بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذٰى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

দ্বীন-ইসলামে ঈমানের স্বরূপ

১ম খন্ড

প্রথম খন্ড

পবিত্র কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর কষ্টিপাথরে যাচাইকৃত

প্রণেতা

ডাঃ শেখ আবু আব্দুল্লাহ লিয়াকত বিন আব্দুস সামাদ বিন রিয়াজ উদ্দিন সালাফী হাফিজাহুল্লাহ খুলনাবী

নূরে তাওহীদ প্রিন্টিং প্রেস, রূপসা, খুলনা।

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذٰى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

দ্বীন-ইসলামে ঈমানের স্বরূপ

১ম

প্রথম খন্ড

উপদেষ্টামন্ডলী

শাইখ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম মাদানী হাফিজাহুল্লাহ

লিসান্স, মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব
ইসলামিক স্কলার, বহু ইসলামি গ্রন্থ প্রণেতা
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, ইহ্ইইয়া-উস্ সুন্নাহ ফাউন্ডেশন, ঢাকা
মহাপরিচালক, ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতি ইনস্টিটিউট, ঢাকা

শাইখ আব্দুস সাত্তার বিন আব্দুল মুত্তালিব হাফিজাহুল্লাহ সালাফী কালাবগী

দাওরায়ে হাদীস, ইসলামিক স্কলার এন্ড পন্ডিত, বহু ইসলামি গ্রন্থ প্রণেতা
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক-মাদ্রাসা দারুস সালাম সালাফিয়া
এবং তালিমুল কুরআন মহিলা মাদ্রাসা, দাকোপ, খুলনা

সম্পাদনায়

শাইখ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল-মামুন বিন আব্দুস সুবহান হাফিজাহুল্লাহ সালাফী,

কামিল (হাদীস), মহিমাগঞ্জ আলিয়া কামিল মাদ্রাসা, গাইবান্ধা
প্রিন্সিপাল, আল-মা'হাদ আস্-সালাফী, নিজখামার, খুলনা

শেখ আবু সাঈদ আব্দুল্লাহ বিন ডক্টর লিয়াকত বিন আব্দুস সামাদ হাফিজাহুল্লাহ সালাফী,

দারুল কুরআন সিদ্দিকীয়া কামিল মাদ্রাসা, খুলনা
বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার (সিএসই), পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী

প্রণেতা

ডাঃ শেখ আবু আব্দুল্লাহ লিয়াকত বিন আব্দুস সামাদ বিন রিয়াজ উদ্দিন সালাফী হাফিজাহুল্লাহ খুলনাবী

দ্বীন-ইসলামে ঈমানের স্বরূপ

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the author.

প্রকাশক ঃ নূরে তাওহীদ মুদ্রণালয়, রূপসা, খুলনা।

প্রকাশকাল ঃ ১৫ জুন - ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, ৮ জিলহজ্জ - ১৪৪৫ হিজরী, ১ আষাঢ় - ১৪৩১ বাংলা

অক্ষর বিন্যাস ঃ কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার শেখ আবু সাঈদ আব্দুল্লাহ ও শেখ উম্মু হাবিবা সাদিয়া সুলতানা।

যোগাযোগ ঃ dr.sheikhliakat@gmail.com

হাদিয়া ঃ **বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, বিক্রয় নিষিদ্ধ।**

প্রাপ্তিস্থান

- **সালেহীয়া লাইব্রেরী**
  হেলাতলা মাসজিদের নীচে, খুলনা। মোবাইল - ০১৭১১-২১৭২৮৮
- **তাওহীদ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স**
  ৯০, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০। ফোন - ০২-৭১১২৭৬২
- **ইহ্ইইয়া-উস্ সুন্নাহ ফাউন্ডেশন**
  ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতি ইনস্টিটিউট, উত্তর খান ও দক্ষিণ খান, ঢাকা। মোবাইল - ০১৮১৭১২৯৮০৭
- **আল-মা'হাদ আস্-সালাফী**
  প্রিন্সিপাল, নিজখামার, খুলনা। মোবাইল - ০১৭৪৪৭১১৯৬৩
- **শেখ আবু সাঈদ আব্দুল্লাহ**
  "মুহাম্মাদীয়া মঞ্জিল" কুলছুম কানন, হোল্ডিং নাম্বার- ১৪৮/৩, বাগমারা মেইন রোড, সোনামনি স্কুলের পার্শ্বে, ডাঃ লিয়াকত সরণি, খুলনা। মোবাইল - ০১৯১১০৭৩৫৮০, ০১৭৩১৫২৬০৩৭
- **দেশের সকল অভিজাত ইসলামী লাইব্রেরী সমূহে**

Din-Islame Emaaner Swarup, 1st Volume Written By:

Dr. Sheikh Abu Abdullah Liakat Bin Abdus Samad Salafi Khulnabi

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده -

প্রকাশকের কথা

الحمد لله আলহাম্‌দুলিল্লাহ। **দ্বীন-ইসলামে ঈমানের স্বরূপ** নামক পুস্তকটি আমরা যথাসময়ে প্রকাশ করতে পেরে মহান আল্লাহ রব্বুল আ'লামীনের প্রতি কোটি কোটি প্রশংসা জ্ঞাপন করছি। فلله الحمد ফালিল্লাহিল হামদ্। ডাঃ শেখ আবু আব্দুল্লাহ লিয়াকত বিন আব্দুস সামাদ বর্তমানে বাংলাদেশের ইসলামী লেখক, গবেষক ও চিন্তাবিদদের মধ্যে এক অনন্য স্থান দখল করে আছেন। আধুনিক বিশ্বে যখন ইসলামের অরিজ্বিনাল বিধি-বিধান, হুকুম-আহকামগুলো দলিত মথিত করে নিচে ফেলে মানব রচিত তাগুতি (তথা শাইত্বানী) শক্তির বিধি-বিধান, হুকুম আহকামের সয়লাভ বইছে তখন লেখকের ক্ষুরধার লেখনি ছদ্মবেশী নামধারী মুমিন-মুসলিমদের সত্যিকারের মুসলিম হওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখে চলেছে। দ্বীন ইসলামের খিদমাতে লেখকের অবদান বহুমুখী। তবে আমরা বলব তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান তাঁর মননশীল, সমাজগঠন ও সমাজ সংস্কারমূলক লেখা, তাঁর চিন্তা ধারার লিখিত রূপ। তাঁর লিখিত প্রকাশিত **'সলাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (প্রথম থেকে পঞ্চম খন্ড)' 'যে গুনাহ তাওবা ছাড়া ক্ষমা হয় না' 'উম্মাতে মুহাম্মাদীর মুক্তির সঠিক পথ' 'দ্বীন প্রতিষ্ঠায় রাসূলের পদ্ধতি বনাম তাগুতি পদ্ধতি' 'পরকালের পাথেয় (প্রথম থেকে সপ্তম খন্ড)' 'সত্যিকারের মুমিন-মুসলিমের পরিচয় (প্রথম খেকে পঞ্চম খন্ড)'** প্রভৃতি পুস্তকগুলো ইতিমধ্যে অভিজ্ঞ পাঠক-পাঠিকা, জ্ঞানী-গুণী, সাধক, গবেষক ও চিন্তাশীল লেখক মহলে ব্যাপকভাবে নন্দিত, বরিত ও প্রসংশিত হয়েছে। বস্তুতঃ তাঁর সব লেখনিই জ্ঞানের দুই মূল উৎস পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের ফল্গু ধারা। দ্বীন ইসলামের মূল রূহ হল 'তাওহীদ'। এর মৌলিক দু'টি ধারা হল, আক্বীদা ও আমাল। তবে এর ভিত্তি হল তাওহীদী আক্বীদা বা ঈমান। আভিধানিক অর্থে ঈমান বলা হয় এমন বিশ্বাসকে, যা নিরাপত্তাপূর্ণ ও প্রশান্তিময় অর্থাৎ ভীতিশূন্য দৃঢ় বিশ্বাসই 'ঈমান' (মির'আতুল মাফাতীহ ১/১১৯ পৃঃ)। শারঈ অর্থে- 'অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কাজে বাস্তবায়নের নাম ঈমান, যা সৎ কাজে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং অসৎ কাজে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়' (ক্বাৎফুছ ছামার, পৃঃ ৬১) এর রুকন বা স্তম্ভ হল ছয়টি (১) মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস (২) মালাইকাদের প্রতি বিশ্বাস (৩)

কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস (৪) রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস (৫) বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাস এবং (৬) তাক্বদীরের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস করা (মিশকাত-হা/১, বাক্বারা- ১৭৭ ও ২৮৫ আয়াত)। কারো ঈমান যদি শিরক মুক্ত হয়, তাহলে তার আমাল মহান আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে কারন এই আক্বীদার উপর যাবতীয় আমাল নির্ভরশীল। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এ বিষয়ে প্রিয় কথা বলেছেন, انما الاعمال بالنيات 'সমস্ত আমাল নিয়তের উপর নির্ভরশীল'। নিয়ত যদি একনিষ্ঠ বা বিশুদ্ধ না হয় তাহলে সমস্ত আমাল বাতিল বলে গণ্য হবে। এ কারণেই বিশুদ্ধ ঈমান-আক্বীদা ও সঠিক আমাল মুসলিম জীবনের মূল চাবিকাঠি। মানবজাতির ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সফলতা ও ব্যর্থতা এর উপরেই নির্ভরশীল। কিন্তু বর্তমানে মুসলিমদের অধিকাংশই ভ্রান্ত ঈমান-আক্বীদায় বিশ্বাসী। তাদের আচার-আচরণ, আমাল-আখলাক্ব, তাওহীদ, মানহাজ ও ঈমান-আক্বীদা দেখলে মনে হয় তাদের কাছে তাওহীদী ঈমান-আক্বীদা ও মানহাজের আদৌ কোন মূল্যই নেই। অথচ আমাল কবুলযোগ্য হওয়ার জন্য তাওহীদ, মানহাজ ও বিশুদ্ধ ঈমান-আক্বীদা প্রধান শর্ত। এ জন্য মানুষের পবিত্র কোরআন ও সহিহ হাদিস সম্পর্কে না জানা, অজ্ঞতা ও উদাসীনতাই দায়ী। তাই সত্যিকারের মুমিন-মুসলিমগণ যেন তাদের ঈমান-আক্বীদা ও মানহাজকে বিশুদ্ধ করতে পারে এবং ঈমান বিধ্বংসী শিরক, কুফর, ইলহাদ, নিফাক্ব, ত্বাগুত, বিদ'আতসহ যাবতীয় ভ্রান্ত আক্বীদা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে এজন্য আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। فلله الحمد ফালিল্লাহ-হিল হামদ। সে লক্ষ্যেই অত্র পুস্তকের নাচিজ লেখক দ্বীন-ইসলামের অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আক্বীদা ও তাওহীদের উপর বিজ্ঞান ভিত্তিক ও অকাট্য দার্শনিক যুক্তি প্রমাণের কষ্টিপাথরে যাচাই-বাছাই করেই **"দ্বীন-ইসলামে ঈমানের স্বরূপ"** নামক অমর গ্রন্থটি সংকলিত করেছেন। তার এ অনবদ্য গ্রন্থটির নাম **"দ্বীন-ইসলামে ঈমানের স্বরূপ"**। গ্রন্থটি চমৎকার রচনা শৈলীতে অনন্য ও মনোজ্ঞ। যেন জ্ঞানের চৌমোহনা। জ্ঞান পিপাসুদের জন্য সুশীতল অমীয় জান্নাতী পানীয়। এ গ্রন্থটির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, যে বিষয়টি নিয়েই তিনি কলম ধরেছেন, সে বিষয়েই সংক্ষিপ্ত ভাবে হলেও জ্ঞান পিপাসুদের ক্ষুধা নিবারণ করার মত করেই লিখেছেন। অধ্যয়নের পর দিল, মন, প্রাণ, অন্তর এক অনাবিল প্রশান্তিতে ভরে উঠে।

ইসলামী জীবন গঠনে প্রতিটি সত্যিকারের মুমিন-মুসলিমের জন্য যে বিশুদ্ধ ঈমান-আক্বীদা, আমাল-আখলাক্বের যে পথ ও পদ্ধতি মহান আল্লাহ রব্বুল আ'লামীন তাঁর প্রিয় হাবীব ও খলীলের মাধ্যমে আমাদেরকে প্রদর্শন

করেছেন, সে পথই হচ্ছে দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতে সফলতা ও মুক্তির একমাত্র সঠিক পথ। যে পথ ও পদ্ধতি সম্বন্ধে বর্তমানে দুনিয়ার অধিকাংশ বাণী আদম উদাসীন, গাফিল ও বেখেয়াল। যারা **সিরাত্বুল মুস্তাক্বীমের** পথ পেতে আগ্রহী তারাও সহজে খুঁজে পায়না সে পথের সঠিক দিশা। তদুপরী এদেশের সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা এ ব্যাপারে ৯৯% দায়ী। এক্ষেত্রে কেবল মাত্র সুশিক্ষিত লোকেরাই এ সম্পর্কে কিছু অবগতি প্রাপ্ত হয়। আমাদের প্রাণ-প্রিয় শ্রদ্ধাভাজন, শিক্ষাবিদ, শিক্ষানুরাগী ও সুসাহিত্যিক বন্ধুবর ডাঃ শেখ আবু আব্দুল্লাহ লিয়াকত বিন আব্দুস ছামাদ সালাফী ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বের এ অভাব পূরণার্থে স্বকীয় নিরলস গবেষণা, সাধনা, অনুসন্ধান ও পরিশ্রমে যে অমূল্য জ্ঞান সম্পদ সংগ্রহ করেছেন তা দুনিয়ায় প্রকাশ করা অত্যন্ত জরুরী বিধায় **"দ্বীন-ইসলামে ঈমানের স্বরূপ"** নামক পুস্তকটি প্রকাশ করা হল। এই অভাব পূরণার্থে প্রকাশিত গ্রন্থটি রাষ্ট্র, ব্যক্তি ও সমাজকে সংশোধন করতে পারলে বা সর্বসাধারণ উপকৃত হলে আমাদের সকলের শ্রম সার্থক জ্ঞান করব। সম্মানিত বিদগ্ধ পাঠক-পাঠিকার দু'আয় অত্র গ্রন্থটি আমাদের প্রকাশনা জগতে তাওহীদ, বিশুদ্ধ ঈমান-আক্বীদা ও মানহাজ এর উপর একটি নির্ভরযোগ্য (অঁঃযবহঃরপ) ও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ হিসাবে নন্দিত ও বরিত হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

সর্বশেষে গ্রন্থকার, সম্পাদকমন্ডলী এবং গ্রন্থখানি কম্পিউটার কম্পোজের (শেখ আবু সাঈদ আব্দুল্লাহ বিন লিয়াকত বিন আব্দুস সামাদ, উম্মু হাবিবা সাদিয়া সুলতানা বিনতে লিয়াকত-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য) মুদ্রণ ও প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সব্বাইকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি এবং মহান রব্বুল আ'লামীনের নিকটে কায়মনোবাক্যে তাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ ও সফলতা কামনা করছি। সেই সাথে লেখকের দীর্ঘায়ু, হায়াতে তৈয়্যেবা, সুস্থ, সবল ও স্বচ্ছল জীবনের কামনা করি এবং তাঁর লেখার মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধির মাধ্যমে দ্বীন ইসলামের আরো ব্যাপক খিদমত করতে পারেন কায়মনোবাক্যে এই দু'আ করি। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم- اللهم صل وسلم على نبينا محمد - والسلام - রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামীউল আলিম অতুবু আলাইনা ইন্নাকা আন্তাত তাওয়াবুর রাহীম। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম আ'লা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ অআ'লা আলি মুহাম্মাদ। ওয়াস সালাম।

বিনয়াবনত

প্রকাশকঃ সি, এস, সি, এস প্রকাশনী

ভূমিকা

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدى الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله- اما بعد :

ইসলামী জীবন আদর্শের মূল ভিত্তি হচ্ছে তাওহীদ, বিশুদ্ধ ঈমান-আক্বীদাহ ও মানহাজ। তার পরই ইসলাম। বিশুদ্ধ ঈমান-আক্বীদাহ বীজ সদৃশ্য আর ইসলাম হচ্ছে সেই বীজ থেকে অংকুরিত বৃক্ষ। বীজ না হলে যেমন বৃক্ষের অস্তিত্ব অসম্ভব, তেমনি বিশুদ্ধ ঈমান-আক্বীদাহ ও মানহাজ ব্যতীত ইসলাম অবাস্তব। ইসলাম একটা দেহ সংস্থা। বিশুদ্ধ ঈমান-আক্বীদাহ ও মানহাজ তার মধ্যে অবস্থিত প্রাণ-সদৃশ্য। প্রাণহীন দেহ যেমন মূল্যহীন, ঈমান বিহীন ইসলাম তেমনি মূল্যহীন। তাই ইসলাম গোটা দুনিয়ার মানব ও জিন জাতিকে সর্বপ্রথম ঈমান গ্রহণেরই আহ্বান জানায়। কেননা ঈমান হচ্ছে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ প্রাসাদের মূল ভিত্তি, যেমন বীজ হচ্ছে শাখা-প্রশাখা, পত্র-পল্লব সমন্বিত বৃক্ষের মূল। বীজ বপন করা হলেই বৃক্ষের অংকুরোদগম হওয়ার সম্ভাবনা। বীজ রোপিত না হলে বৃক্ষের অস্তিত্ব আকাশ-কুসুম কল্পনা।

গাছ যেমন তার মূলের বা শিকড়ের উপর সুদৃঢ় মজবুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, কোনো বিল্ডিং বা আট্টালিকা যেমন তার শক্ত-মজবুত ভিতের উপর বা ফাউন্ডেশনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তেমনি একজন খাঁটি মুসলিম প্রতিষ্ঠিত থাকে তার শক্ত-মজবুত বিশুদ্ধ ঈমানী ভিতের উপর। যার ঈমান হবে যত মজবুত, মুসলিম হিসেবে তিনি হবেন ততটা খাঁটি ও উন্নত।

ঈমান ও ইসলাম একত্রে হলে মুহাম্মাদী দ্বীন তথা শারী'আত পূর্ণ হবে। ঈমান হলো দ্বীনের জান আর ইসলাম হলো দ্বীনের দেহ। দেহ ছাড়া জান যেমন মূল্যহীন, ঈমান ছাড়া ইসলাম তেমনি মূল্যহীন। দেহ না হইলে জান স্থির হয় না, ইসলাম না হলে ঈমান স্থান পায় না। ঈমান ও ইসলাম দুটোকে একত্রে মিলালে তবেই তুমি সত্যিকারের মুমিন-মুসলিম বলে পরিগণিত হবে। এই ঈমান অমূল্য রত্ন। জান-প্রাণের সঙ্গে ইহাকে ভালোবাস। প্রাণের উপর কষ্ট আসিতে দাও, তবুও ভুলেও ঈমানের গায়ে একটু চোটও লাগিতে দিও না। সদা-সর্বদা মনে রাখিও ঈমান রত্ন নষ্ট হইলে সব নষ্ট, ইহকাল পরকাল নষ্ট, মান-সম্মান নষ্ট, ধন-ঐশ্বর্য নষ্ট, স্বাস্থ্য-সম্পদ নষ্ট।

আমাদের অনেকের বদ্ধমূল ধারণা এই যে, মুসলিমের ঘরে জন্মগ্রহণ করিলেই বুঝি মুসলিম হওয়া যায়। নিজের কিছু আদৌ করার দরকার হয় না। কিছু না করিয়াই শুধু মুসলিম নাম ধারণের অমূলক ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। ঈমান ও ইসলাম এমন কতকগুলি আক্বীদা ও কর্মের সমষ্টির নাম, যাহা যে কেহ সুষ্ঠু, সুন্দর ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবে, সেই মানবতার চরম উন্নতির আসনে আসীন হইতে পারিবে। চির সুখে সুখী হইতে পারিবে, ইহকাল ও পরকালে ধন্য হইতে পারিবে, সফলতা লাভ করিবে, স্রষ্টা ও সৃষ্টি সকলেরই নিকট বরণীয় ও আদরণীয় হইতে পারিবে।

এ ঈমান, যা ইসলাম নামক অট্টালিকার ভিত, প্রতিটি সত্যিকারের মুমিন-মুসলিমের সে সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন, স্বচ্ছ, নির্ভুল, নির্ভেজাল, বিশুদ্ধ জ্ঞান থাকা অতীব দরকার। এমন জ্ঞান থাকতে হবে যাতে করে তার অন্তরে পূর্ণ প্রত্যয় জন্মে আর এ প্রত্যয়ই জেনো হয় তার জীবনের পরিচালিকা শক্তি। এ ঈমানী প্রত্যয় যেন প্রতিফলিত হয় তার চিন্তা-চেতনা, আমাল-আখলাক্ব, কথা ও কর্মে। এর জন্যই তিনি বেঁচে থাকবেন ও এরই জন্য যেন তিনি মৃত্যুবরণ করবেন।

'দ্বীন-ইসলামে ঈমানের স্বরূপ' কিতাবে ঈমানিয়াতের পূর্ণাঙ্গ চিত্র সংক্ষিপ্তভাবে হলেও অংকিত হয়েছে। মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে আমরা পবিত্র কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে সুনিপুণভাবে এ চিত্র অংকন করেছি। প্রতিটি ছদ্মবেশী ভৌগলিক মুসলিমের ধ্যান-ধারণা ও আক্বীদা বিশ্বাসকে পরিশুদ্ধ করে মজবুত, নির্ভেজাল, বিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন ঈমানের অধিকারী হতে খুবই সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এই কিতাব ইনশাআল্লাহ। আমরা মনে করি, **দ্বীন-ইসলামে ঈমানের স্বরূপ** কিতাবটি প্রত্যেক মুমিন-মুসলিমের নিত্য পাঠ্য হওয়া উচিত।

ইসলামের মূল রুহ হলো তাওহীদ। ঈমান ও আমাল এর মৌলিক দু'টি ধারা। আর ঈমানী চেতনা যদি শিরকমুক্ত হয়, তাহলে সেই আমাল মহান আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে। অন্যথা বাতিল বলে গণ্য হবে। এর কারণেই বিশুদ্ধ ঈমান-আক্বীদা ও সঠিক আমাল মুসলিম জীবনের মূল চাবিকাঠি। মানব ও জিন জাতির ইহকাল ও পরকালে সফলতা ও ব্যর্থতা এর উপরেই নির্ভরশীল, কিন্তু বর্তমান জামানার মুসলিমদের অধিকাংশই ভ্রান্ত ঈমান আক্বীদায় বিশ্বাসী। তাদের কাছে তাওহীদী ঈমান-আক্বীদার আদৌ কোনো গুরুত্ব নেই। অথচ আমাল কবুলযোগ্য হওয়ার জন্য বিশুদ্ধ আক্বীদা প্রধান

শর্ত। এ জন্য মানবের ও দানবের ঈমান আক্বীদা সম্পর্কে অজ্ঞতা ও উদাসীনতাই দায়ী। তাই মুসলিমরা যেন তাদের ঈমান-আক্বীদা ও মানহাজকে বিশুদ্ধ করতে পারে এবং ঈমান বিধ্বংসী শিরক, কুফর, ইলহাদ, ত্বাগুত, বিদ'আতসহ যাবতীয় ধরনের ভ্রান্ত ঈমান-আক্বীদা ও মানহাজ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে, সে লক্ষ্যেই **'দ্বীন-ইসলামে ঈমানের স্বরূপ'** নামক সুবৃহৎ কলেবরের কিতাবটি সংকলন করা হয়েছে। ফালিল্লাহিল হাম্‌দ।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসে নববীর স্পষ্ট ও অকাট্য বক্তব্য প্রমাণ করে, ঈমানের কয়েকটি মূলনীতি রয়েছে, যেগুলোর উপর তাওহীদ ও ঈমান দণ্ডায়মান। এসব মূলনীতি একটি অপরটির সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। যেগুলোর একটির প্রতি ঈমান আনলে বাকীগুলোর প্রতি ঈমান আনা জরুরী হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে একটির সাথে কুফরী করলে বাকীগুলোর সাথে কুফরী হয়ে যায়। সেজন্য প্রত্যেক সত্যিকারের মুমিন-মুসলিমের ঈমান সম্পর্কে সম্যক ধ্যান-ধারণা থাকা একান্তই জরুরী।

বিভিন্ন দেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর সাথে তুলনা করলে বাংলাদেশের মুসলিমদের বিশেষ তিনটি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। সেই বৈশিষ্ট্য তিনটি হলো-

(১) বাংলার আপামর মুসলিমগণ ভক্তিপ্রবণ। তারা তাদের ধর্ম দ্বীন ইসলামকে খুবই ভালোবাসেন। মহান আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা -এর প্রতি তাদের ভক্তি খুবই বেশি। তাঁরা সাধারণতঃ ইসলামী ঈমান-আক্বীদা, আচার-আচরণ, তাহযীব-তামাদ্দুন, সংস্কৃতি ইত্যাদি মেনে চলতে খুবই আগ্রহী।

(২) তাঁরা সরলপ্রাণ। সাধারণতঃ ঈমান ও ইসলামের নামে বা ধর্মের নামে যা বলা হয় তাঁরা সহজেই তা মাথা পেতে নেন।

(৩) তাঁরা ভদ্র ও বিনয়ী। কোনো বিষয়ে সত্য অবগত হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা তা বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নেন এবং নিজের ভুল স্বীকার করে নেন। অন্যান্য অনেক মুসলিম জনগোষ্ঠীর সদস্যদের মতে নিজের ভুল বুঝার পরেও তা আঁকড়ে ধরার বা তার পক্ষে ওকালতি করার চেষ্টা করেন না। বিদেশী দাঈ ও সমাজকর্মীরা বাংলার মুসলিমদের এসকল বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন।

এতসব ভালো ভালো গুণ ও বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও বাংলার মুসলিমদের মধ্যে সাধারণভাবে আমরা দেখতে পাই যে, তারা তাদের বিশুদ্ধ ঈমান-

আক্বীদা, মানহাজ, আমাল-আখলাক্ব ও ইসলামী বিধি-বিধান সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান রাখেন না। অনেক ধর্মভীরু দ্বীন-দরদী মুসলিমকে উসুলুল ঈমান বা ঈমানের আরকান সম্পর্কে যদি প্রশ্ন করা হয়, তবে তিনি ভালোভাবে তা বুঝিয়ে বলতে পারেন না। যেমন- লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ-এর অর্থ কী? ঈমানের আহকাম ও আরকানগুলো কি কি? কিসে কিসে ঈমান ও ইসলাম বিনষ্ট হয়? শিরক কি? কুফর কি? নেফাক্ব কি? ইলহাদ কি? ত্বাগুত কি? বিদ'আত কি? দ্বীন-ইসলামের মূল ভিত্তি কি কি? ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ সকল বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকার দুঃখজনক পরিণতি হলো- তাঁরা প্রতিনিয়ত এমন সব ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস ও কর্মে লিপ্ত হচ্ছেন যা তাদের ঈমান ও ইসলামকে বিনষ্ট বা দুর্বল করে দিচ্ছে। কেন এমন হচ্ছে? যেখানে ঈমানই মূল সেখানে ঈমান সম্পর্কে বিশুদ্ধ ও স্বচ্ছ জ্ঞান অর্জন না করে বা ভাসা ভাসা ধারণা নিয়ে কিভাবে আমরা প্রকৃত মুসলিম হতে পারি?

আমাদের মনে হয় যে কোনো বিবেকবান পাঠক-পাঠিকা অনুধাবন করবেন যে, আমাদের এ অবস্থার আশু-আমূল পরিবর্তন হওয়া উচিত। আমাদের উচিত আমাদের দ্বীনের মূল কি তা ভালোভাবে অবগত হওয়া। কিসে আমাদের ঈমান দৃঢ় ও মজবুত হবে আর কিসে কিসে আমাদের ঈমান ও ইসলাম বিনষ্ট হবে সে সম্পর্কে আমাদের স্বচ্ছ, পরিচ্ছন্ন, বিশুদ্ধ, নির্ভেজাল জ্ঞান অর্জন করা।

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের মহান সত্তা, নাম, গুণ, কর্ম ও অধিকার সম্পর্কে সার্বিকভাবে জানা ও মানা হচ্ছে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ইলম ও সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান-এর সাথে অন্য কিছুর তুলনা করার সুযোগ কোথায় ? দুনিয়ার যত মানব ও দানব এসেছে তারা যদি এ জ্ঞান অর্জন না করে, তাহলে সে অন্য যত বিদ্যাই অর্জন করুক না কেন সে গন্ডমূর্খ ও জাহেল থেকেই যাবে। এ জ্ঞান অনুযায়ী অজ্ঞতা ও জ্ঞানের মাপকাঠি নির্ধারিত হবে। এ জ্ঞান যার কাছে যত বেশী, যত বিশুদ্ধ তিনি তত বড় মাপের আলেম হিসেবে বিবেচিত হবেন, কারণ, এ জ্ঞান অর্জন মানেই তাওহীদের জ্ঞান অর্জন। তাওহীদ হল মহান আল্লাহর একত্ব। ইবাদতের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র বা একমাত্র মহান আল্লাহকে একক গণ্য করাই হল তাওহীদ। আহলুল ইলম ও উলামায়ে কেরাম তাওহীদকে তিনভাগে ভাগ করেছেন। যথা: ১) তাওহীদে রবুবিয়্যাহ ২) তাওহীদে উলুহিয়্যাহ এবং ৩) তাওহীদে আসমা ওয়া সিফাত।

মহান আল্লাহর সত্তা ও কর্ম সম্পর্কে জানার, তা ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করার ও মানার অপর নাম তাওহীদুর রবুবীয়াহ বা প্রভুত্বে তাওহীদ। তার নাম ও গুণ জানা, মানা ও সেগুলোর যথাযথ উপলব্ধি অন্তরে জাগরুক রাখা, সেগুলো দিয়ে তাকে ডাকাই হচ্ছে তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত বা নাম ও গুণে তাওহীদ। আর তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন থেকে একমাত্র তার জন্যই মানব ও দানবের সবকিছু নিবেদিত হওয়ার নামই হচ্ছে তাওহীদুল উলুহিয়াহ বা ইবাদাতে তাওহীদ। তন্মধ্যে সবচেয়ে শরীফ ও সম্মানিত অংশ হচ্ছে তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত। সমস্ত নবী ও রাসূলগণের মূল দাওয়াত ছিল তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ।

আমরা আমাদের নিজেদের এবং সন্তান-সন্ততির দৈহিক সুস্থতার জন্য খুবই সচেতন ও সচেষ্ট। অনুরূপভাবে আমরা আমাদের ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ ও তার বৃদ্ধিতে খুবই সচেষ্ট। এসব ক্ষেত্রে কোনো জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ব্যক্তি না জেনে-বুঝে কোনো কাজ আদৌ করবেন না। তিনি কোনো প্রকল্পে বিনিয়োগের আগে সার্বিকভাবে নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করবেন যে, তার বিনিয়োগকৃত মূলধন সেখানে নিরাপদ থাকবে এবং তা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে। কারও সততা, নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা সম্পর্কে পরিপূর্ণ নিশ্চিত না হয়ে কখনই তিনি কারো হাতে তার কষ্টার্জিত অর্থ-সম্পদ তুলে দেবেন না, যত লাভের লোভই সে দেখাক না কেন। উপরন্তু এরূপ সৎ ও বিশ্বস্ত মানুষও কোনোভাবে যেন তার ধন-সম্পদ নষ্ট করতে না পারে সেজন্য বিভিন্ন ধরণের শর্ত তিনি আরোপ করবেন এবং মাঝে মাঝেই তার সম্পদের হিসাব নিবেন।

নিঃসন্দেহে আমাদের শারিরীক ও মানসিক সুস্থতা, আমাদের সন্তান-সন্ততির শারিরীক ও মানসিক সুস্থতা এবং আমাদের অর্থ-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও তার উন্নয়ন আমাদের বড় দায়িত্ব এবং আমাদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু এর থেকেও যেটা আমাদের বেশি রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের দরকার সেটা হলো আমাদের ঈমান আক্বীদা। ঈমান আক্বীদা হলো আমাদের সবচাইতে বড় সম্পদ, যার উপর আমাদের পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের সকল কল্যাণ, সফলতা ও মুক্তি নির্ভর করছে। ঈমানের ক্ষতি হলে আমরা চূড়ান্ত ধ্বংস ও ক্ষতির মধ্যে নিপতিত হব। এ মহামূল্যবান সম্পদ সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কি আমাদের কিছু চেষ্টা করা উচিত নয় ? এজন্য কি সামান্য কিছু সময় আমাদের ব্যয় করা উচিত নয় ?

উপরে উল্লেখিত সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ আলোচনা থেকে আমরা সবাই অনুভব করছি যে, ঈমান ও আক্বীদার জ্ঞান অর্জন করা আমাদের খুবই জরুরী। এ উপলব্ধি ও অনুভবের ভিত্তিতেই আমাদের এ কলম ধরা। বাংলার অসংখ্য-অগণিত সরলপ্রাণ ভক্তিপ্রবণ মুসলিম সমাজেই কেউই দ্বীন ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস বা উসুলুল ঈমান সম্পর্কে জানতে অনিচ্ছুক নন। তা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে তাদের অনেকের অজ্ঞতা বা জানার কমতির কারণ সম্ভবত এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা কিতাবের স্বল্পতা। বিভিন্ন কিতাবে আরকানুল ঈমানের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু সাধারণ পাঠক-পাঠিকার কর্মজীবনের ব্যস্ততার মাঝে বিভিন্ন বইপত্র সংগ্রহ করে বিস্তারিত পড়ার বা জানার সময় হয়ে উঠে না। ফলে আমরা এমন একটি কিতাব এর প্রয়োজন অনুভব করলাম যাতে সাধারণ পাঠক-পাঠিকার জন্য ইসলামী ঈমান-আক্বীদার সকল দিক খুঁটিনাটি আলোচনা করা হবে। এই কিতাবে এ প্রয়োজন মিটানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে।

আমাদের বিশ্বাস যে, ঈমান ও আক্বীদার বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর হুবহু অনুসরণ এবং সাহাবী, তাবেয়ী, তাবি-তাবিয়ী ও প্রসিদ্ধ চার ঈমানের মতামতের বাইরে না যাওয়াই মুমিনের নাজাত ও প্রশান্তির পথ। প্রথম তিন মুবারক যুগে যে সকল হাদীস প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, প্রসিদ্ধ হাদীসের গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে এবং প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণ সহীহ বলে গ্রহণ করেছেন, কেবলমাত্র সেগুলির উপরে আমাদের নির্ভর করতে হবে। পরবর্তী যুগে সংকলিত, গরীব, অপ্রসিদ্ধ, জাল, জয়ীফ ইত্যাদি হাদীসের উপর নির্ভরতা একেবারেই বর্জন করতে হবে। এগুলিকে ফজীলাতের বিষয়ে কেউ জয়ীফ গ্রহণ করলেও কোনো অবস্থাতেই এগুলি বিশুদ্ধ-ঈমান আক্বীদার উৎস নয়। পবিত্র কুরআনের তাফসীর, হাদীসের ব্যাখ্যা ও ঈমান-আক্বীদা বিষয়ক অন্যান্য মতামতের ক্ষেত্রেও একই কথা। সহীহ সনদে তাদের থেকে এ সকল বিষয়ে যা বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে আমাদের সকলের সীমাবদ্ধ থাকতে হবে এবং এ সকল বিষয়ে তারা যা বলেননি তা বর্জন করতে হবে। এজন্য এই বইয়ের মূল ভিত্তি পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস।

মহান আল্লাহর অশেষ, অবারিত রহমাত ও তাওফীক্বই আমাদের একমাত্র সম্বল। অত্র পুস্তক লেখার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সদা-সর্বদা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে কাতর আকুতি জানিয়েছি, যেন তিনি দয়া করে সঠিকভাবে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের শিক্ষা বুঝার ও বুঝানোর তাওফীক্ব দান করেন। কিন্তু যে কোন মানবীয় কাজ-কর্মে ভুল থাকা

খুবই স্বাভাবিক। আর আমার মত অযোগ্য, নাচিজ ব্যক্তির ভুল ব্যাপক হওয়াই স্বাভাবিক। যেমন প্রিয়নবীজী বলেছেন- "প্রত্যেক আদম সন্তানই ভুলকারী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ভুলকারী তারা, যারা নিজের ভুল স্বীকার করে (তথা তাওবা করে)।" (তিরমিজী) প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন, **الدين النصيحة "আদ্ দীনুন নাসীহাহ** অর্থাৎ পরস্পরে নসীহতই দ্বীন।" তাই আমরা একান্তভাবে আশা করব যে, কোন জ্ঞানী-গুণী, আলেম-উলামা, পাঠক-পাঠিকা অত্র বইয়ে কোন প্রকার ভাষাগত, তথ্যগত বা মতামতের ভুল দেখতে পেলে যেন অনুগ্রহপূর্বক তা অত্র বই এর লেখককে বা প্রকাশককে জানান। আমরা আমাদের অপূর্ণতা সম্পর্কে সচেতন এবং ভুল সংশোধনে ভীষণভাবে আগ্রহী। এ বই এর কোন বিষয়ে আপনি দ্বিমত পোষণ করলে দয়া করে তা আমাদেরকে জানান। পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে আমাদের মতের ভুল ধরা পড়লে আমরা তা তাৎক্ষণিকভাবে স্বীকার করে নেব। মহান আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় নবীজীর শিক্ষার যথাযথ **'ইত্তিবা'** ও **'ইতা'আত'** করাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। ভুল করা খুবই স্বাভাবিক তবে ভুলকে আঁকড়ে ধরে থাকা মহা অন্যায়। আমরা এরূপ অন্যায়ের মধ্যে লিপ্ত হওয়া থেকে মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

ফুল অভ্যন্তরে মধু সঞ্চিত থাকে একথা কেউ জানত না যদি মৌমাছি অক্লান্ত পরিশ্রমে সেখান থেকে মধু আহরণ করে না আনত। কবি, লেখক, সাধক-গবেষক, চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক, চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিকদের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যেত যদি সম্পাদক, প্রকাশক ও মাহাত্মদের সুনজরে সেগুলো না পড়ত। বিভিন্ন রোগের মহৌষধ মধু সঞ্চয় করে যদি সে মধু গোপন কক্ষে আবদ্ধ করে রাখা হতো তাহলে যেমন তার গুণাগুণ অপ্রকাশিত থাকত তেমনি আমাদের এই সামান্য চিন্তাধারায় রচিত/সংকলিত **"দ্বীন-ইসলামে ঈমানের স্বরূপ"** কিতাবটি হয়তো চিরদিন অপ্রকাশিত থাকত আর যুগে যুগে উই পোকার খোরাক জোগাত যদি মহান রব্বুল আ'লামীনের অশেষ রহ্মাত অতঃপর আমার প্রিয়সহধর্মিণী শেখ উম্মু সালমা ইসমত আরা বিউটি বেগমের পবিত্র হস্তের ছোয়া না পেত।

অত্র পুস্তকের আরবী ইবারত লিখে দিয়ে যারা আমাকে সার্বিকভাবে কো-অপারেশন ও সাহায্য-সহযোগিতা করেছে তারা হল, আমার প্রাণপ্রিয় কলিজার টুকরা একমাত্র পুত্র কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার শেখ আবু সাঈদ আব্দুল্লাহ, পটুয়াখালি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, আমার স্নেহাস্পদ পরম প্রিয় মেঝো

কন্যা কৃষিবিদ শেখ উম্মু উমামা সুরাইয়া, পটুয়াখালি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও আমার অতি আদরের দুলালী ছোট কন্যা শেখ উম্মু হাবিবাহ সাদিয়াহ সুলতানা, অনার্স ২য় বর্ষ, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল।

ইয়া রব্বুল আ'লামীন। এই পুস্তকের সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ভ্রমপ্রমাদ আমার একান্তই নিজস্ব এবং যা কিছু শুভ, কল্যাণপ্রদ ও ভালো দিক রয়েছে সেগুলো সবই তোমার। তাই মেহেরবাণী করে তুমিই আমাদের সবাইকে এই পুস্তকের সম্যক অনুধাবন, সঠিক হৃদয়ঙ্গম এবং এর প্রতি আমাল করার পূর্ণ তাওফীক্ব দান কর।

এই পুস্তক প্রকাশের ব্যাপারে আমাকে উপদেশ দিয়ে, আরবী ইবারত লিখে দিয়ে, সুষ্ঠু মুদ্রণের গুরু দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে যারা আমাকে সার্বিকভাবে সাহায্য-সহযোগীতা ও কো-অপারেশন করেছেন, মহান রব্বুল আ'লামীন তাঁদের সবাইকে জাযায়ে খায়র প্রদান করুন। অধম লেখক অত্র পুস্তক সংকলন করতে গিয়ে যে সমস্ত গ্রন্থরাজি হতে সাহায্য নিয়েছি, উক্ত গ্রন্থরাজির সম্মানিত লেখক, সম্পাদক, সংকলক ও প্রকাশকদের প্রতি জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। মহান রব্বুল আ'লামীন তাঁদের সবাইকে এর জাযায়ে খায়র প্রদান করুন। পরিশেষে হে আমার মহান আল্লাহ ! তুমি জান কি লোভের বশবর্তী হয়ে আমি একাজে হাত দিয়েছিলাম আর তুমিই জান এতে আমার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির অবদান। আমাদের দুইজনের ও সন্তান-সন্ততির পক্ষ থেকে তুমি এটা কবুল কর। আর এটা আমাদের দুইজনের পিতা-মাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, আত্মীয়-স্বজন ও মুরুব্বীয়ানদের পারলৌকিক নাজাতের অবলম্বন বানায়ে দাও। এর অসীলায় আমাদের পরিবার-পরিজনদের মুসল্লী বানায়ে দাও এবং তাঁদের ইহকাল ও আখিরাতের অভিভাবকত্ব গ্রহণ কর। মেহেরবান মহান আল্লাহর উপরই আমার ভরসা। তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট। তাঁর প্রতি আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তিনিই সর্বোত্তম সাহায্যকারী ও সমাধানকারী। মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ অসৎ পথ থেকে সরায়ে সৎ পথে নিয়ে আসার শক্তি রাখেন না। لا حول ولا قوة الا بالله লা-হাওলা অলা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। অতএব তাঁরই কাছে আমি সবকিছু সোপর্দ করছি।

وما ذلك على الله بعزيز - ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم - واخر دعوانا عن الحمد لله رب العلمين آمين ثم آمين -

ওয়ামা যালিকা আলাল্লাহি বি-আযীয, রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামীউল আলীম, ওয়া আতুবু আলাইনা ইন্নাকা আন্তাত তাওয়াবুর রহীম ওয়া আখিরু দা'অনা আনিল হামদুলিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন। আমীন! সুম্মা আমীন !!

বিনয়াবনত

মহান আল্লাহর রহমত অতঃপর পাঠকদের নিকট দু'আ প্রার্থী

ডাঃ শেখ আবু আব্দুল্লাহ লিয়াকত বিন আব্দুস সামাদ সালাফী খুলনাবী

ফরমার চীফ মেডিকেল অফিসার এ্যান্ড হেড অফ দ্যা ডিপার্টমেন্ট (দায়িত্বপ্রাপ্ত),

মেডিকেল বিভাগ, মোংলা পোর্ট হসপিটাল, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, মোংলা, বাগেরহাট।

মোবাইল- ০১৯১১-০৭৩৫৮০, ০১৭৭১-৪৩৪৯২৪

Why is this book???

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدى الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله- اما بعد:

Faith is the main basis of Islamic way of life. After that, comes Islam. Faith is like a seed and Islam is a tree sprouted from that seed. As the existence of a tree is impossible without seed, similarly without faith, Islam is unreal. Islam is organized as a body. Faith is life-like in the body. Islam without faith is worthless like lifeless bodies. That is why Islam, firstly, calls on **'the Human and the Jinn'** nations of the world to be have faith. Because faith is the main foundation of the complete palace of Islam, just as the seed is the root of a organized tree with its branches and leaves. Seedlings are more likely to germinate when sown. If the seed is not planted, the existence of the tree is **only a fantasy** (**unimaginable).**

Just as a tree stands firmly on its roots, a building stands upright on its durable and firm foundation, in the same way, a true Muslim is established on the basis of his/her strong and stout faith.

The stronger one's faith is, the more pure and advanced one will be as a Muslim.

When faith and Islam come together, the Muhammadi religion, that is, Shari'ah will be fulfilled. Faith is the soul of religion and Islam is the body of religion. Just as life is worthless without body, Islam is worthless without faith. As a soul remains unstable without a body, in the same way, faith has no place without Islam. Only if you combine faith and Islam, you will be considered a true believer-Muslim. This faith is priceless. Love it with all your soul and heart. Let hardship come upon the soul, yet do not let the slightest injury inflict on faith. Always remember that if faith is lost, everything is lost, this world and the hereafter are lost, value and honour are lost, wealth and riches are lost, health and wealth are lost.

The basic idea of many of us is that you can become a Muslim only if you are born in a Muslim house. **Having birth in a muslim family**, **it seems you don't have to do anything on your own at all to be a true muslim.** The absurd idea of naming only Muslims without doing anything is completely wrong. Faith and Islam are the names of a number of akidaas and deeds which, if one performs them systemically, beautifully and smoothly, one can attain the seat of ultimate progress of humanity. You will be able to be happy forever, you will be blessed in this world and in the hereafter, you will be successful, you will be able to be loved and cherished by all.

It is essential for every true believer-Muslim to have a clear, transparent, accurate, unadulterated, pure knowledge about this faith which is the foundation of a **building** called Islam. He must have such knowledge that a full conviction is born in his/her heart and this conviction is the **guiding** force of his/her life. This faith should be reflected in his thoughts and consciousness, deeds and morals, words and actions. This is the reason for which a true believer muslim should live and die.

The full picture of faith is given in the book **'The Nature of Faith in Din-Islam'** albeit briefly. By the grace of Almighty Allah, we have skillfully drawn this picture in the light of the Holy Quran and

Sahih Sunnah (authentic Islamic life). By the wish of Almighty Allah, this book will play a very helpful role in purifying the thoughts and beliefs of every Muslim in order to attain strong, unadulterated, pure and clear faith. We think that this book should be a daily text for every believer-Muslim.

The essence of Islam is **Tawheed** (Oneness of Almighty Allah). The two basic tenets of this are faith and deeds (Holy performances). And if the spirit of faith is without partnership to Allah, then that deed (Holy performances) will be acceptable to Allah Almighty. Otherwise, it (holy performance) will be considered void. That is why, pure Iman-Akidaa (faith-concept) and proper deeds (Holy performances) are the key to muslim-life. The success and failure of **'the Human and the Jinn'** nations in this world and in the hereafter depend on it (holy performance), but most of the Muslims of the present age believe in the erroneous-belief in Akidaa (concept of Islam). To them, Tawheedee - Emaan-Akidaa (faith-concept on the basis of Oneness of Almighty Allah) is of no importance at all. But pure Akidaa (concept of Islam) is the main condition for Amal (holy performance) to be acceptable. So, ignorance and indifference of the human beings and the **jinns** about Akidaa is to be blamed for this. Therefore, the muslims, in order to purify their Emaan Akidaa (faith-concept of Islam) and to protect themselves from all kinds of extreme faith-spoiling Shirk (partnership with Allah), Kufr (denying Islamic rules and regulations), Ilhad (atheism), Tagut (violators of Islamic laws and regulations), Bid'aat (innovation in Islam), the great form of book **'The Nature of Faith in Islam'** has been compiled. **Falillahil Hamd**.

The Holy Qur'an and the clear and irrefutable statement of the Prophet in Hadith prove that there are several principles of faith on which Tawheed (Oneness of Allah) and Emaan (faith) are based. These principles are inextricably linked with one another. If you believe in one of them, it becomes necessary to believe in the rest. On the other hand, if one denies any one of them, he becomes a disbeliever with the rest. That is why, it is very essential for every true believer-Muslim to have a thorough idea about the faith.

Comparing the Muslim population of different countries, the muslims of Bangladesh have three special characteristics. The three characteristics are-

(1) All the muslims of Bengal are devout. They love their religion, Islam, very much. Their devotion to Almighty Allah and His beloved Prophet (peace and blessings be upon him) is very high. They are generally very interested in adhering to the Islamic faith - Akidaa (concept of Islam), manners, tahajib–tamaddun, culture etc.

(2) They are simple-minded. Usually what is said in the name of faith and Islam or in the name of religion, they take it easy.

(3) They are polite and humble. When they know the truth about something, in most cases they accept it without saying a word and admit their mistake. According to many other members of the Muslim community, even after realizing their mistake, they do not try to adhere to or advocate for it. Foreign officials and social workers have mentioned all these features of the muslims of Bengal.

Despite all these good qualities and characteristics, we generally find among the Muslims of Bengal that they do not have a detailed knowledge of their rules and regulations. Many devout Muslims are asked about **Usulul Emaan** or **'principles of faith'** but they cannot explain them well. For example, what is the meaning of La-ilaha illallah? What are the pillars of faith? What spoils faith and Islam? What is shirk? What is Kufr? What is Nefaq? What is innovation (i.e. Bidaat)? What is the main basis of Islam? etc. etc.

The sad consequence of not having a thorough understanding of all these matters is that they are constantly engaged in all these meditative ideas, beliefs and actions which are destroying or weakening their faith and Islam. Why is this happening? Where faith is the root, how can we be real Muslims without having a clear and transparent knowledge of faith or with vague ideas?

We think that any conscientious reader will realize that our condition should change immediately. We should be well aware of the essence of our religion. Acquiring our clear, clean, pure, unadulterated knowledge about what will make our faith strong and stout and what will destroy our faith and Islam.

The distinguished knowledge and the best knowledge in the world is to know and accept the great entity, name, quality, actions and rights of Almighty Allah- where is the opportunity to compare it with others? If all the humans and demons in the world do not acquire this knowledge, then no matter how much knowledge they acquire, they will remain stupid and ignorant. Ignorance and knowledge will be measured according to this knowledge. The more this knowledge is available to him, the closer he is, the more he will be enlightened because this knowledge is the foundation of knowledge in Tawheed. Tawheed denotes Oneness of Allah. To accept Oneness of Allah only in terms of Veneration is Tawheed.

Another name for knowing about the entity and actions of Almighty Allah is Tawhidur Rabubiyyah or Oneness in Lordship. Knowing His name and qualities, obeying them and keeping them awake in the heart, calling Him by those names are Tawhidul Asma Was Sifat or Tawheed in Name and Attributes. And by being aware of His rights and all humans' and demons' devotion to Him alone is called Tawheedul Uluhiyah or Tawheed in worship. Among them, the most dignified and honourable part is Tawhidul Asma Was Sifat.

We are very conscious and striving for the physical well-being of ourselves and our children. In the same way, we are striving very hard for the maintenance and prosperity of our wealth. In these cases, a man of knowledge and intelligent person will not do any work at all without knowing or understanding. Before investing in any project, he will try to make sure that his invested capital will be safe there and it will gradually increase. He will never give up his hard-earned money without being fully convinced of someone's honesty, devotion, and fidelity, no matter how greedy he may be. In addition, he will impose various conditions so that even

such an honest and faithful person will not waste his wealth in any way and will occasionally take stock of his wealth.

Undoubtedly, our physical well-being, the well-being of our children and the maintenance and development of our resources are our great responsibilities and extremely necessary for us. But more than that, what we need to maintain and develop is our Emaan Akidaa (belief and concept). Emaan Akidaa (belief and concept) is our greatest asset, on which depends all our welfare, success and liberation of our worldly and otherworldly life. If faith is lost, we will fall into ultimate destruction and loss. Shouldn't we make some effort for the proper and smooth maintenance for this precious resource? Shouldn't we spend a little time for this?

From the brief but concise discussion mentioned above, we all feel that it is very necessary for us to acquire the knowledge of Emaan and Akidaa. We have started writing on the basis of this perception and feeling. In the innumerable simple-minded Muslim society of Bengal, no one is reluctant to know about the basic beliefs of Islam or Usulul Emaan. Nevertheless, the ignorance or lack of knowledge of many of them in this regard is probably due to the lack of necessary guidelines in this regard. Different aspects of Arkanul Emaan have been discussed in different books. But in the midst of busy career-life of the common readers, there is not time for them to read or know in detail by collecting various books. As a result, we have felt the need for such a book that would discuss all aspects of Islamic faith and belief in detail for the general readers. Every effort has been made in this book to meet this need.

We believe that the path of salvation and peace of the believer is to follow the Holy Qur'an and Sahih Sunnah exactly on faith and belief and not to go beyond the views of Sahabi, Tabi'i, Tabi-Tabi'i and the famous four faiths. We have to rely only on the hadiths that have gained prominence in the first three Mubarak eras, compiled in the books of famous hadiths and accepted by the famous muhaddisin as sahih. Reliance on compiled, poor, infamous, fake, false, etc. hadiths in the next age should be completely eliminated. Even if someone describes them as virtuous, they are by no means the source of Emaan Akidaa. The

same is true of the exegesis of the Holy Qur'an, the interpretation of the Hadith, and other opinions on Emaan-Akidaa. All of us have to be limited in what has been narrated from them in the Sahih Sanad and we have to reject what they have not said in all these matters. Therefore, the main basis of this book is the Holy Quran and Sahih Hadith.

Finally, Sovereign and Gracious Allah knows for what purpose I have taken this attempt and the sacrifices and contribution that my wife and children have made. I pray to Sovereign and Gracious Allah for accepting this trifle effort on all our behalf and make it a good support of mercy and salvation for our parents and patrons in the spiritual world hereafter. I also pray to Sovereign and Gracious Allah to render us the perfect knowledge of Tawheed (Oneness of Allah) and give power to stick to Tawheed (Oneness of Allah) with strong determination and make us free from all the known and unknown shirks (partnership with Allah, to share, participate, be partner, associate) and Bidaat (innovation in Islam) so that we may die with pure and rectified Emaan and Akidaa. The beloved Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said, ‘‘Admonition between one another is religion.’’ Therefore, we sincerely hope that if knowledgeable-virtuous persons, scholars, readers find any kind of linguistic, informative or opinion error in this book, please inform the author or publisher of this book. We are aware of our imperfections and are keenly interested in correcting mistakes. If you disagree with any topic in this book, please let us know. If our opinion is misunderstood in the light of the Holy Quran and Sahih Hadith, we will immediately accept it. Our sole purpose is to do the proper **‘ittiba’** and **‘ita’at’** of the teachings of Exalted Allah and His beloved Prophet (peace and blessings of Allah be upon him). It is normal to make mistakes, but it is wrong to hold on to those mistakes. We seek refuge in Exalted Allah from indulging in such injustices.

No one would have known that honey is stored inside flowers if the bees had not worked tirelessly to extract honey from flowers. The relentless efforts of poets, writers, devotees-researchers, thinkers, litterateur, physicians and scientists would

have failed if they had not been well-apprised in the eyes of editors, publishers and great persons. If honey, the drug for various ailments, had been stored in a secret chamber, then its merits and demerits would have remained unrevealed ; in the same way, the book **''Din-Islame Emaaner Sarup"**, written and compiled with our little line of thought, would have remained unrevealed and would provide food for the termite (wee) insects throughout the ages if there were Exalted Allah's no infinite mercy and then my dear wife Sheikh Ummu Salma Ismat Ara's touch of her virtuous hands.

The ones who have co-operated and helped me in writing the Arabic verses of this book are my favourite piece of my heart, the only son, computer engineer Maulana Sheikh Abu Sayeed Abdullah, my affectionate most favourite second daughter Maulana Sheikh Umm Umama Suraiya, student of Masters, Faculty of Agriculture, Patuakhali University of Science and Technology and my dear youngest daughter, Sheikh Umm Habibah Sadiah Sultana, a student of class XI.

O Lord, Sustainer of the Universe, all these deviations and errors in this book are my own and all the good, beneficial and good aspects are yours. So please give us all a full understanding of this book, a proper perception and full will-power to act on it.

By advising me on the publication of this book, by writing Arabic verses, and by shouldering the heavy responsibility of proper printing, may Almighty Allah bestow goodness on all those who have rendered me their assistance, help and co-operation. I would like to express my sincere gratitude to the esteemed authors, editors, compilers and publishers of all the books from whom I have taken help in compiling this book. May Almighty Allah bless them all. I pray to Allah this book might create an urge in the readers towards honesty, truth and welfare and save them from sin (shirk, kufoor, nifaq, ilhad, - bidaat etc) and fall. My earnest request to those, who will be benefited with this book, to pray to Sovereign and Gracious Allah for peace and prosperity of my parents, teachers, friends and the whole muslim-nation. I have tried my best

to discuss about the characteristics of Tawheed and true perfect muslims in this book so far my knowledge goes.

The great prophet Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wa Sallam At Taslima says, ‘‘To err is human and everyone is wrong and the greatest wrong are those who admit the wrongs of their own.’’ As I am one of the members of this human society, I may obviously be wrong and misguided. Therefore, if anyone finds any wrong in this book and rectifies, I will be highly obliged and rectify the same in next publication (if Allah wishes).

اللهم صلى وصلم على النبيين محمد - الحمد لله الذى بنعمته تتما لصالحات ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم - واتوب علينا انك انت التواب الرحيم- سبحان ربك رب العزت عما يصفون وسلم على المرسلين - والحمد لله رب العالمين - واخر دعوان عن الحمد لله رب العالمين- امين - سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك (ثلاثة)

Humbly

Writer

Brief Introduction of the Author

The author, Dr. Sheikh Abu Abdullah Liakat bin Abdus Samad was born in a reputed muslim family in the year 1951/52 in his father’s house, village-Chandpur, post-Baman Danga Bazar, police station-Rupsah, district-Khulna. He is the 5th (fifth) son of his late father Alhajj Sheikh Abu Aftab Abdus Samad bin Sheikh Riaz Uddin Rahimahullah and his late mother Sheikh Ummu Saleha Kulsum binte Abdul Jobbar Jomadder Rahimahullah. Among his siblings, he is the 8th (eighth) child of his late parents. He started his education in his own village primary school named Chandpur Govt. Primary School and in the Maktab (religious teaching centre) of Chandpur Central Jam-e-Mosque. At home, he continued his learning from his eldest brother Master Sheikh Muhammad Aftab Uddin and from his elder brother Master Sheikh Muhammad Sahidullah.

He successfully passed the S.S.C and the H.S.C examinations respectively in the year 1977 and 1979 from

Shahidpur Khan-A-Sabur Bohumukhi High School and North Khulna Govt. Degree College. After that he got himself admitted in Rajshahi Medical College in December 1979 and from then he started his research on the Holy Quran and Hadith, also started writing books on the basis of philosophical and scientific theories about various significant subjects of Din Islam. He successfully passed M.B.B.S (Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery) from Rajshahi Medical College in 1985. After passing the M.B.B.S examination, he successfully completed his one year internship in Rajshahi Medical College Hospital. Instead of joining in a government service after completing the internship, he joined as an R.M.O (Residential Medical Officer) in Khulna Shishu Hospital with a view to serving the underprivileged, the wailful-helpless and the ailing people and there he continued his service with reputation from 1987 to 1989.

After that, in 1990 he directly joined as a Medical Officer in Mongla Port Hospital and till today he is still executing his responsibilities with reputation and sincerity. Besides, he is also rendering free medical treatment-services to the people of this area (Rupsa, Terokhada and Mollahat Upazila) in **"Free Friday Clinic"** under the banner of **Chandpur Somaj Kollayan Songstha,** irrespective of religion, caste, the poor and the rich. On the other hand, he is firmly determined to eradicate **'Shirok'**, **'Bidaat'** and un-Islamic thought and culture and earnestly desires to establish pure **'Tawheed'** and authentic sunnah in the society and in the state. So, at present, he is combatting against established **'Shirok', 'Bidaat'** and un-Islamic thought, culture and superstitions in the society and in the state. Besides, he is also continuing various significant welfare activities in his respite.

Humbly

Publisher

Edification

My very dear mumeen-muslim brothers and sisters! It is very easy to give advice to someone but it is very difficult to put it

into practice. There is a proverb in English, 'It is easy to say but difficult to do'. O There is no benefit if the knowledge is not put to practice eventhough one may achieve high degrees or lofty titles, study lofty books or collect a huge number of books.

If you act only **according** to the Holy Quran and the Sahih Sunnah, then Sovereign and Gracious Allah's mercy, blessings and compassion will continue to shower on you like a downpour. As Exalted Allah says in verse 97 of Surah Nahl, من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة- i.e, "The person , if he is a believer ,either male or female, who will perform sacred deeds, Allah will surely give him a chance to live a good life."

Sovereign and Gracious Allah's mercy cannot be expected in any way if one does not act **according** to pure sincerity and Sahih Sunnah. As Allah Subhanahu wa Ta'ala says in verse 110 of Surah Al-Kahf on this subject, فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا- i.e, ***"The person, who wishes to gain Exalted Allah's vision or gain His satisfaction, it is obligatory for the person to perform amal-e-salih (i.e. good deeds, righteous deeds). "*** In this regard, the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم ***"Allah, the Exalted, will certainly not observe your physical contour or your wealth, infact He will notice your intention (i.e. mind) and amals (i.e. good deeds or righteous deeds)" (Muslim).***

O my dear mumeen-muslim brothers and sisters! Let us all acquire the knowledge of the Holy Qur'an and Sahih Sunnah and do good deeds with pure sincerity and in accordance with the teachings our beloved prophet (peace and blessings of Allah be upon him) by eating legitimate foods **according** to that knowledge. If an act of worship is not performed in the manner in which it is performed, taught and practiced by the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him), then no matter how sincere, intending and devoted it may be, it will never be accepted by Sovereign and Gracious Allah.

As the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said in this regard, من عمل عملا ليس عليه امرنا فهوه رد- ''If a person does an action or deed that is not a deed, then his deed or action will be rejected (that is, that deed will never be accepted by Exalted Allah).'' (Bukhari, Muslim). In this regard, the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) added: من احدث فى امرنا هذا ما ليس فيه فهو رد- ***''The person who has created anything new not included in our laws, it is rejected.'' (Muslim).***

The prophet (peace and blessings of Allah be upon him) further said, **قال كل امتى يدخلن الجنة يوم القيامة الا من ابى قالوا ومن ابى يا رسول الله قال من اطاعنى دخل الجنة ومن عصانى فقد ابى-** i.e, ***''All my ummah will go to Paradise on the Day of Resurrection, except the deniers.''*** The Companions (may Allah be pleased with them) said, ***"O Allah's messenger (peace and blessings of Allah be upon him), who denies?''*** Our dear prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said, ***"He who obeys me will go to Paradise, and he who disobeys me will reject me."*** (Bukhari- 7280).

O our Maintainer! Give us the power to do good deeds with pure sincerity by eating legitimate foods according to the path shown by our dear prophet (peace and blessings of Allah be upon him). O my Lord! You have given me knowledge and strength for which it has been possible for me to compile the great volume book **"Din-Islame Emaaner Sarup"**.

O my Lord! Give me the power to convey thanks for this gift and to be a martyr in your way with my life and property and give me death for your religion. O my Lord! Do not make any crookedness in my mind after receiving divine guidance.

اللهم صلى وصلم على النبيين محمد- الحمد لله الذى بنعمته تتما لصالحات ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم- واتوب علينا انك انت التواب الرحيم- سبحان ربك رب العزت عما يصفون وسلم على المرسلين- والحمد لله رب العالمين- واخر دعوان عن الحمد لله رب العالمين- امين- سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك (ثلاثة)

উপদেশ বাণী

প্রাণ প্রিয় মুমিন-মুসলিম ভাই ও বোনেরা! কাউকে উপদেশ দেওয়া খুবই সহজ। কিন্তু উহা বাস্তবে আমাল করা অত্যন্ত কঠিন। যেমন ইংরেজীতে একটি প্রবাদ রয়েছে, `It is easy to say but difficult to do' বড় বড় ডিগ্রী বা টাইটেল লাভ করলে, বড় বড় কিতাব অধ্যয়ন করলে বা প্রচুর কিতাব সংগ্রহ করলে, ঐ ইলম আমালে পরিণত না করা পর্যন্ত আদৌ কোন লাভ হবে না।

পবিত্র কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আমাল করলেই কেবল মাত্র রব্বুল আলামীনের রহমত, বরকত ও করুণা আপনার উপর বৃষ্টির ধারার ন্যায় অঝোর ধারায় সদা-সর্বদা বর্ষিত হতে থাকবে। যেমন এ বিষয়ে মহান আল্লাহ জাল্লাহ শানুহু সূরা নাহলের ৯৭ নাম্বার আয়াতে বলেন, من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حيوة طيبة- অর্থাৎ "যে ব্যক্তি নেক আমাল করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী হোক, সে মুমিন হলে আমি আল্লাহ তাকে অবশ্যই উত্তম জীবনযাপন করার সুযোগ দিব।" খাঁটি ইখলাস ও সহীহ সুন্নাহ মুতাবিক আমাল না করলে কোন ভাবেই রব্বুল আ'লামীনের রহমতের আশা করা যায়না। যেমন এ বিষয়ে সূরা কাহাফের ১১০ নাম্বার আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানা ওয়া তা'আলা বলেন, فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا- যে ব্যক্তি (কাল কিয়ামতের মাঠে) মহান আল্লাহ রব্বুল আ'লামীনের দর্শন বা সন্তুষ্টি লাভের কামনা-বাসনা রাখে তার আমালে সালিহ (তথা নেক আমল) করা কর্তব্য।" এ বিষয়ে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলীমা বলেন, অর্থাৎ "নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ রব্বুল আ'লামীন তোমাদের শারীরিক অবয়ব ও ধন-সম্পদের দিকে তাকাবেন না, বস্তুতঃ তিনি তাকাবেন তোমাদের নিয়্যত (তথা অন্তর) ও আমালের দিকে" (মুসলিম)।

হে আমার প্রাণ-প্রিয় মুমিন-মুসলিম ভাই ও বোনেরা! আসুন আমরা সবাই পবিত্র কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর ইলম অর্জন করি এবং খাঁটি ইখলাছের সাথে ও প্রিয় নবীজীর অনুসৃত তরীক্বা মুতাবিক উক্ত ইলম অনুযায়ী হালাল রুজি ভক্ষণ করে নেক আমল করি। যদি কোন ইবাদাত প্রিয় নবীজীর প্রদর্শিত, শেখানো ও আচরিত পদ্ধতিতে পালিত না হয়, তাহলে যত ইখলাছ, আন্তরিকতা ও ঐকান্তিকতাই থাক না কেন, তা মহান আল্লাহ রব্বুল আ'লামীনের কাছে কোন অবস্থাতেই কবুল হবে না। যেমন এ বিষয়ে প্রিয়নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত্-তাসলীমা বলেছেন, من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد- "মান আ'মিলা আ'মালা লাইসা আ'লাইহি আমরুনা ফাহুয়া রদ" অর্থাৎ আমাদের কর্ম বা আমাল যা নয় এমন কোন কর্ম বা আমাল যদি কোন মানুষ করে তবে তার কর্ম বা আমাল প্রত্যাখ্যাত হবে (তথা মহান আল্লাহ রব্বুল আ'লামীনের নিকট সে আমাল কোন দিনও কবুল হবে না)। (বুখারী, মুসলিম)। এ বিষয়ে প্রিয় নবীজী আরো বলেন, من احدث فى امرنا هذا ما ليس فيه فهو رد- মান আহদাসা ফী আমরিনা হাযা মা লাইসা ফিহি ফাহুয়া রদ্ অর্থাৎ "যে ব্যক্তি আমাদের শারীয়াতে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল, যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত" (মুসলিম)। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলীমা-এ বিষয়ে আরো বলেছেন, অর্থাৎ আমার উম্মাত সকলেই জান্নাতে যাবে কিয়ামতের দিন, অস্বীকারকারী ব্যতীত। সাহাবীগণ রাজিআল্লাহু আনহুমা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলীমা! কে অস্বীকারকারী! প্রিয় নবীজি উত্তরে বললেন, যে আমার আনুগত্য করে সে জান্নাতে যাবে আর যে আমার নাফরমানি করে সে আমাকে অস্বীকার করে।" (বুখারী-৭২৮০)।

হে মহান রব্বুল আ'লামীন! আপনি আমাদের সবাইকে সহীহ্ ইলম অনুযায়ী খাঁটি ইখলাসের সাথে প্রিয় নবীজীর অনুসৃত তরীক্বায় হালাল রুজী ভক্ষণ করে নেক আমাল করার তাওফীক্ব দিন। হে আমার রব! আপনি আমাকে ইলম ও শক্তি দান করেছেন ফলে **"দ্বীন-ইসলামে ঈমানের স্বরূপ"** নামক বৃহৎ কলেবরের কিতাবটি সংকলন করা আমার দ্বারা সম্ভবপর হয়েছে। হে আমার রব! আমাকে এই নি'আমতের যথাযথ শুকরিয়া আদায় করার এবং আমার জান ও মাল দিয়ে আপনার রাস্তায় শহীদ হওয়ার তাওফীক্ব দিন এবং আপনার দ্বীনের উপর বিশুদ্ধ ঈমানের সাথে মুসলিমী হালতে আমাকে ওফাত দিন। হে আমার রব! হেদায়াত প্রাপ্তির পর আর আমার অন্তরে কোন বক্রতা সৃষ্টি করবেন না।

বিনীত

লেখক

উৎসর্গ

মহান আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লাহ সূরাতুল হাশরের ১০ নং আয়াতে কারীমায় বলেন,

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ -

অর্থাৎ যাহারা উহাদের পরে আসিয়াছে, তাহারা বলে, "হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদিগকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোনরূপ বিদ্বেষ রাখিও না। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু"। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এ বিষয়ে সূরাহ মুহাম্মাদের ১৯ নং আয়াতে কারীমায় আরো বলেন,

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ -

অর্থাৎ সুতরাং (হে মুহাম্মাদ তুমি!) জানিয়া রাখ, মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন হক্ব (প্রকৃত বা সত্যিকারের) মা'বুদ নাই, (অতএব তুমি হে মুহাম্মাদ!) ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার এবং মুমিন নর-নারীদের ত্রুটির জন্য। মহান আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি এবং অবস্থান সম্পর্কে অবগত আছেন।

উপরে উল্লেখিত দু'টি আয়াতের হুকুমের পরিপ্রেক্ষিতে আমি মৎ প্রণীত ক্ষুদ্র কিতাবখানা **"দ্বীন-ইসলামে ঈমানের স্বরূপ"** সকল মুমিন-মুসলিম নর-নারীর আত্মার বা রুহের মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দরবারে উৎসর্গ করলাম।

ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين- امين – ثم امين -

﴾ সূচিপত্র ﴿

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
☞ প্রকাশকের কথা	i
☞ ভূমিকা	iv
☞ Why is this book	xii
☞ Brief introduction of the Author	xx
☞ Edification	xxi
☞ উপদেশ বাণী	xxiv
☞ উৎসর্গ	xxvi
☞ আরবী খুৎবাহ	১
☞ মহান আল্লাহর মানব ও দানব (তথা জিন জাতি) সৃষ্টির উদ্দেশ্য	২
☞ ঈমান ও ইসলাম বিনষ্টের কারণসমূহ	৯
☞ তাগুতের সাথে কুফরী করা	৪০
☞ কালেমায়ে শাহাদাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য	৪৯
☞ ঈমানের পরিচয়	১৫০
☞ ঈমানের অর্থ ও পরিচয়	১৫১
☞ বিশ্বাস বা ধর্ম বিশ্বাস	১৫৩
☞ ঈমানের মূলনীতি বা উসুলুল ঈমান	১৫৭
☞ পবিত্র কুরআনুল কারীমে ঈমানের আলোচনা	১৬২

☞ ঈমানের তাৎপর্য ১৭০
☞ ঈমানের তিনটি অবস্থা ১৭২
☞ ঈমানের গুরুত্ব ১৭৩
☞ বিশুদ্ধ আক্বীদার গুরুত্ব ও তাৎপর্য ১৭৬
☞ কালিমা তাইয়্যিবা ১৮৬
☞ কালিমা প্রচারের পূর্বেকার আক্বীদাহ ২০৩
☞ কালিমার দু'টি অংশ ২০৬
☞ মানুষ ও কালিমার আদি কথা ২০৭
☞ কালিমা পড়ার অর্থই হলো আল্লাহদ্রোহীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ২১৫
☞ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহুর তাৎপর্য ২২১
☞ কালিমা চায় দেশে ইসলামী আইন ২২৪
☞ কোন ঈমান শ্রেষ্ঠ ২২৫
☞ ঈমানের লজ্জত বা স্বাদ ২২৯
☞ মহান আল্লাহকে ভালবাসার প্রকৃত নিদর্শন ২৩২
☞ তাওহীদের শর্তাবলী ২৪২
☞ তাওহীদের মৌলিক উপাদান বা রুকন ২৭৬
☞ কালিমা শাহাদাত ২৮৬
☞ একটি ধর্ম সম্পর্কে সঠিকভাবে জানার উপায় ২৯৭
☞ ইসলামের পরিচয় ২৯৯
☞ হিন্দুদের পরিচয় ৩০১

☞ ইসলামে ঈমানের বিষয় বস্তু এবং ঐগুলোর সাথে হিন্দুধর্মীয় ধর্মগ্রন্থসমূহে প্রদত্ত ধর্ম বিশ্বাসের তুলনা ৩০৩

☞ হিন্দুধর্মে প্রভু সম্পর্কিত ধারণা ৩০৪

☞ ইসলামে প্রভু সম্পর্কিত ধারণা ৩০৯

☞ ইসলাম ও হিন্দুধর্মে ফিরিশতাদের ধারণা ৩১৪

☞ ইসলাম এবং হিন্দুধর্মে কিতাব অবতীর্ণের ধারণা ৩১৫

☞ হিন্দুধর্মের গ্রন্থসমূহ ৩১৮

☞ ইসলাম এবং হিন্দুধর্মের আলোকে নুবুয়তের ধারণা ৩২১

☞ প্রভুর গুণাবলী ৩২৬

☞ ঈমানের শাখা-প্রশাখা ৩৩৩

☞ **(ক) অন্তরের ঈমানী আমালসমূহ** **৩৩৫**

☞ মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান ৩৪৯

☞ আরশ ও কুরসী সংক্রান্ত আহলুস সুন্নাত অল জামাআতের আক্বীদা ৪৩২

☞ বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্মগুলোর শ্রেণিবিন্যাস ৬৬৬

☞ সূরাহ আল ইখলাস ধর্মতত্ত্বের কষ্টিপাথর ৬৮৩

☞ মানুষের ঈশ্বর হওয়ার দাবী সম্পর্কে ইসলামের বক্তব্য ৬৮৩

☞ আমরা যে নামে ঈশ্বরকে ডাকি ৬৮৫

☞ ‘গড’ কখনো মানুষ হতে পারে না ৬৮৬

☞ মানুষ কর্তৃক অন্য মানুষের উপাসনা নিস্ফল ৬৮৮

☞ ঈশ্বরের গুণাবলী ৬৯১
☞ রাসূল (সা:) সম্পর্কে আক্বীদা ৭২৪
☞ ঈমান বিল মালায়িকাহ ৭৫২
☞ ফিরিশতাদের সঠিক মর্যাদা ৭৫৪
☞ মানুষের চাইতে ফিরিশতাদের মর্যাদা বেশী নয় ৭৫৫
☞ ফিরিশতাদের বিভিন্ন দায়িত্ব ৭৫৬
☞ মালাকগণ বিষয়ক বিভ্রান্তি ৮০১
☞ ফিরিশতাদের প্রতি ঈমান আনার গুরুত্ব ৮০৫
☞ মালাকগণে বিশ্বাসের কল্যাণ ৮১৩

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدى الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله - يايها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون - يايها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء - واتقوالله الذى تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا - يايها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا - يصلح لكم اعمالكم ويغفرلكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما - وتزودوا فان خير الزاد التقوى - شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولوا العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم - ان الدين عند الله الاسلام - ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الاخرة من الخسرين - اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا - فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنت والله يعلم متقلبكم ومثواكم - ليس كمثله شئ وهو السميع البصير- بسم الله الرحمن الرحيم - قل هو الله احد - الله الصمد - لم يلد ولم يولد - ولم يكن له كفوا احد - اعوذ بالله من الشيطان الرجيم - الله لا اله الا هو الحى القيوم - لا تأخذه سنة ولا نوم - له ما فى السموات وما فى الارض - من ذا الذى يشفع عنده الا باذنه - يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم - ولا يحيطون بشئ من علمه الا بما شاء - وسع كرسيه السموات والارض ولا يؤده حفظهما - وهو العلى العظيم - ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين - وكان الله بكل شئ عليما - لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الاخرة وذكر الله كثيرا - من يطع الرسول فقد اطاع الله - ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا - ما اتاكم الرسول فخذوه - وما نهاكم عنه فانتهوا - واتقوا الله - قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفرلكم ذنوبكم والله غفور رحيم - ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال اننى من المسلمين - بسم الله الرحمن الرحيم - والعصر- ان الانسان لفى خسر- الا الذين امنوا وعملوا لصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر- آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن باللَّه وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك

المصير - يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا - وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ - اما بعد : فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم تسليما وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة - وكل ضلالة فى النار-

মহান আল্লাহর মানব ও দানব (তথা জিন জাতি) সৃষ্টির উদ্দেশ্য

ব্রাদারানে ইসলাম! উদ্দেশ্য বিহীন কাজ পাগলের, নিয়তবিহীন কাজ পন্ড।

কলম কি জন্য সৃষ্ট হয়েছে? কাগজ কি জন্য সৃষ্ট হয়েছে? কাগজ কি জন্য সৃষ্ট হয়েছে? জুতা কি জন্য তৈরী করা হয়েছে? আপনি কি জন্য সৃষ্টি হয়েছেন?

‘এসেছি, তবে জানি না আমি এসেছি কোথা হতে,
চোখের সামনে পথ দেখেছি চলিতেছি সেই পথে।
এমনি ভাবে চলতে রব ইচ্ছে আমার যত,
কোথায় যাব তাও জানিনে পথই বা আর কত?’

ট্রাফিক পুলিশ একজন গাড়ি-চালককে জিজ্ঞাসা করল, ‘আপনি কোথা থেকে আসছেন?’ সে উত্তরে বলল, “জানি না।’ পুলিশ জিজ্ঞাসা করল, ‘কোথায় যাবেন?’ সে বলল, ‘জানি না।’ পুনরায় তাকে জিজ্ঞাসা করল, ‘কেন এসেছেন বা এদিকে কি জন্য যাবেন?’ সে বলল, “কি জানি?’ পুলিশ বলল, “কেন জানেন না?” সে বলল, “তাও জানি না!’ নিশ্চয় পুলিশ তাকে পাগল ভাববে এবং তাকে আটক করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। মানুষ একটি সম্মানিত জীব। মহান আল্লাহ তাকে জ্ঞান-বুদ্ধি, বিবেক ও মর্যাদা দিয়েছেন। তাকে তার প্রয়োজনীয় ঈমান, জান, জ্ঞান, মান ও ধন দান করে তার হিফাযতের ব্যবস্থা করেছেন এবং তার জন্য জীবন-ব্যবস্থা পাঠিয়েছেন। কিন্তু যারা যে সে জীবন-ব্যবস্থা গ্রহণ করে না, তাদেরকে আপনি কি মনে করেন? কোন জীবের সাথে তাদেরকে তুলনা করবেন? আপনি-আমি যাই বলি আর না-

ই বলি না কেন, অথবা বলতে ভয় ও দ্বিধা করি না কেন, মহান সৃষ্টিকর্তা বলেই দিয়েছেন, 'তারা হল পশুর ন্যায়।' মহান আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ -

অর্থাৎ, যারা অবিশ্বাস করে তারা ভোগ-বিলাসে লিপ্ত থাকে এবং জন্তু-জানোয়ারের মত উদর-পূর্তি করে। আর তাদের নিবাস হল জাহান্নাম। (সূরাহ মুহাম্মাদ - ১২ আয়াত)

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ -

অর্থাৎ, আমি তো বহু জ্বিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি; তাদের হৃদয় আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চক্ষু আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা দর্শন করে না এবং তাদের কর্ণ আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা শ্রবণ করে না। এরা চতুস্পদ জন্তুর ন্যায়; বরং তা অপেক্ষাও অধিক বিভ্রান্ত! তারাই হল উদাসীন। (সূরাহ আ'রাফ - ১৭৯ আয়াত)

তাদের সৃষ্টিকর্তার প্রতি তাদের ঈমান নেই, বিশ্বাস নেই। তাই তাদের জীবনের কোন উদ্দেশ্য নেই। আর তাই তারা পার্থিব জীবনকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ -

অর্থাৎ, ওরা বলে, 'একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, এখানেই আমরা মরি ও বাঁচি; মহাকাল-ই আমাদেরকে ধ্বংস করে।' বস্তুতঃ এ ব্যাপারে ওদের কোন জ্ঞান নেই, ওরা তো কেবল ধারণা করে মাত্র। (সূরাহ জাসিয়াহ - ২৪ আয়াত)

কিন্তু সত্যি কি তাই? সত্যিই কি মানুষ এমনিই সৃষ্টি হয়েছে? তাকে সৃষ্টি করার পিছনে কোন উদ্দেশ্য নেই? মহান আল্লাহ বলেন,

أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى -

অর্থাৎ, মানুষ কি মনে করে যে, তাকে নিরর্থক ছেড়ে দেওয়া হবে? (সূরাহ ক্বিয়ামাহ - ৩৬ আয়াত)

অর্থাৎ, তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না? (সূরাহ মু'মিনূন - ১১৫ আয়াত)

না, মানুষকে আল্লাহ এমনি সৃষ্টি করেননি। এ আকাশ-বাতাস, এ মাটি-পানি, এ বৃক্ষ-প্রাণী মহান সৃষ্টিকর্তা ফালতু সৃষ্টি করেননি। তিনি বলেন,

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ -

অর্থাৎ, আমি আকাশ, পৃথিবী এবং উভয়ের অন্তর্বর্তী কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি; এ তো অবিশ্বাসীদের ধারণা। সুতরাং অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ। (সাদ - ২৭)

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ -

অর্থাৎ, আমি আকাশন্ডলী ও পৃথিবী এবং ওদের মধ্যে কোন কিছুই খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি । (সূরাহ দুখান - ৩৮ আয়াত)

মানুষদের মধ্যে যাঁরা জ্ঞানী মানুষ, কেবল তাঁরাই সে উদ্দেশ্যের কথা জানতে পারেন। মহান আল্লাহ বলেন,

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا -

অর্থাৎ, যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে মহান আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং (বলে) 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি নিরর্থক সৃষ্টি করেনি। (সূরাহ আলে ইমরান - ১৯১ আয়াত) আরবী কবি বলেন,

যদি মরণের পর আমাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হত, তাহলে মরণই প্রত্যেক জীবের জন্য আরামদায়ক হত। কিন্তু মরণের পর আমাদেরকে পুনর্জীবিত করা হবে এবং প্রত্যেক জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেন, "কিয়ামতের দিন কোন বান্দার পদযুগল ততক্ষণ পর্যন্ত সরবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে ৫টি জিনিস প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হবে; তার আয়ু প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হবে যে, সে তা কিসে ক্ষয় করেছে? তার যৌবন প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হবে যে, সে তা কিসে নষ্ট করেছে? তার ধন- সম্পদ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হবে যে, সে তা কি উপায়ে উপার্জন করেছে এবং কোন্ পথে ব্যয় করেছে? এবং যে ইল্ম সে শিখেছিল, সে অনুযায়ী কি আমল করেছে?" (২৫২ তিরমিযী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৯৪৬ নং)

তাহলে উদ্দেশ্য কি? আমরা কোন্ উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হয়েছি? মহান আল্লাহ কেন আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন? তিনি বলেন,

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا -

অর্থাৎ, তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে ছ'দিনে সৃষ্টি করেছেন এবং সেই সময় তাঁর আরশ পানির উপরে ছিল; যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করে নেন, তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম কে? (সূরাহ হূদ - ৭ আয়াত)

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا -

অর্থাৎ, পৃথিবীর উপর যা কিছু আছে আমি সেগুলিকে ওর শোভা করেছি মানুষকে এই পরীক্ষা করবার জন্য যে, তাদের মধ্যে কর্মে কে উত্তম। (সূরাহ কাহাফ - ৭ আয়াত)

অর্থাৎ, যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদেরকে পরীক্ষা করবার জন্য; কে তোমাদের মধ্যে কর্মে সর্বোত্তম? আর তিনি পরাক্রমশালী, বড় ক্ষমাশীল। (সূরাহ মূলক - ২ আয়াত)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেন, "দুনিয়া হচ্ছে সুমিষ্ট ও সবুজ শ্যামল এবং আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তাতে প্রতিনিধি করেছেন। অতঃপর তিনি দেখবেন যে, তোমরা কিভাবে কাজ কর। অতএব তোমরা দুনিয়ার ব্যাপারে সাবধান হও এবং সাবধান হও নারীজাতের ব্যাপারে ।" (২৫৩ মুসলিম)

মহান আল্লাহ জ্বিন-ইনসান সৃষ্টির কারণ আরো স্পষ্ট করে বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ - مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ - إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ -

অর্থাৎ, আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন ও মানুষকে কেবল এ জন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে। আমি তাদের নিকট হতে জীবিকা চাই না এবং এও চাই না যে, তারা আমার আহার্য যোগাবে। নিশ্চয় মহান আল্লাহ; তিনিই রুযী দাতা প্রবল, পরাক্রান্ত। (সূরাহ যারিয়াত ৫৬-৫৮ আয়াত)

এখানে একটি প্রচলিত ভুলের সংশোধন হওয়া দরকার। আর তা হল এই যে, ভক্তির অতিরঞ্জনে অনেকে ধারণা করে থাকেন যে, মহানবীর জন্য সারা জাহান পয়দা হয়েছে। কবি বলেছেন,

'ফুল বাগানে ফুটল নবীন ফুল---
সে ফুল যদি না ফুটিত----------কিছুই পয়দা না হইত
না করিত আরশ-কুর্সী জলীল-রব্বুল।'

কিন্তু এ কথা বড় ভুল। যেহেতু মহান আল্লাহ তাঁর ইবাদতের জন্য বিশ্ব-জাহান সৃষ্টি করেছেন। আর তাঁকে চিনিয়ে তাঁর ইবাদতের সঠিক পদ্ধতি বাতলে দেওয়ার জন্য নবী-রসূল তথা শেষনবীকেও প্রেরণ করেছেন।

হ্যাঁ, মহান আল্লাহ কেবল নিজের ইবাদতের জন্য মানব-দানব সৃষ্টি করেছেন। তাঁর শির্কহীন ইবাদত না করার জন্যই বহু মানুষকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ পক্ষ থেকে বান্দার জন্য ইবাদত জানা ও পালন করাই সবচেয়ে বড় ফরয। শির্কহীন ইবাদতই হল দ্বীনের শুরু ও শেষ, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরিক বিষয়। তাওহীদই হল সকল নবী-রসূলগণের প্রথম দাওয়াত। এর জন্যই কিতাবসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। বাতিলপন্থীদের সাথে নবী-রসূলদের যুদ্ধ বেধেছে। এর জন্যই মানুষ দুই দুই শ্রেণীতে ভাগ হয়েছে; এক শ্রেণী কাফের-মুশরিক এবং অন্য শ্রেণী তাওহীদবাদী মু'মিন। এক শ্রেণী জাহান্নামী এবং অন্য শ্রেণী জান্নাতী।

মানুষ প্রকৃতিগতভাবে দাস। তার প্রকৃতিতে দাসত্ব আছে। তার জানতে অথবা অজান্তে সে কিছু না কিছুর দাসত্ব ও আনুগত্য করে। বরং সকল সৃষ্টিই ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সৃষ্টিকর্তার দাসত্ব করে। তিনি বলেছেন,

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ -

অর্থাৎ, তারা কি আল্লাহর ধর্মের পরিবর্তে অন্য ধর্ম চায়? অথচ আকাশে ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সমস্তই স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় তাঁর কাছে আত্ম-সমর্পণ করেছে! এবং তাঁরই কাছে তারা ফিরে যাবে। (সূরাহ আলে ইমরান - ৮৩ আয়াত)

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ -

অর্থাৎ, আল্লাহর প্রতি সিজদাবনত হয় আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এবং তাদের ছায়াগুলিও সকাল ও সন্ধ্যায়। (সূরাহ রাদ - ১৫ আয়াত)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ -

অর্থাৎ, তুমি কি দেখ না যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা এবং উড়ন্ত পাখীদল মহান আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? সকলেই তাঁর প্রশংসা এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি জানে। আর ওরা যা করে, সে বিষয়ে মহান আল্লাহ সম্যক অবগত। (সূরাহ নূর ৪১)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ -

অর্থাৎ, তুমি কি দেখ না যে, মহান আল্লাহকে সিজদা করে যারা আছে আকাশমন্ডলী পৃথিবীতে; সিজদা করে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমন্ডলী, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু, এবং সিজদা করে মানুষের মধ্যে অনেকে আর অনেকের প্রতি অবধারিত হয়েছে শাস্তি। আল্লাহ যাকে হেয় করেন তার সম্মানদাতা কেউই নেই; নিশ্চয় আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন। (সূরাহ হাজ্জ - ১৮ আয়াত)

বহু মানুষ আছে, যাদের সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস নেই অথবা তাঁর রসূল ও কিতাবে বিশ্বাস নেই, তারাও আসলে তাদের প্রবৃত্তির দাসত্ব করে । মহান আল্লাহ তাদের কথা বলেন,

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَـٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا -

অর্থাৎ, তুমি কি দেখ না তাকে, যে তার কামনা-বাসনাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে? তবুও কি তুমি তার কর্মবিধায়ক হবে। (সূরাহ ফুরক্বান - ৪৩ আয়াত)

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَـٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ -

অর্থাৎ, তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে, যে তার খেয়াল-খুশীকে নিজের উপাস্য করে নিয়েছে? মহান আল্লাহ জেনেশুনেই ওকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং ওর কর্ণ ও হৃদয় মোহর করে দিয়েছেন এবং ওর চোখের ওপর রেখেছেন পর্দা। অতএব, মহান আল্লাহ মানুষকে বিভ্রান্ত করার পর কে তাকে পথনির্দেশ করবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? (সূরাহ জাসিয়াহ - ২৩ আয়াত)

فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ -

অর্থাৎ, অতঃপর ওরা যদি তোমার আহবানে সাড়া না দেয়, তাহলে জানবে ওরা তো কেবল নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে । মহান আল্লাহর পথনির্দেশ অমান্য করে যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে, তার অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে? নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে পথনির্দেশ করেন না। (সূরাহ কাসাস - ৫০ আয়াত)

বহু মানুষ আছে, যারা মহান আল্লাহকে চেনে; কিন্তু তাকে ছেড়ে অন্যের ইবাদত করে। তাঁর খায়-পরে, কিন্তু অন্যের ইবাদত করে। তারা সেই

স্ত্রীর মত, যে স্বামীর খায়-পরে; কিন্তু দেহ সমর্পণ করে অন্যকে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ -

অর্থাৎ, তারা মহান আল্লাহ ছাড়া যাদের উপাসনা করে, তারা তাদের জন্য আকাশমন্ডলী অথবা পৃথিবী হতে কোন জীবনোপকরণ সরবরাহ করার শক্তি রাখে না এবং তারা কিছুই করতে সক্ষম নয়। (সূরাহ নাহল ৭৩ আয়াত)

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ -

অর্থাৎ, আর তারা মহান আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর উপাসনা করে, যা তাদের কোন অপকারও করতে পারে না এবং কোন উপকারও করতে পারে না। অথচ তারা বলে, এরা হচ্ছে মহান আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী। তুমি বলে দাও, 'তোমরা কি মহান আল্লাহকে এমন বিষয়ের সংবাদ দিচ্ছ, যা তিনি অবগত নন, না আকাশসমূহে, আর না পৃথিবীতে? তিনি পবিত্র এবং তারা যে অংশী করে, তা হতে তিনি উর্ধ্বে।' (সূরাহ ইউনুস ১৮ আয়াত)

অনেকে মহান আল্লাহকে চেনে, তাঁর ইবাদতও করে, কিন্তু তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করে! তাঁর জন্য নামায, যাকাত, রোযা ও হজ্জ আদায় করে; কিন্তু তার সাথে সাথে মাযারেও সিজদা করে। তারা সেই স্ত্রীর মত, যে স্বামীর খায়-পরে; কিন্তু স্বামীর সাথে অন্যকেও দেহ সমর্পণ করে! সে স্ত্রী কি স্ত্রী থাকার যোগ্য, না তিন তালাক পাওয়ার যোগ্য? মহান আল্লাহ আদেশ হল,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ -

অর্থাৎ, হে মানুষ সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের উপাসনা কর, যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা পরহেজগার হতে পার। (সূরাহ বাক্বারাহ - ২১ আয়াত)

আর এ হল কুরআন কারীমের সর্বপ্রথম আদেশ। মহান আল্লাহর নিষেধ হল,

فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ -

অর্থাৎ, সুতরাং জেনে শুনে কাউকেও মহান আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করো না। (ঐ - ২২ আয়াত)

এ হল কুরআন কারীমের সর্বপ্রথম নিষেধ।

ইবাদত কাকে বলে? ইবাদত হল প্রত্যেক সেই গুপ্ত ও প্রকাশ্য কথা ও কাজ, যা মহান আল্লাহ পছন্দ করেন। মহান আল্লাহর পছন্দনীয় কথা বলা ও পছন্দনীয় কাজ করার জন্যই মানুষ সৃষ্টি হয়েছে। নামায, যাকাত, রোযা, হজ্জ, কুরবানী, নযর, দুআ, তাদরীস, তাবলীগ ইত্যাদি সবই মহান আল্লাহর ইবাদত, এ সবই কেবল মহান আল্লাহর জন্য। তিনি বলেন,

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ -

অর্থাৎ, বল, “নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার উপাসনা (কুরবানী), আমার জীবন ও আমার মরণ, বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহরই জন্য। তাঁর কোন অংশী নেই এবং আমি এ সম্বন্ধেই আদিষ্ট হয়েছি। আর আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) দের মধ্যে আমিই প্রথম।’ (সূরা আনআম ১৬২-১৬৩ আয়াত)

কিন্তু যাকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, সে যদি সে কাজ না করে, তাহলে নিশ্চয় তা আদরণীয় হবে না। যে ঘড়ি টাইম দেয় না, তা কেউ রাখবে না। যে গাড়ি চলে না, তা কেউ রাখবে না। যে বলদ গাড়ি টানে না, যে গাই দুধ দেয় না, তা কেউ পুষবে না। যে গাছ ফল দেয় না বা কোন উপকার দেয় না, সে গাছ চুলোয় যায়।

বলাই বাহুল্য যে, আমরা মহান আল্লাহর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি হয়েছি, সুতরাং আমরা যেন তাঁর ইবাদত করি। তাঁর আহবানে সাড়া দিলে, তবেই তিনি আমাদেরকে পুরস্কার দানে ধন্য করবেন। তিনি বলেন,

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ - ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً - فَادْخُلِي فِي عِبَادِي - وَادْخُلِي جَنَّتِي -

অর্থাৎ, হে প্রশান্ত চিত্ত! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। সুতরাং তুমি আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। (সূরাহ ফজর- ২৭-৩০ আয়াত) মহান আল্লাহ সকলকে তওফীক দিন। আমীন। (খুতবা মাদানীয়াহ)

ঈমান ও ইসলাম বিনষ্টের কারণাবলী

সম্মানিত মুমিন-মুসলিম ভাই ও বোনেরা! আমরা আপনাদেরকে ঈমানের শর্ত ও রুকন সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এখন আমরা সংক্ষেপে এগুলো বিনষ্টের কারণসমূহ ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ। ওয়ামা তাওফীক্বি ইল্লা বিল্লাহ তাওওয়াককালতু আলাইহি ওয়া ইলাইহি উনিব। আমাদের দেশের অধিকাংশ মুমিন-মুসলিম ভাই ও বোনেরা

সালাত ভঙ্গের কারণ জানে। সিয়াম ভঙ্গের কারণ জানে, ওযু ভঙ্গের কারণ জানে। অথচ সালাত, সিয়াম, ওযু, হজ্জ ইত্যাদি নেক আমালসমূহ মহান আল্লাহ সুবহানা ওয়া তা'আলার নিকট গৃহীত হওয়ার পূর্বশর্ত হলো বিশুদ্ধ ঈমান। যেমন- ওযু ভঙ্গের কারণসমূহ আছে। যদি কোন ওযুকারী ওজু ভঙ্গের কোন একটা কাজ করেন তবে তার ওযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। তখন তার উপর ওয়াজিব হল তিনি নতুন করে ওযু করবেন। সেই রকম ঈমানের ক্ষেত্রেও। কারণ বিশুদ্ধ ঈমান বান্দার আসল সম্বল। এটা ভঙ্গ হয়ে গেলে তার আর কিছুই বাকী থাকে না। অথচ এ ব্যাপারে আমরা কেউই আদৌ সচেতন নই। শুধু বলি আমরা মুমিন, আমরা মুসলিম, আমাদের ঈমান আছে। মুহাদ্দিসগন ও উলামায়ে কিরাম পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস গবেষণা করে ঈমান ও ইসলাম বিনষ্টের কতিপয় কারণ উল্লেখ করেছেন। তাই নিম্নে ঈমান বিনষ্টের কতিপয় কারণ সর্বসাধারণ পাঠক-পাঠিকার সুবিধার্থে তুলে ধরা হলোঃ-

প্রথম কারণ ঃ الشرك فى عبادة الله আশ শিরক ফী ইবাদাতিল্লাহি- **অর্থাৎ** 'ঈমানের সাথে শিরকের মিশ্রণ'। মহান আল্লাহর ইবাদত বা তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কখনও শিরকের ছোঁয়া লাগলে মহান আল্লাহর মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হবে। তাই মহান আল্লাহ কঠোর শর্ত পেশ করে বলেন,

فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا-

অর্থাৎ 'সুতরাং যে তার রবের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তাঁর ইবাদতে কাউকে শরীক না করে' (কাহাফ-১১০)

উক্ত নিষেধাজ্ঞা প্রমাণ করে যে, ঈমানের মধ্যে শিরকের মিশ্রণ ঘটলে ইবাদত করে কোন লাভ নেই। কারণ এতে ঈমানও নষ্ট হবে, আমলও নষ্ট হবে। কোন আমলই থাকবে না। ছালাত হোক, ছিয়াম হোক, হজ্জ, যাকাত যাই হোক। যেমন পুকুরের পানিতে বিষ দিলে পানিও নষ্ট হয়ে যায়, মাছও মরে যায়। যে ধরনের মাছই থাক না কেন, সবই মরে যায়। তাই মহান আল্লাহ তা'য়ালা ঈমানেরর সাথে শিরক না মিশানোর জন্য কঠোর শর্ত আরোপ করেছেন। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون - অর্থাৎ 'প্রকৃতপক্ষে যারা ঈমান এনেছে এবং ঈমানের সাথে শিরক মিশ্রিত করেনি, তাদের জন্যই নিরাপত্তা রয়েছে। আর তারাই হেদায়াত প্রাপ্ত' (আন'আম-৮২)। উক্ত আয়াতে বর্ণিত জুলুম অর্থ শিরক, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা উল্লেখ করেছেন। (বুখারী হা/৩২, মুসলিম হা/৩৪২) অন্য আয়াতে এ বিষয়ে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন আরো বলেন, ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو

فى الاخرة من الخسرين- অর্থাৎ ‘যে ব্যক্তি বিশ্বাসের সাথে কুফরী করবে, তার আমাল নষ্ট হয়ে যাবে। সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।’ (মায়িদাহ-৫) অন্য আয়াতে আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون - অর্থাৎ ‘তারা যদি শিরক করে, তাহলে তারা যা আমাল করেছে সবই বাতিল হয়ে যাবে’ (আন‘আম-৮৮)। স্বয়ং নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা কে হুঁশিয়ার করে দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

ولقد اوحى اليك والى الذين من قبلك – لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكنن من الخسرين -

অর্থাৎ ‘নিশ্চয় আপনার উপর এবং আপনার পূর্ববর্তীদের উপর অহি করা হয়েছে যে, যদি আপনি শিরক করেন, তবে অবশ্যই অবশ্যই আপনার সমস্ত আমাল বাতিল হয়ে যাবে। আপনি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন’ (যুমার-৬৫) উক্ত আয়াত প্রমাণ করে যে, যার ঈমানে শিরকের মিশ্রণ ঘটবে, তার ঈমান ও আমাল কিছুই থাকবে না। মহান আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما -

“নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ শির্কের অপরাধ ক্ষমা করেন না, এছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করেন।” (নিসা-৪৮)। শির্কের মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর উদ্দেশ্যে পশু যবাই করা, কবরের উদ্দেশ্যে অথবা খাজা বাবা ফরিদপুরীর উদ্দেশ্যে অথবা খাজা মুঈনুদ্দীনের উদ্দেশ্যে। এছাড়া যত বাবা আছে, যেমন আমাদের দেশের পৌত্তলিকরা নিয়েছে ‘মা’ -এর ভাগ- যেমন মা কালি, মা সরস্বতী, মা দুর্গা ইত্যাদি; তাই নামধারী মুসলিমরা দেখল ‘মা’র ভাগতো শেষ হয়ে গেল তাই ‘বাবা’র গ্রুপ কব্জা করল। মহান আল্লাহ বলেনঃ فصل لربك وانحر - “তোমার প্রতিপালকের জন্য সালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর।” (আল-কাওসার: ২) যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য পশু যবাই করে তার প্রতি মহান আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন। (সহীহ মুসলিম)

সুতরাং এ পশু যবাই বা কুরবানী যদি কোন ব্যক্তি ও বস্তুর উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে তবে তা বড় শির্ক বলে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট প্রার্থনা করা, সাহায্য চাওয়া, কাউকে ভয় করা, অন্যের উপর ভরসা করা, অন্যের উদ্দেশ্যে মানৎ করা, অন্যকে উপকার ও অপকারের

মালিক মনে করা, মহান আল্লাহর যেমন ক্ষমতা, অন্য কারো এরূপ ক্ষমতা রয়েছে বিশ্বাস করা ইত্যাদি সবই শির্ক। উল্লিখিত বিষয়গুলির দলীল নিম্নরূপ, মহান আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا - "আর নিশ্চয়ই মাসজিদসমূহ মহান আল্লাহর জন্য, সুতরাং তার সাথে আর কাউকেও ডেকো না।" (জ্বিন-১৮)

قل انما ادعوا ربى ولا اشرك به احدا - "বলুন, শুধু আমার রবের নিকটেই প্রার্থনা করি আর তার সাথে কাউকেও শরীক করি না।" (জ্বিন-২০) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেছেন, الدعاء مخ العبادة দু'আই হচ্ছে 'ইবাদাত। (সহীহ আবূ দাউদ, ১৩২৯) সুতরাং দু'আ বা প্রার্থনা মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট করা যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন ঃ اياك نعبد واياك نستعين "আমরা শুধু আপনারই 'ইবাদাত করি এবং শুধু আপনারই নিকট সাহায্য চাই।" (ফাতিহা-৫) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেছেনঃ যখন কিছু চাইবে মহান আল্লাহর নিকট চাইবে এবং যখন সাহায্য ভিক্ষা করবে তখন একমাত্র মহান আল্লাহর নিকট সাহায্য ভিক্ষা করবে। (আহমাদ ও তিরমিযী)

উল্লেখ্য সাহায্য চাওয়ার বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। তা হল এই যে, প্রশ্ন হতে পারে তাহলে মহান আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট কোন রকম সাহায্য চাওয়া কি অবৈধ ? এর উত্তর হল ঃ ঐ সমস্ত কাজ যা মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দ্বারা সমাধান করা সম্ভব নয়, তাতে সাহায্য চাওয়া জায়িয নেই। যেমন- মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া যে সমস্ত বিষয়ে (কর্মে) জীবিত ব্যক্তি সাহায্য করতে সমর্থ; যেমন- কর্জ দেয়া, আর্থিক বা দৈহিকভাবে সাহায্য করা ইত্যাদি। মহান আল্লাহ বলেন ঃ وتعانوا على البر والتقوى "এবং তোমরা একে অপরকে সাহায্য কর উত্তম কাজ ও তাক্বওয়ার ক্ষেত্রে।" (আল-মায়িদাহ-২) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেছেন, মহান আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সাহায্য করেন যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার ভাইকে সাহায্য করে। (সহীহ মুসলিম) অতএব রোগমুক্তি, রিয্ক, হিদায়াত এবং এ জাতীয় বিষয়গুলো মহান আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট চাওয়া যাবে না। জীবিত ব্যক্তিরা এই জাতীয় কার্য করতে যেমন সামর্থ্য রাখে না তেমনি মৃতদেরতো প্রশ্নই আসে না।

মহান আল্লাহ বলেনঃ فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين "সাবধান! তোমরা তাদেরকে ভয় করবে না, আমাকে ভয় করবে যদি তোমরা

মু'মিন হয়ে থাক।" (আল ইমরান-১৭৫) মহান আল্লাহ আরও বলেনঃ وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين "আর শুধু মহান আল্লাহর উপর ভরসা কর যদি মু'মিন হয়ে থাক।" (মায়িদাহ-২৩)

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو- وان يردك بخير فلا راد لفضله – يصيب به من يشاء من عباده- وهو الغفور الرحيم - " মহান আল্লাহ যদি তোমাকে কোন বিপদে আক্রান্ত করেন তাহলে তিনি ব্যতীত কেউ নেই তা অপসারণকারী, আর যদি তিনি তোমাকে কল্যাণ দানের ইচ্ছা করেন তাহলে কেউ নেই তাঁর অনুগ্রহ ফিরাবার।" (সূরাহ ইউনুস ১০ ঃ ১০৭)

দ্বিতীয় কারণ ঃ من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر اجماعا **মান জাআলা বায়নাহু অবায়নাল্লাহি ওছায়িতা ইয়াদউহুম ওয়াইয়াছআলুহুমুশ শাফাআতা ওয়াইয়াতা ওয়াক্বালু "আলাইহিম ফাক্বদ কাফারা ইজমাআন অর্থাৎ- মহান আল্লাহ ও বান্দার মাঝে মাধ্যম নির্ধারণ করে তাদের কাছে চাওয়া, প্রার্থনা করা, শাফা'আত কামনা করা, তাদের ইবাদত করা, তাদের উপর তাওয়াক্কুল করা। এটা পরিষ্কার কুফরী।"**

কোন মুসলিম ব্যক্তি উক্ত মাধ্যম নির্ধারণ করে ইবাদত করলে তার ঈমান থাকবে না। এটা কাফের, মুশরিক ও বিধর্মীদের আক্বীদা ও কর্মসূচী। মহান আল্লাহ বলেনঃ ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله - অর্থাৎ 'তারা মহান আল্লাহ ছাড়া এমন বস্তুর ইবাদত করে, যারা তাদের কোন উপকার ও ক্ষতি করতে পারে না। আর তারা বলে, এরা মহান আল্লাহর নিকটে আমাদের জন্য সুপারিশকারী' (ইউনুস-১৮)। মহান আল্লাহ তার জবাবে বলেছেনঃ قل اتنبئون الله بما لا يعلم فى السموات ولا فى الارض سبحانه وتعالى عما يشركون - অর্থাৎ 'আপনি তাদের বলে দিন, তোমরা কি মহান আল্লাহকে এমন বিষয়ের সংবাদ দিচ্ছ, যা তিনি অবগত নন, না আকাশ সমূহে, না জমীনে ? তিনি মহা পবিত্র এবং তাদের শিরকী কর্মকাণ্ড থেকে অনেক উর্ধ্বে'। (ইউনুস-১৮)। অন্যত্র এ বিষয়ে মহান আল্লাহ আরও বলেন, والذين اتخذوا من دونه اولياء- ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى - অর্থাৎ 'যারা মহান আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, (তারা বলে) আমরা তো এজন্যই তাদের পূজা করি, যেন তারা আমাদেরকে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দেয়'। (যুমার-৩) মহান আল্লাহ এর জবাবে বলেনঃ

ان الله يحكم بينهم فى ما هم فيه يختلفون – ان الله لايهدى من هو كاذب كفار-

অর্থাৎ 'তারা যে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করছে, মহান আল্লাহ তার ফায়সালা করে দিবেন। যে মিথ্যাবাদী ও কাফের, মহান আল্লাহ তাকে হেদায়াত দান করেন না' (যুমার-৩)। উক্ত আয়াতগুলো প্রমাণ করে যে, মহান আল্লাহকে পাওয়ার জন্য কেউ যদি অবৈধ মাধ্যম গ্রহণ করে, তবে সে কুফরী করবে এবং তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। যারা মৃত পীর, বুযুর্গ, ফকীর, ওলী, মূর্তি, প্রতিকৃতি, শহীদ মিনারকে অসীলা করে দু'আ করে, ইবাদাত করে, তাদের মাঝে-আর মক্কার মুশরিকদের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। এদের ঈমান-আমল অবশিষ্ট থাকার প্রশ্নই আসে না। যারা মাজার, কবর, মাছ, পুকুর, কবুতর, কুমির, কচ্ছপ, ইত্যাদির মাধ্যমে ইবাদাত করছে, তারা মহান আল্লাহর মর্যাদা ও বড়ত্বকে প্রতিনিয়ত ভূ-লুণ্ঠিত করছে। তারা নামে মুসলিম হলেও তাদের ঈমান-আমাল কোন কাজে আসবে না। গায়রুল্লাহর পূজারী এ সমস্ত ভক্তরা যতই গলাবাজি করুক, মানুষের সাথে যতই প্রতারণা করুক, মহান আল্লাহর বিধানকে তারা ফাঁকি দিতে পারবে না। রাজনীতির নামে দলীয় নেতা-কর্মী, সরকারী আমলা, এমপি, মন্ত্রী, ডিসি, এসপি, ম্যাজিস্ট্রেট, জাজ, উকিল, এ্যাডভোকেট, ব্যারিস্টার যতই ক্ষমতার দাপট দেখান, তারা কি মহান আল্লাহর চেয়েও বড় প্রতাপশালী ? দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী শাসক নমরুদ, ফিরাউন, আবু জাহল কেউ কি মহান আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা পেয়েছে ? অতএব সাবধান! দুনিয়াবী দাপট না দেখিয়ে রোম সম্রাটের মত এলাহী বিধানের সামনে আত্মসমর্পণ করাই বুদ্ধিমানের পরিচয়। এখন আমরা বৈধ অসীলা নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

বৈধ অসীলা ও তার প্রকারভেদ

বৈধ "অসীলা" দুই ধরণের- (ক) শরীয়াতসম্মত "অসীলা" অর্থাৎ যা পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর সমর্থনপুষ্ট। (খ) জাগতিক "অসীলা" গ্রহণ অর্থাৎ যার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব, যেমন হাজ্জে গমনকালে বিমানে আহোরণ করা। আমরা জানতে পেরেছি আমাদেরকে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন বিপদে আপদে তাঁর সাহায্য চাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, وقال ربكم ادعونى استجب لكم – ان الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين - অর্থাৎ 'তোমাদের রব বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাক আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। নিশ্চয়ই যারা অহংকার বশতঃ আমার ইবাদাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে তারা অপদস্থ হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ

করবে (আল-মূ'মিন বা গাফির-৬০) অন্য আয়াতে এসেছে- واذا سألك عبادى عنى فانى قريب – اجيب دعوة الداع اذا دعان- فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون - অর্থাৎ 'যখন আমার বান্দাগণ তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, আমি তো নিশ্চয় নিকটবর্তী। আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেই, যখন সে আমাকে ডাকে। সুতরাং তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে। আশা করা যায়, তারা সঠিক পথে চলবে। (বাকারা-১৮৬) পবিত্র কুরআন এবং সহীহ হাদীস বিচার বিশ্লেষণ করে আমরা আমাদের জন্য তিন শ্রেণীর বৈধ অসীলার সন্ধান পাই।

বৈধ অসীলার ১ম প্রকার ঃ - ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها অর্থাৎ 'মহান আল্লাহ তায়ালার সুন্দর সুন্দর নাম অথবা মহৎ গুণাবলীর মাধ্যম গ্রহণ করা'। এ মর্মে পবিত্র কুরআন এবং সহীহ হাদীসে অসংখ্য দলীল বিদ্যমান। যেমন - **১ নং দু'আ ঃ** اللهم انى اسألك بانك انت الرحمن الرحيم اللطيف الخبير ان تعافينى - অর্থাৎ-হে মহান আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তোমার রহমান, রহীম, লতীফ ও খবীর নামের মাধ্যমে আমার অসুস্থতা থেকে মুক্তি কামনা করছি। **২ নং দু'আ ঃ** أسألك برحمتك التى وسعت كل شئ ان ترحمنى وتغفرلى - অর্থাৎ 'হে মহান আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তোমার ঐ রহমতের মাধ্যমে আমার প্রতি করুণা ও ক্ষমার আবেদন করছি যে রহমত সব কিছুকে ঘিরে আছে। **৩ নং দু'আ,** অনুরূপ এভাবে দু'আ করা ঃ اللهم انى أسألك بحبك لمحمد صلى الله عليه وسلم - অর্থাৎ "মহান আল্লাহ! আমি তোমার নিকট মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-এর ভালোবাসার মাধ্যমে আশ্রয় চাই।" এখানে যেহেতু ভালোবাসা মহান আল্লাহর একটি গুণ, তাই তাঁর মাধ্যমে তাঁর নিকট প্রার্থনা বৈধ হবে।

মহান আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নামের মাধ্যমে তাঁর নিকট আবেদন করতে হবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন ঃ ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها - অর্থাৎ "হে মহান আল্লাহর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম অতএব সেগুলোর মাধ্যমে তোমরা তাঁর নিকট আবেদন কর"। (আ'রাফ-১৮০) অত্র আয়াত যে অর্থ প্রদান করে তা হলো, তোমরা মহান আল্লাহর কাছে তাঁর সুন্দর সুন্দর নামের মাধ্যমে অসীলা গ্রহণ কর, কেননা নিঃসন্দেহে তাঁর মহান সুন্দর নামগুলো অসীলা গ্রহণের অন্যতম মাধ্যম, যেহেতু এই গুণাবলী নামগুলো তাঁরই সাথে খাস।

৪ নং দু'আ ঃ এ ক্ষেত্রে সুলাইমান আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা যে দু'আ করেছিলেন তা উল্লেখ করার প্রয়োজন অনেক বেশি। কারণ দু'আটি

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন ঃ رب او زعنى ان اشكر نعمتك التى انعمت على وعلى والدى وان اعمل صالحا ترضه وادخلنى برحمتك فى عبادك الصلحين - অর্থাৎ, হে আমার রব! আমার প্রতি এবং আমার পিতা-মাতার প্রতি তোমার দয়া নিয়ামাতের শুকরিয়া আদায় করার সুযোগ দাও এবং আমাকে তৌফিক দাও এমন সৎ আমলকারী হিসেবে যাতে তুমি সন্তুষ্ট এবং তোমার রহমতের মাধ্যমে আমাকে তোমার সৎ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর। (নামল-১৯)

৫ নং দু'আ ঃ এ দু'আটির মাধ্যমে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা দু'আ করেছেন- اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احينى ما علمت الحياة خيرا لى وتوفنى اذا كانت الوفاة خيرا لى হে মহান আল্লাহ! আমি তোমার অদৃশ্যের জ্ঞানের মাধ্যমে তোমার নিকট এ দু'আ করছি যে, তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত আমার জীবিত থাকা কল্যাণ মনে করবে ততক্ষণ আমাকে জীবিত রাখো আর যদি আমার জন্য মৃত্যুই কল্যাণকর হয় তাহলে মৃত্যুই দান কর। (নাসাঈ, হাঃ ১৩০৫, ১৩০৬; ইমাম হাকিম সহীহ বলেছেন, এবং ইমাম যাহাবী এটাকে সমর্থন করেছেন)

৬ নং দু'আ ঃ اللهم انى أسألك يا الله الاحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفرلى ذنوبى انك انت الغفور الرحيم - অর্থাৎ হে মহান আল্লাহ! অদ্বিতীয় একক সত্ত্বা, অমুখাপেক্ষী, যিনি জন্ম দেননি, জন্ম নেননি এবং তার সমকক্ষ আর কেউ নেই আমি তোমার নিকট আবেদন করছি তুমি আমাকে ক্ষমা কর হে ক্ষমাশীল ও দয়াময়! (আবু দাউদ, হা/৯৮৭; নাসাঈ, আহমাদ, সনদ সহীহ)। জনৈক লোককে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা তাশাহহুদে এ দু'আ করতে শুনে মন্তব্য করেছিলেন, যে দু'আ করেছে মহান আল্লাহ তার দু'আ কবুল করে তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

৭ নং দু'আ ঃ اللهم انى أسألك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السموات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حى يا قيوم انى أسألك الجنة واعوذبك من النار- অর্থাৎ 'জনৈক ব্যক্তিকে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা তাশাহহুদে এ দু'আ করতে শুনে মন্তব্য করেছিলেন তোমরা কি শুনতে পেরেছ সে কিসের মাধ্যমে দু'আ করেছে ? সে মহান আল্লাহর এমন মহৎ নামের মাধ্যমে দু'আ করেছে, যদি সেই নামে ডাকা হয়, তখন তিনি সেই ডাকের সাড়া দেন। ঐ নাম ধরে কিছু চাইলে তিনি তাকে দান করেন'। (আবু দাউদ, হা/১৪৯৭; নাসাঈ, আহমাদ, প্রভৃতি সনদ সহীহ)।

৮ নং দু'আ ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেছেন, যার চিন্তা পেরেশানী মাত্রাতিরিক্ত পর্যায়ে পৌঁছে যাবে সে এ দু'আ করবে ঃ اللهم انى عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتى بيدك ماض فى حكمك عدل فى قضاوك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او علمته أحدا من خلقك او أنزلته فى كتابك او استأثرت به فى علم الغيب عندك ان تجعل القرأن ربيع قلبى ونور صدرى وجلاء جزنى وذهاب همى - অর্থাৎ "হে আমার আল্লাহ! আমি তোমার বান্দা এবং তোমার বান্দীর ছেলে। আমার সব শক্তি তোমার নিকট, আমার উপর তোমার আইন কার্যকর। আমি তোমার নিকট তোমার ঐ সব নামের মাধ্যমে আবেদন করছি যার মাধ্যমে তুমি তোমার নাম রেখেছ অথবা তোমার কোন সৃষ্টিকে শিক্ষা দিয়েছ অথবা তোমার কিতাবে নাযিল করেছ অথবা যা তুমি কাউকে শিখাওনি শুধু তুমিই জানো এসব নামের মাধ্যমে আমি তোমার নিকট আবেদন করছি। পবিত্র কুরআনকে আমার হৃদয়ের প্রশান্তির কারণ, বক্ষের আলো এবং চিন্তা-পেরেশানীর মুক্তির মাধ্যম করে দাও"।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেছেন, কেউ এমন দু'আ করলে, মহান আল্লাহ তার চিন্তা ও পেরেশানি দুর করে দেন এবং তার প্রভাব ও মর্যাদা পূর্বের অবস্থা থেকে পরিবর্তন করে বৃদ্ধি করে দেন। (মুসতাদরাক হাকিম, হা/১৩২৯ কিতাবুল জানায়েয; আহমাদ, হা/৩৭১২, সিলসিলা সহীহাহ, হা/১৯৯) এ রকম আরও দু'আ রয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়েছেন। সহীহ হাদীসে এসেছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেছেন ঃ اللهم انى اعوذ بعزتك لا اله الا انت ان تضلنى - অর্থাৎ "হে মহান আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তোমার সম্মানের মাধ্যমে আশ্রয় চাই তুমি ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই। আমাকে তুমি পথভ্রষ্ট করে দিও না ..."। (মুসলিম, হা/৭০৭৪) এ ব্যাপারে আরও একটি হাদীস আছে যা আনাস রাজিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত এ মর্মে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা এর নিকট যখন কোন বিষয় কঠিন হতো তখন তিনি বলতেনঃ يا حى يا قيوم برحمتك استغيث - অর্থাৎ "হে চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী! তোমার রহমতের মাধ্যমে আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই"। (তিরমিযী, হা/৩৫২৪, তুহফাতুল আহওয়াযী, ১/২৬৭ হাকিম, ১/৫০৯, হাদীসটি হাসান) অতএব, উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হলো, শরীয়ত সম্মত অসীলা হচ্ছেঃ মহান আল্লাহ তায়ালার নাম

অথবা তাঁর সিফাতি নামসমূহের মাধ্যমে অসীলা গ্রহণ করা। কেননা এর কারণে মহান আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন এবং তার উপর সন্তুষ্ট হন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা উক্ত নাম ও সিফাতি নামসমূহের মাধ্যমে অসীলা গ্রহণ করেছেন। এ জন্য মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ ما اتكم الرسول فخذوه - অর্থাৎ, রাসূল তোমাদের নিকট যা এনেছেন তা গ্রহণ কর। (হাশর-৭) সুতরাং আমাদের জন্য শরীয়াতসম্মত পন্থা হচ্ছে সেটাই যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা মহান আল্লাহকে ডেকেছেন।

বৈধ অসীলার ২য় প্রকার ঃ التوسل الى الله تعالى بعمل صالح قام به الداعى -

দু'আকারী নিজের সৎ আমলের মাধ্যমে "অসীলা" গ্রহণ করবেঃ যেমন কোন মুসলিম এভাবে দু'আ করবে যে, হে মহান আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আমার ঈমান এবং তোমার প্রতি ভালোবাসা এবং তোমার রাসূলের অনুসরণের মাধ্যমে তোমার কাছে দু'আ করছি এ মর্মে যে, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, এ ধরনের মাধ্যমে অবলম্বন খুব উৎকৃষ্ট মাধ্যম অবলম্বন, মহান আল্লাহ তায়ালা এ রকমের বিধান জারি করেছেন এতেই তিনি সন্তুষ্ট, মহান আল্লাহ বলেন, الذين يقولون ربنا اننا امنا فاغفرلنا ذنوبنا وقنا عذاب النار - অর্থাৎ "মুমিন তো তারাই যারা বলে হে আমার রব! আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনেছি অতএব আপনি আমাদের পাপ ক্ষমা করে দিন আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন"। (আলে ইমরান-১৬) মহান আল্লাহ তাআলা আরোও বলেন, ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهدين - অর্থাৎ "হে আমাদের রব! আপনি যা অবতীর্ণ করেছেন তার প্রতি আমরা ঈমান এনেছি এবং রাসূল এর অনুসরণ করেছি; সুতরাং আপনি আমাদেরকে সাক্ষী প্রদানকারীদের তালিকাভুক্ত করে নিন"। (আলে-ইমরান-৫৩) অন্যত্র মহান আল্লাহ আরও বলেন, ربنا اننا سمعنا مناديا ينادى للايمان ان امنوا بربكم فامنا – ربنا فاغفرلنا ذنوبنا وكفر عنا سياتنا وتوفنا مع الابرار অর্থাৎ 'হে আমাদের রব! আমরা আপনার পক্ষ থেকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিয়ে ঈমান আনয়ন করেছি সুতরাং আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করেন, আমাদের পাপ মোচন করেন এবং আমাদেরকে সৎ বান্দাদের সাথে মৃত্যু দিবেন'। (আলে ইমরান: ১৯৩-১৯৪) অন্য আয়াতে আরও বলা হয়েছে- انه كان فريق من عبادى يقولون ربنا امنا فاغفرلنا وارحمنا وانت خير الرحمين- অর্থাৎ- "নিশ্চয়ই আমার বান্দাদের একটি দল আছে যারা বলে হে আমাদের রব!

আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনেছি, অতএব আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে রহম করুন নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ রহমকারী"। (মুমিন-১০৯) উল্লেখিত আয়াতে কারীমাগুলো অসীলা চাওয়ার দৃষ্টান্ত। অনুরূপভাবে এই প্রকার অসীলা গ্রহণ করা শরীয়ত বৈধতা দিয়েছে। যেমন, বুরাইদা ইবনুল হাসীব রাজিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা এক ব্যক্তিকে নিম্নের দু'আটি বলতে শুনেছেন,

اللهم انى أسألك انى اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد-

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা দু'আটি শুনে বললেন, এই ব্যক্তি মহান আল্লাহর এমন মহান নামের মাধ্যমে প্রার্থনা করেছেন, যদি এর মাধ্যমে চাওয়া হয়, তাহলে মহান আল্লাহ তাকে দান করেন। যদি এই নামের মাধ্যমে ডাকা হয়, তাহলে সেই ডাকে সাড়া দেন। (আবু দাউদ, হা/১৪৯৫; আহমাদ, হাঃ ৫/৩৪৯,৩৫০) সৎ আমল দু'আ করার ক্ষেত্রে "অসীলা" (মাধ্যম) হতে পারে। এর একটি জ্বলন্ত প্রমাণ হচ্ছে সহীহ হাদীসে বর্ণিত ঐ হাদীসটি যেখানে তিনজন লোক পাহাড়ের গুহায় আটকে পড়ে নিজ নিজ সৎ আমলের মাধ্যমে মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করলে মহান আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মস্ত বড় বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। হাদীসটির বিস্তারিত ঘটনা নিম্নে তুলে ধরা হলো- আবদুল্লাহ বিন উমার রাজিআল্লাহু আনহু বলেনঃ আমি নবীজীকে বলতে শুনেছি, তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে তিন ব্যক্তি (পথ) চলতে চলতে রাত কাটানোর জন্য একটি গুহায় প্রবেশ করে আশ্রয় নিল। হঠাৎ পাহাড় থেকে একখণ্ড পাথর পড়ে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেল। তখন তারা পরস্পর বলল তোমাদের নেক আমালসমূহের ওয়াসীলাহ দিয়ে মহান আল্লাহকে ডাকা ছাড়া আর কোন কিছুই এ পাথর থেকে তোমাদেরকে মুক্ত করতে পারবে না। তখন তাদের একজন বলতে লাগল, হে আমার মহান আল্লাহ! আমার মাতা-পিতা খুবই বৃদ্ধ ছিলেন। আমি কখনও তাঁদের আগে আমার পরিবার-পরিজনকে কিংবা দাস-দাসীকে দুধ পান করাতান না। একদিন একটি জিনিসের খোঁজে আমাকে অনেক দূরে চলে যেতে হয়। কাজেই তাদের ঘুমিয়ে পড়ার পূর্বে আমি (পশুপাল নিয়ে) ফিরতে পারলাম না। তাই আমি (তাড়াতাড়ি) তাঁদের জন্য দুধ দোহন করে নিয়ে এলাম। কিন্তু তাদেরকে নিদ্রিত পেলাম। আর তাদের আগে আমার পরিবার-পরিজন ও দাস-দাসীকে দুধ পান করতে দেয়াটা আমি অপছন্দ করলাম। তাই আমি তাঁদের জেগে উঠার অপেক্ষায় পেয়ালটিকে হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। এভাবে ভোর

হলো। তখন তারা জাগলেন এবং দুধপান করলেন। হে আমার মহান আল্লাহ যদি আমি তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে একাজ করে থাকি তবে এ পাথরের কারনে আমরা যে বিপদে পড়েছি তা আমাদের থেকে দূর কর। এ কথা বলার পর পাথরটি সামান্য সরে গেল। কিন্তু তাতে তারা বের হতে পারল না। নবীজী বললেনঃ তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি বললঃ হে আমার মহান আল্লাহ! আমার এক (অনিন্দ্য সুন্দরী) চাচাত বোন ছিল। আমি তাকে ভোগ করতে চাইলাম। কিন্তু সে আমাকে প্রত্যাখ্যান করল। অবশেষে এক কঠিন দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে সে (খাদ্যাভাবে সাহায্যের জন্য) আমার নিকট এল। আমি তাকে একশ বিশ দীনার (স্বর্ণ মুদ্রা) এ শর্তে দিলাম যে, সে আমার সাথে নির্জন বাস করবে। সে তা (অকপটে) মনজুর করল। আমি যখন সম্পূর্ণ সুযোগ লাভ করলাভ, তখন সে বলল! আমি তোমাকে অবৈধভাবে মোহর ভাঙ্গার অনুমতি দিতে পারি না (অর্থাৎ অন্যায়ভাবে তুমি আমার সাথে সঙ্গম বা মিলন করতে পার না)। ফলে মানুষের মধ্যে সে আমার সর্বাধিক প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও আমি তার সাথে সহবাস করা পাপ মনে করে তার কাছ থেকে সরে পড়লাম এবং আমি তাকে যে স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলাম তা ছেড়ে দিলাম।

হে আমার মহান আল্লাহ! আমি যদি এটা তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করে থাকি, তবে তার (ওয়াসীলায়) আমরা যে বিপদে পড়েছি তা দূর কর। একথা বলার পর ঐ পাথরটি (আরও একটু) সরে গেল কিন্তু তাতে তারা গুহা থেকে বের হতে পারছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বললেনঃ তারপর তৃতীয় ব্যক্তি বললঃ হে আমার মহান আল্লাহ! আমি কয়েকজন মজুর নিযুক্ত করেছিলাম এবং আমি তাদেরকে তাদের মজুরিও দিয়েছিলাম। কিন্তু একজন লোক তার প্রাপ্য না দিয়ে চলে গেল। আমি তার মজুরির টাকা কাজে খাটালাম। তাতে প্রচুর ধন সম্পদ অর্জিত হলো। কিছুকাল পর সে আমার নিকট এসে বলল, হে মহান আল্লাহর বান্দাহ! আমাকে মজুরি দিয়ে দাও। আমি তাকে বললাম এসব উট, গরু, ছাগল ও গোলাম যা তুমি দেখতে পাচ্ছ তার সবটাই তোমার মজুরি। একথা শুনে সে বলল, হে মহান আল্লাহর বান্দাহ! তুমি আমার সাথে ঠাট্টা বিদ্রুপ করো না। তখন আমি বললামঃ আমি তোমার সাথে মোটেই ঠাট্টা বিদ্রুপ করছি না। তখন সে সবই গ্রহণ করল এবং হাঁকিয়ে নিয়ে গেল। তার থেকে একটাও ছেড়ে বা রেখে গেল না। হে আমার মহান আল্লাহ! আমি যদি তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এটা করে থাকি। তবে তার ওয়াসীলার যে বিপদে আমরা পড়েছি তা দূর কর। তখন ঐ

গুহার মুখের পাথরটি সম্পূর্ণ সরে গেল এবং তারা বেরিয়ে এসে পথ চলতে লাগল।

অত্র হাদীস থেকে স্পষ্ট যে, বিপদের মূহুর্তে মহান আল্লাহর কাছে নিজ নিজ সৎ আমালের মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করলে মহান আল্লাহ তাআলা বিপদ থেকে মুক্তি দান করেন। (বুখারী, হা/২২৭২; মুসলিম, নাসাঈ প্রমুখ) এই হাদীস থেকে স্পষ্ট হয় যে, যখন তাদের উপর কঠিন মসিবত পতিত হয় তখন তারা তিনজন ছিলেন এবং তাদের উপর বিষয়টি সংকটময় হয়ে পড়ে এবং একমাত্র মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য সব পথ তালাশ করে নিরাশ হয়ে যায়। ফলে তারা উক্ত পথ অবলম্বন করেন এবং ইখলাসের সহিত মহান আল্লাহকে ডাকেন এবং তারা তাদের স্ব-স্ব সৎ আমলগুলোর প্রতি স্মরণ করেন যাতে উক্ত বিপদের মোকাবেলায় সহযোগী হয়।

সুতরাং তারা তাদের উল্লেখিত সৎ আমলের মাধ্যমে তিনজনেই অসীলা করেন। প্রথমজন অসীলা করেছেন স্বীয়-সন্তানের চাইতে মাতা-পিতার প্রতি ভালোবাসার প্রতিদান হিসেবে, যার মধ্যে কোন খাদ ছিলনা। দ্বিতীয় ব্যক্তির অসীলা ছিল তার চাচাতো বোনের সাথে ব্যভিচার করা থেকে বিরত থাকা, মেয়েটিকে সে প্রচুর ভালোবাসত। অপর দিকে মেয়েটি অভাব-অনটনে দিনাতিপাত করছিল, ফলে সে তাকে স্পর্শ করতে বাধ্য করায়। কিন্তু যখন ছেলেটির কাঙ্ক্ষিত মূহুর্ত চলে আসে, তখন মেয়েটি তাকে মহান আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ফলে ছেলেটি কুকর্ম করা থেকে বিরত থাকে এবং টাকা-পয়সাগুলো এমনিতেই তাকে দান করে।

আর তৃতীয় ব্যক্তির অসীলা হলো, জনৈক ব্যক্তির পারিশ্রমিক স্বরূপ রেখে যাওয়া অর্থ, যা পরবর্তীতে বিশাল সম্পদে পরিণত হয়েছিল। উক্ত ব্যক্তি ফিরে এসে তার রেখে যাওয়া ন্যায্য অর্থটুকু চাইলে উক্ত অর্থ দ্বারা অর্জিত সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে দেন। আর এটি ছিল তার একনিষ্ঠ অন্যতম আমল যা একমাত্র মহান আল্লাহর জন্যই করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা আমাদেরকে ওহীর আলোকে এই ঘটনা বর্ণনা করেন যা গায়েবের ঘটনা। মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ জানত না। আমাদেরকে স্মরণ করে দেওয়ার জন্য যাতে এরূপ দৃষ্টান্তপূর্ণ সৎ আমলের মাধ্যমে অসীলা করি এবং এরূপ মূল্যবান শিক্ষা গ্রহণ করি এবং এটি একটি সুন্দর উপদেশ। কোন ব্যক্তি এরূপ কথা কখনও বলেননি যে, এই আমল আমাদের নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-কে প্রেরণ করার পূর্বে অতিবাহিত হয়ে গেছে। তাই ইলমে উসূলের মূলনীতি অনুযায়ী তা

বাস্তবায়ন হবে না। কেননা আমাদের পূর্ববর্তী শরীয়াত আমাদের জন্য শরীয়াত নয়।

(পাঠক বৃন্দ! কেউ যদি এরূপ দাবি করে থাকে তাহলে তা সঠিক নয়।) কেননা নাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা সংঘটিত যে কাহিনীটি বর্ণনা করেছেন তা ঃ প্রশংসা, মর্যাদা এবং সম্মান করার প্রতি আজ্ঞা বহন করে। আর এটি নাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-এর পক্ষ থেকে স্বীকৃতি প্রদানেরই নামান্তর; বরং তা সবচেয়ে অধিক স্বীকৃতি প্রদানের অন্তর্ভুক্ত। কেননা তারা তাদের উল্লেখিত সৎ আমলের মাধ্যমে অসীলা করেছেন এবং তা উল্লেখিত পবিত্র কুরআনের আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বৈধ অসীলার ৩য় প্রকার ঃ التوسل الى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح

সৎ ব্যক্তির দু'আর মাধ্যমে "অসীলা" করা

যেমন কোন মুসলিম যদি কোন বড় ধরনের বিপদে পতিত হয় সে ক্ষেত্রেও তিনি অন্য একটি শক্তিশালী মাধ্যম গ্রহণ করতে পারেন। আর তা হলো তার বিশ্বাস মতে এমন এক ব্যক্তির কাছে যাবেন যিনি সৎ, মুত্তাক্বী এবং পবিত্র কুরআন এবং সুন্নাহর জ্ঞানে জ্ঞানী। তার কাছে এসে তিনি মহান আল্লাহর কাছে তার বিপদ থেকে মুক্তির জন্যে দু'আর আবেদন করতে পারেন। এটা হচ্ছে এক প্রকার শরীয়াত সম্মত অসীলা। নিম্নে আমরা এই প্রকার অসীলা সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে কিছু উদাহরণ পেশ করছি।

ক) বিশিষ্ট সাহাবী আনাস বিন মালিক রাজিআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা এর জামানায় একবার দুর্ভিক্ষ পৌঁছলে আমাদের মাঝে নবীজী মিম্বারে উঠে ভাষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে গেলেন। ঠিক ঐ মুহূর্তে এক বেদুঈন এসে আরয করলেন, হে আল্লাহর নাবী! দুর্ভিক্ষের কারণে মাল সম্পদ সব নষ্ট হতে চলেছে, পরিবার-পরিজন ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছে সুতরাং আপনি আমাদের জন্য মহান আল্লাহর নিকটে দু'আ করেন তিনি যেন বৃষ্টি বর্ষণ করেন। একথা শুনে নাবীজী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা দুহাত উঁচু করলেন এমন কি তার বগলের শুভ্রতা পরিলক্ষিত হচ্ছিল এবং তিনি এ মর্মে দু'আ করলেন ঃ - اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا

"হে মহান আল্লাহ! আপনি আমাদের বৃষ্টি দেন! হে মহান আল্লাহ, আপনি আমাদের বৃষ্টি দেন! হে মহান আল্লাহ আপনি আমাদের বৃষ্টি দেন"।

লোকেরা তাঁর সাথে হাত উত্তোলন করে দু'আ করলেন। তবে সেখানে একথা উল্লেখ নেই তারা ক্বিবলা দিকে হয়েছেন এবং তাদের গায়ের চাদর উল্টিয়ে নিয়েছেন। হাদীসটির বর্ণনাকারী বলেন, নাবীজীর দু'আর পূর্ব মূহুর্তে আসমানে কোন মেঘ ছিল না। কিন্তু দু'আর পরক্ষণেই মুষলধারে বৃষ্টিপাত হলো। ঐ দিন হলো তার পরের দিন হলো; এমন কি আগামি জুমুআর দিন পর্যন্ত বৃষ্টি হতে থাকলো। ছয় দিন যাবৎ আকাশে সূর্য দেখা গেল না। পরের জুমুআয় ঐ গ্রাম্য ব্যক্তি কিংবা অন্য আরেক ব্যক্তি এসে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-এর খুৎবা প্রদানকালে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঘর-বাড়ি, রাস্তা-ঘাট, প্রাণীগুলো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, আপনি বৃষ্টি বন্ধের জন্য দু'আ করুন। এ কথা শুনে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা মুচকি হাসলেন। অতঃপর দুহাত তুলে বৃষ্টি বন্ধের জন্য দু'আ করলেন।

(খ) এ ব্যাপারে আরেকটি দলীল সেটিও আনাস বিন মালিক রাজিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্ত্বাব রাজিআল্লাহু আনহু তার যামানায় আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্তালিবের মাধ্যমে মহান আল্লাহর নিকট বৃষ্টির দু'আ করলে তিনি বলতেন, হে মহান আল্লাহ! তোমার নাবী বেঁচে থাকতে আমরা তাঁর মাধ্যমে তোমার নিকট বৃষ্টি প্রার্থনা করছি। এখন তোমার নাবীর অবর্তমানে তাঁর চাচার মাধ্যমে তোমার নিকট বৃষ্টির প্রার্থনা করছি সুতরাং তুমি আমাদেরকে বৃষ্টি দাও। ফলে বৃষ্টি হলো। (বুখারী, ২য় খণ্ড, ৩৯৮ পৃঃ, ৭ম খণ্ড ৬২ পৃঃ)

উল্লেখ্য যে, উমার রাজিআল্লাহু আনহু-এর দু'আটিকে যদি কেউ এ অর্থে গ্রহণ করে থাকে হে মহান আল্লাহ! আমরা তোমার নাবী বেঁচে থাকতে তাঁর সম্মানের মাধ্যমে তোমার কাছে বৃষ্টি চাইতাম এখন তাঁর অবর্তমানে তার চাচা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের সম্মানের মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করছি। তাহলে তা সহীহ হবে না। কারণ "সম্মানের মাধ্যমে" এ কথার স্বপক্ষে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসে কোন দলীল নেই। এবং সালাফে সালেহীনদের থেকে কেউ এরূপ করেন নি। হাফেজ ইবনু আসাকির রহিমাহুল্লাহ রচিত তাঁর 'তারীখ' নামক গ্রন্থেও অনুরূপ একটি ঘটনা সহীহ সনদে প্রসিদ্ধ তাবেঈ সুলাইম ইবনু আমের আল হাবায়িরী থেকে বর্ণনা করেছেন। -(আবু যুরআহ আদ দিমাশক্বী এবং ইয়াকুব বিন সুফিয়ান উভয়ে স্ব-স্ব "তারীখ" গ্রন্থে সুলাইম বিন আমের থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেছেন) তাতে রয়েছেঃ "আকাশে মেঘ শূণ্যের ফলে মু'আবিয়া ইবনু আবি সুফিয়ান এবং দামেশকবাসী বৃষ্টির জন্য

প্রার্থনা করেন। যখন মু'আবিয়া রাজিআল্লাহু আনহু মিম্বারের উপর বসলেন, তখন বললেন, ইয়াযিদ ইবনুল আসওয়াদ আল জুরাশী কোথায় ? তখন লোকজন তাকে ডেকে নিয়ে আসেন। মু'আবিয়া রাজিআল্লাহু আনহু তাকে আদেশ করে মিম্বারে উপবেশন করাল তিনি তাঁর সামনে উপবেশন করেন। অতঃপর মু'আবিয়া রাজিআল্লাহু আনহু বললেন ঃ হে মহান আল্লাহ! আমরা আজকে আপনার নিকট আমাদের সর্বাধিক মর্যাদাবান এবং কল্যাণকর ব্যক্তির মাধ্যমে সুপারিশ প্রার্থনা করছি। হে মহান আল্লাহ! আজকে আমরা ইয়াজিদ ইবনু আসওয়াদ আল জুরাশীর মাধ্যমে সুপারিশ প্রার্থনা করছি। হে ইয়াযিদ! তুমি দু'হাত উত্তোলন করে মহান আল্লাহর নিকট দু'আ কর। ফলে তিনি দুহাত তুললেন এবং লোকজনও হাত উত্তোলন করলেন। ফলে চাকতরি (চাকা) ন্যায় অনতিবিলম্বে পশ্চিমে মেঘ উত্তেজিত হওয়া আরম্ভ করল এবং প্রবল বাতাস শুরু হলো। অবশেষে আমরা বৃষ্টিতে সিক্ত হলাম; এমনকি লোকজন তাদের বাড়িতে পৌঁছার সুযোগ পেল না"। ইবনু আসাকির সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন, যাহহাক ইবনু কায়েস লোকজনের সাথে বৃষ্টির প্রার্থনা করার জন্য বের হলেন। অতঃপর ইয়াজিদ বিন আসওয়াদকে উদ্দেশ্য করে অনুরূপ বললেনঃ হে অধিক ক্রন্দনকারী! মহান আল্লাহর দু'আ করার জন্য দাঁড়াও! উক্ত রেওয়ায়েতে বৃদ্ধি করে বলা হয়েছে, তিনি তিনবার দু'আ করলেন। ইতোমধ্যে তাদেরকে প্রচুর বৃষ্টি প্রদান করা হলো।

অত্র আলোচনায় মু'আবিয়া রাজিআল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-এর মাধ্যমে অসীলা করেন নি। তিনি একজন সৎ ব্যক্তির মাধ্যমে অসীলা করেছেন আর তিনি হলেন ইয়াজিদ বিন আসওয়াদ। তার মাধ্যমে দু'আ করলে মহান আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে বৃষ্টি দান করেন। উপরে উল্লেখিত তিন প্রকার "অসীলা" ব্যতীত সব ধরণের "অসীলা" পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে বাতিল হিসেবে পরিগণিত এবং এর উপরই সালাফে সালেহীনদের আমল এবং মুসলিমদের ইজমা। আর উক্ত তিন প্রকার অসীলা হলো ঃ

১। মহান আল্লাহ তায়ালার সুন্দর সুন্দর নাম অথবা মহৎ গুণাবলীর মাধ্যম গ্রহণ করা। ২। দু'আকারী নিজের সৎ আমলের "অসীলা" গ্রহণ করবে। ৩। সৎ ব্যক্তির দু'আর মাধ্যমে "অসীলা" করা।

অসীলার এই (তিন) প্রকার ছাড়া অন্য যত প্রকার রয়েছে, সে গুলোর ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। আর আমরা যে আক্বীদা পোষণ করে থাকি এবং আমাদেরকে যে দ্বীন মহান আল্লাহ দিয়েছেন ইহা ব্যতীত অন্যগুলো বৈধ নয়

এবং তা শরীয়ত সম্মত নয়। কেননা সেগুলোর ব্যাপারে এমন কোন দলীল-প্রমাণ বর্ণিত নেই, যার মাধ্যমে দলীল প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং পারস্পরিকভাবে আসা ইসলামিক যুগ সমূহের মুহাক্কিক আলিমগণ এটাকে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন। তথাপি কেউ কেউ কতক ইমামের কথা বলেছেন। যেমন- ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহু শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-এর মাধ্যমে অসীলা করা জায়েয বলেছেন। আর ইমাম শাওকানী রহিমাহুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা এবং অন্যান্য আম্বিয়া এবং সৎ ব্যক্তিদের মাধ্যমেও অসীলা করা জায়েয বলেছেন। কিন্তু মতবিরোধপূর্ণ বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দলীল-প্রমাণের সহিত যাচাই-বাছাই করা। তাই আমরা কোন সাম্প্রদায়িকতা এবং কোন মানুষের পক্ষপাতিত্ব করব না। আমরা শুধুমাত্র সত্যটিকে গ্রহণ করব। যেমনটি আমরা আক্বীদা পোষণ করি। সুতরাং যদি কেউ সৃষ্টিজীবের সত্ত্বার মাধ্যমে অসীলা জায়েয বলেন, তাহলে পবিত্র কুরআন এবং বিশুদ্ধ সুন্নাহ থেকে 'নস' প্রমাণ করতে হবে। সুতরাং আমরা এক্ষণে পবিত্র কুরআন থেকে কিছু দলীল পেশ করব প্রতিত্তর হিসেবে। তার মধ্যে আমরা এরূপ উদাহরণ পাচ্ছি না যে, সৃষ্টিজীবের কারও সম্মান, মর্যাদা, অবস্থান, শান ইত্যাদির মাধ্যমে অসীলা করার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন পবিত্র কুরআন মাজীদে এসেছে ঃ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا – ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به- واعف عنا واغفرلنا وارحمنا – انت مولنا فانصرنا على القوم الكافرين- অর্থাৎ "হে আমাদের রব! আমরা যদি ভুলে যাই, অথবা ভুল করি তাহলে আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের রব, আমাদের উপর বোঝা চাপিয়ে দেবেন না, যেমন পূর্ববর্তীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন কিছু বহন করাবেন না, যার সামর্থ্য আমাদের নেই। আর আপনি আমাদেরকে মার্জনা করুন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। আপনি আমাদের অভিভাবক। অতএব আপনি কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন"। (বাক্বারা-২৮৬) মহান আল্লাহ আরও বলেন ঃ فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين – و نجنا برحمتك من القوم الكافرين - অর্থাৎ 'তখন তারা বলল, আমরা মহান আল্লাহর উপর তাওয়াককুল করলাম। হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে জালিম কওমের ফিতনার পাত্র বানাবেন না। আর আমাদেরকে আপনার অনুগ্রহে কাফির কওম থেকে নাজাত দিন"। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন ঃ واذ قال ابراهيم

رب اجعل هذا البلد امنا واجنبنى وبنى ان نعبد الانصنام - অর্থাৎ "আর স্মরণ কর যখন ইবরাহীম বলল, হে আমার রব, আপনি এ শহরকে নিরাপদ করে দিন এবং আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে মূর্তি পূজা থেকে দূরে রাখুন"। (ইবরাহীম-৩৫)

رب اجعلنى مقيم الصلوة ومن ذريتى ربنا وتقبل دعاء – ربنا اغفرلى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب - অর্থাৎ "হে আমার রব, আমাকে সালাত কায়েমকারী বানান এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও, হে আমাদের রব, আর আমার দু'আ কবুল করুন। হে আমাদের রব, যেদিন হিসাব কায়েম হবে, সেদিন আপনি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে ও মুমিনদেরকে ক্ষমা করে দিবেন"। (ইবরাহীম: ৪০-৪১) মহান আল্লাহ তায়ালা মূসা আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা-এর যবানে যে দু'আ বের হয়েছিল সেটিও উল্লেখ করে দিয়েছেন ঃ رب اشرح لى صدرى - ويسرلى امرى – واحلل عقدة من لسانى - يفقهوا قولى - অর্থাৎ "হে আমার রব, আমার বুক প্রশস্ত করে দিন এবং আমার কাজ সহজ করে দিন। আর আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন। যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে"। (ত্বহা: ২৫-২৮) পবিত্রময় মহান আল্লাহ বলেন ঃ والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم- ان عذابها كان غراما - অর্থাৎ "হে আমার রব, তুমি আমাদের থেকে জাহান্নামের আযাব ফিরিয়ে নাও। নিশ্চয় এর আযাব হলো অবিচ্ছিন্ন"। (আল ফুরক্বান-৬৫)

এখানে কুরআনুল কারীম থেকে কিছু দু'আ এসেছে। তন্মধ্যে কিছু দু'আ মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যাতে করে আমরা এ ভাবে মহান আল্লাহকে ডাকি। আর কিছু দু'আ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, যে গুলো রাসূলগণ এবং আম্বিয়াদের ঘটনা থেকে বর্ণিত হয়েছে, যেভাবে তাঁরা দু'আ করেছেন। আর উক্ত দু'আর মধ্যে তাঁরা কোন প্রকার অসীলার আশ্রয় নেন নি, যে ভাবে এর বিপরীতমুখী ভাইয়েরা নব আবিষ্কৃত পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন এবং বিরোধীতাকারী ভাইয়েরা এ ব্যাপারে বাগ-বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন।

উল্লেখিত দু'আ গুলো হচ্ছে কুরআনুল কারীম থেকে বর্ণিত দু'আর উদাহরণ। এবার যদি আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-এর হাদীসের প্রতি দৃষ্টিপাত করি তাহলে আমরা অবগত হতে পারব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা কিভাবে দু'আ করেছেন। যে দু'আর উপর মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁকে তা শিক্ষা দিয়েছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

আত-তাসলিমা আমাদেরকে উক্ত দু'আর ফযিলতের প্রতি দিকনিদের্শনা প্রদান করেছেন যেটি পবিত্র কুরআনিক দু'আর অনুকূল, যা নব-আবিষ্কৃত অসীলা থেকে মুক্ত। নিম্নে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো।

(ক) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা এর সাহাবীরা যদি কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতেন তাহলে তাদেরকে ইস্তিখারা করার দু'আটি ঠিক তেমনিভাবে শিখিয়েছিলেন যেমনি তিনি তাদেরকে কুরআন শিখিয়েছিলেন। ইস্তিখারার দু'আটি হলো ঃ اللهم انى استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألت من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وأنت علام الغيوب – اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لى فى دينى ومعاشى وعاقبة امرى واجله فاقدره لى ويسره لى ثم بارك لى فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لى فى دينى ومعاشى وعاقبة امرى واجله فاصرفه عنى واصرفنى عنه واقدر لى الخير حيث كان ثم ارضى - অর্থাৎ-হে মহান আল্লাহ! আমি তোমার জ্ঞানের অসীলায় তোমার নিকট কল্যাণ কামনা করছি এবং তোমার শক্তির অসীলায় আমি শক্তি কামনা করছি এবং তোমার অপার করুণা ভিক্ষা করছি। কেননা তুমি শক্তিশালী আর আমি দুর্বল। তুমি জ্ঞানী, আর আমি অজ্ঞ এবং তুমি আদৃশ্যের বিষয়ে জ্ঞানী। হে মহান আল্লাহ! তুমি যদি অত্র বিষয়টি আমার দ্বীন দুনিয়ার জন্য এবং আমার দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য ভালো মনে কর তাহলে আমাকে এ কাজ করার সক্ষমতা দাও এবং আমার জন্য তা সহজ করে দাও, অতঃপর তাতে আমার জন্য বরকত দাও। আর যদি তুমি মনে কর উক্ত বিষয়টি আমার দ্বীন দুনিয়ার জন্য এবং দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য অকল্যাণকর, তাহলে তা আমার থেকে সরিয়ে দাও আমাকেও তার থেকে সরিয়ে নাও, আর আমাকে কল্যাণকর কর্ম সম্পাদনের তাওফীক দাও সেটা যেখান থেকে হোক না কেন এবং তাতে আমাকে সন্তুষ্টি দান কর। -(বুখারী, হাদীস নং-৬৩৮২; বুখারী, হাঃ ১১৬২, ৭৩৯০) (খ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা নিম্নোক্ত দু'আর মাধ্যমে দু'আ করেছেন ঃ اللهم اصلح لى دينى الذى هو عصمة امرى واصلح لى دنياى التى فيها معاشى واصلح لى اخرتى التى فيها معادى واجعل الحياة زيادة لى فى كل خير واجعل الموت راحة لى من كل شر- অর্থাৎ-"হে মহান আল্লাহ! আমার জন্য আপনি আমার দ্বীন সংশোধন করে দেন যা আমার জীবনের জন্য হেফাযতকারী। আমার দুনিয়া কল্যাণময় করেন যাতে আমি জীবন ধারণ করি এবং আমার আখিরাত কল্যাণময় করেন যেখানে আমি

ফিরে যাব। আমার জীবনে অধিকহারে কল্যাণ দেন এবং মৃত্যুকে আমার জন্য সব ধরণের অকল্যাণ থেকে মুক্তিস্বরূপ করেন"। (মুসলিম, হা/৭০৭৮)

(গ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা আরও দু'আ করেছেন,

اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احينى ما علمت الحياة خيرا لى وتوفنى اذا علمت الوفاة خيرا لى - অর্থাৎ "হে মহান আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তোমার অদৃশ্যের জ্ঞান ও গোটা সৃষ্টিজগতের তোমার শক্তির মাধ্যমে তোমার নিকট দু'আ করছি যদি জান আমার জীবিত থাকা কল্যাণকর তাহলে আমাকে জীবিত রাখ। আর যদি মনে কর মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর তাহলে তুমি আমাকে মৃত্যু দান কর। (ইমাম নাসাঈ সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন)

(ঘ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা আরও দু'আ করতেন এভাবে যে, اللهم انى اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى - অর্থাৎ "হে মহান আল্লাহ! আমি তোমার নিকট হেদায়েত, তাক্বওয়া, ক্ষমা এবং দারিদ্রতা থেকে মুক্তি প্রার্থনা করছি।" (মুসলিম, হা/৭০৭৯) এই রকম দু'আ হাদীসে অনেক রয়েছে যে গুলোর মধ্যে আমরা একটি দু'আও পাই না যার মধ্যে নব আবিষ্কৃত পন্থায় অসীলার আশ্রয় নেওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। সে পন্থাকে বিরোধী ভাইয়েরা গ্রহণ করেন। আর আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, তুমি দেখবে এসমস্ত লোকেরা পূর্বে উল্লেখিত শরীয়ত সম্মত অসীলার প্রকার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারা তাদের দু'আর মধ্যে উক্ত বৈধ পন্থায় আমল করে না অথচ পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ এবং উম্মাতের ইজমা দ্বারা তা প্রমাণিত। তারা এমন ধরনের অসীলা বানিয়ে নিয়েছেন যা মহান আল্লাহ তা নির্ধারণ করেন নি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা এরূপ আমল করেন নি এবং মর্যাদাপূর্ণ প্রথম তিন যুগের সালাফগণ থেকে এরূপ কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে বিপরীতমুখী ভাইদের অনুকূলেও কিছু ক্বওল রয়েছে, কিন্তু সে ব্যাপারে মতপার্থক্য এবং ইখতেলাফ রয়েছে। সুতরাং তাদের কাছে নিম্নের আয়াতের আলোকে অধিক গ্রহণযোগ্য কোনটি হবে ? যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ قال اتستبدلون الذى هو ادنى بالذى هو خير- অর্থাৎ "যা উৎকৃষ্ট তোমরা কি তার সঙ্গে যা নিকৃষ্ট তার বিনিময় করতে চাও" ? (বাক্বারা-৬১) এ ব্যাপারে আমরা বিশিষ্ট তাবেঈ হাসান বিন আতিয়্যাহ আল মুহাবিরীর কথাটি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। হয়তবা আমলগত দিক থেকে কাউকে সমর্থন যোগাবে। তিনি বলেন, ما ابتدع قوم بدعة فى دينهم الا نزع من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها الى يوم القيامة- অর্থাৎ-"কোন জাতি যদি

বিদ'আতী আমল চালু করে তাহলে তাদের মধ্য থেকে তারা যে পরিমাণ বিদ'আত চালু করবে সে পরিমাণ সুন্নাত উঠে যাবে, অতঃপর সে সুন্নাত কিয়ামাত পর্যন্ত আর ফিরে আসবে না"। (দারেমী, ১/৪৫, সনদ সহীহ)

তাদের এহেন বিদআতী অসীলার বিরোধীতায় কেবল আমরাই এককভাবে বলছি না, বরং আমাদের পূর্বের বড় বড় ইমাম, ওলামা তাদের এ ধরনের বিদআতী আসীলার চরম বিরোধিতা করেছেন। এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ-এর একটি কথা পাওয়া যায় আদদুররুল মুখতার নামক কিতাবের ২য় খণ্ডের ৬৩০ পৃষ্ঠায়, যেটি হানাফী মাযহাবের একটি অতি প্রসিদ্ধ কিতাব। সেখানে এসেছে ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

لا ينبغى لاحد ان يدعوا الله الا به والدعاء المأذون فيه المأمور به ما استفيد من قوله تعالى - অর্থাৎ "কারও জন্য এটা বৈধ নয় আল্লাহকে সরাসরি না ডেকে কোন মাধ্যম দিয়ে ডাকবে বরং মহান আল্লাহকে সরাসরি ডাকবে এবং ঐ সমস্ত দু'আর মাধ্যমে ডাকবে যার অনুমতি রয়েছে, যার মাধ্যমে দু'আ করতে শরীয়াত আদেশ করেছে। পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত থেকে এটাই বুঝা যায়"। ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها -

অর্থাৎ মহান আল্লাহর রয়েছে সুন্দর সুন্দর অনেক নাম তোমরা সেগুলির মাধ্যমে তাকে ডাকো। (আরাফ-১৮০) ইমাম আবূ হানিফা রহিমাহুল্লাহ থেকে এরূপ আরেকটি কথা পাওয়া যায়।

বিশর ইবনুল ওয়ালীদ বলেন, আমাদেরকে ইমাম আবূ হানীফার ছাত্র ইমাম আবূ ইউসুফ হাদীস শুনিয়েছেন এ মর্মে যে, ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ বলেছেন ঃ لا ينبغى لاحد ان يدعو الله الا به واكره ان يقول : بمعاقد العز من عرشك او بحق خلقك - অর্থাৎ 'কারও জন্য এটা উচিত নয় মহান আল্লাহকে তাঁর নাম ব্যতীত অন্য কিছুর মাধ্যমে ডাকবে। কেউ যদি এমনভাবে মহান আল্লাহকে ডাকে যে, হে মহান আল্লাহ! তোমার আরশের সম্মানের অসীলায় আমি তোমার নিকট দু'আ করছি, অথবা কেউ যদি বলে হে মহান আল্লাহ! তোমার সৃষ্টিজীবের সম্মানের অসীলায় আমি তোমার নিকট দু'আ করছি। এ দুধরনের অসীলাই আমি অপছন্দ করি'। ইমাম আবূ ইউসুফ রহিমাহুল্লাহ বলেন, কেউ যদি মহান আল্লাহর নিকট তাঁর আরশের সম্মানের অসীলায় দু'আ করে। তাহলেঃ মহান আল্লাহকেই বলা হয়। আমি এভাবে বলাকে অপছন্দ করি না। কিন্তু আমি যেভাবে বলা অপছন্দ করি সেটি হচ্ছে, হে মহান আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অমুক ব্যক্তির সম্মানের অসীলায় অথবা তোমার নাবীগণের সম্মানের অসীলায় অথবা তোমার ঘরের সম্মানের অসীলায়

দু'আ করছি, তাহলে তা হবে সম্পূর্ণভাবে ভুল, আমি এভাবে অসীলা গ্রহণকে অপছন্দ করি।

আল-কুদুরী বলেন, মহান আল্লাহর নিকট তাঁর সৃষ্টির অসীলায় কোন আবেদন বৈধ নয় এ ব্যাপারে সব আলেম একমত পোষণ করেছেন। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ তার আল-কায়িদাতুল জালিলায় এ কথাই ব্যক্ত করেছেন। শাইখ যুবাইদী বলেন, كره ابو حنيفة وصاحباه ان يقول الرجل : أسألك بحق فلان او بحق انبياءك ورسلك او بحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك اذ ليس لاحد على الله حق - অর্থাৎ-"ইমাম আবূ হানীফা এবং তার দুই শিষ্য ইমাম আবূ ইউসুফও ইমাম মুহাম্মাদ অপছন্দ করেছেন যে, কেউ এরূপ দু'আ করবে, হে মহান আল্লাহ আমি তোমার নিকট অমুক ব্যক্তির সম্মানের অসীলায় অথবা তোমার নাবী রাসূলের সম্মানের অসীলায় অথবা তোমার ঘরের সম্মানের অসীলায় ইত্যাদি নানা ধরণের অসীলায় দু'আ করছি। কেননা মহান আল্লাহর উপরে কেউ সম্মানিত নয়"। -(শরহুল ইহইয়া ২য় খণ্ড ২৮৫ পৃষ্ঠা) অনুরূপ ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ ও ইমাম মুহাম্মাদ রহিমাহুল্লাহ একমত পোষণ করে বলেন, যদি কেউ এরূপ দু'আ করে ঃ اللهم انى اسألك بمعاقد العز من عرشك - অর্থাৎ-"হে মহান আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তোমার আরশের সম্মানের অসীলায় আবেদন করছি"। তাহলে এইরূপ চাওয়াকে তাঁরা উভয়ে অপছন্দ করেছেন। তবে ইমাম আবূ ইউসুফের মত হলো এরূপ অসীলা করা বৈধ। এ ব্যাপারে তিনি একটি দলীল পেশ করেছেন, তবে দলীলটি বাতিল, সহীহ নয়। ইমাম ইবনুল জাওজী তার "আল-মাওযুআত" নামক কিতাবে দলীলটি উল্লেখ করেছেন এবং তিনি বলেছেন, এ দলীলটি নিঃসন্দেহে জাল। ইমাম যায়লাঈ হানাফী রহিমাহুল্লাহ তার নাসবুর-রায়া নামক কিতাবের ২৭৩ পৃষ্ঠায় বলেছেন হাদীসটি দলীল হিসাবে উপস্থাপনের অনুপযুক্ত। (মাযহাবি কিতাবে বর্ণনা করা হয়েছে) ("অসীলা" প্রকারভেদ ও হুকুমসমূহ-কৃত শাইখ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী)।

তৃতীয় কারণ ঃ من اعتقد ان هدى غير النبى صلى الله عليه وسلم اكمل من هديه او ان حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر - আজকাল লক্ষ লক্ষ ছদ্মবেশী মুসলিম নামধারী ব্যক্তি এ ধরনের বিশ্বাসে বিশ্বস্ত। কেউবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমার তরীকার চেয়ে চিশতিয়া, নকশাবন্দিয়া, কাদেরীয়া, জাবেরীয়া, সাবেরীয়া, মুজাদ্দেদীয়া ইত্যাদি তরীকার হিদায়েতরূপী বিদআতকে অধিক পূর্ণাঙ্গ মনে করছে। আবার কেউবা যুগ যুগ ধরে চলে আসা

বাপ-দাদার লালিত মাযহাবকে রাসূলের তরীকার উপর প্রাধান্য দিচ্ছে। আবার কেউ রাসূলের রেখে যাওয়া রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, যুদ্ধনীতি, সন্ধিনীতি ও আইন-বিধানের চেয়ে অন্যদের আবিষ্কৃত এ সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে অধিক সুন্দর মনে করছে। জাতীয়তাবাদ, পুঁজিবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের এসব প্রেমিকরা কি প্রকৃত অর্থে মুসলিম থাকতে পারে। যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-এর আদর্শের চেয়ে অন্যের আদর্শ শ্রেষ্ঠ, অথবা তাঁর ফায়সালার চেয়ে অন্যের ফায়সালা অধিক উত্তম-যেমন ত্বাগূতপন্থীরা প্রাধান্য দেয়, তাহলে ঐ ব্যক্তি কাফের। মহান আল্লাহ বলেনঃ

فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما- অর্থাৎ 'আপনার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার আপনার উপর অর্পণ না করবে; অতঃপর আপনার দেওয়া সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা থাকবে না এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেবে' (নিসা-৬৫)।

চতুর্থ কারণঃ من ابغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা যে শরীআত নিয়ে এসেছেন, তাঁর কোন অংশের প্রতি যদি কোন ব্যক্তি বিদ্বেষ পোষণ করে, তবে সে কুফরী করবে, যদিও সে তার প্রতি আমাল করে। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم التسليما- অর্থাৎ 'এটা এ জন্য যে, মহান আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তারা তা অপছন্দ করে। সে জন্য মহান আল্লাহ তাদের আমালগুলো নষ্ট করে দিবেন' (মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-৯)। ঃ যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমকে কটুক্তি বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করবে, তাদের জন্য শারঈ বিধান হলো, মৃত্যুদণ্ড। (বুখারী হা/৪০৩৭; মুসলিম হা/১৮০১; আবুদাউদ হা/৪৩৬১; নাসাঈ হা/৪০৭০) যেমন আজকাল নামধারী মুসলিমকে পর্দা, দাঁড়ি ইত্যাদি শরীয়াতের বিষয় নিয়ে ব্যঙ্গ করতে দেখা যায়। দাঁড়ি রাখলে তাকে ছাগল বা চাচা বলে সম্বোধন করতে দেখা যায়। এছাড়া ইসলামী রাজনীতি, ইসলামী শিক্ষা, আইন-কানুন ও আযান নিয়েতো আমাদের দেশের জনৈক কবি ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছে বলে জনশ্রুতি রয়েছে।

পঞ্চম কারণ ঃ من استهزأ بشئ من دين الرسول صلى الله عليه وسلم او ثوابه او عقابه كفر **মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা এর আনীত দ্বীনের কোন অংশকে, তার প্রতিদান ও শাস্তিকে যে ঠাট্টা করবে, সে কুফরী করবে।** মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

قل ابى الله وايته ورسوله كنتم تستهزؤون - لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم-

আপনি বলুন! তবে কি তোমরা মহান আল্লাহ, তাঁর আয়াত সমূহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি হাসি-তামাসা করছিলে ? তোমরা (আজ) কোন ওজর পেশ কর না। কারণ ঈমান আনার পর তোমরা কুফরী করেছিলে' (তওবা-৬৫-৬৬)। আমাদের দেশের অধিকাংশ অনুষ্ঠানে বিশেষ করে নাট্যানুষ্ঠানে খারাপ চরিত্রের (খলনায়কের ভূমিকায়) অভিনয়ের জন্য দাঁড়ি, টুপি ও ইসলামী বেশ-ভুষাকে সিম্বল বা প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পবিত্র আল-কুরআনের কোন শব্দ আয়াত কোন ঘটনা প্রসঙ্গে বিশেষ কোন নবীর নাম, কেউ কেউ এমন বিকৃতভাবে উচ্চারণ করেন যাতে বিদ্রূপ বুঝা যায়। এ ধরনের হাসি-ঠাট্টা, বিদ্রূপ উদ্দেশ্যেমূলক হোক বা হাসি-ঠাট্টামূলক হোক উভয়ই কুফর।

ষষ্ঠ কারণ ঃ - مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদেরকে সহযোগিতা ও সমর্থন করা। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لايهدى القوم الظلمين- 'তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, নিশ্চয় সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। বস্তুতঃ মহান আল্লাহ জালেমদেরকে হেদায়াত দান করেন না' (মায়েদাহ-৫১)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেন, 'যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য অনুকরণ করবে, সে সেই জাতিরই অন্তর্ভুক্ত হিসাবে গণ্য হবে'। (আবুদাউদ হা/৪০৩১; মিশকাত হা/৪৩৪৭)। যেমন আমাদের সমাজে এক শ্রেণির ঝড়-পধষষবফ বুদ্ধিজীবী রয়েছে যারা নিজেদের চিন্তা-চেতনা, বক্তব্য ও লেখনী শক্তি দিয়ে পৌত্তলিকদের সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা ও নানাভাবে কো-অপারেশান করে যাচ্ছে। কেউবা কবি রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠকে 'ইবাদাত' তুল্য বলে তার পৌত্তলিক কাব্য সাহিত্যের প্রচার-প্রসার কল্পে বিভিন্ন ধরনের কো-অপারেশান করছে। সাহিত্যের প্রচার-প্রসার কল্পে বিভিন্ন ধরনের কো-অপারেশান করছে। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও ভার্সিটির পাঠ্য পুস্তকসমূহ থেকে নামী-দামী মুসলিম লেখকদের সুন্দর সুন্দর নৈতিক,আদর্শিক সমাজ গঠন মূলক লেখাগুলো বাদ

দিয়ে অমুসলিম লেখকদের ঈমান বিধ্বংসী লেখাগুলো পাঠ্য-পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করে মুসিলম লেখকদের বিরুদ্ধে মুশরিক্ব লেখকদের সাহায্য করছে। আবার কেউবা কোন কোন অঞ্চলে চুক্তি করে পৌত্তলিকদের লালন-পালন করছে ও মুসলিমদের দমন করছে। এভাবে নামধারী মুসলিম সাংবাদিকরা ইয়াহুদ-নাসারা ও পৌত্তলিকদের পক্ষে আর মুসলিমদের বিপক্ষে সংবাদ পরিবেশন করে থাকে দুনিয়ার হীন স্বার্থে। এসবই স্পষ্ট ও সর্বসম্মত কুফরী কাজ।

সপ্তম কারণ ঃ من لم يكفر المشركين او شك فى كفرهم او صحح مذهبهم كفر **যে ব্যক্তি মুশরিকদেরকে কাফের বলে না কিংবা তাদের কুফরীতে সন্দেহ পোষণ করে, অথবা তাদের মতবাদকে সঠিক মনে করে, কে কুফরী করে।** মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا - অর্থাৎ 'সুতরাং যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন নেক আমাল করে এবং তার রবের ইবাদাতে কাউকে শরীক না করে' (সূরাহ কাহাফ-১১০)। হাদীসে এসেছে, 'আবু হুরায়রা রাজিআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেছেন, বরকতময় মহান আল্লাহ বলেন, আমি শিরককারীদের শিরক থেকে মুক্ত। যে ব্যক্তি কোন আমাল করে আর তাতে আমাকে ছাড়া অন্যকে শরীক করে, আমি তাকে এবং তার শরীককে বর্জন করি। (মুসলিম হা/৭৬৬৬)।

অষ্টমত ঃ যাদু টোনা করা। এর মধ্যে রয়েছে কাউকে আপোষ করার জন্য কিংবা বিচ্ছিন্ন করার জন্যে যাদু-টোনা করা অথবা ভেলকিবাজি। ভালোবাসা সৃষ্টি করে বলে কথিত আংটি বা বয়লা। যে ব্যক্তি এ কাজ করল অথবা এতে সন্তুষ্ট হলো, সে কুফরী করল। এর প্রমাণ মহান আল্লাহর বাণী-(বাক্বারা-১০২)

ولقد علموا لمن اشتراه ما له فى الاخرة من خلاق-

অর্থাৎ তারা ভালোভাবে জানে যে, যে ব্যক্তি যাদু অবলম্বন করে তার জন্যে আখিরাতে কোন পাওনা নেই।

পাক-ভারত বাংলাদেশের পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যাদু-টোনা ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে। স্বামীর মন আকৃষ্ট করার জন্য স্ত্রী কর্তৃক বা স্ত্রীকে বশে রাখার জন্য স্বামী কর্তৃক যাদু টোনা ও তাবিজ-তুমার করা নিত্য-নৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রেমিক-প্রেমিকার বিষয়টিও অনুরূপ। আবার ছেলে যাতে স্ত্রীর প্রতি অধিক আসক্ত হয়ে পিতা-মাতাকে ভুলে না যায় সে লক্ষ্যেও পিতা-মাতা ছেলের জন্য যাদু-টোনা করে থাকেন। তেমনিভাবে মেয়ে

জামাতাকেও মেয়ের প্রতি সর্বদা আসক্ত রাখার জন্য শ্বাশুড়ীগণ যাদু-টোনা করে থাকেন। শত্রুকে ক্ষতিগ্রস্থ করা বা মেরে ফেলার জন্য যাদু-টোনার ব্যবহার আমাদের সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। যাদু কুফর হওয়ার কারণে এসব ব্যক্তির ইসলাম ভঙ্গ হয়ে যায়।

নবমতঃ যদি কেউ মনে করে যে, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমার শারীআত থেকে বের হয়ে অন্য শারীআতেও যেতে পারে বা যাওয়া যায়; যেমন কিছু লোক ধারণা করে যে, খিজির আলাইহিস সালাম মুসা আলাইহিস সালাম এর শারীআত থেকে বের হয়ে গিয়েছিলেন। এ ধারণা পোষণকারীগণ কাফির। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ সূরাহ আলে-ইমরানের ১৯-নং আয়াতে বলেন, "(ان الدين عند الله الاسلام) নিশ্চয় মহান আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত দ্বীন হলো ইসলাম।" এ বিষয়ে সূরাহ আলে ইমরানের ৮৫-নং আয়াতে আরো বলেন, "(ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه- وهو فى الاخرة من الخسرين- যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন সন্ধান করবে কস্মিনকালেও তার থেকে তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

আমাদের দেশের কিছু সুফীবাদী মনে করে যে, কিছু কিছু মানুষ (চেষ্টা-সাধনার) মাধ্যমে এমন পর্যায়ে উপনীত হতে পারে যে, তখন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমার শারীআত মান্য করা তার আর প্রয়োজন থাকে না। এ ব্যাপারে তারা মূসা আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা ও খিজির আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা-এর ঘটনাকে তাদের এ ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। অথচ সে ঘটনার সাথে তাদের এ ধারণার আদৌ কোনো সামঞ্জস্য নেই। কেননা, খিজির আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা মুসা আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় তার নবুয়াত সীমানার বাইরে ছিলেন। তাই তিনি মূসা আলাইহিস সালামের শারীআতের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তাছাড়া মূসা আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা গোটা পৃথিবী ও সকল সম্প্রদায়ের নবী ও রাসূল ছিলেন না। অনেক ভ্রান্ত বাতিনী মারেফাতপন্থী ব্যক্তিবর্গ নিজেদের রাসূল-এর শারীআতের বাইরে মনে করে। তারা বলেন, আমরা তো হাক্বীকাতের মঞ্জিলে পৌঁছে গেছি। অতএব সর্বসাধারণের জন্য উপযোগী শারীআত আমাদের আর কোন প্রয়োজন নেই। অথচ প্রিয় নবীজী বলেন, " ঐ সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ নিহিত রয়েছে, এই উম্মাতের ইয়াহুদী হোক আর নাসারা (বা খ্রিষ্টান) হোক আমার সম্পর্কে শোনার পর যদি আমার প্রতি এবং আমি যা নিয়ে প্রেরিত

হয়েছি তার প্রতি ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করে অবশ্যই সে জাহান্নামের অধিবাসীদের মধ্যে গণ্য হবে।" (মুসলিম)

দশমত ঃ যে মহান আল্লাহর দ্বীন থেকে বিমুখ। দ্বীন শিক্ষাও করে না, এর প্রতি আমলও করে না।

মহান আল্লাহ বলেন, ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها – انا من المجرمين منتقمون ('যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের নির্দশনাবলী দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার অপেক্ষা অধিক জালিম আর কে ? আমি অবশ্যই অপরাধীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি' (সাজদাহ-২২)। মহান আল্লাহ বলেন, قل اطيعوا الله والرسول – فان تولوا فان الله لا يحب الكفرين- ('(হে নবী!) আপনি বলুন, তোমরা মহান আল্লাহ ও রাসূলের অনুসরণ কর, কিন্তু যদি তারা ফিরে যায়, তবে নিশ্চয় মহান আল্লাহ অবিশ্বাসীদের ভালোবাসেন না' (আলে ইমরান-৩২)। অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন, ويقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك- وما اولئك بالمؤنين 'তারা বলে আমরা মহান আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-এর প্রতি ঈমান আনলাম এবং আমরা আনুগত্য স্বীকার করলাম, কিন্তু এরপর তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়; বস্তুতঃ তারা মুমিন নয়। (নূর-৪৭)। অতএব দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে দ্বীন ত্যাগ করা ইসলাম ও ঈমান বিনষ্টের কারণ।

জ্ঞাতব্য ঃ ইসলাম ভঙ্গের কারণগুলোর একটি বা একাধিক কারণ কারও নিকট পাওয়া গেলে তাকে কাফির বলা যাবে না যতক্ষণ কাফির হওয়ার শর্তাবলী ও প্রতিবন্ধকের কারণসমূহ অনুসন্ধান না করা হবে। অন্যথায় কাফির ফতোয়া দানকারীর উপরই এ বিধান প্রযোজ্য হতে পারে।

কাফির, মুশরিক বা বিদ'আতী বলার শর্তাবলী

কাউকে শিরক বা বিদ'আত করতে দেখলে তাকে কাফির, মুশরিক বা বিদ'আতী বলার তিনটি মূলনীতি রয়েছে। যথা-

১। জ্ঞান থাকা ঃ যে অপরাধের কারণে কোন ব্যক্তিকে কাফির (মুশরিক্ব বা বিদ'আতী) বলা হচ্ছে সে অপরাধ করলে কাফির হয় বলে কুরআনে সহীহ সুন্নাহ দলীল প্রমাণিত হতে হবে এবং এ বিষয়ে উক্ত ব্যক্তির জ্ঞান থাকতে হবে। যদি এ বিষয়ের উক্ত ব্যক্তির জ্ঞান না থাকে তাহলে কুফরী (শিরক-বিদ'আত) কাজের জন্য তাকে কাফির বলা যাবে না। বরং এক্ষেত্রে তাকে উপযুক্ত পন্থায় সংশয়মুক্ত জ্ঞান দান করতে হবে। তা না করে কাফির বললে নিজেই কাফির হয়ে যাবে। কারণ কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে কাফির

বলা ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইকে কাফির বলে সম্বোধন করবে, সত্যিকার অর্থে সে যদি কাফির না হয় তাহলে সম্বোধনকারী ব্যক্তিই কাফির হয়ে যাবে। (বুখারী ৬১০৪, মুসলিম ৬০) মহান আল্লাহ বলেনঃ

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم- وساءت مصيرا-

"কোন লোকের নিকট হিদায়াত প্রকাশ হবার পরেও যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-এর সাতে বিরোধিতা করে আর মুমিনদের পথ ছেড়ে দিয়ে অন্যদের পথ অনুসরণ করে আমি তাকে সে পথেই চালাই যে পথে সে চলেছে এবং তাকে জাহান্নামের নিক্ষেপ করব। আর তা জঘন্যতম আবাসস্থল।" (আন-নিসা-১১৫)।

এজন্য হাক্কানী আলিমগণ বলেছেন যে, নতুন মুসলিমদেরকে যারা এখনও ফরযসমূহ ও সুন্নাতসমূহ জানতে পারেনি, তারা যদি ফরয কাজগুলোকে অস্বীকার করে, তাহলে কাফের বলা যাবে না। আর শর্ত যা শাইখ উসাইমীন বর্ণনা করেছেন যে, ওখানে অনেক সময় ধরে দাড়িয়ে থাকতে হবে। অর্থাৎ কোন মুসলিমকে কোন কথা, কাজ বা এতেক্বাদ বিশ্বাসের কারণে কাফের বলা বলা যাবে না, যতক্ষণ না তার বিরুদ্ধে কোন দলিল পাওয়া যাবে এবং তার ভিতরে যত সন্দেহ আছে সব দূরীভূত হবে। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا -

অর্থাৎ "কোন সম্প্রদায়কে আমি ততক্ষণ পর্যন্ত আযাব প্রদান করি না যতক্ষণ তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ না করি।" (ইসরা-১৫)

وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هدهم حتى يبين لهم ما يتقون- ان الله بكل شئ عليم -

মহান আল্লাহ আরও বলেন ঃ " মহান আল্লাহ কোন জাতিকে হিদায়াত করার পর ততক্ষণ পর্যন্ত পথভ্রষ্ট করেন না, যতক্ষণ তাদেরকে সেসব বিষয় বলে দেওয়া হয় যা থেকে তাদেরকে বেঁচে থাকা উচিত।" (আত্-তাওবা: ১১৫)

ولو انا اهلكنهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لو لا ارسلت الينا رسولا فنتبع ايتك من قبل ان نذل ونخزى -

"আমি যদি তাদেরকে ইতিপূর্বেই কোন আযাব দ্বারা ধ্বংস করে দিতাম তবে তারা বলত, হে মহান আল্লাহ! আপনি আমাদের নিকট কোন রাসূল পাঠাননি। আমরা জালিম ও অপদস্ত হবার পূর্বেই

আয়াতসমূহের অনুসরণ করতাম।" (ত্বাহা-১৩৪) মহান আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ تكاد تميز من الغيظ- كلما القى فيها فوج سألهم خزنتها الم يتكم نذير- قالوا بلى قد جاءنا نذير- فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شئ- ان انتم الا فى ضلل كبير- অর্থাৎ "রোষে যেন জাহান্নাম ফেটে পড়বে; যখন এক একটি দলকে জাহান্নাম নিক্ষেপ করা হবে, তখন জাহান্নামের দ্বার রক্ষীরা জিজ্ঞেস করবেন, তোমাদের নিকট কি কোন ভয় প্রদর্শনকারী আসেননি ? তারা বলবে, হ্যাঁ, অবশ্যই এসেছিলেন কিন্তু আমরা তাদেরকে মিথ্যুক ভেবেছিলাম এবং বলেছিলাম যে, মহান আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেননি। তোমরা বড়ই গুমরাহীর মধ্যে পড়ে আছো।" (মুলক: ৮-৯)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেন ঃ এক ব্যক্তি নিজের প্রতি অবিচার করল ঃ কিন্তু যখন তার মৃত্যু উপস্থিত হলো, আপন সন্তানদের ওসিয়ত করল, যখন সে মরে যাবে তখন তাকে যেন পুড়ে ফেলা হয়, অতঃপর তার আধা ভাগ স্থলে আর আধা সমুদ্রে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। মহান আল্লাহর কসম! যদি তিনি তাকে ধরতে সক্ষম হন, তবে এমন শাস্তি দিবেন যা জগতের কাউকে কখনও দেননি। যখন সে মরে গেল, তারা তার নির্দেশ অনুসারেই তা করল। অতঃপর মহান আল্লাহ সমুদ্রকে হুকুম দিলেন, তার মধ্যে যা ছিল তা একত্র করে দিল। এভাবে স্থলকে নির্দেশ দিলেন, স্থল তার মধ্যে যা ছিল তা একত্র করে দিল। অতঃপর মহান আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন তুমি এরূপ করেছিলে ? সে বলল, তোমার ভয়ে রব, তুমি তা জান। এতে মহান আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/২২৫৯)

অতএব এ হাদীস থেকে বুঝা গেল যে, মহান আল্লাহর ভয়তো তাঁর ছিল। কিন্ত পরকালে মহান আল্লাহ পুনরায় একত্রিত করে পাকড়াও করবেন এ সম্পর্কে সে অজ্ঞ ছিল। বিধায় তাকে মুশরিক্ব বলা যাবে না। যেমন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল বিভ্রান্ত জাহামিয়াদেরকে বলেছিলেন ঃ তোমরা যেরূপ কথাবার্তা বল, আমিও যদি সেরূপ বলতাম তাহলেতো কাফির হয়ে যেতাম। কিন্তু তোমাদেরকে আমি কাফির বলতে পারছিনা। কারণ তোমরা আমার কাছে অজ্ঞ। (ফিতনাতুন তাকফীর ৬৩ পৃঃ ইঃ জঃ ৭০ পৃঃ)

২। ক্ষমতা ও স্বাধীনতা থাকা ঃ যে অপরাধের কারণে কোন ব্যক্তিকে কাফির বলা হবে, সে অপরাধ করলে কাফির হয় বলে কুরআন-হাদীসের দলীল প্রমাণিত হতে হবে এবং তা বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের ক্ষমতা ও স্বাধীনতা থাকতে হবে। যদি ক্ষমতা ও স্বাধীনতা না থাকার কারণে কুফরী কাজ করে তবে কাফির

من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله – ولهم عذاب عظيم - অর্থাৎ "যার উপর জবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে সে ব্যতীত যে কেউ বিশ্বাসী হওয়ার পর মহান আল্লাহতে অবিশ্বাসী হয় এবং কুফরীর জন্য মন উন্মুক্ত করে দেয়, তাদের উপর আপতিত হবে মহান আল্লাহর গজব এবং তাদের জন্যে রয়েছে শাস্তি।" (নাহল-১০৬)।

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে ব্যক্তিকে হত্যার হুমকি দিয়ে কুফরী কালাম উচ্চারণ করতে বাধ্য করা হয়, যদি প্রবল বিশ্বাস থাকে যে, হুমকিদাতা তা কার্যে পরিণত করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখে তবে এমন জবরদস্তির ক্ষেত্রে সে যদি মুখে কুফরী কালাম উচ্চারণ করে, তবে শর্ত এই যে, তার অন্তর ঈমানে অটল থাকতে হবে এবং কুফরী কালামকে মিথ্যা ও মন্দ বলে বিশ্বাস করতে হবে। (কুরতুবী, মাযহারী, মা আরেফুল কুরআন-৭৭৫ পৃষ্ঠা)

আলোচ্য আয়াতটি কতিপয় সাহবী সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়, যাদেরকে মুশরিকরা গ্রেফতার করেছিল এবং হত্যার হুমকি দিয়ে কুফরী অবলম্বন করতে বলেছিল। যারা গ্রেফতার হয়েছিলেন, তাঁরা ছিলেন আম্মার, তদীয় পিতা ইয়াসির, মাতা সুমাইয়া, সুহায়েব, বেলাল এবং খাব্বাব রাজিআল্লাহু আনহুম। তাঁদের মধ্যে ইয়াসির ও তদীয় সহধর্মিনী সুমাইয়া কুফরী কালাম উচ্চারণ করতে সম্পূর্ণ অবীকার করেন। ইয়াসির রাজিআল্লাহু আনহুকে হত্যা করা হয় এবং সুমাইয়া রাজিআল্লাহু আনহাকে দু'উটের মাঝখানে বেঁধে উট দু'টিকে হাঁকিয়ে দেওয়া হয়। ফলে তিনি দ্বিখণ্ডিত হয়ে শহীদ হন। এ দু'জন মহাত্মাই ইসলামে সর্বপ্রথম শাহাদাত বরণ করেন। এমনিভাবে খাব্বাবও কুফরী কালাম উচ্চারণ করতে অস্বীকার করে হাসিমুখে শাহাদাত বরণ করে নেন। তাঁদের মধ্যে আম্মার প্রাণের ভয়ে কুফরী কালাম মৌখিক স্বীকারোক্তি করলেও তাঁর অন্তর ঈমানে অটল ছিল। শত্রুর কবল থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-এর খেদমতে উপস্থিত হন। তখন অত্যন্ত দুঃখের সাথে ঘটনাটি বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি যখন কুফরী কালাম বলছিলে, তখন তোমার অন্তরের অবস্থা কি ছিল ? তিনি আরয করলেনঃ আমার অন্তর ঈমানের উপর স্থির এবং অটল ছিল ? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা তাকে আশ্বাস দেন যে, তোমাকে এজন্যে কোন শাস্তি ভোগ করতে হবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-এর সিদ্ধান্তের সত্যায়নেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। (তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন ৭৫৭ পৃষ্ঠা)

৩। স্মরণ ও ইচ্ছা থাকা ঃ যে অপরাধের কারণে কোন ব্যক্তিকে কাফির বলা হবে, সে অপরাধ করলে কাফির হয় বলে পবিত্র কুরআন-হাদীসের দলীল প্রমাণিত হতে হবে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে সে অপরাধে জড়িত হওয়া প্রমাণিত হতে হবে। যদি অনিচ্ছায় বা ভুলক্রমে উক্ত অপরাধে জড়িত হয় তবে তাকে কাফির বলা যাবে না। অনিচ্ছায় কয়েকটি দিক হতে পারে। যেমন কাউকে শিরক বা বিদ'আত করতে বাধ্য করা হচ্ছে। যাকে করানো হচ্ছে সে কাজটাকে কুফর, শিরক বা বিদআত জানে। কিন্তু তাকে যেহেতু কাজটা করতে বাধ্য করা হচ্ছে। সেহেতু তাকে কাফির, মুশরিক্ব বা বিদ'আতী বলা যাবে না।

যেমন সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেন ঃ মহান আল্লাহ তাঁর বান্দার তাওবায় তোমাদের ঐ ব্যক্তির চেয়েও বেশি আনন্দিত হন যার খাদ্য ও পানীয় সহ তার উট মরুভূমিতে হারিয়ে গেল। সে নিরাশ হয়ে এক গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়ল। এহেন নিরাশ অবস্থায় হঠাৎ তার নিকট সেই উটটিকে দাঁড়ানো দেখতে পেয়ে সে তার লাগাম ধরে ফেলল এবং আনন্দের আতিশয্যে বলে উঠল, **হে মহান আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা, আমি তোমার প্রভু! সে আনন্দের আতিশয্যেই ভুল করে ফেলেছে।** (বুখারী, মুসলিম, রিয়াজুস সালিহীন **১**ম খণ্ড-২৭ পৃষ্ঠা) উল্লেখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, ভুলক্রমে মহান আল্লাহকে বান্দা বললেও কাফির হয় না (মহান আল্লাহ সর্বজ্ঞ)। উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত তিনটি বিষয় যথা- **জ্ঞান, ক্ষমতা ও স্বাধীনতা, স্মরণ ও ইচ্ছা না থাকার কারণে যদি কোন ব্যক্তি কুফর, শিরক, বিদআত করে তবে কাজটিকেতো কুফর, শিরক, বিদআত বলা যাবে কিন্তু তা সম্পাদনকারীকে কাফির, মুশরিক্ব বা বিদআতী বলা যাবে না।**

শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহাব রহিমাহুল্লাহ বলেনঃ কোন ব্যক্তি যদি ইসলামী বিধান সম্পর্কে না জেনে আবদুল কাদির জ্বিলানী রহিমাহুল্লাহ অথবা সাইয়্যিদ বাদাবী রহিমাহুল্লাহর কবরে সিজদা করে, তা হলে তাকে (সরাসরি) কাফির আখ্যা দেওয়া যাবে না। তবে ইসলামের বিধান ও দলীল সম্পর্কে জানার পরেও যদি সিজদা করে তাহলে সে কাফির। (ফিতনাতুত তাকফীর-৬৩ পৃষ্ঠা) শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেন ঃ সেই সব মুসলিমদেরকে আমরা কাফির আখ্যা দিতে পারি না কারণ তাদের নিকট কাফির আখ্যা দানের দলীলগুলো স্পষ্ট করে উপস্থাপন করা

হয়নি। কেননা আমাদের নিকট যথেষ্ট পরিমাণ দা'ঈ (প্রচারক) নেই যারা জনগণের দ্বারপ্রান্তে নির্ভেজাল তাওহীদের দা'ওয়াত পৌঁছাতে সক্ষম। (ফিতনাতুত তাকফীর ৭৪ পৃষ্ঠা)

সম্মানিত মুমিন মুসলিম ভ্রাতাগণ! উল্লেখিত দলিল প্রমাণ দ্বারা বুঝা যায় কাফির আখ্যা দানের বিষয়টি অত্যন্ত ভয়াবহ। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে আমাদের দেশে ও অন্যান্য দেশে নানা খোঁড়া অজুহাত দেখিয়ে (অর্থাৎ কুফরাম বাওয়াহা প্রমাণ না করে) রাষ্ট্র পরিচালনাকারী শাসক গোষ্ঠী ও সাধারণ মুসলিমদের কাফির ও ফাসিক আখ্যাদানের মাধ্যমে তাদের জান-মাল হালাল করা হচ্ছে। যার ফলে বোমাবাজি, হত্যাকাণ্ড ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকেও ইসলাম মনে করে ইসলামের নামে অনৈসলামী কর্মকাণ্ড ঘটিয়ে ইসলাম ও মুসলিমকে সংঘাতের মুখে ঠেলে দিচ্ছে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকার কারণে। এমনিভাবে সহীহ আক্বীদার দাবীদার কিছু দাঈ ও খ্যাতনামা টিভির বক্তাদের কেউ ছোট খাটো ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে মুসলিমদের কে কাফের ও খারেজি আখ্যা দিতে শোনা যাচ্ছে। যা আহলে সুন্নাহ/হাদীসের আক্বিদা পরিপন্থী এবং খুবই বেদনাদায়ক। এক্ষেত্রে ঐ সকল দাঈ ভাইদের দলিয় গুড়ামী পরিহার করে দ্বীনের স্বার্থে আরও উদার হওয়ার আহ্বান করছি। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিক বুঝ দান করুন। (ঈমান ও ইসলাম বিনষ্টের কারণগুলি আপনি জানেন কি ?)

হে মহান আল্লাহ! আপনি সকল মুসলিম ও মুসলিমাহকে কুফর, শিরক, নিফাক ও বিদআত থেকে হিফাযাত করে নির্ভেজাল তাওহীদ ও সুন্নাহের পথে চলার তাওকফীক দান করুক। আমীন।

তাগুতের সাথে কুফরী করা

তাওহীদের মৌলিক উপাদান বা রুকন দুইটি

তাওহীদের প্রথম রুকন বা মৌলিক বিষয় হচ্ছে, "তাগুতকে অস্বীকার করা" আর দ্বিতীয় রুকন বা মৌলিক বিষয় হচ্ছে, "অদ্বিতীয় মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা"। তার প্রমাণ হচ্ছে সূরাহ বাক্বারার ২৫৬নং আয়াত,

فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ -

"ফামাই ইয়াকফুর বিত্ তাগুত ওয়া ইউমিম্বিল্লাহি ফাক্বদিস তামসাকা বিল উরওয়াতিল উসক্ব লান ফিছামা লাহা ওয়াল্লাহু ছামিউন আলিম অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করবে ও মহান আল্লাহর উপর ঈমান আনবে সে

এমন এক মজবুত হাতল ধরবে যা কখনো ছিঁড়ে যাবার নয়। আর মহান আল্লাহ্ হলেন সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাময়।"

উপরে উল্লেখিত আয়াতে কালিমায় لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু কে বুঝানো হয়েছে। এটাই মূলত : তাওহীদের কালিমা। যেমন এ বিষয়ে প্রিয় নবীজী বলেছেন, "যে ব্যক্তি لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ বললো আর মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য সকল উপাস্যকে অস্বীকার করলো তার জান ও মাল পবিত্র (অর্থাৎ কাফিরদের জান ও মালের মত গণীমতের মাল নয়) এবং তার হিসাবের ভার মহান আল্লাহর উপরই ন্যস্ত (অর্থাৎ মনের কুফরী বিচার মহান আল্লাহই করবেন)।" (মুসলিম)

আমরা অত্র অধ্যায়ে শুধুমাত্র তাওহীদের প্রথম রুকন নিয়ে সংক্ষেপে আলোচন করব। আর তাওহীদের দ্বিতীয় রুকন সম্পর্কে জানতে হলে মৎ প্রণীত "সত্যিকারের মুমিন-মুসলিমের পরিচয়" নামক পুস্তকটি দয়া করে পাঠ করুন।

প্রথম রুকন ঃ তাগুতকে অস্বীকার করা

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা (মহান আল্লাহ আপনাদেরকে সরল ও সঠিক পথের দিশা দান করুন) আপনাদেরকে জেনে রাখতে হবে যে, তাগুতের কুফরী ব্যতীত একজন বান্দা কখনো "মুওয়াহিদ" (তথা মহান আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী) হতে পারে না। আর তাগুত কি জিনিস তা জানা ব্যতীত তাগুতকে অস্বীকার করা কখনো সম্ভব নয়।

আভিধানিকভাবে তাগুতের সংজ্ঞা

তাগুত আরবী তুগইয়ান শব্দ থেকে উৎসারিত। যার অর্থ সীমালংঘণ করা, অবাধ্যতা, জুলুম বা অন্যায়ের ক্ষেত্রে সীমালংঘণ কারীকে 'তাগী' বা সীমালংঘণ কারী বলা হয়। অত্যধিক সীমালংঘন কারীকে 'তাগীয়াহ' বলা হয়। কঠিনতম সীমালংঘন কারী বা মহা অবাধ্যকে 'তাগুত' বলা হয়। এভাবে আমরা দেখছি যে, আভিধানিকভাবে 'তাগুত' অর্থ মহা সীমালংঘন কারী। (জাইনুদ্দীন রাজী, মুখতারুস সিহাহ পৃষ্ঠাঃ ১৬৫)।

আভিধানিকভাবে সকল সীমালংঘণ কারীকে তাগুত বলা হয়। তবে পবিত্র কুরআনের পরিভাষায় 'তাগুত' অর্থ শাইত্বন। এছাড়া মহান আল্লাহকে ছাড়া যা কিছুর ইবাদাত, পূজা বা উপাসনা করা হয় তাকে 'তাগুত' বলা হয়। (বাকারা- ২৫৭, নিসা- ৭৬, বুখারী আস- সহীহ ৪/১৬৭৩, তাবারী, তাফসীর- ৩/১৮-১৯)। যেমন মহান আল্লাহ্ সুবহানা ওয়া তা'আলা সূরাহ হাক্কার ১১ নং আয়াতে বলেন ঃ - إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ

অর্থাৎ যখন জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল তখন আমি তোমাদেরকে চলন্ত নৌযানে আরোহণ করিয়াছিলাম।" এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, যখন পানি বৃদ্ধি পেয়ে তার সীমা অতিক্রম করেছিল ।

শরীয়াতের পরিভাষায় তাগুতের সংজ্ঞা

এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই 'তাগুত' যে মহান আল্লাহদ্রোহী হয়েছে এবং সীমা লংঘণ করেছে কোন হককে নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করেছে এবং এমন বিষয়ে নিজেকে মহান আল্লাহর সাথে সমকক্ষ বানিয়েছে, যা একমাত্র মহান আল্লাহর খাস।

কোন মাখলুক (সৃষ্টি) কর্তৃক মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার কার্যাবলীর যে কোন কার্য সম্পাদনের বিষয়টি নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করা যেমন সৃষ্টি করা, রিজিক দান অথবা শরীআত (তথা বিধান) রচনা। এসব বিষয়গুলো সম্পাদনের ব্যাপারকে যে ব্যক্তি নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করবে অর্থাৎ কেউ যদি বলে, আমি সৃষ্টি করি, আমি রিজিক দান করি, আমি বিধান (তথা আইন-কানুন) রচনা করি, সেই তাগুত।

এ সংজ্ঞাটি উত্তম এবং ব্যাপক অর্থজ্ঞাপক মহান আল্লাহ্ ব্যতীত যারই ইবাদাত করা হয়, এমন সব কিছুই এ সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। যে সব মাবুদ (উপাস্য) কে তাগুত হিসাবে গণ্য করা হয় সে গুলোর মধ্যে মূর্তি, এমন সব কবর, গাছ, পাথর ও অচেতন পদার্থ যেগুলোর উপাসনা করা হয়। মহান আল্লাহর আইন ব্যতীত এমন সব আইন যার মাধ্যমে বিচার ফায়সালা চাওয়া হয়। এমন সব বিচারক তাগুতের অন্তর্ভুক্ত যারা মহান আল্লাহর আইনের বিরোধি আইন দ্বারা মানুষের মধ্যে বিচার ফায়সালা করে। শাইত্বন, যাদুকর, গণক (যারা ইলমে গায়েবের বিষয়ে কথা বলে), উপাস্য হতে যারা রাজী, যারা নিজেদেরকে কোন কিছু হালাল, হারাম করা ও আইন রচনা করার অধিকার রাখে বলে মনে করে, তারা সবাই তাগুত। তাদেরকে অস্বীকার করা ওয়াজিব। তাদের কাছ থেকে এবং তাদেরকে যারা উপাসনা করে উভয়ের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান অতি আবশ্যক ।

প্রধান প্রধান তাগুত

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ), ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (রহিমাহুল্লাহ) এবং সৈয়দ আবুল আলা মওদুদী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন ঃ তাগুতের সংখ্যা অনেক। তবে পাঁচ ধরনের তাগুত নেতৃত্বের আসনে রয়েছে।

(এক) গাইরুল্লাহর (মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু) ইবাদাতের দিকে আহবানকারী শাইত্বন। যেমন এ বিষয়ে মহান আল্লাহ সূরাহ ইয়াসীনের ৬০-৬১ নং আয়াতদ্বয়ে বলেন :

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ - وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ -

"আলাম আহাদ ইলাইকুম ইয়া বাণী আদামা আল্লা তা'আবুদুশ শাইত্বনা ইন্নাহু লাকুম আদুউ উম মুবীন, ওয়া আনিবুদুনি হাজা সিরাতুম মুস্তাক্বীম" অর্থাৎ হে বানী আদম ! আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দেইনি যে, তোমরা শাইত্বনের ইবাদাত করো না। কেননা, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। আর (কেবলমাত্র খালিছভাবে একনিষ্ঠ হয়ে) আমারই ইবাদাত কর, এটাই হল সরল পথ ।"

(দুই) মহান আল্লাহর আইন পরিবর্তনকারী জালিম শাসক এবং মানুষের তৈরী শাসনতন্ত্র যে শাসক রাষ্ট্রে কায়েম করে। যেমন এ বিষয়ে মহান আল্লাহ সূরাহ নিসার ৬০নং আয়াতে বলেন ঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا -

অর্থাৎ আপনি কি তাদেরকে দেখেন নি, যারা দাবী করে যে, আপনার প্রতি যা নাজিল করা হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাজিল করা হয়েছে তার প্রতি ঈমান আনয়ন করেছে। তারা বিরোধপূর্ণ বিষয়কে ফায়সালার জন্য তাগুতের দিকে নিয়ে যেতে চায় অথচ তাদের প্রতি তাকে (তথা তাগুতকে) অমান্য করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।"

যেমন মহান আল্লাহর আইন পুরুষ ও মহিলা চোরের হাত কাটা। কিন্তু এই আইন পরিবর্তন করে অন্য যে কোন আইন প্রয়োগ করাই হচ্ছে তাগুতের কাজ । এছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর আইনের বাইরে যে কোন আইন প্রয়োগ করাই তাগুতের কাজ। পৃথিবীর যে ব্যক্তি বা দল এ কাজ করবে সেই তাগুত হবে। যেমন মহান আল্লাহ এ বিষয়ে বলেন :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ -

"ওয়াস সারিক্ব ওয়াস সারিক্বতা'উ আইদিয়াহুমা বিমা কাসাবা নাকালাম মিনাল্লাহি ওয়াল্লাহু আঝিঝুন হাকিম অর্থাৎ যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে তাদের হাত কেটে দাও তাদের কৃত কর্মের সাজা হিসেবে।

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে হুশিয়ারী মহান আল্লাহ্ পরাক্রান্ত জ্ঞানময়।" (মায়িদা- ৩৮)

যেমন কেউ যদি বলে, "কোন ব্যক্তি যদি কোন শিশুকে অথবা কোন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিকে সাগরে ডুবিয়ে মেরে ফেলে তাহলে তার কিসাস নেই। (হিদায়া- ৪/৫৬৬) ।

অথচ মহান রব্বুল আ'লামীন সূরাহ বাক্বারার ১৭৮ নং আয়াতে বলেন ঃ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى

"ইয়া আইউহাল্লাজীনা আমানু কুতিবা আলাই কুমুল কিসাস ফিল ক্বতলা অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের প্রতি হত্যার (বা নিহতদের) ব্যাপারে কিসাস গ্রহণ ফরজ করা হয়েছে।"

মহান আল্লাহ সূরাহ বাক্বারার ১৭৯-নং আয়াতে আরো বলেন :

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ -

"ওয়ালাকুম ফিল কিসাসি হাইয়্যাতুই ইয়া উলিল আলবাবী লাআল্লাকুম তাত্তাকুন অর্থাৎ হে বুদ্ধিমানগণ ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্যে জীবন যাতে তোমরা সাবধান হতে পার।"

উল্লেখিত সূরাহ বাক্বারার ১৭৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনু কাসীর তার প্রণীত জগৎবিখ্যাত তাফসীর ইবনু কাসীরে বলেন ঃ "আল্লাহ তা'য়ালার ইরশাদ হচ্ছে, হে জ্ঞানীরা ! তোমরা জেনে রেখো যে, কিসাসের মধ্যে মানবগোষ্ঠির অমরত্ব রয়েছে। এর মধ্যে বড় দূরদর্শিতা রয়েছে। যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে যে, একজনের পরিবর্তে অপরজন নিহত হচ্ছে, সুতরাং দু'জন মারা যাচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যদি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখা যায় তবে জানা যাবে যে, এটা জীবনেরই কারণ। হত্যা করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির স্বয়ং এই ধারণা হবে যে, সে যাকে হত্যা করতে যাচ্ছে তাকে হত্যা করা তার আদৌ উচিত হবে না। নতুবা তাকেও নিহত হতে হবে। এই ভেবে সে হত্যার কাজ হতে বিরত থাকবে। তাহলে দু'ব্যক্তি মৃত্যু হতে বেঁচে যাচ্ছে। (ইবনু কাসীর)

তিনি আরো বলেন, পূর্বের কিতাবসমূহের মধ্যেও তো মহান আল্লাহ তা'য়ালা এই কথাটি বর্ণনা করেছিলেন যে, আলক্বতলু আনফাল ক্বতলি অর্থাৎ হত্যা হত্যাকে বাঁধা দেয়, কিন্তু পবিত্র কুরআনুল কারীমের মধ্যে অত্যন্ত বাকপটুতা ও ভাষালংকারের সাথে এই বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর বলা হচ্ছে, 'এটা তোমাদের বেঁচে থাকার কারণ। প্রথমত ঃ তোমরা মহান আল্লাহপাকের অবাধ্যতা থেকে রক্ষা পাবে। দ্বিতীয়ত : না কেউ কাউকে হত্যা

করবে, না সে নিহত হবে। সুতরাং পৃথিবীতে সর্বত্র নিরাপত্তা ও শান্তি বিরাজ করবে। (ঐ)

(তিন) মহান আল্লাহ্ সুবহানা ওয়া তা'য়ালার নাজিলকৃত বিধি-বিধান, আইন-কানুন, হুকুম-আহকাম, রুলস-রেগুলেশান্স ছাড়া অন্য বিধানে দেশে ফায়সালা করে । যেমন ঃ এ বিষয়ে সূরাহ মায়িদায় মহান আল্লাহ্ বলেন :

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ -

"ওয়া মাললাম ইয়াহুকুম বিমা আনজালাল্লাহু ফাউলায়িকা হুমুল কাফিরুন অর্থাৎ যে সব লোক মহান আল্লাহ্ যা (তথা যে বিধি-বিধান, আইন-কানুন, হুকুম- আহকাম ইত্যাদি) অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী ফায়সালা করে না তারাই কাফির।" ঐ একই সূরাতে রব্বুল আ'লামীন আরো বলেন ঃ

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ -

"ওয়া মাললাম ইয়াহুকুম বিমা আনজালাল্লাহু ফাউলায়িকা হুমুজ জ্বলিমুন অর্থাৎ যেসব লোক মহান আল্লাহ্ যা (তথা আইন-কানুন) অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী ফায়সালা করে না তারাই জালিম।" ঐ একই সূরাহতে মহান আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা আরো বলেন,

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ -

"ওয়া মাললাম ইয়াহকুম বিমা আনজালাল্লাহু ফাউলায়িকা হুমুল ফাসিকুন অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ যা নাজিল করেছেন তদনুসারে যারা ফায়সালা করে না, তারাই পাপাচারী বা ফাসিক।" (মায়িদা - ৪৪,৪৫,৪৭)

এর দ্বারা এমন বিচারক বুঝান হয়েছে, যে মহান আল্লাহর শরীআতকে পরিবর্তনকারী কোন বিধান বা আইনের সাহায্যে বিচার ফায়সালা করে। যেমন : সারা বিশ্বে গণতান্ত্রিক বা যে কোন প্রক্রিয়ায় যে বিচার ব্যবস্থা মানুষ প্রবর্তন করে তা হচ্ছে তাগুতি ব্যবস্থা।

(চার) মহান আল্লাহ্ ব্যতীত যে ব্যক্তি ইলমে গায়েব জানে বলে দাবী করে। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেন :

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا -

অর্থাৎ তিনি আলিমুল গায়িব (অদৃশ্যের জ্ঞানী) বস্তুত ঃ তিনি স্বীয় গায়েবের (অদৃশ্য) বিষয় কারো কাছে প্রকাশ করেণ না।" (জ্বিন- ২৬) সূরাহ আনআমের ৫৯নং আয়াতে এ বিষয়ে মহান আল্লাহ্ আরো বলেন :

وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ -

অর্থাৎ আর অদৃশ্যের চাবী তারই নিকটে রয়েছে তিনি ব্যতীত অন্য কেহ তা জানে না। স্থল ও সমুদ্রভাগে যা কিছু আছে তা তিনিই জানেন তাঁর অজানাতে একটি পাতাও ঝরে পড়ে না। মাটির অন্ধকারে এমন কোন শষ্য কণাও অংকুরিত হয় না অথবা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কোন বস্তুই নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।"

(পাঁচ) মহান আল্লাহ্ ছাড়া যার ইবাদত করা হয় এবং এ ইবাদাত গ্রহণে যে রাজী বা সন্তুষ্ট থাকে। যেমন এ বিষয়ে মহান আল্লাহ্ সূরাহ আম্বিয়ার ২৯নং আয়াতে বলেন,

وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَـٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ -

অর্থাৎ তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বলবে যে, তিনি (মহান আল্লাহ্) ব্যতীত আমিই উপাস্য। এ কারনেই তাকে আমি জাহান্নামের শাস্তি দিব। আর এভাবেই আমি জালিমদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি ।

যেমন ঃ বাংলাদেশ ও উপমহাদেশের যে সমস্ত জীবিত বা মৃত পীরকে পূজা করা হয়। পীরের কাছে কোন কিছু চাওয়া, সন্তান চাওয়া, পীরকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা, পীরকে সিজদা দেওয়া, পীরের কবরের আশে-পাশে ঘোরা-ফেরা করা ও সলাত আদায় করা সমস্ত কাজগুলি মারাত্মক শিরক। মহান আল্লাহর আছে যার কোন ক্ষমা নেই। এই কাজগুলি যারাই করবে তারা তাগুতকে অনুসরণকারী হিসেবে মুশরিক ও কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

তাগুতকে কিভাবে অস্বীকার করতে হবে ?

পাঁচভাবে তাগুতকে অস্বীকার করা অপরিহার্য ঃ

(এক) তাগুতের ইবাদাত বাতিল ও আক্বীদা পোষণের মাধ্যমে :

মহান আল্লাহ্ সুবহানা তা'য়ালা ইরশাদ করেন :

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ -

"জালিকা বিআন্নাল্লাহা হুওয়াল হাক্কু ওয়া আন্না মা-ইয়াদউনা মিন দুনিহী হুওয়াল বাতিল ওয়া আন্নাল্লাহা হওয়াল আলিইউল কাবীর অর্থাৎ এটা এজন্য যে, মহান আল্লাহই প্রকৃত সত্য আর মহান আল্লাহ ছাড়া তারা যাকে ডাকে তা বাতিল ও অসত্য। মহান আল্লাহই সবার উচ্চে এবং মহান আল্লাহই মহান।" (হাজ্ব- ৬২)

(দুই) তাগুতকে পরিত্যাগ ও তাগুত থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে :

এর অর্থ হচ্ছে তাগুতের ইবাদাত পরিত্যাগ করা, পরিহার করা। যেমন এ বিষয়ে মহান আল্লাহ্ সূরা নাহলের ৩৬নং আয়াতে বলেন ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ -

'ওয়ালাক্বদ বাআছনা- ফীকুল্লি উম্মাতির রাসূলান আনি বুদুল্লাহা অজতানিবুদ তাগুত অর্থাৎ আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি এই মর্মে যে, তোমরা মহান আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তাগুতদেরকে বর্জন কর।'

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মহান আল্লাহর আইন হল কোন নর বা নারী চুরি করলে হাত কাটতে হবে, কিন্তু বর্তমানে আমাদের প্রচলিত সমাজের বা রাষ্ট্রের আইন হলো জেল বা জরিমানা। সুতরাং এখানে মহান আল্লাহর আইন পরিবর্তিত হচ্ছে। মহান আল্লাহর আইন যেই পরিবর্তন করুক আমরা তার বিরুদ্ধে। এটাই মহান আল্লাহর বিধান । মহান আল্লাহ্ সূরাহ হাজ্বের ৩০নং আয়াতে আরো বলেন ঃ - فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ

অর্থাৎ সুতরাং তোমরা মূর্তিদের অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাক ।"

এটা অবশ্যই জেনে রাখতে হবে যে, তাগুতের কাছে বিচার ফায়সালার জন্য গমন করা, তাদের মাধ্যমে সাহায্য কামনা করা এবং তাদের জন্য নজর মানা, মান্নত করা, তাদের ইবাদাত করার মধ্যেই শামিল। একথা জেনে রাখা প্রয়োজন যে, তাগুত তিনভাবে পরিত্যাগ করা যায়।

প্রথমত ঃ আক্বীদা বা বিশ্বাসগত ভাবে ।

দ্বিতীয়ত : কথার মাধ্যমে ।

তৃতীয়ত : কাজের মাধ্যমে ।

উপরে উল্লেখিত তিনটি ক্ষেত্রে বান্দা তাগুতকে পরিত্যাগ করতে না পারলে সম্পূর্ণরূপে তাগুতকে পরিত্যাগ করা সম্ভব নয়। কেননা, যে ব্যক্তি কথা ও কাজের মাধ্যমে তাগুতকে পরিত্যাগ করে কিন্তু আক্বীদাগতভাবে পরিত্যাগ করে না, তার অবস্থা মুনাফিকের মত ।

যে ব্যক্তি আক্বীদাগতভাবে তাগুতকে পরিত্যাগ করে কিন্তু কাজের মাধ্যমে পরিত্যাগ করে না তার অবস্থা ঐ ব্যক্তির মতো, যে তাগুতকে সিজদা করে অথবা তার উদ্দেশ্যে মান্নত করে অথবা বিচার ফায়সালার জন্য তাগুতের কাছে যায়। আবার এ দাবীও করে যে তার আক্বীদা শুদ্ধ আছে।

শেখ সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ্ তার তাইসীরুল আজীজির হামীদ নামক গ্রন্থের ৪১৯ নং পৃষ্ঠায় বলেন, যে ব্যক্তি তাগুতের কাছে বিচার ফায়সালা নিয়ে যায়, সে মুমিন ও নয় এমনকি মুসলিম ও নয়। অথচ আমরা আজ যে বিচার ব্যবস্থার অধীনে তা তাগুতি বিচার ব্যবস্থা। সুতরাং আমাদেরকে সাবধান হতে হবে।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এই জন্যই যে ব্যক্তির কাছে মহান আল্লাহর কিতাব ছাড়া বিচার ফায়সালা চাওয়া হয়, তাকেই তাগুত নামে আখ্যায়িত করা হয় অর্থাৎ মহান আল্লাহর কিতাব ছাড়া বিচার ফায়সালা তাগুত। (মাজমুউল ফতোয়া)

হাফেজ ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন ঃ প্রত্যেক কওমের ঐ ব্যক্তিই হচ্ছে তাগুত, কওমের লোকেরা মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে বাদ দিয়ে যার কাছে বিচার ফয়সালা চায়। (এলামু মুকিঈন)

(তিন) দুশমনি বা শত্রুতার মাধ্যমে :

মহান আল্লাহ্ সুবহানা ওয়া তা'য়ালা সূরাহ শুআরার ৭৫-৭৭ আয়াতে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা এর ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :

قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ - أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ - فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ -

অর্থাৎ তোমরা এবং তোমাদের বাপদাদারা যে সব জিনিসের ইবাদাত করে আসতেছো সেগুলি কি কখনো তোমরা চোখ মেলে দেখেছ ? এরা সবাইতো আমার দুশমন একমাত্র রব্বুল আলামীন ছাড়া।"

(চার) ক্রোধ ও ঘৃণার মাধ্যমে :

মহান আল্লাহ্ এ বিষয়ে সূরাহ মুমতাহিনার ৪নং আয়াতে বলেন ঃ

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا -

অর্থাৎ তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাঁর সঙ্গীগণের মধ্যে সুন্দর আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল ঃ তোমাদের সাথে এবং তোমরা মহান আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদাত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমরা যতক্ষণ না একক মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, ততক্ষণ তোমাদের ও আমাদের মধ্যে থাকবে চির শত্রুতা, ক্রোধ ও ঘৃণা ।

(পাঁচ) অস্বীকার বা কুফরী করার মাধ্যমে :

অর্থাৎ তাগুতকে অস্বীকার করা। তাগুতের যারা উপাসনা করে এবং নের্তৃত্বের আসনে বসায় তাদেরকে অস্বীকার করা এবং যে ব্যক্তি কুফরী মতবাদের (গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র ইত্যাদি) প্রবর্তন করে অথবা কুফরীর দিকে আহবান জানায় তাকে অস্বীকার করা।

ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : আদম সন্তানের উপর মহান আল্লাহ তা'য়ালা সর্ব প্রথম যে ফরজটি চাপিয়ে দিয়েছেন তা হচ্ছে তাগুতকে অস্বীকার করা এবং মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা। এর প্রমাণ হচ্ছে মহান আল্লাহর বাণী,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ -

অর্থাৎ আমি প্রত্যেক উম্মাতের কাছে এ মর্মে রাসূল পাঠিয়েছি যে, তোমরা মহান আল্লাহর ইবাদাত কর আর তাগুত থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকো।" (নাহল- ৩৬)

তিনি আরো বলেন ঃ তাগুতের সাথে কুফরী করা অর্থাৎ তাগুতকে অস্বীকার করা ব্যতীত কেউ মুমিন হতে পারবে না। এর প্রমাণ হচ্ছে মহান আল্লাহর বাণী,

فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا -

অর্থাৎ যে তাগুতকে অস্বীকার করে এবং মহান আল্লাহর উপর ঈমান আনে সে যেন এমন এক শক্তিশালী রশি ধরলো যা কোনদিন-ই ছিঁড়ে যাবার নয়। (বাক্বারাহ- ২৫৬)

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা ! আপনাদেরকে মহান আল্লাহর ওয়াস্তে বলছি, আপনারা আপনাদের দ্বীনের মূলকে আঁকড়ে ধরুন। আঁকড়ে ধরুন আদ্যোপান্ত এবং আপাদমস্তক তথা এ-টু-জেড বা টপ টু বটম, 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহর' সাক্ষ্য প্রদান করুন। এর অর্থ অনুধাবন করুন। এ কালিমাকে ভালবাসুন। ভালবাসুন তাওহীদের ধারক ও বাহকদেরকে। তাদেরকে আপনারা আপনাদের ভাই হিসেবে গ্রহণ করে নিন যদিও তারা আপনাদের কাছ থেকে দুরে অবস্থান করছে। আসুন আমরা আপোষে দলাদলি ত্যাগ করে সবাই এক সাথে মহান আল্লাহর রুজ্জু (তথা তাওহীদ) কে ধারণ করি। তাগুতগুলোকে অস্বীকার করি। তাদের বিরুদ্ধাচরণ করি। তাদেরকে মনে প্রাণে ঘৃণা করি। আমীন। সুম্মা আমীন। (ডা: শেখ আবু আব্দুল্লাহ লিয়াকত বিন আব্দুস সামাদ কর্তৃক রচিত পরকালের পাথেয় ১ম খন্ড হতে গৃহীত)

কালেমায়ে শাহাদাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ঈমান হলো অন্তরে বিশ্বাস, মৌখিক সাক্ষ্যদান এবং বাস্তব আমলের নাম। শুধুমাত্র অন্তরের বিশ্বাস ঈমানের জন্য যথেষ্ট নয়; অবশ্যই সাক্ষ্যদান এবং আনুগত্য নিশ্চিত করতে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর চাচা আবূ তালিব তার ভাতিজার নবুওয়াতের ব্যাপারে

অন্তরে বিশ্বাস করতো। কিন্তু তাঁকে প্রকাশ্য সাক্ষ্য দেয়নি এবং তাঁর অনুসরণ করেনি। ফলে মুশরিক্ব অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।

ক্বিয়ামত দিবসে মুক্তি লাভের জন্য তিনটি বিষয় অপরিহার্য-

১. একমাত্র মহান আল্লাহর ইবাদাত করা। মহান আল্লাহর ইবাদাত মুশরিক্বগণও করতো। কিন্তু তারা একমাত্র মহান আল্লাহর ইবাদাত করতো না। তারা মহান আল্লাহর ইবাদাত করতো, আবার তাগূতের ইবাদাতও করতো। সকল নবী রাসূল তাদেরকে একমাত্র মহান আল্লাহর ইবাদাতের দিকে আহ্বান করার জন্যই প্রেরিত হয়েছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ -

"আর আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতিতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা একমাত্র মহান আল্লাহর ইবাদাত কর এবং পরিহার কর তাগূতকে।" (সূরাহ ১৬; আন- নাহল - ৩৬)

২. একমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর ইত্তেবা' করা। প্রত্যেকটি মানুষ তার বিশ্বাস, কর্ম, লেনদেন, আচার-আচরণ ও চরিত্রের ক্ষেত্রে একমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমাকে অনুসরণ করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَـهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ -

"সুতরাং, তোমরা মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আন ও তাঁর প্রেরিত উম্মী নবীর প্রতি; যে মহান আল্লাহ ও তাঁর বাণীসমূহের প্রতি ঈমান রাখে। আর তোমরা তাঁর অনুসরণ কর, আশা করা যায়, তোমরা হিদায়াত লাভ করবে।" (সূরাহ ৭; আল-আ'রাফ ১৫৮)

৩. মহান আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদাত করা হয়, তাদের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা। তাগূতের প্রতি অস্বীকৃতি ছাড়া কারো ঈমান পরিপূর্ণ হয় না। মহান আল্লাহ বলেন,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ -

"অতএব, যে ব্যক্তি তাগূতকে অস্বীকার করে এবং মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই সে মজবুত রশি আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয়। আর মহান আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" (সূরাহ ২; আল-বাক্বারাহ - ২৫৬)

তাওহীদের সাক্ষ্যদানের সাথে রিসালাতের সাক্ষ্যদান অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাওহীদের সাক্ষ্যদান পরিপূর্ণ হয় না, রিসালাতের সাক্ষ্যদান ছাড়া। আবার ঠিক রিসালাতের সাক্ষ্যদান পরিপূর্ণ হয় না, তাওহীদের সাক্ষ্যদান ছাড়া। মহান আল্লাহর তাওহীদ হলো ইবাদাত করার ক্ষেত্রে তিনিই একমাত্র মা'বুদ । তিনি ছাড়া আর কারো ইবাদাত করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর তাওহীদ হলো তাঁর ইত্তেবা' করার ক্ষেত্রে। কোনো ইবাদাত তাঁর ইত্তেবা' ছাড়া করা যাবে না ।

ইসলাম পরিপালনের আবশ্যকীয় দু'টি মূলনীতি

১. মহান আল্লাহ ব্যতীত আর কারো ইবাদাত করবো না। তিনিই একমাত্র সত্য মা'বুদ। তাঁর কোন অংশীদার নেই। এটিই হলো তাওহীদের সাক্ষ্যদান। এর বিপরীত শিরক।

২. মহান আল্লাহর কোনো ইবাদাত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর শরী'আতের পদ্ধতি ছাড়া করবো না। এটিই হলো রিসালাতের সাক্ষ্যদান। এর বিপরীত বিদ'আত।

এক কথায় বলা যায়, শিরকমুক্ত তাওহীদি ঈমান এবং বিদ'আতমুক্ত সুন্নাতি আমল। মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا -

"বল, 'আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার নিকট ওহী প্রেরণ করা হয় যে, তোমাদের ইলাহই এক ইলাহ। সুতরাং, যে তার রবের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার রবের ইবাদাতে কাউকে শরীক না করে ।" (সূরাহ ১৮; আল-কাহাফ- ১১০)

তাওহীদের সাক্ষ্যদানের **(শাহাদাতুত তাওহীদ)** দু'টি রুকন রয়েছে। তাওহীদের কালেমাটি এ দু'টি রুকন সহকারে স্বীকৃতি দিয়েই ইসলামে প্রবেশ করতে হয়।

প্রথম রুকন - (লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ) অর্থাৎ মহান আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো মা'বুদ নেই ।

দ্বিতীয় রুকন- মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ অর্থাৎ, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা মহান আল্লাহর রাসূল।

তাওহীদের কালেমা **(কালিমাতুত তাওহীদ)** বাস্তবায়নের জন্য কুরআন ও সুন্নাহয় কিছু শর্তের উল্লেখ করা হয়েছে। এ শর্তগুলো না থাকলে কালেমার সাক্ষ্যদান বাস্তবায়িত হয় না। তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্যদান এ শর্তসমূহ

পালন সহকারে করলেই মুসলিম হওয়া যাবে, জান্নাতে প্রবেশ করা যাবে, জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। এ শর্তসমূহ না মানলে মুসলিম হওয়া যায় না। মুনাফিক্বগণ তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্যদানের পরেও কাফির। কারণ, তারা সাক্ষ্যদানের এ শর্তসমূহ মেনে নেয়নি। মহান আল্লাহ বলেন, ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ -

"তা এ জন্য যে, তারা ঈমান এনেছিল তারপর কুফরী করেছিল। ফলে তাদের অন্তরসমূহে মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। তাই তারা বুঝতে পারছে না।" (সূরাহ ৬৩; আল-মুনাফিক্বন - ৩)

তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্যদানের এ শর্তসমূহ জানা প্রত্যেক মুসলিমের অবশ্যই কর্তব্য। এ শর্তসমূহকে দুটি ভাগে ভাগ করে- তাওহীদের সাক্ষ্যদানের শর্তাবলি এবং রিসালাতের সাক্ষ্যদানের শর্তাবলি আলাদা করে সংক্ষিপ্তভাবে এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে শর্তসমূহ পূর্ণ করে তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্যদান করার তাওফীক্ব দিন। আমাদেরকে শিরকমুক্ত তাওহীদি ঈমান আনার এবং বিদ'আতমুক্ত সুন্নাতি আমল করার তাওফীক্ব দিন। আমীন!

একজন মানুষ ইসলামে প্রবেশ করতে হলে তাকে একটি কালেমা **(কালিমা)** পাঠ করতে হয়। এই কালেমাটির নাম কালেমায়ে শাহাদাত **(কালিমাতুশ শাহাদাতি)**। কালেমাটি নিম্নরূপ- **আশহাদু আন লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু অহ্দাহু লা-শারী-কালাহু অআশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।**

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মহান আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মা'বুদ নেই। তিনি একক। তাঁর কোনো শরীক নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা মহান আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।"

এই কালেমাটির মধ্যে দুটি অংশ রয়েছে-

প্রথম অংশ- আশহাদু আন লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু অহ্দাহু লাশারীকালাহু।

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মহান আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ নেই। তিনি একক। তাঁর কোনো শরীক নেই।"

এ অংশে মহান আল্লাহর তাওহীদ বা একত্ববাদের সাক্ষ্য দেয়া হয়। এক কথায় "শিরকমুক্ত তাওহীদি ঈমান ও আমলের" ঘোষণা দেয়া হয়।

দ্বিতীয় অংশ- অআশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অরাসূলুহু।

"এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা মহান আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।"

এ অংশে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর রিসালাত বা তিনি মহান আল্লাহর বান্দা ও রাসূল হওয়ার সাক্ষ্য দেয়া হয়। এক কথায় "বিদ'আতমুক্ত সুন্নাতি ঈমান ও আমলের" ঘোষণা দেয়া হয়।

একজন মানুষ মুসলিম হওয়ার ক্ষেত্রে এ সাক্ষ্যদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর চাচা আবূ তালিব তার ভাতিজার নবুওয়াতের সত্যতা সম্পর্কে অন্তরে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী ছিল, কিন্তু তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্যদান করেনি। ফলে সে মুসলিম হতে পারেনি। মুশরিক্ব অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে।

তাই বুঝা গেল, কালেমায়ে শাহাদাতের সাক্ষ্যদানের উপর নির্ভর করে দুনিয়ায় আমাদের জীবন-যাপন কেমন হবে। আমাদের বিশ্বাস ও কর্ম আখিরাতমুখী হবে নাকি অন্যান্য জীব-জানোয়ারের মতো অন্তসারশূন্য, উদ্দেশ্যহীন চলাফেরা হবে। অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস, প্রকাশ্য ঘোষণা ও সকল কাজ-কর্মে যখন আমরা প্রকৃত অর্থে এই কালেমার সাক্ষ্যদাতা হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করতে সক্ষম হবো, তখন দুনিয়ায় আমাদের বসবাস, জীবন ধারণ সবই হবে আখেরাতে নাজাত ও নেয়ামত লাভের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। জীবন হবে পরিকল্পিত, পরিচ্ছন্ন, অধিকার ও কর্তব্যে সমন্বিত, হক্ব-ইনসাফের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যেখানে হতাশা- নিরাশার কোনো স্থান নেই। কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ থেকে এই কালেমার সাক্ষ্য দানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিম্নে কিছু বিষয় সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

(১) এ সাক্ষ্যদান ইসলামের প্রথম রুকন ও ঈমানের প্রধান শাখা

ইসলামে প্রবেশের প্রথম শর্তই এ সাক্ষ্যদান। এটি দীনের মূল **(লুববুদ দ্বীনি)** ও মিল্লাতের ভিত্তি **(আসাসুল মিল্লাতি)**। সহীহাইনে উদ্ধৃত উমার ইবনুল খাত্তাব রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত সুপরিচিত ও বিখ্যাত হাদীসে এসেছে, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আমাদের সামনে আবির্ভূত হলো। তার পরনের কাপড়-চোপড় ছিল ধবধবে সাদা এবং মাথার চুলগুলো ছিল মিশমিশে কালো। সফর করে আসার কোনো চিহ্নও তাঁর মধ্যে দেখা যায়নি। আমাদের কেউই তাঁকে চিনেও না। অবশেষে সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর সামনে বসলো। সে তাঁর হাঁটুদ্বয়

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর হাঁটুদ্বয়ের সাথে মিলিয়ে দিলো এবং দুই হাতের তালু তাঁর (অথবা নিজের) উরুর উপর রাখলো এবং বললো, হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা ! আমাকে ইসলাম সম্বন্ধে বলুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বললেন, "ইসলাম হচ্ছে এই- তুমি সাক্ষ্য দিবে যে, মহান আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোনো ইলাহ (মা'বুদ) নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, রামাজানের সিয়াম পালন করবে এবং যদি পথ অতিক্রম করার সামর্থ্য হয় তখন বাইতুল্লাহর হজ্জ করবে।" সে বললো, আপনি সত্যই বলেছেন। বর্ণনাকারী (উমার রাজিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা তাঁর কথা শুনে আশ্চর্যান্বিত হলাম। কেননা, সে (অজ্ঞের ন্যায়) প্রশ্ন করছে আর (বিজ্ঞের ন্যায়) সমর্থন করছে। এরপর সে বললো, আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বললেন, "ঈমান এই যে, তুমি মহান আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাকুল, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর প্রেরিত নবীগণ ও শেষ দিনের উপর ঈমান রাখবে এবং তুমি তাক্বদীর ও এর ভালো ও মন্দের প্রতিও ঈমান রাখবে।" (সহীহ বুখারী: ৫০; সহীহ মুসলিম: ৮)

ইবনু উমার রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন, 'পাঁচটি বিষয়ের উপর ইসলামের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, মহান আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই, আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা তাঁর বান্দা ও রাসূল- এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেয়া, বাইতুল্লাহর হজ্জ করা ও রামাজানের সিয়াম পালন করা।" (সহীহ বুখারী: ৮; সহীহ মুসলিম: ১৬) ঈমানের অনেকগুলো শাখা-প্রশাখা রয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে উত্তম শাখা হলো তাওহীদের সাক্ষ্যদান। আবূ হুরায়রাহ রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেন,"ঈমানের শাখা সত্তরটির চেয়েও বেশি, আর লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।" (সহীহ মুসলিম: ৩৫)

(২) এ কালেমার সাক্ষ্যদানের প্রতি নবী আলাইহিমুস সালামগণ দা'ওয়াত দিতেন

যুগে যুগে নবী-রাসূল আলাইহিমুস সালামগণ পৃথিবীর মানুষকে এ কালেমার সাক্ষ্যদানের প্রতি দা'ওয়াত দিতেন। যারা এ কালেমার সাক্ষ্যদানের

আহ্বানে সাড়া দিতেন, তারা তাঁদের উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত হতেন। যারা সাড়া দেয়নি, তারা কাফির ও মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হতো। মহান আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ -

"আমি তো নূহকে তার কওমের নিকট প্রেরণ করেছি। অতঃপর সে বলেছে, 'হে আমার কওম, তোমরা একমাত্র মহান আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন (সত্য) ইলাহ নেই।" (সূরাহ ৭; আল-আ'রাফ - ৫৯)

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ -

"আর (প্রেরণ করলাম) আদ জাতির নিকট তাদের ভাই হুদকে। সে বলল, 'হে আমার কওম, তোমরা একমাত্র মহান আল্লাহর ইবাদাত কর । তিনি ছাড়া তোমাদের কোন (সত্য) ইলাহ নেই। (সূরাহ ৭; আল-আ'রাফ - ৬৫)

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُ

"আর সামূদের নিকট (প্রেরণ করেছি) তাদের ভাই সালিহকে। সে বলল, 'হে আমার কওম, তোমরা একমাত্র মহান আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন (সত্য) ইলাহ নেই।" (সূরাহ ৭; আল-আ'রাফ - ৭৩)

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُ -

"আর মাদইয়ানে (প্রেরণ করেছিলাম) তাদের ভাই শু'আইবকে। সে বলল, 'হে আমার কওম, তোমরা একমাত্র মহান আল্লাহর ইবাদাত কর । তিনি ছাড়া তোমাদের কোন (সত্য) ইলাহ নেই।" (সূরাহ ৭; আল-আ'রাফ - ৮৫)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ -

"আর তোমার পূর্বে এমন কোনো রাসূল আমি পাঠাইনি যার প্রতি আমি এই ওহী নাযিল করিনি যে, আমি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই; সুতরাং, তোমরা একমাত্র আমার ইবাদাত কর।" (সূরাহ ২১; আল-আম্বিয়া - ২৫)

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ -

"আর আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতিতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা একমাত্র মহান আল্লাহর ইবাদাত কর এবং পরিহার কর তাগূতকে।" (সূরাহ ১৬; আন-নাহল - ৩৬) মু'আয ইবনু জাবাল রাজিয়াল্লাহু 'আনহু বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা আত্ তাসলিমা যখন আমাকে (ইয়ামানের প্রশাসক নিযুক্ত করে) পাঠালেন। তখন তিনি বললেন, "তুমি এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ যারা

কিতাবধারী। সুতরাং, তাদেরকে আহ্বান জানাবে এ সাক্ষ্য দেয়ার জন্য, মহান আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই আর আমি আল্লাহর রাসূল।" (সহীহ মুসলিম: ১৯)

(৩) এ সাক্ষ্যদান বান্দার উপর মহান আল্লাহ প্রদত্ত বড় নি'আমাত

যে ব্যক্তি এ কালেমার সাক্ষ্য প্রদান করতে সক্ষম হয়েছে, সে মহান আল্লাহ প্রদত্ত নি'আমাত 'হিদায়াত' লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। হিদায়াত লাভ করা এটি মহান আল্লাহ প্রদত্ত মহা নি'আমাত । মহান আল্লাহ বলেন,

يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ -

"তিনি ফেরেশতাদের আপন নির্দেশে ওহী দিয়ে নাযিল করেন তার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার প্রতি; যেন তোমরা সতর্ক কর যে, আমি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই। অতএব, তোমরা আমাকে ভয় কর।" (সূরাহ ১৬; আন-নাহল - ২)

الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ - فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ -

সত্য তোমার রবের পক্ষ থেকে। সুতরাং, তুমি কখনো সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।" (সূরাহ ২; আল-বাক্বারাহ - ১৪৭)

'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ রাজিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা আত্-তাসলিমা বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা যাকে ভালবাসেন অথবা অপছন্দ করেন উভয়কে তিনি পার্থিব প্রাচুর্যতা দান করে থাকেন। আর আল্লাহ তা'আলা যাকে ভালবাসেন তাকে দীনের জ্ঞান দান করেন।" (আহমাদ, আল-মুসনাদ: ৩৬৭২; হাদীসটি সহীহ)

(৪) এ সাক্ষ্যদান প্রকৃত জ্ঞানী ও জান্নাতি মানুষের বৈশিষ্ট্য

এ সাক্ষ্যদাতাগণ এমন এক সাক্ষ্য প্রদান করেন, যে সাক্ষ্যটি মহান আল্লাহ, মালাইকা ও নবী-রাসূল আলাইহিমুস সালামও প্রদান করেন। তাওহীদ ও রিসালাতবিহীন জ্ঞান জাহালাত বা মূর্খতা। এ জন্য মহান আল্লাহ এ সাক্ষ্যদাতাগণকে উলুল ইলম বা জ্ঞানী বলেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ -

"মহান আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই, আর ফেরেশতা ও জ্ঞানীগণও। তিনি ন্যায় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। তিনি ছাড়া কোনো

(সত্য) ইলাহ নেই । তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরাহ ৩; আলে-ইমরান - ১৮)

জান্নাতী মানুষের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَالَّذِينَ هُم بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ -

"আর যারা তাদের সাক্ষ্যদানে অটল।" (সূরাহ ৭০; আল-মা'আরিজ - ৩৩)

এ আয়াতে কারীমায় সকল প্রকার সাক্ষ্যদানকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। আর এ কথা তো চির সত্য যে, তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্যদান সকল সাক্ষ্যদানের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

(৫) এ কালেমার সাক্ষ্যদান বিপদাপদ দূরকারী এবং নিরাপত্তার মাধ্যম

কালেমায়ে শাহাদাতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ বান্দার সকল বিপদাপদ দূর করে দেন। যেমন ইউনূস আলাইহিস সালাম মাছের পেটে গিয়ে দু'আ করেছিলেন,

وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ - فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ -

"তারপর সে অন্ধকার থেকে ডেকে বলেছিল, 'আপনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই'। আপনি পবিত্র মহান। নিশ্চয় আমি ছিলাম যালিম'। অতঃপর আমি তার আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তাকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিলাম, আমি এমনিভাবে বিশ্ববাসীদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি।" (সূরাহ ২১; আল-আম্বিয়া - ৮৭-৮৮)

ইবনু 'আব্বাস রাজিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, বিপদের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এ দু'আ পড়তেন লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহুল আজিমুল হালিম লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু রববুল আরশিল আজিম লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু রববুস সামাঅতি অরববুল আরজি অরববুল আরশিল কারীম।

মহান "আল্লাহ ব্যতীত কোন (সত্য) ইলাহ নেই, যিনি অতি উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ ও অশেষ ধৈর্যশীল, আরশে আযীমের প্রভু। মহান আল্লাহ ব্যতীত কোন (হক্ব) মাবূদ নেই। আসমান যমীনের প্রতিপালক ও সম্মানিত আরশের মালিক। মহান আল্লাহ ব্যতীত আর কোন (সত্য) ইলাহ নেই।" (সহীহ বুখারী: ৬৩৪৬, সহীহ মুসলিম: ২৭৩০)

উকবাহ ইবনু আমির রাজিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, আমার ওপর উট চড়ানোর দায়িত্ব ছিল। আমার পালা এলে আমি উট চড়িয়ে বিকেলে ফিরিয়ে নিয়ে এলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমাকে পেলাম, তিনি দাঁড়িয়ে লোকদের সঙ্গে কথা বলছেন। তখন আমি তার (নবীজীর) এ কথা শুনতে পেলাম, "যে মুসলিম সুন্দরভাবে অযূ করে তারপর দাঁড়িয়ে দেহ ও মনকে পুরোপুরি মহান আল্লাহর প্রতি নিবদ্ধ রেখে দু' রাকা'আত সালাত আদায় করে সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে।" উকবাহ বলেন, কথাটি শুনে আমি বলে উঠলাম, বাহ! হাদীসটি কত চমৎকার! তখন আমার সামনের একজন বলতে লাগলেন, আগের কথাটি আরো উত্তম। আমি সে দিকে তাকিয়ে দেখলাম তিনি 'উমার। তিনি আমাকে বললেন, তোমাকে দেখেছি, এই মাত্র এসেছ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা আত্-তাসলিমা এর আগে বলেছেন, "তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি উত্তম ও পূর্ণরূপে অযূ করে এ দু'আ পড়বে আশহাদু আন্ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু অআন্না মুহাম্মাদান আব্দুল্লাহি অরাসুলুহু। তার জন্যে জান্নাতের আটটি দরজা খুলে যাবে এবং যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।" (সহীহ মুসলিম: ২৩৪)

মুআয বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন, মামিন নাফসিন তামুতু তাশহাদু আন লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু অআন্নি রাসূলুল্লাহি ইয়ারজাউ জালিকা ইলা ক্বালবি মুউক্বিনিন ইল্লা গাফারাল্লাহু লাহা অর্থাৎ "যে কোন ব্যক্তি সর্বান্তঃকরণে এ সাক্ষ্য দিয়ে মারা গেলো, 'আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন ইলাহ নাই এবং আমি আল্লাহর রাসূল', আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন।" (সুনান ইবন মাজাহ: ৩৭৯৬; শাইখ আলবানী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।)

যে ব্যক্তি তাওহীদ ও রিসালাতের যথাযথ সাক্ষ্যদান করবে, সে দুনিয়া ও আখিরাতে নিরাপত্তা লাভ করবে। মহান আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ -

"যারা ঈমান এনেছে এবং নিজ ঈমানকে যুলমের সাথে সংমিশ্রণ করেনি, তাদের জন্যই নিরাপত্তা এবং তারাই হিদায়াত প্রাপ্ত।" (সূরাহ ৬; আল-আন'আম - ৮২) ইবনু উমার রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহান আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা আত্-তাসলিমা বলেছেন,"আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য

নির্দেশিত হয়েছি, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোনো উপাস্য নেই ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা আল্লাহর রাসূল, আর সালাত প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত আদায় করে। তারা যদি এগুলো করে, তবে আমার পক্ষ হতে তাদের জান ও মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা লাভ করলো; অবশ্য ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কোনো কারণ থাকে, তাহলে স্বতন্ত্র কথা। আর তাদের হিসাবের ভার মহান আল্লাহর উপর অর্পিত।" (সহীহ বুখারী: ২৫; সহীহ মুসলিম: ২২)

আবূ মালিক তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমাকে বলতে শুনেছি, **মান ক্বলা-লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু** অর্থাৎ "যে ব্যক্তি মহান 'আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই', এ কথা স্বীকার করে এবং মহান 'আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য উপাস্যকে অস্বীকার করে', তার জান-মাল নিরাপদ। আর তার হিসাব-নিকাশ আল্লাহর নিকট।" (সহীহ মুসলিম: ২৩)

(৬) এ সাক্ষ্যদান ঐক্যের মাধ্যম

তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ঐক্য তৈরী হয়। এ সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে একজন মানুষ মুসলিম হয়ে অপর মুসলিমের ভাই হয়ে যান। কালেমায়ে শাহাদাত মুসলিম ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিকে মজবুত করে। কারণ, তাদের দীন ও আক্বীদা এক হয়ে যায়। আক্বীদার ভিন্নতা মানুষের মধ্যে বিভক্তি ও বিরোধ তৈরী করে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ - وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَـٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ -

"তিনিই তোমাকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর সাহায্য ও মু'মিনদের দ্বারা। আর তিনি তাদের অন্তরসমূহে প্রীতি স্থাপন করেছেন । যদি তুমি যমীনে যা আছে, তার সবকিছু ব্যয় করতে, তবুও তাদের অন্তরসমূহে প্রীতি স্থাপন করতে পারতে না। কিন্তু মহান আল্লাহ তাদের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন, নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান।" (সূরাহ ৮; আল-আনফাল - ৬২-৬৩)

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ -

"নিশ্চয় যারা তাদের দীনকে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং দল-উপদলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের কোন ব্যাপারে তোমার দায়িত্ব নেই।" (সূরাহ ৬; আল-আন'আম - ১৫৯)

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ -

"আর তোমরা সকলে মহান আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বিভক্ত হয়ো না। আর তোমরা তোমাদের উপর মহান আল্লাহর নি'আমাতকে স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পরে শত্রু ছিলে। তারপর মহান আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালবাসার সঞ্চার করেছেন। অতঃপর তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই-ভাই হয়ে গেলে।" (সূরাহ ৩; আলে- ইমরান - ১০৩)

আবূ মুসা রাজিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা আত্-তাসলিমা বলেছেন, "এক মু'মিন আর এক মু'মিনের জন্য ইমারত তুল্য, যার এক অংশ আর এক অংশকে সুদৃঢ় করে । আর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা আত্-তাসলিমা) তাঁর এক হাতের আঙ্গুল আর এক হাতের আঙ্গুলে প্রবেশ করিয়ে দেখালেন।" (সহীহ বুখারী: ২৪৪৬, সহীহ মুসলিম: ২৫৮৫)

নু'মান ইবনু বাশীর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা আত্-তাসলিমা বলেছেন, "মু'মিনদের উদাহরণ তাদের পারস্পরিক ভালবাসা, দয়ার্দ্রতা ও সহানুভূতির দিক থেকে একটি মানব দেহের ন্যায় যখন তার একটি অঙ্গ আক্রান্ত হয় তখন তার সমস্ত দেহ ডেকে আনে তাপ ও অনিদ্রা।" (সহীহ বুখারী: ৬০১১, সহীহ মুসলিম: ২৫৮৬) আবূ হুরায়রাহ রাজিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা আত্-তাসলিমা বলেছেন, "এক মুসলিম অন্য মুসলিমের ভাই। সে তার সাথে কোনরকম বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, তার প্রসঙ্গে মিথ্যা বলবে না, তাকে অপমান করবে না। প্রত্যেক মুসলিমের মান-সম্মান, ধন-সম্পদ ও রক্তের (জীবনের) উপর হস্তক্ষেপ করা অপর মুসলিমের উপর হারাম। তাক্বওয়া এখানে (অন্তরে)। কেউ মন্দ বলে প্রমাণিত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার অপর মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। (জামে' আত-তিরমিযী: ১৯২৭; শাইখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

(৭) এ সাক্ষ্যদান সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যম

তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে একজন মানুষ শান্তিপ্রিয় হয়ে যান। তিনি ইসলামের বিধি-বিধান মেনে চলতে বাধ্য হন । কারো প্রতি

কোন যুলুম করেন না। একজন অপরজনের কল্যাণ কামনা করেন। এর মাধ্যমে একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ -

"যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করা কিংবা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া যে কাউকে হত্যা করল, সে যেন সব মানুষকে হত্যা করল। আর যে তাকে বাঁচাল, সে যেন সব মানুষকে বাঁচাল।" (সূরাহ ৫; আল-মায়িদাহ - ৩২)

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ -

"নিশ্চয় যারা এটা পছন্দ করে যে, মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ুক, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।" (সূরাহ ২৪; আন-নূর - ১৯)

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا -

"আর যে ইচ্ছাকৃত কোন মুমিনকে হত্যা করবে, তার প্রতিদান হচ্ছে জাহান্নাম, সেখানে সে স্থায়ী হবে। আর মহান আল্লাহ তার উপর ক্রুদ্ধ হবেন, তাকে লা'নত করবেন এবং তার জন্য বিশাল আযাব প্রস্তুত করে রাখবেন।" (সূরাহ ৪; আন-নিসা: -৯৩) তামীম আদ্-দারী রাজিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা আত্-তাসলিমা বলেছেন, "সদুপদেশ দেয়াই দীন।" আমরা আরয করলাম, কার জন্য উপদেশ? তিনি বললেন, "মহান আল্লাহ ও তাঁর কিতাবের, তাঁর রাসূলের, মুসলিম শাসক এবং মুসলিম জনগণের।" (সহীহ মুসলিম: - ৫৫)

''জারীর রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেন, দ্বীন হচ্ছে উপদেশ প্রদানের নাম। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। জারীর রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা! এ উপদেশ কার জন্য হবে ? তিনি বললেন, আল্লাহর জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলিম নেতাদের জন্য ও সাধারণ মুসলমানদের জন্য'' (বুখারী, তারগীব হা/৩৩১০)।

আল্লাহ তা'আলার জন্য নসীহতের অর্থ কী ?

আল্লাহ তা'আলার জন্য নসীহতের অর্থ হল, সত্যিকার ভাবে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, আল কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমার মাধ্যমে তিনি যে সংবাদ দিয়েছেন তা সত্য বলে মেনে

নেয়া। নিষ্ঠার সাথে এককভাবে তাঁর এবাদত করা, তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করা। তিনি যেসব বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন সেগুলো বাস্তবায়ন করা, নিষিদ্ধ বিষয় থেকে দূরে থাকা, তিনি যা ভালবাসেন তা ভালবাসা এবং তাঁর অপছন্দনীয় জিনিষকে অপছন্দ করা। মুমিন বান্দাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা আর কাফের, মুশরিক ও মুনাফিকদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা। যে ব্যক্তি উক্ত বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করল সে স্বীয় প্রভুর জন্য নসীহত আদায় করল। পবিত্র কুরআন থেকে এই হাদীছের সমর্থনে নিম্নের আয়াতটি সাক্ষ্য হিসেবে প্রযোজ্য:

لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ -

''দুর্বল, রুগ্ন, ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ লোকদের জন্য কোন অপরাধ নেই, যখন তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য কল্যাণ কামনা করবে এবং তাদের সাথে মনের দিক থেকে পবিত্র হবে''। (তাওবাঃ ৯১)

আল্লাহর কিতাবের নসীহত:

এ কথার অর্থ হলো, কুরআনের প্রতি ঈমান রাখা। যেমন ঈমান রেখেছিলেন সালাফে সালেহীন তথা সাহাবা, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনগণ। ইমাম তাহাবী রাহিমাহুল্লাহ বলেনঃ আল-কুরআন নিঃসন্দেহে আল্লাহর কালাম। তা আল্লাহর নিকট থেকেই এসেছে। অহী আকারে তিনি উহা অবতীর্ণ করেছেন। মুমিনগণ সত্য হিসেবে উহা বিশ্বাস করে এবং দৃঢ় আস্থা রাখে যে আল কুরআন সৃষ্টি জগতের ন্যায় আল্লাহর সৃষ্ট নয় বরং উহা প্রকৃতই আল্লাহর কালাম সুতরাং উহা শুনে কেউ যদি ধারণা করে যে উহা মানুষের কথা তাহলে সে কুফরী করল। এ ধরণের লোকদেরকে আল্লাহ তা'আলা দুষ্কৃতিকারী ও পাপাচারী বলে আখ্যা দিয়েছেন এবং তাদেরকে ''সাকার'' নামক জাহান্নামের ভয় দেখিয়েছেন। তিনি বলেনঃ ان هذا إلا قول البشر سأصليه سقر- যে এ কথা বলে ইহা মানুষের কথা বৈ কিছু নয়, তাকে অচিরেই আমি ''সাকার'' নামক জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। (শরহুল আক্বীদাহ আত তাহাবীয়া)

এই আয়াত থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, আল-কুরআন নিঃসন্দেহে মানুষের স্রষ্টার বাণী, উহা মানুষের কথার সাথে কোন ভাবেই সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। পবিত্র কুরআনের বিশুদ্ধ তেলাওয়াত বা পঠনও তার জন্য কল্যাণ কামনার অন্তর্গত। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ او زد عليه ورتل القرأن ترتيلا ''এবং কুরআন তেলাওয়াত করো তারতীল সহকারে সুবিন্যস্তভাবে''। (সূরা মুজযাম্মিলঃ ৪) এমনিভাবে মুসলিমদেরকে উহা শিক্ষাদান করাও মঙ্গল কামনার অন্তর্গত।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেনঃ خيركم من تعلم القرأن وعلمه - ''তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে নিজে কুরআন শিখে এবং তা অন্যকে শিখায়''। (সহীহ বুখারী, হাদীছ নং-৪৬৩৯)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমার জন্য নসীহতঃ

আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ انصحوا لله ورسوله اذا ইমাম কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেনঃ আল্লাহর রাসূলের জন্য নসীহতের অর্থ হলো তাঁর নবুওয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, তাঁর আদেশ ও নিষেধের আনুগত্য করা, তাঁর বন্ধুকে বন্ধু এবং শত্রুকে শত্রু ভাবা, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করা, তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে ভালবাসা, তাঁর সুন্নাতের তাযীম করা, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সুন্নাতের লালন করা, গভীর জ্ঞানলাভের জন্য উহার গবেষণা করা, প্রচার-প্রসার এবং উহার প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেয়া এবং তাঁর মহান চরিত্রে চরিত্রবান হতে সচেষ্ট থাকা। {(তাফসীরে কুরতুবী, (৮/২২৭)}

মুসলিম শাসকদের জন্য নসীহতঃ

মুসলিম শাসকদের মঙ্গল কামনা প্রসঙ্গে হাফেজ ইবনে হাজার রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, শাসকদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে তাদেরকে সহযোগিতা করা, উদাসীনতার মুহূর্তে সতর্ক করা, ভুল-ত্রুটির মুহূর্তে বিদ্রোহ না করে তা সংশোধন করার ব্যবস্থা করা। তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ থাকা, বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদেরকে তাদের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা। তাদের জন্য সর্বোত্তম কল্যাণ কামনা হলো, সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে অন্যায় ও যুলুমের পথ থেকে তাদেরকে বাধা দান করা। {(ফতহুলবারী, ১/১৩৮)}

সাধারণ মুসলিমদের জন্য কল্যাণ কামনাঃ

এ প্রসঙ্গে ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ বলেনঃ তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গলজনক বিষয়ে নির্দেশনা দান, দ্বীনের অজানা বিষয়ে জ্ঞান দান করা এবং এ ব্যাপারে কথা ও কাজে তাদেরকে সহযোগিতা করা। তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি গোপন রাখা এবং তা সংশোধন করার ব্যবস্থা করা। ক্ষতি এবং কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা তথা তাদের হিতসাধন করার চেষ্টা করা। দয়া ও নিষ্ঠার সাথে তাদেরকে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ করা। সকলের প্রতি সহনশীল হওয়া। বড়দের শ্রদ্ধা ও ছোটদের প্রতি দয়া করা। উত্তম পরামর্শ ও উপদেশ দেয়া, ধোঁকা ও হিংসা-বিদ্বেষ পরিত্যাগ করা। নিজের

অপছন্দনীয় বস্তু তাদের জন্য অপছন্দ করা। তাদের ধন-সম্পদ ও ইজ্জতের হেফাযত করা। মোটকথা সার্বিক দিক থেকে সাধারণ মুসলিমদেরকে সহযোগিতা করা।

এখানে বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, কল্যাণকামিতা শুধু মুসলিমদের সাথেই সীমিত নয়, বরং অমুসলিমদের জন্যও তা অপরিহার্য। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা তাঁর জাতির কল্যাণ কামনা করেছেন তথা তাদেরকে শিরক ও মূর্তি পূজার অন্ধকার থেকে তাওহীদের আলোর দিকে নিয়ে আসার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। (শারহুল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্বীয়া- অনুবাদ-আব্দুল্লাহ শাহেদ আল মাদানী)

''জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-কে বলতে শুনেছি, যখন কোন মানুষ কোন সম্প্রদায়ের মাঝে পাপের কাজ করে। এ সময় তারা বাধা প্রদান করবে না, তাহলে আল্লাহ তাদের মরণের পূর্বে তাদের সকলের উপর বিপদ চাপিয়ে দিবেন'' (আবু দাউদ, তারগীব হা/৩৩১২)।

''আবু বকর ছিদ্দীক রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-কে বলতে শুনেছি, যখন কোন সম্প্রদায় শরী'আত বিরোধী কোন কাজ দেখবে এবং তা হতে বাধা প্রদান করবে না, তখন আল্লাহ তাদের সকলকে শাস্তি প্রদান করেন'' (আবু দাউদ, তারগীব হা/৩৩১৩)।

আবু সাঈদ রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন, ''তোমাদের যে কোন ব্যক্তি যে কোন অন্যায় কাজ দেখবে সে যেন তা বল প্রয়োগে বাধা প্রদান করে। এভাবে সম্ভব না হলে মুখে বাধা প্রদান করবে। সম্ভব না হলে সে অন্যায়কে ঘৃণা করবে। আর অন্তরে ঘৃণা করে বাধা প্রদান করা কাজটি সবচেয়ে দুর্বল ঈমানের পরিচয়'' (মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৩৭)।

ভালকাজের আদেশ দিলে নিজেও পালন করতে হবে। অন্যথা পরিণতি হবে ভয়াবহ। আল্লাহ বলেন, ''হে ঈমানদারগণ! তোমরা এমন কথা কেন বল, যা তোমরা কর না ? আল্লাহর নিকট বড় ক্রোধের বিষয় এই যে, তোমরা বল এমন কথা, যা তোমরা কর না'' (ছফ: ২-৩)।

উসামা ইবনু যায়েদ রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তখন আগুনে পুড়ে

তার নাড়িভুড়ি বের হয়ে যাবে। এসময় সে ঘুরতে থাকবে, যেমন গাধা তার চাকা নিয়ে তার চার পার্শ্বে ঘুরতে থাকে। তখন জাহান্নামবাসীরা তার নিকট একত্রিত হয়ে তাকে বলবে, হে অমুক ব্যক্তি! তোমার এ অবস্থা কেন ? তুমি না আমাদেরকে ভালকাজের আদেশ করতে আর অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করতে ? সে বলবে, আমি তোমাদেরকে ভালকাজের আদেশ করতাম বটে, কিন্তু আমি তা করতাম না। আর আমি তোমাদেরকে অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করতাম অথচ আমিই তা করতাম'' (বুখারী, মিশকাত হা/৫১৩৯)। আনাস ইবনু মালিক রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন, যে রাতে আমাকে মি'রাজে নিয়ে যাওয়া হল, সে রাতে কতগুলি লোককে দেখলাম, যাদের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দ্বারা কেটে দেয়া হচ্ছে। আমি বললাম, হে জিবরাঈল! এরা কারা ? তিনি বললেন, এরা আপনার উম্মতের বক্তা, যারা মানুষকে ভাল কাজের আদেশ করত, কিন্তু নিজেরা আমল করত না'' (ইবনু হিব্বান, তারগীব, হা/৩৩২৮)। জুনদুব ইবনু আব্দুল্লাহ আযদী রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন, সে ব্যক্তির উদাহরণ যে ব্যক্তি মানুষকে কল্যাণের দাওয়াত দেয়, নিজে আমল করে না। সে সেই মোমবাতির মত। যে মোমবাতি মানুষকে আলো দেয় এবং নিজেকে জ্বালিয়ে দেয়'' (তাবারানী, তারগীব, হা/৩৩৩১)।

ইমরান ইবনু হুসাইন রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন, ''আমার অবর্তমানে তোমাদের উপর যেটা সবচেয়ে বেশী ভয় করি তারা হচ্ছে সেই সব লোক যারা মুখে জ্ঞানী, মুনাফিক্ব'' (তাবারানী, তারগীব, হা/৩৩৩২)। যারা মুখে ধর্মের কথা বলে, নিজে আমল করে না। এদের বিষয়টি সবচেয়ে ভয়াবহ। এরা মুখে জ্ঞানী, কর্মে মুনাফিক্ব।

আবু হুরায়রাহ রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন, ''তোমাদের কোন ব্যক্তি অন্যের চোখে ক্ষুদ্র-কুটা দেখতে পায়, কিন্তু নিজের চোখে গাছের শিকড়, বড় কাঠ খন্ড দেখতে পায় না (তাবারানী, তারগীব, হা/৩৩৩৬)। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, মানুষ অপরের ক্ষুদ্র দোষ দেখতে পায় কিন্তু নিজের বড় দোষ দেখতে পায় না। ভাল কাজের আদেশ দেয়া আর নিজের বড় দোষ দেখতে পায় না। ভাল কাজের আদেশ দেয়া আর নিজে না করা সবচেয়ে বড় দোষ।

হুযাইকা ইবনুল ইয়ামান রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলীমা বলেন : সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ। তোমরা অবশ্যই সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ করবে। নতুবা অবিলম্বে আল্লাহ তোমাদের উপর তাঁর আযাব নাযিল করবেন। তখন তোমরা তাঁর কাছে দু'আ করলেও তিনি তোমাদের সেই দু'আ কবুল করবেন না। (তিরমিযী, হাসান হাদীস)

ঐ হুযাইফা বিন ইয়ামান রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা ইরশাদ করেন : তোমরা অবশ্যই সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের প্রতিরোধ করবে। অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা যে কোন আযাবে তোমাদের সকলকে ধ্বংস করে দিবেন কিংবা তোমাদের মধ্য হতে সর্বাধিক পাপাচারী অন্যায়কারী জালিম লোকদেরকে তোমাদের উপর শাসনকর্তা নিযুক্ত করে দিবেন। এমতাবস্থায় তোমাদের মধ্যকার সৎ লোকেরা আল্লাহর কাছে মুক্তি লাভের জন্য দু'আ করবে তখন তা কবুল করা হবে না। (মুসনাদে আহমাদ)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যে কেউ দেখবে যে সমাজে এমন কোন কাজ হচ্ছে যা আল্লাহর দৃষ্টিতে ঘৃণিত তাহলে সে কাজকে পরিবর্তন করবে ন্যায় দ্বারা। এ কাজ করতে হবে হাত বা ক্ষমতা প্রয়োগ করে। তাতে যখন অপারগতা হবে তখন জবান দ্বারা আন্দোলন করে তা পরিবর্তন করবে। আর যদি আন্দোলন করার মতও ক্ষমতা না থাকে, তবে তা পরিবর্তন করবে মন দ্বারা। এখানে মন দ্বারা অর্থ হল মনে মনে এমন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে যেন অদূর ভবিষ্যতে অন্যায় অপকর্ম সমাজ থেকে দূর করা যায়। আর এতটুকু কাজও যে করবে না তার মধ্যে ঈমানের নিম্নতম অংশ ও বাকী থাকবে না। এই হল উপরোক্ত হাদীসের সারমর্ম। মুনকার কাজ বলতে বুঝায় যাবতীয় অন্যায় কাজ যেমন- অশ্লীল ছায়াছবি, বেহায়াপনা, নগ্নতা, সুদ-ঘুষ, জুয়া, মদ, মাতালি, চুরি, ডাকাতি, হাইজ্যাক, গুপ্তহত্যা, ফাঁকিবাজি, চোরাকারবারী , নারী নির্যাতন ইত্যাদি যাবতীয় অন্যায় কাজকেই আল কুরআনের ভাষায় মুনকার বলা হয়। উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসংগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা অন্যত্র বলেছেন : "অতপর অযোগ্য লোকেরা খিলাফতের আসনে বসবে, তারা এমন সব কথা বলবে যা তারা নিজেরা করবে না এবং এমন সব কাজ করবে যা করতে আল্লাহ তাদেরকে হুকুম করেননি। এই সময় তাদের (ঐ

সব শাসকদের) বিরুদ্ধে যারা হাত দ্বারা জিহাদ করবে তারা মুমীন। যারা জবান দ্বারা জিহাদ করবে তারাও মুমীন, যারা অন্তর দ্বারা জিহাদ করবে তারাও মুমীন। এর নিচে ঈমানের আর কোন ধুলিকনা পরিমাণও পর্যায় নেই।

কোন মুসলিম শাসক রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে অন্যায় করবে আর সৈনিক নবীর উম্মত তার বিরুদ্ধে কোন আওয়াজ তুলবে না, বরং তাকে সমর্থন করে যাবে (প্রকৃতপক্ষে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করে চুপ থাকলেই অন্যায়কে সমর্থন করা হয়।) তাদের (সেই সব উম্মতদের) চেহারা সুরাত ও লেবাস পোষাক যেমনই হোক না কেন, তারা আল্লাহর নবীর দৃষ্টিতে দ্বীন ইসলাম থেকে খারিজ। যেমন এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন : " যে ব্যক্তি তার শাসককে খুশি করার উদ্দেশ্যে এমন কোন কাজ করে ও এমন কিছু কথা বলে যাতে শাসক খুশী হয় ঠিকই কিন্তু আল্লাহ তাতে নারাজ হন সে দ্বীন ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে। (কানযুল উম্মাল ৬ষ্ঠ খন্ড ৩০৯ নং হাদীস)

নোমান ইবনে বাশীর রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন : "যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশাবালী লংঘন করে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম লংঘিত হচ্ছে দেখেও তার প্রতিকার করে না বরং লংঘনকারীর সংগে সদ্ভাব বজায় রেখে চলে, এই দুই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত হলো যেমন- একদল লোক একটি নৌকা সংগ্রহ করে লটারীর মাধ্যমে ঠিক করলো যে, কিছু লোক উপরের তলায়, আর কিছু লোক নিচের তলায় থাকবে, নিচের তলায় যারা অবস্থান নিয়েছিল তাদেরকে পানির জন্য উপর তলার লোকদের নিকট যেতে হতো। ফলে উপরের লোকেরা অসুবিধা বোধ করতো। অবশেষে নিচের লোকগুলো পানির জন্য কুঠার দিয়ে নৌকার তলদেশ ভাংগতে শুরু করল। উপরের লোকেরা এবার নিচে এসে জিজ্ঞেস করলঃ তোমরা একি করছো? জবাবে তারা বলল : আমাদের পানির প্রয়োজন। আর সমুদ্রের পানি উপরে গিয়েই সংগ্রহ করতে হয়। তোমরা আমাদের যাওয়া আসায় বিরক্তি বোধ করছ। সুতরাং এখন আমরা নৌকার তলদেশ ভেঙ্গে সমুদ্র হতে পানি সংগ্রহ করবো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এ উপমা বর্ণনা করে বললেন : যদি উপরের লোকেরা নিচের লোকদের হাত ধরে নৌকার তলদেশ ছিদ্র করা থেকে বিরত না রাখতো তাহলে তাদের নিজেদেরকেও সাগরে ডুবে মরতে হতো। কিন্তু তারা নিচের

লোকদেরকে একাজ থেকে বিরত রেখে নিজেরাও বাঁচলো তাদেরকেও বাঁচালো। (বুখারী)

তাই কোন মুমীন মুসলিম মুনকার কাজ দেখে চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। তাকে অবশ্যই সৎ কাজের আদেশ দিতে হবে এবং মুনকার কাজে বাধা সৃষ্টি করতে হবে ও প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। এর ফলে দেশের লোকের পক্ষে, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই, মাস্তানী, মদ্যপান, বেশ্যাবৃত্তি, মদ-মাতলামী, জুয়া, জুলুম, নির্যাতন, উলঙ্গপনা ও অন্যান্য মুনকার ও অন্যায় আচরণের সুযোগ পাবে না। বরং গোটা দেশের লোক পুরো শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে সুখে শান্তিতে জীবন যাপন করতে পারবে। কুরআন হাদীসে বর্ণিত নির্দেশাবলী মেনে চলার আহ্বান ও নিষিদ্ধ তথা নাফরমানী কাজের নিষেধ ও প্রতিরোধ করার দায়িত্ব আল্লাহপাক সর্বস্তরের মুসলিমের জন্য বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন। এটা এমনি একটি দায়িত্ব যার বাস্তবায়নে অলসতা, উদাসীনতা ও অনীহা প্রকাশ কোন জাতির ভাগ্যে করুণ পরিণতি ডেকে আনার জন্য যথেষ্ট। যে দেশের রাষ্ট্রনায়ক, সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং সাধারণ জনসাধারণ সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধে ব্যর্থ, যেখানে হত্যা, সন্ত্রাস, চুরি, চাঁদাবাজী, সুদ, ঘুষ, জিনা-ব্যভিচার, জীবনের নিরাপত্তার হুমকি, অর্থনৈতিক দুরবস্থা, পারিবারিক অশান্তি ও কোন্দল, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বিশ্বাসঘাতকতা, সামাজিক বিশৃংখলা, তাগুত ও অসৎ লোকের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব, বন্যা খরা, মহামারী প্রভৃতি আযাব তাদেরকে চারদিক থেকে অক্টোপাসের মত ঘিরে ধরবে। ঠিক এমনি মুহূর্তে অশান্তির আগুনে জর্জরিত অতিষ্ঠ মানবের আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এ যে নিজ হাতের কামাই। ঐরূপ অবস্থার জন্য নিজেরাই দায়ী। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এরূপ পরিস্থির সৃষ্টির ব্যাপারে আগেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, "মানুষ কোন অত্যাচারীকে অত্যাচার করতে দেখেও তার দুই হাত ছেপে ধরে তাকে প্রতিহত না করলে অচিরেই আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে তাঁর ব্যাপক আযাবে নিক্ষিপ্ত করবেন। (তিরমিযী, হাসান সহীহ) তাইতো মুমীন বান্দাগণ আল্লাহর গযব থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য সমাজ থেকে অনৈসলামী কাজকামগুলো দূরীভূত করার জন্য সদা-সর্বদা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করে থাকেন।

আবূ হুরায়রাহ্ রাজিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন, “তোমরা পরস্পর হিংসা করো না, পরস্পর ধোঁকাবাজি করো না, পরস্পর বিদ্বেষ পোষণ করো না, একে অপরের ক্ষতি করার উদ্দেশে অগোচরে শত্রুতা করো না এবং একে অন্যের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয়ের চেষ্টা করবে না। তোমরা মহান আল্লাহর বান্দা হিসেবে ভাই ভাই হয়ে থাকো।” (সহীহ বুখারী: ৬০৬৬, সহীহ মুসলিম: -২৫৬৪) ‘আবদুল্লাহ্ ইবনু ‘উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা আত্-তাসলিমা বলেছেন,“এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তার উপর যুদ্ধ করবে না এবং তাকে যালিমের হাতে সোপর্দ করবে না। যে কেউ তার ভাইয়ের অভাব পূরণ করবে, আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহ দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ ঢেকে রাখবে, মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ ঢেকে রাখবেন।” (সহীহ বুখারী: ২৪৪২, সহীহ মুসলিম: ২৫৮০)

(৮) এ কালেমার সাক্ষ্যদান এক দৃঢ়তর রজ্জু ধারণ করা

এ সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে যারা ইসলামকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করে তারা যেহেতু ধ্বংস ও প্রবঞ্চনা থেকে নিরাপদ হয়ে যায়, সে জন্য কুরআন কারীমে তাদেরকে দৃঢ়তর রজ্জু ধারণকারীর সাথে তুলনা করা হয়েছে। এটি এমন শক্ত (ও মজবুত) দড়ির মত যা কখনো ছিঁড়ার সম্ভাবনা নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ -

“অতএব, যে ব্যক্তি তাগূতকে অস্বীকার করে এবং মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই সে মজবুত রশি আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয়। আর মহান আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।” (সূরাহ ২; আল-বাক্বারাহ- ২৫৬)

এ আয়াতের তাফসীরে ইবনু আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহুমা, সাঈদ ইবনু যুবাইর ও দাহহাক রাহিমাহুমুল্লাহ বলেন, এ দৃঢ় রজ্জুটি হলো, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু। মহান আল্লাহ বলেন,

لَّا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَـٰنِ عَهْدًا -

“যারা পরম করুণাময়ের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছে তারা ছাড়া অন্য কেউ সুপারিশ করার ক্ষমতা রাখবে না।” (সূরাহ ১৯; মারইয়াম - ৮৭)

এ আয়াতের তাফসীরে ইবনু আব্বাস রাজিয়াল্লাহু ‘আনহু ও মুকাতিল রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এ আল-আহ্দু অঙ্গিকারটি হলো, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু অর্থাৎ এ কালেমার সাক্ষ্যদান ছাড়া সুপারিশ পাবে না।

(৯) এ কালেমার সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে সুদৃঢ় থাকা যায়

কালেমায়ে শাহাদাতের মাধ্যমে বান্দা পৃথিবীতে সুদৃঢ় থাকতে পারে এবং আখিরাতেও মহান আল্লাহ তাকে সুদৃঢ় রাখবেন। এ সাক্ষ্যদান একটি মজবুত ও অনঢ় বৃক্ষের মত একটি প্রতিষ্ঠিত উক্তি। তবে এ সাক্ষ্যদান আন্তরিকতার সাথে হতে হবে এবং এর শর্তসমূহ পূরণ করে আমল করতে হবে। কুফরী সাক্ষ্যদানকে মহান আল্লাহ খারাপ বৃক্ষের সাথে তুলনা করেছেন । মহান আল্লাহ বলেন,

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ -

“আল্লাহ অবিচল রাখেন ঈমানদারদেরকে সুদৃঢ় বাণী দ্বারা দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে।” (সূরাহ ১৪; ইবরাহীম -২৭)

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ -

“আর অপবিত্র বাক্যের উপমা নিকৃষ্ট বৃক্ষের ন্যায়, যাকে মাটির উপর থেকে সমূলে উপড়ে ফেলা হয়েছে, যার কোন স্থিতি নেই।” (সূরাহ ১৪; ইবরাহীম - ২৬) বারা ইবনু আযিব রাজিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা আত্-তাসলিমা বলে, “অতঃপর তার নিকট দু‘জন ফেরেশতা এসে তাকে বসিয়ে উভয়ে প্রশ্ন করে, তোমার রব কে? তখন সে বলে, আমার রব মহান আল্লাহ । তাঁরা উভয়ে তাকে প্রশ্ন করে, তোমার দীন কি? সে বলে, আমার দীন হলো ইসলাম । তারা প্রশ্ন করে, এ লোকটি তোমাদের মধ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনি কে? তিনি বলেন, সে বলে, তিনি মহান আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত্-তাসলিমা। তারপর তারা উভয়ে আবার বলে, তুমি কি করে জানতে পারলে? সে বলে, আমি মহান আল্লাহর কিতাব পড়েছি এবং তার প্রতি ঈমান এনেছি এবং সত্য বলে স্বীকার করেছি।”

জারীর বর্ণিত হাদীসে এসেছে, এটাই হলো মহান আল্লাহর বাণী- (ইউসাববিতুল্লাহুল্লাজীন আমানু) (সূরাহ ১৪; ইবরাহীম ২৭) এর অর্থ, “যারা এ শাশ্বত বাণীতে ঈমান এনেছে তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে মহান আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন।” (আবূ দাউদ: ৪৭৫৩; হাদীসটি সহীহ)

(১০) এ কালেমার সাক্ষ্যদান একটি উত্তম বৃক্ষের মত

কালেমায়ে শাহাদাতকে একটি উত্তম বৃক্ষের সাথে তুলনা করা হয়েছে। যে গাছের মূল মুমিনের অন্তরে সুদৃঢ় রয়েছে এবং যার শাখা-প্রশাখা উপরে বিস্তৃত। এ কালেমার সাক্ষ্যদানকারী দুনিয়াতে নেক আমল করতে থাকে এবং তার ফলাফল আকাশে নির্ধারিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ -

"তুমি কি দেখ না, মহান আল্লাহ কীভাবে উপমা পেশ করেছেন? কালিমা তাইয়েবা, যা একটি ভাল বৃক্ষের ন্যায়, যার মূল সুস্থির আর শাখা-প্রশাখা আকাশে।" (সূরাহ ১৪; ইবরাহীম - ২৪)

(১১) এ কালেমার সাক্ষ্যদান হলো সবচেয়ে বিশুদ্ধ কথা

যে ব্যক্তি এ কালেমার সাক্ষ্যদান করবে তিনি সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও সঠিক সাক্ষ্যদান করেন। কারণ তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্যদান প্রকৃত সত্যের সাক্ষ্যদান। কেউ যদি এ সাক্ষ্যদান না করে সে মূলত সত্যকে গোপন করলো।

মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا - يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا -

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা মহান আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজগুলোকে শুদ্ধ করে দেবেন এবং তোমাদের পাপগুলো ক্ষমা করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই এক মহা সাফল্য অর্জন করল ।" (সূরাহ ৩৩; আল-আহযাব - ৭০-৭১)

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ - إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ -

"নিশ্চয় যারা গোপন করে সু-স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ ও হিদায়াত যা আমি নাযিল করেছি, কিতাবে মানুষের জন্য তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করার পর, তাদেরকে মহান আল্লাহ লা'নত করেন এবং লা'নতকারীগণও তাদেরকে লা'নত করে। তারা ছাড়া, যারা তাওবা করেছে, শুধরে নিয়েছে এবং স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে। অতএব, আমি তাদের তাওবা কবূল করব। আর আমি তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।" (সূরাহ ২; আল-বাক্বারাহ - ১৫৯-১৬০)

(১২) এ কালেমার সাক্ষ্যদান বান্দার উপর মহান আল্লাহর অধিকার

তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্যদান করা মহান আল্লাহর নির্দেশ । এটি বান্দার উপর মহান আল্লাহর অধিকার। মহান আল্লাহ বলেন, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا - "আর তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে।" (সূরাহ ১৭; আল-ইসরা - ২৩) মুয়ায ইবনু জাবাল রাজিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, একবার আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা আত্-তাসলিমা এর সঙ্গে তাঁর উটের পিছনে বসলাম। অথচ আমার ও তাঁর মাঝখানে ব্যবধান ছিল শুধু সাওয়ারীর গদির কাষ্ঠ- খন্ড । তিনি (নবীজী) বললেন, "হে মুয়ায!" আমি বললাম, আপনার নিকটে আপনার খিদমতে আমি হাজির হে মহান আল্লাহর রাসূল! তারপর আরও কিছুক্ষণ চলার পরে আবার বললেন, "হে মুয়ায ইবনু জাবাল!" আমিও আবার বললাম, আপনার নিকটে আপনার খিদমতে আমি হাজির হে আল্লাহর রাসূল! তখন তিনি বললেন, "তুমি কি জানো যে, বান্দার উপর আল্লাহর হক্ব কী?" আমি বললাম, মহান আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই বেশি ভাল জানেন। তিনি বললেন, "বান্দার উপর আল্লাহর হক্ব এই যে, সে তাঁরই 'ইবাদাত করবে, তাঁর সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করবে না।" এরপর আরও কিছুক্ষণ পথ চলার পর আবার ডাকলেন, "হে মুয়ায ইবন জাবাল!" আমি বললাম, আপনার নিকটে আপনার খিদমতে আমি হাজির হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, "যদি বান্দা তা করে মহান আল্লাহর কাছে বান্দার প্রাপ্য কী হবে, তা কি তুমি জান?" আমি বললাম, মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই বেশি ভাল জানেন । তিনি বললেন, "তখন মহান আল্লাহ্র কাছে বান্দার হক্ব হল তাদেরকে শাস্তি না দেয়া।" (সহীহ বুখারী: ৫৯৬৭, ৬৫০০) তালহা ইবন উবাদুল্লাহ ইবন কারীয রাজিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা আত্- তাসলিমা বলেছেন, "সর্বোত্তম দু'আ হলো আরাফাতের দু'আ । আর আরাফাতের সর্বোত্তম দু'আ হলো, ঐ দু'আ যা আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণ করেছিলেন। দু'আটি এই- **লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু অহ্দাহু লা-শারীকালাহু** (মহান আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন ইলাহ নাই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নাই।" (মালেক, মুআত্তা: ২৪৬)

(১৩) এ কালেমার সাক্ষ্যদান গুনাহ মাফের মাধ্যম

তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে মহান আল্লাহ বান্দার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন। আবূ হুরায়রাহ রাজিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা আত্-তাসলিমা বলেছেন, **লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু অহ্দাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহু ওয়া আ'লা কুল্লি শাইইন ক্বাদীর** অর্থাৎ "যে লোক একশতবার এ দু'আটি পড়বে, (আল্লাহ ব্যতিত সত্য কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরিক নেই, রাজত্ব একমাত্র তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও একমাত্র তাঁরই জন্য, আর তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান।) তাহলে দশটি গোলাম আযাদ করার সমান সওয়াব তার হবে। তার জন্য একশটি সওয়াব লেখা হবে এবং আর একশটি গুনাহ মিটিয়ে ফেলা হবে। ঐদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তান হতে মাহফুজ থাকবে । কোন লোক তার চেয়ে উত্তম সওয়াবের কাজ করতে পারবে না । তবে হ্যাঁ, ঐ ব্যক্তি সক্ষম হবে, যে এর চেয়ে ঐ দু'আটির 'আমল বেশি পরিমাণ করবে।" (সহীহ বুখারী: ৩২৯৩, সহীহ মুসলিম: ২৬৯১)

(১৪) এটি ইবাদাত কবুলের শর্ত

প্রত্যেকটি ইবাদাত কবুল হওয়ার জন্য দুটি শর্ত রয়েছে। এ দুটি শর্ত একই সাথে পাওয়া আবশ্যক । একটি হলো, ইবাদাতটি ইখলাসের সাথে একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য হতে হবে। এটিই হলো- **শাহাদাতু আন লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু** বা তাওহীদের সাক্ষ্যদান। অপর শর্তটি হলো, ইবাদাতটি একমাত্র মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা আত্- তাসলিমা এর ইত্তেবা' বা অনুসরণ করে হতে হবে। এটিই হলো- **শাহাদাতু আননা মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহি** বা রিসালাতের সাক্ষ্যদান।

(১৫) এ সাক্ষ্যদানের উপর মৃত্যুবরণও জরুরি

তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্যদান জীবিত অবস্থায় যেমন জরুরি, এ সাক্ষ্যদানের উপর মৃত্যুবরণ করাও ঈমানী মৃত্যুর জন্য অত্যাবশ্যক। মু'আয ইবনু জাবাল রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা আত্-তাসলিমা বলেছেন, **মান কানা আখিরু কালামিহী লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু দাখালাল জান্নাত** "যার সর্বশেষ বাক্য হবে লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (সুনান আবূ দাউদ: ৩১১৬; শাইখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

'উসমান রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা আত্-তাসলিমা বলেছেন, **মান মাতা অহুওয়া ইয়া'লামু আন্নাহু লা-ইলা-ইল্লাল্লাহু দাখালাল জান্নাতা** অর্থাৎ "যে

এমতাবস্থায় মারা গেল যে, সে জানে আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (সহীহ মুসলিম: ২৬)

আবূ যার রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা আত্- তাসলিমা বলেছেন, "যেকোনো বান্দা **লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু** বলবে এবং এ অবস্থার উপরে মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (সহীহ বুখারী: ৫৮২৭; সহীহ মুসলিম: ৯৪)

(১৬) এ সাক্ষ্যদান মীযানের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী

তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্যদান অর্থাৎ, কালেমায়ে শাহাদাত আসমান ও যমীনের চাইতেও বেশি ভারী। আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাজিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা আত্- তাসলিমা কে বলতে শুনেছেন, "আল্লাহ তাআলা ক্বিয়ামাত দিবসে আমার উম্মাতের একজনকে সমস্ত সৃষ্টির সামনে আলাদা করে উপস্থিত করবেন। তিনি তার সামনে নিরানব্বইটি আমলনামার খাতা খুলে ধরবেন। প্রতিটি খাতা দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। তারপর তিনি প্রশ্ন করবেন, তুমি কি এগুলো হতে কোনো একটি (গুনাহ) অস্বীকার করতে পার? আমার লেখক ফেরেশ্তারা কি তোমার উপর যুলম করেছে? সে বলবে, না, হে প্রভু! তিনি আবার প্রশ্ন করবেন, তোমার কোনো অভিযোগ আছে কি? সে বলবে, না, হে আমার প্রভু! তিনি বলবেন, আমার নিকট তোমার একটি সওয়াব আছে। আজ তোমার উপর এতটুকু যুলুমও করা হবে না । তখন ছোট একটি কাগজের টুকরা বের করা হবে। তাতে লিখা থাকবে- **আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অআশহাদু আননা মুহাম্মাদান আবদুহু অরাসূলুহু** অর্থাৎ (আমি সাক্ষ্য প্রদান করি যে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোনো সত্য মা'বুদ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।) তিনি তাকে বলবেন, দাড়িপাল্লার সামনে যাও । সে বলবে, হে প্রভু! এতগুলো খাতার বিপরীতে এই সামান্য কাগজটুকুর কি আর ওজন হবে? তিনি বলবেন, তোমার উপর তারপর কোন যুলুম করা হবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেন, খাতাগুলো এক পাল্লায় রাখা হবে এবং উক্ত টুকরাটি আরেক পাল্লায় রাখা হবে। ওজনে খাতাগুলোর পাল্লা হালকা হবে এবং কাগজের টুকরার পাল্লা ভারী হবে। আর আল্লাহ তাআলার নামের বিপরীতে কোন কিছুই ভারী হতে পারে না।"

(আহমাদ, আল- মুসনাদ: ৬৯৯৪; জামে' আত-তিরমিযী: ২৬৩৯; হাদীসটি সহীহ)

'আব্দুল্লাহ বিন আমর রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেন, "নূহ আলাইহিস সালাম স্বীয় ওফাতের সময় তাঁর দুই ছেলেকে ডেকে বলেছেন, আমি তো অক্ষম হয়ে পড়েছি। তাই আমি তোমাদেরকে অসিয়ত করে যাচ্ছি। আমি তোমাদেরকে দুটি বিষয়ে আদেশ করছি এবং দুটি বিষয় থেকে নিষেধ করছি। আমি তোমাদেরকে শিরক এবং অহংকার থেকে নিষেধ করছি। আর যে দুটি বিষয়ে আদেশ করছি তার একটি হলো- **লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু** কেননা, সমস্ত আসমান ও যমীন এবং এর মাঝে যা কিছু আছে সব কিছু যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর অপর পাল্লায় **লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু** রাখা হয়, তাহলে কালেমার পাল্লাই ঝুলে যাবে (ভারি হবে)। আর যদি সমস্ত আসমান-যমীন (সাত আকাশ ও সাত যমীন) এবং এর মধ্যকার যা কিছু আছে, একটি হালকা বা গোলাকার করে তার উপর এ কালেমাকে রাখা হয় তাহলে ওজনের কারণে তা ভেঙ্গে যাবে। আর আমি তোমাদেরকে আদেশ করছি **সুবহানাল্লাহি অবিহামদিহী** (পাঠ করার জন্য), কেননা এটা প্রত্যেক বস্তুর তাসবীহ, এর দ্বারাই প্রত্যেক বস্তুকে রিযিক্ব দেয়া হয়।" (আহমাদ, আল-মুসনাদ: ৬৫৮৩, ৭১০১; হাদীসটি সহীহ)

(১৭) এ সাক্ষ্যদান জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যম

এ সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে বান্দা জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করে। উবাদাহ ইবনু সামিত রাজিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমাকে বলতে শুনেছেন, **মান শাহিদা আন্ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু অআন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহি হাররামাল্লাহু আলাইহিন নার** অর্থাৎ "আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা আত্-তাসলিমা মহান আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিবেন।" (সহীহ মুসলিম: ২৯)

ইনু মুসাইয়্যাব রাহিমাহুল্লাহ তার পিতা মুসাইয়্যাব রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, অর্থাৎ, যখন আবূ তালিবের মুমূর্ষ অবস্থা তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা তার নিকট গেলেন। আবূ জাহলও তার নিকট উপবিষ্ট ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা তাকে লক্ষ্য করে বললেন, "চাচাজান, **লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু**

কালেমাটি একবার পড়ুন, তাহলে আমি আপনার জন্য মহান আল্লাহর নিকট কথা বলতে পারব।" (সহীহ বুখারী: ৩৮৮৪, ৬৬৮১)

আনাস ইবনু মালিক রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা প্রভাতে শত্রুর উপর আক্রমণ করতেন। তিনি আযানের শব্দ শুনার জন্যে কান পেতে অপেক্ষায় থাকতেন। তিনি আযান শুনতে পেলে আক্রমণ থেকে বিরত থাকতেন, অন্যথায় আক্রমণ করতেন। তিনি এক ব্যক্তিকে **আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার** বলতে শুনেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বললেন, এ ব্যক্তি মুসলিম। সে পুনরায় বলল, **আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু**। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা আত্- তাসলিমা বললেন, তুমি জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেলে। অতঃপর লোকটির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলেন, সে মেষপালের রাখাল।" (সহীহ মুসলিম: ৩৮২)

এ সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে বান্দা জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ পায়। মু'আয রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন, "যে ব্যক্তি সত্যচিত্তে (ইখলাসের সাথে) **আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অআন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহি** সাক্ষ্য দিয়ে মৃত্যুবরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (আহমাদ, আল-মুসনাদ ২২০০৩; আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীস আস-সাহীহাহঃ ২২৭৮; শাইখাইনের শর্তে হাদীসটি সহীহ)

উবাদাহ্ ইবনু সামিত রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন, "যে ব্যক্তি বলে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মহান আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা তাঁর বান্দা ও রাসূল, আর নিশ্চয় ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর বান্দা, তাঁর বান্দীর (মারইয়ামের) পুত্র ও তাঁর সে কালেমা- যা তিনি মারইয়ামকে পৌঁছিয়েছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে প্রেরিত একটি 'রুহ' মাত্র, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, মহান আল্লাহ তাকে জান্নাতের আটটি দরজার যেটি দিয়ে প্রবেশ করাতে চাইবেন, প্রবেশ করাবেন।" (সহীহ বুখারী: ৩৪৩৫; সহীহ মুসলিম : ২৮)

উবাদা ইবনু সামিত রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন, 'আল্লাহ

তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, তার আমল যা-ই হোক না কেন।" (সহীহ বুখারী: ৩৪৩৫)

আমরা বুঝতে পারলাম যে, **'শাহাদাহ'** তথা সাক্ষ্য প্রদান করা ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এটি ইসলামের প্রথম রুকন। 'শাহাদাহ' তথা সাক্ষ্য প্রদান করতে হয় ঈমানের দুটি অংশের উপর। সেগুলো হলো-

(১) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ।

(২) মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ।

এর ভিত্তিতে আহলুল ইলমগণের মতে, তাওহীদের দুটি রুকন রয়েছে, যার একটি অপরটির পরিপূরক। আর তাহলো-

(১) **তাওহীদুল ইবাদাহ**। একে তাওহীদুল মা'বূদও বলা হয়। অর্থাৎ মহান আল্লাহকে এক জেনে কেবলমাত্র তাঁরই ইবাদাত করা। যদি কেউ মা'বূদের ইবাদাত থেকে বিচ্যুত হয়ে সামান্য ডানে-বামেও চলে যায়, তবে মা'বূদের প্রতি তার ইবাদাতগুলোকে সে নষ্ট করল। তাওহীদের এ রুকনটি শাহাদাহর প্রথম অংশ তথা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' থেকে উদগত হয়েছে।

(২) **তাওহীদু-তরীক্বাতিল ইবাদাহ**। অর্থাৎ ইবাদাতের তরীক্বাহ বা পদ্ধতিগত তাওহীদ। এ তরীক্বাহ হতে হবে কেবলমাত্র তরীক্বাতু মুহাম্মাদির রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা অর্থাৎ 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর তরীক্বাহ'। একে আল-ইত্তেবা ও বলা হয়। এটি শাহাদাহর দ্বিতীয় অংশ তথা 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' থেকে উদগত হয়েছে। এ একটিমাত্র তরীক্বাহর বাইরে কোন তরীক্বাহর ইবাদাত আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন কবুল করেন না। আজ আমাদের মধ্যে বহু মুসলিম তরীক্বাহর তাওহীদ না বোঝার কারণে বিভিন্ন তরীক্বাহর ইবাদাত করেও তারা মনে করেন যে, তাদের ইবাদাত ঠিক আছে। আল্লাহর দরবারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর তরীক্বাহই গ্রহণযোগ্য। বিভিন্ন তরীক্বাহর ইবাদাতগুলো আমাদের ইত্তেবার তাওহীদ নষ্ট করে দেয়। আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর অনুসরণের নির্দেশ দিয়ে বলেন, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ - "বল, "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরাহ আলে-ইমরান : ৩১ আয়াত)

তাওহীদের এ দুটি রুকন মেনে নেওয়ার কিছু শর্ত রয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম রুকন তথা তাওহীদুল ইবাদার শর্ত হলো ৯টি এবং দ্বিতীয় রুকন তথা তাওহীদু তরীক্বাতিল ইবাদার শর্ত হলো ৮টি। আমরা এখন তাওহীদের প্রথম তথা তাওহীদুল ইবাদার ৯টি শর্ত সম্পর্কে আলোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ।

তাওহীদের সাক্ষ্যদানের প্রথম শর্ত হলো আল-ইলমুল মুনাফীলিল জাহল অর্থাৎ এমন জ্ঞান যা দ্বারা অজ্ঞতা দূরীভূত হয়ে যায়। এটি হলো **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর ইলম**। যদি কারো দুনিয়ার হাজারো জ্ঞান অর্জিত হয় এবং **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'**-এর জ্ঞান অর্জিত না হয়, তবে তাকে কুরআন ও সুন্নার দৃষ্টিতে জ্ঞানী বলা যায় না। যেমন, আবূ জাহল তৎকালীন সময়ের জ্ঞানী ব্যক্তিদের একজন হলেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা তাকে **'আবূ জাহল'** তথা 'অধিক মূর্খ বা মূর্খের' নামে আখ্যায়িত করেছেন। কেননা সে **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'**-এর তাৎপর্য বুঝেনি। **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু'** এর সাক্ষ্য দিতে হবে ইলম সহকারে। এটি ফরযে আইন। কেননা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু পাঠ করার সাথে সাথে পাঠকারীর উপর ইসলামের ফরয-ওয়াজিব, হালাল-হারাম ইত্যাদি বিধিবিধান কার্যকর হয়ে যায়। তাই যদি তার **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'** -এর জ্ঞান না থাকে তবে সে ঈমান আনয়নের পর অজ্ঞতার কারণে বিভিন্ন প্রকার শিরক, বিদ'আত ও ভ্রষ্টতায় নিপতিত হয়। সে **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'** সাক্ষ্য দিয়েও কবরে গিয়ে সিজদা করে, মান্নত করে, গরু, ছাগল, খাসি, মুরগি নিয়ে মাজারের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়, উৎসর্গ করে ইত্যাদি। তাই আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'** এর ইলম অর্জনের নির্দেশ দিয়ে বলেন, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ - এবং জেনে রাখো, নিঃসন্দেহে আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তুমি ক্ষমা চাও তোমার ও মুমিন নারী-পুরুষদের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য।" (সূরাহ মুহাম্মাদ : ১৯ আয়াত) যে ব্যাক্তি ইল্‌ম সহকারে বলবে, **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'** সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। 'উসমান রাজি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন, (মান মাতা ওয়াহুওয়া ইয়া'লামু আন্নাহু লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু দাখালাল জান্নাতা)

'যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো যে, সে জানে আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (সহীহ মুসলিম, হা/৪৩)

আহলুল ইলমগণ বলতেন, **আউওয়ালু ওয়া জিবীন আলাল আবিদি মারিফাতির রহমানি বিত্ তাওহীদ** অর্থাৎ "মহান আল্লাহর একজন বান্দার উপর সর্বপ্রথম ফরয হলো তাওহীদ সহকারে রাহমানকে জানা।"

তাওহীদের সাক্ষ্যদানের দ্বিতীয় শর্ত হলো, আল-ইয়াক্বীন আল-মুনাফী লিল-শাক্ব অর্থাৎ এমন ইয়াকিন তথা বিশ্বাস যা দ্বারা সন্দেহ দূরীভূত হয়ে যায়। ইয়াক্বীন (আল ইয়াক্বিন) অর্থ দৃঢ় বিশ্বাস, সর্বান্তকরণে বিশ্বাস ইত্যাদি। অন্তরের বড় একটি রোগ হলো শাক্ব তথা সন্দেহের রোগ। অতএব অন্তরের যাবতীয় সন্দেহকে দূর করে দেওয়াই হলো তাওহীদুল ইবাদার দ্বিতীয় শর্ত। আমাদের সমাজের মধ্যে কেউ কেউ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু'-এর সাক্ষ্য দেন, সাথে সাথে অন্তরে বিভিন্ন সন্দেহও লালন করেন। যেমন কেউ কেউ একথা অন্তরে লালন করেন যে, "কবরে আযাব হয় শুনেছি, কিন্তু হয় কি হয় না তা ঠিক নেই, কেননা অনেককেই তো কবর দিলাম, কিন্তু কবরে আযাব হতে তো দেখলাম না নাউযুবিল্লাহ। কেউ আবার সুদ খাবেন কি খাবেন না, তা নিয়ে সন্দেহের মধ্যে থাকেন। তারা যুক্তি দেন যে, "কয়দিন খাই এরপর বয়স হলে না হয় তওবা করে নিব অর্থাৎ সুদ খেলে যে পরকালে শাস্তি হবে, তা তার ভালোভাবে বিশ্বাস হচ্ছে না। অথচ সাহাবায়ে কিরাম রাজিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহুম 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর সাক্ষ্য প্রদানের পর চব্বিশ ঘন্টা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত থাকতেন। অর্থাৎ তাঁদের ঈমান ছিল ইয়াকিনের ভিত্তিতে, তাদের অন্তরে কোন সন্দেহ ছিল না। আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা এ প্রসঙ্গে বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - "মুমিন কেবল তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর সন্দেহ পোষণ করেনি।" (সূরাহ আল-হুজুরাত : ১৫ আয়াত)

তাওহীদের সাক্ষ্যদানের তৃতীয় শর্ত হলো আল-ক্বাবূল আল-মুনাফীয়্যু লির-রাদ্দি অর্থাৎ এমন কবূল যা প্রত্যাবর্তনকে প্রত্যাখ্যান করে। অর্থাৎ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-কে এমনভাবে কবুল করতে হবে যেন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর জন্য জীবনের জানমাল সবকিছু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হওয়া যায়। যেমনভাবে বাড়িঘর, সহায়–সম্পত্তি, সন্তান-সন্ততি সব বিসর্জন দিয়ে সাহাবায়ে কিরামগণ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহুম 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর নির্দেশে হিজরত করে মদীনায় চলে গিয়েছিলেন। যেমনভাবে তাঁরা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর জন্য জানমাল নিয়ে বদরের যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। আল্লাহ

‘আযযা ওয়া জাল্লা বলেন, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ - “আর তোমরা তোমাদের রবের অভিমুখী হও এবং তার কাছেই আত্মসমর্পণ কর।” (সূরাহ আয-যুমার : ৫৪ আয়াত)

তিনি অন্যত্র আরো বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً - হে মুমিনগণ, তোমরা ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ কর।” (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ২০৮ আয়াত)

তাওহীদের সাক্ষ্যদানের চতুর্থ শর্ত হলো, আল-ইনক্বিয়াদ আল-মুনাফী লিল-তার্ক অর্থাৎ এমন ইনক্বিয়াদ তথা আত্মসমর্পন যা বর্জন করাকে প্রত্যাখ্যান করে। ইনক্বিয়াদ অর্থ গলায় বেড়ি বা শৃঙ্খল লাগানো। অর্থাৎ মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ইচ্ছা ও নির্দেশের উপর পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে শৃঙ্খলিত হওয়াই হলো ইনক্বিয়াদ। অর্থাৎ ঈমানদার হওয়ার পর নিজের সকল ইখতিয়ার মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ছেড়ে দিতে হবে। মহান আল্লাহ ‘আযযা ওয়া জাল্লা এ প্রসঙ্গে বলেন, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا - “আর মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য নিজদের ব্যাপারে অন্য কিছু এখতিয়ার করার অধিকার থাকে না; আর যে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।” (সূরাহ আল-আহযাব : ৩৬ আয়াত)

তিনি অন্যত্র আরো বলেন, إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ - “যখন তার রব তাকে বললেন, ‘তুমি আত্মসমর্পণ কর’। সে বলল, ‘আমি সকল সৃষ্টির রবের কাছে নিজকে সমর্পণ করলাম।” (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ১৩১ আয়াত)

যদি কেউ ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’-এর সকল হুকুম আহকাম মাথা পেতে নেন, তবে তার শেষ কালেমা হতে পারে এটিই। মু‘আয ইবনু জাবাল রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন, মান কানা আখিরু কালামিহী লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু দাখালাল জান্নাতা অর্থাৎ “যার সর্বশেষ বাক্য হবে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ”, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (সুনান আবূ দাউদ, হা/৩১১৬; শাইখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

তাওহীদের সাক্ষ্যদানের পঞ্চম শর্ত হলো আস-সিদকুল মুনাফী লিল কাযিব অর্থাৎ আস-সিদক তথা সত্যবাদিতা, যা মিথ্যাকে প্রত্যাখ্যান করে। ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর সাক্ষ্য দিতে হবে সত্যবাদিতার সাথে। যদি কারো মুখের

সাক্ষ্য বিশ্বাস ও কর্মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, তাহলে তার ঈমান অর্জিত হয়নি। অতএব, কথায়, বিশ্বাসে ও আমলে অবশ্যই সত্যবাদী হতে হবে। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-এর সাক্ষ্যের সত্যবাদিতা জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিফলিত হতে হবে। আল্লাহ বলেন,- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ "হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।" (সূরাহ আত-তাওবাহ : ১১৯ আয়াত)

মুনাফিক্বরাও 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর সাক্ষ্য দিত। তবে তাদের সাক্ষ্যে সত্যবাদীতা ছিল না, তাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি। আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা তাদের সম্পর্কে বলেন, إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ - "যখন তোমার কাছে মুনাফিক্বরা আসে, তখন বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহ জানেন যে, অবশ্যই তুমি তাঁর রাসূল। আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, অবশ্যই মুনাফিক্বরা মিথ্যাবাদী।" (সূরাহ আল-মুনাফিক্বুন : ১ আয়াত)

তাওহীদের সাক্ষ্যদানের ষষ্ঠ শর্ত হলো আল-ইখলাস আল-মুনাফী লিশ-শিরক অর্থাৎ এমন ইখলাস তথা আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠতা, যা শিরককে প্রত্যাখ্যান করে। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' -এর সাক্ষ্য দিতে হবে ইখলাসের সাথে। এতে দুনিয়াবী কোন স্বার্থ হাসিল, লোক দেখানো বা ভিন্ন কোন উদ্দেশ্যে থাকবে না। ইখলাসের সাথে আল্লাহর সকল হুকুমকে মেনে নিয়ে তাওহীদ ও ইখলাসের ভিত্তিতে আল্লাহর ইবাদাত করাই হলো ঈমানের দাবী । আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা বলেন, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ - "আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ইবাদাত করে তাঁরই জন্য দীনকে একনিষ্ঠ করে।" (সূরাহ আল-বায়্যিনাহ : ৫ আয়াত)

তাওহীদের সাক্ষ্যদানের সপ্তম শর্ত হলো আল-ইসতিক্বামাহ অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানের উপর অটল অবিচল থাকা। ঈমান আনয়নের পর মৃত্যু পর্যন্ত ইবাদাতের আর কোন বিরতি নেই। তাই মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানের উপর অটল অবিচল থাকার সুদৃঢ় ইচ্ছা পোষণসহ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর সাক্ষ্য দিতে হবে। আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা বলেন, - وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ "আর ইয়াকীন (মৃত্যু) আসা পর্যন্ত তুমি তোমার রবের ইবাদাত কর।" (আল-হিজর : ৯৯ আয়াত)

তিনি অন্যত্র আরো বলেন, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ - "নিশ্চয় যারা বলে, 'আল্লাহই আমাদের রব' অতঃপর অবিচল থাকে, ফেরেশতাগণ তাদের কাছে নাযিল হয় (এবং বলে), 'তোমরা ভয় পেয়ো না, দুশ্চিন্তা করো না এবং জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর তোমাদেরকে যার ওয়াদা দেয়া হয়েছিল' ।" (সূরাহ ফুসসিলাত : ৩০ আয়াত)

তাওহীদের সাক্ষ্যদানের অষ্টম শর্ত হলো আল-মাহাব্বাতুল মুনাফী লিল-বুগজি অর্থাৎ মাহাব্বাহ তথা ভালোবাসা যা এর বিপরীত অপছন্দকে প্রত্যাখ্যান করে। ঈমান আনয়ন করতে হবে দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছুর উপরে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে ভালোবেসে। নতুবা অন্তরের ঈমান কখনো পরিপূর্ণ হতে পারে না। আল্লাহ ওয়া জাল্লা বলেন, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ - আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে আল্লাহকে ভালোবাসার মতো ভালবাসে। আর যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহর জন্য ভালোবাসায় দৃঢ়তর। (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ১৬৫ আয়াত) আনাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেন, 'তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা তার সন্তান ও সব মানুষের অপেক্ষা অধিক প্রিয়পাত্র হই।" (সহীহুল বুখারী, হা/১৫; সহীহ মুসলিম, হা/৭৩)

তাওহীদের সাক্ষ্যদানের নবম শর্ত হলো আল-কুফর বিত-তাগূত অর্থাৎ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' -এর সাক্ষ্য দিতে হবে সকল প্রকার তাগূতের সাথে কুফরি করার মাধ্যমে। একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত বাদ দিয়ে আর যার ইবাদাত করা হয়, তাকে তাগূত বলে। মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের সাথে সাথে সকল প্রকার তাগুতাকে পরিহার ও বিরোধীতা করতে হবে। আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা বলেন, فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - "অতএব, যে ব্যক্তি তাগূতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই সে মজবুত রশি আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয়।" (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ২৫৬ আয়াত)

এটি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, সকল আম্বিয়া আলাইহিস সালাম আত্ তাসলিমা সকল প্রকার তাগূতকে পরিহার করার দাওয়াত দিয়েছেন। আল্লাহ ‘আযযা ওয়া জাল্লা এ প্রসঙ্গে বলেন, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ - “আর আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতিতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি এজন্য যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং পরিহার কর তাগূতকে। (সূরাহ আন-নাহল : ৩৬ আয়াত)

অতএব, যদি কারো সাথে তাগূতের গভীর সম্পর্ক বা বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয় অথবা সে নিজেই তাগূত বা তাগূতের অনুসারী হয়, তবে সে যতই ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর সাক্ষ্য দিক না কেন তার অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি।

তাওহীদুল ইবাদার এ নয়টি শর্ত এবং তাওহীদুল ইত্তেবা‘র ৮টি শর্তই হলো ঈমানের আহকাম । অতএব এ শর্তগুলো একসাথে যদি কারো মধ্যে না পাওয়া যায়, যতই ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর সাক্ষ্য দিক না কেন, সে ঈমানদার নয়।

আমাদের সকলের প্রতি কর্তব্য হলো এ সংক্রান্ত আরো জ্ঞান অর্জন করা এবং এর আলোকে ইসলামের প্রথম স্তম্ভ তথা ঈমানকে পরিশুদ্ধ করা। যদি কেবলমাত্র ইসলামের এ একটি স্তম্ভকে পরিশুদ্ধরূপে গ্রহণ করা হয়, তবে অন্যান্য সকল স্তম্ভই এর সাথে সাথে অতি সহজেই ঠিক হয়ে যাবে। এ পরিশুদ্ধ ঈমানই ব্যক্তিকে বাধ্য করবে অন্যান্য সকল নেক আমল করার জন্য এবং সকল প্রকার অপরাধকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য। ইসলামের এ স্তম্ভেই আজকের মুসলিমদের মূল সমস্যা। যদি এ সমস্যা দূর করা যায় তবে সমাজের সকল প্রকার শিরক, বিদ’আত ইলহাদ ও কুফর দূর হবে, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সবাইকে পরিপূর্ণ মুমিন হয়ে এ পৃথিবীতে বসবাস করার তাওফীক্ব দান করুন। মৃত্যুর সময় ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করার তাওফীক্ব দান করুন। আমীন! ইয়া রব্বাল ‘আলামিন!

রিসালাতের সাক্ষ্যদানের শর্তাবলি

রিসালাতের বাক্যটি হলো- **মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ**। কোনো ব্যক্তি রিসালাতের সাক্ষ্য না দিলে তার তাওহীদের সাক্ষ্য পূর্ণ হবে না। তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্যদানই হলো ইসলামের প্রথম রুকন। দুইটি সাক্ষ্যদান মিলে একটি রুকন। ইবনু উমার রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন, “পাঁচটি বিষয়ের উপর ইসলামের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই, আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা তাঁর বান্দা ও রাসূল-

এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেয়া, বাইতুল্লাহর হজ্জ করা ও রমাযানের সিয়াম পালন করা।" (সহীহ বুখারী: ৮; সহীহ মুসলিম: ১৬) কেউ যদি সাক্ষ্য দেয়- **আশহাদু আন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহ্দাহু লা-শারীকালাহু** (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই)' সে মুমিন হবে না, যতক্ষণ না এ সাক্ষ্য দিবে- **অআশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অরাসূলুহু** (আর আমি আরোও সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা আল্লাহর বান্দা ও রাসূল)। কোন জায়গায় যদি শুধু ! **শাহাদাতু আন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু** থাকে, বুঝতে হবে সেখানে শাহাদাতু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বাক্য দুটি অধিক পরিচিতির কারণে একটির উপর **আল ইক্বতিসারু** বা সংক্ষিপ্ত করা হয়। এ দু' সাক্ষ্যদান মিলে একটি রুকন। এ জন্য প্রত্যেক ইবাদাতে দুটি শর্ত পাওয়া আবশ্যক- (১) একনিষ্ঠতা বা শিরকমুক্ত হওয়া **(আল ইখলাস)** ও (২) সুন্নাতের অনুসরণ বা বিদ'আতমুক্ত হওয়া **(আল মুতাবাআতু)**। যদি কেউ সাক্ষ্য দেয় **লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ** বা মহান আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো মা'বুদ নেই। তাকে আমরা প্রশ্ন করি, তুমি **লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ** কার থেকে জানলে? উত্তর- মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর থেকে। তিনি কিভাবে জানলেন যে, মহান আল্লাহই একমাত্র হক্ব ইলাহ? তিনি ব্যতীত ইলাহ হওয়ার যোগ্য আর কেউ নেই? উত্তর হবে- তিনি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল। তাহলে দেখা যায় **লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ** সাক্ষ্য দিলে তিনি **মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ** সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হবেন। দুটি বাক্য মিলেই একটি পূর্ণাঙ্গ রুকন। আবার কেউ যদি প্রথমে সাক্ষ্য দেন **মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ** তাকে আমরা বলি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা কোন মূল বিষয়টি পৌছানোর জন্য রিসালাতপ্রাপ্ত হয়েছেন? উত্তর হবে মহান আল্লাহর তাওহীদ **লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ** (তিনি ছাড়া আর কোন সত্য মা'বুদ নেই)' পৌঁছানোর জন্যই রিসালাতপ্রাপ্ত হয়েছেন। কোন ব্যক্তি এর যে কোন একটি বাক্য সাক্ষ্য দিলে অপরটি সাক্ষ্য দিতেও তিনি বাধ্য হবেন ।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা মহান আল্লাহর রাসূল এ সম্পর্কে জানা পাঁচটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে-

১. তাঁর বংশ-পরিচয় সম্পর্কে জানা

তিনি এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আরবী, কুরাইশি ও হাশেমী। তিনি হলেন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশিম।

তিনি ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পুত্র ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশধর।

২. তাঁর বয়স, জন্মস্থান এবং হিজরতের স্থান সম্পর্কে জানা

তাঁর মোট বয়স তেষট্টি বছর। জন্মস্থান মক্কায়। হিজরতের স্থান মদীনা। তিনি মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। চল্লিশ বছর বয়সে নবুওয়াত প্রাপ্ত হন। তেপ্পান্ন বছর পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করেন। অতঃপর মদীনায় হিজরত করেন। সেখানে দশ বছর জীবিত ছিলেন । অতঃপর এগারো হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে তাঁর ওফাত হয়।

৩. তাঁর নবুওয়াতের তেইশ বছর সম্পর্কে জানা

চল্লিশ বছর বয়সে হেরা গুহায় তাঁর প্রতি প্রথম ওহী নাযিল হয়।

৪. তিনি কিভাবে নবী ও রাসূল হলেন, সে সম্পর্কে জানা

তিনি নবী হলেন, যখন মহান আল্লাহ এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ করলেন-

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ - خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ - الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ - "পড় তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন । তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' থেকে। পড়, আর তোমার রব মহামহিম। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে তা শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না।" (সূরাহ ৯৬; আল-আলাক ১-৫)

অতঃপর তিনি রাসূল হলেন, যখন মহান আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ করলেন।

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ - قُمْ فَأَنذِرْ - وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ - وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ - وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ - وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ - وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ -

"হে বস্ত্রাবৃত! উঠ, অতঃপর সতর্ক কর। আর তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। আর তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র কর। আর অপবিত্রতা বর্জন কর। আর অধিক পাওয়ার আশায় দান করো না। আর তোমার রবের জন্যই ধৈর্যধারণ কর।" (সূরাহ ৭৪; আল-মুদ্দাসসির ১-৭)

আহলুল ইলমদের মতে, নবী ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্য হলো- যাদের প্রতি এমন শরী'আত সহকারে ওহী নাযিল করা হয়, যে শরী'আত প্রচারের নির্দেশ দেয়া হয় না, তাঁরাই হলেন নবী। আর যাদের প্রতি এমন শরী'আত সহকারে ওহী নাযিল করা হয়, যে শরী'আত প্রচার এবং তদানুযায়ী আমলের নির্দেশ প্রদান করা হয়, তাঁরা হলেন রাসূল। প্রত্যেক রাসূল নবীও হবেন, কিন্তু প্রত্যেক নবী রাসূল নন।

৫. তিনি কী নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন? কেন প্রেরিত হয়েছেন? সে সম্পর্কে জানা

তিনি মহান আল্লাহর তাওহীদ সহকারে প্রেরিত হয়েছেন। একজন মানুষের করণীয় ও বর্জনীয়ের ব্যাপারে পরিপূর্ণ শরী'আত সহকারে প্রেরিত হয়েছেন। তিনি সমগ্র জগতের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন, যাতে তিনি তাদেরকে শিরক, কুফর ও মূর্খতার অন্ধকার থেকে বের করে তাওহীদ, ঈমান ইলমের আলোর দিকে পথ দেখান, এর দ্বারা মানুষ মহান আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি লাভ করবে এবং তাঁর শাস্তি ও কঠোরতা থেকে রক্ষা পাবে। দশ বছর পর্যন্ত তিনি মানুষকে মহান আল্লাহর তাওহীদের দিকে আহ্বান করেন। দশ বছর পর তাঁর মিরাজ সংগঠিত হয়। মহান আল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। অতঃপর তিন বছর মক্কায় সালাত আদায় করেন। তিন বছর পর তাঁকে মদীনায় হিজরতের নির্দেশ প্রদান করা হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর হিজরতের পরে শরী'আতের অন্যান্য বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয়। যেমন, যাকাত, সাওম, হজ্জ, জিহাদ, আযান, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ প্রভৃতির শর'য়ী বিধিবিধান ।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর ওফাত

হিজরতের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা দশ বছর জীবিত ছিলেন। এরপর যখন মহান আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে দীনকে পরিপূর্ণ করলেন, মুমিনদের উপর তাঁর নিয়ামত পরিপূর্ণ করে দিলেন, তখন তাঁকে ইখতিয়ার দিলেন তাঁর সাথীদের সাথে থাকার জন্য অথবা নবীগণ, সিদ্দীকীন, শহীদগণ ও সালেহীনদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য। সফর মাসের শেষ দিকে এবং রবিউল আউয়াল মাসের প্রথম দিকে তাঁর অসুস্থতা শুরু হয়।

আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহা বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা উহুদের শহীদদের জন্য দু'আ করলেন, অতঃপর বললেন, "আল্লাহ তাআলা তাঁর এক বান্দাকে দুনিয়া ও মহান আল্লাহর নিকট যা আছে- এ দুয়ের মধ্যে একটি গ্রহণের ইখতিয়ার দিলেন। তিনি মহান আল্লাহর নিকট যা আছে-তা গ্রহণ করলেন।" (সহীহ বুখারী: ৪৬৬; তাবারানী, আল-আউসাত (৭/১১৫); আল-মাকতাবাহ আশ-শামিলাহ: ৭০১৭)

আবূ বকর রাজিয়াল্লাহু আনহু এ কথার মর্ম বুঝতে পেরে কান্না শুরু করে দিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বললেন, "হে আবূ বকর, তুমি কাঁদবে না। নিজের সাহচর্য ও সম্পদ দিয়ে আমাকে

যিনি সবচেয়ে অধিক ইহসান করেছেন তিনি আবূ বকর। আমার কোনো উম্মতকে যদি আমি খলীল (অন্তরঙ্গ বন্ধু) রূপে গ্রহণ করতাম, তবে তিনি হতেন আবূ বকর। কিন্তু তাঁর সাথে রয়েছে ইসলামের ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্য।" (সহীহ বুখারী: ৪৬৬)

১১ হিজরীর ১২ অথবা ১৩ রবিউল আউয়াল সোমবার তিনি পানির পাত্রে হাত ঢুকিয়ে মুখমন্ডল মাসেহ করলেন, আর বলতে লাগলেন, **লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ইন্না লিল মাউতি সাকারাতিন** অর্থাৎ "আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোনো মা'বুদ নেই, সত্যিই মৃত্যু-যন্ত্রণা কঠিন।" (সহীহ বুখারী: ৪৪৪৯)

অতঃপর আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, **আল্লাহুম্মার রফীক্বিল আ'লা** অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! উচ্চে সমাসীন বন্ধুর (সঙ্গে মিলিত করুন)।" (সহীহ বুখারী: ৪৪৬৩) এ দিনেই তাঁর ওফাত হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর ওফাতের সংবাদ শুনে অনেক সাহাবী দুঃখ-ভারাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। এমনকি 'উমার রাজিয়াল্লাহু আনহু এই মৃত্যু সংবাদ সহ্য করতে পারছিলেন না। এমন অবস্থায় আবূ বকর রাজিয়াল্লাহু আনহু মিম্বরে উঠে মহান আল্লাহর প্রশংসা করলেন অতঃপর বললেন, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ - অর্থাৎ, আপনাদের মধ্যে যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর ইবাদাত করতেন, তিনি তো মৃত্যুবরণ করেছেন। আর যারা আপনাদের মধ্যে মহান আল্লাহর 'ইবাদাত করতেন (জেনে রাখুন) মহান আল্লাহ চিরঞ্জীব, কখনো মরবেন না। মহান আল্লাহ বলেন, (অর্থ) "আর মুহাম্মাদ কেবল একজন রাসূল। তার পূর্বে নিশ্চয়ই অনেক রাসূল বিগত হয়েছে। যদি সে মারা যায় অথবা তাকে হত্যা করা হয়, তবে তোমরা কি তোমাদের পেছনে ফিরে যাবে? আর যে ব্যক্তি পেছনে ফিরে যায়, সে কখনো মহান আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারে না। আর আল্লাহ অচিরেই কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দেবেন।" (সূরাহ ৩; আলে-ইমরান ১৪৪) (সহীহ বুখারী: ৪৪৫৪)

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র আরো বলেন, - إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ

"নিশ্চয়ই তুমি মরণশীল এবং তারাও মরণশীল।" (সূরাহ ৩৯; আয-যুমার ৩০) তাঁর ওফাত হয়েছে, কিন্তু তাঁর দীন অবশিষ্ট রয়েছে। এটাই তাঁর দীন ইসলাম। এমন কোনো কল্যাণকর বিষয় নেই, যে বিষয়ে তিনি উম্মতকে নির্দেশনা দেননি। এমন কোনো ক্ষতিকর বিষয় নেই, যে বিষয়ে তিনি উম্মতকে সতর্ক করেননি। তাঁর দেখানো কল্যাণকর জিনিস হলো, তাওহীদ ও

মহান আল্লাহ যা পছন্দ করেন। আর সতর্ককৃত বিষয় হলো, শিরক, কুফর ও মহান আল্লাহ যা অপছন্দ করেন। মহান আল্লাহ তাঁকে সমগ্র মানবতার প্রতি প্রেরণ করেছেন। মহান আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর আনুগত্যকে মানুষ ও জিন উভয়ের প্রতি ফরয করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ-

"বল, হে মানুষ, আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর রাসূল, যার রয়েছে আসমানসমূহ ও জমিনের রাজত্ব।" (সূরাহ ৭; আল-আ'রাফ ১৫৮)

তাঁর মাধ্যমে মহান আল্লাহ দীনকে পরিপূর্ণ করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেন,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا -

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে।" (সূরাহ ৫; আল-মায়িদা ৩)

সালমান রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, একদা তাঁকে বলা হলো, তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা তোমাদেরকে সকল কাজই শিক্ষা দেন; এমনকি পেশাব-পায়খানার নিয়ম-কানুনও! তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি আমাদেরকে নিষেধ করেছেন পায়খানা ও পেশাবের সময় কিবলামুখী হয়ে বসতে, ডান হাত দিয়ে শৌচকার্য করতে, তিনটি ঢিলার কম দিয়ে ইস্তিঞ্জা করতে এবং গোবর ও হাড় দিয়ে ইস্তিঞ্জা করতে। (সহীহ মুসলিম: ২৬২)

তিনি যা কিছু নির্দেশ করেছেন, তা উম্মতের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণকর। আর যা কিছু নিষেধ করেছেন, তা উম্মতের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিকর । মহান আল্লাহ এ দীনের মধ্যে কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি, বরং দীনকে সহজ করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেন, - يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"আল্লাহ তোমাদের সহজ চান এবং কঠিন চান না।" (সূরাহ ২; আল-বাকারা ১৮৫)

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ - "দ্বীনের ব্যাপারে তিনি তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি।" (সূরাহ ২২: আল-হাজ্জ ৭৮)

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি বা রিসালাতের সাক্ষ্যদানেরও অনেকগুলো শর্ত রয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ৮টি শর্ত রয়েছে। নিম্নে এ ৮টি শর্তের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরা হলো।

(এক) যথার্থ ইলম আল ইলমু বিমা'নাহা।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা আত্-তাসলিমা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত সত্য রাসূল। এ বিষয়ে যথার্থ ইলম অর্জন করা রিসালাতের সাক্ষ্যদানের অন্যতম শর্ত । মহান আল্লাহ বলেন, مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَـٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ - "মুহাম্মাদ তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নয়; তবে মহান আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী ।" (সূরাহ ৩৩; আল-আহযাব - ৪০)

সাক্ষ্যদানের সাথে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের যথার্থ ইল্ম অত্যাবশ্যক

(১) তাঁর নাম ও বংশ পরিচয় সম্পর্কে জানা। তিনি হলেন- মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুল মুত্তালিব বিন হাশিম বিন আবদে মানাফ বিন কুসাই বিন কিলাব বিন মুররাহ। প্রত্যেক মুসলিমকে অবশ্যই জানতে হবে তার রব সম্পর্কে, যার সে ইবাদাত করবে। তিনি হলেন মহান আল্লাহ। তাঁর রাসূল সম্পর্কে জানতে হবে, যার সে অনুসরণ করবে। তিনি হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা আত্- তাসলিমা। তাঁর দীন সম্পর্কে জানতে হবে, যে দীনের উপর সে চলবে। তা হলো ইসলাম।

(২) তাঁর 'বাশারিয়্যাহ বা মানুষ হওয়া সম্পর্কে জানা। তিনি মহান আল্লাহর বান্দা, তাঁর ইবাদাত করা যায় না। মহান আল্লাহ বলেন, سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ - "পবিত্র মহান সে সত্তা, যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে নিয়ে গিয়েছেন আল মাসজিদুল হারাম থেকে আল মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত, যার আশপাশে আমি বরকত দিয়েছি, যেন আমি তাকে আমার কিছু নিদর্শন দেখাতে পারি । তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" (সূরাহ ১৭; আল-ইসরা- ১)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেন, "তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করো না, যেমন 'ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে নাছারা (খ্রিস্টানরা) বাড়াবাড়ি করেছিল। আমি তাঁর বান্দা, তাই তোমরা বলবে, মহান আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল ।" (সহীহ বুখারী: ৩৪৪৫)

(৩) তাঁর নবুওয়াত ও রিসালাত সম্পর্কে জানা। তিনি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য নবী ও রাসূল । মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ - "বল, হে মানুষ, আমি তোমাদের সবার প্রতি মহান আল্লাহর রাসূল, যার রয়েছে আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব। তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু দেন। সুতরাং, তোমরা মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আন ও তাঁর প্রেরিত উম্মী নবীর প্রতি, যে মহান আল্লাহ ও তাঁর বাণীসমূহের প্রতি ঈমান রাখে। আর তোমরা তার অনুসরণ কর, আশা করা যায়, তোমরা হিদায়াত লাভ করবে।" (সূরাহ ৭; আল-আ'রাফ - ১৫৮)

(৪) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর সীরাত বা জীবনী সম্পর্কে জানা, যা কুরআন কারীম ও সহীহ হাদীসমূহে এসেছে। মহান আল্লাহ বলেন, لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا - "অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদের জন্য যারা মহান আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং মহান আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।" (সূরাহ ৩৩; আল-আহযাব - ২১)

(৫) তাঁর সৃষ্টিগত ও চারিত্রিক গুণাবলি সম্পর্কে জানা। মহান আল্লাহ বলেন, - وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

"আর নিশ্চয় তুমি মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত।" (সূরাহ ৬৮; আল-ক্বালাম - ৪)

(৬) তাঁর সত্তাগত আজ জাতিই ইয়াতু ও শরয়ী আশ শারই ইয়াতু বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে জানা।

সত্তাগত বৈশিষ্ট্য যেমন-

(ক) তাঁর চক্ষু ঘুমায়, অন্তর ঘুমায় না। হাদীসে এসেছে, আবূ সালামা ইব্ন আবদুর রাহমান রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি আয়িশাহ রাজিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করলেন, রামাজান মাসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর সালাত কেমন ছিল? 'আয়িশা রাজিয়াল্লাহু আনহা বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা রামাজান মাসে ও অন্যান্য সব মাসের রাতে এগার রাক'আতের অধিক সালাত আদায় করতেন না। প্রথমে চার রাক'আত পড়তেন। এ চার রাক'আত আদায়ের সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর আরো চার রাক'আত

সালাত আদায় করতেন। এ চার রাক'আতের সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর তিন রাক'আত আদায় করতেন। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি বিতর সালাত আদায়ের পূর্বে ঘুমিয়ে পড়েন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বললেন, আমার চোখ ঘুমায়, আমার অন্তর ঘুমায় না। (সহীহ বুখারী: ৩৫৬৯; সহীহ মুসলিম: ৭৩৮)

(খ) তিনি তাঁর সামনে থেকে যেভাবে দেখেন, পিছনেও সেভাবে দেখেন। হাদীসে এসেছে, আবূ হুরায়রাহ রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা সালাত শেষ করে পিছনে ফিরে বললেন, "হে অমুক ব্যক্তি! তুমি কি সুষ্ঠুভাবে তোমার সালাত আদায় করবে না? সালাত আদায়কারী কিভাবে তার সালাত আদায় করে তা কি সে দেখে না? কেননা, সে নিজের উপকারের জন্যই সালাত আদায় করে । মহান আল্লাহর শপথ! আমি সামনের দিকে যেভাবে দেখতে পাই, পিছনেও সে রকমই দেখতে পাই।" (সহীহ মুসলিম: ৪২৩)

এ ধরনের আরো অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

আর শর'য়ী বৈশিষ্ট্য যেমন-

(ক) তাঁর ওফাতের পরে তাঁর স্ত্রীদের অন্যদের জন্য বিবাহ করা হারাম। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا -

"আর মহান আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়া এবং তার (মৃত্যুর) পর তার স্ত্রীদেরকে বিয়ে করা কখনো তোমাদের জন্য সঙ্গত নয়। নিশ্চয় এটি মহান আল্লাহর কাছে গুরুতর পাপ।" (সূরাহ ৩৩: আল-আহযাব - ৫৩)

(খ) তাঁর জন্য ধারাবাহিক সিয়াম আস সাউমুল বিছাল বৈধ করা হয়েছে, যা তার উম্মাতের জন্য বৈধ নয়। আবূ হুরায়রাহ রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেন, 'তোমরা সওমে বেসাল পালন করা হতে বিরত থাক", (বাক্যটি তিনি) দুবার বললেন। তাঁকে বলা হল, আপনি তো সওমে বেসাল করেন। তিনি বললেন "আমি এভাবে রাত যাপন করি যে, আমার প্রতিপালক আমাকে পানাহার করিয়ে থাকেন। তোমরা তোমাদের সাধ্যানুযায়ী আমল করার দায়িত্ব গ্রহণ করো।" (সহীহ বুখারী: ১৯৬৬; সহীহ মুসলিম: ১১০৩)

এ ধরনের আরো অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

(৭) তাঁর নবুওয়াতের দলীলসমূহ সম্পর্কে জানা। এ ব্যাপারে কুরআন কারীম সহীহ হাদীসে অসংখ্য দলীল রয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, তিনি সত্যিই মহান আল্লাহর রাসূল। এ ছাড়া অনুভূতিগত ও আকলী অসংখ্য দলীল রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ - "আর যখন মারইয়াম পুত্র ঈসা বলেছিল, 'হে বনী ইসরাঈল, নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট মহান আল্লাহর রাসূল। আমার পূর্ববর্তী তাওরাতের সত্যায়নকারী এবং একজন রাসূলের সুসংবাদদাতা যিনি আমার পরে আসবেন, যার নাম আহমদ অতঃপর সে যখন সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে আগমন করল, তখন তারা বলল 'এটাতো স্পষ্ট যাদু'।" (সূরাহ ৬১; আস-সাফ- ৬)

হাদীসে এসেছে, 'আতা ইবনু ইয়াসার রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু আস রাজিয়াল্লাহু আনহুকে বললাম, আপনি আমাদের কাছে তাওরাতে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর গুণাবলি বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, আচ্ছা। আল্লাহর কসম! কুরআনে বর্ণিত তাঁর কিছু গুণাবলি তাওরাতেও উল্লেখ করা হয়েছে, "হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করেছি" এবং উম্মীদের রক্ষক হিসাবেও । আপনি আমার বান্দা ও আমার রাসূল। আমি আপনার নাম মুতাওয়াক্কিল (আল্লাহর উপর ভরসাকারী) রেখেছি। তিনি বাজারে কঠোর রূঢ় ও নির্দয় স্বভাবের ছিলেন না। তিনি মন্দের প্রতিশোধ মন্দ দ্বারা নিতেন না বরং মাফ করে দিতেন, ক্ষমা করে দিতেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে ততক্ষণ মৃত্যু দিবেন না যতক্ষণ না তাঁর দ্বারা বিকৃত মিল্লাতকে ঠিক পথে আনেন অর্থাৎ যতক্ষণ না তারা আরববাসীরা) **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'**-এর ঘোষণা দিবে। আর এ কালেমার মাধ্যমে অন্ধ-চক্ষু, বধির-কর্ণ ও আচ্ছাদিত হৃদয় খুলে যাবে। (সহীহ বুখারী: ২১২৫)

(৮) তাঁর উম্মাত হিসেবে তাঁর অধিকারসমূহ সম্পর্কে জানা। তিনি যে সংবাদ দিয়েছেন, তা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা, তিনি যে নির্দেশ দিয়েছেন, তার আনুগত্য করা । তিনি যা নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকা। একমাত্র তাঁর অনুসরণেই মহান আল্লাহর ইবাদাত করা। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ - "রাসূল তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে তিনি তোমাদের

নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও এবং মহান আল্লাহকেই ভয় কর, নিশ্চয় মহান আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর।" (সূরাহ ৫৯; আল-হাশর - ৭)

(৯) তাঁর মাধ্যমে নবুওয়াত ও রিসালাতের সমাপ্তি সম্পর্কে জানা। মহান আল্লাহ বলেন, مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ - "মুহাম্মাদ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নয়; তবে আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী ।" (সূরাহ ৩৩; আল-আহযাব- ৪০)

আবূ হুরায়রাহ রাজিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন,"আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের অবস্থা এমন, এক ব্যক্তি যেন একটি গৃহ নির্মাণ করল; তাকে সুশোভিত ও সুসজ্জিত করল, কিন্তু এক পাশে একটি ইটের জায়গা খালি রয়ে গেল। অতঃপর লোকজন এর চারপাশে ঘুরে আশ্চর্য হয়ে বলতে লাগল ঐ শূন্যস্থানের ইটটি লাগানো হল না কেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেন, আমিই সে ইট। আর আমিই সর্বশেষ নবী।" (সহীহ বুখারী ৩৫৩৫; সহীহ মুসলিম: ২২৮৬)

(১০) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর রিসালাত পূববর্তী সকল নবী আলাইহিস সালামের শরী'আতসমূহকে রহিতকারী, এ সম্পর্কে জানা। মহান আল্লাহ বলেন, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ - "আর আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি যথাযথভাবে, এর পূর্বের কিতাবের সত্যায়নকারী ও এর উপর তদারককারীরূপে।" (সূরাহ ৫; আল-মায়িদাহ - ৪৮)

(১১) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর নবুওয়াতের পরে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দীন মহান আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়, এ সম্পর্কে জানা। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ - "আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন চায় তবে তার কাছ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (সূরাহ ৩; আলে-ইমরান - ৮৫) আবূ হুরায়রাহ রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা আত্-তাসলিমা বলেছেন, সে সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! ইয়াহুদী হোক আর খৃস্টান হোক, যে ব্যক্তিই আমার এ রিসালাতের খবর শুনেছে অথচ আমার রিসালাতের উপর ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করবে, অবশ্যই সে জাহান্নামী হবে ।" (সহীহ মুসলিম: ১৫৩)

(১২) তাঁর রিসালাত কিয়ামাত পর্যন্ত সকল মানুষ ও জীনের উপর বিস্তৃত, এ সম্পর্কে জানা। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ - "আর আমি তো তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি।" (সূরাহ ২১; আল-আম্বিয়া - ১০৭) قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا - "বল, 'হে মানুষ, আমি তোমাদের সবার প্রতি মহান আল্লাহর রাসূল।" (সূরাহ ৭; আল- আ'রাফ - ১৫৮)

(১৩) তিনি তাঁর রিসালাত পরিপূর্ণরূপে পৌছিয়েছেন, এ সম্পর্কে জানা। মহান আল্লাহ বলেন,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا -

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে।" (সূরাহ ৫; আল-মায়িদাহ - ৩)

আয়িশাহ রাজিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, অর্থাৎ, যদি কেউ তোমাকে বলে যে, তাঁর অবতীর্ণ বিষয়ের সামান্য কিছুও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা গোপন করেছেন তা হলে অবশ্যই সে মিথ্যা বলেছে। আল্লাহ বলেছেন, "হে রাসূল! আপনি তা পৌঁছে দিন যা আপনার প্রতি আপনার রবের তরফ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে।" (সূরাহ ৫; মায়েদা - ৬৭) (সহীহ বুখারী: ৪৬১২)

(১৪) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর নিষ্পাপ হওয়া সম্পর্কে জানা। তিনি সকল প্রকার শিরক, কবীরা গুনাহ ও খারাপ চরিত্র থেকে নিষ্পাপ। তাবলীগ ও রিসালাতের ক্ষেত্রেও নিষ্পাপ মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ هَـٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ - "বল, 'এটা আমার পথ। আমি জেনে-বুঝে মহান আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেই এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে তারাও। আর মহান আল্লাহ পবিত্র মহান এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই' ।" (সূরাহ ১২; ইউসুফ- ১০৮) وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ - مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ - وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ - إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ - عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ - "কসম নক্ষত্রের, যখন তা অস্ত যায়। তোমাদের সঙ্গী পথভ্রষ্ট হয়নি এবং বিপথগামী হয়নি। আর সে মনগড়া কথা বলে না। তাতো কেবল ওহী, যা তার প্রতি ওহীরূপে প্রেরণ করা হয়। তাকে শিক্ষা দিয়েছে প্রবল শক্তিধর," (সূরাহ ৫৩; আন-নাজম- ১-৫)

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ - "আর নিশ্চয় তুমি মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত।" (সূরাহ ৬৮; আল-ক্বলাম - ৪) يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ - 'হে রাসূল, তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার নিকট যা নাযিল করা হয়েছে, তা পৌঁছে দাও আর যদি তুমি না কর তবে তুমি তাঁর রিসালাত পৌঁছালে না। আর মহান আল্লাহ তোমাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।" (সূরাহ ৫; আল-মায়িদাহ - ৬৭) لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ - "নিশ্চয়ই তোমাদের নিজদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছেন, তা তার জন্য কষ্টদায়ক যা তোমাদেরকে পীড়া দেয়। তিনি তোমাদের কল্যাণকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, পরম দয়ালু।" (সূরাহ ৯; আত-তাওবাহ - ১২৮)

(দুই) এ সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অন্তরের দৃঢ়তা ইস্তি ক্বানুল ক্বালবী বি হাজিহিস শাহাদাতি রিসালাতের সাক্ষ্যদানের পরে মুমিনের অন্তরে এমন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে, যাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ না থাকে। কোন প্রকারের সন্দেহ তৈরি হলে এ সাক্ষ্যদান কোনো কাজে আসবে না। যেমন মুনাফিক্বরা মুখে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি সাক্ষ্য দিয়েছিল, কিন্তু অন্তর থেকে সন্দেহ দূরীভূত হয়নি। এ জন্য মহান আল্লাহ তাদের সাক্ষ্যদানকে মিথ্যা হিসেবে অভিহিত করেছেন । মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ - "মুমিন কেবল তারাই যারা মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর সন্দেহ পোষণ করেনি। আর নিজদের সম্পদ ও নিজদের জীবন দিয়ে মহান আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে। এরাই সত্যনিষ্ঠ।" (সূরাহ ৪৯; আল-হুজুরাত - ১৫) إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ - "যখন তোমার কাছে মুনাফিক্বরা আসে, তখন বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহ জানেন যে, অবশ্যই তুমি তাঁর রাসূল। আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, অবশ্যই মুনাফিক্বরা মিথ্যাবাদী।" (সূরাহ ৬৩; আল-মুনাফিক্বূন - ১) এ সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অন্তরের দৃঢ়তা তখন অর্জিত হয়, যখন সে তাঁর সুন্নাতসমূহকে আঁকড়ে ধরবে এবং বিদ'আতের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ - "রাসূল

তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে তিনি তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও এবং মহান আল্লাহকেই ভয় কর, নিশ্চয় মহান আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর।" (সূরাহ ৫৯; আল-হাশর - ৭)

উমার রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন, **ইন্নামাল আ'মালু বিন নিয়্যাত** "কাজ (এর প্রাপ্য হবে) নিয়ত অনুযায়ী। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিদান পাবে। তাই যার হিজরত হবে ইহকাল লাভের অথবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে, তবে তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই হবে, যে জন্যে, সে হিজরত করেছে (সহীহ বুখারী: ১; সহীহ মুসলিম - ১৯০৭)

আয়িশাহ রাজিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন, **মান আহ্দাসা ফী আমরিনা হাজা মা লাইছা ফীহি ফাহুঅ রাদ্দুন** অর্থাৎ "কেউ আমাদের এ শরী'আতে নাই এমন কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটালে তা প্রত্যাখ্যাত।" (সহীহ বুখারী: ২৬৯৭; সহীহ মুসলিম: ১৭১৮) উম্মুল মুউমিনীন আয়িশাহ রাজিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, **"মান 'আমিলা 'আমালান লাইছা 'আলাইহি আমরুনা ফাহুঅ রাদ্দুন"** অর্থাৎ, যে ব্যক্তি এমন কোন কর্ম করলো যাতে আমাদের নির্দেশনা নেই, তা প্রত্যাখ্যাত হবে। (সহীহ মুসলিম: ১৭১৮)

ইরবাদ ইবনু সারিয়াহ রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে এসেছে, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে সালাত আদায় করলেন, অতঃপর আমাদের দিকে ফিরে আমাদের উদ্দেশে জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেন, তাতে চোখগুলো অশ্রুসিক্ত হলো এবং অন্তরগুলো বিগলিত হলো। তখন এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ যেন কারো বিদায়ী ভাষণ। অতএব আপনি আমাদেরকে কি নির্দেশ দেন? তিনি বলেন, "আমি তোমাদেরকে আল্লাহভীতির, শ্রবণ ও আনুগত্যের উপদেশ দিচ্ছি, যদিও সে (আমীর) একজন হাবশী গোলাম হয়। কারণ, তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে জীবিত থাকবে তারা অচিরেই প্রচুর মতবিরোধ দেখবে। তখন তোমরা অবশ্যই আমার সুন্নাত এবং আমার হিদায়াতপ্রাপ্ত খলীফাগণের সুন্নাত অনুসরণ করবে, তা দাঁত দিয়ে কামড়ে আঁকড়ে থাকবে। সাবধান! (ধর্মে) প্রতিটি নবাবিষ্কার সম্পর্কে! কারণ প্রতিটি নবাবিষ্কার হলো বিদ'আত এবং প্রতিটি বিদ'আত হলো ভ্রষ্টতা।" (আবূ দাউদ: ৪৬০৭; জামে-আত-তিরমিযী: ২৬৭৬; শাইখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন) অন্তরের

দৃঢ়তার জন্য মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর সুন্নাতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যম হলো, তিনি যা নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর আনুগত্য করা, তিনি যা বর্ণনা দিয়েছেন তা বিশ্বাস করা, তিনি যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা, একমাত্র তাঁর পদ্ধতিতে মহান আল্লাহর ইবাদাত করা । মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا - لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا - "নিশ্চয় আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে । যাতে তোমরা মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আন, তাকে সাহায্য ও সম্মান কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় মহান আল্লাহর তাসবীহ পাঠ কর।" (সূরাহ ৪৮; আল-ফাতহ - ৮-৯) অন্তরে দৃঢ়তার লক্ষণ হলো, তিনি যা শিখিয়েছেন তা শিখা, আমল করা, অন্যকে শিখানো, শিক্ষক ও আমলকারীদের সম্মান করা । মহান আল্লাহ বলেন,- وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ'তোমরা রব্বানী হও। যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দিতে এবং তা অধ্যয়ন করতে।" (সূরাহ ৩; আলে-ইমরান ৭৯) وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ - إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ "বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই মহান আল্লাহকে ভয় করে। নিশ্চয় মহান আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল।" (সূরাহ ৩৫; ফাতির - ২৮)

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ - "যে ব্যক্তি রাতের প্রহরে সিজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তার রব-এর রহমত প্রত্যাশা করে (সে কি তার সমান যে এরূপ করে না) বল, 'যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান?' বিবেকবান লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।" (সূরাহ ৩৯; আয-যুমার -৯) অন্তরের দৃঢ়তার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর ফয়সালাকে আন্তরিকভাবে মেনে নিতে হবে। এতে সে ঈমানের স্বাদ লাভ করবে। মহান আল্লাহ বলেন, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا - "অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোন দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়।" (সূরাহ ৪; আন-নিসা - ৬৫)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا - "আর মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য নিজদের ব্যাপারে অন্য কিছু এখতিয়ার করার অধিকার থাকে না; আর যে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।" (সূরাহ ৩৩; আল-আহযাব - ৩৬) আব্বাস ইবনু আবদুল মুত্তালিব রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমাকে বলতে শুনেছেন, "সে ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পেয়েছে, যে রব হিসেবে মহান আল্লাহকে, দীন হিসেবে ইসলামকে এবং রাসূল হিসেবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমাকে সন্তুষ্ট চিত্তে স্বীকার করেছে।" (সহীহ মুসলিম- ৩৪) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর সুন্নাত থেকে বিমুখ হওয়া অন্তরের বক্রতা ও মুনাফেক্বীর লক্ষণ। মহান আল্লাহ বলেন, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا - وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا - "তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা দাবি করে যে, নিশ্চয় তারা ঈমান এনেছে তার উপর, যা নাযিল করা হয়েছে তোমার প্রতি এবং যা নাযিল করা হয়েছে তোমার পূর্বে। তারা তাগূতের কাছে বিচার নিয়ে যেতে চায় অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাকে অস্বীকার করতে। আর শয়তান চায় তাদেরকে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত করতে। আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'তোমরা আস যা মহান আল্লাহ নাযিল করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে', তখন মুনাফিক্বদেরকে দেখবে তোমার কাছ থেকে সম্পূর্ণরূপে ফিরে যাচ্ছে।" (সূরাহ ৪; আন-নিসা- ৬০-৬১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর সুন্নাতের অনুসরণ দু'ভাবে করতে হয়। একটি করার মাধ্যমে অনুসরণ, অপরটি বর্জন করার মাধ্যমে অনুসরণ। দুটিই অন্তরের দৃঢ়তা লাভের মাধ্যম। এ জন্য মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ - "রাসূল তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে সে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও এবং আল্লাহকেই ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর।" (সূরাহ ৫৯; আল-হাশর ৭)

পালন করার মাধ্যমে সুন্নাত তা হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা যা করেছেন, অথবা করার নির্দেশ দিয়েছেন অথবা

করার অনুমতি দিয়েছেন। যেমন: পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের আযান দেয়া, হজ্জের তালবিয়্যাহ উচ্চারণ করা প্রভৃতি ।

বর্জন করার সুন্নাত : তা হলো চাহিদা থাকা সত্ত্বেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা যা বর্জন করেছেন। যেমন- দু' ঈদের সালাতে, জানাযার সালাতে আযান না দেয়া প্রভৃতি। প্রথমটি যেমন করার নাম সুন্নাত, দ্বিতীয়টি না করার নাম সুন্নাত। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে আযান দেয়া সুন্নাত, ঈদ ও জানাযায় আযান না দেয়া সুন্নাত।

(তিন) এ সাক্ষ্যদানের প্রতি প্রকাশ্যে ও গোপনে আত্মসমর্পণ
আল ইনক্বিয়াদু লাহা জাহিরান অবাতিনাম

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি সাক্ষ্যদানের সাথে সাথে তাঁর নবুওয়াত ও রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস করা, তিনি যা বর্ণনা করেছেন তা সত্যায়ন করা, তিনি যা কিছু করার নির্দেশ দিয়েছেন তার আনুগত্য করা, তিনি যা করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা, তার জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। এ বিষয়গুলোর প্রতি প্রকাশ্যে ও গোপনে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

- قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ "বল, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদেরকে ভালোবাসেন না।" (সূরাহ ৩; আলে-ইমরান ৩২)

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ - "বল, হে মানুষ, আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর রাসূল, যার রয়েছে আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব। তিনি ছড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু দেন। সুতরাং, তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আন ও তাঁর প্রেরিত উম্মী নবীর প্রতি, যে আল্লাহ ও তাঁর বাণীসমূহের প্রতি ঈমান রাখে। আর তোমরা তার অনুসরণ কর, আশা করা যায়, তোমরা হিদায়াত লাভ করবে।" (সূরাহ ৭; আল-আ'রাফ ১৫৮)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর প্রতি আনুগত্যের সহায়ক কর্মসমূহ

(১) উভয় প্রকার ওহীর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা দু' ধরনের ওহী নিয়ে এসেছেন। একটি কুরআন, অপরটি সুন্নাহ। এ দু' প্রকার ওহীর প্রতি বিশ্বাস করা ঈমানের অংশ । মহান আল্লাহ বলেন, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ - مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ - وَمَا يَنطِقُ عَنِ

الْهَوَىٰ - إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ - عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ - "কসম নক্ষত্রের, যখন তা অস্ত যায়। তোমাদের সঙ্গী পথভ্রষ্ট হয়নি এবং বিপদ গামীও হয়নি। আর সে মনগড়া কথা বলে না। তাতো কেবল ওহী, যা তার প্রতি ওহীরূপে প্রেরণ করা হয়। তাকে শিক্ষা দিয়েছে প্রবল শক্তিধর," (সূরাহ ৫৩; আন- নাজম - ১-৫)

এ দুটি ওহী-ই সবচাইতে সত্য বাণী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা হলেন সৃষ্টির মধ্যে সবচাইতে সত্যবাদী। মহান আল্লাহ বলেন, **ইলা সিরাতিম মুস্তাক্বীম** بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ - "এবং তোমার প্রতি নাযিল করেছি কুরআন, যাতে তুমি মানুষের জন্য স্পষ্ট করে দিতে পার, যা তাদের প্রতি নাযিল হয়েছে। আর যাতে তারা চিন্তা করে।" (সূরাহ ১৬; আন-নাহল - ৪৪) وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ - "আর যে সত্য নিয়ে এসেছে এবং যে তা সত্য বলে মেনে নিয়েছে, তারাই হল মুত্তাক্বী।" (সূরাহ ৩৯; আয-যুমার - ৩৩)

(২) মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, সন্দেহ ও উপেক্ষা থেকে মুক্ত থাকা: এ বিষয়গুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর প্রতি ঈমানকে নষ্ট করে দেয়। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا - "আর যে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার জন্য হিদায়াত প্রকাশ পাওয়ার পর এবং মুমিনদের পথের বিপরীত পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে ফেরাব যেদিকে সে ফিরে এবং তাকে প্রবেশ করাব জাহান্নামে। আর আবাস হিসেবে তা খুবই মন্দ।" (সূরাহ ৪; আন-নিসা - ১১৫)

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ - "সুতরাং, যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে তাদের উপর কঠিন শাস্তি।" (সূরাহ ২৪; আন-নূর - ৬৩)

(৩) কোন বিষয়ে উলামায়ে কিরামদের ইখতেলাফ হলে তা সমাধানের জন্য তাঁর সহীহ হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্তন করা। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا - "হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর মহান আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের ।

অতঃপর কোনো বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা মহান আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যার্পণ করাও- যদি তোমরা মহান আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর।" (সূরাহ ৪; আন-নিসা - ৫৯)

(৪) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর আনুগত্যের জন্য মহান আল্লাহর নিকট দু'আ করা। মহান আল্লাহ সালাতের প্রত্যেক রাকা'আতে এ দু'আ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন । মহান আল্লাহ বলেন, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ - "আপনারই আমরা ইবাদাত করি এবং আপনারই নিকট আমরা সাহায্য চাই। আমাদেরকে সরল পথ দেখান। পথের হিদায়াত দিন। তাদের পথ, যাদের উপর আপনি অনুগ্রহ করেছেন। যাদেরকে নিয়ামত দিয়েছেন।" (সূরাহ ১; আল-ফাতিহাহ - ৫-৭) 'আবদুর রহমান ইবনু আওফ রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, আমি উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ রাজিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা রাতের বেলা যখন সালাত আদায় করতেন তখন কীভাবে তাঁর সালাত শুরু করতেন? জবাবে 'আয়িশাহ রাজিয়াল্লাহু আনহা বললেন, রাতে যখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা সালাত আদায় করতে উঠতেন তখন এ দু'আটি পড়ে সালাত শুরু করতেন **আল্লাহুম্মা রব্বা জিররাঈলা অমিকাঈলা অইসরাফীলা ফাতি রাস সামাওয়াতি অল আরজ আলিমাল গাইবি অশশাহাদাতি আনতা তাহকুমু বাইনা ইবাদিকা ফীমা কানু ফীহি ইয়াখতালিফুন ইহদিনী লিমাখ তুলিফা ফীহি মিনাল হাক্কি বিইজনিকা ইন্নাকা তাহদি মান তাশাউ ইলা সিরাতিম মুস্তাক্বীম** (অর্থ), "হে আমার মহান আল্লাহ! জিব্রীল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের প্রতিপালক, আসমান ও জমিনের গ্রষ্টা, প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়সমূহের জ্ঞানের অধিকারী। তোমার বান্দারা যেসব বিষয়ে মতানৈক্য পোষণ করে তুমিই সেগুলোর ফায়সালা করবে। সত্য ও ন্যায়ের যেসব বিষয়ে মতানৈক্য পোষণ করা হয়েছে সে বিষয়ে তুমি আমাকে পথ দেখাও। তুমিই তো যাকে ইচ্ছা সরল-সহজ পথ দেখিয়ে থাকো।" (সহীহ মুসলিম: ৭৭০)

(৫) কুরআন কারীম বুঝে পাঠ করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা আত্-তাসলিমা হলেন কুরআন কারীমের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। তাঁর চরিত্র ও আমল হলো আল- কুরআন। এ জন্য কুরআন

কারীমকে যত বুঝবে ততই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর আনুগত্য বাড়বে।

মহান আল্লাহ বলেন, - أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا "তবে কি তারা কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তা- ভাবনা করে না? নাকি তাদের অন্তরসমূহে তালা রয়েছে?" (সূরাহ ৪৭; মুহাম্মাদ - ২৪)

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ - "আর এটি তো আমার সোজা পথ। সুতরাং, তোমরা তার অনুসরণ কর এবং অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না, তাহলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এগুলো তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা তাক্বওয়া অবলম্বন কর।" (সূরাহ ৬; আল-আন'আম - ১৫৩)

(৬) উলামায়ে রাব্বানীদের সাহচর্য্যে থাকা। বিদ'আতী ও ফাসিকদের সাহচর্য পরিত্যাগ করা। সুন্নাতের অনুসারী আলিমদের সাহচর্য্যে থাকলে সুন্নাতের অনুসরণ সহজ হয়ে যায়। বিদ'আতী আলিম ও প্রবৃত্তি পূজারী ব্যক্তির সাহচর্য্যে থাকলে সুন্নাতের অনুসরণ করা যায় না। মহান আল্লাহ বলেন, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا - "আর তুমি নিজকে ধৈর্যশীল রাখ তাদের সাথে, যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের রবকে ডাকে, তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এবং দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে তোমার দু'চোখ যেন তাদের থেকে ঘুরে না যায় । আর ওই ব্যক্তির আনুগত্য করো না, যার অন্তরকে আমি আমার যিকর থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে এবং যার কর্ম বিনষ্ট হয়েছে।" (সূরাহ ১৮; আল-কাহাফ - ২৮)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ - "হে মুমিনগণ, তোমরা মহান আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।" (সূরাহ ৯; আত-তাওবাহ - ১১৯)

"আর যখন তুমি তাদেরকে দেখ, যারা আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে উপহাসমূলক সমালোচনায় রত আছে, তুমি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, যতক্ষণ না তারা অন্য কথাবার্তায় লিপ্ত হয় । আর যদি শয়তান তোমাকে ভুলিয়ে দেয়, তবে স্মরণের পর যালিম সম্প্রদায়ের সাথে বসো না।" (সূরাহ ৬; আল-আন'আম- ৬৮)

আবূ মূসা রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা আত্-তাসলিমা বলেছেন, "সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত হল, কস্তুরীওয়ালা ও কামারের হাপরের ন্যায়। কস্তুরীওয়ালা হয়ত তোমাকে কিছু দান করবে কিংবা তার নিকট হতে তুমি কিছু খরিদ করবে কিংবা তার নিকট হতে তুমি সুবাস পাবে। আর কামারের হাপর হয়ত তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে কিংবা তার নিকট হতে পাবে দুর্গন্ধ ।" (সহীহ বুখারী: ৫৫৩৪; সহীহ মুসলিম: ২৬২৮)

আবু হুরায়রাহ রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা আত্-তাসলিমা বলেছেন, **আর রাজুলু আ'লা দ্বীনি খালিইলিহী ফালইয়ানজুর আহাদুকুম মান ইউ খালিলু** অর্থাৎ "মানুষ তার বন্ধুর রীতিনীতির অনুসারী হয়। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকেই যেন লক্ষ করে, সে কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করছে।" (আবূ দাউদ: ৪৮৩৩; জামে- আত-তিরমিযী: ২৩৭৮; শাইখ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)

(৭) প্রবৃত্তির অনুসরণ (ইত্তাবাউল হাওয়া) থেকে মুক্ত হওয়া। প্রবৃত্তির অনুসরণ মানুষকে গোমরাহীর দিকে ধাবিত করে। মহান আল্লাহ বলেন, يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ - "(হে দাউদ), নিশ্চয় আমি তোমাকে যমীনে খলীফা বানিয়েছি, অতএব তুমি মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার কর আর প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, কেননা তা তোমাকে মহান আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। নিশ্চয় যারা মহান আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয় তাদের জন্য (পরকালে) কঠিন আজাব রয়েছে, কারণ তারা হিসাব দিবসকে ভুলে গিয়েছিল। (সূরাহ -৩৮, সোয়াদ - ২৬) فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ - "আর আল্লাহর দিকনির্দেশনা ছাড়া যে নিজের খেয়াল খুশির অনুসরণ করে তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? নিশ্চয় আল্লাহ যালিম কওমকে হিদায়াত করেন না।" (সূরাহ ২৮; আল-ক্বাসাস -৫০)

(৮) দলীলের উপর যুক্তিকে প্রাধান্য না দেয়া: আল কুরআনুল কারীম ও সহীহ হাদীসকে দীন পালনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তা যুক্তিতে মিলুক বা না মিলুক। মহান আল্লাহ বলেন, فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ - "সুতরাং, তোমরা মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আন ও তাঁর প্রেরিত উম্মী নবীর প্রতি, যে মহান আল্লাহ ও

তাঁর বাণীসমূহের প্রতি ঈমান রাখে। আর তোমরা তার অনুসরণ কর, আশা করা যায়, তোমরা হিদায়াত লাভ করবে।" (সূরা ৭; আল-আ'রাফ- ১৫৮)

আনাস ইবনু মালিক রাজিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে। তিন জনের একটি দল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর 'ইবাদাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর স্ত্রীদের বাড়িতে আসল । যখন তাঁদেরকে এ সম্পর্কে জানানো হলো, তখন তারা ইবাদাতের পরিমাণ কম মনে করল এবং বলল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর সঙ্গে আমাদের তুলনা হতে পারে না। কারণ, তাঁর আগের ও পরের সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। এমন সময় তাদের মধ্য হতে একজন বলল, আমি সারা জীবন রাতভর সালাত আদায় করতে থাকব। অপর একজন বলল, আমি সবসময় সিয়াম পালন করব এবং কক্ষনো বাদ দিব না। অপরজন বলল, আমি নারী সংগ ত্যাগ করব, কখনও বিয়ে করব না। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা আত্-তাসলিমা তাদের নিকট এলেন এবং বললেন, "তোমরা কি ঐ সব লোক যারা এমন এমন কথাবার্তা বলেছ? আল্লাহর কসম! আমি মহান আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশি ভয় করি এবং তোমাদের চেয়ে তাঁর প্রতি বেশি অনুগত; অথচ আমি সিয়াম পালন করি, আবার তা থেকে বিরতও থাকি। সালাত আদায় করি এবং নিদ্রা যাই ও মেয়েদেরকে বিয়েও করি। ফামান রাগিবা আন সুন্নাতি ফালাইছা মিন্নি অর্থাৎ সুতরাং, যারা আমার সুন্নাতের প্রতি বিরাগ পোষণ করবে, তারা আমার দলভুক্ত নয় ।" (সহীহ বুখারী: ৫০৬৩; সহীহ মুসলিম: ১৪০১)

(৯) অন্ধ অনুকরণ বর্জন করা: মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ - "আর যখন তাদেরকে বলা হয়, মহান 'আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার দিকে ও রাসূলের দিকে আস', তারা বলে, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের যার উপর পেয়েছি তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। যদিও তাদের পিতৃপুরুষরা কিছুই জানত না এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত ছিল না তবুও?" (সূরাহ ৫; আল-মায়িদাহ - ১০৪)

(১০) দীনের দাওয়াত দেয়া: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা আত্- তাসলিমা মানুষকে যে দীনের দিকে দাওয়াত দিয়েছেন, সে দাওয়াত দেয়ার মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য করা। মহান আল্লাহ বলেন, هَٰذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو

- الْأَلْبَابِ "এটা মানুষের জন্য পয়গাম। আর যা দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা হয় এবং তারা জানতে পারে যে, তিনি কেবল এক ইলাহ, আর যাতে বুদ্ধিমানরা উপদেশ গ্রহণ করে।" (সূরাহ ১৪; ইবরাহীম - ৫২)

সাহল ইবনু সা'দ রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, খাইবারের যুদ্ধে একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা আত্-তাসলিমা বললেন, "আগামীকাল সকালে আমি এমন এক লোকের হাতে ঝাণ্ডা তুলে দেব যার হাতে মহান আল্লাহ খাইবারে বিজয় দান করবেন যে মহান আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে এবং যাকে মহান আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ভালোবাসেন।" সাহল রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মুসলিমগণ এ জল্পনায় রাত কাটালো যে, তাদের মধ্যে কাকে দেয়া হবে এ ঝাণ্ডা। সকালে সবাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর কাছে আসলেন, আর প্রত্যেকেই তা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বললেন, "আলী ইবনু আবূ ত্বলিব রাজিয়াল্লাহু আনহু কোথায়?" সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি তো চক্ষুরোগে আক্রান্ত। তিনি বললেন, "তার কাছে লোক পাঠাও।" সে মতে তাঁকে আনা হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা তার উভয় চোখে থুথু লাগিয়ে তার জন্য দু'আ করলেন। ফলে চোখ এমন ভালো হয়ে গেল যেন কখনো চোখে কোন রোগই ছিল না । এরপর তিনি তার হাতে ঝাণ্ডা প্রদান করলেন । তখন 'আলী রাজিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তারা আমাদের মতো (মুসলিম) না হওয়া পর্যন্ত আমি তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বললেন, "তুমি বর্তমান অবস্থায়ই তাদের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে হাজির হও, এরপর তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের প্রতি আহবান করো, মহান আল্লাহর অধিকার প্রদানে তাদের প্রতি যে দায়িত্ব বর্তায় সে সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত কর। কারণ, মহান আল্লাহর কসম! তোমার দাওয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ যদি মাত্র একজন মানুষকেও হিদায়াত দেন তাহলে তা তোমার জন্য লাল রঙের (মূল্যবান) উটের মালিক হওয়ার চেয়ে উত্তম।" (সহীহ বুখারী: ৪২১০; সহীহ মুসলিম: ২৪০৬)

(১১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর সুন্নাতের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ - قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ - "হে মানুষ,

তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে উপদেশ এবং অন্তরসমূহে যা থাকে (যে রোগব্যধি গুলো আছে) তার শিফা, আর মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত। বল, 'আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমতে। সুতরাং, এ নিয়েই যেন তারা খুশি হয়'। এটি যা তারা জমা করে তা থেকে উত্তম।" (সূরাহ ১০; ইউনুস- ৫৭-৫৮)

(১২) তাঁর শরী'আত অনুযায়ী ফয়সালা করা। মহান আল্লাহ বলেন, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا - "অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোনো দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়।" (সূরাহ ৪; আন-নিসা - ৬৫)

(১৩) শরী'আতের দলীলের প্রতি সম্মান করা। মহান আল্লাহ বলেন, آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ - "রাসূল তার নিকট তার রবের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছে, আর মুমিনগণও। প্রত্যেকে ঈমান এনেছে মহান আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাকুল, কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসূলগণের উপর, আমরা তাঁর রাসূলগণের কারও মধ্যে তারতম্য করি না। আর তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং মানলাম। হে আমাদের রব! আমরা আপনারই ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল।" (সূরা ২; আল-বাক্বারাহ - ২৮৫)

(১৪) সর্বক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর অনুসরণ করা। কথা, কাজ, চরিত্র, ইবাদাত, লেনদেন, আচার-আচরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণ করা। মহান আল্লাহ বলেন, لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا - "অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদের জন্য যারা মহান আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং মহান আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।" (সূরাহ ৩৩; আল-আহযাব - ২১)

(১৫) সর্বদা বক্রতা ও বিচ্যুতি থেকে ভয়ে থাকা। বক্রতা (আজ জাইগু) ও বিচ্যুতি (আলইন হিরাফু) অন্তরের দুটি রোগ। এ রোগ থেকে সদা সতর্ক থাকা। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

- "আর যে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার জন্য হিদায়াত প্রকাশ পাওয়ার পর এবং মুমিনদের পথের বিপরীত পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে ফেরাব যেদিকে সে ফিরে এবং তাকে প্রবেশ করাব জাহান্নামে। আর আবাস হিসেবে তা খুবই মন্দ।" (সূরাহ ৪; আন-নিসা - ১১৫)

(১৬) ইলমে হাদীসের জ্ঞান অর্জন করা। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ - الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ "তোমরা রববানী হও। যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দিতে এবং তা অধ্যয়ন করতে।" (সূরাহ ৩; আলে-ইমরান - ৭৯)

(চার) এ সাক্ষ্যদান গ্রহণ করা আল ক্বাবুলু বিহা

রিসালাতের সাক্ষ্যদানের পর তা সর্বান্তকরণে গ্রহণ করতে হবে। কোন বিষয় প্রত্যাখ্যান করা যাবে না। মুনাফিক্বগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর রিসালাতের সকল বিষয় সর্বান্তকরণে গ্রহণ করতে পারেনি। মহান আল্লাহ বলেন, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا - "অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোনো দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়।" (সূরাহ ৪; আন-নিসা - ৬৫)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমাকে সর্বান্তকরণে গ্রহণের সহায়ক কর্মসমূহ

(১) প্রত্যেক মানুষের উপর তাঁকে প্রাধান্য দেয়া : মহান আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমাকে সকল সৃষ্টির উপর মর্যাদা দিয়েছেন । তিনি শেষ নবী, রাসূলদের ইমাম, সমগ্র সৃষ্টিজগতের নেতা। মহান আল্লাহ বলেন, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ - "নিশ্চয়ই তোমাদের নিজদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছেন, তা তার জন্য কষ্টদায়ক যা তোমাদেরকে পীড়া দেয় । তিনি তোমাদের কল্যাণকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, পরম দয়ালু।" (সূরাহ ৯; আত-তাওবাহ - ১২৮) আবূ হুরায়রাহ্ রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন, "আমি কিয়ামাতের দিন আদম সন্তানদের সরদার হব এবং আমিই প্রথম ব্যক্তি যার কবর খুলে যাবে এবং

আমিই প্রথম সুপারিশকারী ও প্রথম সুপারিশ গৃহীত ব্যক্তি।" (সহীহ মুসলিম - ২২৭৮)

(২) তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আদব রক্ষা করা: তাঁর প্রতি সালাত সালাম পেশ করা, প্রশংসা করা, তাঁর সীরাত আলোচনা করা, তাঁর নবুওয়াতের দলীলসমূহ আলোচনা করার মাধ্যমে তাঁর প্রতি আদব রক্ষা করা । মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا - "নিশ্চয় মহান আল্লাহ নবীর প্রতি রহমত ও অনুগ্রহ বর্ষন করেন এবং তাঁর ফেরেশ্তাগণ নবীর জন্য (মাগফিরাত ও রহমত বর্ষনের) দু'আ করে। হে মুমিনগণ, তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।" (সূরাহ ৩৩; আল-আহযাব - ৫৬)

আলী ইবনু আবী ত্বালিব রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন, "কৃপণ সেই লোক যার কাছে আমার আলোচনা করা হয় অথচ সে আমার উপর সালাত পড়ে না।" (আহমাদ, আল-মুসনাদ: ১৭৩৬; জামে- আত-তিরমিযী: ৩৫৪৬; শাইখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

(৩) তিনি যা বর্ণনা করেছেন তা বিশ্বাস করা: মহান আল্লাহ তাঁকে মিথ্যা ও অপবাদ থেকে রক্ষা করেছেন। তাঁর বর্ণনাকে অস্বীকার করা কুফর। মহান আল্লাহ বলেন, أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ - بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ - "নাকি তারা বলে, 'সে তা বানিয়েছে'? বল, 'তবে তোমরা তার মত একটি সূরাহ (বানিয়ে) নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে পারো ডাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' বরং তারা যে ব্যাপারে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেনি, তা তারা অস্বীকার করেছে এবং এখনও তার পরিণতি তাদের কাছে আসেনি। এভাবেই তারা অস্বীকার করেছিল, যারা ছিল তাদের পূর্বে। সুতরাং, তুমি লক্ষ্য কর, কেমন ছিল যালিমদের পরিণাম।" (সূরাহ ১০; ইউনুস - ৩৮-৩৯)

(৪) তাঁর সুন্নাতের পরিপূর্ণ অনুসরণ: তাঁর সুন্নাতকে মেনে নেওয়া ঈমানের ভিত্তি, আর সুন্নাত থেকে বিমুখ হওয়া বক্রতা ও নিফাক্বের লক্ষণ। মহান আল্লাহ বলেন, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا - وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا - "তুমি কি তাদেরকে

দেখনি, যারা দাবি করে যে, নিশ্চয় তারা ঈমান এনেছে তার উপর, যা নাযিল করা হয়েছে তোমার প্রতি এবং যা নাযিল করা হয়েছে তোমার পূর্বে। তারা তাগূতের কাছে বিচার নিয়ে যেতে চায় অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাকে অস্বীকার করতে। আর শয়তান চায় তাদেরকে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত করতে। আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'তোমরা আস যা মহান আল্লাহ নাযিল করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে', তখন মুনাফিক্বদেরকে দেখবে তোমার কাছ থেকে সম্পূর্ণরূপে ফিরে যাচ্ছে।" (সূরাহ ৪; আন-নিসা - ৬০-৬১)

(৫) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর ইত্তেবা-করা: কথা বার্তা, কাজ কর্ম, চরিত্র সর্বক্ষেত্রে তাঁর ইত্তেবা- করা। মহান আল্লাহ বলেন,- مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে মহান আল্লাহরই আনুগত্য করল । আর যে বিমুখ হল, তবে আমি তোমাকে তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক করে প্রেরণ করিনি।" (সূরাহ ৪; আন- নিসা - ৮০)

(৬) সুন্নাত বিরোধীদের প্রতিবাদ করা, জবাব দেয়া: যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর সুন্নাতকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, অস্বীকার করে তাদের জবাব দেয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমাকে সর্বান্তকরণে গ্রহণের প্রমাণ। মহান আল্লাহ বলেন, لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ - وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ - 'এই সম্পদ নিঃস্ব মুহাজিরগণের জন্য ও যাদেরকে নিজেদের ঘর-বাড়ী ও ধন-সম্পত্তি থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল। অথচ, এরা মহান আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির অন্বেষণ করে এবং মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করেন। এরাই তো সত্যবাদী । আর মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা মদীনাকে নিবাস হিসেবে গ্রহণ করেছিল এবং ঈমান এনেছিল (তাদের জন্যও এ সম্পদে অংশ রয়েছে), আর যারা তাদের কাছে হিজরত করে এসেছে তাদেরকে ভালোবাসে। আর মুহাজিরদেরকে যা প্রদান করা হয়েছে তার জন্য এরা তাদের অন্তরে কোন ঈর্ষা অনুভব করে না। এবং নিজেদের অভাব থাকা সত্ত্বেও নিজেদের ওপর তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়। যাদের মনের কার্পণ্য থেকে রক্ষা করা হয়েছে,

তারাই সফলকাম।" (সূরাহ ৫৯; আল-হাশর - ৮-৯) وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ - لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ - "আর যদি তুমি তাদেরকে প্রশ্ন কর, অবশ্যই তারা বলবে, 'আমরা আলাপচারিতা ও খেল-তামাশা করছিলাম। বল, 'আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলের সাথে তোমরা বিদ্রূপ করছিলে? তোমরা ওযর পেশ করো না। তোমরা তোমাদের ঈমানের পর অবশ্যই কুফরী করেছ। যদি আমি তোমাদের থেকে একটি দলকে ক্ষমা করে দেই, তবে অপর দলকে আযাব দেব। কারণ, তারা হচ্ছে অপরাধী।" (সূরাহ ৯; আত-তাওবাহ - ৬৫-৬৬)

(৭) সাহাবায়ে কেরামগণের বিরোধীদের জবাব দেয়াঃ সাহাবায়ে কেরামগণকে ভালোবাসা, তাঁদের প্রশংসা করা, তাঁদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাঁদের সুন্নাতের অনুসরণ করাও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমাকে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করার দলীল । মহান আল্লাহ বলেন, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ - "আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা তাদেরকে অনুসরণ করেছে সুন্দরভাবে, মহান আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তারাও মহান আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাতসমূহ, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। এটাই মহাসাফল্য।" (সূরাহ ৯; আত-তাওবাহ- ১০০)

আবূ সা'ঈদ খুদরী রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন, তোমরা আমার সাহাবীদের কাউকে গাল-মন্দ করবে না। কারণ, তোমাদের কেউ যদি উহুদ পর্বতের সমতুল্য স্বর্ণ খরচ করে তবুও তাঁদের এক মুদ অথবা অর্ধ মুদের ন্যায় হবে না।" (সহীহ বুখারী: ৩৬৭৩; সহীহ মুসলিম: ২৫৪১)

ইরবাদ ইবন সারিয়্যাহ রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে জীবিত থাকবে তারা অচিরেই প্রচুর মতবিরোধ দেখবে। 'আলাইকুম বি সুন্নাতি অসুন্নাতিল খুলাফায়িল মাহদিইনার রাশিদীনা তামাসসাকু বিহা অ আজজু 'আলাইহা বিন নাজিঝি অর্থাৎ তখন তোমরা অবশ্যই আমার সুন্নাত এবং আমার হিদায়াতপ্রাপ্ত খলীফাহগণের সুন্নাত

অনুসরণ করবে, তা দাঁত দিয়ে কামড়ে আঁকড়ে থাকবে।' (আবূ দাউদ: ৪৬০৭; জামে- আত-তিরমিযী: ২৬৭৬; শাইখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

(৮) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর স্ত্রীদের বিরূদ্ধে অপবাদ আরোপকারীদের জবাব দেয়া: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর স্ত্রীগণ মুমিনগণের মা। তাঁদের বিরুদ্ধে কেউ অপবাদ আরোপ করলে তার জবাব দেয়া ঈমানী দায়িত্ব । মহান আল্লাহ বলেন,

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ - "নবী মুমিনদের কাছে তাদের নিজদের চেয়ে ঘনিষ্ঠতর। আর তার স্ত্রীগণ তাদের মাতাস্বরূপ।" (সূরাহ ৩৩; আল-আহযাব - ৬)

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ - "যারা এই অপবাদ রচনা করেছে তারাতো তোমাদেরই একটি দল; এটাকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করনা; বরং এটাতো তোমাদের জন্য কল্যাণকর; তাদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে তাদের কৃত পাপ কাজের ফল, এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে তার জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।" (সূরাহ ২৪; আন-নূর- ১১)

(৯) কোন ইবাদাত শর-য়ী দলীল বিহীন না করা: প্রত্যেক ইবাদাতের মূল হলো নিষিদ্ধ, যতক্ষণ না তার কুরআন ও সুন্নাহ উভয়টি থেকে অথবা যেকোনো একটি থেকে শর-য়ী দলীল না পাওয়া যাবে। আয়িশাহ রাজিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেন, **মান আমিলা আমালান লাইসা আলাইহি আমরুনা ফাহুঅ রাদ্দুন** অর্থাৎ যে ব্যক্তি এমন কোনো কর্ম করলো যাতে আমাদের নির্দেশনা নেই, তা প্রত্যাখ্যাত হবে।" (সহীহ মুসলিম: ১৭১৮)

আর মু'আমালাত (লেনদেন জাতীয় কর্মসমূহ) ও আদাত (স্বাভাবিক অভ্যাস জাতীয় কর্মসমূহ) এর মূল হলো বৈধ, যতক্ষণ না এটি হারাম হওয়ার দলীল না পাওয়া যাবে। মহান আল্লাহ বলেন, هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - "তিনিই যমীনে যা আছে সব তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তারপর আসমানের প্রতি খেয়াল করলেন এবং তাকে সাত আসমানে সুবিন্যস্ত করলেন । আর সব কিছু সম্পর্কে তিনি সম্যক জ্ঞাত।" (সূরাহ ২; আল-বাক্বারাহ - ২৯)

(১০) কুরআন ও সুন্নাহ বুঝা ও আমল করার ক্ষেত্রে সালাফদের পদ্ধতি অনুসরণ করাঃ এ উম্মাতের শ্রেষ্ঠ যুগ হলো, সাহাবায়ে কেরামদের যুগ। মহান আল্লাহ তাঁদেরকে নবীর সাহচর্য্যের জন্য, তাঁর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য মনোনীত করেছেন। ইমরান ইবনু হুসাইন রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন, **খাইরুকুম ক্বরনী ছুম্মাল্লাজীনা ইয়ালুনাহুম, ছুম্মাল্লাজীনা ইয়ালুনাহুম** অর্থাৎ "আমার যুগের লোকেরাই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম। অতঃপর তাদের নিকটবর্তী যুগের লোকেরা, অতঃপর তাদের নিকটবর্তী যুগের লোকেরা।" (সহীহ বুখারীঃ ২৬৫১; সহীহ মুসলিমঃ ২৫৩৫)

আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন, "বানী ইসরাঈল যে অবস্থায় পতিত হয়েছিল, নিঃসন্দেহে আমার উম্মাতও সেই অবস্থার সম্মুখীন হবে, যেমন একজোড়া জুতার একটি আরেকটির মতো হয়ে থাকে। এমনকি তাদের মধ্যে কেউ যদি প্রকাশ্যে তার মায়ের সাথে ব্যভিচার করে থাকে, তবে আমার উম্মাতের মধ্যেও কেউ তাই করবে। আর বানী ইসরাঈল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল। আমার উম্মাত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। শুধু একটি দল ছাড়া তাদের সবাই জাহান্নামী হবে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে দল কোনটি? তিনি বললেন, **মা আনা 'আলাইহি অআসহাবি** অর্থাৎ আমি ও আমার সাহাবীগণ যার উপর প্রতিষ্ঠিত।" (জামে' আত-তিরমিযীঃ ২৬৪১; শাইখ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)

(১১) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমাকে সম্মান করাঃ মানুষের অন্তরে যা লুকায়িত থাকে, তা অঙ্গ - প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ - 'হে মুমিনগণ! তোমরা মহান আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দাও; যখন সে তোমাদেরকে আহবান করে তার প্রতি, যা তোমাদেরকে জীবন দান করে । জেনে রাখ, নিশ্চয় মহান আল্লাহ মানুষ ও তার হৃদয়ের মাঝে অন্তরায় হন। আর নিশ্চয় তাঁর নিকট তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।" (সূরাহ ৮; আল-আনফাল ২৪)

(পাঁচ) এ সাক্ষ্যদানে একনিষ্ঠতা আল ইখলাছু ফীহা

রিসালাতের সাক্ষ্যদানের পরে একজন মুমিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমাকে একনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করবে, তাঁর

ইত্তেবা'র ক্ষেত্রে অন্য কাউকে অংশীদার করবে না। এ ধরনের একনিষ্ঠ ইত্তেবা' রিসালাতের সাক্ষ্যদানের অন্যতম শর্ত। মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ - قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ - 'বল, 'যদি তোমরা মহান আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, মহান আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর মহান আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। বল, 'তোমরা মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর'। তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ কাফিরদেরকে ভালোবাসেন না।" (সূরাহ ৩; আলে-ইমরান ৩১-৩২)

আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেন, **লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা আকুনা আহাব্বা ইলাইহি মিন অলিদিহী অঅলাদিহী অন নাসি আজমাঈন** অর্থাৎ "তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা, তার সন্তান ও সব মানুষের অপেক্ষা অধিক প্রিয়পাত্র হই।" (সহীহ বুখারী: ১৫; সহীহ মুসলিম: ৪৪)

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা তাঁর রবের পক্ষ থেকে যা নিয়ে এসেছেন, তার পরিপূর্ণ অনুসরণ এ সাক্ষ্যদানের অন্যতম চাহিদা। এ সাক্ষ্যদানের অর্থই হলো, তিনি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত সত্য রাসূল, তিনি যা নির্দেশ দিবেন তা মানা, তিনি যা বর্ণনা দিবেন তা বিশ্বাস করা, তিনি যা নিষেধ করবেন তা থেকে বিরত থাকা, তাঁর পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতিতে মহান আল্লাহর ইবাদাত না করা।

সুন্নাতের ইত্তেবা'র ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালাসমূহ

(ক) ইবাদাতের ক্ষেত্রে সুন্নাতের অনুসরণ করতে হলে ৬টি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন ।

(১) কারণ (আস সাবাতু): ইবাদাতটি কারণের দিক থেকে শরী'আতের অনুযায়ী হতে হবে। যেমন: কেউ যদি পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উপর আরো এক ওয়াক্ত বৃদ্ধি করে দাবি করে যে, প্রতিদিন ৬ ওয়াক্ত সালাত ফরয, তা প্রত্যাখ্যাত হবে। কারণ, এ ইবাদাতটি বাড়ানোর জন্য কুরআন অথবা সুন্নাহ'য় শর'য়ী কোনো কারণ (**আস সাবাতু**) নেই । মহান আল্লাহ বলেন, أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ - "তাদের জন্য কি এমন কিছু শরীক

আছে, যারা তাদের জন্য দীনের বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি মহান আল্লাহ দেননি? আর ফয়সালার ঘোষণা না থাকলে তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েই যেত। আর নিশ্চয় যালিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।" (সূরাহ ৪২; আশ-শূরা - ২১)

আয়িশাহ রাজিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন, **মান আহদাসা ফী আমরিনা হাজা মা লাইছা ফীহি ফাহুওয়া রদ্দুন** অর্থাৎ কেউ আমাদের এ শরী'আতে নাই এমন কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটালে তা প্রত্যাখ্যাত।" (সহীহ বুখারী: ২৬৯৭; সহীহ মুসলিম: ১৭১৮)

১। সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ দেখা দিলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা গ্রহণের নামায পড়তেন । আমরাও ঐ কারণে তাঁর অনুসরণ করে ঐ নামায পড়বো ।

২। মদীনায় এসে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা ইয়াহুদদেরকে মুহাররম মাসের দশ তারিখে রোযা রাখতে দেখলেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন এটা কেমন রোযা রাখ? তারা বললো এটা সেই শুভদিন যেই দিনে আল্লাহ তা'আলা বানু ইসরাঈল (মুসা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা ও তার সম্প্রদায় কে তাদের শত্রুর (ফিরআউন ও তার বাহিনীর) হাত থেকে পরিত্রাণ দান করেছিলেন, তাই মুসা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এই দিন (শুকরিয়া স্বরূপ) রোযা রেখেছিলেন এ জন্য আমরাও রাখি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বললেনঃ মুসা এর পরিত্রাণের কারণে শুকরিয়া করার আমি তোমাদের চেয়ে বেশী হকদার। অত:পর তিনি রোযা রাখলেন এবং সাহাবাদেরকেও রোযা রাখা নির্দেশ দিলেন। কিন্তু যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা ও মু'মিনদেরকে আল্লাহ তাআলা ইহুদীসহ যে কোন বিধর্মীর বিপরীত করার নির্দেশ দিয়েছেন এই জন্য রাসূল বলেছিলেন: যদি আগামী বৎসর আল্লাহ জীবিত রাখেন তাহলে নবম তারিখেও রোযা রাখবো। কিন্তু এর পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। (মুসলিম- ১৬৯)

পক্ষান্তরে যে সমস্ত কারণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এর যুগে বিদ্যমান ছিল কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা তার সাথে কোন ইবাদত বা আমল জড়িত করেন নি আমরাও তার সাথে কোন ইবাদত বা আমল জড়িত করবো না। ইবাদত জড়িত

না করাই সুন্নাত ও নেকীর কাজ এবং জড়িত করাই হলো বিদআত ও গুনাহর কাজ।

উদাহরণ:

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এর জন্ম দিবস উপস্থিত হওয়ার কারণে মিলাদ মাহফিল করা, বা জন্মের কারণে ঐ দিনকে স্মরণ করে কোন ইবাদত যেমন দরুদ ও জন্মকাহিনী বর্ণনা করে, বিভিন্ন ভঙ্গীতে সমবেত কণ্ঠে সুর ঝংকারের সাথে নিজেদের রচিত দরূদ পাঠ করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এর জন্ম দিবস বা জন্মের কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এর যুগেও ছিল কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এই কারণের সাথে কোন ইবাদত বা আমল জড়িত করেন নি। কাজেই রাসূলের অনুসারী বলে দাবী করলে বা রাসূলের প্রেমিক হওয়ার আকাঙ্খা রাখলে ঐ কারণের সাথে কোন ইবাদত বা আমল যোগ করা চলবে না। কেউ জড়িত করলে তা বিদআত হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এর অনুসণের রূপ রেখা ও ধরণ সম্পর্কে সম্মক জ্ঞান না থাকার কারণে বা তাকলীদের (দেখাদেখির) ভিত্তিতে বিরাট সংখ্যক মুসলমান আলিম ও জনসাধারণ এই বিদআতে নিমজ্জিত। এমনকি সংখ্যাগরিষ্ট লোক করে বলে ও ইত্তেবা সম্পর্কীয় সুক্ষ্মজ্ঞান শূণ্য বহু আলিম করে বলে অনেক আলেম ও জনসাধারণ এটাকে সঠিক বা সওয়াবের কাজ বলে প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টাও করে থাকে। আল্লাহ তাদেরকে ইত্তেবায়ে সুন্নাতের রূপরেখার সুক্ষ্মভাব বুঝার তৌফিক দান করুন। আমীন ছুম্মা আমীন ।

২. ইসরা ও মি'রাজঃ এটা একটা বিরাট মু'জিযা ও উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার জন্য এক বিরাট গৌরব ও অহঙ্কারের কারণ। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এই কারণের সাথে কোন প্রকার ইবাদত বা আমল জড়িত করেননি কাজেই নবী প্রেমিক মুসলমানদের উচিত হলো ঐ কারণের সাথে আমল বা ইবাদত জড়িত না করা। যদি কেউ করে তবে তা বিদআত ও গুনাহের কাজ হবে।

ইবনু আব্বাস থেকে মিরাজের রাত্রির (২৭শে রজব) এর ব্যাপারে যে, ঘটনা বর্ণনা করা হয় তা বিদআতীদের বানানো মিথ্যা ও জাল বানোয়াট কথা। এমনিভাবে ইবনু সুলতান নামে এক ব্যক্তি সম্পর্কে যে ঘটনা বর্ণনা করা হয় সেটাও মিথ্যা ও বানোয়াট। দেখুন আস-সুনান ওয়াল মুবতাদিআত দেখুন,

(১৪৩-১৪৪, ও তাহযীরুল মুসলিমীনা আনিল ইবতিদাই ফিদ দ্বীন- উর্দু অনুদিত ৬৫০-৬৫৬ পৃঃ)।

(২) প্রকরণ (আল-জিনস্)ঃ দুইঃ প্রকার ভিত্তিকঃ অর্থাৎ যেই প্রকার বা যেই জাতীয় আমল ও ইবাদত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা করতেন ঐ জাতীয় আমল ও ইবাদত (খাছগুলি ব্যতীত) আমরাও করবো। ইবাদতের মধ্যে যেই জাতীয় দু'আ কালাম তিনি পড়তেন আমরাও ঐগুলি পড়বো। যেই জাতীয় জিনিস বা বস্তু তিনি হালাল করেছেন ঐ জাতীয় বস্তু ও জিনিস আমরাও হালাল করবো। যেই জাতীয় কাজ, বস্তু ও জিনিস হারাম করেছেন আমরাও হারাম জানবো। এভাবে আমল করাই সুন্নাত, এর বিপরীত করা-ই হলো বিদআত ও পাপের কাজ ।

উদাহরণঃ

১। নামাযে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা যেই জাতীয় দুআ-কালাম পড়তেন তা হচ্ছে এই: তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে নামায আরম্ভ করতেন এরপর চুপিচুপি স্বরে ছানা পড়তেন। তারপর সূরা ফাতিহা ও যে কোন একটি সুরা বা কিছু আয়াত পাঠ করতেন। তাকবীর দিয়ে রুকু করতেন সামিআল্লাহু বলে রুকু থেকে উঠতেন। রুকুর ভিতর সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম" পড়তেন। উঠে রাব্বানা লাকাল হামদু পাঠ করতেন। অত:পর তাকবীর দিয়ে সিজদায় যেতেন। সিজদায় "সুবহানা রাব্বিয়াল আলা" বলতেন, তাকবীর দিয়ে, সিজদা থেকে উঠে আল্লাহুম্মাগফিরলী অরহামনী ওয়াহদিনী অআ'ফিনী, ওয়ারযুক্বনী" পড়তেন, অত:পর দ্বিতীয় সিজদা দিতেন, তাতে ঐ তাসবীহ পাঠ করতেন। দ্বিতীয় রাকআতের দ্বিতীয় সিজদার পর আততাহিয়্যাতু..... তাশাহহুদ পাঠ করতেন, কোন হাদীছে পাওয়া যায় দরূদও পড়তেন । ফজরের নামায হলে এর সঙ্গে আরো অন্যান্য দুআ মাছুরা পাঠ করে আসসালামু আলাইকুম বলে দু'দিকে সালাম দিয়ে ছলাত শেষ করতেন। মাগরিব নামায হলে তাশাহহুদ ও দরূদ পড়ে উঠে আরো এক রাকআত, যোহর, আছর ও ইশার নামায হলে দু'রাকআত পড়ে তাশাহহুদ, দরূদ ও অন্যান্য দু'আয়ে মা'ছুরাহ পড়ে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি বলে ডানে বামে সালাম ফিরে নামায শেষ করতেন। প্রতিটি কাজ ধীর স্থিরতার সাথে পালন করতেন। এই হলো হাদীছ থেকে পাওয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এর নামাযের বিবরণ।

নামাযে যে জাতীয় দুআ-কালাম ও তাসবীহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা পড়তেন তার ভিতর নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া... বিভিন্ন ওয়াক্তের নামাযের বিভিন্ন গদবাধা নিয়তের মুখে উচ্চারণ করে কিংবা মনে মনেও পড়েন নি। তবে নিয়ত অবশ্যই করতেন। গদবাধা নিয়তের শব্দগুলি কুরআন, হাদীছ ও উল্লেখযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য কোন ফিকার কিতাবেও নেই। চার ইমামের কোন ইমাম থেকেও এই সমস্ত শব্দভিত্তিক নিয়ত বর্ণিত হয়নি। কাজেই প্রমাণিত হল যে, নিয়ত পড়া খাঁটি বিদআত, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ পর্যন্তও নেই। এ কথা বুঝে আসবে না একমাত্র ঐ ব্যক্তির যার মস্তিস্ককে গোঁড়ামী ও বিদআত নিবিড়ভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

এমনিভাবে নামাযের পূর্বে মুছাল্লার দু'আ। কোনদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা কোন এক ওয়াক্তেও পড়েননি, দুনিয়ার কোন কুরআন সুন্নাহভিত্তিক বড় কিংবা ছোট আলেমও পড়েননি ও পড়ে না। একমাত্র মাযহাবীরা তথা কুরআন হাদীছের সুক্ষ্ম অনুসরণ থেকে বহুদূরে অবস্থানকারী তথাকথিত মুর্খ সমাজের দৃষ্টিতে বড় আলিমরাই পড়ে থাকেন, ফতোওয়া দিয়ে থাকেন ও তাদের পুস্তকে লিখে থাকেন। আমার এই ক্ষুদ্র লিখনীটা দেখে রাগান্বিত হয়েই হোক না কেন একবার যদি আল্লাহ তাদের এই ব্যাপারে হাদীছ দেখার তাওফীক দিতেন আমি নিজেকে ধন্য মনে করতাম।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা তাকবীরে তাহরীমার পর ফাতিহা পড়ার পূর্বে চুপি স্বরে কিছু দু'আ পড়তেন যেটাকে ছানা বলা হয়। এই দু'আ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীছে বিভিন্ন শব্দ এসেছে। কোন নামাযে সুবহানাকা... কোন নামাযে আল্লাহুম্মা বায়েদ বাইনী ওয়া বাইনা খাত্বাইয়া... কোন নামাযে ইন্নি ওয়াজ্জাহতু অজহিয়া লিল্লাযী... পড়তেন। এই তিনটি ছাড়াও হাদীছের কিতাবে আরো কয়েকটি দু'আ এসেছে। এ সমস্তই তাকবীরে তাহরীমার পর সূরা ফাতিহা পড়ার পূর্বে পড়তেন।

এক্ষণে তাকবীরে তাহরীমার পর ইন্নী ওয়াজজাহতু ওয়াজহিয়া... পড়ার দলীল উল্লেখ করছি ।

আলী রাজিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা যখন নামাযের জন্য দাঁড়াতেন তখন আল্লাহু আকবার বলতেন অত:পর বলতেন: ইন্নী ওয়াজজাহতু অজ হিয়া লিল্লাযি...। (হাদীছটি ইমাম আহমাদ হা/৮০৩, তিরমিযী হা/৩৪২১, আবু

দাউদ হা/৭৬০, সুনানে নাসাঈ হা/৮৯৭, ও অন্যান্যগণ তাদের স্বস্ব হাদীছগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন)

২। যেই জাতীয় মহিলা বিবাহ করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা হারাম করেছেন সেই জাতীয় মহিলা বিবাহ করা হারাম জানতে হবে। যেই জাতীয় মহিলা বিবাহ করা হালাল করেছেন সেই জাতীয় মহিলা বিবাহ করা হালাল জানতে হবে।

৩। যেই জাতীয় পুরুষের সাথে বিবাহ জায়েয তাদের থেকে রাসুলুল্লাহ মহিলাদেরকে পর্দা করতে বলেছেন, তারা কে তাদের থেকে অবশ্যই পর্দা করতে হবে। এবং যাদের সাথে বিবাহ হারাম তাদের থেকে পর্দা না করলে অসুবিধা নেই বলেছেন তাদের থেকে পর্দা না করলে অসুবিধা নেই।

৪। যেই জাতীয় খাদ্য পানীয়, হারাম করেছেন সেই জাতীয় খাদ্য ও পানীয় হারাম জানতে হবে। যদি কেউ ঘোড়া দ্বারা কোরবানী করে তার কোরবানী কবুল হবে না। কেননা, শরী'আতে শুধুমাত্র গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু যেমন- ছাগল, গরু (মহিষ), উট প্রভৃতি দ্বারা কোরবানীর নির্দেশনা এসেছে। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ - "রাসূল তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে সে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও এবং আল্লাহকেই ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর।" (সূরাহ ৫৯; আল-হাশর - ৭)

(৩) পরিমাণ (আল কাদারু): তিনঃ সংখ্যা ও পরিমাণ ভিত্তিক অনুসরণঃ ইবাদত ও আমলের ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা যে সংখ্যা ও পরিমাণ দিয়েছেন ঠিক ঐ পরিমাণ ও সংখ্যার ভিত্তিতে ইবাদত ও আমল করতে হবে। এর ভিতর কোন হেরফের করা চলবে না । নইলে তা বিদআতে পরিণত হযে যাবে। উদারহণ:

১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ছলাত পড়া ফরয। এর কম ও বেশী ওয়াক্ত পড়া চলবে না।

২। সামর্থশালীদের জন্য জীবনে একবার হজ্জ পালন করা ফরয বলেছেন, একবারই ফরজ জানতে হবে। এর অধিক যতবার করতে পারবে সুন্নাত হবে।

৩। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের যে ওয়াক্তের যত রাকআত নির্ধারণ করেছেন তত রাকআতই পড়তে হবে। এর কম ও বেশী করা চলবে না । কম ও বেশী করলে ইসলাম থেকে বহির্ভূতকারী বিদআত হবে।

৪। যাকাত ফরযের জন্য নির্দিষ্ট নিসাব নির্ধারণ করেছেন, ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ এর টাকা পয়সা বা ধন সম্পদ হলে যাকাত দিতে হবে। এই নিসাবের ভিতর হেরফের করা চলবে না। নিসাব পরিমাণ ধনসম্পদ হওয়ার পর ১ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর ইচ্ছাকৃতভাবে যাকাত না দেয়া সাংঘাতিক বড় পাপ হবে, হাদীছের আলোকে অনেক বিদ্যানের নিকট কাফির হওয়ার কথাও পাওয়া যায়। নিসাবের পূর্বে যাকাত দেয়া বৈধ নয়, দিলে ওটা সাদাকাহ হিসাবে দিতে হবে। কিন্তু নিসাব পূর্ণ হওয়ার পর ১ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যাকাত দিলে তা (অগ্রীম) যাকাত বলেই গণ্য হবে।

৫। যাকাতুল ফিতর ১ ছা' দিতে হবে। অর্ধ সা দিলে চলবে না। দিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এর সুন্নাহ পরিপন্থী বিদআত হবে ।

৬। তারাবীহ ১১ রাকআত পড়া রাসূলের সুন্নাতের নিখুত অনুসরণের দাবী। বেশী পড়া অনেকে বিদআত বলেছেন। এমনকি আল্লামাহ আলবানীও বিদআত বলেছেন ।

৭। এক সফরে একটি হজ্জ ও উমরাহ করেছেন। একাধিক করেন নি। না তাঁর নিজের জন্য না অন্য কোন আত্মীয়ের জন্য। এমনিভাবে তাঁর ছাহাবাগণ রযিয়াল্লা-হু আনহুম ও নয়। যদি কেউ এক সফরে একাধিক হজ্জ বা উমরা করে। চাই নিজের জন্য চাই অন্য কোন নিকটাত্মীয়ের জন্য তাহলে তা রাসূলের পরিপন্থী ও বিদআত হবে।

৮। যদি কেউ জুমু'আর সালাত তিন রাকা'আত আদায় করে তার সালাত কবুল হবে না। কেননা, শরী'আত জুমু'আর সালাত দু' রাকা'আত নির্ধারণ করেছে। তিন রাকা'আত পরিমাণের দিক থেকে শরী'আতের বিপরীত। মহান আল্লাহ বলেন, وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا - "আর এগুলো আল্লাহর সীমারেখা। আর যে আল্লাহর (নির্ধারিত) সীমারেখাসমূহ অতিক্রম করে সে অবশ্যই তার নিজের ওপর যুলম করে। তুমি জান না, হয়তো এর পর আল্লাহ, (ফিরে আসার) কোন পথ তৈরি করে দিবেন।" (সূরাহ ৬৫; আত-ত্বলাক্ব - ১)

(৪) পদ্ধতি (আল কাইফিইইয়াতু): ইবাদাতটি পদ্ধতিগত দিক থেকে শরী'আত মোতাবেক হতে হবে । যদি কোন ব্যক্তি ওযূর মধ্যে প্রথমে পা ধৌত করে, তারপর মাথা মাসেহ করে, অতঃপর দু'হাত ধৌত করে, তারপর মুখমন্ডল ধৌত করে তার ওযূ কবুল হবে না। এ ওযূ দ্বারা সালাত আদায় করলে তা বিশুদ্ধ হবে না। কেননা, এটি পদ্ধতিগত দিক থেকে শরী'আতের

বিপরীত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা যে ইবাদত যে পদ্ধতিতে করতেন বা করতে বলেছেন ঐ পদ্ধতিতেই করতে হবে। এর ব্যতিক্রম করা হলে অনুসরণ ত্রুটিপূর্ণ হবে এবং বিদআতের দরজা উন্মুক্ত হবে।

উদাহরণঃ

রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা যে পদ্ধতিতে ছলাত পড়েছেন বা পড়তে বলেছেন ঐ পদ্ধতিতে পড়তে হবে। তাকবীরে তাহরীমার পর ছানা পাঠ করে সূরা ফাতিহা পড়তেন আমাদেরকেও এই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে, ছলাত আদায় করতে হবে। সূরাহ ফাতিহার পর ছানা পড়া চলবে না। কেউ পড়লে বিদআত হবে ।

এমনিভাবে যে কোন একটি সূরাহ বা কিছু আয়াত পড়ার পর সূরাহ আল ফাতিহা পড়াও বিদআত হবে। রুকুর পূর্বে সিজদা করলে বিদআত হবে। যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এর পদ্ধতি জানার পরও ইচ্ছাকৃতভাবে ঐ পদ্ধতির ব্যতিক্রম করে পড়ে তবে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এমনিভাবে প্রতিটি ইবাদতের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর সুন্নাত অনুযায়ী আমল করতে ইচ্ছুক এবং বিদআত বিদ্বেষী তাদের উচিত প্রতিটি ইবাদত ও আমলকে হাদীছে বর্ণিত পদ্ধতির সাথে তুলনা করে বা মিলিয়ে দেখা উচিত ।

বিভিন্ন হাদীছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা তার পদ্ধতি গ্রহণ করার জন্য নির্দেশও দিয়েছেন যেমন ছলাতের ক্ষেত্রে বলেছেনঃ সল্লু কামা রাআইতুমুনী উসাল্লী অর্থাৎ তোমরা ঠিক ঐ পদ্ধতিতে ছলাত পড়ো যে পদ্ধতিতে আমাকে ছলাত পড়তে দেখ। (শারহুস সুন্নাহ লিল বাগভী হা/ ৪৩২, সহীহ বোখারী)

হজ্জের ক্ষেত্রে বলেছেনঃ খুজুউ আননিই মানাসিকাকুম অর্থাৎ তোমরা আমার থেকে হজ্জের পদ্ধতি শিখে নাও। (শারহুস সুন্নাহ হা ১৯৪৯, সহীহ বুখারী)

কেউ যদি যিল-হজ্জের ৮ তারিখে উকুফে আরাফাহ ও ৯ তারিখে মিনা ও ১০ তারিখে মুযদালিফায় অবস্থান করে তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর পদ্ধতির অনুসরণ না করার কারণে এই ব্যক্তির হজ্জ বাতিল বলে গণ্য হবে। অবশ্য ১০ তারিখের কাজগুলি (জামরাতুল কুবরাকে পাথর মারা, কুরবাণী করা, মাথা নাড়া বা চুল ছোট করা, তাওয়াফে ইফাযা) এর ভিতর ধারাবহিকতা ক্ষুন্ন হলে হজ্জের কোন অসুবিধা হবে না।

তবে উত্তমের পরিপন্থী হবে। অবশ্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন: অসুবিধা নেই। যদি না বলতেন তবে অসুবিধা ছিল।

পদ্ধতিগত কারণে ও প্রকারভিত্তিক অনুসরণের মানদন্ডে প্রতি ফরয ছলাতের পর প্রচলিত পদ্ধতিতে ইমাম ও মুক্তাদির সম্মিলিত দু'আ বিদআত। পদ্ধতিগত কারণে বিদআত এ জন্য যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা প্রতি ফরয সালাতের পর একাকী দু'আ যিকর-আযকার করতেন সম্মিলিত ভাবে নয়, তাই সম্মিলিত দু'আ নবীর বিপরীতে হওয়ায় বিদআত বলে গণ্য । আর প্রকারভিত্তিক অনুসরণের মানদন্ডে এ জন্য যে, যে প্রকার দু'আ ও যিকর আযকার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা পাঠ করতেন সেগুলো বাদ দিয়ে নিজেদের চয়নকৃত দু'আ পাঠ করা হয়। আরো এ জন্য বিদআত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা সালাতের পর এক বচনের পাঠ করার দু'আই শুধু শিখিয়েছেন। সম্মিলিত দু'আর জন্য লোকেরা নিজেদের পক্ষ থেকে বহুবচনের শব্দ বিশিষ্ট দু'আ পাঠ করে ।

মহান আল্লাহ বলেন, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا - "আর যে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার জন্য হিদায়াত প্রকাশ পাওয়ার পর এবং মুমিনদের পথের বিপরীত পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে ফেরাব যেদিকে সে ফিরে এবং তাকে প্রবেশ করাব জাহান্নামে। আর আবাস হিসেবে তা খুবই মন্দ।" (সূরাহ ৪; আন-নিসা - ১১৫)

(৫) স্থান (আল মাকান):

স্থান ভিত্তিক অনুসরণ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা যেই স্থানে যে ইবাদাহ ও আমল করতেন বা করতে বলেছেন ঐ স্থানে ঐ ইবাদত বা আমল করা হবে। আর যে স্থানে ইবাদত বা আমল করতেন না বা করতে নিষেধ করেছেন, সেই স্থানে ইবাদত করা চলবে না। এর বিপরীত করলে বিদআত হবে।

উদাহরণ:

১। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা ফরয ছলাত মাসজিদে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং সুন্নাত ও নফল ছলাত বাড়ীতে পড়া উত্তম বলেছেন। এমনকি আজান শোনার পর কেউ শারঈ কারণ ব্যতীত মাসজিদে জামাআতের সাথে ছলাত না পড়ে বাড়ীতে পড়লে উক্ত নিয়মের

বিপরীত করলে বিদআত হবে তার সালাত হবে না বলেও ছহীহ হাদীছে পাওয়া যায়। উক্ত নিয়মের বিপরীত করলে বিদআত হবে।

২। হজ্জ আদায়ের জন্য শুধু মক্কা মুকাররমাহ নির্ধারণ করেছেন। কাজেই মক্কা ছাড়া অন্য কোথাও হজ্জ হবে না। কেউ যদি জেনে শুনে অন্য কোন কোথাও হজ্জ করে বা করার নির্দেশ করে তবে সে ইসলাম থেকে বহির্ভূত হয়ে যাবে।

৩। ছলাতের জন্য শুধু কা'বা মুকাররমাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা কিবলা নির্ধারণ করেছেন। অন্য কোন স্থানকে কিবলা বানালে ঐ ব্যক্তি মুসলমান থাকবে না। হ্যাঁ, তবে দিক হারিয়ে কিংবা ভুলক্রমে যদি অন্য দিকে মুখ করে ছলাত আদায় করে ফেলে তাহলে সে দোষমুক্ত এমনকি তার ছলাতও শুদ্ধ হয়ে যাবে।

৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা তিনটি মাসজিদ ব্যতীত ইবাদতের উদ্দেশ্যে আর অন্য স্থানে যাওয়া কড়াকড়ি নিষেধ করেছেন। কাজেই এর ব্যতিক্রম করে অন্য কোথাও এমনকি কোন নাম করা বড় মাসজিদেও যাওয়া যাবে না। কোন মাযার, দরগাহ ও দরবার এমনকি টঙ্গীর বিশ্ব ইজতিমায়ও নয়।

৫। মাসজিদ ব্যতীত আর কোথাও ই'তিকাফ করা চলবে না, কারণ কুরআন ও হাদীছে শুধু মাসজিদে ই'তিকাফ করার কথা-ই উল্লেখ হয়েছে। বাড়ীর উল্লেখ কোন আয়াতে বা হাদীছে নেই। এ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বিষয় সমান। উক্ত কথার উপর সকলেই একমত পোষণ করেছেন শুধু হানাফী মাযহাবের কিছু সংখ্যক আলিম ব্যতীত। কিন্তু ইমাম আবু হানিফার ও আহমাদের নিকট শুধু ঐ সমস্ত মাসজিদে জায়েয যে সমস্ত মাসজিদে সালাত প্রতিষ্ঠা করা হয়। মহিলাদের জন্য বাড়ীকে ই'তিকাফের স্থান নির্ধারণ করা আল্লাহ ও রাসূলের উপর মাতব্বরী ছাড়া আর কিছু নয়। এক্ষেত্রে তাদের দলীল হলো নিজেদের মস্তিস্ক। মহিলা পুরুষের সবার জন্য ই'তিকাফের স্থান হলো মাসজিদ তার দলীল সূরা বাকারার ১৮৭ নং আয়াত ও সহীহ বুখারীর হাদীছ। দেখুন কিতাবুল ই'তিকাফ এর প্রথম তিনটি হাদীছ এমনিভাবে দেখুন বাবু ই'তিকাফিন নিসা।

৬। তাওয়াফের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা কা'বাকে খাছ করেছেন । কাজে অন্য কোথাও কোন কবরে বা মাযারে তাওয়াফ করা রাসূলের তরীকার পরিপন্থী শিরকে আকবার বা বড় শিরক বা বড় বিদ'আত হবে। হজ্জ পালনকারী যদি আরাফাহর দিন

মুযদালিফায় অবস্থান করেন, অথবা কা'বা ছাড়া অন্য ঘরের তাওয়াফ করেন, এ ইবাদাতসমূহ বিশুদ্ধ হবে না। কারণ, শরী'আত এ ইবাদাতের জন্য যে স্থানকে নির্দিষ্ট করেছে, তার বিপরীত হয়েছে। আয়িশাহ রাজিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেন, **মান আমিলা আমালান লাইসা আলাইহি আমরুনা ফাহুওয়া রদ্দুন** অর্থাৎ "যে ব্যক্তি এমন কোন কর্ম করলো যাতে আমাদের নির্দেশনা নেই, তা প্রত্যাখ্যাত হবে।" (সহীহ মুসলিম: ১৭১৮)

(৬) সময় (আজ জামানু): সময় ভিত্তিক অনুসরণ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা যেই সময় যেই ইবাদত করেছেন বা করতে বলেছেন ঐ সময় ঐ আমল বা ইবাদত করতে হবে। এমনিভাবে যেই সময় ইবাদত করতে নিষেধ করেছেন ঐ সময় ইবাদত করা চলবে না।

উদাহরণ:

১। যোহরের ছলাত পড়তে বলেছেন, সূর্য পূর্বাকাশে ঢলে যাওয়ার পর। কাজেই কেউ যদি এর পূর্বে বেলা ১০টায় পড়ে তবে তার ছলাত হবে না। কিংবা যোহরের সময় আসরের নামায ও আসরের সময় যোহরের নামায পড়লে হবে না। এমনিভাবে মাগরিবের নামায আসরের সময় পড়লে চলবে না। কিন্তু শারঈ কারণবশত: যোহর ও আছর একত্রে (আলাদা ইকামত ও আলাদা সালামে) পড়া চলে। এমনিভাবে মাগরিব ও ইশাও।

২। আল্লাহ তাআলা শুধু রামাযান মাসে ২৯ বা ৩০ দিন ছওম রাখা ফরয বলেছেন। কাজেই এই ফরয ছওম শুধু রামাযান মাসেই করতে হবে। রামাযানের পরিবর্তে অন্য কোন মাসে এই ছওম করা চলবে না। হ্যাঁ, তবে কেউ শারঈ কারণবশত: পূর্ণ রামাযানের রোযা না রাখতে পারলে অন্য মাসে তা কাযা করে নেয়ার নির্দেশ কুরআনে ও হাদীসে এসেছে।

৩। এমনিভাবে হজ্জের মাসেই শুধু হজ্জ করা চলবে, বছরের অন্য কোন মাসে হজ্জ করা চলবে না। এটাই মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ। কেউ যদি অন্য কোন মাসে হজ্জ করে তবে তাঁর হাজ্জ বাতিল বলে গণ্য হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এর হাদীছ থেকে হজ্জের সময়সীমা জানার পর যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে অন্য কোন মাসে হজ্জ করা জায়েয ঘোষণা দেয় বা পালন করে তবে সে মুসলমানই থাকবে না।

৪। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা জুমআর নামায পড়ার দিন ধার্য করেছেন জুম্আহ বার (শুক্রবার)। যদি কেউ শনিবার বা অন্য কোন বার জুমআর ছলাত আদায় করে তবে তা

হারাম কাজ বলে গণ্য হবে। যার জেনে শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রবার ব্যতীত অন্য কোন বারে জুমআর ছলাত প্রতিষ্ঠা করবে তারা ইসলাম থেকে বহির্ভূত হয়ে যাবে।

৫। শুধু জুমআর দিন বা রাত ইবাদতের জন্য খাছ করা নিষেধ করেছেন। রাসূল বলেন: তোমরা রাত সমূহের মধ্যে জুমআর রাতে বিশেষ করে কিয়ামুল্লাইল (তাহাজ্জুদ) পড়ো না। এমনিভাবে শুধু জুমআর দিনে বিশেষ করে ছিলাম পালন করো না । হ্যাঁ, তবে কারো ছিয়ামের দিন হলে সেটা ভিন্ন কথা। (সহীহ মুসলিম ১১৪৪)

* যে সমস্ত সময়ে নামায পড়া নিষেধ করেছেন যেমন সুর্য উঠার সময়, সূর্য অস্তমিত হওয়ার সময়, ঠিক মাথার উপর সুর্য থাকে ঐ সময় ফজরের ছলাতের পর থেকে সুর্য উঠার পূর্ব, আছরের ছলাতের পর থেকে সূর্য ডুবার পূর্ব পর্যন্ত। কারণ কাযা ব্যতীত ঐ সমস্ত সময়ে ছলাত পড়া থেকে বিরত থাকতে হবে। তবে কারণ বিজড়িত নামাযের বিষয়টি ব্যতিক্রম যেমন জানাজার সালাত, তাহহিয়্যাতুল মাসজিদ, কাজা সালাত ইত্যাদি ইত্যাদি। যদি কোনো মুসলিম সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পূর্বে জোহরের সালাত আদায় করে, অথবা রজব মাসে রামাদানের ফরয সিয়াম পালন করে, তার সালাত ও সিয়াম বিশুদ্ধ নয়। কারণ, এ সকল ইবাদাতের জন্য শরী'আত যে সময়সীমা নির্ধারণ করেছে, তার ব্যতিক্রম হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا - "বল, আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার নিকট ওহী প্রেরণ করা হয় যে, তোমাদের ইলাহই এক ইলাহ। সুতরাং, যে তার রবের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার রবের ইবাদাতে কাউকে শরীক না করে।" (সূরাহ ১৮; আল-কাহাফ - ১১০)

প্রত্যেকটি ইবাদাতে এ ছয়টি বৈশিষ্ট্য না থাকলে তা সুন্নাতের ইত্তেবা' হয় না। মহান আল্লাহ বলেন, قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ - "সুতরাং, যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে তাদের উপর কঠিন শাস্তি।" (সূরাহ ২৪; আন-নূর ৬৩)

(খ) আকল ও প্রবৃত্তির উপর কুরআন কারীম ও সহীহ সুন্নাহকে প্রাধান্য দেয়া: প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য হলো সুন্নাতের অনুসরণ করা।

সুন্নাতটির হিকমত বুঝে আসুক, আর নাই আসুক। সর্বাবস্থায় সুন্নাতটির ইত্তেবা‘ করতে হবে।

মহান আল্লাহ বলেন, تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ - “আর যে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে মহান আল্লাহ তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতসমূহে, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর এটা মহা সফলতা।” (সূরাহ ৪; আন-নিসা - ১৩)

(গ) ইবাদাতের যে প্রকরণটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর যুগে চাহিদা থাকা সত্ত্বেও তিনি করেননি, তা অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে। তা করা বিদ‘আত। যেমন- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর জন্মদিনের অনুষ্ঠান, মিরাজের রাত্রি জাগরণ, শা‘বানের মধ্যবর্তী রাত্রি জাগরণ, নববর্ষ উদযাপন প্রভৃতি। আয়িশাহ রাজিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন, **মান আহদাসা ফী আমরিনা হাজা মালাইছা ফীহি ফাহুঅ রদ্দুন** অর্থাৎ “কেউ আমাদের এ শরী‘আতে নাই এমন কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটালে তা প্রত্যাখ্যাত।” (সহীহ বুখারী: ২৬৯৭; সহীহ মুসলিম: ১৭১৮)

(ঘ) সুন্নাতের অনুসরণ জীবনের সকল ক্ষেত্রে করতে হবে। আকীদা, ইবাদাত, মু‘আমালাত, মু‘আশারাত, রাজনীতি, অর্থনীতিসহ সকল ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমাকে অনুসরণ করাই এ সাক্ষ্যদানের প্রতি একনিষ্ঠ হওয়া। মহান আল্লাহ বলেন, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا - “আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে।” (সূরাহ ৫; আল-মায়িদাহ - ৩)

(ছয়) এ সাক্ষ্যদানে সততা

(আস সিদক্ব ফীহা)

রিসালাতের সাক্ষ্যদান অন্তরের সততার সাথে হতে হবে। এ সাক্ষ্যদানের মধ্যে কোন মিথ্যা ও নিফাক্ব মিশ্রিত হতে পারবে না । মহান আল্লাহ বলেন, إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ - “যখন তোমার কাছে মুনাফিক্বরা আসে, তখন বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আপনি মহান আল্লাহর

রাসূল এবং মহান আল্লাহ জানেন যে, অবশ্যই তুমি তাঁর রাসূল । আর মহান আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, অবশ্যই মুনাফিক্বরা মিথ্যাবাদী।" (সূরাহ ৬৩; আল-মুনাফিক্বূন - ১)

অন্তরে সততা (আস সিদক্ব) সৃষ্টির সহায়ক কর্মসমূহ

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি সাক্ষ্যদান করলেই মুমিন হওয়া যায় না, যদি তা সততার সাথে না হয়। এ জন্য মহান আল্লাহ এ সততার পরীক্ষা করে থাকেন। মহান আল্লাহ বলেন, أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ - وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ - "মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে, আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না? আর আমি তো তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি। ফলে মহান আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা সত্য বলে এবং অবশ্যই তিনি জেনে নেবেন, কারা মিথ্যাবাদী।" (সূরাহ ২৯; আল-'আনকাবূত - ২-৩)

মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এমন কিছু কর্ম শিক্ষা দিয়েছেন, যা সততা তৈরিতে সহায়ক হয়। নিম্নে তার কিছু উল্লেখ করা হলো-

(১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর সীরাত সম্পর্কে জানা: তাঁর মহান চরিত্র, উম্মতের প্রতি তাঁর বিশাল রহমত, তাঁর সবর, জিহাদ ও মহান সততা প্রভৃতি সম্পর্কে জানা । মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا - وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا - وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا - وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا - "হে নবী, আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। আর মহান আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহবানকারী ও আলোকদীপ্ত প্রদীপ হিসেবে। আর তুমি মুমিনদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে বিরাট অনুগ্রহ। আর তুমি কাফির ও মুনাফিক্বদের আনুগত্য করো না এবং তাদের নির্যাতন উপেক্ষা কর আর মহান আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল কর; তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।" (সূরাহ ৩৩; আল-আহযাব - ৪৫-৪৮)

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ - "অবশ্যই মহান আল্লাহ মুমিনদের উপর অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের

মধ্য থেকে তাদের প্রতি একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে আর তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয়। যদিও তারা ইতঃপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল।" (সূরাহ ৩; আলে-ইমরান ১৬৪)

لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا - "যাতে তোমরা মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আন, তাকে সাহায্য ও সম্মান কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় মহান আল্লাহর তাসবীহ পাঠ কর।" (সূরাহ ৪৮; আল-ফাতহ - ৯)

(২) মহান আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমাকে ভালোবাসা, সম্মান করা: মুমিনগণ মহান আল্লাহর ভালোবাসার কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমাকে ভালোবাসে, মহান আল্লাহর প্রতি সম্মানের কারণেই তাঁকে সম্মান করে। মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর ভালোবাসার কারণে ঈমানদারদেরকে, সাহাবায়ে কেরামদেরকে ভালোবাসে । মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ - "বল, "যদি তোমরা মহান আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, (তবে) মহান আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর মহান আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরাহ ৩; আলে-ইমরান - ৩১)

আবূ হুরায়রাহ রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন, "ঈমানদার ছাড়া কেউই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, আর তোমরা ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না একে অন্যকে ভালোবাসবে। আমি কি তোমাদের তা বলে দিব না, কি করলে তোমাদের মাঝে পারস্পরিক ভালোবাসার সৃষ্টি হবে? তা হলো, তোমরা পরস্পর বেশি সালাম বিনিময় করবে।" (সহীহ মুসলিম: - ৫৪)

(৩) তাঁর প্রতি অবতীর্ণ দীনকে স্বীকার করা ও আনুগত্য করা: তাঁর শিখানো দীনের আনুগত্যই মহান আল্লাহর আনুগত্য। তাঁর আনুগত্য করাই তাঁর প্রতি ঈমানের সততা প্রমাণ করে। মহান আল্লাহ বলেন, مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا - "যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে বিমুখ হল, তবে আমি তোমাকে তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক করে প্রেরণ করিনি।" (সূরাহ ৪; আন-নিসা - ৮০) - وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ "আর তোমরা আনুগত্য

কর আল্লাহ ও রাসূলের, যাতে তোমাদেরকে দয়া করা হয়।" (সূরাহ ৩; আলে-ইমরান ১৩২)

(৪) তাঁর গুণাবলি সম্পর্কে জানা: এ সম্পর্কে যত বেশি জানবে, ততই মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান বৃদ্ধি পাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর ইত্তেবা'র আগ্রহ বাড়বে। অন্তর তাঁর ভালোবাসায় পরিপূর্ণ হবে। মহান আল্লাহ বলেন, مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا - "মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তার সাথে যারা আছে তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর; পরস্পরের প্রতি সদয়, তুমি তাদেরকে রুকুকারী, সিজদাকারী অবস্থায় দেখতে পাবে। তারা আল্লাহর করুণা ও সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করছে। তাদের আলামত হচ্ছে, তাদের চেহারায় সিজদার চিহ্ন থাকে। এটাই তাওরাতে তাদের দৃষ্টান্ত। আর ইঞ্জীলে তাদের দৃষ্টান্ত হলো একটি চারাগাছের মত, যে তার কঁচিপাতা উদগত করেছে ও শক্ত করেছে, অতঃপর তা পুষ্ট হয়েছে ও স্বীয় কান্ডের উপর মজবুতভাবে দাঁড়িয়েছে, যা চাষীকে আনন্দ দেয়। যাতে তিনি তাদের দ্বারা কাফিরদেরকে ক্রোধান্বিত করতে পারেন । তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপ্রতিদানের ওয়াদা করেছেন।" (সূরাহ ৪৮; আল-ফাতহ - ২৯)

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ - "সুতরাং, তোমরা মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আন ও তাঁর প্রেরিত উম্মী নবীর প্রতি, যে আল্লাহ ও তাঁর বাণীসমূহের প্রতি ঈমান রাখে। আর তোমরা তার অনুসরণ কর, আশা করা যায়, তোমরা হিদায়াত লাভ করবে। (সূরাহ ৭; আল-আ'রাফ - ১৫৮)

(৫) উম্মতের প্রতি তাঁর অত্যধিক ভালোবাসা সম্পর্কে জানা: মহান আল্লাহ বলেন, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ - "নিশ্চয়ই তোমাদের নিজদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছেন, তা তার জন্য কষ্টদায়ক যা তোমাদেরকে পীড়া দেয়। তিনি তোমাদের কল্যাণকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, পরম দয়ালু।" (সূরাহ ৯; আত-তাওবাহ - ১২৮)

(৬) তাঁর আনুগত্য ও ইত্তেবা'র দ্বারা অর্জিত সাওয়াবের পরিমাণ সম্পর্কে জানা: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর ইত্তেবা' ছাড়া কোনো ইবাদাতের সাওয়াব অর্জিত হয় না। সকল কল্যাণ ও সফলতা লাভ করার একমাত্র মাধ্যম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর তরীকা।

মহান আল্লাহ বলেন, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَـٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَـٰئِكَ رَفِيقًا - ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا - "আর যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে তারা তাদের সাথে থাকবে, মহান আল্লাহ যাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীলদের মধ্য থেকে। আর সাথী হিসেবে তারা হবে উত্তম । এই অনুগ্রহ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে । আর সর্বজ্ঞ হিসাবে মহান আল্লাহই যথেষ্ট।" (সূরাহ ৪; আন-নিসা- ৬৯-৭০)

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ - যে তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ দেয় ও বারণ করে অসৎ কাজ থেকে এবং তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে আর অপবিত্র বস্তু হারাম করে। আর তাদের থেকে বোঝা ও শৃঙ্খল- যা তাদের উপরে ছিল- অপসারণ করে। সুতরাং, যারা তার প্রতি ঈমান আনে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং তার সাথে যে নূর নাযিল করা হয়েছে তা অনুসরণ করে তারাই সফলকাম।" (সূরাহ ৭; আল-আ'রাফ: -১৫৭)

(৭) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর প্রতি বেশি বেশি দরূদ ও সালাম পেশ করা: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর জন্য দু'আ করা একটি ইবাদাত, এটি তাঁর অধিকার। সবচেয়ে উত্তম দু'আ হলো তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করা। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে দরূদ অর্থ তাঁর রহমত বর্ষণ করা, মালাকগণের নিকট তাঁর প্রশংসা করা। মালাকগণের পক্ষ থেকে দরূদ অর্থ তাঁর জন্য দু'আ করা। আর মানুষের পক্ষ থেকে দরূদ অর্থ তাঁর জন্য দু'আ করা, তাঁর প্রশংসা করা, তাঁর যিকর সমুন্নত করার জন্য, তাঁর সম্মান, মর্যাদা ও প্রতিদান বৃদ্ধি করার জন্য মহান আল্লাহর নিকট কামনা করা । মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا - "নিশ্চয়

আল্লাহ (ঊর্ধ্ব জগতে ফেরেশতাদের মধ্যে) নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দু'আ করে। হে মুমিনগণ! তোমরাও নবীর উপর দরূদ পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।" (সূরাহ ৩৩; আল-আহযাব - ৫৬) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন: যে আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে আল্লাহ তার বিনিময়ে ঐ ব্যক্তির উপর ১০ বার রহমাত প্রেরণ করবেন। (সহীহ মুসলিম হা/ (৩৮৪))

রাসূলের উপর দরূদ পাঠ বিরাট ইবাদত। অনেকে তাশাহহুদে দরূদ পাঠকে ওয়াজিব বলেছেন। যখনই কোন বান্দা নেকীর উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এর উপর দরূদ পাঠ করবে তখনই তার জন্য এই ফযীলত লাভ হবে। এর জন্য নির্দিষ্ট কোন সময় বা আনুষ্ঠানিকতা শর্ত নয়। বরং আনুষ্ঠানিকভাবে যেমন মিলাদ মাহফিলে দরূদ পড়া বিদআত, কারণ মিলাদ মাহফিলই বিদআত । দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মিলাদ তথা বিদআতপন্থী আলিমগণ দরূদের আয়াত ও হাদীছ দিয়ে মিলাদ সাব্যস্ত করে থাকেন।

অথচ দরূদ পড়া হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা ও সাহাবাদের সুন্নাত আর মিলাদ হলো খ্রীষ্টানদের সুন্নাত। যা ইসলামের দৃষ্টিতে দু'দিক থেকে বিদআত।

দরূদ পড়ার নির্দেশ স্বয়ং মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা দিয়েছেন এবং মিলাদ পড়ার নির্দেশ দিয়েছে বা ব্যবস্থা করেছে একজন ইরাকের রাজনৈতিক স্বার্থউম্মাদ শাসক মুযাফফরুদ্দীন কাউকুবুরী। সে সপ্তম শতাব্দীর ৬০৪ হিজরী সনে এই মিলাদ চালূ করে। উক্ত শাসকের ইন্তেকাল হয় ৬৩০ হিজরীতে। তারীখে ইবনে খাল্লেকান ও জুনাগড়ী প্রণীত মিলাদুন্নবী দ্রষ্টব্য।

দরূদে ইব্রাহীম ব্যতীত অন্যান্য যে সমস্ত দরূদ বিভিন্ন নামে প্রচলিত ওগুলো যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা থেকে সাব্যস্ত নয় কাজেই তা পড়া রাসূলের সুন্নাতে কাউলীর পরিপন্থী হওয়ায় বিদআত। মহান আল্লাহ আমাদেরকে নিখুত ভাবে তাঁর রাসূলের অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন । আমীন ।

দরূদ পড়ার ক্ষেত্রসমূহ:

ইমাম ইবনুল ক্বাইম আল জাউযিয়াহ (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর প্রণীত জালা-উল আফহাম নামক গ্রন্থে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা

এর প্রতি দরূদ পড়ার ৪১টি ক্ষেত্র ও অবস্থা বর্ণনা করেছেন। তার কতিপয় উদ্ধৃত করা হলো:

১. ছলাতের তাশাহহুদে, ২. মাসজিদে প্রবেশের সময়, ৩. মাসজিদ থেকে বের হবার সময়, ৪. মুয়াযযিনের আযান শুনার পর, ৫. ইকামতের সময়, ৬. তাঁর (রাসূল সাল্লাল্লাহু "আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর নাম শুনার পর, ৭. দু'আর সময়, ৮. জানাযার ছলাত, ৯. সকাল-সন্ধ্যার যিকর হিসাবে, ১০. জুমআর দিন, ১১. যে কোন দ্বীনি মাজলিসের শুরু ও শেষে, ১২. দুআ কুনুতের শেষে, ১৩. তাঁর কবরের যিয়ারত কালে, ১৪. জুমআ ও ঈদাইনের খুৎবায়, ১৫. হজ্জ-উমরাহ কালে ছাফা-মারওয়াহ পাহাড়ের উপর চড়ে, ১৬. যে কোন দুশ্চিন্তা ও বিপদাপদের সময়, ১৭. ক্ষমা ও তাওবাহর জন্য ইত্যাদি ক্ষেত্র ও অবস্থা সমূহ।

যে সমস্ত অবস্থায় দরূদ পড়া নিষিদ্ধ বা অপছন্দনীয় ঃ

১। নাপাক জায়গায় ও অবস্থায়,

২। যে কোন বিদ'আতী উপলক্ষ ও অনুষ্ঠানে যেমন মীলাদে, ও ঈদে মীলাদুন্নবী, কুলখানী, জন্মবার্ষিকী ও মৃত্যুবার্ষিকী ইত্যাদিতে।

(৮) তাঁর জন্য ওয়াসীলা (আল অসীলাতু) ও ফাজীলাহ (আল ফাজীলাতু)-এর দু'আ করা: 'ওয়াসীলা' হলো জান্নাতের এমন এক সুউচ্চ স্থান, যা একমাত্র একজন বান্দার জন্যই তৈরি করা হয়েছে । ফাজীলাহ' হলো সমস্ত বরকত, কল্যাণ ও সম্মানের দু'আ করা। আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমাকে বলতে শুনেছেন, "তোমরা যখন মুওয়াযযিনকে আযান দিতে শুন, তখন সে যা বলে তোমরা তাই বল। অতঃপর আমার উপর দরূদ পাঠ কর । কেননা, যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে তার উপর দশবার রহমাত বর্ষণ করেন। অতঃপর আমার জন্যে আল্লাহর কাছে ওয়াসীলাহ্ প্রার্থনা কর। কেননা, 'ওয়াসীলাহ্' জান্নাতের একটি সম্মানজনক স্থান। এটা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একজনকেই দেয়া হবে। আমি আশা করি, আমিই হব সে বান্দা। যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আমার জন্যে ওয়াসীলাহ্ প্রার্থনা করবে তার জন্যে (আমার) শাফা'আত বৈধ হয়ে যাবে।" (সহীহ মুসলিম: - ৩৮৪)

(৯) তাঁর জন্য মাক্বামে মাহমূদের (আল মাক্বামুল মাহমুদ) দু'আ করা: 'মাক্বামে মাহমূদ' হলো কিয়ামতের দিন সৃষ্টি জগতের হিসাব শুরু করার জন্য বড় সুপারিশের (**আস শাফাআতুল উজমা**) জন্য দাঁড়ানো। এ মহান

সুপারিশের মহান মাক্বামটিই 'মাক্বামে মাহমূদ'। মহান আল্লাহ বলেন, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا - "আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ আদায় কর তোমার অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে। আশা করা যায়, তোমার রব তোমাকে প্রশংসিত অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করবেন।" (সূরাহ ১৭; আল-ইসরা - ৭৯)

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন, "যে ব্যক্তি আযান শুনে দু'আ করে, আল্লাহুম্মা রব্ বা হাজিহিদ দা'অতিত তামমাতি অস সালাতিল ক্বয়িমাতি আতি মুহাম্মাদাল অসিলাতা অল ফাজিলাতা অব আসহু মাক্বামাম মাহমুদাল্লাজি অআদতা অর্থাৎ 'হে আল্লাহ এ পরিপূর্ণ আহবান ও প্রতিষ্ঠিত সালাতের মালিক, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমাকে ওয়াসীলা ও সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী করুন এবং তাঁকে সে মাকামে মাহমুদে পৌঁছে দিন যার অঙ্গীকার আপনি করেছেন', ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য আমার শাফা'আত বৈধ হবে।" (সহীহ বুখারী: - ৬১৪)

(সাত) এ সাক্ষ্যদান ও তার সাক্ষ্যদাতার প্রতি ভালোবাসা আল মাহাববাতু লিহাজিহিস শাহাদাতি ওয়া আহলিহা

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি সাক্ষ্যদানের পরে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর প্রতি পরিপূর্ণ ভালোবাসা থাকতে হবে । যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমাকে ভালোবাসেন তাদের প্রতি ভালোবাসা এবং যারা তাঁকে অপছন্দ করে তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা এ সাক্ষ্যদানের অন্যতম শর্ত। মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ - "বল, "তোমরা মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর'। তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ কাফিরদেরকে ভালোবাসেন না।" (সূরাহ ৩; আলে-ইমরান - ৩২)

যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমাকে ভালোবাসে সে আখিরাতে তাঁর সাথে থাকবে। মহান আল্লাহ বলেন, "আর যারা মহান আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে তারা তাদের সাথে থাকবে, মহান আল্লাহ যাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীলদের মধ্য থেকে। আর সাথী হিসেবে তারা হবে উত্তম। এই অনুগ্রহ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর সর্বজ্ঞ হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।" (সূরাহ ৪; আন-নিসা - ৬৯-৭০)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর ইত্তেবা' করা মহান আল্লাহকে ভালোবাসার মাধ্যম। কুরআন কারীমে এসেছে, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ - "বল, 'যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।" (সূরাহ ৩; আলে-ইমরান ৩১) আনাস ইবনু মালিক রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, মাতাস সাআতু, ক্বলা রাসূলুল্লাহি মা আ'দাদতা লাহা ক্বলা হুববাল লিল্লাহি অরাসূলিহি। আনতা মা'আ মান আহবাবতা অর্থাৎ, এক যাযাবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমাকে প্রশ্ন করল, কিয়ামাত কবে হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা তাকে বললেন, "তুমি কিয়ামাতের জন্যে কি পাথেয় প্রস্তুত করেছ?" সে বলল, আমি বেশি কিছু প্রস্তুত করতে পারিনি। তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মুহাব্বত। তিনি বললেন, "তুমি তারই সাথী হবে যাকে তুমি মুহাব্বত কর।" (সহীহ বুখারী: ৩৬৮৮; সহীহ মুসলিম - ২৬৩৯)

যারা মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমাকে ভালোবাসবে, তাদেরকে ভালোবাসা ওয়াজিব। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ - وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ - তোমাদের বন্ধু কেবল মহান আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ, যারা সালাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে বিনীত হয়ে। আর যে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব করে, তবে নিশ্চয় মহান আল্লাহর দলই বিজয়ী।" (সূরাহ ৫; আল-মায়িদাহ - ৫৫-৫৬) আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন,

"তিনটি বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে রয়েছে, সে ঈমানের প্রকৃত স্বাদ অনুভব করবে-

(১) অন্য সবার তুলনায় যার কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক প্রিয়। (২) যে কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই তাঁর বান্দাকে ভালোবাসে। (৩) এবং যাকে আল্লাহ কুফ্‌র থেকে মুক্তি দিয়েছেন, তারপর সে কুফরের দিকে ফিরে যাওয়াকে এমন অপছন্দ করে যেমন আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করে।" (সহীহ বুখারী: ১৬; সহীহ মুসলিম: ৪৩)

যারা মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। তাদের প্রতি বৈরিতা পোষণ করা, তাদেরকে অপছন্দ করা, তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা ওয়াজিব। মহান আল্লাহ বলেন,

لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ - "তুমি পাবে না এমন জাতিকে যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনে, বন্ধুত্ব করতে তার সাথে যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে, যদিও তারা তাদের পিতা, অথবা পুত্র, অথবা ভাই, অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। এরাই, যাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে রূহ দ্বারা তাদের শক্তিশালী করেছেন। তিনি তাদের প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতসমূহে যার নিচে দিয়ে ঝর্ণাধারাসমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। এরাই আল্লাহর দল । জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর দলই সফলকাম।" (সূরাহ ৫৮; আল-মুজাদালাহ - ২২)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ - হে মুমিনগণ! ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না । তারা একে-অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয় তাদেরই একজন। নিশ্চয় আল্লাহ যালিম কওমকে হিদায়াত দেন না।" (সূরাহ ৫; আল-মায়িদাহ - ৫১)

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ - "ইবরাহীম ও তার সাথে যারা ছিল তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। তারা যখন স্বীয় সম্প্রদায়কে বলছিল, "তোমাদের সাথে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যা কিছুর উপাসনা কর তা হতে আমরা সম্পর্কমুক্ত। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি; এবং উদ্রেক হল আমাদের-তোমাদের মাঝে

শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আন।" (সূরাহ ৬০; আল-মুমতাহিনাহ- ৪)

ভালোবাসার মাপকাঠি হলো সুন্নাতের অনুসরণ। কোনো ব্যক্তির মধ্যে যতটুকু সুন্নাত আছে, তাকে ততটুকু ভালোবাসতে হবে। আর কোনো মুসলিমের মধ্যে যতটুকু খারাপ কাজ আছে, তাকে ততটুকু অপছন্দ করতে হবে।

উমার ইবনুল খাত্তাব রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর যুগে এক লোক যার নাম ছিল, আবদুল্লাহ্ আর ডাকনাম ছিল হিমার। এ লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমাকে হাসাত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা শরাব পান করার অপরাধে তাকে বেত্রাঘাত করেছিলেন। একদিন তাকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় আনা হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা তাকে চাবুক মারার আদেশ দিলেন। তাকে চাবুক মারা হলো। তখন দলের মাঝ থেকে এক লোক বলল, হে আল্লাহ! তার উপর লা'নত বর্ষণ করুন! নেশাগ্রস্থ অবস্থায় তাকে কতবার যে আনা হল! তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বললেন, "তাকে লা'নত করো না। আল্লাহর কসম! আমি জানি যে, সে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে।" (সহীহ বুখারী: - ৬৭৮০)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমাকে ভালোবাসার সহায়ক কর্মসমূহ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমাকে ভালোবাসার সহায়ক অনেক কর্ম রয়েছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

(১) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর উত্তম গুণাবলিসমূহ এবং তাঁর মহান চরিত্র সম্পর্কে জানা। মহান আল্লাহ বলেন, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ -
"আর নিশ্চয় তুমি মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত।" (সূরাহ ৬৮; আল-ক্বলাম - ৪)

আয়িশাহ রাজিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর নিকট ওয়াহীর সূচনা হয়েছিল সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে । আর তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন তা সকালের সূর্যের মতোই সুস্পষ্টরূপে সত্যে পরিণত হত। অতঃপর তাঁর কাছে একাকী থাকা প্রিয় হয়ে পড়ে এবং তারপর তিনি হেরা গুহায় নির্জনে কাটাতে

থাকেন। আপন পরিবারের কাছে ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত সেখানে তিনি একাধারে বেশ কয়েক রাত ইবাদাতে মগ্ন থাকতেন এবং এর জন্য কিছু খাদ্য সামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যেতেন। তারপর তিনি খাদীজার কাছে ফিরে যেতেন এবং আরো কয়েক দিনের জন্য অনুরূপভাবে খাদ্য সামগ্রী নিয়ে আসতেন। তিনি যখন হেরা গুহায় ছিলেন, তখন তাঁর নিকট ফেরেশ্‌তা আসলেন, এরপর বললেন, পড়ুন! তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বললেন, "আমি তো পড়তে জানি না।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেন, "তখন ফেরেশ্‌তা আমাকে জড়িয়ে ধরে এমন চাপ দিলেন যে, আমার খুবই কষ্ট হলো।" তারপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, "পড়ুন! আমি বললাম, আমি তো পড়তে সক্ষম নই।" তারপর আমাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং দ্বিতীয়বারও এমন জোরে চাপ দিলেন যে, আমার খুবই কষ্ট হলো। পরে ছেড়ে দিয়ে বললেন, পড়ুন! আমি বললাম, "আমি তো পড়তে সক্ষম নই।" এরপর আবার আমাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং তৃতীয়বারও এমন জোরে চাপ দিলেন যে আমার খুবই কষ্ট হলো। এরপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন,

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ - خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ - الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (অর্থ) 'পাঠ করুন! আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন; সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক্' হতে। পাঠ করুন! আর আপনার প্রতিপালক মহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না' (সূরাহ ৯৬; 'আলাক্ব ১-৫)। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এ ওয়াহী নিয়ে ফিরে এলেন। তাঁর স্কন্ধের পেশীগুলো কাঁপছিল । খাদীজাহ্ রাজিয়াল্লাহু আনহার নিকট এসে বললেন, "তোমরা আমাকে চাদর দ্বারা ঢেকে দাও, তোমরা আমাকে চাদর দ্বারা ঢেকে দাও।" তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। অবশেষে তাঁর ভীতি দূর হলো। এরপর খাদীজাহ রাজিয়াল্লাহু আনহাকে সকল ঘটনা উল্লেখ করে বললেন, "খাদীজাহ্ আমার কি হলো? আমি আমার নিজের উপর আশঙ্কা করছি।" খাদীজাহ্ রাজিয়াল্লাহু আনহা বললেন, না! কখনো তা হবে না! বরং সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহর কসম! তিনি কখনো আপনাকে অপমানিত করবেন না। আল্লাহর কসম! আপনি স্বজনদের খোঁজ-খবর রাখেন, সত্য কথা বলেন, দুঃখীদের দুঃখ নিবারণ করেন, দরিদ্রদের বাঁচার ব্যবস্থা

করেন, অতিথিদের সেবা করেন এবং প্রকৃত দুর্দশাগ্রস্থদের সাহায্য করেন। (সহীহ বুখারী: ৪৯৫৩; সহীহ মুসলিম: ১৬০)

(২) উম্মতের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ, দয়া এবং তাদের জন্য আখিরাতের আযাবের ভয় প্রভৃতিকে স্মরণ করা। মহান আল্লাহ বলেন, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ - "নিশ্চয়ই তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছেন, তা তার জন্য কষ্টদায়ক যা তোমাদেরকে পীড়া দেয়। তিনি তোমাদের কল্যাণকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, পরম দয়ালু।" (সূরাহ ৯; আত-তাওবাহ - ১২৮) আবূ হুরায়রাহ রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমাকে বলতে শুনেছেন, "আমার ও লোকদের উদাহরণ এমন লোকের মত, যে আগুন জ্বালালো আর যখন তার চারদিক আলোকিত হয়ে গেল, তখন পতঙ্গ ও ঐ সমস্ত প্রাণী যেগুলো আগুনে পুড়ে, তারা তাতে পুড়তে লাগল। তখন সে সেগুলোকে আগুন থেকে ফিরানোর চেষ্টা করল। কিন্তু সেগুলো আগুনে তাকে পরাজয় করল এবং আগুনে পতিত হলো। (তদ্রূপ) আমিও তোমাদের কোমর ধরে আগুন থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছি। কিন্তু তোমরা তাতেই পতিত হচ্ছ।" (সহীহ বুখারী: ৬৪৮৩; সহীহ মুসলিম: ২২৮৪)

(৩) উম্মতের হেদায়েতের জন্য তাঁর কোরবানী সম্পর্কে জানা। তিনি তাঁর সব কিছু মানুষকে দাওয়াত দেয়ার জন্যই ব্যয় করেছেন। আনাস রাযিাল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন, "আমাকে আল্লাহর পথে যেভাবে ভয় দেখানো হয়েছে, আর কাউকে ঐভাবে ভয় দেখানো হয়নি । আমাকে আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে যেভাবে যন্ত্রণা দেয়া হয়েছে আর কোনো ব্যক্তিকে সেভাবে যন্ত্রণা প্রদান করা হয়নি । আমার উপর দিয়ে ত্রিশটি দিবারাত্রি এমনভাবে অতিবাহিত হয়েছে যে, বিলালের বগলের মধ্যে রক্ষিত সামান্য খাদ্য ছিল আমার ও বিলালের সম্বল । তা ছাড়া এতটুকু আহারও ছিল না যা কোনো প্রাণধারী প্রাণী খেয়ে বাঁচতে পারে।" (জামে' আত-তিরমিযী: ২৪৭২; শাইখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

(৪) অধিক পরিমাণে সীরাতের গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করা। মহান আল্লাহ বলেন, لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا - "অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে

উত্তম আদর্শ তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।" (সূরাহ ৩৩; আল-আহযাব - ২১)

(৫) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর সুন্নাতের প্রচার-প্রসারে সার্বিক সহযোগিতা করা। সাহাবায়ে কেরাম রাজিয়াল্লাহু আনহুম এ পদ্ধতিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমাকে ভালোবেসেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ - "সুতরাং, যারা তার প্রতি ঈমান আনে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং তার সাথে যে নূর নাযিল করা হয়েছে তা অনুসরণ করে তারাই সফলকাম।" (সূরাহ ৭; আল-'আরাফ - ১৫৭)

(৬) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর আহলে বাইতকে ভালোবাসা। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا - হে নবী পরিবার, আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতাকে দূরীভূত করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।" (সূরাহ ৩৩; আল-আহযাব - ৩৩) তিনি অন্য আয়াতে বলেন, يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا - হে নবী-পত্নিগণ, তোমরা অন্য কোনো নারীর মতো নও । যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে (পরপুরুষের সাথে) কোমল কণ্ঠে কথা বলো না, তাহলে যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে সে প্রলুব্ধ হয়। আর তোমরা ন্যায়সঙ্গত কথা বলবে।" (সূরাহ ৩৩; আল-আহযাব - ৩২)

যাইদ বিন আরক্বাম রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা একদিন মাক্কাহ্ ও মাদীনার মাঝামাঝি 'খুম্ম' নামক স্থানে দাঁড়িয়ে আমাদের সামনে বক্তৃতা দিলেন। আল্লাহর প্রশংসা ও সানা বর্ণনা শেষে ওয়াজ-নসীহাত করলেন। অতঃপর বললেন, "হুঁশিয়ার, হে লোক সকল! আমি একজন মানুষ, অতি সত্ত্বরই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ফেরেশ্তা আসবে, আর আমিও তাঁর আহ্বানে সাড়া দিব। আমি তোমাদের নিকট ভারী দু'টো জিনিস রেখে যাচ্ছি । এর প্রথমটি হলো আল্লাহর কিতাব। এতে হিদায়াত এবং আলোকবর্তিকা আছে। অতএব, তোমরা আল্লাহর কিতাবকে অনুসরণ করো, একে শক্ত করে আঁকড়ে রাখো।' তারপর তিনি কুরআনের প্রতি উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিলেন। এরপর বলেন, "আর দ্বিতীয়টি হলো আমার আহলে বায়ত। আর আমি আহলে

বায়তের বিষয়ে তোমাদের আল্লাহর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি। আহলে বায়তের ব্যাপারে তোমাদের আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আহলে বায়াতের বিষয়ে তোমাদের আল্লাহর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি।" (সহীহ মুসলিম: ২৪০৮)

(৭) তাঁর সাহাবীদেরকে ভালোবাসা। তাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমাকে সর্বোচ্চ ভালোবেসেছেন। ইমরান ইবনু হুসাইন রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন, খইরুকুম ক্বারনি সুম্মাল্লাজীনা ইয়ালুনাহুম সম্মাল্লাজীনা ইয়ালুনাহুম অর্থাৎ "আমার যুগের লোকেরাই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম। অতঃপর তাদের নিকটবর্তী যুগের লোকেরা, অতঃপর তাদের নিকটবর্তী যুগের লোকেরা।" (সহীহ বুখারী: ২৬৫১; সহীহ মুসলিম: ২৫৩৫)

আবূ সা'ঈদ খুদরী রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন, তোমরা আমার সাহাবীদের কাউকে গাল-মন্দ করবে না। কারণ, তোমাদের কেউ যদি উহুদ পর্বতের সমতুল্যও স্বর্ণ খরচ করে তবুও তাঁদের এক মুদ অথবা অর্ধ মুদের ন্যায় হবে না।" (সহীহ বুখারী: ৩৬৭৩; সহীহ মুসলিম: ২৫৪১)

(আট) এ সাক্ষ্যদানের প্রতি ঈমান এবং তার বিপরীত বিষয়সমূহ অস্বীকার করা
আল ঈমানু বিহা অল কুফ্রু বিহা ইউনাক্বিজুহা

রিসালাতের সাক্ষ্যদানের শর্ত হলো, এ সাক্ষ্যদানের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান আনতে হবে। এ সাক্ষ্যদানের বিপরীত সকল বিষয়কে অস্বীকার করতে হবে । মহান আল্লাহ বলেন, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا - "আর যে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার জন্য হিদায়াত প্রকাশ পাওয়ার পর এবং মুমিনদের পথের বিপরীত পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে ফেরাব যেদিকে সে ফিরে এবং তাকে প্রবেশ করাব জাহান্নামে। আর আবাস হিসেবে তা খুবই মন্দ।" (সূরাহ ৪; আন-নিসা - ১১৫)

এ সাক্ষ্যদানের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস অর্জিত হয় তাঁর ইত্তেবা'র মাধ্যমে। তাঁর অনুসরণের মাধ্যমে রবের সন্তুষ্টি অর্জিত হয়, জান্নাত লাভ করা যায়, আযাব থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। মহান আল্লাহ তাঁর নিজের কসম করে ঘোষণা দিয়েছেন তাঁর রাসূলের পরিপূর্ণ আনুগত্য ছাড়া কেউ মুমিন হতে পারবে না । মহান আল্লাহ বলেন, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا

شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا - "অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোনো দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়।" (সূরাহ ৪; আন-নিসা ৬৫) فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ - "সুতরাং, যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে তাদের উপর কঠিন শাস্তি।" (সূরাহ ২৪; আন-নূর - ৬৩) وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ - "রাসূল তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে সে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও এবং আল্লাহকেই ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর।" (সূরাহ ৫৯; আল-হাশর - ৭) তাঁর অনুসরণ উম্মতের উপর ফরয। তাঁর শরী'আত, পদ্ধতি ও সুন্নাতের বিপরীত করা উম্মতের জন্য হারাম। মহান আল্লাহ বলেন, فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ - "সুতরাং, তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আন ও তাঁর প্রেরিত উম্মী নবীর প্রতি, যে আল্লাহ ও তাঁর বাণীসমূহের প্রতি ঈমান রাখে। আর তোমরা তার অনুসরণ কর, আশা করা যায়, তোমরা হিদায়াত লাভ করবে।" (সূরাহ ৭; আল-আ'রাফ - ১৫৮)

ইরবাদ বিন সারিয়াহ রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা আমাদেরকে এমন হৃদয়গ্রাহী নসীহত করেন যে, তাতে (আমাদের) চোখগুলো অশ্রু ঝরালো এবং অন্তরসমূহ প্রকম্পিত হলো। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এতো যেন নিশ্চয়ই বিদায়ী ভাষণ। অতএব, আপনি আমাদের থেকে কি প্রতিশ্রুতি নিবেন (আদেশ দিবেন)? তিনি বলেন, "আমি তোমাদের আলোকিত দীনের উপর রেখে যাচ্ছি, তার রাত তার দিনের মতোই (উজ্জ্বল)। আমার পরে নিজেকে ধ্বংসকারীই কেবল এ দীন ছেড়ে বিপথগামী হবে।" (সুনান ইবন মাজাহ: ৪৩)

আনাস ইবনু মালিক রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন, ফামান রাগিবা আন সুন্নাতি ফালাইছা মিন্নি অর্থাৎ "সুতরাং, যারা আমার সুন্নাতের প্রতি বিরাগ পোষণ করবে, তারা আমার দলভুক্ত নয়।" (সহীহ বুখারী: ৫০৬৩; সহীহ মুসলিম: ১৪০১)

সুন্নাহকে সংরক্ষণ করার মাধ্যমসমূহ

এ সাক্ষ্যদানের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস অর্জিত হয় তাঁর সুন্নাহকে সংরক্ষণ করার মাধ্যমে। সুন্নাহকে সংরক্ষণ করার অন্যতম মাধ্যমগুলো হলো-

(১) সহীহ হাদীসসমূহ ও সাহাবী, তাবেয়ীদের আছার-সমূহ শিক্ষা লাভ করা এবং শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করা। বিভিন্ন হাদীসের গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে: যায়েদ ইবন সাবিত রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার নিকট হতে হাদীস শুনে তা মুখস্থ রাখলো এবং অন্যের নিকটও তা পৌঁছে দিলো, আল্লাহ তাকে চিরউজ্জ্বল করে রাখবেন। জ্ঞানের অনেক বাহক তার চেয়ে অধিক সমঝদার লোকের নিকট তা বহন করে নিয়ে যায়; যদিও জ্ঞানের বহু বাহক নিজেরা জ্ঞানী নয়।" (আবূ দাউদ: ৩৬৬০; জামে আত-তিরমিযী: ২৬৫৬; শাইখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

(২) তাঁর সুন্নাহকে বাতিল ফিরকাসমূহের বিচ্যুতি, পরিবর্তন ও ভুল ব্যাখ্যা থেকে সংরক্ষণ করা। সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন, "আমার পূর্বে আল্লাহ তাআলা যে নবীকেই কোন উম্মতের মধ্যে পাঠিয়েছেন, তাদের মধ্যে তাঁর জন্য একদল অনুসারী ও সহাবা ছিল। তারা তাঁর সুন্নাতকে সমুন্নত রাখত এবং তাঁর নির্দেশের অনুসরণ করত। অতঃপর তাদের অবর্তমানে কতগুলো মন্দ লোক স্থলাভিষিক্ত হয়। তারা মুখে যা বলে নিজেরা তা করে না। আর যা করে তার জন্য তাদেরকে নির্দেশ করা হয়নি। অতএব, যে ব্যক্তি তাদের হাত (শক্তি) দ্বারা মুকাবিলা করবে, সে মু'মিন। যে ব্যক্তি তাদের মুখ দ্বারা মুকাবিলা করবে, সে মুমিন। যে ব্যক্তি তাদের মন দ্বারা ঘৃণা করবে, সে মুমিন। এরপর আর সরিষার দানা পরিমাণও ঈমানের স্তর নেই । (সহীহ মুসলিম: ৫০)

(৩) তাঁর সুন্নাহকে জাল হাদীস থেকে মুক্ত করা। যুগে যুগে উম্মতের আলিমগণ এ কাজটি করেছেন। ইমাম মালেক, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম রাহিমাহুমুল্লাহ-সহ অসংখ্য মহাদ্দিস সহীহ হাদীসের গ্রন্থ সংকলন করেছেন। ইবনু সীরিন রাহিমাহুল্লাহ বলতেন, নিশ্চয়ই এ ইলম হলো দীন। কাজেই কার কাছ থেকে তোমরা দীন গ্রহন করছো, তা যাচাই করে নাও। (সহীহ মুসলিম-১/১৪, সুনান আদ-দারেমী: ৪৩৮)

(৪) তাঁর সুন্নাহর প্রতি ঠাট্টা বিদ্রূপকারীদের, সন্দেহ সৃষ্টিকারীদের প্রতিহত করা। যেমন- সালাত, পর্দা, মিসওয়াক, দাঁড়ি, টাখনুর উপর পোশাক

পরিধান, উত্তরাধিকার আইন প্রভৃতি নিয়ে কেউ কেউ বিদ্রূপ করে, সন্দেহ সৃষ্টি করে। মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ - "আর যখন তোমরা সালাতের দিকে ডাক, তখন তারা একে উপহাস ও খেল-তামাশারূপে গ্রহণ করে। তা এই কারণে যে, তারা এমন কওম, যারা বুঝে না।" (সূরাহ ৫; আল-মায়িদাহ - ৫৮)

সহীহ সুন্নাহর প্রতি ঠাট্টা বিদ্রূপ করা, সুন্নাহর মধ্যে দোষ-ত্রুটি খোঁজা কুফরী। যা ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

মহান আল্লাহ বলেন, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ - لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ - "আর যদি তুমি তাদেরকে প্রশ্ন কর, অবশ্যই তারা বলবে, আমরা আলাপচারিতা ও খেল-তামাশা করছিলাম। বল, 'আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলের সাথে তোমরা বিদ্রূপ করছিলে'? তোমরা ওযর পেশ করো না। তোমরা তোমাদের ঈমানের পর অবশ্যই কুফরী করেছ। যদি আমি তোমাদের থেকে একটি দলকে ক্ষমা করে দেই, তবে অপর দলকে আযাব দেব। কারণ, তারা হচ্ছে অপরাধী।" (সূরাহ ৯; আত-তাওবাহ - ৬৫-৬৬)

যারা এ ধরনের কাজ করে তাদেরকে প্রতিহত করাকে জিহাদ বলা হয়েছে। আল- কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا - "সুতরাং, তুমি কাফিরদের আনুগত্য করো না এবং তুমি কুরআনের সাহায্যে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম কর।" (সূরাহ ২৫; আল-ফুরক্বান - ৫২)

সুন্নাহের বিপরীত বিষয়সমূহ অস্বীকার করার পদ্ধতিসমূহ

সুন্নাতের বিপরীত বিষয়সমূহকে অস্বীকার করাও রিসালাতের সাক্ষ্যদানের শর্ত। যেমনিভাবে কেউ তাওহীদের সাক্ষ্য দিলে তাগূতকে অস্বীকার করা শর্ত, তেমনিভাবে কেউ রিসালাতের সাক্ষ্য দিলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা ও তাঁর সুন্নাহ বিরোধীদের অস্বীকার করাও শর্ত ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর সুন্নাতের বিপরীত বিষয়সমূহকে অস্বীকারের পদ্ধতি নিম্নরূপ-

(১) সুন্নাত বিমূখ প্রবৃত্তি পূজারী, বিদ'আতকারী ও ভ্রষ্ট ব্যক্তিদের পরিত্যাগ করা যাতে তারা তাদের গোমরাহী ও বিদ'আত থেকে তাওবাহ করে ফিরে আসে। মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا

فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ - "আর যখন তুমি তাদেরকে দেখ, যারা আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে উপহাসমূলক সমালোচনায় রত আছে, তুমি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, যতক্ষণ না তারা অন্য কথাবার্তায় লিপ্ত হয়। আর যদি শয়তান তোমাকে ভুলিয়ে দেয়, তবে স্মরণের পর যালিম সম্প্রদায়ের সাথে বসো না।" (সূরাহ ৬; আল-আন'আম - ৬৮)

সুন্নাত বিরোধীদের সাহচর্যে থাকলে তাদের প্রভাব তার মধ্যে এসে পড়ে। এতে তার অন্তরেও বক্রতা সৃষ্টি হয়। আবূ মূসা রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন, "সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত হলো, কস্তুরীওয়ালা ও কামারের হাপরের ন্যায়। কস্তুরীওয়ালা হয়ত তোমাকে কিছু দান করবে কিংবা তার নিকট হতে তুমি কিছু খরিদ করবে কিংবা তার নিকট হতে তুমি সুবাস পাবে। আর কামারের হাপর হয়ত তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে কিংবা তার নিকট হতে পাবে দুর্গন্ধ।" (সহীহ বুখারী: ৫৫৩৪; সহীহ মুসলিম: ২৬২৮)

মহান আল্লাহ বলেন, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ - "আর তোমরা ভয় কর ফিতনাকে যা তোমাদের মধ্য থেকে বিশেষভাবে শুধু যালিমদের উপরই আপতিত হবে না। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ আযাব প্রদানে কঠোর।" (সূরাহ ৮; আল-আনফাল - ২৫)

(২) সুন্নাতের প্রকৃত অনুসারীদের মজলিসে বসতে হবে, তাঁদের সোহবতে থাকতে হবে, তাঁদের আলোচনা শুনতে হবে। বিদ'আতীদের মজলিস থেকে দূরে থাকতে হবে, তাদের সোহবত পরিত্যাগ করতে হবে, তাদের আলোচনা শুনা থেকে বিরত থাকতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا - "আর তুমি নিজকে ধৈর্যশীল রাখ তাদের সাথে, যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের রবকে ডাকে, তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশে এবং দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে তোমার দু'চোখ যেন তাদের থেকে ঘুরে না যায়। আর ওই ব্যক্তির আনুগত্য করো না, যার অন্তরকে আমি আমার যিকির থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে এবং যার কর্ম বিনষ্ট হয়েছে।" (সূরাহ ১৮; আল-কাহাফ ২৮)

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا - "আর তিনি তো কিতাবে তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করা হচ্ছে এবং সেগুলো নিয়ে উপহাস করা হচ্ছে, তাহলে তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা অন্য কথায় নিবিষ্ট হয়, তা না হলে তোমরাও তাদের মতো হয়ে যাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুনাফিক ও কাফিরদের সকলকে জাহান্নামে একত্রকারী।" (সূরাহ ৪; আন-নিসা ১৪০)

বিদ'আতী ব্যক্তির সাথে উঠাবসা করলে তিনটির যেকোনো একটি বিপদে পড়ার সম্ভাবনা আছে ।

(ক) হয় সে অন্যদের জন্য ফিতনায় পরিণত হবে।

(খ) নতুবা তার অন্তরে এমন কিছু তৈরি হবে যা তার ক্ষতি করবে।

(গ) নতুবা সে তার ঈমান ও ইলমের গভীরতায় নিজেকে বড় মনে করবে।

তিনটিই বড় বড় বিপদ। মহান আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন। (কালেমায়ে শাহাদাতের গুরুত্ব ও শর্ত)

কুফর ও কুফরের প্রকারভেদ

ঈমানের বিপরীত হলো কুফর। আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা বলেন, لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - "দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই। নিশ্চয় হিদায়াত স্পষ্ট হয়েছে ভ্রষ্টতা থেকে অতএব, যে ব্যক্তি তাগূতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই সে মজবুত রশি আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" (সূরাহ আল-বাক্বারাহ ঃ ২৫৬ আয়াত)

মহান আল্লাহ ছাড়া আর যার পূজা করা হয়, তাকে তাগূত বলে। উল্লিখিত আয়াতে কারীমায় আগে সকল প্রকার তাগূতকে অস্বীকার করতে এবং পরে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে বলা হয়েছে। এখানে **ইয়াকফুর বিত ত্বাগুতি** অর্থাৎ তাগূতকে অস্বীকার করতে বলার অর্থ তাগূতের সাথে কুফরি করার নির্দেশ। এই নির্দেশের আলোকে আমরা ঈমান আনয়নের শুরুতেই তাওহীদের বাণী পড়ে থাকি, আর তাহলো, **লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু** অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই। **লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু** এর **লা-ইলাহা** শব্দগুচ্ছ দ্বারা প্রথমেই আমরা সকল প্রকার তাগূতের সাথে কুফরি করে থাকি, অতঃপর

ইল্লাল্লাহু শব্দগুচ্ছ দ্বারা একমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমান আনি। সুতরাং ঈমান ও কুফর দুটি বিপরীত বিষয় এবং এ দুটো অতি সূক্ষ্মভাবে পাশাপাশি অবস্থান করে। তাই 'ঈমান' বোঝার জন্য 'কুফর বুঝা এবং 'কুফর' বোঝার জন্য 'ঈমান' বুঝা প্রয়োজন। কুফর (আল কুফরু) শব্দের অর্থ- অস্বীকার করা, গোপন করা, আবৃত করা, লুকিয়ে রাখা, অবিশ্বাস করা ইত্যাদি। যেমন কুফর শব্দটির শুধুমাত্র শাব্দিক অর্থকে প্রাধান্য দিয়ে আরবীতে একজন কৃষককে কাফির (আবৃতকারী) বলা হয়। কেননা কৃষক বীজকে মাটি দ্বারা আবৃত করে রাখেন। তবে ইসলামী পরিভাষায় কুফর হলো, **জিদ্দাল ঈমানী** অর্থাৎ ঈমানের বিপরীত। ঈমানের ছয়টি রুকনের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করাকে ঈমান বলে। সুতরাং এ ছয় রুকনের কোনটির প্রতি বিন্দুমাত্র অস্বীকৃতিই হলো কুফর। ইসলামী শরী'আতে কুফর দুই প্রকার। সেগুলো হলো :

(১) আল-কুফরুল আকবার তথা বৃহত্তর কুফর : কুফর আকবারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়। সে একজন প্রকৃত কাফিরে পরিণত হয়। ফলে তার সকল আমল বরবাদ হয়। তার পরিণতি হয় স্থায়ী জাহান্নাম ।

(২) আল-কুফরুল আসগার তথা ক্ষুদ্রতর কুফর : কুফর আসগারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় না। সে সম্পূর্ণ কাফির হয় না। তার আমল বরবাদ হয় না। তবে সে পাপী ও শাস্তিযোগ্য অপরাধী।

আল-কুফরুল আকবার পাঁচ প্রকার। সেগুলো হলো :

(১) মহান আল্লাহর প্রতিপালনের একত্বে অবিশ্বাস বা কুফরি (আল কুফরু বিত্ তাওহীদুর রুবুবিইয়্যাহ) : তাওহীদের প্রথম পর্যায় হলো তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ। ক্ষমতা, সৃষ্টি, প্রতিপালন, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে মহান আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস স্থাপন করাই হলো তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ। সুতরাং এ সকল বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় হওয়ার ব্যাপারে সামান্যতম অবিশ্বাস, অস্বীকার, দ্বিধা ও সন্দেহ করাই হলো কুফরি, যেমন- মহান আল্লাহর অস্তিত্বে, সৃষ্টিতে বা ক্ষমতায় অবিশ্বাস করা, অন্য কাউকে অংশীদার মনে করা, সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর একত্বের ব্যাপারে আংশিক বিশ্বাস ও আংশিক অবিশ্বাস করা ইত্যাদি। এর সবই আল-কুফরু বি-তাওহীদির রুবূবিয়্যাহ ।

(২) মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলির একত্বে অবিশ্বাস (আল কুফরু বি ওয়াহিদীল আসমায়ি অস সিফাতি) : তাওহীদের দ্বিতীয় পর্যায় হলো, তাওহীদুল আসমায়ি ওয়াস-সিফাত অর্থাৎ মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলির

একত্ব। সুতরাং মহান আল্লাহ তাঁর যে সকল নাম ও গুণাবলি আমাদেরকে জানিয়েছেন, সেগুলোর কোনটির ব্যাপারে সামান্যতম অবিশ্বাস, অস্বীকার ও সন্দেহ করা, সেগুলোকে তাঁর কোন সৃষ্টির সাথে তুলনা করা, এসবই আল-কুফরু বিত-তাওহীদুল আসমায়ি ওয়াস সিফাত। যেমন- মহান আল্লাহর 'ইলম (ইলমুল্লাহি) আসমান, জমিন ও তাঁর সমস্ত মাখলুক্বাত ব্যাপী বেষ্টিত । তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী। কোন কিছুই তাঁর জ্ঞানের ঊর্ধ্বে নয়। আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা বলেন, - عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ "তিনি গাইব ও প্রকাশ্যের জ্ঞানী, মহান, সর্বোচ্চ।" (সূরাহ আর-রাদ : ৯ আয়াত)

সুতরাং তাঁর একটি নাম হলো, আল-'আলীম তথা সর্বজ্ঞ। এক্ষেত্রে তাঁর এ নামের ব্যাপারে সামান্যতম অবিশ্বাস, অস্বীকার ও সন্দেহ পোষণ করা কুফরি। তিনি ছাড়া আর কেউ গাইবের খবর জানেন না। কোন নবী-রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা গাইবের খবর জানেন না। সুতরাং তাঁর অদৃশ্য জ্ঞানের সাথে অন্য কাউকে শরীক করা কুফরি।

মহান আল্লাহর একটি নাম হলো, আল-ক্বাদির তথা সর্বশক্তিমান, মহা ক্ষমতাধর। সুতরাং তাঁর কুদরতের ব্যাপারে ন্যূনতম অবিশ্বাস করা, অস্বীকার করা, সন্দেহ করা, কোন সৃষ্টির সাথে তুলনা করা এবং কাউকে শরীক করা কুফরি।

মহান আল্লাহর বাণী (কালামুল্লাহি) তথা কুরআন মহান আল্লাহর একক সত্তার অংশ। কুরআনুল কারীমে বর্ণিত প্রতিটি হুকুম, আইন বা বিধানের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর প্রণীত আইনের বিপরীতে অন্য কারো আইন প্রণয়নের ক্ষমতা বা অধিকার নেই। সুতরাং মহান আল্লাহ প্রণীত আইনের বিপরীতে অন্য কাউকে আইন প্রনয়নের অধিকার দেওয়া এবং অন্য কারো আইন প্রনয়নের অধিকার আছে বলে মনে করা কুফরি। অনুরূপভাবে মহান আল্লাহর হাত, পা, চোখ, মুখমন্ডল ইত্যাদি তাঁর কোন সৃষ্টির সাথে তুলনীয় নয়। এক্ষেত্রেও তিনি একক ও অতুলনীয় সুতরাং মহান আল্লাহর হাত, পা, চোখ, মুখমন্ডল ইত্যাদিকে কোন সৃষ্টির সাথে তুলনা করা অথবা এগুলোকে অবিশ্বাস অস্বীকার বা সন্দেহ করা কুফরি।

মহান আল্লাহ কখনো ঘুমান না, তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, - لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ "তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না।" (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ২৫৫ আয়াত)

সুতরাং এক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র অস্বীকার, অবিশ্বাস ও সন্দেহ করা কুফরি । মহান আল্লাহর কোন মা-বাবা, স্ত্রী, সন্তান, ছেলেমেয়ে নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। ইয়াহুদীরা নবী উযাইর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-কে আল্লাহর ছেলে বলে দাবী করে এবং খ্রীষ্টানরা ঈসা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-কে আল্লাহর ছেলে বলে দাবী করে। তাদের উভয়টিই কুফরি। আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা এ প্রসঙ্গে বলেন, وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ - "আর ইয়াহুদীরা বলে, উযাইর আল্লাহর পুত্র এবং নাসারারা বলে মাসীহ আল্লাহর পুত্র। এটা তাদের মুখের কথা। তারা সেসব লোকের কথার অনুরূপ বলছে, যারা ইতঃপূর্বে কুফরি করেছে। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন, কোথায় ফেরানো হচ্ছে এদেরকে?" (সূরাহ আত-তাওবাহ : ৩০ আয়াত) খ্রীষ্টানরা মারিয়াম আলাইহিস সাল্লাম-কে আল্লাহর স্ত্রী সাব্যস্ত করে থাকে। মুশরিকরা ফেরেশ্তাদের আল্লাহর মেয়ে বলে দাবি করে। মুসলিমদের মধ্যে যারা গোমরাহিতে লিপ্ত তারা ওলি-আওলিয়াদের আল্লাহর সহযোগী মনে করে। এগুলো সবই 'আল-কুফরু বি-তাওহীদিল আসমায়ি ওয়াস সিফাত' এর অন্তর্ভুক্ত।

(৩) মহান আল্লাহর ইবাদাতের একত্বে অবিশ্বাস (আল কুফরু বি তাওহীদিল ইবাদাতি) : তাওহীদের চূড়ান্ত প্রকার হলো তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ বা তাওহীদুল ইবাদাহ। ইবাদাত পাওয়ার একমাত্র হক্বদার হলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। মহান আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদাত করা বা ইবাদাতের হক্বদার মনে করা কুফরি। একইভাবে মহান আল্লাহর ইবাদাতের একত্বে অবিশ্বাস করা, অস্বীকার করা, সন্দেহ করা এবং নিজেদের মনগড়া ইবাদাত তৈরী করে নেওয়া বা মনগড়া ইবাদাতকে ইবাদাতের সাথে মিশ্রিত করে নেওয়া কুফরি, এগুলোকে আল-কুফরু বি-তাওহীদিল ইবাদাহ বলা হয়।

(৪) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর রিসালাতে অবিশ্বাস (আল কুফরু বি রিসালাতি মুহাম্মাদ): ঈমানের অবিচ্ছেদ্য মৌলিক অংশ হলো মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-কে মহান আল্লাহ প্রেরিত শেষ নবী ও রাসূল হিসেবে মেনে নেওয়া এবং **অআশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অরাসূলুহু** অর্থাৎ 'আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা আল্লাহর বান্দা ও রাসূল' -এরূপ সাক্ষ্য প্রদান করা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর ব্যক্তিত্ব, রিসালাত, মর্যাদা, মহত্ব, তাবলীগের পূর্ণতা, নবুওয়াতের পূর্ণতা, বিশ্বজনীনতা ও পরিসমাপ্তি এবং তাঁর কথা, কর্ম অনুমোদন ও মৌন সম্মতি ইত্যাদির কোনটিতে বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস, অস্বীকৃতি ও সন্দেহ পোষণ করা নিঃসন্দেহে কুফরি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর উপর অবতীর্ণ কুরআনুল কারীমের প্রতিটি আয়াত মুতাওয়াতির পর্যায়ে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। সহীহ সুন্নারও কিছু সংখ্যক হাদীস রয়েছে যা মুতাওয়াতির মুতাওয়াতির বৃহৎ সংখ্যক রাবীর বর্ণিত হাদীস, মিথ্যার ব্যাপারে যাদের উপর একাট্টা হওয়া অসম্ভব, সনদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ সংখ্যা বিদ্যমান থাকলে হাদীসকে মুতাওয়াতির বলা হয় পর্যায়ের। কুরআনুল কারীমের কোন আয়াত, বিধান বা শিক্ষা এবং মুতাওয়াতির পর্যায়ের হাদীসগুলোর কোনটির ব্যাপারে সামান্যতম অবিশ্বাস, অস্বীকার সন্দেহ পোষণ করা কুফরি। তবে অন্যান্য সহীহ ও হাসান পর্যায়ের হাদীসগুলোর ব্যাপারে কেউ যদি অবিশ্বাস, অস্বীকার বা সন্দেহ পোষণ করেন, তবে তাকে কাফির বলা যায় না তবে সে নিঃসন্দেহ গোমরাহ বা পথভ্রষ্ট।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর মাধ্যমে আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা দীনকে কিয়ামত পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর পর আর কোন নবী রাসূল আসবেন না। পূর্ণাঙ্গ দীনুল ইসলামের মধ্যে আর কোন ধরণের সংযোজন বিয়োজনের সুযোগ নেই। আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা এ প্রসঙ্গে বলেন, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا - "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দীন হিসেবে পছন্দ করলাম। (সূরাহ আল-মায়েদাহ : ৩ আয়াত)

সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর আগমনের মধ্য দিয়ে নবুওয়াতের ধারা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেছে। কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় যদি মনে করেন যে, নবুওয়াতের ধারা বন্ধ হয়নি, নবী রাসূলগণ আরোও আসবেন, তবে সকল উলামায়ে কিরামগণের ঐক্যমতে তারা কাফির। যেমন- কাদিয়ানি সম্প্রদায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে যাননি এবং তিনি যুগে যুগে ওলি-আওলিয়াদেরকে শরী'আতের

বিভিন্ন আমল ও দিকনির্দেশনা কাশফ, ইলহাম, ইলকা ও স্বপ্নযোগে পৌঁছিয়ে থাকেন, এধরণের বিশ্বাস পোষণ করা কুফরি। এ ধরণের বিশ্বাস পোষণের মাধ্যমে এটাই প্রতিয়মান করা হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর প্রতি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুওয়াতের যে আমানত ছিল, তিনি তা সঠিকভাবে পৌঁছাননি বরং গোপন করেছেন, যা ওলি-আওলিয়াদের মাধ্যমে পরবর্তীতে তিনি পৌঁছিয়েছেন, নাউযুবিল্লাহ। এটি একটি অপবাদ। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বিদায় হজ্জের দিন সাহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহু 'আনহুম থেকে দ্বীন পূর্ণাঙ্গ হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য গ্রহণ করেছিলেন এবং সেদিন তিনি স্বয়ং আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লাহকে এ ব্যাপারে সাক্ষী করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে, তোমরা সতর্ক থাকো। আজকের এ দিনের মত, এ শহরের মতো এবং এ মাসের মতো আল্লাহ তা'আলা তোমাদের রক্তকে ও তোমাদের সম্পদকে তোমাদের উপর হারাম করেছেন। বল তো, আমি কি আল্লাহর পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি। সমবেত সকলে বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, **আল্লাহুম্মা আশহাদ হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন**। এ কথা তিনবার বললেন (তারপর বললেন) তোমাদের জন্য পরিতাপ অথবা তিনি বললেন, তোমাদের জন্য আফসোস, সতর্ক থেকো, আমার পরে তোমরা কুফরের দিকে ফিরে যেয়ো না যে, একে অন্যের গর্দান মারবে।" (সহীহুল বুখারী (তাওহীদ, hadithbd.com), হা/৪৪০৩)

শরী'আতের কোন বিধান কিভাবে পালিত হবে তা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সুনির্ধারিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা আল্লাহর দীনের ব্যাপারে যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আমাদের জানিয়েছেন, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। দীনের বিধানগুলো বিশেষত যেগুলো মুতাওয়াতির পর্যায়ে প্রমাণিত, সেগুলোর কোনটিতে অবিশ্বাস, অস্বীকার ও সন্দেহ পোষণ করা কুফরি। যেমন- সালাত, যাকাত, সিয়াম ইত্যাদির ফরয হওয়া অস্বীকার করা, সালাতের তাহারাত, রাকা'আত, রুকু, সিজদা, বৈঠক ইত্যাদির পদ্ধতি অস্বীকার ও ব্যতিক্রম করা, সকল প্রকার যিনা, ব্যভিচার, চুরি, ডাকাতি, হত্যা, সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি ইত্যাদি হারাম হওয়ার ব্যাপারে অস্বীকার করা, কোন হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল মনে করা ইত্যাদি। তবে কেউ যদি অজ্ঞতাবশত এগুলোকে অবিশ্বাস, অস্বীকার বা সন্দেহ করে থাকে, তবে তা ওযর হিসেবে গৃহিত হবে। আর মতভেদপূর্ণ বিষয়ে কেউ দ্বিমত পোষণ করলে তা কুফর হিসেবে গৃহিত হবে না ।

(৫) সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির কুফর (আল কুফরু বির রিজা অল বারাআতি) : কোন প্রকার কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা কুফরি। তেমনি দীনুল ইসলামের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকাও কুফরি। এর চারটি ধরণ রয়েছে। আমরা এর প্রথমটি এখন আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ ।

এর প্রথম ধরণটি হলো মহান আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানকে অপছন্দ করা (আল কুফরু বিমা আনজালাল্লাহু তা'আলা)। ঈমান হলো মহান আল্লাহর সকল বিধানের প্রতি সন্তুষ্টি। আর কুফর হলো মহান আল্লাহর কোন একটি বিধানের প্রতি অসন্তুষ্টি। আল্লাহ সুবহানাহু ও তা'আলার নাযিলকৃত শরী'আতের যতগুলো বিধান আছে, এ বিধানগুলোর কোনটিতে অসন্তুষ্টি পোষণকারী কাফির সাব্যস্ত হবেন। আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা আমাদের জন্য কুরআন নাযিল করেছেন। এতে রয়েছে পর্দা, সালাত, যাকাত, সিয়াম, যিকর ইত্যাদির বিধানাবলী। আরো রয়েছে হুদূদ, যেমন- যিনাকারী, চোর-ডাকাত, মদ পানকারী, সালাত পরিত্যাগকারী প্রমুখ ব্যক্তিদের অপরাধের শাস্তির বিধানাবলী। কিসাস যেমন- হত্যার পরিবর্তে হত্যার বিধানও এতে রয়েছে। এসব কিছুকে সেকেল, মানবতা বিবর্জিত, অসভ্য বা অপ্রয়োজনীয় আইন মনে করা এবং এগুলোতে অসন্তুষ্টি পোষণ করা কুফরি অনুরূপভাবে আল্লাহর আইনের বিপরীতে মানুষের মনগড়া মতবাদ যেমন- জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ইত্যাদির প্রতি সন্তুষ্টি পোষণ করাও কুফরি। আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা বলেন, ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ - أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا - "আর যারা কুফরি করে তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস এবং তিনি তাদের আমলসমূহ বা করে দিয়েছেন। তা এজন্য যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তারা তা অপছন্দ করে। অতএব তিনি তাদের আমলসমূহ ব্যর্থ করে দিয়েছেন ।" (সূরাহ মুহাম্মাদ : ৮-৯ আয়াত)

দুঃখজনক হলো আমাদের সমাজে কিছু মানুষ এমন রয়েছে যারা ঈমান-একীনের কথা বলে, আবার মানুষকে মানুষের বানানো কুফরি মতবাদগুলোর প্রতি আহ্বান করে। এটা হলো কুফরির সাথে ঈমানের মিশ্রণ। আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা আমাদের সবাইকে এর থেকে হিফাযাত করুন।
আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা আমাদের সবাইকে কুফরমুক্ত তাওহীদবাদী ঈমানদার হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন। ঈমানের সাথে জীবনযাপন করার তাওফীক্ব দান করুন। কুফরমুক্ত হয়ে ঈমানের উপর সালেছে কদম থাকার তাওফীক্ব দান করুন। আমীন! ইয়া রব্বাল আলামীন!

দ্বীন-ইসলামে ঈমানের স্বরূপ

ঈমানের পরিচয়

ইসলামী জীবন আদর্শের মূল ভিত্তি হচ্ছে বিশুদ্ধ ঈমান। গাছ যেমন তার মূলের বা শিকড়ের উপর সুদৃঢ় মজবুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, কোন অট্টালিকা যেমন তার ভিতের উপর বা ফাউন্ডেশনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। তেমনি একজন প্রকৃত মুসলিম প্রতিষ্ঠিত থাকে তার শক্ত, মজবুত ঈমানী ভিতের উপর। যার ঈমান হবে যত মজবুত, মুসলিম হিসেবে তিনি হবেন ততোটা খাঁটি ও উন্নত।

মহান আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-কে যে দ্বীনসহ দুনিয়ায় পাঠালেন সেই দ্বীনকে বিশ্বাস করা ঈমান আর সেই মত কাজ করা ইসলাম। ঈমান ও ইসলাম একত্রে হলে মুহাম্মাদী দ্বীন পূর্ণ হবে। ঈমান হলো দ্বীনের জান আর ইসলাম হলো দ্বীনের দেহ। দেহ ছাড়া জান যেমন মূল্যহীন, ঈমান ছাড়া ইসলাম তেমনি মূল্যহীন। দেহ না হইলে জান স্থির হয় না, ইসলাম না- হলে ঈমান স্থান পায় না। ঈমান ও ইসলাম দুটোকে মিলালে তবেই তুমি সত্যিকারের মুমিন-মুসলিম হবে।

এই ঈমান অমূল্য রত্ন। প্রাণের সংগে ইহাকে ভালবাস, প্রাণের উপর কষ্ট আসিতে দাও, তবুও ঈমানের গায়ে একটু চোট লাগিতে দিও না। মনে রাখিও ঈমান রত্ন নষ্ট হইলে সব নষ্ট- ইহকাল-পরকাল নষ্ট, মান-সম্মান নষ্ট, ধন-ঐশ্বর্য নষ্ট, স্বাস্থ্য-সম্পদ নষ্ট।

অনেকে ধারণা করেন যে, মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করিলেই বুঝি মুসলমান হওয়া যায়, নিজের কিছু করার দরকার হয় না। কিছু না করিয়াই শুধু মুসলমান নাম ধারণ করিলেই বিনা ক্লেশে জান্নাতে যাওয়া যায়। এই ধরনের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কেননা ঈমান ও ইসলাম কাহারও পৈতৃক সম্পত্তি নয়। ঈমান ও ইসলাম এমন কতকগুলি বিশ্বাস ও কার্যের সমষ্টির নাম, যাহা যে কেহ সম্পন্ন করিবে, সেই মানবতার চরম উন্নতির আসনে আসীন হইতে পারিবে। চির সুখে সুখী হতে পারিবে, ইহকালে ও পরকালে ধন্য হইতে পারিবে, স্রষ্টা এবং সৃষ্টি সকলেরই নিকট আদরণীয় হইতে পারিবে।

এ ঈমান, যা ইসলাম নামক অট্টালিকার ভিত বা ফাউন্ডেশন, প্রতিটি সত্যিকারের মুমিন-মুসলিমের সে সম্পর্কে স্বচ্ছ, সুস্পষ্ট, সঠিক, নির্ভুল, নির্ভেজাল বিশুদ্ধ জ্ঞান থাকা দরকার। এমন জ্ঞান থাকতে হবে যাতে করে তার

অন্তরে পূর্ণ প্রত্যয় জন্মে। আর এ প্রত্যয়ই যেনো হয় তার জীবনের পরিচালিকা শক্তি। এ ঈমানী প্রত্যয় যেনো প্রতিফলিত হয় তার চিন্তা, বিশ্বাস, কথা ও কর্মে। এর জন্যেই যেনো তিনি বেঁচে থাকবেন ও এরি জন্যে যেনো তিনি মৃত্যুবরণ করবেন। ঈমানিয়াতের প্রতিটি দিক ও সেগুলোর শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে অনাবিল বুঝ ও স্বচ্ছ ধারণা না থাকলে মুসলিমদের জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়ার সমূহ আশংকা থেকে যায়। ঈমানের সাথে শিরক এবং ইসলামের সাথে কুফরের সংমিশ্রনের ছিদ্র পথ উম্মুক্ত থেকে যায়। (ঈমানের পরিচয়)

ঈমানের অর্থ ও পরিচয়

আরবী **'আমন'** শব্দ থেকে ঈমান শব্দটির উৎপত্তি। **'আমন'** অর্থ শান্তি, নিরাপত্তা, আস্থা, বিশ্বস্ততা, হৃদয়ের স্থিতি ইত্যাদি। ঈমান শব্দের আভিধানিক অর্থ- নিরাপত্তা প্রদান, আস্থা স্থাপন, বিশ্বাস ইত্যাদি। এ ঈমান শব্দটির অর্থ সম্পর্কে ৪র্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ আবুল হুসাইন আহমাদ ইবনু ফারিস (৩৯৫ হিজরী) বলেন ঃ 'হামজা' মীম ও নুন এই ধাতুটির মূল অর্থ দু'টিঃ প্রথম অর্থ- বিশ্বস্ততা যা খিয়ানতের বিপরীত এবং দ্বিতীয় অর্থ বিশ্বাস করা বা কোন ব্যক্তি বা বিষয়ের সত্যতা স্বীকার করা। আমরা দেখছি যে, অর্থ দু'টি খুবই নিকটবর্তী ও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। (ইবনু ফারিস কৃত- মু'জামু মাকায়িসিল লুগাহ- ১/১৩৩)

তিনি উভয় অর্থে ঈমান শব্দের আলোচনা করে উল্লেখ করেন যে, প্রথম অর্থে ঈমান অর্থ নিরাপত্তা প্রদান করা বা আমানতদার বলে মনে করা। আর দ্বিতীয় অর্থে ঈমান অর্থ বিশ্বাস করা, বিশ্বস্ততায় আস্থা স্থাপন করা। (প্রাগুক্ত- ১/১৩২-১৩৩)

মূল ঈমান শব্দটির অর্থ সম্পর্কে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী; **"ইসলামী তাহযীব আওর উসকে উসুল ও মাবাদী"** পুস্তকে নিম্নভাবে লিখেছেন ঃ

'ঈমান' শব্দটি **'আমন'** ধাতু থেকে নির্গত। **'আমন'** এর সার কথা হচ্ছে, আত্মার প্রশান্তিও নির্ভীকতা লাভ। এ ধাতু থেকেই আমানত শব্দটি এসেছে। এ হচ্ছে খিয়ানতের বিপরীত শব্দ। অর্থাৎ যাতে খিয়ানতের ভয় নেই, তাই হচ্ছে **'আমানত'**। এখান থেকেই এসেছে আমীন শব্দটি। কাউকেও **'আমীন'** এজন্যে বলা হয় যে, তার সদাচরণ সম্পর্কে মনে কোনো প্রকার আশংকা থাকে না এবং সে খিয়ানত করবে না, বলে মনে পূর্ণ ভরসা থাকে।

(যেমন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা কে **'আল-আমীন'** বলা হতো এ কারনেই) এই আমন ধাতুরই ক্রিয়ারূপ হচ্ছে ঈমান। এর তাৎপর্য হচ্ছে, মনের ভিতর কোনো কথা প্রত্যয় ও সততার সাথে এমনিভাবে দৃঢ়মূল করে নেয়া যেনো, তার প্রতিকূল কোন জিনিসের পথ খুঁজে পাওয়া ও প্রবেশ করার কোন প্রকার আশংকাই না থাকে। **'মুমিন'** কে এজন্যে মুমিন বলা হয়, যে বিষয়ে সে জ্ঞান ও প্রত্যয়ের অধিকারী হয়েছে এর বিপরীতে কোন কিছুই তার মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ার এতোটুকু আশংকাও নেই এবং সে যার প্রতি এ প্রত্যয় স্থাপন করেছে তার থেকে কোন প্রকার অসদাচরণ ও খিয়ানতের বিন্দুমাত্র আশংকা তো নেই-ই উপরন্তু আস্থা ও প্রত্যয় লাভের ফলে সে পূর্ণাঙ্গ প্রশান্তি ও ভরসা লাভ করে।

অর্থাৎ মহান আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব, তাঁর মহান গুণাবলী তাঁর ইচ্ছা ও অনিচ্ছা, আদেশ-নিষেধ, তাঁর ইচ্ছানুযায়ী চলার সুফল এবং অনিচ্ছানুযায়ী চলার কুফল ইত্যাদি মৌলিক বিষয় সমূহের এমন সুস্পষ্ট জ্ঞান ও বুঝ থাকা, যেনো ব্যক্তির হৃদয় মন মহান আল্লাহর প্রতি নিরংকুশ প্রত্যয়ী হয়ে যায় এবং এর বিপরীতে ও প্রতিকূল কোন কিছুই তার মধ্যে প্রবিষ্ট না হয়। আর এ প্রত্যয়ের ফলে সে যেন মহান আল্লাহ তা'আলার প্রতি পরিপূর্ণ ভরসা করে, তার মন যেন মহান আল্লাহর প্রতি পূর্ণাঙ্গ আস্থাশীল হয়ে যায় এবং সে যেন পূর্ণাঙ্গ প্রশান্তি লাভ করে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ - ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً - فَادْخُلِي فِي عِبَادِي - وَادْخُلِي جَنَّتِي -

"ইয়া আইইয়া তুহান নাফছুল মুতমায়িন্না তুরজিঈ ইলা রব্বিকী রজিইয়াতাম মার জিঈইয়াতান ফাদখুলি ফী ইবাদী অদখুলী জান্নাতী অর্থাৎ হে প্রশান্ত আত্মা! এসো তোমার পরওয়ারদেগারের নিকট। তোমার শুভ পরিণতির জন্যে এসো আজ সন্তুষ্ট চিত্তে, তোমার মালিকের প্রিয় পাত্র হয়ে। (এসো) আমার নেক বান্দাহদের সাথে শামিল হয়ে যাও, আর দাখিল হয়ে যাও জান্নাতে।" (ফজর: ২৭-৩০)

বিশ্বাস বা ধর্ম বিশ্বাস

বিশ্বাস অর্থে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসে সর্বদা ঈমান শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে। ক্রিয়ার শেষে **'বিশ্বাস করল'** অর্থে **'আ-মানা'** আমানূ ইত্যাদি ক্রিয়াপদ, **'বিশ্বাস কর'** অর্থে তু'মিনু, নু'মিনু ইত্যাদি ক্রিয়াপদ, **আদেশ**

অর্থে 'আ-মিন, আ-মিনু ইত্যাদি ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়েছে। **বিশ্বাসী** অর্থে মুমিন, মুমিনুন ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর **বিশ্বাস** অর্থে 'ঈমান' শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআন কারীমে এ বিষয়ে বলা হয়েছে, - وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ **'ওয়া ক্বলাল্লাজীনা উতুল ইলমা অল ঈমানা** অর্থাৎ আর যারা ঈমান ও ইলম (বিশ্বাস ও জ্ঞান) প্রদত্ত হয়েছে তারা বলল। (রুম-৫৬)

অন্যত্র এ বিষয়ে মহান আল্লাহ আরো বলেন, وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ - **'ওয়া মাই ইয়াকফুর বিল ঈমানী ফাক্বদ হাবিতা আ'মালুহু ওয়া হু ওয়া ফিল আখিরাতি মিনাল খছিরীন** অর্থাৎ আর কেউ ঈমান প্রত্যাখ্যান করলে তার কর্ম বিনষ্ট বা নিষ্ফল হবে সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' (মায়িদা-৫) সূরাহ আল-ইমরানের ১৯৩ নং আয়াতে এ বিষয়ে মহান আল্লাহ আজজা ওয়া জাল্লা শানুহু আরো বলেন,

رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا - **'রব্বানা ইন্নানা সামি'না মুনাদি ইয়াই ইউনাদিই লিল ঈমানী আন আমিনু বি রব্বিকুম ফা আমান্না** অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা একজন আহবান কারীকে ঈমানের দিকে আহবান করতে শুনেছি, তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনয়ন কর, সুতরাং (তার আহবানের কারনে) আমরা ঈমান আনয়ন করেছি।'

সূরাহ আনফালের ২ নং আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানা ওয়াতাআলা বলেন, - وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ **'ওয়া ইজা তুলিইয়াত আলাইহিম আইয়াতুহু জাদাতহুম ঈমানাও** অর্থাৎ যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট তেলাওয়াত করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে।'

আব্দু কাইস গোত্রের প্রতিনিধিদের বিষয়ে রইসুল মুফাসসিরিণ আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবীজী তাদেরকে, 'একমাত্র মহান আল্লাহর প্রতি ঈমানের নির্দেশ প্রদান করেন এবং বলেন, তোমরা কি জান যে, একমাত্র মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান কি ? তাঁরা বলেন, মহান আল্লাহ ও তার রাসূলই (এ বিষয়ে) অধিকতর অবগত আছেন। তখন প্রিয় নবীজী বলেন, (একমাত্র মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান এই যে) **ক্বলা শাহাদাতু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহি** অর্থাৎ তুমি সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, মহান আল্লাহ ছাড়া কোন হক্ব মাবুদ (ইবাদাত যোগ্য বা উপাস্য)

কেউ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা তাঁর রাসূল।' (বুখারী, মুসলিম)

হাদীসে সর্বদা **'বিশ্বাস'** বা ধর্ম বিশ্বাসকে ঈমান নামেই অভিহিত করা হয়েছে। যেমন এক হাদীসে আবু হুরাইরা রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ "একদিন প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা লোকজনের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন। এমতাবস্থায় ধবধবে সাদা পোষাক পরিহিত অবস্থায় (জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা) তাঁর নিকট আগমন করে বলেন, (ইয়া রাসূলুল্লাহ!) **ঈমান কি?** নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা তখন উত্তরে বলেন, (ঈমান এই যে) তুমি বিশ্বাস করবে মহান আল্লাহয়, তাঁর ফিরিশতাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে, তাঁর সাক্ষাতে, তাঁর রাসূলগণে এবং তুমি বিশ্বাস করবে শেষ পুনরুত্থানে এবং তুমি বিশ্বাস করবে তাক্বদীর বা নির্ধারণের সবকিছুতে। তিনি পুনরায় প্রশ্ন করেন, **ইসলাম কি ?** নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা উত্তরে বলেন, ইসলাম এই যে, তুমি মহান আল্লাহর ইবাদাত করবে, কোন কিছুকে তাঁর সাথে শরীক বানাবে না, সলাত কায়েম করবে, ফারজ জাকাত প্রদান করবে এবং রামাজানের সিয়াম পালন করবে।' (বুখারী, মুসলিম)

উপরে উল্লেখিত বুখারী ও মুসলিমের হাদীসটিতে প্রিয় নবীজী ঈমান ও ইসলামের উভয়ের পরিচিতি প্রদান করেছেন। ইসলাম শব্দটি আরবী **'সালাম'** শব্দ থেকে গৃহীত। এর অর্থ শান্তি, নিরাপত্তা, সমর্পন ইত্যাদি। ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পন করা, অনুগত হওয়া ইত্যাদি। আভিধানিকভাবে ঈমান বিশ্বাসের দিক এবং ইসলাম কর্মের দিক। তবে ব্যবহারিক ভাবে ঈমান ও ইসলাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এ বিষয়ে আবু হানীফা নুমান বিন সাবিত রহিমাহুল্লাহ বলেন, ঈমান হচ্ছে (মুখের) স্বীকৃতি ও (অন্তরের) সত্যায়ন। বিশ্বাসকৃত বিষয়াদির দিক থেকে (যে যে বিষয়ে বিশ্বাস করা হয়েছে তাতে) আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীদের ঈমান বাড়ে না এবং কমে না, কিন্তু ইয়াকীন বা বিশ্বাসের দৃঢ়তা-গভীরতা ও সত্যায়নের দিক থেকে ঈমান বাড়ে এবং কমে। এভাবে ঈমান ও তাওহীদের ক্ষেত্রে মুমিনগণ সকলেই সমান। কর্মের ক্ষেত্রে তাদের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। ইসলাম অর্থ মহান আল্লাহর নির্দেশের জন্য আত্মসমর্পন করা এবং অনুগত হওয়া। আভিধানিকভাবে ঈমান ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তবে বাস্তবে ও ব্যবহারে ইসলাম ছাড়া কোন ঈমান হয় না এবং ঈমান ছাড়া ইসলামের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। কাজেই ঈমান ও ইসলাম হলো পিঠের

সাথে পেটের ন্যায়। ঈমান, ইসলাম ও সমস্ত শারীআতকে একত্রে দ্বীন বলা হয়। (মোল্লা আলী ক্বারী, শারহুল ফিকহীল আকবার, ১৪১-১৫০)

ঈমান ও আমালের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ নিয়ে ইসলামী শারীআতে বিভিন্ন বিভক্তি ও ফিরকাসমূহের সূত্রপাত ঘটে। **খারিজীগণ ও** তাদের সমমনা ফিরকাগুলি আমাল বা ইসলামের বিধানমত কর্ম করাকে ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে গণ্য করেছে। ফলে শারীআতের বিধান পালনের বিচ্যুতি তাদের মতে ঈমানের বিচ্যুতি বা কুফর বলে গণ্য। অপরদিকে **মুর্জিয়াগণ** ঈমানকে মহান আল্লাহর নির্দেশ পালন বা ইসলামের বিধি-বিধান পালন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করেছে। তাদের মতে কোনরূপ ইসলাম পালন ছাড়াই চূড়ান্ত পূর্ণতায় পৌছানো সম্ভব। তারা পাপী মুসলিমকে পরিপূর্ণ ঈমানদার ও নিশ্চিত জান্নাতী বলে গণ্য করেছে। উভয় মতের মধ্যে **আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের** অনুসারী গণ বিশ্বাস করেন যে, পাপী মুমিন কাফির নন, আবার ঈমানের পূর্ণতাও তিনি লাভ করেননি। তবে এ বিষয়ের ব্যাখ্যায় আহলুস সুন্নাতের ইমামগণের পারিভাষিক সংজ্ঞার মধ্যে সামান্য কিছু মত পার্থক্য রয়েছে। এ ক্ষেত্রে দু'টি মত রয়েছে।

(এক) ইমাম আবু হানীফা নুমান বিন সাবিত রহিমাহুল্লাহ ও অন্যান্য কোন কোন ইমামের মতে আমাল বা বিধান পালন ঈমানের অংশ নয়। বরং ঈমানের দাবী ও সম্পূরক। তাদের মতে ঈমান হলো অন্তরের বিশ্বাস ও মুখে সে বিশ্বাসের স্বীকৃতির নাম। তাদের মতে বিষয় বস্তুর দিক থেকে স্বীকৃতি বেশী কম হয় না বা ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না, তবে বিশ্বাসের গভীরতার দিক দিয়ে হ্রাস-বৃদ্ধি হয়।

(দুই) অন্যদিকে ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ, ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহ ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ ও অন্যান্য অসংখ্য অগণিত মুহাদ্দিসগণ বলেন যে, আমাল বা কর্ম ঈমানের অংশ, তবে মনের বিশ্বাস বা মুখের স্বীকৃতির মত অংশ নয়, বরং দ্বিতীয় পর্যায়ের অংশ। এজন্য তাদের মতে কর্মের অনুপস্থিতি দ্বারা ঈমানের অনুপস্থিতি প্রমাণিত হয় না, তবে দুর্বলতা ও কমতি প্রমাণিত হয়। তারা বলেন, ঈমান হলো অন্তরের বিশ্বাস, মুখের স্বীকৃতি ও দেহের কর্ম। এদের মতে কর্মের কারনে ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়।

এ দু'মতের মধ্যে শব্দ প্রয়োগে যতই পার্থক্য থাক না কেন, মূল বিশ্বাসে কোন পার্থক্য নেই। কারণ উভয় মতের অনুসারীগণ একমত যে,

(এক) ঈমান ও আমাল দুটিই মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশ এবং বান্দাকে দুটিই অর্জন করতে হবে। ঈমানবিহীন ইসলাম বা ইসলামবিহীন ঈমান অকল্পনীয়।

(দুই) কর্মের ত্রুটির কারণে বা কবীরা গুনাহের কারনে বান্দা কাফির হয় না, তবে মহান আল্লাহর শাস্তির যোগ্য হবে। (কুরআন সুন্নাহের আলোকে ইসলামী আকীদা)

ঈমান মানুষের মূলধন। দুনিয়াবী শান্তি ও পরকালীন মুক্তি লাভের একমাত্র উপায়ও এই ঈমান। মহান আল্লাহ বলেন,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً - وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ -

"মান আ'মিলা সলিহান মিন জাকারিন আউ উনছা'ওয়া হু ওয়া মুউমিনুন ফালা নুহ্‌য়ি ইয়ান্নাহু হাইয়াতান তাইয়িবাতান অলা নাজজি ইয়ান্নাহুম আজরাহুম বি আহ্‌ছানি মাকানু ইয়া'মানলুন অর্থাৎ 'যে মুমিন অবস্থায় সৎ আমল করবে, পুরুষ হোক বা নারী, আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং তারা যা করত, তার তুলনায় অবশ্যই আমি তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেব' (নাহল-৯৭)। পবিত্র কুরআন এবং হাদীসে নববীর স্পষ্ট ও অকাট্য বক্তব্য প্রমাণ করে, ঈমানের কয়েকটি মূলনীতি রয়েছে, যেগুলোর উপর ঈমান দন্ডায়মান। এসব মূলনীতি একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যেগুলোর একটির প্রতি ঈমান আনলে বাকীগুলোর প্রতি ঈমান আনা জরুরী হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে একটির সাথে কুফরী করলে বাকীগুলোর সাথে কুফরী হয়ে যায়। সেজন্য প্রত্যেক মুমিনের ঈমান সম্পর্কে সম্যক, স্বচ্ছ, স্পষ্ট ও পরিপূর্ণ ধারণা থাকা জরুরী।

ঈমানের মূলনীতি বা 'উছূলুল ঈমান'-এর পরিচয়

'উছূলুল ঈমান' যৌগিক শব্দ, যা **'উছূল'** ও **'আল-ঈমান'** শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে গঠিত। **'উছূল'** শব্দটি বহুবচন, একবচনে **'আছল'** ব্যবহৃত হয়। কোন কিছুর মূল অংশ ও ভিত্তিকে **'আছল'** বলা হয়। অন্যভাবে- যার প্রয়োজন অনুভব করা হয়, কিন্তু সে অন্যের প্রয়োজন অনুভব করে না, আভিধানিক অর্থে তার নাম **'আছল'**। পরিভাষায়, যার উপর অন্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়, কিন্তু সে কারো উপর স্থাপিত হয় না, তাকে **'আছল'** বলে। (জুরজানী, কিতাবুত তা'রীফাত (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৩ হি:/১৯৮৩

খ্রি:), পৃ: ২৮) বুঝা গেল, যে কোন কিছুর মৌলিক বিষয়কে **'আছল'** বলে। সেজন্য **'উছূলুল ঈমান'** কথাটির আরেকটি যৌগিক রূপ হচ্ছে, **'উসুসুল ঈমান'** যার একবচন **'আসাস'**। কোন কিছুর মূল অংশকে **'আসাস'** ও বলা হয়। তাহলে **'উছূলুল ঈমান'** অর্থ দাঁড়ালো- **'ঈমানের মূলনীতিসমূহ'**, **'ঈমানের মৌলিক বিষয়াবলী'** ইত্যাদি। কিন্তু **'উছূলুল ঈমান'** বা ঈমানের মূলনীতি বলে যে কিছু আছে, অধিকাংশ মানুষই তা জানে না; এমনকি অনেক আলেম-ওলামাও জানেন না, যা দুঃখজনক।

যাহোক, এর প্রসিদ্ধ প্রতিশব্দ হচ্ছে, **'আরকানুল ঈমান'** বা **'ঈমানের স্তম্ভ/খুঁটিসমূহ'**। সাধারণত এ পরিভাষাটির সাথেই মানুষ বেশী পরিচিত।

'আল-ঈমান' শব্দটি বাবে ইফআল এর মাছদার। আভিধানিক অর্থ **আত্ তাসদিক্ব অর্থাৎ- 'আন্তরিক বিশ্বাস', আল ইক্বরারু অত তামানিনাতু অর্থাৎ- 'স্বীকৃতি ও প্রশান্তি'**। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ (৬৬১-৭২৮ হি:/১২৬৩-১৩২৮ খ্রি:) শেষোক্ত অর্থটাই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা হৃদয়ে যখন আন্তরিক বিশ্বাস ও বশ্যতা স্থান পায়, তখনই কেবল স্বীকৃতি ও প্রশান্তি অর্জিত হয়। (দ্রষ্টব্য: আছ-ছারেমুল মাসলূল, প্রকাশক: সঊদী বোর্ডার গার্ড, তা.বি., পৃ: ৫১৯) শরীয়তের পরিভাষায়, **"তাসদিক্ব বিল জিনান, ওয়া ক্বাউলুন বিল লিসান ওয়া আমালুন বিল জাওয়ারিহী অল আরকানি ইয়াজিদু বিত্ তাআ'তি ওয়া ইয়ানক্বুসু বিল মা'ছি ইয়াতি** অর্থাৎ- 'অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি, আমলে বাস্তবায়নের নাম ঈমান, যা পুণ্য দ্বারা বৃদ্ধি পায় এবং পাপ দ্বারা হ্রাস পায়। (ইবনু তাইমিয়াহ, আল-আক্বীদাতুল ওয়াসেত্বিয়াহ, তাহক্বীক: আশরাফ ইবনে আব্দুল মাক্বছূদ (রিয়ায আযওয়াউস সালাফ, ২য় প্রকাশ, ১৪২০ হি:/১৯৯৯ খ্রি:), পৃ: ১১৩)

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের নিকট কথা ও কাজের নাম ঈমান। এর ভূরি ভূরি দলিল মিলে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন, 'ঈমানের ৭০ বা ৬০ টিরও উপরে শাখা রয়েছে। এর সর্বোত্তম হলো, **'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ'** এবং সর্বনিম্নটি হলো, **রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা। আর লজ্জাও ঈমানের একটি শাখা**। (মুসলিম হা/৫৮) হাদীসটিতে 'রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা'-কে ঈমানের একটি শাখা হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এটি কাজ নয় কী ? ইবনু আবিল ইয হানাফী রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'ঈমান হচ্ছে মূল, যার বহু শাখা-প্রশাখা রয়েছে। এর প্রত্যেকটি শাখাকে 'ঈমান' বলা হয়। ফলে সালাত, যাকাত, সিয়াম ও হজ্জ

ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে গোপন আমলও। যেমন লজ্জা, ভরসা, আল্লাহর ভয় ও তাঁর নিকট তওবা। এভাবে 'রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা' পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে এসব শাখা-প্রশাখা। কেননা সেটাও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। (ইবনু আবিল ইয, শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবিইয়াহ, তাহক্বীক্ব: আহমাদ শাকের, (সঊদী আরব: ধর্ম, ওয়াকফ, দাওয়াত ও দিক-নির্দেশনা বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১ম প্রকাশ: ১৪১৮ হি:), পৃ: ৩২৩) সেজন্য ঈমানের পারিভাষিক অর্থে মৌলিকভাবে পাঁচটি বিষয় থাকা জরুরী। যথা- **১. অন্তরের কথা, ২. মুখের স্বীকৃতি, ৩.অন্তরের আমল, ৪. মুখের আমল ও ৫. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল।** (ইবনু তাইমিয়াহ, আল-আক্বীদাতুল ওয়াসেত্বিইয়াহ, পৃ: ১১৩) এগুলোর সমষ্টির নাম যে ঈমান, তার বহু দলীল-প্রমাণ মিলে। যেমন-

১. অন্তরের কথা: অন্তরের কথা বলতে অন্তর বা হৃদয় দ্বারা সত্যায়ন ও দৃঢ় বিশ্বাসকে বুঝায়। মহান আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ - لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ - 'আর যে সত্য নিয়ে এসেছে এবং সত্যকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে, তারাই তো মুত্তাকী। তাদের বাঞ্ছিত সবকিছুই তাদের রবের নিকট রয়েছে। এটাই সৎকর্মশীলদের পুরস্কার।' (যুমার: ৩৩-৩৪) তিনি অন্যত্র ইরশাদ করেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا - 'কেবলই তারাই মুমিন, যারা মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, অতঃপর সন্দেহ পোষণ করেনি' (হুজুরাত: ১৫) মহান আল্লাহ সন্দেহ-সংশয় পোষণকারীদের সম্বন্ধে বলেন, يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ - 'তাদের অন্তরে যা নেই, তাই তারা তাদের মুখে বলে থাকে' (ইমরান: ১৬৭)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি **'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু'** পড়েছে এবং তার অন্তরে একটি যবের ওযন পরিমাণ কল্যাণ (ঈমান) আছে, সে জাহান্নামের আগুন থেকে বের হয়ে আসবে' (বুখারী হা/৭৪১০)

২. মুখের স্বীকৃতি: 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু' এবং **'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'** এই শাহাদাতাইন মুখে বলা এবং এতদুভয়ের অপরিহার্য বিষয়সমূহকে স্বীকৃতি প্রদানই হচ্ছে মুখের স্বীকৃতি। মহান আল্লাহ বলেন,

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ- 'তোমরা বল, আমরা মহান আল্লাহর

প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আর যা ইবরাহিম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তদীয় বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যা মুসা ও ঈসাকে প্রদান করা হয়েছিল এবং অন্যান্য নবীগণকে তাদের রব হতে যা প্রদত্ত হয়েছিল, সেসবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা তাদের কারো মধ্যে তারতম্য করি না। আর আমরা তাঁরই অনুগত' (বাকারা: ১৩৬)। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ - 'আর যখন তাদের নিকট তা তেলাওয়াত করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি, নিশ্চয়ই তা আমাদের রবের পক্ষ থেকে আগত সত্য। আমরাতো পূর্বেও আত্মসমর্পণকারী ছিলাম' (ক্বাছাছ: ৫৩)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেন, **"উমিরতু আন উক্বাতিলান্নাসা হাত্তা ইয়াশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ** অর্থাৎ 'আমাকে লোকেদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার আদেশ করা হয়েছে, যতক্ষণ না তারা একথার সাক্ষ্য প্রদান করে যে, মহান আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল'। (বুখারী হা/২৫, মুসলিম হা/৩৬)

৩. অন্তরের আমল: বিশ্বাস, নিয়ত, ইখলাছ, ভালবাসা, আত্মসমর্পণ, মহান আল্লাহর উপর ভরসা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি অন্তরের আমলের অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ -

'মুমিন তো কেবল তারাই, যাদের সামনে যখন মহান আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন তাদের অন্তরসমূহ ভীত হয়ে পড়ে। আর যখন তাদের সামনে তার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয়, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে দেয় এবং তারা তাদের রবের উপর ভরসা করে' (আনফাল: ২)।

আনাস ইবনু মালেক রহিমাহুল্লাহ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমাকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা ! ক্বিয়ামত কখন সংঘটিত হবে ? তিনি বললেন, তুমি এর জন্য কী প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ ? লোকটি বলল, এর জন্য আমি বেশী সালাত, ছিয়াম ও দান-সাদকা প্রস্তুত করতে পারিনি; তবে আমি মহান আল্লাহ এবং রাসূলকে ভালবাসি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বললেন, **"আন্তা মা'আ মান আহ্বাবতা** অর্থাৎ 'যাকে তুমি ভালবাস, তুমি তার সাথেই থাকবে'। (বুখারী হা/৭১৫৩)

৪. মুখের আমলঃ যেসব আমল মুখ দ্বারা সম্পন্ন হয় বা যেসব আমল মুখ ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা সম্পন্ন করা যায় না, সেগুলো মুখের আমলের অন্তর্ভুক্ত। যেমনঃ কুরআন তেলাওয়াত, দু'আ-ইসতিগফার, যিকর-আযকার, তাসবীহ-তাহলীল, তাকবীর-তাহমীদ ইত্যাদি। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ -

'যারা মহান আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করে, সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদের যে রিজিক দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসার আশা করতে পারে, যাতে কখনোই লোকসান হবে না' (ফাতিরঃ ২৯)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا - وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا -

'হে মুমিনগণ! তোমরা অধিক পরিমাণ আল্লাহর জিকির করো। আর সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা (তাসবীহ) ঘোষণা কর' (আহযাবঃ ৪১-৪২)। অন্য আয়াতে এসেছে, - وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ - إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيم 'আর তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' (মুযযাম্মিলঃ ২০)।

আবু হুরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি প্রত্যেক সালাতের পরে ৩৩ বার **'সুবহানাল্লাহ'**, ৩৩ বার **'আল-হামদুলিল্লাহ'**, ৩৩ বার **'আল্লাহু আকবার'** এবং ১০০ বার পূর্ণ করতে **'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহূ লা শারীকা লাহূ লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর'** পড়ে, তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হয়- যদিও সেগুলো সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়'। (মুসলিম হা/১৪৬)

৫. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলঃ যেসব আমল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সম্পন্ন হয় বা যেসব আমল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা সম্পন্ন করা যায় না, সেগুলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলের অন্তর্ভুক্ত। যেমনঃ রুকু করা, সেজদা করা, হজ্জ-ওমরাহ করা, জিহাদ করা, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে কোন কাজে কোথাও যাওয়া ইত্যাদি। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ -

'হে মুমিনগণ! তোমরা রুকু কর, সিজদা কর, তোমাদের রবের ইবাদাত কর এবং ভাল কাজ কর; আশা করা যায়, তোমরা সফলকাম হতে পারবে। আর তোমরা মহান আল্লাহর পথে জিহাদ কর, যেভাবে জিহাদ করা উচিৎ' (হাজ্জ: ৭৭-৭৮)। অন্য আয়াতে এসেছে,

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا - وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا -

'আর-রহমানের বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং অজ্ঞ লোকেরা যখন তাদেরকে সম্বোধন করে, তখন তারা বলে 'সালাম'। আর যারা তাদের রবের জন্য সেজদারত ও দন্ডায়মান হয়ে রাত্রি যাপন করে' (ফুরকান: ৬৩-৬৪)। (দ্রষ্টব্য: হাফেয আল-হাকামী, মা'আরেজুল ক্ববূল বিশারহি সুল্লামিল বু'ছূল ইলা ইলমিল উছূল (দাম্মাম, সঊদী আরব: দারু ইবনিল ক্বাইয়িম, ১ম প্রকাশ ১৪১০ হি:/১৯৯০ খ্রি:), ২য় খন্ড, পৃ: ৫৮৮-৫৯৩) (ছিরাতে মুস্তাক্বীম চলমান গবেষণা পর্ব-৪)

পবিত্র কুরআনে ঈমানের আলোচনা

পবিত্র কুরআনে ঈমানীয়াত সম্পর্কে নিম্নে কয়েকটি আয়াত পেশ করা হইল ঃ

১। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ - الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ - وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ -

অর্থাৎ পবিত্র কুরআন হেদায়েত দান করে সে সমস্ত লোকদের, যারা মুত্তাকী, যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সলাত প্রতিষ্ঠিত করে, আর আমি তাদেরকে যে রুযী দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের উপর যা কিছু তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের উপর যা তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, আর আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে। (বাকারা: ২-৪)

২। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ - অর্থাৎ সৎকর্ম শুধু তাই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করবে, বরং বড় সৎকাজ হল এই যে, ঈমান আনবে মহান আল্লাহর উপর, ক্বিয়ামত দিবসের উপর, ফেরেশতাদের উপর, কিতাবসমূহের উপর এবং সমস্ত নবী রাসূলগণের উপর, আর সম্পদ ব্যয় করবে তারই মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, এতীম-মিসকীন, মুসাফির- ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী কৃতদাসদের জন্যে। আর যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দান করে এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী এবং অভাবে, রোগে, শোকে ও যুদ্ধের সময় (ধৈর্যধারণকারী), তারাই হলো সত্যাশ্রয়ী, আর তারাই পরহেজগার। (বাকারা-১৭৭)

৩। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا-

অর্থাৎ অতঃপর যে তাগুতকে অস্বীকার করে এবং মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে সে এমন এক মজবুত অচ্ছেদ্য রজ্জু ধারণ করে যা কখনো ছিড়বার নয়। (বাকারা-২৫৬)

৪। মহান আল্লাহ এ বিষয়ে আরো বলেন ঃ

مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ -

অর্থাৎ যারা ঈমান আনে মহান আল্লাহর প্রতি এবং পরকালের প্রতি আর সালেহ আমল করে। তাদের রবের নিকট থেকে তাদের জন্য রয়েছে পুরষ্কার। আর তাদের কোনো ভয় নেই, চিন্তাও নেই। (বাকারা-৬২)

৫। মহান আল্লাহ এ বিষয়ে আরো বলেন ঃ

وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ - অর্থাৎ এরা সকলেই মহান আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাব ও রাসূলগণের প্রতি ঈমান পোষণ করে। (বাকারা-২৮৫)

৬। মহান আল্লাহ এ বিষয়ে আরো বলেন ঃ

- فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ অর্থাৎ অতঃপর ঈমান আনো মহান আল্লাহর প্রতি ও রাসূলগণের প্রতি। যদি তোমরা ঈমান আনো এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করো, তবে তোমাদের জন্য বিরাট পুরষ্কার রয়েছে। (আল ইমরান-১৭৯)

৭। মহান আল্লাহ এ বিষয়ে আরো বলেন ঃ

- إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ অর্থাৎ মুমিন মূলতঃ তারাই মহান আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি যাদের ঈমান রয়েছে। (নূর-৬২)

৮। মহান আল্লাহ এ বিষয়ে আরো বলেন ঃ

- فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا অর্থাৎ ঈমান আনো মহান আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি আর আমাদের অবতীর্ণ নূরের প্রতি। (তাগাবুন-৮)

৯। মহান আল্লাহ এ বিষয়ে আরো বলেন ঃ

- إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ অর্থাৎ যারা ঘোষণা দেয়, মহান আল্লাহ আমাদের রব, অতঃপর এ কথার উপর অটল ও অবিচল থাকে, তাদের নিকট ফেরেশতা নাযিল হয়ে থাকে। (সিজদা-৩০)

১০। মহান আল্লাহ এ বিষয়ে আরো বলেন ঃ

- إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে মুমিন তারাই, যারা মহান আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, অতঃপর আর কোনো সন্দেহে পড়েনি। (হুজুরাত-১৫)

১১। মহান আল্লাহ এ বিষয়ে আরো বলেন ঃ

- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ অর্থাৎ মহান আল্লাহকে ভয় করো এবং তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনো, তাহলে মহান আল্লাহ তোমাদের প্রতি তাঁর রহমত দ্বিগুণ করে দেবেন। (হাদীদ-২৮)

১২। মহান আল্লাহ এ বিষয়ে আরো বলেন ঃ

- وَمَن يَكْفُرْ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا অর্থাৎ বস্তুতঃ যে অবিশ্বাস করিয়াছে মহান আল্লাহতে, তাহার ফেরেশতাগণে, তাহার কিতাব সমূহে, তাহার রাসূল সকলে এবং পরকালে, সে নিশ্চিত রূপে সঠিক পথ হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে বহুদূরে। (নেছা-১৩৬)

১৩। মহান আল্লাহ এ বিষয়ে আরো বলেন ঃ

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا - অর্থাৎ দুনিয়ায় (সাধারণভাবে) অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে কোন বিপদ পৌঁছিয়া থাকুক না কেন তাহা তোমাদের সৃষ্টি করার পূর্বেই একটি কিতাবে (লাওহে মাহ্ফুজে) নির্ধারিত করা আছে। (হাদীদ-২২)

১৪। মহান আল্লাহ এ বিষয়ে আরো বলেন ঃ

وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ- অর্থাৎ এবং এ কারনে যে, (ক্বিয়ামত অবশ্যম্ভাবী) এবং নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ পুনরুত্থিত করিবেন তাহাদের যাহারা কবরে আছে। *(হজ্ব-৭) (আরো বহু আয়াতে কারীমা আছে পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে তাহা পরিত্যাগ করিলাম)*

হাদীসে নববীতে ঈমানের আলোচনা

১। ঈমান প্রসংগে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেন ঃ উম্মতকে শিক্ষা দিবার জন্য একদা জিবরাইল আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা মানুষের রূপ ধরে এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা কে প্রশ্ন করলেন ঃ **ঈমান কি ?** উত্তরে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বললেন ঃ মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করা, তাঁর ফেরেশতাদেরকে বিশ্বাস করা, তাঁর কিতাবসমূহকে বিশ্বাস করা, তাঁর রাসূলগণকে বিশ্বাস করা, আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, আর তাক্বদীরের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার নাম ঈমান। জিবরাইল আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা এ কথা শুনে বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি ঠিক বলেছেন। (বুখারী, মুসলিম)

উল্লেখিত হাদীসের প্রশ্নকারী ছিলেন, জিব্রীল আলাইহিস সালাম আত-তাসলিমা। তাই হাদীসটিকে **'হাদীসে জিব্রীল'** বলে। এটি রাসূলের সাথে জিব্রীল আমীনের একটি সাক্ষাৎকার। এই সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জিব্রীল আমীন অত্যন্ত সুন্দরভাবে ইসলাম ও ঈমানের হাক্বিক্বাত, দ্বীনের বুনিয়াদী কথাগুলোর কাঠামো প্রিয় রাসূলের মুখ দিয়ে গোটা বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করেছেন। এতে দ্বীনের মূল ভিত্তির কথা বলা হয়েছে বলে এ হাদীসটিকে **উম্মুস সুন্নাহ বা উম্মুল আহাদীসও** বলা হয়।

২। আবু হুরাইরা রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন ঃ ঈমানের সত্তরটিরও অধিক শাখা রয়েছে ! এর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হলো ঃ **"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ** অর্থাৎ মহান আল্লাহ ছাড়া কোন হক্ব ইলাহ নেই" এ কথার ঘোষণা দেয়া। এর নিম্নতম শাখাটি হলো ঃ **পথ হতে কষ্টদায়ক জিনিস অপসারিত করা এবং লজ্জাশীলতাও ঈমানের একটি অংশ।"** (বুখারী, মুসলিম)

উল্লেখিত হাদীসে ঈমানের স্তর বিন্যাস ও শাখা-প্রশাখার কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ সেই সব কাজ, যা নিয়ে ঈমান ও ইসলামের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। বুখারীর অন্য আরো এক বর্ণনায় ঈমানের শাখা-প্রশাখা ষাটেরও অধিক বলা হয়েছে। এখানে ঈমানের দুই প্রান্তসীমার কথা বলা হয়েছে।

সবচেয়ে উত্তম ও মর্যাদাবান শাখার কথা বলা হয়েছে **"লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ"**। উল্লেখিত কালিমা তাইয়্যিবা মনে-প্রাণে, মুখে বলা ও স্বীকার করাই হল মূল ঈমান। মহান আল্লাহ ছাড়া আর কোন হক্ব ইলাহ নেই। তিনি সবসময় আছেন, সবসময় থাকবেন। বাকী থাকা, চিরদিন থাকা শুধু তাঁরই বৈশিষ্ট্য। দুনিয়ার আর সব একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। এভাবে আল্লাহর রাসূল, মালায়িকাহ, কিতাবসমূহ ইত্যাদির উপর পরিপূর্ণ আস্থা ও ভাল ধারনা রাখা। আখিরাতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। মৃত্যুর পর কবরে গুনাহগারদের শাস্তি ও নেক বান্দাদের পুরষ্কার প্রদান করা হবে। আর ঈমানের নিম্নতম শাখা হল পথ-ঘাট হতে মানুষকে কষ্ট ও দুঃখ দিতে পারে এমন কষ্টদায়ক পদার্থ উঠিয়ে দূরে ফেলে দেয়া। (যেমন-আম, কাঁঠাল, কলা ইত্যাদি ফলের ছোবলা বা এই ধরনের অন্যান্য জিনিস যেমন-ইট, কাঠ, পাথর ইত্যাদি)।

এই দুই প্রান্তসীমার মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেনঃলজ্জাশীলতাও ঈমানের একটি অংশ। অর্থাৎ লজ্জা মুমিনের একটি ভূষণ। এই ভূষণ যার মধ্যে আছে তিনি অনেক গুনাহ থেকে বেঁচে থাকেন। তার মধ্যে অনেক উত্তম গুনাবলী সৃষ্টি হয়ে থাকে।

৩। আবু হুরাইরা রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন ঃ ঈমানের শাখা হচ্ছে ষাটের কিছু বেশী এবং লজ্জা ঈমানের একটি শাখা। (বুখারী)

৪। সুফিয়ান বিন আব্দুল্লাহ সাকাফী বলেন, একবার আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এর নিকট আরজ করলাম, নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা আমাকে ইসলাম সম্পর্কে এমন একটি কথা বলুন, যে সম্পর্কে আপনার পরে (অথবা আপনি ব্যতীত) আর কাউকে যেনো আমার জিজ্ঞাসা করতে না হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বললেন ঃ **"বলো ! আমি মহান আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপন করলাম" এবং একথার উপর অটল ও অবিচল থাকো।** (মুসলিম)

৫। আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন ঃ সে ব্যক্তিই ঈমানের স্বাদ পেল, যে মহান আল্লাহকে নিজের রব, ইসলাম কে জীবন ব্যবস্থা ও মুহাম্মাদকে রাসূল হিসাবে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করেছে। (মুসলিম)

মহান আল্লাহ সুবহানা ওয়া তা'আলার রুবুবিয়্যাত, তাঁর জাত ও সিফাতের উপর ঈমান, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এর রিসালাত ও নবুওয়াতের উপর ইয়াক্বিন ও ইতিক্বাদ, দ্বীন ও শারীআতের সঠিকতা ও সত্যতার উপর পরিপূর্ণ নির্ভরতা, ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা ও আহকামের অনুসরণ, এমনভাবে হতে হবে যেন হৃদয়-মন উল্লসিত উদ্ভাসিত হয়ে যায়। কোন চাপ অনুভব না করে। বিরক্তির কণামাত্রও এতে থাকবে না। যেমন কোন মূল্যবান বস্তু পাওয়া গেলে মন যেমন উৎফুল্ল হয়ে উঠে । তেমনি মহান আল্লাহর রাসূল ও দ্বীন প্রাপ্তির জন্য মন তৃপ্ত ও উৎফুল্ল হয়ে যাবে।

৬। আলী রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন ঃ কোন বান্দাই মুমিন হইতে পারিবে না যাবৎ না সে এই চারটি কথায় বিশ্বাস করে ঃ-

ক. মহান আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্যিকারের মাবুদ নাই এবং আমি মহান আল্লাহর রাসূল, সত্য সহকারে তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন ঃ এই বিশ্বাস করা।

খ. মৃত্যুতে বিশ্বাস করা।

গ. মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর বিশ্বাস করে ও

ঘ. তাক্বদীরে বিশ্বাস করে। (তিরমিযী, ইবনে মাজা, মিশকাত)

ঈমান অর্থ বিশ্বাস। কিন্তু শরীয়াত বিধানে দ্বীন ইসলামের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি এবং সুচারুরূপে তদনুযায়ী কাজ করার নামই হলো ঈমান। আর এরূপ ঈমান বাড়ে ও কমে। যে বিশ্বাস করে সে মু'মেন। এইরূপ না দেখিয়া বিশ্বাস করাকে ঈমান বিল গায়েব বলে। তাই মুমেন মুমেনা তাদের অন্তরের বিশ্বাসকে নিম্নভাবে মুখে প্রকাশ করিয়া থাকে ঃ

"আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রূসূলিহী ওয়াল ইয়াওমিল আখিরি ওয়াল কাদরি খাইরিহী ওয়া শাররিহী ওয়াল মাওতে ওয়াল বাআছে বাআদাল মাওতে ওয়াল জান্নাতি ওয়ান-নার অর্থাৎ আমি মহান আল্লাহর উপরে, তাঁহার ফেরেশতাগণ, তাঁহার কিতাবসমূহ, তাহার রাসূলগণ, আখিরাত, ভাগ্যের ভাল ও মন্দ, মৃত্যু, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান এবং জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাস করিলাম। (মুসলিম, মেশকাত) পূর্বেই বলা হয়েছে ঈমান বাড়ে ও কমে।

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে যে, জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা তাঁর হাতের তালু প্রিয় নবীজীর হাঁটুর উপর রেখে প্রশ্নগুলো করেছিলেন যে, (ইয়া রাসূলাল্লাহ)! ইসলাম কি ? উত্তরে নবীজী বলেছিলেন: "ইসলাম এই যে, তুমি তোমার চেহারা মহামহিমান্বিত আল্লাহর কাছে সমর্পন করবে এবং সাক্ষ্য দিবে যে, মহান আল্লাহ ছাড়া আর কোনো প্রকৃত মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিবে যে, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা তাঁর বান্দা ও রাসূল।" জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা তখন বলেন: "এরূপ করলে কি আমি মুসলিম হয়ে যাব?" জবাবে নবীজী বলেন, "হ্যাঁ, এরূপ করলে তুমি মুসলিম হয়ে যাবে।" জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা তখন বলেনঃ "হে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা! আমাকে বলে দিন, ঈমান কি?" নবীজী তখন উত্তরে বলেনঃ "ঈমান এই যে, তুমি বিশ্বাস স্থাপন করবে মহান আল্লাহর উপর, আখিরাতের উপর, মালাকগণের উপর, কিতাবসমূহের উপর, নবীগণের উপর, মৃত্যুর উপর, মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের উপর, জান্নাতের উপর, জাহান্নামের উপর, হিসাবের এবং মিজানের উপর। আরো বিশ্বাস রাখবে তাক্বদীরের ভাল মন্দের উপর।" তখন জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা বললেনঃ "এরূপ করলে কি আমি মুমিন হবো?" নবীজী তখন উত্তরে বললেনঃ "হ্যাঁ, এরূপ করলে তুমি মুমিন হবে।" (ইবনু কাসীর) যেমন এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন ঃ তাদের ঈমানের সাথে যেন ঈমান আরো বেড়ে যায়। (ফাতহ) আর আমি তাদের হিদায়েত

(ঈমান) বৃদ্ধি করে দিয়েছি। (কাহাফ) আর যারা সঠিক পথে থাকে তাদের হিদায়েত (ঈমান) মহান আল্লাহ আরো বৃদ্ধি করে দেন। (মারইয়াম) যারা সঠিক পথে থাকে তাদের হিদায়ত (ঈমান) বৃদ্ধি করে দেন এবং তাদেরকে আল্লাহ ভীতি দান করেন। (মুদ্দাসসির)আর যারা ঈমান এনেছে তাদের ঈমান তিনি আরো বৃদ্ধি করে দেন। (মুহাম্মাদ) এটা তোমাদের কারোর ঈমান বৃদ্ধি করে দেয় কাজেই যারা ঈমান এনেছে তাদের ঈমানকে বৃদ্ধি করে দেয়। (আত-তাওবাহ) তাদেরকে ভয় কর, অতঃপর তাদের ঈমান বেড়ে গেল। (আল-ইমরান) তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পন কেই বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। (আহযাব)

ইবরাহীম খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা বলেছেন ঃ তবে আমার মনের প্রশান্তির জন্য অর্থাৎ আমার মনের বিশ্বাস বেড়ে যায়। (কুরআন)

অতএব পবিত্র কুরআন দ্বারাই প্রমাণিত হইল যে, সৎকার্য্যে ঈমান বেড়ে যায় এবং অসৎকার্য্যে উহা নষ্ট হইয়া যায়। শয়তানের ঈমান ও নবীর ঈমান কি সমান ? শয়তান কি বিশ্বাস করে না যে মহান আল্লাহ আছেন ? তাই বলিয়া কি সে নবীর মত ঈমানদার ? চোরের ঈমান ও সাধুর ঈমান কখনও সমান হতে পারে না। অনেকে মনে করেন ঈমান বাড়েও না কমেও না। অতএব তাদের ধারণা পবিত্র কুরআনের উপরুক্ত আয়াতগুলি হইতে ভুল প্রমাণিত হইল।

আবু হুরাইরা রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলিয়াছেন ঃ ব্যভিচারী ব্যভিচার করিতে পারে না যখন সে ব্যভিচার করে ঈমানদার থাকিয়া, চোর চুরি করিতে পারে না যখন সে চুরি করে ঈমানদার থাকিয়া, শরাবখোর শরাব খাইতে পারে না যখন সে শরাব খায় ঈমানদার থাকিয়া, ডাকাত এরূপে ডাকাতি করিতে পারে না যে, লোক তাহার প্রতি নজর করিয়া থাকে (অর্থাৎ প্রকাশ্যে) যখন সে ডাকাতি করে ঈমানদার থাকিয়া, তোমাদের কেহ গনী মতের মালে খেয়ানত করিতে পারে না যখন সে খেয়ানত করে ঈমানদার থাকিয়া, অতএব সাবধান ! সাবধান !! (মুত্তাফিকুন আলাইহ)

ঐ আবু হুরাইরা রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন ঃ যখন কোন বান্দা ব্যভিচার করিতে থাকে তখন তাহার (অন্তর) হইতে ঈমান বাহির হইয়া যায় এবং তাহার মাথার

উপর ছত্রের ন্যায় অবস্থিত থাকে, অতঃপর যখন সে এই অপকর্ম হইতে বিরত হয়। তখন ঈমান তাহার নিকট প্রত্যাবর্তন করে। (আবুদাউদ, তিরমিযী)

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসের বর্ণনায় আছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন ঃ হত্যাকারী হত্যা করিতে পারে না, যখন সে হত্যা করে ঈমানদার থাকিয়া। ইকরামা রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ আমি আব্দুল্লাহ রাজিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ কিরূপে তাহার ঈমান বাহির হইয়া যায় ? ইহা শুনিয়া তিনি তাঁহার দুই হাতের অংগুলীসমূহকে পরস্পরের ফাঁকের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়া, পরে উহা টানিয়া লইলেন এবং বলিলেন ঃ এই রূপে। অতঃপর যদি সে তওবা করে, ঈমান পুনঃ ফিরিয়া আসে এইরূপে ঃ এ বলিয়া পুনরায় তিনি তাঁহার অংগুলী সমূহকে পরস্পরের ফাঁকের মধ্যে প্রবেশ করাইলেন। ইহা ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি বলিয়াছেন যে, 'সে মুমিন থাকে না ইহার অর্থ সে কামেল বা পূর্ণ মুমিন থাকে না বা তার ঈমানের নূর থাকে না।

মুমিনের **'অন্তর'** খুবই পাক পবিত্র-ভান্ডার। এতে শুধু ঈমানের আলো স্থান পায়। ঈমানের পরিপন্থি কোন জিনিস এই পবিত্র ভান্ডারে স্থান পায় না। ঈমানের আলো তা বরদাশ্ত করতে পারে না। শাইত্বানের দুর্দমনীয় প্ররোচনায় কোন মুমিন প্রবৃত্তির তাড়নায় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়ে এই ধরনের গুনাহে লিপ্ত হলে পবিত্র ক্বলবে ঈমানের নূর বসে থাকতে পারে না, যেমনটি এই গুনাহের কাজ করার আগে ছিল। ঈমানের এই চলে যাওয়া ও ফিরে আসার স্বরূপটি ইকরিমার এক প্রশ্নের জবাবে ইবনু আব্বাস দুই হাতের আংগুলগুলো পরস্পর প্রবেশ করিয়ে দিয়ে ঈমান কিভাবে 'ক্বলবে' থাকে আবার আংগুল ছাড়িয়ে নিয়ে দুই হাত আলাদা করে ঈমান কিভাবে দূর হয়ে যায় তাঁর দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন অর্থাৎ এসব গুনাহগার সেই সময় পরিপূর্ণ ঈমানদার থাকে না।

ঈমানের তাৎপর্য

ঈমানের সঠিক তাৎপর্য বুঝতে হলে জানতে হবে নিম্নেবর্ণিত ঈমানের বিভিন্ন দিকগুলির সঠিক ব্যাখ্যা। যথা:

(১) ঈমানের ৩টি অবস্থা, (২) ২টি কলেমা, (৩) ৭টি বিষয়বস্তু ও (৪) ২টি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এর প্রত্যেকটি সম্পর্কে সঠিকভাবে অবগত হওয়ার পরই একটা লোকের পক্ষে ঈমানদার হওয়া সম্ভব; নইলে নয়।

আমাদের ঈমান ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-এর সঙ্গী-সাথীদের ঈমানের মধ্যে পার্থক্য

আমরা ঈমানের দু'টি কালেমা আরবীতে পড়ি আর বলি, হ্যাঁ, যা পড়লাম তা বিশ্বাস করলাম কিন্তু কি বিশ্বাস করলাম তা বাংলায় বুঝিয়ে বলতে পারিনা। অর্থাৎ আমরা যা বিশ্বাস করি বলে দাবী করি তা যে কি, তা আমরা জানিনা। এটাই হচ্ছে আমাদের ঈমান। আর সাহাবায়ে কেরাম রাজিয়াল্লাহু আনহুমগণ তাঁদের মাতৃভাষায় ঈমানের দু'টি কালেমা পড়ে যখন ঈমান এনেছেন তখন তাঁরা বুঝেছেন যে তাঁরা কিসের প্রতি ঈমান আনলেন বা কিসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করলেন। অর্থাৎ তাদের ঈমান ছিল বুঝে সুঝে আর আমাদের ঈমান হচ্ছে না বুঝেই। এর ফলে তাঁদের ও আমাদের চরিত্রের মধ্যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। যেমন: তাঁদের বিশ্বাস মোতাবেক তাদের চরিত্র এমনভাবে গড়ে উঠেছিল যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা একদিন মদিনা থেকে বললেন ''আজ এখান থেকে একজন সুন্দরী রমণী বহু মূল্যবান জেওর গয়না পরে যদি হাজরামাউথ পর্যন্ত একা একা পায়ে হেঁটেও চলে যায় তবুও তার দিকে কেউ ফিরে চাইবে না''। তাছাড়া আরো বলেছেন ''মুসলমান যা ই করুক না কেন সে কখনও মিথ্যা বলবে না এবং তার দ্বারা কারও কোন প্রকার ক্ষতি হবে না, অর্থাৎ মুসলমান কারও জন্যে ভয়ের কারণ হবে না''। এর বাস্তব নজীর দেখতে পাওয়া যায় আরবে ইসলামী খেলাফত কায়েম হয়ে যাওয়ার পর দোকানদার দোকান খুলে রেখে মাসজিদে নামাজ পড়তে গিয়েছে কিন্তু কেউ তার কোন মালে হাত দেয়নি। মানুষ ঘরের দরজা খুলে রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু কোন চোর ঘরে ঢোকেনি। আর আমাদের ঈমান মোতাবেক আমাদের আচরণ হচ্ছে এই যে অন্যান্যদের কথা বাদ দিলেও যারা বিশেষ করে মাসজিদে নামাজ পড়তে যান তাদেরই উপর এমন একটা সাধারণ আস্থা নেই যে ছেঁড়া জুতা জোড়াও বাইরে রেখে নিশ্চিন্তে নামাজ পড়তে পারা যাবে। এ ছাড়াও এমন বহু ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে একজন মুসলমানকে ততটুকু বিশ্বাস করতে পারে না যতটুকু বিশ্বাস করতে পারে একজন অমুসলিমকে। আমি মনে করি এর চাইতে লজ্জাস্কর ঘটনা আর কিছু হতে পারে না যে, যে মুসলমান ছিল একদিন সারা বিশ্বের মধ্যে একমাত্র বিশ্বাসী জাতি, আর যাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমার উপাধিই ছিল **'বিশ্বাসী'** বা **'আল-আমিন'** যাঁকে তাঁর চরম শত্রুরাও চরম বিশ্বাসী বা আল আমিন উপাধি দিয়েছিল, আর আজ সেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমার উম্মতের মধ্যেই বিশ্বাসী লোক খুঁজে

পাওয়া দুষ্কর। এর চাইতে লজ্জার ব্যাপার আর কি হতে পারে তা আমার জ্ঞানে ধরে না। এখন প্রশ্ন আজকের মুসলমানদের এ অবস্থা হলো কেন ? এর জবাব, আজকের মুসলমান যে কি বিশ্বাস করে মুসলমান হয়েছে তা তারা বলতে পারে না। আর কিছু মুসলমান যারা বলতে পারেন তাদেরও অধিকাংশের ধারণা অস্পষ্ট, যার ফলে আজ আমাদের এ দুরবস্থা। এবার আসুন আমরা ঈমানের প্রতিটি দিক ও বিভাগ সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে কিছু বোঝাতে চেষ্টা করি।

ঈমানের ৩টি অবস্থা

ঈমান অর্থ না দেখে বিশ্বাস। মুসলমানদের মহান আল্লাহ-রাসূল ও পরকাল সম্পর্কীয় না দেখা বিশ্বাসকে ঈমান বলা হয়। শুধু এই ব্যাপারেই নয় বরং যে কোন ব্যাপারেই হোক না কেন, মানুষ যখনই কারো নিকট থেকে কোন খবর শোনে তখনই সে খবরটাকে ৩ অবস্থার যেকোন এক অবস্থায় গ্রহণ করতে পারে। যথা: খবর শুনে-

১। কেউ মনে করতে পারে, 'সম্পূর্ণই সত্য খবর'।

২। কেউ মনে করতে পারে, 'সম্পূর্ণই মিথ্যা খবর'।

৩। কেউ মনে করতে পারে, 'হলেও হতে পারে সত্য কিংবা নাও হতে পারে সত্য'। মনের এ অবস্থাকে বলে সন্দেহ। ঠিক তদ্রুপ নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে আমরা পরকাল সম্পর্কে যে খবর শুনে আসছি তা বিশ্বাসের বেলায় বনি আদম ঐ ৩ ভাগে বিভক্ত। অর্থাৎ-

১। এক শ্রেণীর লোক শুনেছে এবং বিশ্বাস করেছে, তাদের বিশ্বাসে সন্দেহ-সংশয় নেই।

২। কেউ শুনেছে, বিশ্বাস করেনি একটুও।

৩। কেউ শুনেছে শুনে ধাঁধাঁয় পড়েছে। তারা পুরোপুরি অমান্যও করেনি আবার তাদের কার্যকলাপে প্রমাণও হয় না যে তারা বিশ্বাস করেছে।

বিশ্বাসের লক্ষণ

বিশ্বাসের লক্ষণ আমরা একটা উদাহরণ থেকে বোঝার চেষ্টা করি। মনে করুন ৩ জন যুবক কোন পাড়াগ্রাম থেকে কোন টাউনে সিনেমা দেখতে যাচ্ছিল- পথে পানির পিপাসায় কোন এক বাড়ী থেকে পানি পান করল। এর

পর এক ব্যক্তি খবর দিল যে, ঐ পানি কোন এক পুকুরের ছিল, যে পুকুরে কলেরা রোগীর বমি ও পায়খানা ধোয়া হয়েছে। অতএব ঐ পানির সঙ্গে তোমরা কলেরার জীবাণু পান করে ফেলেছ। এ খবরটা শুনে কেউ মনে করতে পারে **'কথাটা সম্পূর্ণ সত্য'**, কেউ মনে করতে পারে, **'কথাটা পুরোপুরিই মিথ্যা'** এবং কেউ মনে করতে পারে **'কথাটা সত্যও হতে পারে মিথ্যাও হতে পারে'**। এবার খবরটা শোনার পর কার কিরূপ বিশ্বাস হল তা বোঝার উপায় কি হবে ? এটা বোঝার উপায় অত্যন্ত সহজ। অর্থাৎ যে পুরোপুরি বিশ্বাস করবে তার চলার গতি সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন হয়ে যাবে। সে আর সিনেমার দিকে অগ্রসর হবে না, সে তৎক্ষণাৎ ছুটবে ডাক্তার বাড়ী। আর যে পুরোপুরিই মিথ্যা মনে করবে সে তার চলার গতি পরিবর্তন করবে না। সে সিনেমার দিকেই ছুটবে। আর যার মনে সন্দেহ হবে তাকে ঐ দুই ব্যক্তির যে সঙ্গে নেয়ার চেষ্টা করবে সেই সঙ্গে নিতে পারবে। পরকালের প্রতি কার কিরূপ বিশ্বাস তা বোঝারও ঐ একই পন্থা। অর্থাৎ যে পরকালে বিশ্বাস করবে তার জীবন-যাপনের গতিধারা সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন হবে এবং তার যাবতীয় কার্যকলাপ হবে পরকাল বিশ্বাসের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। আর যার বিশ্বাস হবে সম্পূর্ণই উল্টা তার অবস্থা হবে সম্পূর্ণই পূর্ববৎ। অর্থাৎ তার জীবনের চলার পথের কোন পরিবর্তন আসবে না। আর যার মনে সন্দেহ বা অস্পষ্ট ধারণা হবে তাকে বেঈমানরা চেষ্টা করলে পুরো বেঈমান বানাতে পারবে আর ঈমানদাররা চেষ্টা করলে পুরো ঈমানদার বানাতে পারবে। (কালেমার হাকীকত)

ঈমানের গুরুত্ব

মানুষের চলার পথ দু'টি। প্রথম পথটি তৈরী হয়েছে ঈমান দ্বারা। এই পথটিকে বলা হয় **'সিরাতুল মুস্তাক্বীম'** এটি মুক্তি ও পুরষ্কারের পথ। আর দ্বিতীয় পথটি তৈরী হয়েছে কুফর দ্বারা। এই পথটিকে বলা হয় **'সিরাতুজ জালালাহ'** ভ্রষ্ট পথ। এটি শাস্তি ও ধ্বংসের পথ।

পবিত্র কুরআনের মূল দাওয়াত হচ্ছে তাওহীদ বা ঈমানের দিকে। যার উপর মহাগ্রন্থ **আল-কুরআনিল কারীম** নাজিল হয়েছে সেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা ঈমানের দিকেই মানবজাতি ও জ্বিন জাতিকে আহ্বান করেছেন **"ইউনাদি লিল ঈমান"**। পবিত্র কুরআন সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছে, ঈমান ব্যতীত পবিত্র কুরআন থেকে হিদায়েত লাভ করা যাবে না। **"হুদাল্লিল মুত্তাক্বীন, আল্লাজীনা ইউমিনুনা বিল গাইব।"**

বস্তুতঃ ঈমানই হচ্ছে সত্য, জ্ঞান, পথ নির্দেশিকা, আলোক বর্তিকা, কল্যাণ ও মুক্তি। আর কুফর হচ্ছে অজ্ঞতা, যুলুম, বাতিল, ভ্রষ্টতা, ধ্বংস, অকল্যাণ ও বঞ্চনা।

পবিত্র কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে মহান আল্লাহপাক ঈমান ও কুফরের মাঝে নিম্নভাবে পার্থক্য দেখাইয়াছেন ঃ

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ -

"কুল হাল ইয়াসতা বিল্লাজীনা ইয়া'লামুনা অল্লাজীনা লা ইয়া'লামুন।"

(১) বলুন ! জ্ঞানী এবং অজ্ঞরা কি সমান হতে পারে। (যুমার-৯)

أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ -

"আফামান কানা মুউমিনান কামান কানা ফাসিক্বান লা ইয়াসতাউনা।"

(২) যে ব্যক্তি মুমিন তাঁর মর্যাদা কি ফাসেকের সমান ? না তারা সমান নয়। (সিজদা–১৮)

قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ -

"কুললা ইয়াসতাবিল খবিছু অত তাইয়িবু অলাও আ'জাবাকা কাছরাতুল খাবিছি।"

(৩) পুত পবিত্র ব্যক্তি আর অপবিত্র খবীস এক ও সমান নয়। হে নবী! যদিও খবীসদের আধিক্য তোমাকে বিস্মিত করে। (মায়েদা-১০০)

সূরাহ হুদে মহান আল্লাহপাক কুফরীর পথ অবলম্বন কারীদের অশুভ পরিণতি এবং মুমিনদের শুভ পরিণতির কথা উল্লেখ করার পর দু'দলের মধ্যে এভাবে পার্থক্য করেছেন ঃ

مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ -

"মাছালুল ফারি ক্বাইনি কাল আ'মা অল আছাম্মি অল বাছিরি অস ছামিইয়ি হাল ইয়াসতাবি ইয়ানি মাছালান। আফালা তাজাক্কারুন।"

(৪) এই শ্রেণীর লোকদের দৃষ্টান্ত এরূপ, যেমন একজন লোক অন্ধ ও বধির আর অপরজন শ্রবণশীল ও দৃষ্টিবান। এ দু'জন লোক কি সমান হতে পারে ? এ দৃষ্টান্ত থেকে তোমরা কি শিক্ষা গ্রহণ করবে না ? (হুদ-২৪)

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ - قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا - وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ - وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ - أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ - هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ -

(৫) দ্বীনের ব্যাপারে কোন জোর জবরদস্তি বা বাধ্য বাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়েত (ঈমান) গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে। অতঃপর যে ব্যক্তি (গোমরাহকারী) তাগুত (শয়তানী শক্তি) কে পরিত্যাগ করে মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে, সে একটি অচ্ছেদ্য রজ্জু আঁকড়ে ধরেছে, যা কখনো ছিড়ে যাবার নয়। আর মহান আল্লাহ সব কিছু শুনেন ও জানেন। মহান আল্লাহ ঈমানদার লোকদের সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক। তিনি তাদের অন্ধকার থেকে আলোকের দিকে নিয়ে যান। আর কাফিরদের সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক হচ্ছে তাগুত। তারা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হচ্ছে জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (বাকারা: ২৫৬-২৫৭)

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ -

"ক্বুল হাল ইয়াসতাবিল আ'মা অল বাছিরু আম হাল তাসতা বিজ জুলুমাতু অন নূরু।"

(৬) বলুন ঃ অন্ধ চক্ষুষ্মান কি সমান হয় ? অথবা কোথাও কি অন্ধকার আলোর সমান হয়। (রাদ-১৬)

(৭) সর্বোপরি কথা হচ্ছে, মুমিনরা মহান আল্লাহর দল **(হেজবুল্লাহ)** আর কাফিররা শয়তানের দল **(হেজবুশ শায়তান)**। দুনিয়ায় ও আখিরাতে মহান আল্লাহ মুমিনদের সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক। আখিরাতে তিনি তাদের ক্ষমা করে চিরন্তন সুখ আর অফুরান নিয়ামতে ভরা জান্নাত দান করবেন। পক্ষান্তরে দুনিয়ায় কাফিরদের পথ প্রদর্শক হচ্ছে শয়তান। পরকালে সে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদেরকে সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেবে। অতঃপর সে এবং তার অনুসারীরা সকলেই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

উপর্যুক্ত আলোচনা দ্বারা ঈমানের গুরুত্ব সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা হয়ে গেছে বলে আশা করি।

বিশুদ্ধ আক্বীদার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

মানুষের জীবন বিশুদ্ধ আক্বীদার উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষ তার হৃদয়ের গভীরে যে চেতনা বা বিশ্বাস লালন করে এবং যার উপর ভিত্তি করে তার জীবন পরিচালনা করে সেই বিশ্বাসকে আক্বীদা বলে। আক্বীদা বা বিশ্বাস যার বিশুদ্ধ নয় তার জীবনটাই বৃথা। কেননা বিশুদ্ধ আক্বীদাই হলো মুসলিম জীবনের মৌলিক মানদন্ড। আক্বীদা বিশুদ্ধ না হলে আমলের কোন গুরুত্ব নেই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেন, (انما الاعمال بالنيات) **'সমস্ত আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল'**। (মিশকাত হা/১) নিয়ত শব্দটি 'নাওয়া' (نواة - نوى) শব্দ থেকে তৈরি হয়েছে। আর এর অর্থ হলো-বিচি বা আঁঠি অর্থাৎ মনের গহীনে যে আঁটি লাগানো হবে ঠিক তারই গাছ হবে এবং ফলও সেই গাছেরই হবে। আক্বীদা বা নিয়ত যার যেমন হবে, আমল তেমনই হবে। তার বিপরীত হবে না। কারণ কাঁঠালের বিচি লাগালে আম হয় না আর কেউ আমের আশা করে না। অনুরূপ আমের আঁঠি লাগালে কাঁঠাল হয় না। সুতরাং ক্বলবের কল্পনার ভিত্তি আক্বীদাকে নিয়ন্ত্রণ করা প্রত্যেকেরই দায়িত্ব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেন, (الا وان فى الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد كله الا وهى القلب) 'মনে রেখ! মানুষের শরীরে একটি গোশতের টুকরা রয়েছে। যদি সেটি বিশুদ্ধ হয়, তাহলে শরীরের সবই সুস্থ থাকে আর যদি সেটি অসুস্থ হয়, তাহলে শরীরের সবই অসুস্থ হয়ে যায়। মনে রেখ! সেটা হলো **'অন্তর'**। -(মিশকাত হা/২৭৬২) সুতরাং এই আসল জিনিসটি সঠিকভাবে পরিচালিত হলে শরীরের হাত-পা, চোখ-কান, কথা-বার্তা, চিন্তা-চেতনা, চলা-ফেরা সবই সঠিক পথে পরিচালিত হবে। আর মূল জিনিসটি ভালো না হলে সেগুলো সঠিকভাবে পরিচালিত হবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা এক হাদীছে বলেন, عن ابى هريرة قال قال رسول الله (ص) ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم - অর্থাৎ 'আবু হুরায়রা রাজিআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেছেন, নিশ্চয় (ক্বিয়ামতের দিন) মহান আল্লাহ তোমাদের সুন্দর আকৃতি ও ধন-সম্পত্তির দিকে তাকাবেন না; বরং তোমাদের অন্তর ও আমলের দিকে তাকাবেন। -(মুহাম্মাদ ইবনু

জারীর আবু জাফর আত-ত্বাবারী, জামেউল বায়ান ফী তাবীলিল কুর্‌আন; ৯ম খণ্ড, পৃঃ-৫৯২)

আক্বীদা মুসলিম জীবনের মূল সম্বল। তাই আক্বীদা বিশুদ্ধ না হলে জীবনের সকল প্রকার কর্ম নিস্ফল ও বাতিল বলে গণ্য হবে (মায়েদাহ-৫)। কিন্তু দুঃখজনক হলো, অধিকাংশের আক্বীদা শিরক, কুফর, নেফাক্ব, ইলহাদ, বিদআত ও কুসংস্কারে পরিপূর্ণ। ফলে আমল করে কোন লাভ হচ্ছে না (আন'আম-৮২ ও ৮৮। আক্বীদাগত তামাম বিষয়ের মধ্যে সর্বাধিক গুরত্বপূর্ণ হলো ঈমানের রুকন সমূহ, যা প্রত্যেকের উপর ফরজ। ঈমানের এই ছয়টি রুকন আক্বীদার মৌলিক ভিত্তি, যদিও আক্বীদা সংক্রান্ত আরও অনেক বিষয় রয়েছে। তাই এই মৌলিক ছয়টি বিষয়ের প্রতি সর্বাগ্রে ঈমানকে দৃঢ় করতে হবে। যেমন এর প্রথমটিই হচ্ছে মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস। যাঁর উদ্দেশ্যে বান্দা ছালাত, ছিয়াম, যাকাত সহ জীবনের সবকিছুই পালন করে থাকে। তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে এক প্রতিপালক হিসাবে, স্বতন্ত্র নাম ও গুণাবলী সম্পন্ন সত্তা হিসাবে এবং একক ইলাহ হিসাবে।

অনুরূপভাবে ঈমানের অন্যান্য রুকন সমূহের প্রতিও দৃঢ় ও স্বচ্ছ বিশ্বাস রাখা ফরজ। কিন্তু দুঃখজনক হলো-সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিই মুসলিম সমাজে সবচেয়ে অবহেলিত। ইসলামপন্থী দলগুলো এটাকে খুঁটিনাটি বিষয় বলে উপহাস করে থাকে। আর এর বাইরের বিষয়গুলো নিয়ে ব্যস্ত থাকে। অথচ তাওহীদী আক্বীদা ভিতরে না থাকলে যেমন কোন ব্যক্তি মুসলিম হতে পারে না, তেমনি অন্যান্য হাজারও আমল করলেও মহান আল্লাহর নিকট গৃহীত হবে না; বরং বাতিল বলে গণ্য হবে। কারণ এটা তো মুসলিম হওয়ার প্রধান শর্ত। জিবরীল আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-কে বলেন, ঈমান কী ? তিনি উত্তরে বলেন, মহান আল্লাহর প্রতি, ফেরেশতামণ্ডলী, কিতাব সমূহ, রাসূলগণ, শেষ দিবস এবং তাক্বদীরের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস করা। -(মিশকাত হা/২) উল্লেখ্য যে, কবরেও আক্বীদার প্রশ্ন করা হবে। সেখানে আমল-ইবাদত সম্পর্কে কিংবা রাজনীতি-অর্থনীতি সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করা হবে না। কিন্তু দেশের অধিকাংশ মুসলিমের আক্বীদা যেমন সহীহ নয়, তেমনি ইসলামী দলগুলোর আক্বীদাও বিশুদ্ধ নয়। তারা মহান আল্লাহ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা সম্পর্কে ভ্রান্ত আক্বীদা পোষণ করে। তারা মনে করে মহান আল্লাহ নিরাকার ও সর্বত্র বিরাজমান। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা নূরের তৈরি (নাঊযুবিল্লাহ)। এ ধরনের অসংখ্য

ঈমান বিধ্বংসী আক্বীদা মুসলিম সমাজে চালু আছে। এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেছেন (وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم مشركون) 'তাদের অধিকাংশই মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করে ; কিন্তু তারা তাঁর সাথে (ইবাদাতে) শরীক স্থাপন করে' (ইউসুফ-১০৬)। উক্ত আয়াত পর্যালোচনা করলেই বেরিয়ে আসবে কতজন মানুষের আক্বীদা সঠিক এবং কী পরিমাণ মানুষ শিরক থেকে মুক্ত।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, মহান আল্লাহর নিকট কোন আমল গৃহীত হওয়ার জন্য একমাত্র ও প্রধান শর্ত হলো বিশুদ্ধ আক্বীদা। আক্বীদা বিশুদ্ধ না হলে জীবনের সব আমল বরবাদ হয়ে যাবে। নিম্নের কয়েকটি ঘটনা বিশ্লেষণ করলে বিষয়টি আরও স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হবে। যেমন-

(ক) মুয়াবিয়া ইবনুল হাকাম আস-সুলামী রাজিআল্লাহু আনহু বলেন, আমার একজন বালিকা গোলাম ছিল। সে আমার ছাগলের পাল মাঠে নিয়ে চরাত। একদিন হঠাৎ করে বনের বাঘ এসে ছাগল পাল থেকে একটি ছাগলের বাচ্চা নিয়ে গেল। ফলে আমি রাগান্বিত হয়ে তার গালে একটি থাপ্পড় মারি। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-এর দরবারে আগমন করে বললাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা আমি অন্যায় করে ফেলেছি (তখন আমি ঘটনাটা খুলে বললাম)। আমি তাকে কি মুক্ত করে দিব। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বললেন, তাকে আমার নিকট নিয়ে আস। তাকে নিয়ে আসা হলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা তাকে বললেন, (- فقال لها أين الله قالت فى السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال اعتقها فانها مؤمنة) 'বলতো মহান আল্লাহ কোথায় ? বালিকাটি বলল, মহান আল্লাহ আসমানে। অতঃপর তিনি বললেন, বলতো আমি কে ? বালিকাটি বলল, আপনি মহান আল্লাহর রাসূল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বললেন, তাকে মুক্ত করে দাও। কেননা সে মুমিনা মহিলা'। -(সিলসিলা সহীহাহ হা/৩১৬১)

সুধী পাঠক! শুধু মহান আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকার কারণে বালিকা রাখালকে মুমিনা বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা তাকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে দেওয়ার ঘোষণা দেন।

(খ) আউস গোত্রের বনু আব্দিল আশহাল শাখার আমর বিন ছাবিত আল-উছায়রিম-কে আহতদের মধ্যে দেখতে পেয়ে হতাহতদের সন্ধানকারী মুসলিম বাহিনী হতবাক হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন,

ما الذى جاء بك ؟ احدب على قومك ام رغبة فى الاسلام ؟ فقال بل رغبة فى الاسلام امنت بالله ورسوله ثم قاتلت مع رسول الله (ص) حتى اصابنى ما ترون ومات من وقته فذكروه لرسول الله (ص) فقال هو من اهل الجنة -

অর্থাৎ 'হে উছায়রিম! কোন বস্তু তোমাকে এখানে এনেছে ? নিজ সম্প্রদায়কে সাহায্য করার উত্তেজনায়, না-কি ইসলামের আকর্ষণে ? উত্তরে তিনি বললেন, বরং ইসলামের আকর্ষণ। আমি মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-এর উপর ঈমান এনেছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-এর সাথে যুদ্ধ করেছি। অতঃপর যে অবস্থায় উপনীত হয়েছি, তাতো তোমরা দেখছই। এরপরেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-কে বলা হলো তিনি বলেন, নিশ্চয় সে জান্নাতবাসী'। -(মুসনাদে আহমাদ হা/২৩৬৮৪, সনদ হাসান) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা তার সম্পর্কে আরও বলেন, (عمل قليلا وأجر كثيرا) **'অল্প আমল করল কিন্তু অনেক বেশি পুরস্কার দেওয়া হলো'**। -(বুখারী হা/২৮০৮) আবু হুরায়রা রাজিআল্লাহু আনহু বলেন, (ولم يصل لله صلاة قط) 'অথচ তিনি মহান আল্লাহর জন্য কখনও কোন ছালাতই আদায় করেননি'। -(মুসনাদে আহমাদ হা/২৩৬৮৪)

(গ) আমর ইবনু উক্বাইশ ঃ আবু হুরায়রা রাজিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'সুদের কারণে ইসলামের প্রতি অনাগ্রহী ছিলেন। পরে তিনি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হন। অতঃপর তিনি ওহোদের দিন চলে আসেন এবং গোত্র নেতা সাদ বিন মুআয ও তার গোত্রীয় ভাইদের খোঁজ করেন। অতঃপর তিনি জানতে পারেন যে, তারা সবাই ওহোদের যুদ্ধে চলে গেছেন। তখন তিনি পোশাক পরে যুদ্ধের ময়দানে চলে যান। তাকে এ অবস্থায় দেখে মুসলিমরা নিষেধ করল। কিন্তু তিনি বললেন, আমি ঈমান এনেছি। অতঃপর তিনি যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং আহত অবস্থায় মদীনায় নীত হন। তখন সাদ ও মুআয রাজিআল্লাহু আনহুম তার কাছে গিয়ে তার বোনকে বলেন, তুমি ওকে জিজ্ঞেস কর-তুমি কি তোমার গোত্রীয় উত্তেজনায় গিয়েছিলে, না-কি মহান আল্লাহর ভালোবাসার উত্তেজনায় গিয়েছিলে ?

জবাবে তিনি বললেন, বরং মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-এর মহব্বতের উত্তেজনায়। অতঃপর তিনি মৃত্যুবরণ করেন ও জান্নাতে প্রবেশ করেন। অথচ তিনি মহান আল্লাহর জন্য কোন সালাতই আদায় করেননি'। (আবুদাঊদ হা/২৫৩৭)

(ঘ) বংশ মর্যাদা রক্ষার জন্য যুদ্ধকারী ঃ মদীনার বনু যাফর গোত্রের **'কুযমান'** ওহোদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-এর পক্ষে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করছিল। সে একাই কুরাইশ বাহিনীর ৪ জন পতাকাবাহীসহ ৭/৮ জন শত্রুসৈন্য খতম করেছিল। যুদ্ধের ময়দানে তাকে আহত অবস্থায় পাওয়া গেলে মুসলিম সেনারা তাকে উঠিয়ে মদীনায় তার মহল্লায় নিয়ে যান এবং জান্নাতের সুসংবাদ শুনান। তখন সে বলল, والله ان قاتلت ال عن أحساب قوى ولولا ذلك ما قاتلت 'মহান আল্লাহর কসম! আমি যুদ্ধ করেছি আমার বংশের গৌরব রক্ষার জন্য। যদি এটা না থাকত, তাহলে আমি যুদ্ধই করতাম না'। অতঃপর যখন তার জখমের যন্ত্রণা অত্যধিক বৃদ্ধি পেল, তখন সহ্য করতে না পেরে সে নিজের তীর দিয়ে নিজেকে হত্যা করে ফেলল। তার বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেন, নিশ্চয় সে জাহান্নামী'। প্রকৃত অর্থে সে ছিল মুনাফিক্ব। (সীরাতে ইবনু হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃঃ-৮৮) বংশ গৌরবের উত্তেজনায় তাকে যুদ্ধে টেনে এনেছিল।

সুধী পাঠক! এতে স্পষ্ট হয় যে, কেবল মহান আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করার উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে যুদ্ধকারীর পরিণতি জাহান্নাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-এর পতাকাতলে জিহাদে শরীক হয়েও উক্ত 'কুযমান' শুধু ভ্রান্ত নিয়তের কারণে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হলো। অথচ উছায়রিম ও আমর বিন উক্বাইশ রাজিআল্লাহু আনহুম এক ওয়াক্ত ছালাত আদায় না করেও কেবল মহান আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত করার সৎ নিয়তের কারণে জান্নাতী হলেন। এজন্যই হাদীছে বলা হয়েছে 'সকল কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল'। - (মিশকাত হা/১)

ভ্রান্ত আক্বীদার ভয়াবহ পরিণাম ঃ মুসলিম ব্যক্তির প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হলো নিজের আক্বীদাকে পরিশুদ্ধ করা। মহান আল্লাহ বলেন, ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو فى الاخرة من الخاسرين 'যে ব্যক্তি বিশ্বাসের সাথে কুফুরী করবে তার আমল নষ্ট হয়ে যাবে। সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের

অন্তর্ভুক্ত হবে' (সূরাহ মায়েদাহ-৫)। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত মুফাসসির শাইখ আবু জাফর আত-ত্বাবারী (২২৪-৩১০ হিঃ/৮৩৯-৯২৩ খ্রিঃ) বলেন, ومن يجحد ما أمر الله بالتصديق به من توحيد الله ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله ০ 'মহান আল্লাহর নির্দেশ, তাওহীদের স্বীকৃতি ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যা নিয়ে এসেছেন, সেগুলোকে অস্বীকার করা'। (মিশকাত হা/১)। **সমাজে আমলের গুরুত্বই বেশি। বিশুদ্ধ আক্বীদার কোন গুরুত্ব নেই। অথচ আমল যতই সুন্দর হোক, আক্বীদা ছহীহ না হলে তা মহান আল্লাহর নিকট কখনোই কবুল হবে না।** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেন, ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغى به وجهه 'নিশ্চয় মহান আল্লাহ তাআলা কোন আমল কবুল করবেন না, যদি তাঁর জন্য তা খালেছ হৃদয়ে ও তাঁর সন্তুষ্টির জন্য করা না হয়। -(নাসাঈ হা/৩১৪০, সনদ ছহীহ) অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা আক্বীদাভ্রষ্ট আমলকারীদের সম্পর্কে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন।

عن ابى سعيد الخدرى (رض) انه قال سمعت رسول الله (ص) يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم ويقرءون القرأن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر فى النصل فلا يرى شيئا فى القدح فلا يرى شيئا وينظر فى الريش فلا يرى شيئا ويتمارى فى الفوق - আবু
সাঈদ খুদরী রাজিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের মধ্য হতে একটি সম্প্রদায় বের হবে, যাদের ছালাতের তুলনায় তোমাদের ছালাতকে, সিয়ামের তুলনায় তোমাদের সিয়ামকে এবং আমলের তুলনায় তোমাদের আমলকে তোমরা হালকা মনে করবে। তারা পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করবে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দ্বীন ইসলাম থেকে অনুরূপভাবে বেরিয়ে যাবে, যেভাবে শিকার ভেদ করে তীর বেরিয়ে যায়। শিকারী তীরের ফলার দিকে তাকায়, কিন্তু তাতে শিকারের কোন অংশ দেখতে পায় না। সে তীরের প্বার্শ ও পাতার দিকে তাকায়, কিন্তু সেখানেও কিছু দেখতে পায় না। অবশেষে সে তীরের ফলার মাথায় কিছু আছে মনে করে সন্দেহ পোষণ করে। (মিশকাত হা/৫৮৯৪)

অন্য হাদীছে রয়েছে, শেষ জামানায় তারা পূর্ব দিক থেকে বের হবে। তাদের ঈমান তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেন, আমি তাদেরকে পেলে আদ জাতির ন্যায় হত্যা করব। -(বুখারী হা/৬৯৩০ ও ৭৫৬২) অন্য হদীছে এসেছে, ইয়ামান থেকে গনীমতের মাল আসলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা তা বণ্টন করতে থাকেন। এমতাবস্থায় বানী তামীম গোত্রের **যুল খুওয়াইছিরা** নামের এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-কে লক্ষ্য করে বলে, আপনি মহান আল্লাহকে ভয় করুন, আপনি ইনছাফ করুন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেন, ধিক তোমাকে! আমিই যদি ইনছাফ না করি, তবে আর কে ইনছাফ করবে ? অন্যত্র এসেছে, (فمن يطيع الله اذ عصيته فيأمنى على اهل الارض ولا تأمنون) 'আমি যদি মহান আল্লাহর নাফরমানী করি, তাহলে তাঁর আনুগত্য করবে কে ? মহান আল্লাহ আমাকে পৃথিবীবাসীর উপর আমানতদার করেছেন, আর তোমারা আমাকে আমানতদার মনে করবে না ? -(বুখারী হা/৭৪৩২, ২/১১০৫ পৃঃ) অন্য বর্ণনায় আছে, الا تأمنونى وانا امين من فى السماء يأتينى خبر السماء صباحا ومساء 'তোমরা আমাকে আমানতদার মনে করবে না ? অথচ যিনি আসমানে আছেন, আমি তাঁর পক্ষ থেকে আমানতদার। আমার কাছে সকাল-সন্ধ্যায় আসমানের খবর আসে'। -(বুখারী হা/৪৩৫১, ২/৬২৪)

সুধী পাঠক! উক্ত আক্বীদার লোকেরাই শেষ জামানায় বের হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা সম্পর্কে তাদের ভ্রান্ত ধারণা থাকার কারণেই তাদের ছালাত, ছিয়ামসহ যাবতীয় সুন্দর আমল গ্রহণযোগ্য হবে না। বরং তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বহিষ্কৃত হবে, তাদের সাথে ইসলামের কোন অংশ পর্যন্ত থাকবে না। উক্ত দলীল সমূহের আলোকে মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরাম বলেন,

معلوم بالادلة الشرعية من الكتاب والسنة ان الاعمال والاقوال انما تصح وتقبل اذا صدرت عن عقيدة صحيحة فان كانت العقيدة غير صحيحة بطل ما يتفرع عنها - **অর্থাৎ 'শারঈ বিধি-বিধান তথা কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, যাবতীয় আমল ও কথা কেবল তখনই বিশুদ্ধ হবে এবং গৃহীত হবে, যখন তা বিশুদ্ধ আক্বীদার মাধ্যমে প্রকাশিত হবে। আর যদি আক্বীদা বিশুদ্ধ না হয়, তবে তার থেকে যা কিছু বের হবে, শারঈ দৃষ্টিতে সবই**

বাতিল বলে গণ্য হবে'। এজন্য বলা হয়, العقيدة الصحيحة هى اصل دين الاسلام واساس الملة **'বিশুদ্ধ আক্বীদা দ্বীন ইসলামের শিকড় এবং মুসলিম মিল্লাতের সুদৃঢ় ভিত্তি'**। -(শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায, আল-আক্বীদাতুছ ছহীহাহ ওয়ামা ইউযাদ্দুহা (রিয়াযঃ দারুল ক্বাসেম, ১৪১৫ হিঃ), পৃঃ-৩ ভূমিকা দ্রঃ)

বিশুদ্ধ আক্বীদার অস্বাভাবিক প্রতিদান ঃ আক্বীদা মুসলিম জীবনের মূল্যবান সম্পদ। মুসলিমের সফলতা ও ব্যর্থতা আক্বীদার উপরেই নির্ভরশীল। তাই আক্বীদাকে পরিশুদ্ধ করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর আবশ্যক। তাছাড়া বিশুদ্ধ আক্বীদার রয়েছে অস্বাভাবিক প্রতিদান। নিম্নে বিশুদ্ধ আক্বীদার প্রতিদান সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো ঃ

(ক) জান্নাত লাভ ঃ মহান আল্লাহ তাআলা বিশুদ্ধ আক্বীদা পোষণকারীকে অপরিমাণ প্রতিদান দান করবেন। বিশুদ্ধ আক্বীদার সবচেয়ে বড় প্রতিদান হলো জান্নাত লাভ। হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা রাজিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একদা একজন বেদুইন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-এর কাছে আসল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-কে বলল, আমাকে এমন আমলের কথা বলুন, যে আমল করলে আমি জান্নাতে যেতে পারব। তিনি বললেন, তুমি মহান আল্লাহর ইবাদত করবে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, ফরজ সালাত আদায় করবে, ফরজ যাকাত আদায় করবে এবং রামাজানের সিয়াম পালন করবে। তখন ঐ ব্যক্তি মহান আল্লাহর শপথ করে বলল, আমি এর বেশি করব না। যখন লোকটি চলে গেল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বললেন, যে ব্যক্তি একজন জান্নাতী ব্যক্তিকে দেখে আনন্দিত হতে চায় সে যেন এই ব্যক্তির দিকে দেখে।-(মিশকাত হা/১৪)

(খ) মহান আল্লাহর ক্ষমা লাভ ঃ বিশুদ্ধ আক্বীদা পোষণকারীদেরকে মহান আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দিবেন। সারাজীবন কোন ভালো কাজ না করেও এবং ১০০ জনকে খুন করার পরেও দু'ব্যক্তিকে শুধু মহান আল্লাহকে ভয় করার কারণে মহান আল্লাহ তাআলা তাদের দুজনকে ক্ষমা করে দেন। নিম্নে দুটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো ঃ

(১) আবু হুরায়রা রাজিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেছেন, 'জীবনে কোনদিন কোন সৎ আমল করেনি এমন এক ব্যক্তি তার পরিবারবর্গকে বলছে,

যখন সে মারা যাবে তখন তোমরা তাকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলবে। অতঃপর এর অর্ধেক ছাই স্থলে আর অর্ধেক সাগরে ফেলে দিবে। মহান আল্লাহর কসম করে বলছি, যদি মহান আল্লাহ তাকে ধরতে পারেন, তবে তাকে এমন শাস্তি দিবেন, যা জগৎ সমূহের মধ্যে আর কাউকে দিবেন না। যখন লোকটি মারা গেল তখন তারা তা-ই করল, যা সে নির্দেশ দিয়েছিল। অতঃপর মহান আল্লাহ স্থল ও সাগরকে নির্দেশ দিলেন তাদের মধ্যে যা আছে একত্রিত করার জন্য। তারা তা জমা করল। তারপর মহান আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এটা কেন করেছ ? উত্তরে সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আপনার ভয়েই করেছি। আর আপনিই ভালো জানেন কেন করেছি। অতঃপর মহান আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন'। -(মুসলিম হা/৭১৫৬)

(২) আবু সাঈদ খুদরী রাজিআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেছেন, 'বনী ইসরাঈলের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল, যে নিরানব্বই জন মানুষকে হত্যা করেছিল। অতঃপর সে জানার জন্য বের হলো এবং একজন দরবেশের নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করল, এরূপ ব্যক্তির জন্য তওবা আছে কি ? তিনি বললেন, নেই। সে তাকেও হত্যা করল এবং লোকদেরকে জিজ্ঞেস করতে থাকল। এক ব্যক্তি বলল, অমুক গ্রামে যাও এবং জিজ্ঞেস কর। ইতিমধ্যেই তার মৃত্যু এসে গেল। মৃত্যুর সময় সে তার বুককে ঐ গ্রামের দিকে কিছু বাড়িয়ে দিল। অতঃপর রহমতের ও আযাবের উভয় ফেরেশতা এসে ঝগড়া করতে লাগল যে, কারা তার আত্মা নিয়ে যাবে। এ সময় মহান আল্লাহ ঐ গ্রামকে বললেন, তুমি মৃতের নিকট আস আর তার নিজ গ্রামকে বললেন, তুমি দূরে সরে যাও। অতঃপর ফেরেশতাদের বললেন, তোমরা উভয় দিকের দূরত্ব মেপে দেখ। অতঃপর মাপে তাকে এই গ্রামের দিকে এক বিঘত নিকটে পাওয়া গেল। তাই তাকে মাফ করে দেওয়া হলো'। -(মিশকাত হা/২৩২৭)

(গ) মীযানের দাড়িপাল্লায় সবচেয়ে বেশি ওজন হবে বিশুদ্ধ আক্বীদা ঃ ক্বিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তাআলা আক্বীদার সাক্ষ্য প্রদানকারীকে পুরস্কৃত করবেন। সবচেয়ে ওজনে ভারী হবে এই আক্বীদা ঘোষণাকে। হাদীছে এসেছে, 'আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাজিআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন এমন এক ব্যক্তিকে জনসম্মুখে উপস্থিত করা হবে, যার আমলনামার ৯৯টি ভলিয়ম থাকবে। প্রতিটি ভলিয়ম চোখের দৃষ্টি যত দূর যাবে ততদূর পর্যন্ত লম্বা হবে। অতঃপর মহান আল্লাহ তাকে বললেন, তুমি কি এর কোন একটিকে অস্বীকার করতে পারবে ?

অথবা আমার ফেরেশতারা কি তোমার উপর কোন জুলুম করেছে ? সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! না। মহান আল্লাহ বললেন, তোমার পক্ষ থেকে কোন ওজর আছে কি ? সে বলবে, না। তখন মহান আল্লাহ বলবেন, তোমার একটি নেকী আমার কাছে সংরক্ষিত আছে। তুমি নিশ্চিত জেনে রাখ যে, তোমার প্রতি আজ কোন জুলুম করা হবে না'।

এরপর একটুকরা কাগজ বের করা হবে যাতে লেখা আছে- **"আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু** অর্থাৎ 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মহান আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা মহান আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল'। অতঃপর মহান আল্লাহ তাকে বললেন, তোমার আমলের ওজন দেখার জন্য বের হও। তখন বান্দা বলবে, ঐ সমস্ত বড় বড় দফতরের তুলনায় এই এক টুকরা কাগজের কোন মূল্য আছে কি ? তখন মহান আল্লাহ বলবেন, তোমার উপর কোন জুলুম করা হবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেন, অতঃপর ঐ দফতরগুলো এক পাল্লায় রাখা হবে আর এই কাগজের টুকরাটি এক পাল্লায় রাখা হবে। তখন দফতরগুলোর পাল্লা হালকা উপরে উঠে যাবে আর কাগজের পাল্লা ভারী হয়ে নীচে নেমে যাবে। ঃ মহান আল্লাহর নামের সাথে অন্য কোন জিনিস ওজনে ভারী হতে পারে না। - (মিশকাত হা/৫৫৫৯; সনদ ছহীহ)। সুলায়মান ইবনু ইয়াসার রাজিআল্লাহু আনহু আনছারী এক ছাহাবী থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেন, নূহ আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা তাঁর ছেলেকে বলেন, আমি তোমাকে একটি বিষয়ে অছিয়ত করছি। তুমি তাকে সংরক্ষণ করবে, যেন তুমি তাকে ভুলে না যাও। দু'টি বিষয় তোমাকে আঁকড়ে ধরার জন্য অছিয়ত করছি এবং দু'টি বিষয় থেকে নিষেধ করছি। এমন বিষয়ে তোমাকে অছিয়ত করতে চাচ্ছি, যার দ্বারা মহান আল্লাহ তাআলা সুসংবাদ দিয়েছেন এবং তাঁর সৃষ্টিকে সুন্দর করেছেন এবং যা মহান আল্লাহর উপর বেশি দায়িত্ব অর্পণ করেছে। তোমাকে **'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু'** বলার প্রতি অছিয়ত করছি। কারণ আসমান-জমিন যদি একাট্টা হয় তবুও তাকে ভেঙ্গে দিবে এবং যদি উভয়কে এক পাল্লায় তোলা হয় তবুও এটা ভারী হয়ে যাবে। তোমাকে **'সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহি'** বলার জন্য অছিয়ত করছি। কারণ এ দু'টি সৃষ্টি সবকিছুই মহান আল্লাহর পবিত্রতাসহ তাসবীহ গণনা করে। কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহ বুঝতে পার না। আর তোমাকে এমন দুটি বিষয় থেকে নিষেধ করছি, যা থেকে মহান আল্লাহ নিজেকে আড়ালে রাখেন এবং সৃষ্টিকে হেফাযত

করেন। সে দুটি হলো, **(এক) শিরক ও (দুই) অহংকার**। (আত-তারগীব হা/১৫৪৩)। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها فى السماء – تؤتى اكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون – ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الاخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء -

অর্থাৎ 'আপনি কি লক্ষ্য করেননি মহান আল্লাহ কিভাবে উপমা দিয়ে থাকেন ? সৎ বাক্যের তুলনা উৎকৃষ্ট বৃক্ষ-যার মূল সুদৃঢ় ও শাখা-প্রশাখা ঊর্ধ্বে বিস্তৃত, যা প্রতি মুহূর্তে ফল দান করে থাকে তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। আর মহান আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা এই জন্য দেন, তারা যেন শিক্ষা অর্জন করে। কুবাক্যের তুলনা এক মন্দ বৃক্ষ, যার মূল ভূ-পৃষ্ঠ হতে বিচ্ছিন্ন, যার কোন স্থায়িত্ব নেই। যারা বিশ্বাসী মহান আল্লাহ তাদের দুনিয়া ও পরজীবনে শাশ্বত বাণী দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন এবং যারা জালেম মহান আল্লাহ তাদেরকে বিভ্রান্তিতে রাখেবেন। মহান আল্লাহর যা ইচ্ছা তাই করেন' *(ইবরাহীম-২৪-২৭)। (পরকালের পাথেয়-৭ম খন্ড, পৃ: ৩৯৩-৪০৩)*

কালেমা তাইয়েবা

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ

মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সত্যিকারের সার্বভৌমত্বের মালিক নয়, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা আল্লাহর রাসূল।

কুফর ও কুফরের প্রকারভেদ

'কুফর ও এর প্রকারভেদ ঈমানের বিপরীত হলো কুফর। আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা বলেন,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ -

"দীন গ্রহণের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই। নিশ্চয় হিদায়াত স্পষ্ট হয়েছে ভ্রষ্টতা থেকে অতএব, যে ব্যক্তি তাগূতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই সে মজবুত রশি আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" (সূরাহ আল-বাক্বারাহ ঃ ২৫৬)

মহান আল্লাহ ছাড়া আর যার পূজা করা হয়, তাকে তাগূত বলে। উল্লিখিত আয়াতে কারীমায় আগে সকল প্রকার তাগূতকে অস্বীকার করতে এবং পরে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে বলা হয়েছে। এখানে তাগূতকে অস্বীকার করতে বলার অর্থ তাগূতের সাথে কুফরি করার নির্দেশ। এই নির্দেশের আলোকে আমরা ঈমান আনয়নের শুরুতেই তাওহীদের বাণী পড়ে থাকি, আর তা হলো, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই। শব্দগুচ্ছ দ্বারা প্রথমেই আমরা সকল প্রকার তাগূতের সাথে কুফরি করে থাকি, অতঃপর শব্দগুচ্ছ দ্বারা একমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমান আনি। সুতরাং ঈমান ও কুফর দুটি বিপরীত বিষয় এবং এ দুটো অতি সূক্ষ্মভাবে পাশাপাশি অবস্থান করে। তাই 'ঈমান' বোঝার জন্য কুফর বুঝা এবং 'কুফর' বোঝার জন্য 'ঈমান' বুঝা প্রয়োজন। 'কুফর ও এর প্রকারভেদ। কুফর (আল কুফরু) শব্দের অর্থ- অস্বীকার করা, গোপন করা, আবৃত করা, লুকিয়ে রাখা, অবিশ্বাস করা ইত্যাদি। যেমন কুফর শব্দটির শুধুমাত্র শাব্দিক অর্থকে প্রাধান্য দিয়ে আরবীতে একজন কৃষককে কাফির (আবৃতকারী) বলা হয়। কেননা কৃষক বীজকে মাটি দ্বারা আবৃত করে রাখেন। তবে ইসলামী পরিভাষায় কুফর হলো, জিদ্দাল ঈমানী অর্থাৎ ঈমানের বিপরীত। ঈমানের ছয়টি রুকনের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করাকে ঈমান বলে। সুতরাং এ ছয় রুকনের কোনটির প্রতি বিন্দুমাত্র অস্বীকৃতিই হলো কুফর। ইসলামী শরী'আতে কুফর দুই প্রকার। সেগুলো হলো :

(১) আল-কুফরুল আকবার তথা বৃহত্তর কুফর : কুফর আকবারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়। সে একজন প্রকৃত কাফিরে পরিণত হয়। ফলে তার সকল আমল বরবাদ হয়। তার পরিণতি হয় স্থায়ী জাহান্নাম ।

(২) আল-কুফরুল আসগার তথা ক্ষুদ্রতর কুফর : কুফর আসগারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় না। সে সম্পূর্ণ কাফির হয় না। তার আমল বরবাদ হয় না। তবে সে পাপী ও শাস্তিযোগ্য অপরাধী।

আল-কুফরুল আকবার পাঁচ প্রকার। সেগুলো হলো :

(১) মহান আল্লাহর প্রতিপালনের একত্বে অবিশ্বাস বা কুফরি (আল কুফরু বিত্ তাওহীদুর রুবুবিইয়্যাহ) : তাওহীদের প্রথম পর্যায় হলো তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ। ক্ষমতা, সৃষ্টি, প্রতিপালন, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে মহান

আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস স্থাপন করাই হলো তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ। সুতরাং এ সকল বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় হওয়ার ব্যাপারে সামান্যতম অবিশ্বাস, অস্বীকার, দ্বিধা ও সন্দেহ করাই হলো কুফরি, যেমন- মহান আল্লাহর অস্তিত্বে, সৃষ্টিতে বা ক্ষমতায় অবিশ্বাস করা, অন্য কাউকে অংশীদার মনে করা, সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর একত্বের ব্যাপারে আংশিক বিশ্বাস ও আংশিক অবিশ্বাস করা ইত্যাদি। এর সবই আল-কুফরু বি-তাওহীদির রুবূবিয়্যাহ ।

(২) মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলির একত্বে অবিশ্বাস (আল কুফরু বি ওয়াহিদীল আসমায়ি অস সিফাতি) : তাওহীদের দ্বিতীয় পর্যায় হলো, তাওহীদুল আসমায়ি ওয়াস-সিফাত অর্থাৎ মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলির একত্ব। সুতরাং মহান আল্লাহ তাঁর যে সকল নাম ও গুণাবলি আমাদেরকে জানিয়েছেন, সেগুলোর কোনটির ব্যাপারে সামান্যতম অবিশ্বাস, অস্বীকার ও সন্দেহ করা, সেগুলোকে তাঁর কোন সৃষ্টির সাথে তুলনা করা, এসবই আল-কুফরু বিত-তাওহীদুল আসমায়ি ওয়াস সিফাত। যেমন- মহান আল্লাহর 'ইলম (ইলমুল্লাহি) আসমান, জমিন ও তাঁর সমস্ত মাখলুক্বাত ব্যাপী বেষ্টিত । তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী। কোন কিছুই তাঁর জ্ঞানের ঊর্ধ্বে নয়। আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা বলেন, - عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ "তিনি গাইব ও প্রকাশ্যের জ্ঞানী, মহান, সর্বোচ্চ।" (সূরাহ আর-রাদ : ৯)

সুতরাং তাঁর একটি নাম হলো, আল-'আলীম তথা সর্বজ্ঞ। এক্ষেত্রে তাঁর এ নামের ব্যাপারে সামান্যতম অবিশ্বাস, অস্বীকার ও সন্দেহ পোষণ করা কুফরি। তিনি ছাড়া আর কেউ গাইবের খবর জানেন না। কোন নবী-রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা গাইবের খবর জানেন না। সুতরাং তাঁর অদৃশ্য জ্ঞানের সাথে অন্য কাউকে শরীক করা কুফরি।

মহান আল্লাহর একটি নাম হলো, আল-ক্বাদির তথা সর্বশক্তিমান, মহা ক্ষমতাধর। সুতরাং তাঁর কুদরতের ব্যাপারে ন্যূনতম অবিশ্বাস করা, অস্বীকার করা, সন্দেহ করা, কোন সৃষ্টির সাথে তুলনা করা এবং কাউকে শরীক করা কুফরি।

মহান আল্লাহর বাণী (কালামুল্লাহি) তথা কুরআন মহান আল্লাহর একক সত্তার অংশ। কুরআনুল কারীমে বর্ণিত প্রতিটি হুকুম, আইন বা বিধানের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর প্রণীত আইনের বিপরীতে অন্য কারো

আইন প্রণয়নের ক্ষমতা বা অধিকার নেই। সুতরাং মহান আল্লাহ প্রণীত আইনের বিপরীতে অন্য কাউকে আইন প্রনয়নের অধিকার দেওয়া এবং অন্য কারো আইন প্রনয়নের অধিকার আছে বলে মনে করা কুফরি। অনুরূপভাবে মহান আল্লাহর হাত, পা, চোখ, মুখমন্ডল ইত্যাদি তাঁর কোন সৃষ্টির সাথে তুলনীয় নয়। এক্ষেত্রেও তিনি একক ও অতুলনীয় সুতরাং মহান আল্লাহর হাত, পা, চোখ, মুখমন্ডল ইত্যাদিকে কোন সৃষ্টির সাথে তুলনা করা অথবা এগুলোকে অবিশ্বাস অস্বীকার বা সন্দেহ করা কুফরি।

মহান আল্লাহ কখনো ঘুমান না, তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, - لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ "তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না।" (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ২৫৫)

সুতরাং এক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র অস্বীকার, অবিশ্বাস ও সন্দেহ করা কুফরি । মহান আল্লাহর কোন মা-বাবা, স্ত্রী, সন্তান, ছেলেমেয়ে নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। ইয়াহুদীরা নবী উযাইর আলাইহিস সাল্লাম আত্-তাসলিমা-কে আল্লাহর ছেলে বলে দাবী করে এবং খ্রিষ্টানরা ঈসা আলাইহিস সাল্লাম আত্-তাসলিমা-কে আল্লাহর ছেলে বলে দাবী করে। তাদের উভয়টিই কুফরি। আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা এ প্রসঙ্গে বলেন,وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ - "আর ইয়াহুদীরা বলে, উযাইর আল্লাহর পুত্র এবং নাসারারা বলে মাসীহ আল্লাহর পুত্র। এটা তাদের মুখের কথা। তারা সেসব লোকের কথার অনুরূপ বলছে, যারা ইতঃপূর্বে কুফরি করেছে। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন, কোথায় ফেরানো হচ্ছে এদেরকে?" (সূরাহ আত-তাওবাহ : ৩০) খ্রীষ্টানরা মারিয়াম আলাইহিস সাল্লাম-কে আল্লাহর স্ত্রী সাব্যস্ত করে থাকে। মুশরিক্বরা ফেরেশ্তাদের আল্লাহর মেয়ে বলে দাবি করে। মুসলিমদের মধ্যে যারা গোমরাহিতে লিপ্ত তারা ওলি- আওলিয়াদের আল্লাহর সহযোগী মনে করে। এগুলো সবই 'আল-কুফরু বি-তাওহীদিল আসমায়ি ওয়াস সিফাত' এর অন্তর্ভুক্ত।

(৩) মহান আল্লাহর ইবাদাতের একত্বে অবিশ্বাস (আল কুফরু বি তাওহীদিল ইবাদাতি) : তাওহীদের চূড়ান্ত প্রকার হলো তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ বা তাওহীদুল ইবাদাহ। ইবাদাত পাওয়ার একমাত্র হক্বদার হলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। মহান আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদাত করা বা

ইবাদাতের হক্বদার মনে করা কুফরি। একইভাবে মহান আল্লাহর ইবাদাতের একত্বে অবিশ্বাস করা, অস্বীকার করা, সন্দেহ করা এবং নিজেদের মনগড়া ইবাদাত তৈরী করে নেওয়া বা মনগড়া ইবাদাতকে ইবাদাতের সাথে মিশ্রিত করে নেওয়া কুফরি, এগুলোকে আল-কুফরু বি-তাওহীদিল ইবাদাহ বলা হয়।

(৪) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এর রিসালাতে অবিশ্বাস (আল কুফরু বি রিসালাতি মুহাম্মাদ): ঈমানের অবিচ্ছেদ্য মৌলিক অংশ হলো মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-কে মহান আল্লাহ প্রেরিত শেষ নবী ও রাসূল হিসেবে মেনে নেওয়া এবং অআশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অরাসূলুহ অর্থাৎ 'আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা আল্লাহর বান্দা ও রাসূল' -এরূপ সাক্ষ্য প্রদান করা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর ব্যক্তিত্ব, রিসালাত, মর্যাদা, মহত্ব, তাবলীগের পূর্ণতা, নবুওয়াতের পূর্ণতা, বিশ্বজনীনতা ও পরিসমাপ্তি এবং তাঁর কথা, কর্ম অনুমোদন ও মৌন সম্মতি ইত্যাদির কোনটিতে বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস, অস্বীকৃতি ও সন্দেহ পোষণ করা নিঃসন্দেহে কুফরি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর উপর অবতীর্ণ কুরআনুল কারীমের প্রতিটি আয়াত মুতাওয়াতির পর্যায়ে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। সহীহ সুন্নারও কিছু সংখ্যক হাদীস রয়েছে যা মুতাওয়াতির মুতাওয়াতির বৃহৎ সংখ্যক রাবীর বর্ণিত হাদীস, মিথ্যার ব্যাপারে যাদের উপর একাট্টা হওয়া অসম্ভব, নদের শুররু থেকে শেষ পর্যন্ত এ সংখ্যা বিদ্যমান থাকলে হাদীসকে মুতাওয়াতির বলা হয় পর্যায়ের। কুরআনুল কারীমের কোন আয়াত, বিধান বা শিক্ষা এবং মুতাওয়াতির পর্যায়ের হাদীসগুলোর কোনটির ব্যাপারে সামান্যতম অবিশ্বাস, অস্বীকার সন্দেহ পোষণ করা কুফরি। তবে অন্যান্য সহীহ ও হাসান পর্যায়ের হাদীসগুলোর ব্যাপারে কেউ যদি অবিশ্বাস, অস্বীকার বা সন্দেহ পোষণ করেন, তবে তাকে কাফির বলা যায় না তবে সে নিঃসন্দেহ গোমরাহ বা পথভ্রষ্ট।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর মাধ্যমে আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা দীনকে কিয়ামত পর্যন্ত পূনাংগ করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর পর

আর কোন নবী রাসূল আসবেন না। পূর্ণাঙ্গ দীনুল ইসলামের মধ্যে আর কোন ধরণের সংযোজন বিয়োজনের সুযোগ নেই। আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা এ প্রসঙ্গে বলেন, - الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দীন হিসেবে পছন্দ করলাম । (সূরাহ আল-মায়েদাহ : ৩)

সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর আগমনের মধ্য দিয়ে নবুওয়াতের ধারা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেছে। কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় যদি মনে করেন যে, নবুওয়াতের ধারা বন্ধ হয়নি, নবী রাসূলগণ আরোও আসবেন, তবে সকল উলামায়ে কিরামগণের ঐক্যমতে তারা কাফির। যেমন- কাদিয়ানি সম্প্রদায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে যাননি এবং তিনি যুগে যুগে ওলি-আওলিয়াদেরকে শরী'আতের বিভিন্ন আমল ও দিকনির্দেশনা কাশফ, ইলহাম, ইলকা ও স্বপ্নযোগে পৌঁছিয়ে থাকেন, এ ধরণের বিশ্বাস পোষণ করা কুফরি। এ ধরণের বিশ্বাস পোষণের মাধ্যমে এটাই প্রতিয়মান করা হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর প্রতি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুওয়াতের যে আমানত ছিল, তিনি তা সঠিকভাবে পৌঁছাননি বরং গোপন করেছেন, যা ওলি-আওলিয়াদের মাধ্যমে পরবর্তীতে তিনি পৌঁছিয়েছেন, নাউযুবিল্লাহ। এটি একটি অপবাদ। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বিদায় হজ্জের দিন সাহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু থেকে দীন পূর্ণাঙ্গ হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য গ্রহণ করেছিলেন এবং সেদিন তিনি স্বয়ং আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লাহকে এ ব্যাপারে সাক্ষী করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে, তোমরা সতর্ক থাকো। আজকের এ দিনের মত, এ শহরের মতো এবং এ মাসের মতো আল্লাহ তা'আলা তোমাদের রক্তকে ও তোমাদের সম্পদকে তোমাদের উপর হারাম করেছেন। বল তো, আমি কি আল্লাহর পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি। সমবেত সকলে বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহুম্মা আশহাদ হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন। এ কথা তিনবার বললেন (তারপর বললেন) তোমাদের জন্য পরিতাপ অথবা তিনি বললেন, তোমাদের জন্য আফসোস, সতর্ক থেকো, আমার পরে তোমরা কুফরের দিকে ফিরে যেয়ো না যে, একে

অন্যের গর্দান মারবে।" সহীহুল বুখারী (তাওহীদ, hadithbd.com), হা/৪৪০৩

শরী'আতের কোন বিধান কিভাবে পালিত হবে তা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সুনির্ধারিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা আল্লাহর দীনের ব্যাপারে যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আমাদের জানিয়েছেন, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। দীনের বিধানগুলো বিশেষত যেগুলো মুতাওয়াতির পর্যায়ে প্রমাণিত, সেগুলোর কোনটিতে অবিশ্বাস, অস্বীকার ও সন্দেহ পোষণ করা কুফরি। যেমন- সালাত, যাকাত, সিয়াম ইত্যাদির ফরয হওয়া অস্বীকার করা, সালাতের তাহারাত, রাকা'আত, রুকু, সিজদা, বৈঠক ইত্যাদির পদ্ধতি অস্বীকার ও ব্যতিক্রম করা, সকল প্রকার যিনা, ব্যভিচার, চুরি, ডাকাতি, হত্যা, সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি ইত্যাদি হারাম হওয়ার ব্যাপারে অস্বীকার করা, কোন হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল মনে করা ইত্যাদি। তবে কেউ যদি অজ্ঞতাবশত এগুলোকে অবিশ্বাস, অস্বীকার বা সন্দেহ করে থাকে, তবে তা ওযর হিসেবে গৃহিত হবে। আর মতভেদপূর্ণ বিষয়ে কেউ দ্বিমত পোষণ করলে তা কুফর হিসেবে গৃহিত হবে না ।

(৫) সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির কুফর (আল কুফরু বির রিজা অল বারাআতি) : কোন প্রকার কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা কুফরি। তেমনি দীনুল ইসলামের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকাও কুফরি। এর চারটি ধরণ রয়েছে। আমরা এর প্রথমটি এখন আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ।

এর প্রথম ধরণটি হলো মহান আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানকে অপছন্দ করা (আল কুফরু বিমা আনজালাল্লাহু তা'আলা)। ঈমান হলো মহান আল্লাহর সকল বিধানের প্রতি সন্তুষ্টি। আর কুফর হলো মহান আল্লাহর কোন একটি বিধানের প্রতি অসন্তুষ্টি। আল্লাহ সুবহানাহু ও তা'আলার নাযিলকৃত শরী'আতের যতগুলো বিধান আছে, এ বিধানগুলোর কোনটিতে অসন্তুষ্টি পোষণকারী কাফির সাব্যস্ত হবেন। আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা আমাদের জন্য কুরআন নাযিল করেছেন। এতে রয়েছে পর্দা, সালাত, যাকাত, সিয়াম, যিকর ইত্যাদির বিধানাবলী। আরো রয়েছে হুদূদ, যেমন- যিনাকারী, চোর-ডাকাত, মদ পানকারী, সালাত পরিত্যাগকারী প্রমুখ ব্যক্তিদের অপরাধের শাস্তির বিধানাবলী। কিসাস যেমন- হত্যার পরিবর্তে হত্যার বিধানও এতে রয়েছে। এসব কিছুকে সেকেল, মানবতা বিবর্জিত, অসভ্য বা অপ্রয়োজনীয় আইন মনে

করা এবং এগুলোতে অসন্তুষ্টি পোষণ করা কুফরি অনুরূপভাবে আল্লাহর আইনের বিপরীতে মানুষের মনগড়া মতবাদ যেমন- জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ইত্যাদির প্রতি সন্তুষ্টি পোষণ করাও কুফরি। আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা বলেন وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ - ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ - "আর যারা কুফরি করে তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস এবং তিনি তাদের আমলসমূহ বা করে দিয়েছেন। তা এজন্য যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তারা তা অপছন্দ করে। অতএব তিনি তাদের আমলসমূহ ব্যর্থ করে দিয়েছেন ।" (সূরাহ মুহাম্মাদ : ৮-৯)

দুঃখজনক হলো আমাদের সমাজে কিছু মানুষ এমন রয়েছে যারা ঈমান-একীনের কথা বলে, আবার মানুষকে মানুষের বানানো কুফরি মতবাদগুলোর প্রতি আহ্বান করে। এটা হলো কুফরির সাথে ঈমানের মিশ্রণ। আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা আমাদের সবাইকে এর থেকে হিফাযাত করুন।

আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা আমাদের সবাইকে কুফরমুক্ত তাওহীদবাদী ঈমানদার হওয়ার আওফীক্ব দান করুন। ঈমানের সাথে জীবনযাপন করার তাওফীক্ব দান করুন। কুফরমুক্ত হয়ে ঈমানের উপর সালেছে কদম থাকার তাওফীক্ব দান করুন। আমীন! ইয়া রব্বাল আলামীন!

আল-ঈমান অর্থ দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। ঈমানের মৌলিক সংজ্ঞায় তিনটি উপাদান রয়েছে। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের দৃষ্টিতে এগুলো হলো,

(১) অন্তর বা ক্বালবের দ্বারা বিশ্বাস স্থাপন করা (আত তাসদীকু বিল ক্বালবি)। একে আত তাসদীকু বিল-জিনান ও বলা হয়। বিশ্বাসের স্থান হলো, ক্বালব বা হৃদয়। সুতরাং ক্বালবের বিশ্বাস ব্যতীত ঈমান সত্যায়ন হয় না।

(২) মৌখিক সাক্ষ্য বা স্বীকৃতি দেওয়া (আন নুতক্বু বিস শাহাদাতি)। ঈমান কেবল অন্তরে লুকিয়ে রাখলে তা অর্জিত হয় না। বরং সাথে সাথে এর স্বীকৃতি দেওয়াও অপরিহার্য।

(৩) বিশ্বাসকৃত বিষয় তথা ঈমানকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা কার্যক্রমের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা (আল আমালু বিল জাওয়ারিহী)। একে ইসলামের আরকানগুলোর বাস্তবায়ন তথা আল-'আমালু বিল-আরকানও বলা হয়।

কারো মধ্যে ঈমানের এ তিনটি স্তরের কোন একটি স্তর অনুপস্থিত থাকলে তিনি পরিপূর্ণ মু'মিন নন। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মতে, উল্লিখিত তিনটি বিষয়ের প্রথম দুটি বিষয়ে সামান্যতম ঘাটতি থাকলে তার ঈমান থাকে না এবং তৃতীয় বিষয়টি প্রথম দুটি বিষয়ের শর্তস্বরূপ। অতএব, কেউ যদি তৃতীয় বিষয়টির সামান্যতম ঘাটতি করেন, তবে তিনি কাফির হবেন না, তবে একে অস্বীকার করলে ঈমান থাকবে না। অর্থাৎ তৃতীয় বিষয় তথা আল-'আমলু বিল জাওয়ারিহ বা আল-'আমলু বিল আরকান প্রথম দুটি বিষয়ের পরিপূরক।

সকল যুগের মতই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর যুগেও উল্লিখিত তিনটি বিষয়ের উপর আমল পরিত্যাগকারী তিন ধরণের মানুষ ছিল। তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণি হলো- যারা অন্তরে বিশ্বাস করেনি, মুখে সাক্ষ্য দেয়নি এবং এর উপর আমলও করেনি। এরা হলো কাফির। দ্বিতীয় শ্রেণি হলো- যারা অন্তরে বিশ্বাস করেছে কিন্তু মুখে সাক্ষ্য দেয়নি। যেমন, আবূ তালিব। আবূ তালিব জানতেন যে ইসলাম সত্য এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, কিন্তু তিনি এর মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করেনি। তার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা তাকে কালেমা 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু' পাঠ করতে উদ্বুদ্ধ করলে তিনি তার সর্বশেষ সিদ্ধান্ত জানিয়ে ছিলেন যে- আনা আলা মিল্লাতি আবদিল মুত্তালিব "আমি আবদুল মুত্তালিবের ধর্মের উপর অবিচল রয়েছি" সহীহুল বুখারী (hadithbd.com), হা/১৩৬০; সহীহ মুসলিম (হাদীস একাডেমী, hadithbd.com), হা/৩৯। অর্থাৎ তিনি মুখে স্বীকৃতি না দেওয়ার কারণে ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেননি।

তৃতীয় শ্রেণি হলো- যারা অন্তরে বিশ্বাস করেনি তবে মু

খ স্বীকৃতি দিয়েছে এবং আমলও করেছে। এরা হলো মুনাফিক্ব। আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা তাদের সম্পর্কে বলেন, إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ - "যখন তোমার কাছে মুনাফিক্বরা আসে, তখন বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহ জানেন যে, অবশ্যই তুমি তাঁর রাসূল। আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, অবশ্যই মুনাফিক্বরা মিথ্যাবাদী।" (সূরাহ আল-মুনাফিকুন : ১)

আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা তাদের সম্পর্কে অন্যত্র আরো বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ -

"আর মানুষের মধ্যে কিছু এমন আছে, যারা বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি', অথচ তারা মুমিন নয়।" (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ৮)

অতএব, এ তিনটি বিষয় সহকারে পরিপূর্ণ ঈমান আনয়ন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । তন্মধ্যে মুখে সাক্ষ্য প্রদান করা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। সর্বোত্তম কথা হলো নিজেকে মুসলিম হিসেবে ঘোষণা করা। তাই, অন্তরের ঈমানের সাক্ষ্য মুখে প্রদানের শিক্ষা দিয়ে আল্লাহ "আযযা ওয়া জাল্লা বলেন, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ - "আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম, যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, অবশ্যই আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত?" (সূরাহ ফুসসিলাত : ৩৩)

অর্থাৎ সে নিজেকে মুসলিম হিসেবে সাক্ষ্য দেয়। অতএব, যিনি সর্বদা নিজের ঈমানকে গোপন করেন এবং নিজেকে মুসলিম দাবি করতে ভয় পান, তিনি প্রকৃত ঈমানদার নন । ঈমান লুকিয়ে রাখার বিষয় নয়, বরং এটি প্রকাশ করতে হবে। এটিই আল্লাহর নির্দেশা ইসলামের পাঁচটি ভিত্তির প্রথম ভিত্তি হলো নিজের অন্তরের ঈমানের সাক্ষ্য প্রদান করা প্রসঙ্গে ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেন, "পাঁচটি বিষয়ের উপর ইসলামের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা তাঁর বান্দা ও রাসূল এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেয়া, বাইতুল্লাহর হজ্জ করা ও রমাযানের সিয়াম পালন করা। সহীহুল বুখারী, হা/৮; সহীহ মুসলিম, হা/ ২১।

তিনি অন্যত্র আরো বলেন, "ইসলাম হচ্ছে এই- তুমি সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন ইলাহ (মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, রমাযানের সিয়াম পালন করবে এবং যদি পথ অতিক্রম করার সামর্থ্য হয় তখন বাইতুল্লাহর হজ্জ করবে।" সহীহুল বুখারী, হা/৪৭৭৭; সহীহ মুসলিম, হা/১; আবূ দাউদ (তাহকীককৃত, hadithbd.com), হা/৪৬৯৫।

আমরা বুঝতে পারলাম যে, 'শাহাদাহ' তথা সাক্ষ্য প্রদান করা ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এটি ইসলামের প্রথম রুকন। 'শাহাদাহ' তথা সাক্ষ্য প্রদান করতে হয় ঈমানের দুটি অংশের উপর। সেগুলো হলো-

(১) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ।

(২) মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ।

এর ভিত্তিতে আহলুল ইলমগণের মতে, তাওহীদের দুটি রুকন রয়েছে, যার একটি অপরটির পরিপূরক। আর তাহলো-

(১) তাওহীদুল ইবাদাহ। একে তাওহীদুল মা'বূদও বলা হয়। অর্থাৎ মহান আল্লাহকে এক জেনে কেবলমাত্র তাঁরই ইবাদাত করা । যদি কেউ মা'বূদের ইবাদাত থেকে বিচ্যুত হয়ে সামান্য ডানে-বামেও চলে যায়, তবে মা'বূদের প্রতি তার ইবাদাতগুলোকে সে নষ্ট করল। তাওহীদের এ রুকনটি শাহাদাহর প্রথম অংশ তথা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' থেকে উদগত হয়েছে।

(২) তাওহীদু-তরীক্বাতিল ইবাদাহ। অর্থাৎ ইবাদাতের তরীক্বাহ বা পদ্ধতিগত তাওহীদ। এ তরীক্বাহ হতে হবে কেবলমাত্র তরীক্বাতু মুহাম্মাদির রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এর তরীক্বাহ'। একে আল-ইত্তেবা ওবলা হয়। এটি শাহাদাহর দ্বিতীয় অংশ তথা 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' থেকে উদগত হয়েছে। এ একটিমাত্র তরীক্বাহর বাইরে কোন তরীক্বাহর ইবাদাত আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন কবুল করেন না। আজ আমাদের মধ্যে বহু মুসলিম তরীক্বাহর তাওহীদ না বোঝার কারণে বিভিন্ন তরীক্বাহর ইবাদাত করেও তারা মনে করেন যে, তাদের ইবাদাত ঠিক আছে। আল্লাহর দরবারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এর তরীক্বাহই গ্রহণযোগ্য। বিভিন্ন তরীক্বাহর ইবাদাতগুলো আমাদের ইত্তেবার তাওহীদ নষ্ট করে দেয়। আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এর অনুসরণের নির্দেশ দিয়ে বলেন قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ - "বল, "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরাহ আলে-ইমরান : ৩১)

তাওহীদের এ দুটি রুকন মেনে নেওয়ার কিছু শর্ত রয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম রুকন তথা তাওহীদুল ইবাদার শর্ত হলো ৯টি এবং দ্বিতীয় রুকন তথা তাওহীদু তরীক্বাতিল ইবাদার শর্ত হলো ৮টি। আমরা এখন তাওহীদের প্রথম তথা তাওহীদুল ইবাদার ৯টি শর্ত সম্পর্কে আলোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ। **তাওহীদের সাক্ষ্যদানের প্রথম শর্ত হলো আল-ইলমুল মুনাফীলিল জাহল** এমন জ্ঞান যা দ্বারা অজ্ঞতা দূরীভূত হয়ে যায়। এটি হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর ইলম। যদি কারো দুনিয়ার হাজারো জ্ঞান অর্জিত হয় এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর জ্ঞান অর্জিত না হয়, তবে তাকে কুরআন ও সুন্নার দৃষ্টিতে জ্ঞানী বলা যায় না। যেমন, আবূ জাহল তৎকালীন সময়ের জ্ঞানী ব্যক্তিদের একজন হলেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা তাকে 'আবূ জাহল' তথা 'অধিক মূর্খ বা মূর্খের' নামে আখ্যায়িত করেছেন। কেননা সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর তাৎপর্য বুঝেনি। 'লা ইলাহা ইলাল্লাহু এর সাক্ষ্য দিতে হবে ইলম সহকারে। এটি ফরযে আইন। কেননা 'লা ইলাহা ইলহা পাঠ করার সাথে সাথে পাঠকারীর উপর ইসলামের ফরয-ওয়াজিব, হালাল-হারাম ইত্যাদি বিধিবিধান কার্যকর হয়ে যায়। তাই যদি তার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' -এর জ্ঞান না থাকে তবে সে ঈমান আনয়নের পর অজ্ঞতার কারণে বিভিন্ন প্রকার শির্ক, বিদ'আত ও ভ্রষ্টতায় নিপতিত হয়। সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সাক্ষ্য দিয়েও কবরে গিয়ে সিজদা করে, মান্নত করে, গরু, ছাগল, খাসি, মুরগি নিয়ে মাজারের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়, উৎসর্গ করে ইত্যাদি। তাই আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর ইলম অর্জনের নির্দেশ দিয়ে বলেন, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ - এবং জেনে রাখো, নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তুমি ক্ষমা চাও তোমার ও মুমিন নারী-পুরুষদের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য।" (সূরাহ মুহাম্মাদ : ১৯) যে ব্যাক্তি ইল্ম সহকারে বলবে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। 'উসমান রাজি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন, (মান মাতা ওয়াহুওয়া ইয়া'লামু আন্নাহু লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু দাখালাল জান্নাতা)

'যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো যে, সে জানে মহান আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (সহীহ মুসলিম, হা/৪৩)

আহলুল ইলমগণ বলতেন, **আউওয়ালু ওয়া জিবীন আলাল আবিদি মারিফাতির রহমানি বিত্ তাওহীদ** অর্থাৎ "মহান আল্লাহর একজন বান্দার উপর সর্বপ্রথম ফরয হলো তাওহীদ সহকারে রাহমানকে জানা।"

তাওহীদের সাক্ষ্যদানের দ্বিতীয় শর্ত হলো, আল-ইয়াক্বীন আল-মুনাফী লিল-শাক্ব) অর্থাৎ এমন ইয়াকিন তথা বিশ্বাস যা দ্বারা সন্দেহ দূরীভূত হয়ে যায়। ইয়াক্বীন (আল ইয়াক্বিন) অর্থ দৃঢ় বিশ্বাস, সর্বান্তকরণে বিশ্বাস ইত্যাদি। অন্তরের বড় একটি রোগ হলো শাক্ব তথা সন্দেহের রোগ। অতএব অন্তরের যাবতীয় সন্দেহকে দূর করে দেওয়াই হলো তাওহীদুল ইবাদার দ্বিতীয় শর্ত। আমাদের সমাজের মধ্যে কেউ কেউ 'লা ইলাহা ইল্লাহ'-এর সাক্ষ্য দেন, সাথে সাথে অন্তরে বিভিন্ন সন্দেহও লালন করেন। যেমন কেউ কেউ একথা অন্তরে লালন করেন যে, "কবরে আযাব হয় শুনেছি, কিন্তু হয় কি হয় না তা ঠিক নেই, কেননা অনেককেই তো কবর দিলাম, কিন্তু কবরে আযাব হতে তো দেখলাম না নাউযুবিল্লাহ। কেউ আবার সুদ খাবেন কি খাবেন না, তা নিয়ে সন্দেহের মধ্যে থাকেন। তারা যুক্তি দেন যে, "কয়দিন খাই এরপর বয়স হলে না হয় তওবা করে নিব অর্থাৎ সুদ খেলে যে পরকালে শাস্তি হবে, তা তার ভালোভাবে বিশ্বাস হচ্ছে না। অথচ সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহুম 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর সাক্ষ্য প্রদানের পর চব্বিশ ঘন্টা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত থাকতেন। অর্থাৎ তাঁদের ঈমান ছিল ইয়াকিনের ভিত্তিতে, তাদের অন্তরে কোন সন্দেহ ছিল না। আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা এ প্রসঙ্গে বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - "মুমিন কেবল তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর সন্দেহ পোষণ করেনি।" (সূরাহ আল-হুজুরাত : ১৫)

তাওহীদের সাক্ষ্যদানের তৃতীয় শর্ত হলো আল-ক্বাবূল আল-মুনাফীয়্যু লির-রাদ্দি অর্থাৎ এমন কবূল যা প্রত্যাবর্তনকে প্রত্যাখ্যান করে। অর্থাৎ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-কে এমনভাবে কবুল করতে হবে যেন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর জন্য জীবনের জানমাল সবকিছু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হওয়া যায়। যেমনভাবে বাড়িঘর, সহায়-সম্পত্তি, সন্তান-সন্ততি সব বিসর্জন দিয়ে সাহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহুম 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এর নির্দেশে হিজরত করে মদীনায় চলে গিয়েছিলেন। যেমনভাবে তাঁরা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর জন্য

জানমাল নিয়ে বদরের যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা বলেন, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ - "আর তোমরা তোমাদের রবের অভিমুখী হও এবং তার কাছেই আত্মসমর্পণ কর ।" (সূরাহ আয-যুমার : ৫৪)

তিনি অন্যত্র আরো বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً - হে মুমিনগণ, তোমরা ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ কর।" (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ২০৮)

তাওহীদের সাক্ষ্যদানের চতুর্থ শর্ত হলো, আল-ইনক্বিয়াদ আল-মুনাফী লিল-তার্ক এমন ইনকিয়াদ তথা আত্মসমর্পন যা বর্জন করাকে প্রত্যাখ্যান করে। ইনকিয়াদ অর্থ গলায় বেড়ি বা শৃঙ্খল লাগানো। অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ইচ্ছা ও নির্দেশের উপর পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে শৃঙ্খলিত হওয়াই হলো ইনক্বিয়াদ। অর্থাৎ ঈমানদার হওয়ার পর নিজের সকল ইখতিয়ার আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ছেড়ে দিতে হবে। আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা এ প্রসঙ্গে বলেন, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا - "আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য নিজদের ব্যাপারে অন্য কিছু এখতিয়ার করার অধিকার থাকে না; আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।" (সুরাহ আল-আহযাব : ৩৬)

তিনি অন্যত্র আরো বলেন, إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ ۖ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ - "যখন তার রব তাকে বললেন, 'তুমি আত্মসমর্পণ কর'। সে বলল, 'আমি সকল সৃষ্টির রবের কাছে নিজকে সমর্পণ করলাম।" (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ১৩১)

যদি কেউ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু'-এর সকল হুকুম আহকাম মাথা পেতে নেন, তবে তার শেষ কালেমা হতে পারে এটিই। মু'আয ইবনু জাবাল রাযিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন, মান কানা আখিরু কালামিহী লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু দাখালাল জান্নাতা অর্থাৎ "যার সর্বশেষ বাক্য হবে "লা

ইলাহা ইল্লাল্লাহ", সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সুনান আবূ দাউদ, হা/৩১১৬; শাইখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন ।

তাওহীদের সাক্ষ্যদানের পঞ্চম শর্ত হলো আস-সিদকুল মুনাফী লিল কাযিব অর্থাৎ আস-সিদক তথা সত্যবাদিতা, যা মিথ্যাকে প্রত্যাখ্যান করে। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর সাক্ষ্য দিতে হবে সত্যবাদিতার সাথে। যদি কারো মুখের সাক্ষ্য বিশ্বাস ও কর্মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, তাহলে তার ঈমান অর্জিত হয়নি। অতএব, কথায়, বিশ্বাসে ও আমলে অবশ্যই সত্যবাদী হতে হবে। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-এর সাক্ষ্যের সত্যবাদিতা জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিফলিত হতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, "হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।"

মুনাফিক্বরাও 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' -এর সাক্ষ্য দিত। তবে তাদের সাক্ষ্যে সত্যবাদীতা ছিল না, তাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি। আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা তাদের সম্পর্কে বলেন, إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ - "যখন তোমার কাছে মুনাফিক্বরা আসে, তখন বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহ জানেন যে, অবশ্যই তুমি তাঁর রাসূল। আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, অবশ্যই মুনাফিক্বরা মিথ্যাবাদী।" (সূরাহ আল-মুনাফিক্বুন : ১)

তাওহীদের সাক্ষ্যদানের ষষ্ঠ শর্ত হলো আল-ইখলাস আল-মুনাফী লিশ-শির্ক অর্থাৎ এমন ইখলাস তথা আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠতা, যা শির্ককে প্রত্যাখ্যান করে। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর সাক্ষ্য দিতে হবে ইখলাসের সাথে। এতে দুনিয়াবী কোন স্বার্থ হাসিল, লোক দেখানো বা ভিন্ন কোন উদ্দেশ্যে থাকবে না। ইখলাসের সাথে আল্লাহর সকল হুকুমকে মেনে নিয়ে তাওহীদ ও ইখলাসের ভিত্তিতে আল্লাহর ইবাদাত করাই হলো ঈমানের দাবী । আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা বলেন, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ - "আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ইবাদাত করে তাঁরই জন্য দীনকে একনিষ্ঠ করে" (সূরাহ আল-বায়্যিনাহ : ৫)

তাওহীদের সাক্ষ্যদানের সপ্তম শর্ত হলো আল-ইসতিক্বামাহ অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানের উপর অটল অবিচল থাকা। ঈমান আনয়নের পর মৃত্যু

পর্যন্ত ইবাদাতের আর কোন বিরতি নেই। তাই মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানের উপর অটল অবিচল থাকার সুদৃঢ় ইচ্ছা পোষণসহ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর সাক্ষ্য দিতে হবে। আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা বলেন,- وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ "আর ইয়াকীন (মৃত্যু) আসা পর্যন্ত তুমি তোমার রবের ইবাদাত কর।" (আল-হিজর : ৯৯)

তিনি অন্যত্র আরো বলেন, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ - "নিশ্চয় যারা বলে, 'আল্লাহই আমাদের রব' অতঃপর অবিচল থাকে, ফেরেশতাগণ তাদের কাছে নাযিল হয় (এবং বলে), 'তোমরা ভয় পেয়ো না, দুশ্চিন্তা করো না এবং জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর তোমাদেরকে যার ওয়াদা দেয়া হয়েছিল।" (সূরাহ ফুসসিলাত : ৩০)

তাওহীদের সাক্ষ্যদানের অষ্টম শর্ত হলো আল-মাহাব্বাতুল মুনাফী লিল-বুগজি অর্থাৎ মাহাব্বাহ তথা ভালোবাসা যা এর বিপরীত অপছন্দকে প্রত্যাখ্যান করে। ঈমান আনয়ন করতে হবে দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছুর উপরে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে ভালোবেসে। নতুবা অন্তরের ঈমান কখনো পরিপূর্ণ হতে পারে না। আল্লাহ ওয়া জাল্লা বলেন, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا - আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে আল্লাহকে ভালোবাসার মতো ভালবাসে। আর যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহর জন্য ভালোবাসায় দৃঢ়তর। (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ১৬৫) আনাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেন,-'তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা তার সন্তান ও সব মানুষের অপেক্ষা অধিক প্রিয়পাত্র হই।" (সহীহুল বুখারী, হা/১৫; সহীহ মুসলিম, হা/৭৩)

তাওহীদের সাক্ষ্যদানের নবম শর্ত হলো আল-কুফর বিত-তাগূত 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর সাক্ষ্য দিতে হবে সকল প্রকার তাগূতের সাথে কুফরি করার মাধ্যমে। একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত বাদ দিয়ে আর যার ইবাদাত করা হয়, তাগুত তাগূত বলে। মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের সাথে সাথে

সকল প্রকার তাগুতাকে পরিহার ও বিরোধীতা করতে হবে। আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা বলেন, لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا - "অতএব, যে ব্যক্তি তাগূতকে অস্বীকার করে এবং মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই সে মজবুত রশি আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয়।" (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ২৫৬)

এটি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, সকল আম্বিয়া (আলাইহিমুস সালাম) সকল প্রকার তাগূতকে পরিহার করার দাওয়াত দিয়েছেন। আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা এ প্রসঙ্গে বলেন, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ - "আর আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতিতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি এজন্য যে, তোমরা কেবলমাত্র মহান আল্লাহর ইবাদাত কর এবং পরিহার কর তাগূতকে। (সূরাহ আন-নাহল : ৩৬)

অতএব, যদি কারো সাথে তাগূতের গভীর সম্পর্ক বা বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয় অথবা সে নিজেই তাগূত বা তাগূতের অনুসারী হয়, তবে সে যতই 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ'-এর সাক্ষ্য দিক না কেন তার অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি।

তাওহীদুল ইবাদার এ নয়টি শর্ত এবং তাওহীদুল ইত্তেবা'র ৮টি শর্তই হল ঈমানের আহকাম। তাওহীদুল ইত্তেবার ৮টি শর্ত সম্পর্কে ঈমান বির রিসালাতের অধ্যায়ে।

অতএব এ শর্তগুলো একসাথে যদি কারো মধ্যে না পাওয়া যায়, যতই 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ'-এর সাক্ষ্য দিক না কেন, সে ঈমানদার নয়।

আমাদের সকলের প্রতি কর্তব্য হলো এ সংক্রান্ত আরো জ্ঞান অর্জন করা এবং এর আলোকে ইসলামের প্রথম স্তম্ভ তথা ঈমানকে পরিশুদ্ধ করা। যদি কেবলমাত্র ইসলামের এ একটি স্তম্ভকে পরিশুদ্ধরূপে গ্রহণ করা হয়, তবে অন্যান্য সকল স্তম্ভই এর সাথে সাথে অতি সহজেই ঠিক হয়ে যাবে। এ পরিশুদ্ধ ঈমানই ব্যক্তিকে বাধ্য করবে অন্যান্য সকল নেক আমল করার জন্য এবং সকল প্রকার অপরাধকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য। ইসলামের এ স্তম্ভেই আজকের মুসলিমদের মূল সমস্যা। যদি এ সমস্যা দূর করা যায় তবে সমাজের সকল প্রকার শির্ক, বিদ'আত ইলহাদ ও কুফর দূর হবে, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সবাইকে পরিপূর্ণ মুমিন হয়ে এ পৃথিবীতে বসবাস করার তাওফীক্ব

দান করুন। মৃত্যুর সময় ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন! ইয়া রব্বাল 'আলামিন!

কালেমা প্রচারের পূর্বেকার আক্বীদা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা যখন কালেমা প্রচার শুরু করলেন তখন তিনি দেখলেন তৎকালিন মানুষের মধ্যে ধর্ম সম্পর্কীয় কিছু আক্বীদা বিশ্বাস রয়েছে। তিনি দেখলেন মুসা আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা-এর যারা উম্মত বলে দাবী করত সে ইয়াহুদীরা বিশ্বাস করতো যে আল্লাহ তাদের জন্যই বেহেশত তৈরী করেছেন, আর দোজখ তৈরী করেছেন ইয়াহুদীদের যারা শত্রু তাদের জন্য। তারা মনে করে, যেহেতু তাদের বংশে বহু নবী-রাসূল সৃষ্টি হয়েছেন তাই বেহেশত তাদের বংশের লোকদের জন্য আল্লাহ খাস করে সৃষ্টি করেছেন। পরকালে তাদের ভয়ের কোন কারণই নেই। তারা কর্মফল সম্পর্কে বিশ্বাস করে যে কর্মফল পরকালে নয়; পৃথিবীতেই।

পরকালে তাদের জন্য ভয়ের কোন কারণ নেই এই বিশ্বাসই তাদেরকে বেপরোয়া করে তুলল। আর পরকালের ভয় দূর হয়ে গেলে তারা হয়ে পড়ে শক্ত জালেম। কাজেই তারা জালেমও হয়ে পড়ল স্বাভাবিক নিয়মেই। আর এ জন্যই তাদের উপর নেমে এল মহান আল্লাহর গজব।

খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করত, যারাই ঈসা আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা-কে আল্লাহর ছেলে ও শেষ রাসূল হিসেবে মেনে নেবে তাদের জন্য পরকালে আর কোন ভয় নেই। কারণ তাদের বিশ্বাস যে ঈসা আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা নিজে শূলে বিদ্ধ হয়ে তাঁর সমস্ত উম্মতের শাস্তি নিজেই ভোগ করেছেন। কাজেই তাঁর উম্মতের আর কোন ভয় থাকার কথা নয়। এই বিশ্বাস তাদেরকেও নির্ভীক করে তুলল। আর তাদের ২য় বিশ্বাস ছিল যে, মানুষের জীবনের দু'টি অংশ **(১) দ্বীনদারী বা ধর্মীয় অংশ আর (২) দুনিয়াদারী অংশ**। তাদের বিশ্বাস এখনও রয়েছে যে 'মানুষ দুই মহা প্রভুর অধীন' যথা: **(১) ধর্মীয় প্রধান ও (২) রাষ্ট্রীয় প্রধান**। রাষ্ট্র প্রধান শুধু রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে কথা বলবেন, তিনি ধর্ম ব্যবস্থার উপরে কোন কথা বলতে পারবেন না। আর যিনি ধর্ম প্রধান তিনি ধর্মীয় ব্যাপারেই কথা বলতে পারবেন তিনি রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু বলতে পারবেন না। এই আক্বীদার কারণে তাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থা হল ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ব্যবস্থা।

তারা মনে করে দ্বন্দ্ব এড়িয়ে চলার জন্যে এটাই উত্তম পথ এবং এ পথেই সমাজে শান্তি কায়েম হতে পারে। তাদের বিশ্বাস যে, রাষ্ট্রের কোন আইন কানুনের ক্ষেত্রে ধর্মপ্রধান যদি বাধার সৃষ্টি করে আর তা যদি রাষ্ট্রপ্রধান মেনে নিতে না পারে তাহলে রাষ্ট্রপ্রধান ও ধর্মপ্রধানের মধ্যে সৃষ্টি হবে দ্বন্দ্ব। আর সে দ্বন্দ্ব ছড়িয়ে পড়বে গোটা জাতির মধ্যে, ফলে শান্তি ব্যাহত হবে চরমভাবে। কাজেই তারা তাদের আক্বীদা-বিশ্বাস মোতাবেক জীবনের দুই অংশের জন্যে দুই মহা প্রভু ঠিক করে নিয়েছে এবং তাদের কাজের বা অধিকারের একটা সীমানা ভাগ করে দিয়েছে সে সীমানা তাদের কোন প্রভুই অতিক্রম করতে পারবে না।

কিন্তু ইসলাম এই দুই জাতির কোন ধারণার সঙ্গেই একমত নয়। না ইয়াহুদীদের সঙ্গে আর না খ্রিস্টানদের সঙ্গে। মুসলমানদের ধারণা কর্মের জন্য এ দুনিয়া আর কর্মফল পরকালে। মুসলমানদের বিশ্বাস একজনের পাপের শাস্তি অপরে ভোগ করবে না। প্রভু আমাদের একাধিক নয়, তিনি একাই একমাত্র প্রভু। এই কথারই জোরালো স্বীকারোক্তি হচ্ছে কালেমা তাইয়েবায়। মুসলমানদের বিশ্বাস যে, মানুষ যদি দুই প্রভুকে প্রভু হিসাবে মেনে নেয় তাহলে জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে দুই প্রভুর নির্দেশ যদি দুই প্রকার হয়ে যায় তাহলে একই সঙ্গে দুই প্রকার নির্দেশ মেনে চলা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। যেমন এক প্রভু যদি বলেন রাস্তার ডান পাশ দিয়ে চলতে আর অন্য প্রভু যদি বলেন রাস্তার বাম পাশ দিয়ে চলতে তাহলে চলব কোন পাশ দিয়ে ? যে পাশ দিয়েই চলি না কেন তাতে এক প্রভুর নির্দেশ অমান্য করা হবেই। এজন্য মুসলমান কখনোও দুই প্রভু মানে না। এটারই স্বীকারোক্তি রয়েছে কালেমা তাইয়েবার মধ্যে। তাছাড়া যুক্তি হচ্ছে এই যে একই চাকর যেমন দুই মনিবের চাকুরী একই সঙ্গে করতে পারে না এবং একজন স্ত্রী যেমন একই সঙ্গে দুইজন স্বামীর স্ত্রী হতে পারে না- কারণ এখানে আনুগত্যের প্রশ্ন রয়েছে। ঠিক তেমনই কোন মানুষই একই সঙ্গে দুই মহা প্রভুর বান্দা হতে পারে না। এই কথাগুলোই অত্যন্ত সহজ ভাষায় আকর্ষণীয় ভঙ্গিমায় মাত্র ২৪টি অক্ষরের তৈরী ৭টি শব্দ দ্বারা গঠিত কালেমা তাইয়েবার মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে। কালেমাটি আকারে ছোট হলেও এর ভাবার্থ ও শিক্ষা মোটেই ছোট নয়। এর মধ্যে অর্থাৎ ২৪ অক্ষরের বা ৭ শব্দের কালেমার মধ্যে শিক্ষা রয়েছে কমপক্ষে ২৪×৭ = ১৬৮টি। এ কালেমার মধ্যে ইলাহ নামে যে শব্দটি রয়েছে এই শব্দটি আল কুরআনে ১৪৭টি আয়াতের মধ্যে এসেছে। আল্লাহ এ শব্দটিকে সঠিকভাবে বোঝানোর জন্যই এতগুলো আয়াতের মধ্যে ইলাহ শব্দ এনেছেন।

আল কুরআনের কোথায় কতবার মহান আল্লাহর উলুহিয়াত বা সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে আয়াত নাযিল হয়েছে তা নিম্নে দেওয়া হলো -

ইলাহ (৮০ বার) আল বাকারা ঃ ১৩৩, ১৬২, ১৬৩, ২৫৫। আলে ইমরান ঃ ২, ৬, ১৭, ১৮, ৬২। আন নিসা ঃ ৮৭ , ১৭১। আল মায়িদা ঃ ৮৩, ৮৩। আল আনয়াম ঃ ১৯, ৪৬, ১০২, ১০৬। আল আ'রাফ ঃ ৫৯, ৬৫, ৭৩, ৮৫, ১৫৮। আত তাওবা ঃ ৩১, ১২৯। ইউনুস ৯০। হুদ ঃ ১৪, ৫০, ৬১, ৮৪। রা'দ ঃ ৩০। ইব্রাহিম ঃ ৫২। আন্ নাহাল ঃ ২, ২২, ৫১। আল কাহাফ ঃ ১১০। ত্বাহা ৮, ১৪, ৮৮, ৯৮। আল আম্বিয়া ঃ ২৫, ২৯, ৮৭. ১০৮। আল হাজ্জ ঃ ৩৪। আল মু'মিনুন ঃ ২৩, ৩২, ৯১, ৯১, ১০৬। আন নামাল ঃ ২৬, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪। আল কাছাছ ঃ ৩৮, ৩৮. ৭০, ৭১, ৭২, ৮৮। আল ফাতির ঃ ৩। আস্ সাফফাত ঃ ৩৫। সোয়াদ ঃ ৬৫। জুমার ঃ ৬। মু'মিন ঃ ৩, ৩৭, ৬২, ৬৫। হামিম-আস সিজদা ঃ ৬। যুখরুফ ৮৪, ৮৪। আদ্ দুখান ঃ ৮। মোহাম্মাদ ঃ ১৯। আত্ তুর ঃ ৪৩। আল হাশার ঃ ২২, ২৩। আত্ তাগাবুন ঃ ১৩ আল মুজ্জাম্মিল ঃ ৯। আন্ নাস্ ঃ ৩।

ইলাহান (১৬ বার) আল বাকারা ঃ ১৩৩। আল্ আ'রাফ ঃ ১৩৮, ১৪০। আত্ তাওবা ঃ ৩১ ঃ আল হিজির ঃ ৯৬। বনি ইসরাইল ঃ ২২, ৩৯। আল কাহাফ ঃ ১৪। আল মু'মিনুন ঃ ১১৭। আল ফুরকান ঃ ৬৮। আশ শু'য়ারা ঃ ২৯, ২১৩। আল কাছাছ ঃ ৮৮ দোয়াদ ৫। ক্বাফ ঃ ২৬। জারিয়াহ ঃ ৫১।

ইলাহাকা (২ বার) বাকারা ঃ ১১৩। তোয়াহা ৯০।

ইলাহাকুম (১০ বার) বাকারা ঃ ১৬৩। নাহাল ঃ ২২ । কাহাফ ঃ ১১০। তোয়াহা ঃ ৮৮, ৯৮। আম্বিয়া ঃ ১০৮। আল্ হাজ্জ্ব ঃ ৩৪। আল আনকাবুত ঃ ৪৬। আস্ সাফফাত ঃ ৪। হা-মিম্ আস্ সাজদা ঃ ৬।

ইলাহুনা (১ বার) আনকাবুত ঃ ৪৬

ইলাহাতুন (২ বার) ফুরকান ঃ ৪৩। আল জাসিয়া ঃ ২৩

ইলাহাতিন (২০ বার) মায়েদা ঃ ১১৬। নাহাল ঃ ৫১। আনয়াম ঃ ১৯. ৭৪। আ'রাফ ঃ ১৩৮। বানি ইসরাইল ঃ ৪২। কাহাফ ঃ ১৫। মারিয়াম ঃ ৮১। আম্বিয়া ঃ ২১, ২২, ২৪, ৪৩, ৯১। ফোরকান ঃ ৩। ইয়াসিন ঃ ২৩, ৭৪। আস্ সাফফাত ঃ ৮৬। ছোয়াদ ঃ ৫। যুখরূফ ঃ ৪৫। আহ্কাফ ঃ ২৮।

ইলাহাতিকা (১ বার) আ'রাফ ঃ ১২৭।

ইলাহাতিকুম (৪ বার) আম্বিয়া ঃ ৩৬, ৬৮। সোয়াদ ঃ ৬। নূহ ঃ ২৩।

ইলাহাতিনা (৮ বার) হুদ ঃ ৫৩, ৫৪। আম্বিয়া ঃ ৫৯, ৬২। ফুরকান ঃ ৪২। আস্ সাফফাত ঃ ৩৬। যুখরুফ ঃ ৫৮। আহকাফ ঃ ২২।

ইলাহাতুকুম (২ বার) হুদ ঃ ১০১। আস্ সাফফাত ঃ ৯১।

ইলাহাতী (১ বার) মারিয়াম ঃ ৪৬।

কালেমার দু'টি অংশ

এ কালেমার দু'টি অংশ। একাংশে বলা হয়েছে **লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ** এ অংশে অন্যের নয়, শুধুমাত্র মহান আল্লাহরই সার্বভৌমত্বের স্বীকার করা হয় এবং অপর অংশে বলা হয়েছে **মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ** এই অংশে স্বীকার করা হয় যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা তাঁর পাঠানো Appointed Authority। যেসব ব্যাপারে মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে ক্ষমতা প্রদান করেছেন সে সব ক্ষেত্রে অন্যের কিছুই বলার অধিকার নেই। যেমন কোর্টের হাকিম- যাকে সরকার বিচারক হিসাবে নিয়োগ করেছেন- একমাত্র তারই অধিকার রয়েছে কোন মামলার বিচার করার আর কারও সে অধিকার নেই ঠিক তেমনই রাসূলকে আল্লাহ পাক যেহেতু হাকিম নিযুক্ত করেছেন কাজেই কোন ব্যাপারে আল্লাহর রাসূলই ফায়সালা দিতে পারেন; অন্যেরা নয়। আপনি যদি কোন আসামীর জামিনের জন্যে কোর্টের কোন হাকিমের নিকট দরখাস্ত পেশ করেন তাহলে সেই দরখাস্তে জামিন মঞ্জুরের ক্ষমতা যেমন হাকিম বা সরকারের নিয়োজিত Authority ভিন্ন অন্য কারও নেই ঠিক তেমনই মানুষের জীবন-যাপন কোন নিয়মে চলবে, মানুষের কোন অপরাধের কি শাস্তি হবে ইত্যাদি ব্যাপারে ব্যবস্থা প্রণয়নকারী ও হাকিম হিসাবে যিনি আল্লাহর নিকট থেকে ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েছেন, একমাত্র তিনিই দিতে পারেন জীবন ব্যবস্থা; অন্যেরা নয়। এটারই স্বীকারোক্তি রয়েছে এ কালেমার শেষাংশে। এখন মানুষ যদি আল্লাহকে বাদ দিয়ে আর কাউকে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক বলে মানে তাহলে যেমন আল্লাহর উলুহিয়াতে (প্রভুত্বে) শরিক করা হয় তেমন কেউ যদি জীবন ব্যবস্থা রচয়িতা হিসাবে কাউকে মানে তা সে মাওসেতুং হোক কার্ল মার্কস হোক, বা x y z যেই হোক না, অন্য কাউকে জীবন ব্যবস্থার রচয়িতা হিসাবে মানলেই রাসূলের রেসালাতিতে তাদেরকে শরীক করা হয়। আমরা যেমন সহজ ভাবেই বুঝি যে কোর্টের হাকিম যে জামিন মঞ্জুর করবেন না সেই জামিন অন্য কেউ মঞ্জুর করতে পারে না আর

পারলেও পারবে তখন, যখন কোন বিদ্রোহীদল প্রতিষ্ঠিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে ক্ষমতা দখল করে নিতে পারবে তখনই সেই বিদ্রোহী দলের নিয়োজিত কোন নেতা হাজতের আসামীদের জামিন দেয়ার বা ছেড়ে দেয়ার অধিকার পায় অন্যথায় কেউ তা পারে না। ঠিক তেমনই আল্লাহর সঙ্গে যারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে শুধু তারাই পারে রেসালাতে অন্য কাউকে শরীক করতে। এ সবকিছুই বুঝবার জন্য প্রয়োজন মনকে নিরপেক্ষ করে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা। আমরা এসব বিষয় চিন্তা-ভাবনা করলে অবশ্যই অন্য যেকোন মতবাদের সমর্থক হতে পারি না এবং ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু মানতেও রাজি হতে পারি না।

মানুষ ও কালেমার আদি কথা

"ইন্নি জায়িলুন ফিল আরজি খলিফাহ অর্থাৎ- ''পৃথিবীতে আমি আমার খলিফা বা প্রতিনিধি পাঠাব'' মানুষ সৃষ্টির পূর্বেই মহান আল্লাহ তা ঘোষণা করলেন। অন্যান্য কোন প্রাণীকে মহান আল্লাহ যেহেতু খলিফা করেননি তাই তাদেরকে সে ধরনের উপযুক্ত করে ও সৃষ্টি করেননি। মানুষকে যেহেতু খলিফা করে সৃষ্টি করেছেন তাই খেলাফতির দায়িত্ব পালনের যাবতীয় যোগ্যতাও মানুষকে মহান আল্লাহ দিয়েছেন। তিনি মানুষকে দিয়েছেন **(১) জ্ঞানবুদ্ধি (২) বাক শক্তি (৩) শ্রবণ শক্তি (৪) দর্শন শক্তি (৫) উদ্ভাবনী শক্তি (৬) কর্মক্ষমতা ও (৭) ব্যক্তি স্বাধীনতা। আর দিয়েছেন (১) দয়া-মায়া (২) ভালোবাসা (৩) সততা (৪) পরোপকারিতা (৫) ধৈর্য্য (৬) কৃতজ্ঞতা ও (৭) ন্যায়পরায়ণতা** ইত্যাদির ন্যায় কিছু গুণ যা প্রয়োজন হয় খেলাফতির দায়িত্ব পালনের জন্যে। অতঃপর সে দায়িত্ব পালনে যেন কোন ত্রুটি-বিচ্যুতির সৃষ্টি না হয় সেজন্য আল্লাহ কতকগুলি বিজ্ঞোচিত ব্যবস্থা করেছেন। যেমন-

১। জন্মের পূর্বেই মানুষের নিকট থেকে আল্লাহ **'রবের'** স্বীকৃতি নিয়েছেন। সব মানুসের রূহ সৃষ্টি করে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করেছিলেন **''আলাসতু বি রাব্বিকুম''** আমি কি তোমাদের প্রভু নই ? **''কালূ বালা''** উত্তরে সব রূহ বলেছিল: হ্যাঁ- আপনি আমাদের প্রভু। এই রব শব্দটা আল কুরআনে ১৭৮ বার এসেছে।

২। জন্মের পর যখন তাকে খেলাফতির দায়িত্বভার দেওয়া হল তখন তার কাছ থেকে নেয়া হল ইলাহার স্বীকৃতি। কাউকে রাষ্ট্রের কোনো উচ্চ পর্যায়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হলে যেমন তাকে শপথ পড়তে হয়, তেমন খলিফাতুল্লাহ বা আল্লাহর প্রতিনিধির দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হলেও তাকে

শপথ পড়তে হয়। সেই শপথই হচ্ছে কালেমা তাইয়েবা ও কালিমায়ে রিসালাতের। এ শপথের অর্থ হল এই যেমন আমি আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে ইলাহ বা মনিব বলে মানব না, আল্লাহর হুকুম মত চলব নবীর নির্দেশে। এ কথা বললে তার উপর দায়িত্ব এসে যায় আল্লাহর উলুহিয়াতকে নিজের বাস্তব জীবনে মেনে নেওয়া এবং তা সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা। প্রকৃতপক্ষে কালেমা তাইয়েবা ও কালিমায়ে রিসালাতের মাধ্যমে সেই অঙ্গীকারই করা হয় যে অন্যের নয়, শুধু আল্লাহরই প্রভুত্ব ও তাঁরই নিরঙ্কুশ মালিকানা আমি নিজে মেনে নিচ্ছি এবং এই মানার ভিত্তিতেই সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ব। এর প্রমাণ পাই আমরা নবী-জীবন ও সাহাবা-জীবন থেকে। তাঁরা কালেমা পড়ে যা স্বীকার করেছিলেন তারই ভিত্তিতে তাঁরা সমাজ গড়েছিলেন এবং সে কাজটাকে তাঁরা অপরিহার্য কর্তব্য ও দায়িত্ব বলে মেনে নিয়েছিলেন। এ কালেমা পড়ার পর আমাদের ওপরও সেই দায়িত্ব এসে যায় যে দায়িত্ব এসেছিল (১) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা (২) তাঁর সঙ্গী-সাথী (৩) তাবেয়ীন (৪) তাবে-তাবেয়ীন (৫) আয়েম্মায়ে মুজতাহেদীন (৬) মুজাদ্দেদীন ও (৭) সলফে সালেহীনদের উপর।

৩। সে দায়িত্ব শিক্ষা দেয়ার জন্যে প্রয়োজন ছিল একজন আদর্শ শিক্ষক- তিনি হচ্ছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা।

৪। এ কাজ কিভাবে ও কোন আইনের ভিত্তিতে করতে হবে তার জন্যেই একখানা আইন গ্রন্থ দেয়ার প্রয়োজন ছিল সেই গ্রন্থই হচ্ছে আল-কুরআন।

৫। আর দায়িত্ব পালন করলো কিনা তার জন্যে প্রয়োজন ছিল হিসাব নেয়া, এর জন্যেই রয়েছে পরকাল।

৬। আর প্রয়োজন দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দেয়া- তার জন্যে রয়েছে জাহান্নাম এবং

৭। যারা দায়িত্ব ঠিকমত পালন করে তাদের পুরস্কৃত করা- এর জন্যে রয়েছে জান্নাত।

এ আলোচনা থেকে বুঝা গেল:

(১) মানুষকে মহান আল্লাহর খলিফা বলে ঘোষণা করা,

(২) **''আলাসতু বিরাব্বিকুম, কালূ বালা।''** এর মাধ্যমে তার রবুবিয়াতের স্বীকৃতি নেয়া,

(৩) **''লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ''**-এর মাধ্যমে তাঁর উলুহিয়াতের স্বীকৃতি আদায় করা,

(৪) কিতাবসহ নবী প্রেরণ,

(৫) ইসলামী আন্দোলন ও জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহর খেলাফত কায়েম,

(৬) পরকালের হিসাব-নিকাশ ও

(৭) জান্নাত-জাহান্নাম এর প্রত্যেকটি ব্যাপারই একটির সঙ্গে অপরটির সম্পর্কযুক্ত। এ কোন বিচ্ছিন্ন বা বিক্ষিপ্ত ব্যাপার নয়।

এবার দেখা যাক আল্লাহ পাক যে নবীকে আমাদের জন্যে অনুকরণ ও অনুসরণযোগ্য করে পাঠালেন তিনি এই কালেমাকে সমাজের সম্মুখে কিভাবে তুলে ধরেছিলেন এবং তার ফলাফল-ই বা কি হয়েছিলে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা যখন কালেমার দাওয়াত দেন তখনকার আরবের সামাজিক অবস্থা

১। তখন আরবের সামাজিক অবস্থা ছিল এমন যে, যাযাবর সুলভ কিছু গুণ ছাড়া সৎগুণের কিছুই তাদের মধ্যে বাকী ছিল না। যথা:

(ক) নিজের মেয়েকে জ্যান্ত কবর দেয়া, (খ) লোকহত্যা করা, (গ) চুরি-ডাকাতি, (ঘ) রাহাজানি, (ঙ) মদ-মাতলামি, (চ) জুয়া ও (ছ) ব্যাভিচার। বরং এ কাজগুলোকে তারা আভিজাত্যের লক্ষণ হিসাবে মনে করতো।

তখনকার আরবের অবস্থাকে বুঝাবার জন্যে একজন আরব কবির নিম্নোক্ত ছন্দগুলোকে আমরা স্মরণ করতে পারি। কবি জুহাইর বিন আবু সালমা বলেছেন:

অস্ত্র বলে নিজেকে যে না পারিবে বাঁচাতে

ধ্বংস তার অনিবার্য পারবেনা সে বাঁচিতে।

আগ বেড়ে যে অত্যাচার না পারিবে করিতে

মজলুম তাকে হতেই হবে, এ আরব ভূমিতে।

তৎকালীন আরবের অবস্থার পূর্ণ ইঙ্গিত রয়েছে এ ছন্দের মধ্যে কাজেই সে যুগকে বলা হয় **আইয়ামে জাহেলিয়াত বা অন্ধকার যুগ**।

২। তখন আরবে গোত্রবাদ জারি ছিল, তারা বুঝতো নিজের লোকের সাহায্য করা, তা সে জালেম হলেও। আর বুঝতো অন্য গোত্রের কাউকে কোন প্রকার সাহায্য না করা- তা সে মজলুম বা অত্যাচারিত হলেও।

৩। ন্যায় বিচারের নাম গন্ধও তখন ছিল না।

৪। অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল তখন পুরোমাত্রায়। একদিকে কেউ ছিল পথের ভিখারী; অন্যদিকে সুদী কারবার, মুনাফাখোরী, মজুতদারী, চুরি-ডাকাতি, রাহাজানি, লুটতরাজ ইত্যাদি অসদুপায়ে অর্থ উপার্জন করে কেউ গড়তে ছিল আকাশ ছোঁয়া অর্থের পাহাড়।

৫। আর ছিল দাসপ্রথা- পশুর ন্যায় হাটে-বাজারে মানুষ বেচাকেনা হতো।

৬। তখন গোত্রে গোত্রে চলছিল দলাদলি, মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি, ইত্যাদি পশুসুলভ আচরণ।

৭। তখন আরবের পার্শ্ববর্তী শস্য শ্যামল ফসলে ভরা এলাকাগুলো ছিল অনারবদের হাতে অর্থাৎ উত্তরে সিরিয়া ছিল রোমানদের পরোক্ষ শাসনের অধীন আর দক্ষিণে ইয়েমেন ছিল পার্সিয়ানদের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে। আরবদের হাতে ছিল একমাত্র হেজাজ, নেজদ ও কয়েকটা মরূদ্যান এবং ঘাসপাতা বিহীন কিছুটা মরুভূমি।

মোটামুটি এটাই তৎকালীন আরবের সমাজিক অবস্থা। এই অবস্থায় আল্লাহর নবীর সামনে তিনটি সহজ পথ খোলা ছিল, যে পথে অগ্রসর হলে সহজেই অর্থাৎ বিনা যুদ্ধে ও বিনা বিরোধিতায় তিনি রাজক্ষমতা দখল করতে পারতেন। অতঃপর তিনি নির্বিঘ্নে তৌহিদের প্রচার করতে ও কালেমার দাওয়াত দিতে পারতেন। সে পথ তিনটি ছিল- যথাক্রমে,

১। আরব জাতীয়তাবাদের নামে আন্দোলন করে আরবদেরকে একত্রিত করা। এতে আরবের লোক সবাই তাঁর কথা শুনতো, কারণ তিনি একদিকে ছিলেন উচ্চ বংশের সন্তান অপরদিকে ছিলেন প্রত্যেকের নিকট

বিশ্বাসী। আরবের লোক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-কে ভাল জানতো, মানতো এবং সালিসী মীমাংসায়ও ডাকতো। যেমন: হাজরে আসওয়াদ নিয়ে আরবে যে বিবাদ চলছিল তা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমাই মীমাংসা করে দিয়েছিলেন এবং আরবের প্রত্যেকটি গোত্রপতিই তা মেনে নিয়েছিল। অতএব, আরব জাতীয়তাবাদের নামে অগ্রসর হলে তিনি যে কন্টকমুক্ত পথেই রাজশক্তি হাতে পেতেন এতে কোনই সন্দেহ ছিল না।

২। অর্থনৈতিক বিপ্লব বা অর্থনৈতিক সাম্যের দাবী তুলতে পারতেন। এতে আরবের পৌনে ষোলআনা সর্বহারাদের তিনি সমর্থন পেতেন। এ পথেও তিনি রাজশক্তি হাতে পেতেন অতি সহজেই।

৩। চরিত্র গঠন ও চরিত্র সংশোধনের দাবীও তুলতে পারতেন। এতে আরবের সমস্ত ন্যায়বাদী লোকদের তিনি সমর্থন পেতেন।

এর যে কোন পথে আল্লাহর নবী পা বাড়ালে তিনি **আরব বন্ধু, জাতির পিতা**, বহু কিছু উপাধিও পেতেন এবং নির্বিঘ্নে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তৌহিদ ও কালেমার প্রচার করতে পারতেন। আল্লাহ সে পথে পা বাড়াতে দেননি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমাকে। আল্লাহ তাঁর নবীর উপর হুকুম জারি করলেন, তুমি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা কর **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'**। অতঃপর এই কালেমার মাধ্যমে লোকদেরকে একত্রিত কর। আর প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থাকে এই কালেমার দাবীর ভিত্তিতে উৎখাত করে সেখানে ইসলামী সমাজ গড়ে তোল, যেন সমাজের প্রতিটি কাজই আল্লাহর ইবাদতে পরিনত হয়। আল্লাহ এতটুকু বলেই ক্ষ্যান্ত হননি বরং তিনি তাঁর রাসূলকে আরও হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, খবরদার! এই কালেমার দাবীর ওপর বহাল থাকতে ও এর দাবী মোতাবেক সমাজ গড়তে যত বিপদই আসুক না কেন তা সহ্য করবে এবং সাহসিকতার সাথে তার মোকাবেলা করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকবে।

আল্লাহর নবী কেন এসব পথ ধরলেন না

১। তিনি যদি ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের আন্দোলন শুরু করতেন তাহলে আরব জাতিকে সংঘবদ্ধ করতে পারতেন ঠিকই কিন্তু

(ক) সার্বজনীন ইসলাম আরবের সীমানা অতিক্রম করে তা বাইরে বেরোতে পারতো না।

(খ) সে রাষ্ট্র হতে পূর্বের অন্যায়-অপকর্মগুলো দূর হতো না।

(গ) ভিন্ন ভাষাভাষীদের অত্যন্ত শত্রু লোককেও শত্রু মনে করতে হতো।

(ঘ) স্বদেশীর কোন অপরাধকে অপরাধ বলা যেত না।

(ঙ) ন্যায় বিচারের নাম-গন্ধও থাকতো না।

(চ) নিজের লোক জালেম হলেও তাকে সাহায্য করতে হতো।

(ছ) অন্যে মজলুম হলেও তাকে সাহায্য করা যেত না।

(জ) স্বজনপ্রীতি বাড়তো।

২। অর্থনৈতিক সাম্যের দাবীতে গুটি কয়েক ধনীদের হত্যা করে হয়তো একটা সর্বহারাদের রাষ্ট্র কায়েম করতে পারতেন কিন্তু

(ক) সে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যে খুলাফায়ে রাশেদীনের ন্যায় চরিত্রবান লোক পাওয়া যেত না।

(খ) খুলাফায়ে রাশেদীনের কাউকে হয়তো গুপ্ত হত্যার শিকার হতে হতো।

(গ) ধনসম্পদ যা বহুলোকের হাতে ছড়িয়ে ছিল তা জড়ো হতো রাষ্ট্র পরিচালকদের হাতে।

(ঘ) রাষ্ট্রের নাগরিকগণ হতো রাষ্ট্রযন্ত্র। স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার আদৌ কোনো ক্ষমতা কারো থাকতো না। মানুষ হতো কলের পুতুল।

(ঙ) স্বদেশে বাস করতে হতো জেলখানার কয়েদীর ন্যায়।

(চ) সরকারী রাজনৈতিক দল ছাড়া আর কোনো রাজনৈতিক দল থাকতে পারতো না।

(ছ) তৌহিদের প্রচার তখন কোন মতেই সম্ভব হতো না।

এতে মানুষ মুসলমান হতো না; হতো নাস্তিক। যা বর্তমান বিশ্বের ঘটনাপঞ্জি থেকে বুঝা যায়।

৩। চরিত্র সংশোধনের আন্দোলন তিনি করতে পারতেন কিন্তু এই জন্য করেননি যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালো করেই জানতেন যে চরিত্রের

মূল ভিত্তিই হচ্ছে **'ঈমান'**। যদি কারো মনে ঈমান বা বিশ্বাস না থাকে যে পরকাল বলে কিছু একটা আছে এবং এ জীবনের যাবতীয় কার্যকলাপও দেখার মত কোন শক্তি রয়েছেন যিনি আমাদের প্রতিটি কাজের ভিডিও রেকর্ড সংরক্ষণ করছেন-যার ভিত্তিতে পরকালে বিচার হবে ও অপরাধী সাব্যস্ত হলে শাস্তি পেতে হবে- তবে তাকে কোন প্রকারেই সর্বদিক দিয়ে চরিত্রবান হিসাবে গড়ে তোলা যাবে না।

৪। আমরা দেখেছি জাতীয়তাবাদের নামেও ইমেজ সৃষ্টি করা যেতো, লোক সংঘবদ্ধ করা যেতো, রাষ্ট্রও গড়া যেতো কিন্তু সে পথে মানুষকে-

(ক) তৌহিদবাদী করা যেতো না।

(খ) অর্থনৈতিক সাম্য সে পথে কস্মিনকালেও সম্ভব ছিলোনা।

(গ) চরিত্র গঠনের জন্যে সেটা আদতেই কোন যুক্তিগ্রাহ্য পথ ছিলনা।

(ঘ) এ পথে স্বজনপ্রীতি এড়ানো যেত না।

(ঙ) গুরুত্বপূর্ণ পদে সৎলোকের পরিবর্তে নিজের লোক দিতে হতো।

(চ) নিজের লোকদেরকে অন্যায় করা থেকে ফিরানো যেত না।

(ছ) ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যে গুন্ডাবাহিনী পুষতে হতো।

তা হলে দেখা যাচ্ছে উপরোল্লিখিত যে কোন পথই মানুষকে আল্লাহর রাস্তায় ডাকার জন্যে কোন বৈজ্ঞানিক পন্থা ছিল না। বরং প্রমাণ হলো যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস- তাঁর ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের প্রতি বিশ্বাস ও প্রতিফল গ্রহণের প্রতি বিশ্বাস না থাকলে কোনো প্রকারেই তাকে সৎ পথে আনা যায় না।

যে পথে তিনি অগ্রসর হলেন

মহান আল্লাহ ভালোই জানতেন যে কোন পথে মানুষকে দ্বীনের রাস্তায় আনা যাবে ও দ্বীনের উপরে টিকিয়ে রাখা যাবে। এসব বিষয়ে তিনি পূর্ণ জ্ঞাত তিনি তাঁর নবীকে এক বিশেষ পথে অগ্রসর হতে বললেন। সে পথটা হলো ঐ বিপ্লবী ও বিদ্রোহী কালেমার দাওয়াত। মাত্র ২৪টি অক্ষরের তৈরী ও ৭টি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত এ কালেমাটি এমনই এক ব্যাপক অর্থবোধক ও তাৎপর্যপূর্ণ কালেমা যে, বহু ৭ এর জবাব, বহু ৭ এর আনাগোনা রয়েছে এ ৭ শব্দের কালেমার ব্যাখ্যার মধ্যে। আরও রয়েছে এর মধ্যে পৃথিবীর হাজারও সমস্যার সমাধান। এ কালেমার যাত্রা শুরু হলো মানবমনের এক সর্বাত্মক

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাবের মাধ্যমে। তা হলো **প্রভুত্ব কার ? মানুষের না আল্লাহর ? এবং দাসত্ব কার ? মানুষের না আল্লাহর ?** এটা ছিল এমনই এক প্রশ্ন যার সঙ্গে (১) ভাষা (২) জন্মসূত্র (৩) ধর্ম (৪) গোত্র (৫) বর্ণ (৬) দেশ ও (৭) কাল, এর কোনটারই কোন সম্পর্ক ছিল না; এর সম্পর্ক হচ্ছে মানবতার সঙ্গে। এ বিষয়টি এমনই এক দর্শন যার পরিবর্তন সূচিত হবে না কোন যুগেও বরং এ প্রশ্নের সাথে জড়িত রয়েছে মানুষের (১) মান (২) মর্যাদা (৩) ইজ্জত (৪) সম্ভ্রম (৫) অর্থনৈতিক মুক্তি ও (৬) মানবীয় অধিকার- এমনকি (৭) মানবীয় সত্তাসহ টেকা না টেকার প্রশ্ন। এই একই কালেমার মধ্যে রয়েছে (১) খেলাফতির দায়িত্ব পালনের জন্যে শপথবাণী (২) দ্বীনের রাস্তায় ডাকার জন্যে দাওয়াত বা আহ্বান বাণী (৩) ইসলামী সমাজ বিপ্লবের ডাক (৪) বিশ্বভ্রাতৃত্ব (৫) অর্থনৈতিক সাম্যের ভিত্তিমূল (৬) মানুষের প্রভুত্ব খতম করে আল্লাহর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করার প্রতিজ্ঞা ও (৭) পরকালের জবাবদিহির ভিত্তিতে আল্লাহর খেলাফত বা ইসলামী রাষ্ট্র গড়ার অঙ্গীকার। এসব দাবীর ভিত্তিতে সমাজে ইসলামী আন্দোলন সৃষ্টি করার জন্যে এ কালেমা ছিল এক বিপ্লবী দাওয়াত। তাই আল্লাহ পাক তাঁর নবীকে এই কালেমার দাওয়াত দিতে নির্দেশ দিলেন।

নির্দেশ পেয়ে আল্লাহর নবী আরবের লোকদেরকে এক বিশেষ নিয়মে ডেকে একত্রিত করে ঘোষণা করলেন: **লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ** মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ হক্ব প্রভু নেই, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা তাঁর রাসূল। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন, ‘‘কালেমা তাইয়েবাকে এমন এক পবিত্র গাছের সঙ্গে তুলনা করা যায়, যার মূল শিকড় মাটির গভীরে প্রোথিত এবং যার বহু শাখা -প্রশাখা শূণ্যে বিস্তার লাভ করে দিয়েছে। অর্থাৎ কালেমার মূল বিশ্বাসটা মূল শিকড়ের ন্যায় মানুষের মগজে শিকড় গেড়ে থাকবে। তার জীবনের প্রতিটি শাখা-প্রশাখা হবে কালেমা বিশ্বাস মোতাবেক। জীবনের শাখা-প্রশাখা বলতে বুঝায় মানুষের (১) ব্যক্তিগত জীবন যাপন (২) পারিবারিক আচরণবিধি (৩) সামাজিক বন্ধন (৪) রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধান (৫) অর্থনৈতিক আইন-কানুন (৬) বৈষয়িক বিষয়াদি (৭) আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়াদি। এগুলোকে ৭ কথার কালেমার ৭টি প্রধান শাখা বলা চলে। আর প্রশাখা বলতে আমরা বুঝতে পারি যে, জীবনযাপনের খুঁটিনাটি দিক যা প্রধান শাখা থেকেই বর্হিগত হয়েছে, যেমন (১) পারস্পরিক সম্পর্ক বা বন্ধুত্ব ও শত্রুতা (২) ব্যবসা-বাণিজ্য (৩) চাকুরী-বাকুরী (৪) আয়-ব্যয়, লেন-দেন, সঞ্চয় (৫) শিক্ষা-দীক্ষা (৬) শিল্পকলা (৭)

চাষাবাদ ইত্যাদি আরও সাতটি। অর্থাৎ আল্লাহ বুঝালেন যে কালেমা পড়া লোকদের যাবতীয় কাজই হতে হবে কালেমার বিশ্বাস মোতাবেক।

কালেমা পড়ার অর্থই হলো আল্লাহদ্রোহীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা

প্রকৃতপক্ষে এ কালেমা হচ্ছে আল্লাহদ্রোহীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা। মানুষ হয়ে মানুষের উপর প্রভুত্ব করা আল্লাহর বিধানে নেই।

এই জন্যেই সূরাহ নাসের মধ্যে বলা হয়েছে এক আল্লাহই **'রাববুন্নাস'** বা সব মানুষের প্রভু **'মালিকিন্নাস'** বা সব মানুষের রাজা। **'ইলাহিন্নাস'** বা সব মানুষের উপর সার্বভৌমত্বের মালিক। এমন অনেক কিছুই আছে যা মুশরিক্বানা ধর্মে আছে কিন্তু ইসলামে তা নেই। যেমন অন্য ধর্মে পূজা অর্চনা আছে কিন্তু ইসলামে তা নেই। ঠিক তেমনি অন্য ধর্মে মানুষের উপর মানুষ রাজা-বাদশাহ আছে কিন্তু ইসলামে তা নেই। ইসলাম বলে সব মানুষের একই প্রভু মহান আল্লাহ এবং মানুষ একই প্রভুর বান্দা বা গোলাম। মানুষ যদি মানুষের উপর প্রভু হয়ে চেপে বসে তা হলে মানুষ প্রভুর হুকুমই মানুষ প্রজাদের মেনে চলতে হয়। আর এতে সব চাইতে বড় অসুবিধা হয় ঐখানে যেখানে মানুষ প্রভুর হুকুম আর আল্লাহর হুকুম দুই প্রকার হয় সেখানে আল্লাহর হুকুম বাদ দিয়েই মানুষ প্রভুর হুকুম বলবৎ হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ প্রভুর হুকুম হলো চোরের হাত কেটে দাও আর মানুষ প্রভুর হুকুম হলো চোরকে জেলে দাও। ফলে আল্লাহর হুকুম বাতিল হলো আর মানুষ প্রভুর হুকুম কায়েম হলো। এভাবে যারাই আল্লাহর বিধানকে বাতিল করে নিজেদের বিধান জারি করে তারাই আল্লাহদ্রোহী আর তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাই হচ্ছে কালেমা তাইয়েবার মূল ভাবার্থ। এ কারণেই ইবরাহিম আলাইহিস সালাম আত-তাসলিমা কালেমা পড়লে নমরুদ বুঝেছিল যে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হচ্ছে। ঠিক ঐ একই বুঝ বুঝেছিল মুসা আলাইহিস সালাম আত-তাসলিমা-এর কালেমা পড়া থেকে ফিরআউন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর কালেমা পড়া থেকে আবু জাহেল এবং আবু লাহাবের গোষ্ঠি। ফলে রাষ্ট্রদ্রোহীদের সঙ্গে রাষ্ট্রপতিগণ যে ব্যবহার করে সেই ব্যবহারই পেয়েছেন প্রত্যেক নবী-রাসূলগণ তাদের সমকালীন রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট হতে। এ কালেমার আসল ভাবার্থ হলো **মানি না মানি না কারো আইন মানি না, আল্লাহ ছাড়া কারো আইন মানি না।** আর এ কথা বললেই আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হয়।

প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, আল্লাহদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার সৎসাহস যাদের নেই তাদের জন্যে মুসলমান হওয়া সাজে না। কাজেই রাসূলের সাহাবী যাঁরাই কালেমা পড়েছিলেন তারা প্রত্যেকেই হয়েছিলেন আল্লাহদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য যোদ্ধা। আল্লাহর আইন আল্লাহর জমিনে কায়েম করার জন্যে তারা জান দিয়েছেন কিন্তু মানব রচিত আইন তারা মেনে নেন নি। এটাই হয় কালেমা পড়া মুসলমানদের চরিত্র বা ক্যারেকটর।

কালেমা ব্যাপক অর্থবোধক

এই ধরনের ব্যাপক অর্ধবোধক বিপ্লবী কালেমার দাওয়াত পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হলো এক বিরাট আন্দোলন। গড়ে উঠলো আন্দোলন। হাটে, মাঠে, ঘাটে ও কর্তাব্যক্তিদের মাহফিলে সর্বত্রই ঐ একই কথা, একই আলোচনা, একই জল্পনা-কল্পনা, যে দাওয়াত উঠেছে, প্রভুত্ব মানুষের নয়; প্রভুত্ব কেবল মহান আল্লাহর। গুঞ্জন শুরু হল কায়েমী স্বার্থবাদী মহলে-- এবার মোদের উপায় ? উপায় আর কিছু না, পথ সামনে দুটি। এর যেকোন একটির পথ ধরতেই হবে (১) হয় কালেমা পড়ে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করতে হবে। (২) নইলে কালেমার দাওয়াতকে চিরতরে মিটিয়ে দিতে হবে। শেষ পর্যন্ত কায়েমী স্বার্থবাদীরা পারলো না মনকে মানাতে। দুনিয়ার স্বার্থ ত্যাগ করে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করতে পারলো না তারা। কাজেই তারা মরণপণ চেষ্টা করলো দ্বীনের দাওয়াতকে মিটিয়ে দেয়ার জন্যে। জুলুম অত্যাচার শুরু হলো কালেমার দাবীদারদের উপর। কালেমা পড়াদের মধ্যেও গুঞ্জন শুরু হলো। তাহলে এখন কি করি ? কথা বললে যে মার খেতে হয় ? আল্লাহ হুকুম দিলেন **''হয় মার অথবা মর''** (আল-কুরআন) কিন্তু কালেমার দাওয়াত বন্ধ করো না। আল্লাহর হুকুম ''যতক্ষণ তারা আল্লাহর এবং নবীর নিষিদ্ধ কাজকে ত্যাগ না করে এবং আল্লাহর দ্বীনকে কবুল না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। আর যদি কেউ তোমাদের অধীন হয়ে থাকতে চায় এবং জিযিয়া কর স্বহস্তে দিতে স্বীকার করে তবে তাদের সঙ্গে আর যুদ্ধ করো না'' (আল-কুরআন) অতঃপর মুসলমানরাও বুঝলো যে আমাদেরও সামনে পথ দু'টি। হয় (১) আল্লাহদ্রোহীদেরকে ময়দান ছেড়ে দিয়ে জাহান্নামের পথ ধরতে হবে অথবা (২) জীবনমরণ যুদ্ধ করে আল্লাহর দ্বীনকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। অতঃপর কালেমা পড়া মুসলমানগণ ১নং এর সহজ পথ বাদ দিয়ে ২নং এর কঠিন পথে পা বাড়ালেন। শুরু হলো দুই পক্ষের তুমুল সংঘর্ষ। মুসলমানরা

(১) মার খেলেন, (২) দেশত্যাগী হলেন, (৩) যুদ্ধ করলেন, (৪) ঘর-বাড়ী হারালেন, (৫) আত্মীয়-স্বজন হারালেন, (৬) সমাজ থেকে বহিষ্কৃত হয়ে নির্বাসিত জীবনযাপন করলেন এবং (৭) না খেয়ে না খেয়ে শুকিয়ে হাড় হয়ে গেলেন। কিন্তু শত্রুকে ময়দান ছেড়ে দিলেন না। আল্লাহর প্রভুত্ব কায়েম করতেই হবে, নইলে আল্লাহ খুশি হবেন না, জান্নাত পাওয়া যাবে না, তাই তাঁরা এতো দুঃখকষ্ট মাথা পেতে নিলেন। এবার আসুন স্পষ্ট করে বুঝে দেখি যে, আন্দোলন কেন ও কিসের।

কুরআনী আন্দোলন ও কালেমার দাওয়াত

গভীর মনোযোগ সহকারে আল কুরআন অধ্যয়ন করলে চিন্তাশীল জ্ঞানী গুণীদের জ্ঞানে এইটাই ধরা পড়বে যে, ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে গোটা সমাজে পূর্ণাঙ্গভাবে কায়েম করে দেয়া এবং যতদিন তা কায়েম না হয় ততদিন পর্যন্ত এমন আন্দোলন পরিচালনা করা, যার মাধ্যমে তা কায়েম হতে পারে তার পুরা ব্যবস্থা রয়েছে প্রথম ১৩ বছরে নাজিল হওয়া ৮৯টি মাক্কী সূরাহর মধ্যে আর ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্র চলবে যে নিয়ম-নীতির ভিত্তিতে অর্থাৎ গোটা মানব সমাজের সামগ্রিক কার্যকলাপ ইবাদতে পরিণত হবে যে সব আইন মেনে চললে তার পুরা আইন-কানুন নাজিল হয়েছে পরবর্তী ১০ বছরে নাজিল হওয়া ২৫টি মাদানী সূরাহর মধ্যে। যেহেতু আন্দোলন ও জিহাদ ছাড়া সমাজে কোন পরিবর্তন আসে না তাই মানুষের তৈরী আইন যে আইনে সমাজে মানুষের প্রভুত্ব ও শিরক কায়েম ছিল তা পরিবর্তন করে আল্লাহর আইনের ভিত্তিতে সমাজ গড়ার উদ্দেশ্যে আন্দোলন ও জিহাদ ছিল অপরিহার্য। কারণ কালেমা পড়া মুসলমানগণ যখন দেখবে যে সমাজ চলছে কালেমা বিশ্বাসের বিপরীত পথে অর্থাৎ শিরকের পথে অথচ মুসলমানদের দাবী তার বিপরীত তখন মুসলমানদের উপর দায়িত্ব এসে যায় তারা কালেমার মাধ্যমে যা স্বীকার করে তা যেকোন মূল্যেই হোক সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা। এ করতে হলে পর্যায়ক্রমে যে কাজ করতে হয় তা হচ্ছে **(১) আন্দোলন (২) শ্লোগান (৩) মিছিল (৪) জিহাদ**। কারণ, যে কোন দাবী ২/১ জন করলে তাকে দাবীই বলে। কিন্তু বহু লোক কোন দাবী করলে ঐটারই নাম হয় আন্দোলন। ২/১ জনে কোন কথা বললে তাকে 'কথাই' বলে। কিন্তু একই কথা একই সঙ্গে বহু লোকে বললে তারই নাম হয় শ্লোগান। ২/১ জনে পথ চললে তাকে পথ চলাই বলে কিন্তু বহু লোক একই উদ্দেশ্যে একই সঙ্গে পথ চললে ঐটার নাম হয় **মিছিল**। আর একই মালিকানা দুই পক্ষ দাবী করলে তাদের মধ্যে যে চরম সংঘর্ষ হয়

ঐটারই নাম **জিহাদ**। তাহলে এই বিচারে দেখা যাচ্ছে আন্দোলন, শ্লোগান, মিছিল ও জিহাদ আর কারো জন্যে না হলেও মুসলমানদের জন্যে একান্তই অপরিহার্য। কারণ এ পথ ছাড়া আল্লাহর প্রভুত্বও কায়েম হয় না এবং তা না করতে পারলে শিরকের হাত থেকেও বাঁচা যায় না। আর তা না বাঁচতে পারলে বেহেশতেরও কোন আশা করা যায় না। আর যেহেতু কালেমা পড়া প্রত্যেকের একই বিশ্বাস, একই লক্ষ্য, একই উদ্দেশ্য, কাজেই তাদের দাবীও হতে হবে এক, তাদের সবাইকে মিলে বলতে হবে একই কথা। তাদের সবাইকে চলতে হবে একই সঙ্গে ও একই উদ্দেশ্যে। আর যে ইলাহা বা প্রভুত্ব নিয়ে মানুষ ও আল্লাহর মধ্যে বিপরীতমুখী দাবী তা মানুষের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করাই হচ্ছে কালেমা পড়াদের একমাত্র কর্তব্য ও দায়িত্ব। তাহলে এর থেকে প্রমাণ হলো যে, কালেমার বিশ্বাসই তার অনুসারীদের বাধ্য করে বিপ্লবী আন্দোলন করতে ও জিহাদ চালাতে, কিন্তু প্রশ্ন, বর্তমান যুগে কালেমার যে ব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছে তার সঙ্গে আমার কথার কোন মিল পাওয়া যাচ্ছে না কেনো ? এর জবাবে আমি কয়েকটি জানা কথা বলছি যার প্রতি লক্ষ্য করলে এবং তা আমার ব্যাখ্যার সাথে মিলিয়ে দেখলে অবশ্যই বুঝবেন যে, আমি কোন নতুন কথা বলছি না। যেমন লক্ষ্য করুন:

(১) প্রথম ওহী নাজিল হওয়ার পরে অরাকা বিন নওফেলকে ঘটনাটি বললে তিনি বলেছিলেন- **''তুমি যখন এ কালেমার প্রচার শুরু করবে তখন সারা দেশের লোক ভীষণভাবে তোমার বিরোধিতা শুরু করবে।''**

(২) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা তায়েফে গিয়ে এত মার খেয়েছিলেন যে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলেন।

(৩) তিনি অনেকগুলো যুদ্ধ করেছিলেন।

(৪) তিনি শিবে আবু তালিব পাহাড়ে নির্বাসিত হয়েছিলেন যে সময়ে আরবের লোকেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-কে ও তার সঙ্গী সাথীদেরকে ভাতে পানিতে মারার পরিকল্পনা করেছিল। অতঃপর গাছের ফল, গাছের ছাল ও উটের শুকনো চামড়া খেয়েও জীবন ধারণ করতে হয়েছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা ও তার সঙ্গী সাথীদেরকে।

(৫) শেষ পর্যন্ত মাতৃভূমি ছেড়ে তিনি দেশত্যাগী হয়েছিলেন।

(৬) মদিনায় গিয়ে শক্তি সঞ্চয় করে পৌনে এক যুগ পরে আবার মক্কা মোকাররমায় আসেন বিজয়ীর বেশে।

(৭) অতঃপর ঘোষণা করা হয়; এখন থেকে মক্কায় আল্লাহর ঘরে কোন প্রতিমা থাকবে না। এমনকি ইবরাহিম আলাইহিস সালাম আত-তাসলিমা ও ঈসা আলাইহিস সালাম আত-তাসলিমা-এর প্রতিমাসহ সব প্রতিমা ভেঙ্গে দাও। এখন থেকে চুরি করলে তার হাত কাটা যাবে, যেনা করলে দোররা মারা হবে এখন থেকে সমাজের প্রতিটি কাজই হবে ইসলামের তথা আল্লাহর বিধান মোতাবেক। এসব কথাগুলো দেখুনতো চিন্তা করে পূর্বে শুনেছেন কিনা ? নিশ্চয়ই শুনেছেন। এখন মিলিয়ে দেখুন আমার এই কথাগুলো যা আপনি চিন্তা করেছেন যে এতো পূর্বে শুনিনি তা কি নবীর জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না কি সংঘাত সৃষ্টিকারী ?

এর পরও যদি বলতে চান যে আল কুরআন ও কালেমা তাইয়েবা আমরাও পড়ি কিন্তু তা তো আমাদের দৃষ্টিতে আন্দোলনী কিংবা শ্লোগানের কালেমা হিসাবে ধরা পড়ে না তাহলে আমি বলবো মানুষ একই জিনিস একই সঙ্গে একই আকৃতিতে দেখে কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্যের কারণে চোখের দেখাও ভিন্নরূপ হয়ে যায়। যেমন চাঁদের ভিতরের কালো দাগকে কেউ দেখে **''চাঁদের মা বুড়ী কুঁজো হয়ে বসে সুতো কাটছে''** আর কেউ দেখে চাঁদের কালো পাহাড়-পর্বত হিসাবে ওগুলোকে, আর কেউ দেখে চাঁদের গায়ের খাদ গর্ত যেখানে সূর্যের আলো পড়ে না- পড়ে ছায়া, তাই এমনতর কালো দাগ দেখায়। একই চাঁদকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির কারণে যেমন ভিন্ন ভিন্ন দেখায় তেমন একই কুরআন ও একই কালেমাকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ভিন্ন ভিন্ন রূপ মনে হয়। কিন্তু চাঁদের বিভিন্ন রূপ দেখার মধ্যে যেমন কোনটার যুক্তি নেই এবং কোনটার স্বপক্ষে যুক্তি আছে, ঠিক তেমনই চিন্তা করুন আমার উপস্থাপিত কথার সঙ্গে নবী জীবনের যাবতীয় কার্যাবলীর যুক্তিসঙ্গত মিল আছে কি নেই। তাহলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। অতঃপর দেখা যাক এ কালেমার আহ্বানে আরবের লোক যারা আরবী মাতৃভাষা হওয়ার কারণে তা ভালোই বুঝতো তাদের প্রতিক্রিয়া কিরূপ ছিল। দেখা যায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-কে যারা **আল-আমিন** উপাধি দিয়েছিল তারাই শেষ পর্যন্ত ও আহ্বান সাড়া দিলো না। তারা কেউই স্বীকার করতে চাইলো না এ কালেমার আহ্বানে মেনে নিতে। তারা পরিষ্কারভাবে বুঝলো যে, এ কালেমার দাবী মেনে নেবার অর্থই হলো বর্তমানে যে শক্তি ও প্রভুত্ব ভাগ ভাগ হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে কিছু কিছু করে তাদের-

(ক) গোত্রপতিদের মধ্যে,

(খ) উপ-গোত্রপতিদের মধ্যে,

(গ) ধর্মযাজকদের মধ্যে,

(ঘ) ধর্মীয় উপনেতাদের মধ্যে,

(ঙ) একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের মধ্যে,

(চ) ওস্তাদ গুরুজনদের মধ্যে এবং

(ছ) বিভিন্ন ধরনের কায়েমী স্বার্থবাদীদের মধ্যে-

তা সব ওদের প্রত্যেকের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে কেন্দ্রীভূত করা হবে আল্লাহর হাতে। তাতে সর্বনাশ হবে ঐ ৭ শ্রেণী কায়েমী স্বার্থবাদীদের। কায়েমী স্বার্থবাদীরা চিন্তা করলো যে, এমন এক কালেমার দাওয়াত উত্থাপন করা হয়েছে যা মানুষের মন-মস্তিষ্কে একবার স্থান পেলে মানুষের যাবতীয় কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত হবে আল্লাহর বিধান মোতাবেক। আর কোন প্রাধান্যই আমাদের হাতে রইবে না। অতঃপর আমরা যাদের ওপর ষোলআনা কর্তৃত্ব করি তাদের উপর আমাদের আর এক আনাও কর্তৃত্ব থাকবেনা। আর যাদেরকে জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় মনে করি তারাও আমাদের সমপর্যায়ে এসে যাবে। এটা প্রভু গোষ্ঠি মোটেই বরদাস্ত করতে পারছিল না। তাই তারা মরিয়া হয়ে লেগে গেল রাসূলের আন্দোলনকে দমন করার কাজে কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা তার কাজ চালিয়েই যেতে থাকলেন। যারা ২/৪ জন করে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদেরকে ট্রেনিং দিয়ে যোদ্ধা বানানো হচ্ছিল এবং দাওয়াতি ও আন্দোলনী কাজ সমান তালে জারী রাখা হয়েছিল। লক্ষ্য করলে দেখা যায় সে সময় যারা মুসলমান হচ্ছিলেন তারা প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন গরীব শ্রেণীর লোক। যারা ছিলেন (১) শোষিত (২) নির্যাতিত (৩) অত্যাচারিত (৪) অবহেলিত (৫) উৎপীড়িত (৬) ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী এবং (৭) যারা ছিলেন সৎ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিসম্পন্ন এবং জ্ঞানীগুণী লোক। মুসলমান হয়েছিলেন তারাই। কিন্তু যারা ছিল (১) শাসক ও গোত্রপতি, (২) শোষক ও সামন্ত প্রভু, (৩) পাদ্রী বা ধর্মপ্রভু, (৪) ধর্মযাজক বা ধর্মীয় নেতা, (৫) অত্যাচারী জালেম, (৬) বিভিন্ন ধরনের কায়েমী স্বার্থবাদী, (৭) প্রভুত্ব, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের লোভী এবং (৮) অর্থ লোভী, তারা কিন্তু কেউই মুসলমান হতে পারেনি। অর্থাৎ পারেনি কালেমার বিপ্লবী দাওয়াতকে মেনে নিতে।

সে যুগের মানুষের চাইতে সম্ভবত আমরা এ যুগের মানুষ খুব চতুর। তাই আমরা এমন সুকৌশলে কালেমার মূল আহ্বানকে আড়ালে রাখি যেন ভয়ে কেউ সরে না যায়। তাই উপরোল্লিখিত সব শ্রেণীর লোকই আমাদের দাওয়াত কবুল করেন।

আর সে যুগের দাওয়াত ও এ যুগের দাওয়াতের মধ্যে আরো ক'টি পার্থক্য রয়েছে। তা হলো (১) আমাদের দাওয়াত জন্মগত মুসলমানদের প্রতি আর তাদের দাওয়াত ছিল মানবগোষ্ঠির প্রতি (২) আমাদের দাওয়াত সমাজে বিপ্লব সৃষ্টি করে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম কায়েমের প্রতি নয় এবং কোন আন্দোলনের দাবীও আমাদের নেই কিন্তু সে যুগের দাওয়াতে তা ছিল। তারা বুঝতেন যে ইসলামী আইন রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বহাল না হলে সে আইনের কোন মূল্য থাকে না তাই ইসলামী আইন কায়েম করার লক্ষ্যে তারা জীবন ও ধন-সম্পদ দান করাকেই জীবনের সাফল্য বলে বিশ্বাস করতেন।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর তাৎপর্য

এই কালেমার মধ্যে বলা হয়েছে **'লা ইলাহা'** নেই কোন হক্ব মনিব বা হুকুম কর্তা **'ইল্লাল্লাহ'** মহান আল্লাহ ছাড়া। অর্থাৎ মহান আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন মুনিব বা হুকুম দাতাকে মুনিব বা হুকুম কর্তা হিসাবে মানি না। এবার খোঁজ করে দেখা দরকার মানুষের উপর মহান আল্লাহ ছাড়া আর কে কে হুকুম দাতা হিসাবে কাজ করে:

(১) মানুষের নিজের নফস বা মন: যে চুরি বা যেনা করে সে নিশ্চয়ই আল্লাহর হুকুমে করে না; করে তার মনের হুকুমে।

(২) পিতা-মাতা, ওস্তাদ-গুরুজন।

(৩) গ্রাম্য মাতব্বর।

(৪) সমাজের প্রথা-প্রচলন। যেমন: পৌষ মাস গেলে ধান বের করা যাবে না, রবিবার বৃহস্পতিবারে বাঁশ কাটা নিষেধ, স্বামী, ভাসুর ও শ্বশুরের নাম উচ্চারণ করা মহাপাপ। ছেলে, মেয়ের আকিকা না করলেও ষষ্টির কামান পালতেই হবে ইত্যাদি আল্লাহর হুকুম নয়; সামাজিক প্রথা মাত্র।

(৫) **অনুকরণ:** যেমন- স্যুট, কোট, নেকটাই পরা, দাড়ি মুন্ডান এ সবই অনুকরণ মাত্র।

(৬) **উপরওয়ালাঃ** যাদের অধীনে চাকুরী করে সে সব উপরওয়ালাগণ।

(৭) **রাষ্ট্রীয় আইনঃ** রাষ্ট্র কর্তৃক সুদের বাধ্যতামূলক লেনদেন, মদ ও জুয়ার অনুমতি, যেনার লাইসেন্স, নর-নারীর অবাধ মেলামেশায় সরকারী নিয়ন্ত্রণহীনতা, অশ্লীল ও পর্ণো ছায়াছবি তৈরী ও আমদানীর অবাধ অনুমতি ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় আইনের ছত্রছায়ায় হয়ে থাকে। এরা সবাই মানুষের উপর হুকুম কর্তা।

বলা বাহুল্য এই ৭টিই হচ্ছে কালেমার রাস্তায় চলার পথে প্রধান বাঁধা। কারণ এদের হুকুম যদি মহান আল্লাহর হুকুমের বিপরীত হয়ে যায় তবে কিছুতেই এদের হুকুম মানা যায় না। অথচ এসব শক্তি মানুষকে বাধ্য করে তাদের হুকুম মত চলতে। আর কালেমা পড়া লোক যদি তাদের হুকুমে চলে তবে অবশ্যই তারা পুরা মুসলমান থাকতে পারে না। তাই কালেমার দাবী পূরণের উদ্দেশ্যেই কালেমা পড়া মুসলমানদের করতে হয়েছিলঃ (১) দাওয়াতি কাজ (২) আল জামায়াত (৩) তা'লীম বা শিক্ষা (৪) তরবিয়ত বা প্রশিক্ষণের কাজ (৫) জিহাদের ট্রেনিং ও জিহাদে ঝাপিয়ে পড়ার কাজ (৬) পরকালের জবাবদিহির ভিত্তিতে খেলাফত কায়েম করার কাজ এবং (৭) যেন মানুষের প্রতিটি আচরণই ইবাদতে পরিণত হয় এরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করে দেওয়ার কাজ।

আমি বুঝিনা যে বিংশ এবং একবিংশ শতাব্দীর মানুষ যারা অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও যুক্তিবাদী তারা কালেমা পড়বেন অথচ ঐসব বিষয়ে কোন চিন্তা-ভাবনা করবেন না, এ কেমন বুদ্ধির পরিচয়। যারা একথা বোঝেন যে ট্রানজিস্টারের মিটার সামান্য একটু ঘুরিয়ে দিলেই এক সেন্টারের কথা বন্ধ হয়ে অন্য সেন্টারের কথা আসা শুরু হয়ে যায় তারা কি করে বোঝেন না যে কালেমার দাবীর মধ্যে সামান্য কিছু পরিবর্তন করলেই বেহেশতের রাস্তা থেকে মানুষ গোমরাহীর রাস্তায় উঠে যায়। তারা কি এ কথাটা একটু ভেবে দেখবেন না যে, সে যুগের কালেমা চাইতো মানুষের প্রভুত্ব খতম করে আল্লাহর প্রভুত্ব কায়েম করতে, মিথ্যা ইলাহর দাবীদার নমরুদ, ফেরাউন, শাদ্দাদ, আবু জেহেল ও আবু লাহাবদেরকে সিংহাসনচ্যুত করে মহান আল্লাহর খেলাফত কায়েম করতে। আর আজকের কালেমা ? আজ আর সেই হায়দারী হুংকারের গরম কালেমা নেই। এ কালেমা হয়ে গেছে ঠান্ডা বরফের ন্যায়। আজকের কালেমা আল্লাহর প্রভুত্ব চায় না, খেলাফতও চায় না, চায় এক মুঠো ভিক্ষা। তাই

আজকের কালেমায় কারো রাজসিংহাসন কেঁপে ওঠে না; কেঁপে ওঠে আটা বা চাউলের ভাড়। এই হল এ যুগের কালেমার ফলাফল।

আর নবী যুগের কালেমার দাওয়াতের ফলাফল ছিল কমপক্ষে ৭ × ২ = ১৪টি। যথা:

(১) খতম হল মানুষের উপর থেকে মানুষের প্রভুত্ব, ফলে মানুষ পেল মানুষের মর্যাদা।

(২) অন্যায়, অত্যাচার ও জুলুম নির্যাতন খতম হল চিরতরে।

(৩) অর্থনৈতিক শোষণ বন্ধ হল, মানুষ পেল মানুষের মত বাঁচার অধিকার।

(৪) অশ্লীল কাজ ও বেহায়াপনা বন্ধ হল।

(৫) দাসপ্রথা খতম হল।

(৬) সন্তান হত্যা বন্ধ হল।

(৭) নারী নির্যাতন বিদায় হল।

(৮) দূর হল যাবতীয় ধরণের কুসংস্কার।

(৯) মানুষকে দিয়ে মানুষের আর কোন ভয় রইল না।

(১০) মানুষের যাবতীয় কাজ ইবাদতে পরিণত হল।

(১১) মুসলমান সারা বিশ্বের সেরা জাতি হিসাবে পরিগণিত হল।

(১২) জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলমানরা হল সারা পৃথিবীর ওস্তাদ।

(১৩) মুসলমানদের হাতে এল বিশ্বনেতৃত্ব।

(১৪) মানুষের জীবনে ফিরে এল নির্ভেজাল শান্তি, মানুষ খুশিতে নেচে উঠল।

এ ছিল সে যুগের কালেমার দাওয়াতের ফলাফল। এ কথা কি কেউ অস্বীকার করবেন ? এ কালেমা আজও আমাদেরকে ফিরিয়ে দিতে পারে সেই হারানো মর্যাদা যা একদিন কালেমার বদৌলতে আমরা পেয়েছিলাম। এ সবই আমরা মানি কিন্তু মানিনা শুধু একটি জিনিস, তা হল **'শক্তিধরদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়া'** এর জন্য কালেমার অর্থকে পাল্টে দিয়েছি। আন্দোলন, জিহাদ ও

রাজনীতিকে হারাম বলে ফতোয়া দিয়েছি এবং ঝালেমা এড়ানোর সহজ পথ ধরেছি ফলে কালেমা প্রভুত্ব চাচ্ছে না; চাচ্ছে এক মুঠো ভিক্ষা। অথচ এই কালেমাই একদিন চেয়েছিল মানুষের প্রভুত্ব খতম করে আল্লাহর প্রভুত্ব কায়েম করতে।

কালেমা চায় দেশে ইসলামী আইন

কালেমার দাবী হল দেশে ইসলামী আইন চালু হওয়া। কালেমা কেন দেশে ইসলামী আইন চায় একথা আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠেছে। আমরা বাস করব একটা আইনের দেশে এক প্রকার আইন মেনে নিয়ে কিন্তু ইসলাম যদি সেই আইনের বিপরীত আইন চায় তাহলে মনের শত আগ্রহ থাকলেও তা মেনে চলা যায় না। এটা আমরা খুব ভালভাবেই বুঝি। কিন্তু যেহেতু ইংরেজ আমল থেকে গায়রে ইসলামী আইন-কানুন মেনে চলে ঐ পথে এমনভাবে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি যে জানা কথাকেই নুতন করে জানতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যেতে হয়।

আইন কাকে বলে: সর্বময় ক্ষমতার পক্ষ হতে যে নির্দেশ আসে ঐটার নামই আইন। আইনের পিছনে যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা না থাকে তা হলে তার নাম কোন কিতাবই লেখে না যে তাকে 'আইন' বলা হয়। আর আইন হলেই তার সঙ্গে কমপক্ষে দুটো জিনিস থাকতে হবে:

(১) আইন প্রয়োগকারী সংস্থা অর্থাৎ পুলিশ বিভাগ।

(২) আইন সংরক্ষণকারী সংস্থা অর্থাৎ বিচার বিভাগ।

যেমন দেখুন আমাদের বাংলাদেশে আইন আছে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা পুলিশ বিভাগ আছে যাদের মাধ্যমে আইনকে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। আর আইনের যেন কোন প্রকার অপপ্রয়োগ না হয় তা দেখার জন্য বিচার বিভাগও রয়েছে ফলে আইন দেশে কার্যকর হতে পারছে। কিন্তু আমরা মুখে দাবী করি ইসলামের আইন রয়েছে- হ্যাঁ, রয়েছে একথা ঠিকই কিন্তু সাইকেল থাকলে তার যেমন চাকা থাকা লাগে তা নাহলে সাইকেল চলতে পারে না ঠিক তেমনই ইসলামী আইনের প্রয়োগকারী কোন সংস্থা ইসলামের হাতে না থাকার কারণেই ইসলামী আইন কিতাবে থাকলেও সমাজে তা কার্যকর হতে পারে না। যেমন ইসলামের আইন বলে চোরের হাত কেটে দাও, ডাকাতের এক পাশের হাত এবং অপর পাশের পা কেটে দাও ইত্যাদি। এসব আইনের পিছনে নেই রাজশক্তি আর নেই আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং আইন সংরক্ষণকারী সংস্থা।

তাই হাত কাটা পা কাটা কোনদিন এখানে কার্যকর হতে কেউ দেখেনি। কারণ এখানে ইসলামী হুকুমত নেই। ইসলামী আইন যেন সমাজে কার্যকর হতে পারে সে জন্যেই আল্লাহর নবী একটানা বিরামহীন সংগ্রাম করেছেন ২৩ বছর। এরপর যখনই ইসলামের হাতে রাষ্ট্রব্যবস্থা এসে গেছে এবং যখনই ইসলামী আইনের পিছনে রাজক্ষমতা যোগ হয়েছে তখনই ইসলামের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাও তৈরী হয়েছে ইসলামের বিচার বিভাগও হয়েছে এবং চুরি করলে হাত কাটাও সম্ভব হয়েছে। আর যতদিন পর্যন্ত ইসলামের হাতে রাজশক্তি আসেনি ততদিন পর্যন্ত ইসলামের কোন আইনই সমাজে কার্যকর হতে পারেনি। এ ব্যাপারে স্পষ্ট ধারনা রয়েছে ঐ সংক্ষিপ্ত ২৪টি অক্ষর বিশিষ্ট ৭ শব্দের কালেমার মধ্যে। আশা করি আমরা বুঝতে সক্ষম হব।

সাবধান! আজ সারা বিশ্বে এ কালেমার দ্বারা এক শ্রেণীর লোক সবার অলক্ষ্যে জাবারিয়া মতবাদের দিকে সাধারণ লোকদেরকে আহ্বান জানাচ্ছে। জাবারিয়া এক বাতিল সম্প্রদায়। তারা মনে করে **(১) ''আল ইনসানু কাল জামাদ'' ''মানুষ জড় পদার্থের ন্যায়" (২) তার নিজের কিছুই করার নেই (৩) ''আল্লাহ যা করায় মানুষ তাই করে" (৪) ফেরাউন, নমরুদ যারা বাদশাহ হয়েছিল তাদেরকে আল্লাহই বাদশাহ করেছিলেন, কাজেই (৫) তাদের বিরুদ্ধে আমাদের কিছুই বলার নেই। (৬) যা কিছু হয় তা সবকিছুই আল্লাহ থেকেই হয়। কালেমা যদি এই মতবাদ প্রচার করে তবে এ কালেমাকে স্বাগতম জানাবে নমরুদ, ফেরাউন, শাদ্দাদ ও তাদের তামাম অনুসারীরা। বিরোধীতা করবে না এর কেউ-ই।**

কিন্তু যদি জান্নাত পাওয়ার জন্যেই এ কালেমাকে পড়তে হয় তবে কুরআন হাদিস ও রাসূলের জীবনীর সঙ্গে কালেমাকে মিল করে দেখুন এং অত্যন্ত পরিষ্কার মনে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি সহকারে আমার এ ক্ষুদ্র আলোচনাটুকুর উপর চিন্তাভাবনা করুন। অতঃপর আপনার খালেছ মন থেকে যা সাক্ষ্য পাবেন সেই মোতাবেক কাজ করুন। তবে নিশ্চয়ই কালেমা আমাদেরকে উদ্ধার করবে ইহকালের অশান্তি থেকে এবং পরকালের শাস্তি অর্থাৎ ৭টি জাহান্নামের স্তর থেকেও। (কালেমার হাকীকত)

কোন ঈমান শ্রেষ্ঠ ?

একবার মুয়াজ রাজিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা কোন ঈমান শ্রেষ্ঠ ? (অর্থাৎ ঈমানের কোন গুণ

শ্রেষ্ঠ) উত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলিয়াছিলেন ঃ

কাহাকেও মিত্র ভাবিবে, তবে মহান আল্লাহর ওয়াস্তেই মিত্র ভাবিবে। পক্ষান্তরে কাহাকেও শত্রু ভাবিবে, তাও মহান আল্লাহর ওয়াস্তেই শত্রু ভাবিবে এবং নিজের জবানকে মহান আল্লাহর যিকিরে মশগুল রাখিবে। মুআজ রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ আমি পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ অতঃপর আমি কি করিব ? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলিলেন ঃ অপরের জন্য তাহাই পছন্দ করিবে যাহা নিজের জন্য পছন্দ কর। এভাবে অপরের জন্য তাহা না পছন্দ করিবে যাহা নিজের জন্য না পছন্দ কর। (অর্থাৎ সকলেরই মংগল কামনা করিবে) (আহমাদ, মিশকাত)

আমর বিন আবাছা রাজিয়াল্লাহু আনহু একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-কে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা: ঈমান কি ? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলিলেন ঃ গোনাহর কাজ হইতে ছবর করা ও দান করা। আমর রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ আমি পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা কোন ঈমান উত্তম ? (অর্থাৎ ঈমানের কোন শাখা উত্তম ?) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলিলেন ঃ সৎস্বভাব। (আহমাদ, মিশকাত)

আবু উমামা বাহেলী রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-কে জিজ্ঞাসা করিল ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা! ঈমান কি ? (অর্থাৎ ঈমানের বিশুদ্ধতার পরিচয় কি ?) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলিলেন ঃ যখন তোমার সৎকার্য তোমাকে আনন্দ দিবে এবং তোমার অসৎকাজ তোমাকে পীড়া দিবে তখন তুমি (বিশুদ্ধ) মুমিন। সে পুনঃ জিজ্ঞাসা করিল ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা! অসৎকাজ (গোনাহ) কি ? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলিলেন ঃ যখন কোন কাজ করিতে তোমার অন্তরে বাঁধে তখন উহা ছাড়িয়া দিবে। (আহমাদ, মিশকাত)

প্রিয় নবীজীকে প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য ছিল ঈমানের পরিচয় জানা ও বুঝা। ঈমান আছে কিভাবে বুঝবে। তাই প্রিয় নবীজী বুঝিয়ে দিলেন, খারাপ কাজ ও আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ কাজ করলে মনে খারাপ লাগে, জ্বালাপোড়া সৃষ্টি হয়,

তখন বুঝতে হবে ঈমান আছে। ঈমান আছে বলেই মন খারাপ লাগছে। দ্বিতীয় প্রশ্নের অর্থ হল, মানুষ মানবীয় দুর্বলতার কারণে এমন কিছু কাজ করে ফেলে যা সে জানে না শারীআতের দৃষ্টিকোণ থেকে এ কাজ ঠিক কি বেঠিক! এসব সন্দেহজনক ব্যাপারে ভাল কোনটা জানার উপায় কি? এ ব্যাপারে নবীজী উত্তর দিলেন মুমিনের অন্তর পাক পবিত্র। কাজেই কোন খারাপ বা গুনাহের কাজ করলেই তার মনে খটকা লাগে, অস্থির বিবেকশূন্য হয়ে যায়। তখনই বুঝবে একাজ করা ঠিক নয়। সাথে সাথে এমন কাজ ছেড়ে দিবে। কখনো আর এ কাজ করবে না।

আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন ঃ যাহার আমানত নাই তাহার ঈমান ও নাই এবং যাহার ওয়াদা অংগীকারের মূল্য নাই তাহার দ্বীন ও নাই। (শোআবুল ঈমান, মিশকাত)

আবু উমামা বাহেলী রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর ওয়াস্তে কাহাকেও ভালবাসিবে অথবা মহান আল্লাহর ওয়াস্তে কাহারও সহিত শত্রুতা রাখিবে এবং মহান আল্লাহর ওয়াস্তে দান- খয়রাত করিবে অথবা মহান আল্লাহর ওয়াস্তেই দান– খয়রাত হইতে বিরত থাকিবে। সে তাহার ঈমান পূর্ণ করিয়া লইল। (আবুদাউদ, মিশকাত)

উপরে উল্লেখিত হাদীসে পরিপূর্ণ ঈমানদারের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, মানুষের সব কাজই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রাজী-খুশির জন্য হওয়া উচিত, কোন হীন স্বার্থ সিদ্ধি, প্রদর্শনী, নাম-যশ, আবেগের বশবর্তী হয়ে করা উচিত নয়। দৃষ্টান্তস্বরুপ বলা হয়েছে। যদি কাউকে ভালবাস অথবা যদি কাউকে খারাপ জান ও শত্রুতা পোষণ কর তাহলে তা যেন নিজের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের জন্য না হয়। কেউ ভাল কাজ করছে, এজন্য আল্লাহর ওয়াস্তে তাকে ভালবাসতে হবে। কেউ খারাপ কাজ করছে যা মহান আল্লাহর নিকট ঘৃণা ও অপছন্দনীয়। তাই তাকে আল্লাহর জন্য ঘৃণা করা ও তার সাথে শত্রুতা পোষণ করতে হবে, ঠিক এজন্যই একজন মুমিন আর একজন মুমিনকে ভালবাসে, এজন্যই মুমিনদের পরস্পরের মধ্যে সিসাঢালা প্রাচীরের মত অটুট সম্পর্ক গড়ে উঠে। আবার ফাসিক্ব, কাফির ও মুরতাদের সাথে শত্রুতা হয়। তাকে ঘৃণা করে। কারণ সে আল্লাহকে বিশ্বাস করে না ভালবাসে না। এ ভাবে দান করবে মহান আল্লাহকে খুশী করার জন্য যেসব খাতে মহান আল্লাহ খরচ

করতে বলেছেন। আর যেসব জায়গায় খরচ করা গুনাহ, যে খরচে কোন সওয়াব পাওয়া যাবে না সেসব জায়গায় মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য খরচ করে না। এরাই প্রকৃত ও পূর্ণ ঈমানদার।

আবু জর গেফারী রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন ঃ সমস্ত কাজের শ্রেষ্ঠ কাজ হইতেছে মহান আল্লাহর ওয়াস্তে মিত্রতা করা আর মহান আল্লাহর ওয়াস্তেই শত্রুতা করা। (আবুদাউদ, মিশকাত)

আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ ঈমানদার হয় না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তাঁর পিতা, পুত্র এবং সমস্ত মানুষের চেয়েও প্রিয়তর হই। (বুখারী) অন্য আরো একটি হাদীসে উল্লেখ হয়েছে, একদা উমার বিন খাওাব রাজিয়াল্লাহু আনহু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমাকে সম্বোধন করে বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার জীবন ছাড়া আর সকল জিনিস থেকে আপনাকে বেশী ভালবাসি।" তখন প্রিয় নবীজী ইরশাদ করলেন, "না, হে উমার বিন খাওাব! তুমি পাক্কা মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তোমার নিকট তোমার জীবন থেকেও বেশী প্রিয় হবো।"

নবীজীর মুখে একথা শুনে উমার বিন খাওাব রাজিয়াল্লাহু আনহু উচ্চঃস্বরে বলে উঠলেন, "মহান আল্লাহ সাক্ষী, হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা! আপনি এখন আমার জীবনের চেয়েও আমার নিকট বেশী প্রিয়।"

তখন প্রিয় নবীজী উমারকে বললেন: 'এখন ঠিক হয়েছে হে উমার! [আল উবুদিয়্যা-কৃত শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহিমাল্লাহ] **বুঝা গেল, পরিপূর্ণ ভালবাসা সৃষ্টি করার জন্য প্রেমাষপদের সাথে পরিপূর্ণ ভালবাসার সঠিক জয্বা সৃষ্টি করতে হবে। পরিপূর্ণ ভালবাসার অর্থ ও মানদন্ড হলো, নিজের পছন্দ ও অপছন্দ, নিজের ভালবাসা ও শত্রুতা প্রিয়তমের পছন্দ ও অপছন্দ এবং ভালবাসা ও শত্রুতার জন্যই হয়ে থাকে। এটা তো জানা কথাই যে প্রকৃত প্রিয়তম মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের পছন্দনীয় জিনিস হলো 'ঈমান'** ও **'তাক্বওয়া'** আর অপছন্দনীয় জিনিস হলো **'নাফরমানী'** ও **'ফাসেকী'**। (ঐ)

আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ ঈমানদার হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তার মুসলিম ভাই তার জন্যও তাই পছন্দ করে। (বুখারী)

আবু মুসা রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা কোন (মুসলিমের) ইসলাম সবচেয়ে ভাল ? তিনি বললেন, ঐ মুসলিমের ইসলাম সবচেয়ে ভাল যার জিহবা ও হাত থেকে মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে। (বুখারী) মুসলিমে বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি নবীজীকে জিজ্ঞেস করল, মুসলিমদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি কে? তিনি বললেন ঃ যার মুখ ও হাতের অনিষ্ট হতে অন্য মুসলিমগণ হিফাজাতে থাকে।

উল্লেখিত হাদীসদ্বয়ে বলা হয়েছে যে, শুধু কালিমা পাঠ করে ও কিছু সুনির্দিষ্ট আমল ও আরকান পালন করে পূর্ণ মুসলিম হওয়া যায় না, বরং ইসলামী শারীআত তাঁর অনুসারীদের কাছে এমন একটি পরিপূর্ণ ঈমানদার হবার সাথে সাথে মানবতার সব গুণের সমাবেশ ঘটবে। মুসলিম ব্যক্তির দ্বারা কেউ অনাহুত ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। দুঃখ-কষ্ট পাবে না। কাউকে অযথা বকাঝকা করবে না। অন্যায়ভাবে কাউকে মারবে না, বরং মানুষকে ভালবাসবে, ইজ্জত করবে। আমানতদারী ও ওয়াদা রক্ষা করবে। নৈতিকতার বিকাশ ঘটাবে। সমবেদনা, সিমপ্যাথী ও সহানুভূতি দেখাবে। মানুষ একজন মুসলিমকে সবদিক দিয়ে নিরাপদ মনে করবে।হাত আর মুখ উল্লেখ করার কারণ হল, সাধারণতঃ এই দু'টি জিনিসই মানুষকে বেশী কষ্ট দিয়ে থাকে।

ঈমানের লয্যত বা স্বাদ

আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন ঃ যার ভিতর তিনটি গুণ আছে সে ঈমানের সুমিষ্ট স্বাদ পেয়েছে ঃ

১. তার নিকট অপর সকলের চেয়ে মহান আল্লাহ ও রাসূল প্রিয়তর হয়।

২. কাউকে ভালবাসলে মহান আল্লাহর জন্যই ভালবাসে

৩. আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে যেমন অপ্রিয় জানে, কুফরীতে ফিরে যাওয়াকেও তেমনি অপ্রিয় জ্ঞান করে। (বুখারী)

আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন ঃ সে-ই ঈমানের স্বাদ পেয়েছে যে মহান আল্লাহকে রব, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মাদকে রাসূল হিসেবে পাইয়া সন্তুষ্ট রহিয়াছে। (মুসলিম, মিশকাত)

আবু হুরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এর সাহাবীদের মধ্য হইতে কতক লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এর নিকট আসিলেন এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ আমাদের মধ্যে কেহ তাহার অন্তরে এমন কোনো কথা অনুভব করে যাহা ব্যক্ত করাকে সে বড় গুরুতর বলিয়া মনে করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলিলেন ঃ "তোমরা কি এরূপ গুরুতর বলিয়া মনে কর ? তাহারা বলিলেন ঃ জী, হ্যাঁ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বললেন, ইহা তোমাদের স্পষ্ট ঈমান।" (মুসলিম, মিশকাত)

প্রত্যেক বস্তুর একটি লয্যত বা স্বাদ আছে ঈমানেরও তেমনই একটি লয্যত (স্বাদ বা মজা) আছে। স্বাদ বা মিষ্টতা লাভ না করা পর্যন্ত মানুষ উহার প্রতি যথাযথরূপে আকৃষ্ট হইতে সক্ষম হয় না। তাই ঈমানী লয্যত সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন। **উপরে উল্লেখিত বুখারীর হাদীসে বলা হয়েছে, যার মধ্যে তিন জিনিস পাওয়া যাবে সে ব্যক্তিই ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করবে। এভাবে কথা বলার কারণ হলো মানুষ তখনই কোন জিনিসের স্বাদ পায় যখন সে জিনিসের উপর তার হৃদয়ে অনুরাগ ও আর্কষণ বদ্ধমূল হয়। কোন জিনিসের প্রতি যখন ভালবাসা ও আকর্ষণ সৃষ্টি হয় তখন সে জিনিস পেলে মনে এক প্রশান্তি, তৃপ্তি ও পূলক শিহরণ জাগে। স্বাদ শব্দটি এমন একটি বিশেষ অবস্থার নাম যা রুচিসম্মত ও আকর্ষিত জিনিস অনুভব ও হাসিল করার পর (হৃদয়) মনে সৃষ্টি হয়। কোন দার্শনিক ও মনোবিজ্ঞানীর মতে আকর্ষণীয় জিনিস ভোগ ও লাভ করার অপর নাম হলো স্বাদ। এ কথাটি এত ওজনহীন ও অমূলক কথা যে এর প্রতিবাদ করারও প্রয়োজন নেই। কারণ এ ভোগ ও লাভই তো হলো আকর্ষণ ও স্বাদের মধ্য-মনি। শুধু স্বাদ স্বয়ং নয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে খাবারের ব্যাপারটি নিন। খাবার মানুষের জন্য একটি চিত্তাকর্ষক জিনিস। যখন সে খাবার খেয়ে**

ফেলে তখন এর স্বাদ অনুভব করে। তারপর এ কথা বলা কতটুকু ভুল যে খাবার খাওয়াটাই হলো স্বাদ। এভাবে দৃষ্টি শক্তির কথা ধরুণ। মানুষ কোন প্রিয় জিনিস দেখার পর তার মনে একটি তৃপ্তি লাভ করে। তাই বুঝা গেল, যে তৃপ্তি লাভ হয় ঐ প্রিয় জিনিস দেখার ও দৃষ্টিপাতের পর। এ কারনে নজর এক জিনিস আর স্বাদ ও তৃপ্তি আর এক জিনিস যা দেখার পরই সৃষ্টি হয়। পবিত্র কুরআনের শব্দাবলীও এ সত্যেরই সাক্ষ্য দেয়।

وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ -

"ওয়া ফীহা মা তাসতা-হিহিল আনফুসু অতালাজ্জুল আ' ইউনু ওয়া আনতুম ফীহা খলিদুন অর্থাৎ জান্নাতে এমন সব নাজনেআমত থাকবে যা পাবার জন্য মনে আগ্রহ সৃষ্টি হবে। আর এর দ্বারা মন তৃপ্তি লাভ করবে।" (জুখরুফ-৭১) বুঝা গেলো শুধু দেখার নামই লজ্জত (স্বাদ) নয়। নতুবা এভাবে হতোনা যে চোখ তাকে দেখেই পরিতৃপ্ত হয়ে যাবে। অন্যান্য অনুভূতি সম্পন্ন ব্যাপারগুলিরও এ একই অবস্থা। আনন্দ ও বিপদের যে সব অবস্থা আত্মা অনুভব করবে তা কোন না কোন পছন্দনীয় জিনিস অথবা অপছন্দনীয় জিনিস লাভের ও ভোগের অনুভূতিরই ফলাফল। স্বয়ং অনুভূতি ও উপলব্ধির ফল নয়। অতএব ঈমানের স্বাদ ও এর থেকে প্রাপ্ত মজা ও আনন্দ মহান আল্লাহ সুবহানা ওয়া তাআলাকে পরিপূর্ণভাবে ভালবাসারই ফল। তিনটি কথা পুরাপুরিভাবে বুঝার পরই এ ফল লাভ হতে পারে ঃ

(এক) এ ভালবাসায় পরিপূর্ণতা থাকতে হবে,

(দুই) ভালবাসা বাড়তে থাকতে হবে।

(তিন) এ ভালবাসার পথে প্রতিবন্ধক এমন সব কিছুকে ঘৃণা ও প্রতিরোধ করতে হবে।

"ভালবাসার পরিপূর্ণতার" অর্থ হলো, মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল পৃথিবীর সবকিছু হতে বেশী প্রিয় হবে। শুধু এ কথা বললেই হবে না। বরং মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে বাস্তবেও সর্বাধিক ভালবাসতে হবে।

ভালবাসা বৃদ্ধি হবার দাবী হলো, যদি বান্দা অন্য কাউকেও ভালবাসে সে ভালবাসাও মহান আল্লাহর জন্যই হতে হবে। মূল ভালবাসা তার জন্যে হবে না, হবে আল্লাহর জন্যে। তার প্রতি ভালবাসা হবে মহান আল্লাহর ভালবাসা কেন্দ্রিক।

ভালবাসার পথের প্রতিবন্ধকজনিত প্রতিটি জিনিসকে ঘৃণা করবে অর্থ হল ঈমানের বিপরীত জিনিস কুফর, নেফাক্ব, বিদআত ও শিরককে আগুনে পুড়ে যাওয়া থেকেও অধিক অপছন্দ করা।

কেউ যখন ঈমানের এ সোপানে পৌঁছে যাবে তখনই সে নিজের পছন্দ ও অপসন্দকে মহান আল্লাহতাআলার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির ভিত্তিতে গড়ে তুলতে পারবে। এ সময় দুনিয়ার সব জিনিস হতে মহান আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা তার নিকট বেশী প্রিয় হবে। আর মহান আল্লাহর সৃষ্টি জগতে কাউকে সে ভালবাসলে শুধু মহান আল্লাহর জন্যই ভালবাসবে। অন্য কোন উদ্দেশ্যে আদৌ তা করবে না। এভাবে মহান আল্লাহর সৃষ্টিজগতের কাউকে ভালবাসা প্রকৃত মহান আল্লাহকে ভালবাসারই শামিল। বরং তার পরিপূর্ণতার একটি দিক। ভালবাসার এটাই নিয়ম। *(আল উবুদিয়্যা-কৃত শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া*

মহান আল্লাহকে ভালবাসার প্রকৃত নিদর্শন

দু'টি জিনিসকে আল্লাহ সুবহানা ওয়া তাআলা তাঁর ভালবাসার নিদর্শণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। যথা ঃ

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমার ইত্তেবা ও ইতাআত।

২. জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহি।

জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর অর্থ ঈমান ও আমালে সালিহ হাসিল করার ব্যাপারে এবং আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ শিরক, কুফর, নেফাক্ব, ইলহাদ, বিদআত ও ফিসক এবং আল্লাহদ্রোহীতা ও নাফরমাণীকে মিটিয়ে দেবার জন্য নিজের সমগ্র শক্তি ও চেষ্টা প্রচেষ্টাকে নিয়োজিত করা। মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর পাক কালামে বলেন ঃ

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللهِ

وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ - "কুল ইন কানা আবাউকুম ওয়া আবনাউকুম ওয়া ইখওয়ানুকুম ওয়া আজওয়াজুকুম ওয়া আশিইরাতুকুম ওয়া আম ওয়ালু ইক তারাফ তুমুহা ওয়া তিজারাতান তাখসাউনা কাসাদাহা ওয়া মাছাকিনু তারজাওনাহা আহাব্বা ইলাইকুম মিনাল্লাহি ওয়া রাসূলিহী ওয়া জিহাদী ফী সাবিলিহী ফাতা রব্বাছু হাত্তা ইয়াতি আল্লাহু বি আমরিহী ওয়াল্লাহু লা-ইয়াদিহীল কাওমাল ফাসিক্বীন অর্থাৎ বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাবার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা পছন্দ কর– মহান আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর মহান আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর মহান আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়েত করেন না। (আত তাওবা-২৪)

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় মৃত মাওলানা আবু মুহাম্মাদ আলীমউদ্দিন রহিমাহুল্লাহ তাঁর অসূলে দ্বীন পুস্তকে লিখেছেন ঃ

"দাও তুমি ওহে নবী একথা বলিয়া
সকলেতে শুন খুব মনোযোগ দিয়া।
পিতা পুত্র ভাই আর স্ত্রী ও আত্মীয়
আল্লাহ ও রাসূল হতে হয় যদি প্রিয়
আর সেই মাল যাহা উপার্জন করেছো
কিংবা ব্যবসায় ক্ষতি মনেতে ভাবিছো
আর মনোমত গৃহ বাস কর যাতে
যদি প্রিয় হয় কাছে আল্লাহ ও রাসূল হতে
কিংবা সে জিহাদ করা আল্লাহর রাস্তাতে
বেশী প্রিয় নাহি হয় দুনিয়া হইতে
তবে তো অপেক্ষা করো মোহেতে পড়িয়া
আল্লাহর হুকুম শীঘ্র আসিবে ধাইয়া।
মৃত্যুর ফেরেশতা এসে পৌঁছিবে যখন
বেশী মূল্য কোন বস্তুর বুঝিবে তখন।।
এইরূপ মায়াজালে রহিল যাহারা
ফাসেক বলিয়া গণ্য হইল তাহারা।
সীমার বাহিরে চলে গেছে এরা

নিশ্চয় হয়েছে তারা সবে পথহারা
তাহাদের ভাগ্যে হিদায়েত নাহি মেলে
আল্লাহ ও রাসূলের প্রেম নাহি যে দেলে।।
সুতরাং ঈমানের যারা দাবীদার
বুঝিয়া শুনিয়া হও খুব হুশিয়ার।"

অতএব বুঝা গেল, মহান আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ এবং মহান আল্লাহর পথে জিহাদ করিবার চাইতে, বাবা, পুত্র, পরিজন, ঘর-বাড়ী, আত্মীয়-স্বজন, মাল-সামান তেজারতি ইত্যাদিকে অধিক মূল্যবান মনে করিয়া যারা নিশ্চিন্তে জীবন যাপন করে তাহারা ঈমানের মজা পায় না, উপরোক্ত ধ্বংসের পথে দ্রুতগতিতে আগাইয়া যায় তাই দ্বীনের রাস্তায় আরাম আয়েশ ত্যাগ করিয়া অগ্রসর হওয়া নবীর তরীকা শিখিবার পর আমলের বাসনা লইয়া দুগ্ধ ফেনিভ পালংকের সুখ নিদ্রার কুহক ছিন্ন করিয়া কেবলমাত্র মহান আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের রাস্তায় নামিল, মহান আল্লাহ ও রাসূলের মহব্বত হাসিলের আশায় দুনিয়াকে বৃদ্ধাংগুলি দেখাইয়া ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নিজেকে উৎসর্গ করিল- ঈমানের লয্যত সেই ব্যক্তির জন্যই বরাদ্দ। দ্বিতীয়তঃ কাহাকেও সে ভাল বাসিলে কেবলমাত্র মহান আল্লাহর ওয়াস্তেই বাসিবে। দ্বীনের পথে থাকিয়া দ্বীনের দাওয়াত পেশ করিবার নিঃস্বার্থ উদ্দেশ্য লইয়া কয়েকজন মুসলিম ভাই যখন কিছু সময় কাটায় তখন তাহাদের মধ্যে দ্বীনি মহব্বত পয়দা হইবে। সে মহব্বত খান্দানী ও বংশীয় ভ্রাতৃত্বের চাইতে অধিক পবিত্র ও মহান মর্যাদা সম্পন্ন। কারণ তাহা মহান আল্লাহ ও রাসূলের মহব্বতের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই পূণ্যময় পবিত্র পথে নফসের সহিত সংগ্রামের ভিত্তিতে দ্বীনে এলাহী হুকুমত প্রতিষ্ঠার সংগ্রামক্ষেত্রে একই কাতারে তাহারা পরস্পরের সহিত ব্যাংকারে অবস্থানরত প্রহরী সৈনিক। আল্লাহর এই যমীনে শয়তানী তথা তাগুতি ব্যবস্থা উৎখাত করিয়া এলাহি হুকুম জারী করিবার জন্য এই দুই মুসলিম সমবেত। ধর্মের জন্যে জিহাদে জান-মাল উৎসর্গ করিবার কাজে তাহারা পরস্পরের সাথী। এই মহান সংগীর সহিত জীবনের কিছু সময় কাটানোই তাহার জীবনের গৌরবময় মূহুর্ত এবং ঐ সময়কার প্রতিটি ক্ষণ তাঁহার নিকট মর্যাদাবহ ও পবিত্র। শিক্ষা গ্রহণের পথে তায্কিয়ায়ে নফস বা আত্মশুদ্ধি অভিযানে, তাওহীদি ও ঈমানী আদর্শ প্রতিষ্ঠাকল্পে এবং ইসলাম বিরোধী পরিবেশের উচ্ছেদ সাধনে এ পথের সহযাত্রীগণ একাত্ম। ইহাতে ঈমানী লয্যত আসে, পরিত্রাণ পথের রসদ মেলে, মানসিক ক্লান্তি আসে না বরং মহব্বতে রব্বানী ও জযবায়ে ঈমানী নূতন শান্তি প্রদান করে। আবাস গৃহের আরাম হইতে

ময়দানেই বেশী তৃপ্তি পাওয়া যায়। চিরস্থায়ী শান্তির অন্বেষণে একে অপরকে স্বস্তি দিতে তাহারা বিমুখ হয় না। দৃঢ়চিত্ত সহকারে মুমিন তাহার গন্তব্যপথে যাত্রা করে।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা লক্ষ্য করুন, যারা মহান আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ হতে নিজেদের পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদকে বেশী ভালবাসে তাদেরকে মহান আল্লাহ তা'আলা সূরাহ তাওবার ২৪ নং আয়াতে কত ভয়াবহ শাস্তির ধমক শুনিয়েছেন।

এভাবে রাসূলের ভালবাসা সম্পর্কে রাসূলে করীম নিজে পরিষ্কার ভাষায় ইরশাদ করেছেনঃ "সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার জীবন। তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার সন্তান, তার পিতা-মাতাসহ সকল মানুষের চেয়ে বেশী প্রিয় হবো।"

জিহাদ এর অর্থ যেমন উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, মহান আল্লাহর পছন্দনীয় জিনিস হাসিল এবং তা প্রতিফলিত করবে এবং অপছন্দনীয় ও নিন্দনীয় জিনিসগুলোকে সমূলে উৎপাটিত করবে এবং এ কাজে নিজের সর্বশক্তি ও প্রচেষ্টা নিয়োগ করা। অতএব জিহাদই হলো প্রকৃতপক্ষে ঐ কষ্টিপাথর যার দ্বারা আল্লাহর বান্দার আল্লাহর ভালবাসা দাবী করার ব্যাপারটি যাচাই করা যেতে পারে। শক্তি সামর্থ থাকা সত্বেও যদি কোন ব্যক্তি সে অনুযায়ী জিহাদের মত ফারজ কাজ-পালন করলো না তাহলে প্রমাণিত হবে যে আল্লাহ ও তার রাসূলের ভালবাসা তার মধ্যে কোন বিশেষ প্রেরণা সৃষ্টি করতে পারেনি। এ অতীব গুরুত্বপূর্ণ ফরজ কাজটি আদায়ের ব্যাপারে সে নিজের সামর্থ অনুসারে যত অবহেলা অমনোযোগিতা দেখাবে ততোটাই তার ভালবাসার দাবীর মুখোশ উন্মোচিত হয়ে পড়বে। এতে কোন সন্দেহ নেই, এ ফারজ পালন করে চলার পথে কাঁটা বিছানো থাকে। কিন্তু ভালবাসার এ সুন্নাত কার অজানা আছে যে, প্রেমিকের সান্নিধ্য লাভ বিপদাপদ ও ঝুঁকি পোহাবার পরই ভাগ্য জুটে। খাঁটি ও মেকি উভয় ভালবাসায় একই পদ্ধতি। ক্ষমতা লাভের লোভী রাজসিংহাসনকে, ধন-সম্পদ প্রাপ্তির পূজারী ধন-ভান্ডারকে, রূপ-যৌবনের পাগল প্রেয়সীর সাথে মিলনের ব্যাপারটিকে ততক্ষণ পর্যন্ত অর্জন করতে পারে না যতক্ষণ না পরকালীন জীবনের কঠিন আজাবের কথা বাদ দিলেও এ দুনিয়ার ভয়াবহ বিপদাপদ দ্বারা সে জর্জরিত হবে। কাজেই আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রেমিক তাদের লাভের পথে এতটুকুন জীবন বাজীও না দেখায় যতটুকু গায়রুল্লার প্রেমিকরা দৃঢ় সংকল্প চিত্তে নিজেদের প্রিয়তমার

জন্য দেখাতে পারে, তাহলে তো অবশ্যই সে নিজের ভালবাসার ক্ষেত্রে যথেষ্ট দুর্বলতা ও সংকীর্ণতার অকাট্য একটি প্রমাণ পেশ করলো। অথচ মুমিনের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হলো সে দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে আল্লাহ ও তার রাসূলকে বেশী ভালবাসবে। পবিত্র কুরআন বলছে - وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ **"অল্লাজীনা আমানুউ আশাদ্দু হুব্বান লিল্লাহি** অর্থাৎ ঈমানদারগণ মহান আল্লাহকেই সবচেয়ে বেশী ভালবাসে।" (বাকারা-১৬৫)

সাথে সাথে এ কথাও মনে রাখতে হবে, ভালবাসার ক্ষেত্রে শুধু আবেগ ও সরলতাই মঞ্জিলে মাকসুদে পৌঁছার গ্যারান্টি হতে পারে না। এর সাথে সাথে বরং বুদ্ধিমত্তা ও সচেতনাও থাকা প্রয়োজন। নতুবা কোন কোন ক্ষেত্রে এমনও হতে পারে যে, খাঁটি প্রেমিক খাঁটি প্রেম পোষণ করার পরও নিজের নির্বুদ্ধিতা ও দূরদৃষ্টির অভাবে এবং ধারণার অস্বচ্ছতার কারণে এমন পথ অবলম্বন করে বসবে, যে পথে কখনো নিজের গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে না। খাঁটি ভালবাসার ব্যাপারেও এ ধরনের ভুল পথ নিন্দনীয়, আর যদি মেকি ও ভ্রান্তি ভালবাসায় এ ধরনের কোন পথ অবলম্বন করা হয় তাহলে তো ঐ ব্যক্তির বঞ্চনার ব্যাপারে আর কোন কথাই নেই।

যেমনটি রাষ্ট্র, ধন-সম্পদ, ধন-দৌলত ও রূপ সৌন্দর্যের কিছু অন্ধ পাগল করে থাকে। একদিকে তো তার ভালবাসার গতিই ভ্রান্ত অপরদিকে সে নিজের ইপ্সীত লক্ষ্য হাসিলের ব্যাপারে জ্ঞান-বুদ্ধির পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে সে সবকিছুই হতে বঞ্চিত। অবশ্য এ পথে নানা ধরনের বিপদাপদ তাকে ঘিরে ফেলে। অতএব ভালবাসার পথে বুদ্ধিমত্তা দিয়ে পরিচালিত হতে হবে। অন্যথায় পরাজয় নিশ্চিত।

বিস্তারিত বর্ণনার পর এ কথা সহজেই বুঝে এসে যায় যে মানুষের হৃদয়ে আল্লাহ সুবহানা ওয়া তাআর ভালবাসা যত বেশী হবে তার ইবাদাতেরও ততবেশী প্রাণসত্তার সৃষ্টি হবে। মহান আল্লাহ ছাড়া আর সকল জিনিসের নিয়ন্ত্রণ থেকে সে স্বাধীন ও মুক্ত হতে থাকবে। এভাবে তার মধ্যে ইবাদাতের রং যত গাঢ় ও গভীর হবে। ততোই মহান আল্লাহর মহব্বত ও ভালবাসা এবং গায়রুল্লাহ হতে মুক্ত হবার নিদর্শন তার মধ্যে সৃষ্টি হতে থাকবে। (আল উবুদিয়্যা- কৃত শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া)

"তাওহীদ" অর্থ একক বা একত্ব, কোন কিছুকে একক করা। "ইবাদতের জন্য একমাত্র আল্লাহ" একক গণ্য করাই হল "তাওহীদ" (আল-উছায়মীন, শারহু ছালাছাতিল উছূল, পৃঃ ৩৯)। বান্দা হিসাবে তার আক্বীদা ও

আমলগত প্রত্যেকটি বিষয় একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নির্দিষ্ট করা হল "তাওহীদ"। এজন্য "তাওহীদ" হল ইসলামের মূল রূহ ও প্রথম শিক্ষা।

তাওহীদ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। (ক) তাওহীদে রুবূবিয়াহ (খ) তাওহীদে উলূহিয়াহ এবং (গ) তাওহীদে আসমা ওয়া ছিফাত, যা সূরাহ ফাতেহার শুরুতেই আল্লাহ বর্ণনা করেছেন بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ - إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ- (১-৫ আয়াত)। কেউ উক্ত তিন প্রকার তাওহীদকে খালেছ অন্তরে গ্রহণ না করলে আল্লাহকে একমাত্র মা'বূদ হিসাবে স্বীকার করতে পারে না। আর ঐ ব্যক্তি কখনোই আল্লাহর হেদায়াতও লাভ করতে পারে না (বাক্বারাহ- ২৫৬)। ফলে তার কোন ইবাদতও আল্লাহর নিকট কবুল হয় না। তাই প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয দায়িত্ব হল তাওহীদের শিক্ষা অর্জন করা, তাওহীদকে বুঝা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, - فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ "আপনি জেনে নিন যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন মা'বূদ নেই" (মুহাম্মাদ ১৯)। আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রথম নাযিল হয়েছে, - اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ "আপনি পাঠ করুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন" (সূরাহ আলাক্ব ১) وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا - তাছাড়া এই তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্যই আল্লাহ প্রত্যেক জাতির মাঝে রাসূল প্রেরণ করেছেন (নাহল ৩৬)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা সাধারণ মানুষকেও সর্বপ্রথম তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন (বুখারী হা/১৩৯৭, ৭৩৭২)।

দুঃখজনক হল, আমরা অনেক কিছুই জানি, পড়ি, অনেক বিষয়ে চূড়ান্ত গবেষণা করি, সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জনের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করি, কিন্তু যে বিষয়ে সর্বপ্রথম জানতে হবে, যা জানা ফরয, সেই সম্পর্কেই জানি না, জানার চেষ্টাও করি না। আর সেটা হল তাওহীদ। এর প্রতিদান সরাসরি জান্নাত এবং যাবতীয় সাফল্যের মূলসূত্র (মুসলিম হা/৩১; সূরাহ আ'রাফ ৯৬)। وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ - আসলে মানুষ ও জিন জাতিকে সৃষ্টি করার মৌলিক উদ্দেশ্যই হল, তারা যেন তাদের সার্বিক জীবনে একমাত্র আল্লাহর তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করে (যারিয়াত ৫৬)। তাহলে তার মাঝে ত্বাগূত ও শিরক কোন কিছুই আশ্রয় পাবে না। এটাই কালেমায়ে শাহাদাতের আসল তাৎপর্য। তিন প্রকার তাওহীদ হল-

(ক) তাওহীদে রুবূবিয়াহ : প্রতিপালনে ও পরিচালনায় আল্লাহ যে একক, সে বিষয়ে মনেপ্রাণে স্বীকারোক্তি প্রদান করা। অর্থাৎ সবকিছুর

পালনকর্তা, সৃষ্টিকর্তা, রূযীদাতা, জীবনদাতা, মরণদাতা, আইনদাতা ও সবকিছুর মালিক হিসাবে একমাত্র আল্লাহকে বিশ্বাস করাই হল "তাওহীদে রুবূবিয়াহ" (ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূঊল ফাতাওয়া ৩/১০৩)। আল্লাহ তা'আলা বলেন, - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ "যাবতীয় প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য" (ফাতিহা ২; মুমিনূন ৮৬-৮৭)। "আল্লাহই সবকিছুর স্রষ্টা" (যুমার ৬২)। তিনি আরো বলেন, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا - "আর ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যে, তার রিযিক আল্লাহর যিম্মায় নেই" (হূদ ৬; মুলক ২১; ফাতির ৩; যারিয়াত ৫৮)। অনুরূপ তিনি সবকিছুর মালিক, পরিচালক, জীবনদাতা ও মরণদাতা। তিনি বলেন, يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ - "তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সবকিছু পরিচালনা করেন" (আস-সাজদাহ ৫; সাবা ২২)। অনেকে আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা, রূযীদাতা, জীবনদাতা, মরণদাতা বলে বিশ্বাস করলেও আইন ও বিধান দাতাও যে একমাত্র আল্লাহ এবং তাঁর প্রদত্ত আইন ছাড়া অন্য সব আইন ও বিধান যে বাতিল, তা তারা পরিচ্ছন্ন হৃদয়ে স্বীকার করতে চায় না। এখানেই মানুষ আল্লাহর সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পন্ডিতকে বিধানদাতা হিসাবে শরীক করে থাকে, যা এই তাওহীদকে বাতিল করে দেয়। এদের জন্য কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করছে (শূরা ২১)। কারণ আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ আইন, বিধান ও ইবাদত তৈরি করার অধিকার রাখে না। আল্লাহই একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

(খ) তাওহীদে উলূহিয়াহ : ইবাদতের যোগ্য হিসাবে একমাত্র আল্লাহকে গ্রহণ করাই হল- "তাওহীদে উলূহিয়াহ"। বান্দা হিসাবে সকল কর্মে আল্লাহর একত্ব প্রমাণ করা। যাবতীয় ইবাদত, দু'আ, প্রত্যাশা, ভয়-ভীতি, আগ্রহ, ভরসা, প্রত্যাবর্তন, যবহ, মানত, কুরবানী সবই পেশ করার জন্য আল্লাহকে একক গণ্য করা (আক্বীদাতুত তাওহীদ, পৃঃ ৪২)। অন্য কারো জন্য এগুলো না করা বা কাউকে এগুলোতে শরীক না করা। আর এই আদেশ দেয়ার জন্যই আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে সমস্ত নবী-রাসূলকে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ - "আমরা আপনার পূর্বে রাসূল হিসাবে যাকেই প্রেরণ করেছি, তাঁর কাছেই অহী করেছি যে, আমি ছাড়া কোন হক্ব ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা একমাত্র আমারই ইবাদত কর" (আম্বিয়া ২৫)। অন্যত্র তিনি বলেন, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ - তাদেরকে কেবল আদেশ

দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে শুধু আল্লাহরই ইবাদত করে" (সূরাহ বাইয়েনাহ ৫)। মুসলিম ব্যক্তি তার জীবনের সকল কর্ম আল্লাহর শানে পেশ করবে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য। এটাই তাওহীদে ইবাদাহ বা উলূহিয়াহ। শুধু ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত, ছাদাক্বার ক্ষেত্রে নয়; বরং সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ যে বিধি-বিধান দিয়েছেন, তা নিঃসঙ্কোচে মেনে নিবে এবং পূর্ণভাবে অনুসরণ করবে (বাক্বারাহ ২০৮)। কারণ ইসলামই একমাত্র আল্লাহ প্রেরিত পূর্ণাঙ্গ দ্বীন। এছাড়া অন্য ধর্ম, দর্শন, তরীকা, মাযহাব, ইজম গ্রহণযোগ্য নয় (আলে ইমরান ১৯, ৮৫, মায়েদাহ ৩)।

তাই যারা ছালাত, ছিয়াম, হজ্জের ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে, কিন্তু রাজনীতি, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ত্বাগূত বা মানব রচিত আইনের অনুসরণ করে, তারা ভয়াবহ শিরকের মধ্যে নিমজ্জিত। তারা তাদের ইবাদতকে কিছু আল্লাহর জন্য, আর কিছু জাহেলী মতবাদের স্রষ্টা ও ধর্মীয় গুরুর জন্য নির্ধারণ করেছে। যেমন ছালাত আদায়ের জন্য মাসজিদে যাচ্ছে, কিন্তু কোন কিছু চাওয়ার জন্য মাযার, খানকা, কবর, মৃত পীর-ফকীর-ওলী, মূর্তি, ভাস্কর্য ও তীর্থস্থানেও যাচ্ছে, সেখানে কোটি কোটি টাকা দান করছে, গরু, ছাগল ইত্যাদি মানত করছে। সেগুলোকে মাধ্যম ধরে আল্লাহকে পাওয়ার চেষ্টা করছে। অনুরূপ রাজনৈতিক ব্যক্তিরাও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও বিভিন্ন কাজের সূচনার জন্য মাযার, খানকা, দর্গা, প্রতিকৃতি, স্মৃতিসৌধ, শহীদ মিনার, শিখা চিরন্তন, শিখা অনির্বাণ ইত্যাদি শিরকের আস্তানায় গিয়ে নীরবতা পালন করছে এবং ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করছে। বরং আল্লাহর চেয়ে এগুলোকেই বেশী ভক্তি করছে (বাক্বারাহ ১৬৫)। এভাবে মাসজিদেও যাচ্ছে, মাযারেও যাচ্ছে, মক্কাতেও যাচ্ছে, মন্দিরেও যাচ্ছে। জাহেলী যুগের মূর্তিপূজারী মুশরিক্ব আর তথাকথিত নামধারী এ সমস্ত মুসলিমের মাঝে কোন পার্থক্য দেখা যায় কি (যুমার ৩) ? এভাবে তাওহীদ আর শিরক কি এক সঙ্গে থাকতে পারে ? কারণ এগুলো সবই তাওহীদ বিরোধী ত্বাগূত, যা "শিরকে আকবার" বা বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত, যার পরিণাম ইসলাম থেকে বহিষ্কার এবং তওবার পূর্বে মারা গেলে চিরস্থায়ী জাহান্নাম (তওবা ১৭)। তার জন্য দু'আ ও দান-ছাদাক্বাহ করলেও কবুল হবে না (সূরাহ হাশর ১০; তওবা ১১৩; মুসলিম হা/৯৭৬; আবুদাঊদ হা/২৮৮৩, সনদ হাসান)।

(গ) তাওহীদে আসমা ওয়া ছিফাত : এর অর্থ- আল্লাহর নামসমূহ ও তাঁর গুণাবলী এককভাবে তাঁর সাথেই সম্পৃক্ত করা, অন্য কারো সাথে তুলনা

না করা। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, ঐভাবেই বিশ্বাস করা। কোন রূপক বা বিকৃত অর্থ না করা এবং কল্পিত ব্যাখ্যার আশ্রয় না নেয়া (ফাতাওয়া উছায়মীন ১/৮৩ পৃঃ)। আল্লাহ তা'আলার আকার আছে। তিনি নিরাকার নন। তিনি শুনেন, দেখেন এবং কথা বলেন। তাঁর হাত, পা, চেহারা, চোখ আছে (নিসা ১৬৪; মায়েদাহ ৬৪; ক্বলাম ৪২; ত্ব-হা ৩৯)। তবে তাঁর সাথে সৃষ্টির কোন কিছুই তুলনীয় নয়। বরং তিনি তাঁর মতো। আল্লাহ বলেন, - وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ "কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা" (শূরা ১১)। সুতরাং তাঁর আকারের সাথে কোন কিছুর তুলনা করা যাবে না। যেমন আল্লাহ নিজেই বলেছেন, - فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ "সুতরাং তোমরা আল্লাহর কোন সাদৃশ্য বর্ণনা করো না" (নাহল ৭৪)। আল্লাহ আরশের উপর সমুন্নত। তিনি সর্বত্র বিরাজমান নন। আল্লাহ তাঁর পরিচয় দিয়ে বলেন, - الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ "দয়াময় (আল্লাহ) আরশে সমুন্নত" (ত্ব-হা ৫)। এ মর্মে কুরআন ও ছহীহ হাদীছে অনেক দলীল রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-কে আল্লাহ তা'আলা মিরাজে নিয়ে গিয়েছিলেন সপ্তম আসমানের উপরে এবং বার বার মূসা আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা-এর নিকট থেকে আল্লাহর কাছে যাওয়ার বিষয়টিও প্রমাণ করে আল্লাহ আসমানের উপরে আরশে সমুন্নত (বুখারী হা/৩৮৮৭)। আল্লাহ আমাদের সাথেই আছেন এর অর্থ হল, তাঁর দৃষ্টি, ইলম ও ক্ষমতা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত (তাফসীর ইবনে কাছীর, ৭ম খন্ড, পৃঃ ৫৬০)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা, ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযামসহ সালাফী বিদ্বানগণ যুগে যুগে এমনটিই বুঝেছেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন "ভ্রান্ত আক্বীদা বনাম সঠিক আক্বীদা" শীর্ষক বই।

আল্লাহ তা'আলাকে একমাত্র মা'বূদ হিসাবে গ্রহণ করার জন্য তাওহীদের উক্ত প্রকার সম্পর্কে জ্ঞান রাখা যে আবশ্যক, তা উক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হয়েছে। কারণ শিরক, ত্বাগূত ও কুফরের ছোঁয়া লাগলে মুহূর্তেই তাওহীদ বিনষ্ট হয়ে যায়। তাই তাওহীদের সার্বভৌম প্রতিষ্ঠার জন্য শিরকের উৎসগুলোকে অপসারণ করা ফরয। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-কে পৃথিবীতে পাঠানোর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ - "তিনিই তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন,

যেন তিনি সকল দ্বীনের উপর তাকে বিজয়ী করতে পারেন। যদিও তা মুশরিকরা অপছন্দ করে" (ছফফ ৯)।

এই আয়াতের হুকুম কার্যকর করার জন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা মক্কা বিজয়ের দিন সর্বাগ্রে কা'বা চত্বর থেকে ৩৬০টি মূর্তি অপসারণ করেন (বুখারী হা/২৪৭৮)। তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দেন, "আমার রব আমাকে মূর্তি ভাঙ্গার জন্য এবং পৃথিবীতে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরণ করেছেন, যেন তাঁর সাথে কোনকিছুকে শরীক না করা হয়" (মুসলিম হা/৮৩২)। আলী রাজিয়াল্লাহু আনহু-কে নির্দেশ দিলেন, ছবি-মূর্তি ও সৌধ নির্মাণ করা যত উঁচু কবর আছে সবগুলো ভেঙ্গে দাও, কোথাও যেন অবশিষ্ট না থাকে (মুসলিম হা/৯৬৯)। লাত, মানাত, উযযা, দেব-দেবীর পূজা এবং জাহেলী যুগের সমস্ত আইনকে বাতিল করে ঘোষণা দিলেন, اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ - قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ - আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তোমরা তার আনুগত্য কর (আরাফ ৩)।

একদা ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর সামনে তাওরাত পাঠ করতে দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা রেগে লাল হয়ে গিয়ে বললেন, আমি কসম করে বলছি, আজ যদি মূসা আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা তোমাদের মাঝে আবির্ভূত হন আর তোমরা যদি তার অনুসরণ কর এবং আমাকে পরিত্যাগ কর, তবুও তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। মূসা আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা যদি আজ বেঁচে থাকতেন আর আমার নবুওঅত পেতেন, তবে তিনিও আমার অনুসরণ করতেন (দারেমী হা/৪৪৩; সনদ হাসান)। উপলব্ধির বিষয় হল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর আগমনের পর যদি একজন বিশিষ্ট রাসূল মূসা আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা-এর অনুসরণ না চলে, তবে পীর-ফকীর, দরবেশ, ইমাম, দার্শনিক, পন্ডিত, মনীষীর অন্ধ অনুসরণ চলে কিভাবে ? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপস্থিতিতে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া তাওরাত, ইঞ্জীল, যাবূরসহ অন্যান্য কিতাব যদি বাতিল বলে গণ্য হয়, তাহলে মানুষের তৈরি করা ইসলাম বিরোধী আইন কিভাবে বৈধ হতে পারে ? সেই আইনের স্বীকৃতি দিলে, অনুসরণ করলে তাওহীদ থাকবে কি ? তাই সব শ্রেণীর মানুষকে তাওহীদের জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তিনি রাজনৈতিক ব্যক্তি হৌন, প্রশাসনিক ব্যক্তি হৌন বা যেকোন পেশার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি হৌন কিংবা সাধারণ কোন ব্যক্তি হৌন

(আলবানী, আত-তাওহীদ আওয়ালান, পৃ. ২৮)। আল্লাহ তা'আলা সকল পর্যায়ের মানুষকে তাওহীদ বুঝার ও বলিষ্ঠভাবে সংরক্ষণ করার তাওফীক্ব দান করুন। সেই সাথে তাওহীদ বিরোধী যাবতীয় কার্যক্রম থেকে হেফাযত করুন-আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন!! (আল-ইখলাছ জুন ২০২০ সংখ্যা)

তাওহীদের শর্তাবলী

হে মুসলিম ভ্রাতা (মহান আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন) তাওহীদের অনেক গুলো শর্ত রয়েছে। এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। এ বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞানার্জন করা এবং শর্তগুলো যথাযথভাবে পূরণ করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ওয়াজিব। এটা এজন্য যে, কারো মাঝে তাওহীদের শর্তগুলো না পাওয়া গেলে তার মধ্যে ঈমান ও ইসলামের মূল-ই পাওয়া গেল না বলে বিবেচিত হবে। যেমন সলাত সহীহ হওয়ার শর্তাবলীর মধ্যে যদি কোন একটি শর্ত যেমন শরীর পাক বা জায়গা পাক বা সতর ঢাকা ইত্যাদি না পাওয়া গেলে তাহলে সালাত বাতিল বলে গণ্য হবে। ঠিক তেমনিভাবে তাওহীদের শর্তগুলো বাদ পড়লে তাওহীদও বাতিল বলে গণ্য হবে।

তাওহীদের শর্ত নয়টি ঃ যথা ঃ-

১) ইলম বা জ্ঞান।

২) ইয়াক্বীন বা দৃঢ় বিশ্বাস।

৩) কবুল বা গ্রহণ করা।

৪) ইনকিজাদ বা সমর্পন করা।

৫) ছিদ্ক বা সত্যতা।

৬) ইখলাছ (সততা ও একনিষ্ঠতা) এবং

৭) মুহাব্বত বা ভালবাসা।

৮) আল ইস্তিক্বামাহ বা মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানের উপর অটল অবিচল থাকা।

৯) আল কুফর বিত তাগুত বা তাগুতের সাথে কুফুরি করা।

প্রথম শর্ত ঃ ইলম বা জ্ঞান ঃ বিশ্বাস বা ঈমানের ভিত্তি হলো ইলম বা জ্ঞান। কোন বিষয়ে বিশ্বাস করতে হলে তাকে জ্ঞান বা ইলম অর্জন করতে হবে। কেননা, বিশুদ্ধ ঈমান বা বিশ্বাসই যেহেতু দুনিয়া ও আখিরাতে সকল মানুষের সফলতার মূল চাবি কাঠি সেহেতু ঈমান বিষয়ক ইলম বা জ্ঞান অর্জন করাই মানব জীবনের সর্ব প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফারজ দায়িত্ব। বিশুদ্ধ

ঈমান বিষয়ক সঠিক জ্ঞানই মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ সূরাহ মুহাম্মাদের **১৯** নং আয়াতে বলেন,

- فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ "ফা'লাম আন্নাহু, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু অর্থাৎ তুমি জেনে রাখো, মহান আল্লাহ ছাড়া কোন সত্যিকারের ইলাহ নেই।"

এটা এ জন্য যে, মহান আল্লাহ একক ও অদ্বিতীয় এবং একমাত্র তিনিই ইবাদাতের হক্বদার'– এ কথা না জানা বান্দার ইসলাম গ্রহণ যোগ্য হওয়ার পথে বিরাট অন্তরায়। এ কারণেই তাওহীদের সঠিক ইলম বা জ্ঞানকে বান্দার ইসলাম কবুলের শর্ত নির্ধারণ করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, **"মহান আল্লাহ ব্যতীত কোন হক্ব ইলাহ নেই"** একথা জানা অবস্থায় যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতে যাবে।

শাইখ আব্দুর রহমান বিন হাসান আল শাইখ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন ঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের উলামায়ে কেরাম **'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ'** এর অর্থ এবং এর দ্বারা কি অস্বীকার করা হয় আর কি সাব্যস্ত করা হয় তা বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, **লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহর** উপকারিতা হচ্ছে এর অর্থসহ সেই ইলমে ইয়াক্বীনি বা নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা যা (কি অস্বীকার করা হয় আর কি সাব্যস্ত করা হয়) তা সহ জানা মহান আল্লাহ্ ওয়াজীব করে দিয়েছেন। আবুল মুজাফফর তার 'ইফছাহ' নামক গ্রন্থে বলেছেন, "লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য দানের দাবী হচ্ছে, স্বাক্ষ্য দানকারী অবশ্যই "লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ– মহান আল্লাহ্ ছাড়া কোন হক্ব ইলাহ নেই" সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে। যেমন টি মহান আল্লাহ্ সুবহানা ওয়া তা'আলা বলেছেন, "তুমি জেনে নাও যে মহান আল্লাহ ছাড়া আর কোন হক্ব ইলাহ নেই।"

তিনি আরো বলেন ঃ আরবী গ্রামারের দৃষ্টিতে শব্দের পরে শব্দের পেশ হওয়ার দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে যে, উলুহিয়্যাত (তথা ইলাহ হওয়ার যোগ্যতা) একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। অতএব, মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ উলুহিয়্যাতের হক্বদার হতে পারে না। তিনি এ বিষয়ে আরো বলেন ঃ এখানে সার কথা হচ্ছে, তাগুতকে অস্বীকার করা এবং মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করা উভয় বিষয়ই এ কালিমার অন্তর্ভুক্ত এ কথাটি জেনে নেয়া। তাগুতের ক্ষেত্রে আপনার উলুহিয়্যাতের অস্বীকৃতি আর মহান আল্লাহর জন্য উলুহিয়্যাতের স্বীকৃতি দ্বারা আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত হলেন, যারা তাগুতকে

প্রত্যাখান করেছে আর মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে। যেমন মহান আল্লাহ্ সুবহানা ওয়া তা'আলা বলেছেন ঃ

هَـذَا بَلاَغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَـهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ- অর্থাৎ বস্তুত এটা সকল মানুষের জন্য এক বার্তা, যাতে এটা দ্বারা উহারা সতর্ক হয় এবং জানতে পারে যে, প্রকৃত পক্ষে ইলাহ শুধু একজনই এবং বোধশক্তি সম্পনেরা এর থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।" (ইবরাহীম-৫২)

"উল্লেখিত আয়াতে (যাতে তারা বলেন প্রকৃত পক্ষে ইলাহ একজনই)" বলা হয়নি। মহান আল্লাহ্ সুবহানা ওয়া তা'আলা আরো বলেন ঃ "যারা শুনে সত্যের সাক্ষ্য দিয়েছে তাদের কথা ভিন্ন– অর্থাৎ তারা অন্তরে যা জানে তাই মুখে সাক্ষ্য দিয়েছে।"

প্রিয় নবীজী বলেছেন ঃ **"মহান আল্লাহ্ ব্যতীত কোন হক্ব ইলাহ নেই"**। এ কথা জানা অবস্থায় যে মৃত্যুবরণ করেছে সে জান্নাতে যাবে। এসব আয়াত ও হাদীস দ্বারা উলামায়ে কেরাম এটাই প্রমাণ করেছেন যে, সবচেয়ে বড় ফারজ হচ্ছে অর্থসহ **"লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহর"** জ্ঞানার্জন আর সবচেয়ে মূর্খতা হচ্ছে অর্থসহ **"লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহর"** জ্ঞান না থাকা। অতএব অর্থসহ কালিমার জ্ঞান লাভ যেমনিভাবে সবচেয়ে বড় ওয়াজিব, তেমনিভাবে কালিমার অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞতা হচ্ছে বড় মূর্খতা। অর্থসহ কালিমার জ্ঞান লাভ করতে হলে দয়া করে পাঠ করুন মৎ প্রণীত **'সত্যিকারের মুমিন-মুসলিমের পরিচয়'** নামক আলোড়ন সৃষ্টিকারী পুস্তকটি।

দ্বিতীয় শর্ত ঃ ইয়াক্বীন বা দৃঢ় বিশ্বাস ঃ তাওহীদ জানার পর এবং لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ **"লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ"** এর অর্থ জানার পর এ কালিমার প্রতি বান্দার দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে এবং এর দ্বারা সব ধরনের ইবাদাত যে একমাত্র মহান আল্লাহরই উদ্দেশ্যে নিবেদন করতে হবে এ কথার প্রতিও দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে। এ কালিমা দ্বারা যা বুঝানো হয়েছে সে ক্ষেত্রে বান্দার অন্তরে কোন ধরনের দ্বিধা ও সংশয়-সন্দেহ থাকতে পারবে না। যেমন এ বিষয়ে মহান আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা সূরাহ হুজুরাতের ১৫ নং আয়াতে ইরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ -

"ইন্নামাল মুউ মিনুনাল্লাজীনা আমানু বিল্লাহি ওয়া রসূলিহী সুম্মা লাম ইয়ারতাবু ওয়া জাহাদু বিআম ওয়ালিহীম ওয়া আনফুসিহীম ফী সাবিলিল্লাহি,

উলা-য়িকা হুমুছ ছদিক্কুন অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে মুমিন তো তারাই, যারা মহান আল্লাহ্ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, অতঃপর কোন সন্দেহ-সংশয় পোষণ করেনি এবং নিজেদের জান ও মাল দিয়ে মহান আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে। তারাই তাদের ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী ও সত্যনিষ্ঠ লোক।"

উল্লেখিত সূরাহ হুজুরাতের ১৫ নং আয়াতের তাফসীরে ইমাম ইবনু কাসীর রহিমাহুল্লাহ বলেন, "তাঁরাই পূর্ণ মুমিন যারা মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এর প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না, বরং ঈমানের উপর অটল অবিচল থাকে এবং (নিজের সবচেয়ে প্রিয় জিনিস) জান ও মাল দ্বারা মহান আল্লাহর পথে সংগ্রাম (তথা জিহাদ) করে, তারাই সত্যনিষ্ঠ। অর্থাৎ এরাই এমন যারা বলতে পারে যে, তারা ঈমান এনেছে। তারা ঐ লোকদের মত নয় যারা শুধু মুখেই ঈমানের দাবী করে।"

আবু সাঈদ রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, প্রিয় নবীজী বলেছেন ঃ **"দুনিয়ায় তিন প্রকারের মুমিন রয়েছে। (এক)** যারা মহান আল্লাহর উপর এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এর উপর ঈমান এনেছে, অতঃপর কোন সংশয়-সন্দেহ পোষণ করেনি এবং নিজেদের মাল-ধন ও জীবন দিয়ে মহান আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে। **(দুই)** যাদের থেকে লোকেরা নিরাপত্তা লাভ করেছে। তারা না তাদের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করে, না তাদেরকে হত্যা করে। **(তিন)** যারা (দুনিয়ার বিভিন্ন রকম ও ধরনের ধন-মাল, সোনাদানা দামী দামী গাড়ী, বাড়ী আসবাবপত্রের ইত্যাদি) লোভনীয় বস্তুর দিকে ঝুঁকে পড়ার পর মহামহিমান্বিত মহান আল্লাহর (ভয়ের) জন্য তা পরিত্যাগ করে।" (মুসনাদে আহমাদ) সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, প্রিয় নবীজী বলেছেন ঃ যে বান্দা সাক্ষ্য দেয়, **"মহান আল্লাহ ছাড়া কোন হক্ব ইলাহ নেই এবং আমি মহান আল্লাহর রাসূল"** আর এ ব্যাপারে কোন সংশয়-সন্দেহ পোষণ না করে মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করে। তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

তৃতীয় শর্ত ঃ কবুল বা গ্রহণ করা। তাওহীদ জানার পর **"লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহর"** অর্থ জানা এবং তাঁর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করার পর কালিমাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে হবে, কোন প্রকার ইবাদাতের মাধ্যমেই তা প্রত্যাখ্যান করা যাবে না। (অর্থাৎ কোন প্রকার ইবাদাতই তাওহীদের পরিপন্থি হবে না)। যেমন এ বিষয়ে মহান আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলেনঃ

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ - وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ -

"এসব লোকেরা এমন ছিল যে, তাদেরকে যখন বলা হতো মহান আল্লাহ্ ছাড়া কোন হক্ব ইলাহ নেই" তখন তারা অহংকারে ফেটে পড়ত। তারা বলতো আমরা (কি) এক পাগল কবির কথায় নিজেদের মাবুদগুলোকে পরিত্যাগ করব ? (সাফফাত: ৩৫-৩৬)

চতুর্থ শর্ত ঃ ইনকিজাদ বা সমর্পণ করা। তাওহীদ জানার পর **লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহুর** অর্থ, এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন, ইবাদাতের মাধ্যমে কালিমা গ্রহণ করার পর অবশ্যই লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহুর কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করতে হবে। এ সমর্পন হতে হবে সকল তাগুতি শক্তির সাথে কুফরী করার মাধ্যমে এবং তাগুত থেকে নিজেকে মুক্ত করার মাধ্যমে একক ও অদ্বিতীয় মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার মাধ্যমে। যেমন মহান আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা শানুহু ঘোষণা করেছেন ঃ

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا - "ফালা ওয়া রব্বিকা লা-ইউমীনুউনা হাত্তা ইউ হাক্কিমুকা ফীমা সাজারা বাইনাহুম সুম্মা লা-ইয়াজিদুউ ফী- আনফুছিহীম হারাজাম মিম্মা ক্বজাইতা ওয়া ইউসাল্লিমুউ তাসলিমা অর্থাৎ না, হে মুহাম্মাদ, তোমার রবের নামে কসম ! তারা কিছুতেই ঈমান্দার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায় বিচারক হিসাবে মেনে নেবে। অতঃপর তুমি যাই ফায়সালা করবে সে ব্যাপারে তারা নিজেদের মনে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করবে না বরং কৃত ফায়সালার সামনে নিজেদের মন ও প্রাণকে সমর্পণ করবে।" (নিসা-৬৫)

তাফসীর ইবনু কাসীর প্রণেতা ইমাম ইবনু কাসীর রহিমাহুল্লাহ সূরাহ নিসার ৬৫ নং আয়াতের তাফসীরে বলেন, "কোন ব্যক্তিই ঈমানের সীমার মধ্যে আসতে পারে না যে পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ে মহান আল্লাহ তা'আলার শেষ নবীকে ন্যায় বিচারকরূপে মেনে না নেবে এবং প্রত্যেক নির্দেশকে, প্রত্যেক মীমাংসাকে, প্রত্যেক সুন্নাতকে, প্রত্যেক (সহীহ) হাদীসকে (নিজের বাস্তবিক জীবনে) গ্রহণযোগ্যরূপে স্বীকার না করবে।"

মোটকথা যে ব্যক্তি তার প্রকাশ্য, গোপনীয়, ছোট ও বড় প্রতিটি বিষয়ে প্রিয় নবীজীর (সহীহ) হাদীসকে সমস্ত নীতির মূল মনে করবে সে হচ্ছে

মুমিন। অতএব নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, তারা যেন তোমার মীমাংসাকে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয় এবং স্বীয় অন্তরে যেন কোন প্রকারের সংকীর্ণতা পোষণ না করে। তারা যেন সমস্ত (সহীহ) হাদীসকে স্বীকার করে নেয়। তারা যেন না হাদীসসমূহকে স্বীকার করা হতে বিরত থাকে, না ঐগুলোকে সরিয়ে দেয়ার উপায় অনুসন্ধান করে, না ওর মত অন্য কোন জিনিসকে মর্যাদা সম্পন্ন মনে করে, না এগুলো খন্ডন করে এবং না ঐগুলো মেনে নেয়ার ব্যাপারে তর্ক-বির্তকে লিপ্ত হয়। যেমন প্রিয় নবীজী বলেছেন, "যার অধিকারে আমার প্রাণ রয়েছে তার শপথ! তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হতে পারে না যে পর্যন্ত না সে স্বীয় প্রবৃত্তিকে ঐ জিনিসের অনুগত করে যা আমি আনয়ন করেছি।" (ইবনু কাসীর)

তৃতীয় শর্ত ও চতুর্থ শর্তের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, তৃতীয় শর্ত (কবুল) হচ্ছে কথার মধ্যে আর চতুর্থ শর্ত হচ্ছে কর্মের মধ্যে। যেমনটি মহান আল্লাহ্ সুবহানা ওয়া তা'আলা সূরাহ বাকারার ২৫৬ নং আয়াতে ঘোষণা করেছেন,

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا- অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করলো এবং মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলো, সেই শক্ত রজ্জু আঁকড়ে ধরলো।" মহান আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন আরো বলেন,

اللهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ - অর্থাৎ বস্তুত সার্বভৌমত্বের ক্ষমতা একমাত্র মহান আল্লাহরই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, স্বয়ং তাঁকে ছাড়া তোমরা কারো দাসত্ব ও বন্দেগী করবে না। এটাই সঠিক ও খাঁটি জীবন বিধান। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা অবগত নহে। (ইউসুফ-৪০) এ বিষয়ে মহান আল্লাহ সুবহানা ওয়া তা'আলা সূরাহ মুমিন বা গাফিরের ৬৫ নং আয়াতে বলেন ঃ

هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - অর্থাৎ তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত কোন হক্ব ইলাহ (উপাস্য বা মাবুদ) নেই; সুতরাং তোমরা তাঁকেই ডাকো, তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে। প্রশংসাসমূহ জগত সমূহের প্রতিপালক কেবলমাত্র মহান আল্লাহরই প্রাপ্য।"

এ বিষয়ে আল্লা জাল্লা শানুহু সূরাহ বাইয়েনার ৫ নং আয়াতে আরো বলেনঃ

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ - অর্থাৎ তাদেরকে তো কেবলমাত্র এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা বিশুদ্ধচিত্তে একনিষ্ঠ ভাবে মহান আল্লাহর ইবাদাত করবে এবং সলাত কায়েম করবে এবং জাকাত প্রদান করবে আর এটাই সঠিক দ্বীন (তথা জীবন ব্যবস্থা)। অন্যত্র মহান আল্লাহ একমাত্র মহান আল্লাহর ইবাদাত করার এবং শিরক থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন ঃ

- وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا অর্থাৎ এবং তোমরা মহান আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক বানিয়ো না।" (নিসা-৩৬) অন্যত্র মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ

-وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ অর্থাৎ যারা তাগুতের ইবাদাত বর্জন করে এবং মহান আল্লাহ অভিমুখী হয়, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদেরকে।" (জুমার-১৭) অন্যত্র এ বিষয়ে আরো বলা হয়েছে ঃ

- وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ অর্থাৎ মহান আল্লাহর ইবাদাত করার এবং তাগুতকে (সার্বিক ভাবে) বর্জন করার নির্দেশ দিয়ে আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছি।" (নাহল-৩৬) সূরাহ বাকারার ২১নং আয়াতে মহান আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত এ বিষয়ে বলেছেন ঃ

- يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ অর্থাৎ হে মানব জাতি ! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদাত কর যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার।"

পঞ্চম শর্ত ঃ ছিদক বা সত্যতা। তাওহীদ **লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহর** অর্থ জানার পর এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, তা মনে প্রাণে কবুল করা, এর প্রতি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করার পর অবশ্যই বান্দাকে কালিমার ক্ষেত্রে স্বীয় সত্যতাকে প্রমাণ করতে হবে। যেমন এ বিষয়ে প্রিয় নবীজী প্রিয় কথা বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি সত্যনিষ্ঠ অন্তরে সাক্ষ্য দিবে যে, মহান আল্লাহ্ ছাড়া কোন হক্ব ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা মহান আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, মহান আল্লাহ্ তাঁর জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন। প্রিয় নবীজী আরো বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি সত্যতার সাথে খাঁটি অন্তরে **লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ** বলবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(আহমাদ) যে ব্যক্তি এ কালিমা শুধু মুখে উচ্চারণ করবে কিন্তু এ কালিমা দ্বারা যা বোঝান হয় তা যদি অন্তরে অস্বীকার করে তবে সে জান্নাত লাভ করতে পারবে না। মুনাফিক্বরা শুধু মুখে বলেছিল, "আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি অবশ্যই মহান আল্লাহর রাসূল" এর জবাবে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ - অর্থাৎ "মহান আল্লাহ্ও জানেন, আপনি অবশ্যই তাঁর রাসূল। আর মহান আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিক্বরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। (মুনাফিক্বুন– ১)

অর্থাৎ ঈমান হচ্ছে অন্তরে বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি এবং কর্মে তার বাস্তবায়ন (অর্থাৎ এর জন্য মরা বা জিহাদ) এমনিভাবে মহান আল্লাহ্ সূরাহ বাক্বারার ৮ নং আয়াতে তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলে বর্ণনা করেছেন ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ - "ওয়া মিনান নাছি মাইইয়াক্বুলু আ-মান্না বিল্লা-হি ওয়া বিল ইয়াওমিল আখিরি ওয়ামাহুম বি মুউমীনিন– আর মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা বলে আমরা মহান আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান এনেছি অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা ঈমানদার নয়।"

৬ষ্ঠ শর্ত ঃ ইখলাছ বা সততা একনিষ্ঠতা ঃ

তাওহীদ **লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহর** অর্থ, এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, অন্তর দিয়ে তা গ্রহণ, এর কাছে নিজেকে সমর্পণ এবং ঈমানের সত্যতা যাচাইয়ের পর বান্দাকে অবশ্যই কালিমার ব্যাপারে মুখলিছ বা একনিষ্ঠ হতে হবে। আর ইখলাছ হচ্ছে বান্দার যাবতীয় ইবাদাত- বন্দেগী একমাত্র মহান আল্লাহর জন্যই নিবেদিত হওয়া, গাইরুল্লাহর জন্য ইবাদাত বন্দেগীর বিন্দুমাত্র অংশও নিবেদিত হবে না। যেমন এ বিষয়ে মহান আল্লাহ্ রব্বুল আ'লামীন ইরশাদ করেছেন ঃ

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ -

ওয়ামা উমিরু ইল্লা লিইয়াবুদুল্লাহা মুখলিছীনা লাহুদ দ্বীন অর্থাৎ "তাদেরকে এ ছাড়া কোন হুকুমই দেয়া হয়নি যে, তাঁরা খাঁটিমনে একনিষ্ঠভাবে একমাত্র মহান আল্লাহর ইবাদাত করবে।" (বায়্যিনা-৫)

ইখলাছের মধ্যে এটাও অন্তর্ভুক্ত যে, বান্দা এ কালিমা কোন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে কিংবা কোন ব্যক্তির সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বলবেও না আঁকড়েও ধরবে

না। প্রিয় নবীজী এ বিষয়ে বলেছেন ঃ "মহান আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন, যে একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য **"লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ"** উচ্চারণ করেছে। (বুখারী) প্রিয় নবীজী আরো বলেছেন, "যে ব্যক্তি একনিষ্ঠ অন্তরে বললো **'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ'** সেই হচ্ছে ক্বিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ লাভের জন্য সবচেয়ে সৌভাগ্যবান।"

তাফসীর ইবনু কাসীরে বর্ণিত রয়েছে যে, ঈসা রুহুল্লাহ আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমাকে তাঁর অনুসারী হাওয়ারীরা প্রশ্ন করেছিল ঃ "হে রুহুল্লাহ আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা ! বলুন তো 'মুখলিস' ব্যক্তি কে ? উত্তরে তিনি বলেছিলেন ঃ 'যে শুধুমাত্র মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমাল করে। লোকে তার প্রশংসা করুক এটা তার উদ্দেশ্য থাকে না।"

ইখলাছের গুরুত্ব ও ফলাফল

১. আমল কবুলের প্রথম শর্ত ইখলাছ। ইখলাছ শূন্য আমল পরিত্যায্যঃ

আমল কবুলের পূর্বশর্ত হচ্ছে ইখলাছ। আমল যদি ইখলাছপূর্ণ না হয়ে লোক দেখানোর জন্য কিংবা সুনাম-সুখ্যাতির জন্য হয়, তাহলে সে আমল আল্লাহ গ্রহণ করবেন না। মহান আল্লাহ্র বাণী,

قل انما انا بشر مثلكم يوحى الى انما الهكم اله واحد – فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا -

'(হে নবী!) আপনি বলুন, আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার প্রতি অহি করা হয় যে, তোমাদের ইলাহ একজন। সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন সৎকর্ম করে ও তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে' (সূরাহ কাহফ-১১০)।

সুপ্রিয় পাঠক-পাঠিকা! উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আব্দুর রহমান বিন নাছির আস-সা'আদী (১৭০৭-১৩৭৬ হিঃ) রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, (لا يرئ بعمله بل يعمله خالصا لوجه الله تعالى -) 'লোক দেখানোর জন্য আমল করবে না বরং আমল করবে ইখলাছসহ মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য' (তায়সীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান, পৃঃ ৪৮৯)। আল্লামা ইবনু কাছীর (৭০১-৭৭৪ হিঃ) রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'কোন আমল মহান আল্লাহ কবুল করবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ আমলের মধ্যে এ দু'টি শর্ত একত্রিত না হবে। **(ক) কাজটি সঠিক পদ্ধতিতে শরী'আত মোতাবেক অর্থাৎ**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-এর নির্দেশিত পন্থায় হওয়া এবং (খ) শিরক থেকে মুক্ত হওয়া' (তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ৩য় খন্ড, পৃঃ- ৪০৩)। উল্লেখ্য যে, লোক দেখানোর জন্য বা মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে আমল করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। এ ব্যাপারে নিম্নের হাদীছটি উল্লেখযোগ্য:

আবু মূসা রাজিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা -এর নিকট এসে বলল, এক ব্যক্তি গণীমতের জন্য, এক ব্যক্তি প্রসিদ্ধ হওয়ার জন্য এবং এক ব্যক্তি বীরত্ব দেখানোর জন্য যুদ্ধ করল, তাদের মধ্যে কে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করল? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কালিমা উঁচু করার জন্য যুদ্ধ করল সেই আল্লাহ্র পথে জিহাদ করল (মিশকাত হা/৩৮১৪)। এজন্য মহান আল্লাহ বলেন, الذى خلق الموت والحيوة ليبلوكم ايكم احسن عملا – وهو العزيز الحكيم - 'যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে সর্বোত্তম। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী' (মুলক-২)। ফুযাইল ইবনু আয়ায রহিমাহুল্লাহ সুন্দর আমল সম্পর্কে বলেছেন,

'সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি খালেছ আমল এবং সর্বাধিক সঠিক আমল। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আবু আলী! **'সবচেয়ে বেশি খালেছ আমল এবং সর্বাধিক সঠিক আমল'**- এর অর্থ কী? উত্তরে তিনি বললেন, আমল যদি খালেছভাবে একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হয় কিন্তু তা সঠিক না হয়, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। আর যদি সঠিক হয় কিন্তু খালেছভাবে একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে না হয়, তাহলে তাও গ্রহণযোগ্য হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তা খালেছ ও সঠিক উভয়ই না হবে। খালেছ হল যখন আল্লাহ্র জন্য হবে এবং সঠিক হল যা সুন্নাহ অনুযায়ী হবে (মাদারিজুস সালেকীন, ১ম খন্ড, পৃঃ- ১০৪-১০৫)।

২. ইখলাছ শূন্য আমল মূল্যহীন:

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعله هياء منثورا- 'আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করব অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধুলিকণারূপে করে দিব' (ফুরক্বান-২৩)। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু হাজার হাইতামী (৯০৯-৯৭৪ হিঃ/১৫০৪-১৫৬৭ খিঃ) বলেছেন, (الاعمال التى قصد بها غير الله تعالى ثوابها صارت كالهباء المنثور) **'ঐ সমস্ত**

আমল যেগুলো আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে করা হয়, সেগুলোর ছওয়াব বাতিল হবে এবং তা হবে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণার মত' (আয-যাওয়াজিরু আন ইক্বতিরাফিল কাবাইর, ১ম খন্ড, পৃঃ- ৬৯)।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلوة ولا تكونوا من المشركين- 'বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁর অভিমুখী হয়ে তাকে ভয় করে, ছালাত কায়েম কর এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' (রূম-৩১)। আল্লামা কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ان العبادة لا تنفع الا مع الاخلاص 'নিশ্চয় ইখলাছ শূন্য ইবাদত কোন উপকারে আসবে না' (আল-জামে'উ লি আহকামিল কুরআন, ১৪তম খন্ড পৃঃ- ৩২)।

৩. ইখলাছশূন্য আমলকারী ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবেঃ

ইখলাছশূন্য আমল ও আল্লাহকে সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে আমলকারী জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এ বিষয়ে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বিচারের জন্য সর্বপ্রথম যে তিন ব্যক্তিকে ডাকবেন এবং তাদের বিচার করে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করবেন মর্মে বর্ণিত হাদীছটি প্রণিধানযোগ্য (আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/২২)।

৪. ইখলাছের প্রতিদান জান্নাত লাভঃ

আল্লাহ তা'আলা মুখলিছ ব্যক্তির জন্য জান্নাতের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين- وسوف يؤت الله المؤمنين اجرا عظيما- 'কিন্তু যারা ক্ষমা প্রার্থনা করে ও সংশোধিত হয় এবং আল্লাহকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করে ও আল্লাহ্র জন্য তাদের দ্বীনকে বিশুদ্ধ করে। বস্তুতঃ তারাই মুমিনদের সঙ্গী এবং অচিরেই আল্লাহ মুমিনদেরকে উত্তম প্রতিদান দিবেন' (নিসা ১৪৬)। উক্ত আয়াতে **'উত্তম প্রতিদান'** বলতে আখিরাতে জান্নাতকে বুঝানো হয়েছে (মুহাম্মাদ আলীআছ-ছাবূনী, ছাফওয়াতুত তাফসীর, ১ম খন্ড, পৃঃ- ২০৩)। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, الا عباد الله المخلصين – اولئك لهم رزق معلوم – فواكه وهم مكرمون- فى جنت النعيم - 'তবে তারা নয়, যারা আল্লাহ্র একনিষ্ঠ বান্দা', তাদের জন্য রয়েছে নির্ধারিত রিযিক-ফলমূল এবং তারা হবে সম্মানিত; থাকবে নে'মতপূর্ণ জান্নাতে' (ছাফফাত ৪০-৪৩)।

৫. আসমানী কিতাবগুলোর সারকথা ইখলাছঃ

আল্লাহ তা'আলা পৃথীবিতে নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য। এ জন্য তাদের উপর যে কিতাবগুলো নাযিল করা হয়েছে তার সারমর্ম হচ্ছে মানুষ একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করবে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন, واتينا موسى الكتاب وجعلنه هدى لبنى اسرائيل الا تتخذوا من دونى وكيلا - 'আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তাকে বাণী ইসরাঈলের জন্য পথ নির্দেশক করেছিলাম, আর আমি আদেশ করেছিলাম এই মর্মে যে, তোমরা আমাকে ব্যতীত অপর কাউকে কর্ম বিধায়করূপে গ্রহণ কর না' (বাণী ইসরাঈল-২)। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা শানক্বীতী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

'আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে বিধায়করূপে গ্রহণ করার নিষেধাজ্ঞার ব্যাখ্যা হল তাওরাতকে বানী ইসরাঈলের জন্য হেদায়াত হিসাবে নির্ধারণ করা। কেননা ইখলাছ সহ ইবাদত হবে একমাত্র আল্লাহ্র জন্য নিবেদিত। আর এটা নবীগণের উপর নাযিলকৃত আসমানী কিতাবগুলোর মূল বক্তব্য' (আযওয়াউল বায়ান ফী ইযাহিল কুরআন বিল কুরআন, ৩য় খন্ড, পৃঃ- ১১)।

৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা -এর শাফা'আত লাভঃ

মুখলিছ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা -এর শাফা'আত লাভ করবে। হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা রাজিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন,

'একদা আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা -কে প্রশ্ন করা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা! ক্বিয়ামতের দিন আপনার সুপারিশ লাভের ব্যাপারে কে সবচেয়ে অধিক সৌভাগ্যবান হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বললেন, আবু হুরায়রা! আমি মনে করেছিলাম এ বিষয়ে তোমার পূর্বে আমাকে আর কেউ জিজ্ঞেস করবে না। কেননা আমি দেখেছি হাদীছের প্রতি তোমার বিশেষ লোভ রয়েছে। ক্বিয়ামতের দিন আমার শাফা'আত লাভে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান হবে সেই ব্যক্তি, যে একনিষ্ঠভাবে لا اله الا الله বলে' (বুখারী হা/ ৯৯)।

৭. ইখলাছ অবলম্বনকারী উত্তম বাক্যের দিকে পরিচালিত হয়ঃ

মহান আল্লাহ বলেন, وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد- ‘তাদেরকে পবিত্র বাক্যের দিকে পথ প্রদর্শিত করা হয়েছিল এবং তাদেরকে পরিচালিত করা হয়েছিল পরম প্রশংসিত পথে’ (হজ্জ-২৫)। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা বর্ণনায় ইবনু আবু শায়বা, ইবনু মুনযির ও ইবনু আবী হাতেম যাহহাক সূত্রে বর্ণনা করেন যে, (وهدوا الى الطيب من القول) দ্বারা ইখলাছকে বুঝানো হয়েছে এবং (وهدوا الى صراط الحميد) দ্বারা ইসলামকে বুঝানো হয়েছে’ (আত-দুররুল মানছূর ফিত তা‘বীল বিল মা‘ছূর, ৭ম খন্ড, পৃঃ-১৩৩)।

৮. ফিতনা থেকে মুক্তি লাভঃ

ইউসুফ আলাইহিস সালাম আত-তাসলিমা-এর ফিতনা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন ولقد همت به – وهم بها لولا ان را برهان ربه- كذالك لنصرف عنه السوء والفحشاء- انه من عبادنا المخلصين- ‘সেই রমনী তো তার প্রতি আসক্ত হয়েছিল এবং সেও তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ত; যদি না সে তার প্রতিপালকের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করত। আমি তাকে মন্দ কর্ম ও অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখার জন্য এভাবে নিদর্শন দেখিয়েছিলাম। সে তো ছিল আমার বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত’ (ইউসুফ-২৪)। উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা ইউসুফ আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমাকে অশ্লীলতা এবং বেহায়াপনা থেকে রক্ষা করেছেন তার ইখলাছের বিনিময়ে। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভালবাসে এবং তারই জন্য একনিষ্ঠতা প্রকাশ করে, সে ব্যক্তির অন্তরটা তার প্রেমিক আল্লাহ্র সাথে সম্পৃক্ত থাকে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য একনিষ্ঠতা প্রকাশ করে না, সে ব্যক্তির অন্তর অন্যের ইবাদত করে (ইগাছাতুল লুহফান মিন মাছাইদিশ শায়তান, ১ম খন্ড, পৃঃ-৪৭)।

৯. বৈধ কাজগুলো ইবাদতে রূপান্তরিত হওয়াঃ

ইবাদত কিংবা অন্যান্য বৈধ কাজগুলো যদি একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে করা হয়, তাহলে আল্লাহ তা‘আলা সেগুলোকে মূল্যায়ন করবেন ও ছওয়াব প্রদান করবেন। হাদীছে এসেছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেছেন, ‘আর তোমাদের যৌনাঙ্গে রয়েছে ছাদাক্বাহ। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা! আমাদের কেউ যদি তার যৌন চাহিদা পূর্ণ করে,

তাহলে কি তার জন্য নেকি রয়েছে ? তিনি বললেন, তোমরা কি মনে কর যদি কেউ অবৈধ পন্থায় যৌন চাহিদা মেটায়, তাহলে কি তার পাপ হবে? এমনিভাবে যদি কেউ বৈধ পন্থায় তার যৌন চাহিদা পূর্ণ করে, তাহলে তার জন্য নেকি রয়েছে' (মিশকাত হা/১৮৯৮)। অন্যত্র আমের ইবনু সা'দ (রাজিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেছেন, 'আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য তুমি যা কিছুই খরচ কর না কেন তার উপর তোমাকে প্রতিদান দেয়া হবে। এমনকি এক লোকমা বা এক গ্রাস খাবার, যা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দিবে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা! আমি তো আমার সাথীদের পর তাদের পিছনে রয়ে যাচ্ছি। তিনি বললেন, তুমি পিছনে রয়ে গেছো তাতে তুমি এমন আমল করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করতে পার, যাতে তোমার মর্যাদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও উঁচু হয়' (বুখারী হা/ ৪৪০৯; মুসলিম হা/১৬২৮)।

সুধী পাঠক! ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'আমল নিয়তের উপর নির্ভর করে। ব্যক্তির আমলের ছওয়াব দেয়া হয় তার নিয়তের দিকে লক্ষ্য করে। যখন আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিবারের জন্যও খরচ করা হয়, তাতে ছওয়াব দেয়া হয়। আর বৈধ কাজ, যাতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্য থাকে, সেটিও মহৎ কাজে পরিণত হয়। আর তাতে ছওয়াব দেয়া হয়। এজন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেছেন, حتى اللقمة تجعلها فى فى امرأتك (এমনকি এক লোকমা খাবারও, যা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দিবে'। কেননা মানুষের স্ত্রী পৃথীবিতে তার বিশেষ সাথী। তার মৌলিক চাহিদা পূরণ ও তাকে আশ্রয়দান করা উচিত' *(আল-মিনহাজু শারহি ছহীহ মুসলিম, ১১ তম খন্ড, পৃঃ- ৭৭)।*

১০. শয়তানের প্রতারণা থেকে রক্ষাঃ

শয়তান বনু আদমের প্রকাশ্য শত্রু। সে সব সময় বনু আদমকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলতে চায়। কিন্তু আল্লাহ তাঁর একনিষ্ঠ বান্দাদের তার প্রতারণার ফাঁদ থেকে রক্ষা করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, قال رب بما اغويتنى لازينن لهم فى الارض ولاغوينهم اجمعين - 'সে (শয়তান) বলল, হে আমার প্রতিপালক! আপনি যে আমাকে বিপথগামী করলেন তার জন্য আমি পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাপকর্মকে অবশ্যই শোভন করে তুলব এবং আমি তাদের সকলকেই বিপদগামী করব, তবে তাদের মধ্যে আপনার নির্বাচিত

সৎকর্মশীল বান্দাগণ ব্যতীত' (হিজর -৩৯) । অন্যত্র আল্লাহ বলেন, قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين – الا عبادك منهم المخلصين - 'সে বলল, আপনার ক্ষমতার শপথ! আমি তাদের সকলকেই পথভ্রষ্ট করব, তবে তাদের মধ্যে সৎকর্মশীল বান্দাগণ ব্যতীত' (ছোয়াদ- ৮২-৮৩)।

১১. ইখলাছপূর্ণ দু'আ আল্লাহ ফিরিয়ে দেন নাঃ

খুলুছিয়াত সহ আল্লাহ্র নিকটে দু'আ করলে তিনি তা কবুল করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

واذا غشيهم موج كا لظلل دعوا الله مخلصين له الدين – فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد- وما يجحد بايتنا الاكل ختار كفور -

'যখন তাদেরকে মেঘমালা সদৃশ তরঙ্গ আচ্ছাদিত করে নেয়, তখন তাঁরা খাটি মনে আল্লাহকে ডাকতে থাকে। অতঃপর তিনি যখন তাদের স্থলভাগের দিকে উদ্ধার করে আনেন, তখন তাদের কেউ কেউ সরল পথে চলে। কেবল মিথ্যাচারী, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই আমার নির্দশনাবলী অস্বীকার করে' (লুক্বমান-৩২)। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, فاذا ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين – فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون- 'তারা যখন জলযানে আরোহণ করে, তখন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন স্থলে এনে তাদেরকে উদ্ধার করেন, তখনই তারা শরীক করতে থাকে' (আনকাবূত- ৬৫)।

সুধী পাঠক! উক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আল্লাহর নিকট আমল কবুল হওয়ার আবশ্যিক পূর্বশর্ত ইখলাছ। ইখলাছবিহীন আমল আত্মাবিহীন দেহের ন্যায়। জাহান্নাম ও ফেতনা থেকে মুক্তির জন্য ইখলাছের ভূমিকা অপরিসীম এবং জান্নাত লাভের অন্যতম মাধ্যম হল প্রতিটি কাজে ইখলাছ অবলম্বন তথা একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করা। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক্ব দান করুন-আমীন। *(ছিরাতে মুস্তাক্বীম চলমান গবেষণা পর্বঃ ৪)*

ইখলাছ সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে জানতে হলে আগ্রহী পাঠক পাঠিকা দয়া করে অত্র পুস্তকের ইখলাছ অধ্যায়টি পাঠ করুন।

সপ্তম শর্ত ঃ মুহাব্বত বা ভালবাসা। তাওহীদ **'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ'** এর অর্থ, এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, অন্তর বা মন-প্রাণ দিয়ে তা গ্রহণ, এর কাছে

নিজেকে সমর্পণ, ঈমানের সত্যতার যাচাই, কালিমার ব্যাপারে একনিষ্ঠ হওয়ার পর বান্দাকে অবশ্যই কালিমাকে মুহাব্বত করতে হবে। ক্বলব বা অন্তর দিয়ে কালিমাকে মুহাব্বত করতে হবে আর মুখে কালিমার প্রতি মুহাব্বত প্রকাশ করতে হবে। যেমন মহান আল্লাহ্ সুবহানা ওয়া তা'আলা সূরাহ বাক্বারার ১৬৫ নং আয়াতে বলেন ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّهِ جَمِيعاً وَأَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ- অর্থাৎ "আর মানুষের মধ্যে কেহ কেহ মহান আল্লাহ্ ছাড়া অপরকে মহান আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে এবং মহান আল্লাহকে ভালবাসার ন্যায় তাদেরকে ভালবাসে। কিন্তু যারা ঈমান এনেছে– মহান আল্লাহর প্রতি ভালবাসায় তারা দৃঢ়। আর কতইনা ভাল হতো যদি এ জালিমেরা পার্থিব কোন কোন আজাব প্রত্যক্ষ করে অণুধাবন করে নিতো যে, যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর জন্য এবং শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ অত্যন্ত কঠোর।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেন, ''তোমাদের মধ্যে কেউ পূর্ণাঙ্গ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং অন্যান্য সকল মানুষের চেয়ে প্রিয় না হব"। (বুখারী হা/১৫)

ঈমানের শর্তের ব্যাপারে শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ জিবরীন রহিমাহুল্লাহ বলেন, ঈমানের অন্যতম শর্ত হল- তুমি নিজের জন্য যা পছন্দ কর, তা তোমার অন্য ভাইয়ের জন্যও পছন্দ করবে। কারণ হাদীসে এসেছে, ''তোমাদের কেউ পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্য ভাইয়ের জন্যও পছন্দ না করবে"। (বুখারী হা/১৩) তিনি বলেন, ''সুতরাং সে পূর্ণ মুমিন তো নয়ই; বরং সে সাধারণ মুমিনও হতে পারবে না, যদি সে নিজের পছন্দ অন্য ভাইয়ের জন্য পছন্দ না করে"। (ফাতাওয়া শায়খ ইবনু জিবরীন, ৭ম খন্ড, পৃ: ৫৫)

শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, ''আলেমদের মধ্যে এ বিষয়ে ঐক্য আছে যে, ঈমানের অন্যতম শর্ত হল– আল্লাহর কিতাবের দিকে ফিরে যাওয়া আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা জীবিত থাকা অবস্থায় তার দিকে ফিরে যাওয়া এবং মৃত্যুর পর তাঁর সুন্নাতের দিকে ফিরে যাওয়া"। (আল-হাদীস হুজ্জাহ বিনাফসিহী, পৃ: ৩৩) সুতরাং

আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর দিকে ফিরে যাওয়াই হল ঈমানের শর্ত।

শায়খ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আল-ফাক্বীহ আশ-শানক্বিত্বী (হাফি:) তাঁর অধীনস্থ ফতওয়া বোর্ড থেকে ঈমানের শর্ত পেশ করতে গিয়ে বলেন, ''আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-কে ভালবাসা ফরজ। আর এটা ঈমানের অন্যতম শর্ত। মহান আল্লাহ এমনই বলেন"। (বাকারা-১৬৫) অতএব কোন ব্যক্তিই পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যদি সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর ভালবাসাকে ফরজ মনে না করে। (ফাতাওয়া ইসলামিয়া, ২য় খন্ড, পৃ: ২৪১৯ এবং ১০ম খন্ড, পৃ: ৩৩০৩)

সুধী পাঠক! অন্য একটি হাদীসেও পাওয়া যায় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেন, ''যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে কাউকে ভালবাসে, আর আল্লাহর ওয়াস্তে কারও সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে এবং আল্লাহর ওয়াস্তে দান-খয়রাত করে, আবার আল্লাহর ওয়াস্তেই দান-খয়রাত থেকে বিরত থাকে। সে ঈমান পূর্ণ করেছে।" (আবু দাউদ হা/৪৬৮১) উক্ত হাদীসের আলোকে অনেকেই মনে করেন ঈমানের শর্ত ৪টি। অর্থাৎ- **১. আল্লাহর জন্য কাউকে ভালবাসা ২. আল্লাহর জন্য কারো সাথে রাগ করা ৩. আল্লাহর জন্যই কাউকে কিছু দেয়া বা দান করা এবং ৪. আল্লাহর জন্যই কাউকে কিছু দেয়া থেকে বিরত থাকা। অর্থাৎ এগুলো ঈমানের শর্তের মধ্যেই পড়ে।**

অষ্টম শর্ত: আল ইস্তিক্বামাহ বা মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানের উপর অটল অবিচল থাকা।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ সূরা হিজরের ৯৯ নং আয়াতে বলেন,

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ -

অর্থাৎ, এবং আপনার পালনকর্তার ইবাদাত করুন, যে পর্যন্ত আপনার কাছে নিশ্চিত কথা না আসে (মৃত্যু না আসে)

নবম শর্ত: আল কুফর বিত তাগুত বা তাগুতের সাথে কুফুরি করা।

তাওহীদের সাক্ষ্যদানের নবম শর্ত হলো আল-কুফর বিত-তাগূত 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' -এর সাক্ষ্য দিতে হবে সকল প্রকার তাগূতের সাথে কুফরি করার মাধ্যমে। একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত বাদ দিয়ে আর যার ইবাদাত করা

হয়, তাগুত তাগূত বলে । মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের সাথে সাথে সকল প্রকার তাগুতাকে পরিহার ও বিরোধীতা করতে হবে। আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা বলেন, لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا - "অতএব, যে ব্যক্তি তাগূতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই সে মজবুত রশি আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয়।" (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ২৫৬)

এটি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, সকল আম্বিয়া (আলাইহিমুস সালাম) সকল প্রকার তাগূতকে পরিহার করার দাওয়াত দিয়েছেন। আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা এ প্রসঙ্গে বলেন, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ - "আর আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতিতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি এজন্য যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং পরিহার কর তাগূতকে। (সূরাহ আন-নাহল : ৩৬)

অতএব, যদি কারো সাথে তাগূতের গভীর সম্পর্ক বা বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয় অথবা সে নিজেই তাগূত বা তাগূতের অনুসারী হয়, তবে সে যতই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর সাক্ষ্য দিক না কেন তার অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি।

অতএব একজন মুসলিমের জ্ঞান বা ইলম হতে হবে, যেখানে মূর্খতার কোন অবকাশ নেই। তার ইখলাছ হবে শিরক ও রিয়ামুক্ত, সত্যতা হবে মিথ্যাচার মুক্ত, তার চরিত্র হবে সকল প্রকার মনের বা ক্বলবের রোগ হতে মুক্ত। তার বিশ্বাস হতে হবে সন্দেহ ও সংশয় মুক্ত। সে কালিমা উচ্চারণ করবে অথচ তার মনে কালিমা দ্বারা যা বুঝায় তার ব্যাপারে এবং এর দাবীগুলোর ব্যাপারে কোন প্রকার সংশয় সন্দেহ থাকবে না। তার ক্বলবে থাকবে সেই ভালবাসা, যার মধ্যে থাকবে না কোন ঘৃণা, থাকবে এমন গ্রহণ যোগ্যতা যার মধ্যে থাকবে না কোন অস্বীকৃতি। সেই আরব মুশরিকদের মতো তার অবস্থা হবে না যারা কালিমার অর্থ বুঝতো অথচ তা গ্রহণ করেনি।

মোদ্দাকথা হল, প্রকৃত মুমিন এই কালিমাকে মনে-প্রাণে ভালবাসবে। এর তাৎপর্য ও দাবী অনুযায়ী আমাল করতেও ভালবাসবে। যারা আমাল করে তাদেরকে ভালবাসবে। বান্দা যে তার রবকে ভালবাসে তার আলামত হচ্ছে, মহান আল্লাহ যা ভালবাসেন তা ভালবাসবে– যদিও নিজের মন তার বিরোধিতা করে। মহান আল্লাহ এবং তার রাসূল যাকে ভালবাসেন তাকে ভালবাসবে।

যাকে তারা ঘৃণা করেণ তাকে ঘৃণা করবে। তাঁর রাসূলের অনুসরণ করবে, তাঁর পথে চলবে এবং তাঁর হিদায়েতকে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করবে।

একজন মুসলিমের মধ্যে থাকা চাই সেই আনুগত্য যার মধ্যে থাকবে না শিরকের অস্তিত্ব, যে শিরকের উদ্ভব হয়েছে কালিমার দাবী, অপরিহার্য বিষয় ও অধিকার পরিত্যাগ করার কারণে। কালিমার এসব দাবী ও অপরিহার্য বিষয়গুলোর মাধ্যমেই বান্দার ইসলাম ও ঈমান পরিশুদ্ধ হয়।

উল্লেখিত তাওহীদের শর্তাবলীর প্রতিফলন যথার্থভাবে যার জীবনে ঘটবে, সে **'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহর'** অর্থ শিক্ষার ক্ষেত্রে তার কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে। সাথে সাথে সে তার জ্ঞান-প্রজ্ঞা, ভাল-মন্দের বিচার-বুদ্ধি, হিদায়াত ও স্থিরতার সাহায্যে তার দ্বীনকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। উপরের শর্তগুলোকে ঠিক রেখে এই কালিমার উপর মৃত্যু পর্যন্ত সুদৃঢ় ও অটল থাকতে হবে।

প্রশ্ন ঃ আল্লাহর একত্ববাদ বলতে কি বুঝায়?

উত্তর ঃ মহান আল্লাহকে এক বলে মানাকে আল্লাহর একত্ববাদ বলে। তবে আল্লাহকে এক বলে মানার অর্থ হচ্ছে ঃ (এক) মহান আল্লাহর ক্ষমতায় কাউকে অংশীদার না করা। (দুই) মহান আল্লাহর গুণে কাউকে অংশীদার না করা এবং (তিন) মহান আল্লাহর এখতিয়ার ও অধিকার কাউকে অংশীদার না করা। ১ নং কথার জবাবে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ওয়া হু ওয়া আ'লা কুল্লি শাইইন ক্বাদীর।

তিনি (আল্লাহ) অবশ্যই সমস্ত জিনিসের উপর এককভাবে ক্ষমতা রাখেন যার ক্ষমতার সমতুল্য আর কেউ নেই।" (সূরাহ মায়েদা)

এ কথাটি আল-কুরআনে ৪৫ স্থানে আছে। নিম্নে সূরাহ ও আয়াত নং দেওয়া হলো -

(১) সূরাহ বাকারার ২০, ১০৬, ১০৯, ১৪৮, ১৫৯, ২৮৪ নং আয়াত। (২) সূরাহ আলে ইমরান ২৬, ২৯, ১৬৫, ১৮৮ নং আয়াত। (৩) সূরাহ মায়েদার ১৭, ১৯, ২৪ ও ১২০ নং আয়াত। (৪) সূরাহ আনআমের ১৭ নং আয়াত। (৫) সূরাহ আনফালের ৪১ নং আয়াত। (৬) সূরাহ তওবার ৩৯ নং আয়াত। (৭) সূরাহ হুদের ৪ নং আয়াত। (৮) সূরাহ নফলের ৭০, ৭৭ নং আয়াত। (৯) সূরাহ আন হজ্জের ৬, ৩৯ নং আয়াত। (১০) সূরাহ নূরের ৪৫

নং আয়াত। (১১) সূরাহ আনকাবুতের ২০ নং আয়াত (১২) সূরাহ রুমের ৫০ নং ও ৫৪ নং আয়াত। (১৩) সূরাহ ফাতিরের ১ ও ৪৪ নং আয়াত। (১৪)। সূরাহ হা-মীম সেজদার ৩৯ নং আয়াত। (১৫) সূরাহ শুরার ৯, ২৯ ও ৫০ নং আয়াত। (১৬) সূরাহ আল আহকাফের ৩৩ নং আয়াত। (১৭) সূরাহ হাদীসের ২ নং আয়াত। (১৮) সূরাহ হাশরের ৬ নং আয়াত। (১৯) সূরাহ মুমতাহানার ৭ নং আয়াত। (২০) সূরাহ তাগাবুনের ১ নং আয়াত। (২১) সূরাহ তালাকের ১২ নং আয়াত। (২২) সূরাহ তাহরীমের ৮ নং আয়াত। (২৩) সূরাহ মুলকের ১ নং আয়াত। (২৪) সূরাহ নিসার ১৩৩ ও ১৪৯ নং আয়াত। (২৫) সূরাহ ফুরকানের ৫৪ নং আয়াত। (২৬) সূরাহ আহযাবের ২৭ নং আয়াত। (২৭) সূরাহ আলফাতাহর ২১ নং আয়াত।

মোট এই ৪৫টি আয়াত ছাড়াও আরও ১৪টি আয়াত নাযিল হয়েছে। যার প্রত্যেকটি আয়াত থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে মহান আল্লাহর ক্ষমতা আল্লাহর জন্যেই নির্দিষ্ট। এতে আর কারো অংশ নেই।

মহান আল্লাহর ক্ষমতা একাধিক হাতে থাকলে কি অসুবিধা হতো তা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ বলেন ঃ

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ -

"যদি আকাশ ও পৃথিবীতে আর কারও সার্বভৌমত্ব থাকতো তাহলে আসমান এবং পৃথিবীর উভয়েরই শৃঙ্খলা ব্যবস্থা বিনষ্ট হয়ে যেত। অতএব, আরশের মালিক এক আল্লাহই। সেই সব কথা থেকে তিনি পবিত্র যা লোকেরা বলে বেড়ায়।" (সূরাহ আম্বিয়া ২২ নং আয়াত)

যদি আকাশ ও পৃথিবীর পরিচালনা ব্যবস্থাপনার মধ্যে আর কেউ শরীক থাকত তাহলে আবহমান কাল ধরে দিন-রাত, ঋতুর পরিবর্তন, অমাবস্যা-পূর্ণিমা, বায়ু প্রবাহ, সমুদ্র স্রোত, আকাশের গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান ও আপন আপন কক্ষ পথে পরিভ্রমণ ইত্যাদি একই নিয়মে চলতে পারত না। কেউ আল্লাহ থাকলে (নাউযুবিল্লাহ) প্রত্যেক শক্তিধরই সৃষ্টির মধ্যে যার যার পরিকল্পনা চালাতে চাইত, ফলে সৃষ্টির মধ্যে আমরা একই নিয়ম দেখতে পেতাম না। এই জন্যই আল্লাহ বলেছেন-অবশ্যই এসবের পরিচালনার মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতই। কিন্তু তা যখন সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত কোথাও দেখা যাচ্ছেনা তখন এটা স্পষ্ট প্রমাণিত হলো যে আল্লাহ একই সত্তা এবং তাঁর সৃষ্টির মধ্যে তাঁর ক্ষমতায় আর কারোরই বিন্দু পরিমাণও অংশ নেই।

২। মহান আল্লাহর গুণে কারও অংশ নেই। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ সূরাহ নমলের ৬০ নং আয়াত থেকে ৬৬ নং আয়াত পর্যন্ত কতকগুলো গুণের কথা বলেছে যেগুলোর জন্য প্রয়োজন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়া। একটি আয়াতের মধ্যে আল্লাহ ৫ বার উল্লেখ করেছেন ঃ

তোমরা কেউ কি ছিলে উল্লেখিত কাজের ব্যাপারে আল্লাহর সঙ্গে সার্বভৌমত্বের মালিক? (গুণগুলি হচ্ছে)

(এক) তিনি কে যিনি আসমান জমিনকে বৈজ্ঞানিকভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ থেকে গাছের খাদ্য সার সহ পানি বর্ষণ করেছেন যার দ্বারা গাছপালা সজীব হয়?

(দুই) আর কে তিনি, যিনি চলমান পৃথিবীকে অনড়-অটল করা, পৃথিবীতে পাহাড় গেড়ে দেওয়া, দুই ধরণের পানির সমুদ্রকে একই সঙ্গে প্রবাহিত করা, যার মধ্যে প্রাচীর ছাড়াই দুই ধরণের পানি একত্রে মিলিত হয় না, তার ব্যবস্থা করেন?

(তিন) কে তিনি, যাকে বিপদে পড়ে তোমরা ডাক আর তোমাদেরকে তিনি বিপদমুক্ত করে দেন? আর তোমাদেরকে তাঁর পৃথিবীতে এক দল মানুষের পর আর একদল মানুষকে দিয়ে তাঁর পৃথিবীর আবাদ ঠিক রেখেছেন।

(চার) আর কে তিনি, যিনি স্থল ও জল ভাগে তোমরা পথ হারিয়ে গেলে তোমাদের পথ দেখান? আর বায়ুর সঙ্গে বৃষ্টির সংবাদ ও বায়ুতে কোটি কোটি টন পানি বয়ে নিয়ে যান যার দ্বারা বৃষ্টি হয়?

(পাঁচ) আর কে তিনি, যিনি প্রত্যেক প্রাণী, গাছ-পালা সহ যাবতীয় কিছুতেই একটার পর একটা সৃষ্টি করে পৃথিবীকে সব সময় নতুন করে রেখেছেন। একটা গাছ বৃদ্ধ হয়ে মরে যাচ্ছে আরেকটা নতুন গাছ গজাচ্ছে, একদল মানুষ বৃদ্ধ হয়ে মরে যাচ্ছে আবার ছেলেরা যুবক হয়ে পৃথিবীর অবয়বকে ঠিক রাখছে এসব ব্যবস্থা কে করে?

এই ধরণের ক্ষমতা ও গুণ যদি কারও মধ্যে থাকে তবে মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমাকে বলেছেন তার প্রমাণাদি হাজির কর কিন্তু তা পারবেনা তবুও তোমরা মহান আল্লাহর গুণের সঙ্গে অন্যকে শরীক করছ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এসব ক্ষমতা ও গুণ একমাত্র মহান আল্লাহর মধ্যেই আছে, অন্য কারো মধ্যে নেই।

৩। তিন নম্বরে বলা হয়েছে মহান আল্লাহর অধিকারে শরীক করা। এ ব্যাপারে একটাই মাত্র উদাহরণ দেব। মহান আল্লাহ বলেন ঃ সূরাহ ইউসুফের ৪০ নং ও ৬৭ নং আয়াত।

অর্থাৎ হুকুম কর্তা ও আইনদাতা একমাত্র আল্লাহই। কিন্তু আইন তৈরী করার অধিকার যদি কোনো মানুষকে বা মানব গোষ্ঠীকে বা গণ পরিষদ বা যে কোনো সংস্থাকে দেওয়া হয় তবে মহান আল্লাহর অধিকারে তাকে অংশ দেওয়া হতো।

উপরোল্লিখিত বিষয় তিনটির কোনটিকে কাউকে অংশীদার না বানানোই হচ্ছে তাওহীদ এ বিশ্বাসী হওয়া। *(সওয়াল জওয়াব ৭, ৮ ও ৯ কিতাবের ৪৭-৪৯ পৃঃ)*

প্রশ্ন ঃ মুশরিক্ব কারা?

উত্তর ঃ যদি কেউ উপরে উল্লেখিত বিষয় তিনটির (শক্তিকে, গুণে ও অধিকারে) যে কোন একটিতেও মহান আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার বানায় তবে সেই-ই মুশরিক্ব। মুশরিক্ব কোনো জাতির নাম নয়। প্রতিটি মানুষের তা সে যে জাতিরই হোক না কেন, কাজের উপর নির্ভর করে যে, সে কি? যেমন M. A পাশের সার্টিফিকেট কোন জাতির জন্যই নির্দিষ্ট নয়। এ যেমন অর্জনের জিনিস ঠিক তেমনিই মহান আল্লাহর ওয়াহদানিয়াত মানা এবং না মানা বা মুশরিক্ব হওয়া, এটা ব্যক্তির নিজস্ব ব্যাপার এখানে জন্মগত কোন কিছু নেই। তার মন চাইলে সে মহান আল্লাহর একত্ববাদের ওপর কায়েম থাকতে পারে আর মন চাইলে সে মুশরক্বি হতে পারে। তবে তাকে অবশ্যই জানতে হবে যে কোন কোন কাজে শিরীক হয়।

প্রশ্ন ঃ মুশরিক্ব কি মহান আল্লাহকে মানে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, মুশরিক্বরা মহান আল্লাহকে মানে, তবে তারা মনে করে মহান আল্লাহর শক্তিতে বা তাঁর গুণে কিংবা তার অধিকারে অন্যের অংশ আছে। মুশরিক্বরা যে মহান আল্লাহকে মেনেই মুশরিক্ব হয় তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ধরুন, আপনার পিতা পূর্বে এক বিবাহ করেছিলেন। এরপর সে মহিলার একটা সন্তান হওয়ার পর তাকে তালাক দিলেন। অতঃপর আপনার সেই পূর্বের মা যাকে আপনার জন্মের এমন কি আপনার মায়ের বিবাহের পূর্বে তালাক দিয়েছিলেন-যার কোন খোঁজও আপনি রাখেন না। অতঃপর আপনার মায়ের গর্ভজাত ছেলেটা সহ অন্যত্র তার বিবাহ এবং সেখানেই আপনার সেই

সৎ ভাই তার কাছে বড় হলো। এদিকে আপনার পিতার মৃত্যুর পর আপনার (আপনার পিতার ২য় পক্ষের স্ত্রীর ছেলে মেয়েসহ) আপনার পিতার সম্পত্তি ভাগ-যোগ করে নিয়ে ভোগ করছেন। এমন সময় যদি আপনার সেই সৎ ভাই এসে দাবী করে যে, আমি তোমাদের এক ভাই। তোমরা পিতার যে সম্পদ ভাগ করে নিয়ে যাচ্ছ তাতে আমার অংশ আছে। এই অংশীদারীত্বের দাবী করার অর্থই হলো তাদের (পিতার পরের পক্ষের ভাই-বোনের) শরীক হওয়ার দাবী করা। এখন বলুন, পরে যে ভাইটা দাবী করছে যে আমি তোমাদের একজন শরীক, সেকি তার সৎ ভাই-বোনদের অস্বীকার করল? না অস্বীকার করল না বরং তাদের মালিকানা পূর্ণভাবে স্বীকার করার পরই সে বলছে যে পিতার সম্পত্তিতে তোমাদের শরীকী ভাগ আছে সেই সাথে আমার শরীকানা ভাগও আছে। এখানে প্রমাণ হলো যে শরীক হওয়ার অর্থ হচ্ছে অন্যের সঙ্গে নিজেকে শরীক করা। তাহলে এ উদাহরণ থেকে প্রমাণ হলো যে, যারাই শিরক করে তারা মহান আল্লাহকে মেনে নিয়েই তার সঙ্গে অন্যকে শরীক করে।

এই জন্যেই পূর্ব জামানায় যারা বড় নাম করা মুশরিক্ব ছিল, যেমন নমরূদ, ফেরাউন এদের কথা মহান আল্লাহ বলেছেন, তাদের যদি জিজ্ঞাসা করেন কে আসমান জমিন সৃষ্টি করেছে এবং চাঁদ সূর্যকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছে। তাহলে তারা (ঐ বড় বড় কাফের মুশরিক্বরা) বলবে ওগুলো অবশ্যই মহান আল্লাহ করেন আমি এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের আয়াত গুলো নিম্নে উল্লেখ করছি। এই ধরনের আয়াত আল-কুরআনে মোট ৪টি আছে। যথা- (১) সূরাহ আনকাবুতের ৬১নং আয়াত।

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ - فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ -

আর তুমি যদি তাদের জিজ্ঞাসা কর যে, কে আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং চাঁদ সূর্যকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন? তাহলে তারা বলবে, অবশ্যই ওগুলো মহান আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন।

(২) সূরাহ লোকমানের ২৫নং আয়াত (৩) সূরাহ রুমের ৩৮ নং আয়াত (৪) সূরাহ যুখরুফের ৯নং আয়াত। এ ৪টি আয়াত থেকে অবশ্যই বুঝা গেল যে যারা ইলাহর দাবী করেছিল তারা কেউই পৃথিবী ও আসমানের সৃষ্টিকর্তা বা চাঁদ সূর্যের সৃষ্টিকর্তা হওয়ার দাবী করেনি। তারা সব সময়ই মহান আল্লাহর আইন দাতা ও হুকুম কর্তা হওয়ার অধিকারে নিজেদের অংশ দাবী করে ছিল। সেই জন্যই তাদের সম্পর্কে বলা হয় যে, তারা ইলাহর দাবীদার

ছিল। প্রকৃত পক্ষে যেহেতু তাদের পরে নবী এসেছেন তাই মহান আল্লাহর নবীগণ তাদের সম্পর্কে বলেছেন যে, মহান আল্লাহর সঙ্গে তারা আইনদাতা হুকুমকর্তা হওয়ার মত দাবীদার ছিল বলে তাদেরকে ইলাহর দাবীদার বলা যায়। আর তা মহান আল্লাহর নবীগণ তাদের ব্যাপারে ইলাহর দাবীদার বলেছেনও। ভাগ্য ভালো যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-এর পরে আর কোনো নবী নাই। তা না হলে আজও অনেকের নাম নমরুদ, ফেরাউন ইত্যাদির নামের তালিকাভুক্ত আমরা দেখতে পেতাম। দেখতে পেতাম তাদের নামের তালিকায় কোনো মহাদেবেরই নাম বাদ পড়েনি। এমনকি আমাদের ক্ষুদ্র বাংলাদেশেরও কারো নাম সে তালিকায় পাওয়া যেত এবং সে নাম যে কাদের উঠত তা চোখ ওয়ালারা চোখ দিয়ে দেখেও থাকেন।

প্রশ্ন ঃ ফাসেক, কাফের ও তাগুতের মধ্যে পার্থক্য কি? এবং তাগুত কারা?

উত্তর ঃ (এক) যে ব্যক্তি গোনাহের কাজ করে তা স্বীকার করে যে, হ্যাঁ আমি গোনাহের কাজ করে ফেলেছি সে ফাসেক।

(দুই) যে আল্লাহর আইন অমান্য করে কিন্তু স্বীকার করে না যে সে কোনো অন্যায় কাজ করেছে আর সে অন্যকে মহান আল্লাহর আইন অমান্য করতে বাধ করেনা, সে যা অন্যায় করে তা নিজের খেয়াল খুশি মোতাবিকই করে, অপরকে দিয়ে মহান আল্লাহর আইন অমান্য করানোর মত কোন শক্তি সে রাখে না, তাকে বলে কাফের।

(তিন) যে নিজে মহান আল্লাহর আইন অস্বীকার ও অমান্য করে এবং আইন করে অপরকে দিয়ে মহান আল্লাহর আইন অমান্য করতে বাধ্য করে তাকে বলে তাগুত। যেমন মহান আল্লাহ আইন করে দিলেন রস্তার ডান পাশ দিয়ে চলো, আর তাগুত আইন করল রাস্তার বাম পাশ দিলে চলো। এখানে রাস্তার বাম পাশ দিয়ে চলার আইন তৈরি করা এবং তা কার্যকর করার অর্থই হলো আইন করে মহান আল্লাহর আইনকে অমান্য করানো। যারা এইরূপ আইন করে মহান আল্লাহর আইনকে অমান্য করায় তাদেরকেই বলা হয় তাগুত। আর তাগুত হতে হলে রাজ শক্তি হাতে থাকা দরকার। রাজ শক্তি হাতে না থাকলে মহান আল্লাহর আইনকে অমান্য করানোর মত আইন তৈরিও করা যায়না এবং আইন কার্যকর করে মহান আল্লাহর আইনকে বাতিলও করা যায় না। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা-এর সময় যে তাগুত ছিল

তার নাম উল্লেখ না করেই মহান আল্লাহ সূলা বাকারার ২৫৮ নং আয়াতে বলছেন ঃ

لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ -

"তুমি কি সেই ব্যক্তিকে চেন বা সেই ব্যক্তির কথা কি চিন্তা করেছো যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা-এর সঙ্গে তার রবের ব্যাপারে তর্ক করেছিল। তর্কের বিষয় ছিল যে, রব কি? সে ব্যক্তি এই জন্যে তর্ক করেছিল যে, মহান আল্লাহ তাকে রাজত্ব দান করেছিলেন।"

এই একটি মাত্র আয়াত থেকেই বুঝা যায় যে, তাগুত হতে হলে তার হাতে রাজশক্তি থাকতে হবে, কারণ এর পূর্বে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-এই সূরাহর ১৫৬ নং আয়াতের মধ্যে মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ **"তাগুতকে অস্বীকার করল এবং আল্লাহকে মেনে নিল"**। এর মধ্যে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে মহান আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী হতে হলে তার পূর্বে তাগুতকে অস্বীকার করতে হবে, পরে সে ঈমান আনতে পারবে মহান আল্লাহর প্রতি। কিন্তু বাস্তবে সমাজের মুসলমানদের সার্বিক অবস্থাকে সামনে রেখেই মহান আল্লাহ সূরাহ ইউসূফের ১০৬ নং আয়াতে বলেছেন ঃ

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ -

এদের অধিকাংশই মহান আল্লাহকে মানে কিন্তু মানে এমনভাবে যে, তার সঙ্গে (ইবাদাতে) অন্যকেও শরীক করে।

উপরের আলোচনা থেকে পরিষ্কার হলো যে-

(এক) মুশরিক্ব মহান আল্লাহকে মানে, আল্লাহকে তারা অস্বীকার করেনা। তবে মহান আল্লাহর অধিকারে শরীকানা দাবী করে।

(দুই) আমরা মহান আল্লাহকে মানি, কিন্তু তাগুতকে অস্বীকার করি না।

প্রশ্ন ঃ মহান আল্লাহর একত্ববাদ কোন সমাজে চলতে পারে?

উত্তর ঃ এর উত্তর একটা বাচ্চা ছেলের কাছেও অত্যন্ত সহজ। যে সমাজে একমাত্র মহান আল্লাহর আইন ছাড়া আর কোনো আইন চলে না, সেই সমাজই মহান আল্লহর একত্ববাদের উপর চলতে পারে।

যেমন মহান আল্লাহ সূরাহ নূরের ৫৫ নং আয়াতে বলছেন ঃ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا -

"আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনবে এবং আমলে সালেহ করবে তাদেরকে মহান আল্লাহ অবশ্যই এই দুনিয়ায় খেলাফত দান করবেন (যেখানে মহান আল্লাহর আইন ছাড়া আর কোনো আইনই চলবে না) যেমন দান করেছিলেন পূর্ববর্তীদেরকে। তখন দ্বীনকে মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে দিবেন যা মহান আল্লাহ তাদের জন্য পছন্দ করেছেন (তখন মানুষ আল্লাহর একত্ববাদের উপর থাকতে পারবে। যেভাবে দ্বীনকে মানা মহান আল্লাহ পছন্দ করেন সেভাবে তারা দ্বীনকে মানতে পারবে। আর তখন তাদের সমস্ত প্রকার সামাজিক ভয়-ভীতি নিরাপত্তা দ্বারা পরিবর্তন করে দেওয়া হবে। তখন তারা আমার ইবাদত করতে পারবে এবং আমার সঙ্গে আর কাউকে শরীক করবে না বা শরীক করতে বাধ্য হবে না।"

এই সমাজই হচ্ছে খেলাফতের সমাজ। এই সমাজের লোকই মহান আল্লাহর একত্ববাদের ওপর টিকে থাকতে পারে। আর এ ধরনের খেলাফত কায়েম হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

(এক) মুসলমান দ্বীনকে সেইভাবে মানতে পারবেনা যেভাবে মানলে তা মহান আল্লাহ পছন্দ করেন।

(দুই) সমাজ থেকে নানা ধরনের ভয়–ভীতির কোনটাই উঠবে না বরং তা বাড়তেই থাকবে।

(তিন) নিরাপত্তার সমাজ কি তা মানুষ বুঝতেই পারবেনা। যেমন কেউ যদি চিরদিনই অন্ধকারের মধ্যে বাস করে যেরূপ আলো কেমন তা বুঝতে পারে না, ঠিক তদ্রূপই খেলাফত কায়েম না হলে নিরাপত্তার সমাজ কেমন তা মানুষ বুঝতেই পারবেনা।

(চার) খেলাফত কায়েম না হলে মানুষ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সত্যিকারের ইবাদত করতে পারবে না।

(পাঁচ) আর গায়ের ইসলামী সমাজে মানুষ বাধ্য হবে শিরক করতে। তাই এ সবের হাত থেকে বাঁচার বা রেহাই পাওয়ার জন্যেই দরকার খেলাফত কায়েম করা।

প্রশ্ন ঃ ইসলামের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি?

উত্তর ঃ এর উত্তর বুদ্ধিমানদের জন্যে বুঝা মোটেই কষ্টকর নয়। দেখুন, যখন আমরা বলি মানুষ তখন মনের মধ্যে একটা আকার ভেসে ওঠে, যে এমন একটা জীব যার ঃ

(এক) মাথা আছে এবং সে মাথাটা গরু-ঘোড়া-গাধা ইত্যাদি কোনো জীবের মাথা নয় সেটা মানুষের মাথা।

(দুই) তার নাক আছে, কান আছে, যে কান দিয়ে সে শোনে এবং বোঝে।

(তিন) তার চোখ আছে যে চোখ দিয়েও সে দেখে এবং বোঝে।

(চার) যার দু'খানা হাত আছে যা দিয়ে সে সব ধরনের কাজ যা মানুষের হাতের দ্বারা সম্ভব তা করতে পারে।

(পাঁচ) তার দুটো পা আছে, যে পা দিয়ে ছুটতে পারে এবং জীব জানোয়ারের মত নয় বরং দুই পা দিয়ে খাড়া হয়ে হাঁটতে পারে।

ইত্যাদি দিকগুলো যেমন মানুষ বলার সঙ্গে সঙ্গে একটা লোক বুঝতে পারে কি কি আছে এবং কি কি থাকলে তাকে লোকে মানুষ বলে; ঠিক তদ্রূপই গরু বললেও গরুর চেহারা কেমন তার একটা ছবি তার মানসপটে ভেসে ওঠে। ঠিক তদ্রূপই **'ইসলাম'** শব্দটা উচ্চারণ করলে যারা ইসলাম চেনে তাদের মানসপট ভেসে ওঠে একটা বিশেষ ধরনের জীবন ব্যবস্থার ধারণা। যে জীবন ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে এমন সব বৈশিষ্ট্য যা ছাড়া ইসলাম চলতে পারেনা। যেমন –মাথা, হাত-পা ছাড়া একটা মানুষকে কল্পনা করা যায়ন। ঠিক তেমনই কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছাড়া ইসলামকেও কল্পনা করা যায় না। সেগুলো হচ্ছে ঃ

(এক) ইসলাম হচ্ছে দ্বীনের ইবাদত অর্থাৎ এবাদতের ধর্ম।

(দুই) দ্বীনে তাবলীগ বা প্রচারের ধর্ম।

(তিন) দ্বীনে খিলাফত – অর্থাৎ খিলাফতের ধর্ম।

(চার) দ্বীনে জিহাদ বা জিহাদের ধর্ম।

(পাঁচ) দ্বীনে তাহরীক বা আন্দোলনের ধর্ম।

(ছয়) দ্বীনে ইনকিলাব বা বিপ্লবের ধর্ম।

(সাত) দ্বীনে হক্ব বা সঠিক জীবন ব্যবস্থার ধর্ম।

(আট) দ্বীনে নসিহত বা নসিহতের ধর্ম বা কল্যাণের ধর্ম। উপরে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যগুলোর কোনো একটিকে বাদ দিয়ে ইসলামকে কল্পনা করা যায় না। বৈশিষ্ট্যগুলোর ব্যাখ্যা ঃ

(এক) ইসলামের প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা ইবাদতের ধর্ম। অর্থাৎ মুসলমান যে কাজই করবে তা মহান আল্লাহ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা–এর নির্দেশ ও অনুমতিক্রমেই করবে। আর মহান আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা–এর নির্দেশ ও অনুমতিক্রমে যে কাজই করা হবে তাতেই ইবাদত হবে। ইবাদত অর্থ শুধু নামায-রোজা আদায় করা নয়। এবাদত অর্থ মানুষের জীবনের প্রতিটি কাজই তা ক্ষেত খামারের কাজে হোক বা কলকারখানার কাজ হোক বা চাকুরী-বাকুরী হোক কিংবা রাজকর্ম পরিচালনার কাজ হোক বা যুদ্ধ, সন্ধি, বিজ্ঞানচর্চা, অংক চর্চা, শিক্ষার যাবতীয় বিষয়ের চর্চা, রেডিও টেলিভিশনের ব্যবহার, যানবাহনের ব্যবহার, সাংবাদিকতার কাজ, সাহিত্য ও কাব্য রচনার কাজ, খেলাধুলা ইত্যাদি যত প্রকার কাজের সঙ্গে মানব জীবনের সম্পর্ক রয়েছে তার প্রত্যেকটি কাজ হতে হবে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা–এর নির্দেশে ও অনুমতি মুতাবিকই তাহলে জীবনে প্রত্যেকটি কাজই ইবাদতে পরিণত হবে। এমনকি বিবাহ–শাদী, স্বামী-স্ত্রী মিলে একটা পরিবার গঠন সন্তান উৎপাদন ও তার লালন-পালন করাও ইবাদতের মধ্যে শামিল হবে, যদি তা মহান আল্লাহ ও তার রাসূলের বিধান মুতাবিক হয়। আর মহান আল্লাহর বিধানের খেলাফ হলে নামাজও ইবাদাত হবেনা। এবং রোজাও ইবাদাত হবে না। যেমন মাগরিবে ৩ রাকাত ফরজের স্থলে যদি ইমাম সাহেব ১ রাকাত বেশি করে ৪ রাকাত পড়েন তাবে সেটাও ইবাদাত হবেনা। এবং ঈদের দিনে রোজা থাকলে সে রোজাও ইবাদাত হবেনা। কারণ তাতে মহান আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-এর কোন অনুমতি নেই।

মোট কথা, মহান আল্লাহর হুকুমও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-এর দেখান পন্থায় যে কাজই করা হবে তা ইবাদাতের

মধ্যে শামিল হবে। আর যে কাজই মহান আল্লাহর হুকুম মুতাবিক ও রাসূলের দেখানো পন্থায় হবে না সেটাই ইবাদতের মধ্যে গণ্য হবে না। এই জন্যেই বলা হয়, ইসলাম ইবাদতের ধর্ম। অর্থাৎ মহান আল্লাহর হুকুম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-এর দেখানো পন্থায় মেনে চলার ধর্ম।

(দুই) এর পরবর্তী বৈশিষ্ট্য হলো এটা তাবলীগ বা প্রচারের ধর্ম। যে ব্যক্তি পথ চেনেনা তাকে পথ দেখানোর দায়িত্ব যেমন পথ চেনা লোকের, তেমনি যে বেহেস্ত যাওয়ার পথ চেনে না তাকে বেহেস্তে যাওয়ার পথ দেখানোর কাজ সর্বদা করে যাওয়ার নামই হচ্ছে প্রচার করা যে, এটা ঠিক পথ, আর ঐটা বেঠিক পথ। আর যারা মহান আল্লাহর একত্ববাদের পথ বা আল্লাহ ভীতির পথকে বাদ দিয়ে মহান আল্লাহর বিধানকে অমান্য করার পথে চলছে তাদেরকে সর্বদা বুঝাতে থাকা যে, তোমাদের ভুল পথ ছাড় এবং ঠিক পথ ধর। এ কাজ সর্বদা চালু রাখাও ইসলামের একটি বৈশিষ্ট্য।

(তিন) এর পরবর্তী বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা দ্বীনে খেলাফত। অর্থাৎ ইসলামী আইনের দেশে চলার মত ধর্ম। ট্রেন যেমন তার নিজস্ব রাস্তা ছাড়া চলতে পারে না, ঠিক তদ্রূপ ইসলামও তার নিজস্ব আইনের দেশ ছাড়া চলতে পারে না। ট্রেনের চাকা যেমন লোহার তৈরি তেমনি তার রাস্তাটাও লোহার তৈরি। কাজেই শক্ত মজবুত লোহার উপর দিয়েই শক্ত লোহার চাকা ঘুরতে পারে। ঠিক তেমনই ইসলাম যেমন কঠোরভাবে মহান আল্লাহর আইন মেনে চলার মত মহান আল্লাহর আইনের দেশেই ইসলাম চলতে পারে। মাসজিদে যেমন নামাজের স্থান, সেখানে পূজা মানায় না, মন্দির যেমন পূজার স্থান সেখানে নামাজ মানায় না, গীর্জা যেমন খ্রিস্টানদের প্রার্থনার জায়গা সেখানে যেমন নামাজ মানায় না। অর্থাৎ

(এক) প্রার্থনার জন্যে (খ্রিস্টানদের) গীর্জা।

(দুই) পূজার জন্যে মন্দির।

(তিন) তেমনি নামাজের জন্যে মাসজিদ। এই সহজ বুঝটুকু যেমন আমরা সবাই বুঝি তখন এটা কেন বুঝব না যে, যেখানে আইন রয়েছে মহান আল্লাহর আইনকে অমান্য করে চলার। যেমন-যেখানে মহান আল্লাহর আইন রয়েছে চোরের হাত কাটা, ডাকাতের এক পাশের হাত ও বিপরীত পাশের পা কাটা। জেনার শাস্তি ১০০ দোর্রা মারা, জেনার অপবাদ দিলে তাকে ৮০ দোর্রা মারা, মদ খেলেও তাকে দোর্রা মারা বা জুতা পেটা করা, হত্যাকারীকে কতল

করা, সেখানে রাজ আইন যদি তার উল্টা হয় তাহলে মহান আল্লাহর কুরআনের ঐ সব আইন সেখানে কি মেনে চলা যায়? তা কিছুতেই যায়না। তাই বলছি মহান আল্লাহর কুরআনের আইনে দেশ বা খেলাফত কায়েম না হলে সেখানে মহান আল্লাহর আইন মেনে চলতে পারে না পীর বুযুর্গ হলেও। এমনকি মহান আল্লাহর নবী রাসূল হলেও। তাই আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা যখন দেখলেন যেখানে রাষ্ট্রীয় আইন ইসলামী নয়, সেখানে ইসলামের আইন মেনে চলা যাবেনা। তাই একটানা ২৩ বছর বিরামহীন সংগ্রাম করে খেলাফত কায়েম করেই সেখানে পূর্ণভাবে ইসলাম মেনে চলার পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি ভালোই বুঝতেন যে, নদীতে যেমন সাইকেল চালানো যায় না এবং পাকা-রাস্তায় যেমন স্টীমার চলতে পারেনা। ঠিক তেমনই মানব রচিত আইনের দেশেও ইসলাম চলতে পারে না। তাই তিনি ইসলামী আইনের দেশ গড়ার জন্যে একটানা ২৩ বছর সংগ্রাম করেছেন, যুদ্ধ করেছেন, শান্তি প্রয়োগ করেছেন। এরপর ইসলাম বিরোধী শক্তিকে খতম করেই আরব দেশে খেলাফত বা মহান আল্লাহর আইনের দেশ গড়েছেন। তারপরই তিনি ক্ষ্যান্ত হয়েছেন। এ দ্বারা বুঝা গেল খেলাফত ছাড়া ইসলাম চলতে পারেনা। আমি আরও কিছু উদাহরণ দিচ্ছি।

(এক) আপনারা অবশ্যই জানেন বিশেষ এক আবহাওয়ায় খেজুর ফলে, বিশেষ এক আবহাওয়ায় ধান-পাট জন্মে, বিশেষ এক পরিবেশে এক এক প্রকার প্রাণী বাস করতে পারে। ঠিক তেমনই বিশেষ এক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ইসলাম চলতে পারে। প্রতিকূল পরিবেশে ইসলাম চলতে পারে না, যেমন প্রতিকূল আবহাওয়ায় কোনো ফসল ফলতে পারে না।

(দুই) কোনো লেজওয়ালা প্রাণীকে যেমন মানুষ বলা যায়না এবং লেজওয়ালা প্রাণীর দ্বারা যেমন মানুষের কাজ হয় না, ঠিক তেমনই গায়ের ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার দেশকে ইসলামী রাষ্ট্র বলা যায় না। এবং সেই রাষ্ট্রে বাস করে ইসলামের যাবতীয় হুকুমও মেনে চলা যায় না।

(তিন) এ কারণেই বলা হয় ইসলামের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা দ্বীনে খেলাফত।

(চার) এর অপর এক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা দ্বীনে জিহাদ বা সংগ্রামের ধর্ম। জিহাদকে বুঝানোর জন্যে কিছু উদাহরণ দিচ্ছি।

মনে করুন, আপনার একটা আঙ্গুলে এমন ঘা হলো যে, ডাক্তার বললেন, আঙ্গুলের কিছু অংশ কেটে ফেলে দিতে হবে। আপনি ডাক্তারের পরামর্শে আঙ্গুলের কিছু অংশ কেটে ফেলে দিলেন। এখন বলুন, আঙ্গুলের যে অংশটা কেটে ফেললেন সে অংশটা একদিন পরে পচে দারুন দুর্গন্ধ হয়ে গেল। এবার বলুন, যে আঙ্গুল আপনার দেহে আপনার পুরা বয়স কাল পর্যন্ত পচেনি! আর দেহ বিছিন্ন হওয়ার পর ২৪ ঘন্টার মধ্যে এত দুর্গন্ধ হলো যে, সেখানে মানুষ টিকাই অসম্ভব হয়ে পড়ে। এর কারণ কি? আঙ্গুলের ঐ অংশটা যতক্ষণ আপনার দেহের সঙ্গে ছিল ততক্ষণ তো পচেনি। এখন কেন পচল? এর কারণ হচ্ছে এ যে এই প্রকৃতির মধ্যে এমন এক শক্তি রয়েছে যার কাজ হলো প্রতিনিয়ত জীবন্ত যে কোনো জন্তুকে পচিয়ে ফেলা। আর দেহের মধ্যে এমন জীবনী শক্তি রয়েছে যে, প্রতিনিয়ত ঐ পচিয়ে ফেলা শক্তির সঙ্গে জিহাদ করে দেহটাকে পচার হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখা। এই যে পচনশীল প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে জীবনী শক্তির একটি বিপরীতমুখী টানা হেঁচড়া এটার নামই জিহাদ। এই জিহাদ প্রতিটি প্রাণীর মধ্যেই চালু আছে। সবই এই জিহাদে শরীক রয়েছে।

(এক) মানব দেহের হার্ট বা হৃৎপিণ্ড যার কাজ হচ্ছে প্রতি মিনিটে ৭০ থেকে ৮০ বার পাম্প করে দূষিত রক্তকে হার্টের মধ্যে এনে সেখান থেকে ছাঁকাই করে দূষিত অংশ ফেলে রেখে ফুসফুসের মধ্যে প্রবেশ করায় সেখান থেকে ঐ রক্তকে পরিশোধিত করছে। যার বয়স হয়েছে ৫০ বছর তার হার্টের পাম্প হয়েছে ২শ কোটি বার, এর মধ্যে যদি হার্ট মনে করে যে আমার একটানা ২শ কোটি বার রক্ত পরিশোধিত করে খুব মেহনত হয়ে গেছে। এখন ২ মিনিট একটু বিশ্রাম করি। তাহলে ঐ দুই মিনিটের মধ্যে খবর হয়ে যাবে যে অমুক হার্ট ফেল করে মারা গেছে। দেহের মধ্যকার হার্ট যেমন তার পাম্প দেওয়া কাজ থেকে বিরত থাকতে পারে না এবং বিরত হলেই সে যে মানুষটার দেহের মধ্যে জিহাদে লিপ্ত ছিল ঐ লোকটা আর বাঁচে না ঠিক তদ্রূপই ইসলামকে খতম করার জন্য যে জাহেল শক্তি ঐ প্রাকৃতিক পচনশীলতার ন্যায় ইসলামকে পচিয়ে ফেলার জন্যে সর্বদা জাহেলী শক্তির পিছনে লেগে রয়েছে আর তার হাত থেকে ইসলামকে টিকিয়ে রাখার জন্যে (যেহেতু ইসলাম একটা জীবন্ত মতবাদ) ইসলামের জিহাদকে প্রতিনিয়ত কাজে লাগিয়ে রাখতে হবে। নইলে হার্ট বিশ্রাম নিলে ঐ হার্ট ওয়ালা মানুষটা যেমন আর বাঁচতে পারে না ঠিক তদ্রূপ ইসলাম গ্রহণকারী মুসলমানরা যখনই ইসলামী জিহাদ থেকে বিশ্রাম নিবে ঠিক তখনই ইসলামকে হার্টফেল করতে হবে। সদ্য মরা মানুষ যেমন একটা জীবন ছাড়া মানুষ, ঠিক তদ্রূপই জিহাদ ছাড়া ইসলামও সদ্যমৃত একটা

মানুষের ন্যায় যার দেহের অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ সবই রয়েছে কিন্তু সে আর কোনো কিছুই করার মত ক্ষমতা রাখেনা। ঠিক তেমনই জিহাদ ছাড়া মোর্দা ইসলাম সমাজে শান্তি এনে দেওয়ার মত কোনই ক্ষমতা রাখেনা। আর এই ধরনের ইসলাম যে সব দেশে আছে সে সব দেশের ইসলাম সেই দেশের লোকদেরকে ইসলামী সমাজের শান্তি কিছুতেই দিতে পারে না। এই কারণেই বলা হয় ইসলাম একটা জিহাদের ধর্ম। মানব দেহের ভিতরকার জিহাদ বন্ধ হলে সে যেমন বাঁচতে পারেনা, ঠিক তেমনই ইসলাম নামক দেহের জিহাদ ইসলামপন্থীরা বা ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা চালু না রাখলে ইসলামও আর টিকতে পারে না। আর নামে টিকলে তার নাম টিকা নয়। যেমন জীবন ছাড়া দেহ একটা মানব দেহ হলেও সে জিন্দা মানুষ নয়। এ উদাহরণ থেকে আশা করি জ্ঞানী ব্যক্তিগণ প্রত্যেকেই বুঝতে পারবেন যে, ইসলামে জিহাদ কেন এবং কেনই বা বলা হয় ইসলামের একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এটা জিহাদের ধর্ম। এই জিহাদের উপর ১৮৬টি আয়াত নাযিল হয়েছে।

(পাঁচ) এর পরবর্তী বৈশিষ্ট্য হলো এটা দ্বীনে তাহরীক বা আন্দোলনের ধর্ম। এটাকে আমি দেয়াল ঘড়ি-যার রয়েছে একটা দোলন যন্ত্র বা প্রতিনিয়ত একই নিয়মে দুলছে। ঐ ঘড়ির দোল যতক্ষণ চালু থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ঘড়ি সময় দিতে থাকে, আর যখনই দোলন বন্ধ হয়ে যায় তখনই ঘড়ির টাইম বা সময় দেওয়াও বন্ধ হয়ে যাবে। ঠিক তদ্রূপ ইসলাম একটা আন্দোলনের ধর্ম। এর আন্দোলন বন্ধ করে দিলে আর তার মূল কাজ করতে পারেনা। অর্থাৎ সমাজকে শান্তি দিতে পারে না। এই জন্যেই বলা হয় ইসলাম একটা আন্দোলনের ধর্ম। যারা ইসলামী আন্দোলনে শরীক না তারা ইসলাম নামক ঘড়িটার কোনো পার্টস পত্রও নয়। আশা করি চিন্তাশীল মুসলমান এ উদাহরণ থেকে ইসলামী আন্দোলনের গুরুত্ব সম্পর্কে অবশ্যই কিছু জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।

(ছয়) এটার আর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে – এক বিপ্লবী ধর্ম যাকে বলে দ্বীনে ইনকিলাব। এ ধর্ম চায় বিপ্লব। বিপ্লব ছাড়া এ ধর্ম কায়েম হতে পারে না। বিপ্লব অর্থ আমূল পরিবর্তন। অর্থাৎ সমাজের যাবতীয় মানব রচিত আইন কানুনের মধ্যে আমূল পরিবর্তন এনে একে সম্পূর্ণরূপে মহান আল্লাহর আইনের দেশে পরিবর্তন করতে হবে।

যেমন একখানা গোল পাতার ঘরকে যদি বিল্ডিং করতে হয় তবে গোল পাতার ঘরের কিছুই যেমন বিল্ডিং এ ফিট করা যায় না, ঠিক তেমনই মানব

রচিত আইনের কিছুই ইসলামী আইনের দেশে রাখা যায় না। ইসলামী আইনের দেশ করতে হলে মানব রচিত সমস্ত আইনই পুরাপুরিভাবে পরিবর্তন করতে হয়। পূর্বের আইনের কিছুই কুরআনী আইনের সঙ্গে ফিট রাখা যায় না। এ কারণেই ধর্মকে বলা হয় ইনকিলাবের ধর্ম। আর ইসলামের **১ম** কালেমাকে বলা হয় ইনকিলাবের কালেমা। ইনকিলাব অর্থই বিপ্লব বা আমূল পরিবর্তন।

(সাত) এর অপর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা দ্বীনে হক্ব বা সঠিক জীবন ব্যবস্থা। অর্থাৎ ইসলাম এমন এক জীবন ব্যবস্থা যা সভ্য মানব জীবনের সঙ্গে খাপ খায়। এ জীবন ব্যবস্থা যদি সমাজে কায়েম হয়ে যায় তাহলে বাতিল জীবন ব্যবস্থা আর টিকতে পারে না। আল কুরআনে আছে সূরাহ বনি ইসরাইলের **৮১** নং আয়াতে-

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا -

হে নবী! তুমি বলে দাও সত্য এসে গেছে, (ফলে) বাতিল নির্মূল হয়ে গেছে। আর বাতিল তো হক্বের আগমনে নির্মূল হবেই।

এর থেকে বুঝা গেল হক্ব এসে গেলে বাতিল টিকতে পারে না। যেমন সূর্য উঠলে আঁধার আর এক মুহূর্তও টিকতে পারে না। সূরাহ ইবরাহিমের **১ম** আয়াতে আছে ঃ

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ -

"হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা এটা একখানা কিতাব যা আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি এই জন্যে যে, তুমি লোকদেরকে জমাট বাঁধা অন্ধকার থেকে আলোর মধ্যে নিয়ে আস"।

মহান আল্লাহর এ দুটো কথা থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝা গেল যে, আলো এবং অন্ধকার যেমন এক সঙ্গে বাস করতে পারে না তেমনি ইসলাম ও গায়ের ইসলাম এক সঙ্গে বাস করতে পারে না। অর্থাৎ ইসলাম সহঅবস্থানের মত কোনো জীবন ব্যবস্থা নয়। যেমন গোল পাতা আর ইটকে এক সঙ্গে মিশিয়ে কোন দালান তৈরি করা যায়না ঠিক তেমনি হক্ব ও বাতিলকে একত্রিত করে কোনো সমাজ ব্যবস্থা তৈরি করা যায় না। আরও পরিষ্কার করে বললে বলতে হয় আগুন এবং খড়কুটো যেমন একই স্থানে সহ অবস্থান করতে পারে না, আগুন খড়কুটোকে পুড়িয়ে ছাই করে দেবেই, ঠিক তেমনই হক্ব বা ইসলামী জীবন ব্যবস্থা আর বাতিল জীবন ব্যবস্থা এক সঙ্গে বাস করতে পারে না। হক্ব

বাতিলকে পুড়িয়ে ছাই করে দেবেই। আর যদি দেখা যায় যে, আগুনে খড়ের গাদা, অথচ ধোয়া উঠতে দেখা যাচ্ছে, তা হলে বুঝতে হবে যে, আগুন আর আগুন নেই। তা নিভে গেছে।

ঠিক তদ্রূপ যদি দেখা যায় যে, ইসলামী সমাজে বাতিল রয়েছে তাহলে বুঝতে হবে যে, ইসলামের আগুন মুসলমানরা জ্বেলে রাখতে পারেনি। বাতিলের চাপে আগুন নিভে গেছে আর সেই নিভে যাওয়া আগুনকেই মুসলমানরা বলছে জ্বলন্ত আগুন। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান জামানার মুসলমানরা যাকে আগুন বলে দাবী করছে তা বাতিলের চাপে নিভে গেছে, যা পুনরায় জ্বলানোর দায়িত্ব মুসলমানদের তা মুসলমানরা যেন টেরই পাচ্ছে না। যে বাতি ১৪শো বছর পূর্বে জ্বলেছিল সেই বাতির শুধু লাইট পোস্টটা দেখেই ভাবছি যে, জ্বলন্ত বাতির আলোতেই মনে হয় বাস করছি। কিন্তু আগুনকে বাতিল নিভিয়ে দিয়েছে; তাকে পুনরায় জ্বালানোর দায়িত্ব মুসলমানদের, তা যেন মুসলমানরা ভুলেই গিয়েছে। আফ্সোস এই মুসলমানদেরই পূর্বপুরুষেরা ছিল কি, আর তাদেরই উত্তরসূরী আমরা আজ হলাম কী; তা একবার ভেবে দেখার মত মন মানসিকতার যেন মৃত্যু হয়ে গেছে। হে মেহেরবান আল্লাহ! তুমি আমাদের মধ্যে সেই চেতনাকে পুনরায় জিন্দা করে দাও, যে চেতনা ছিল আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা–এর মধ্যে এবং তাঁর সাহাবীদের মধ্যে।

(আট) এর অপর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা নসিহতের দ্বীন অর্থাৎ এটাকে জাগ্রত ও জ্বলন্ত অবস্থায় রাখার জন্যে প্রয়োজন সমাজে নসিহত চালু রাখা কিন্তু আফসোস যে আজ চিন্তাশীল জ্ঞানীগুণী লোক মাত্রই দেখতে পাচ্ছেন। হক্কের নসিহতের নামে বাতিলের নসিহত সমাজে চালু হয়ে গেছে। মুসলমানদের বিভ্রান্ত করা হচ্ছে, মুসলমানদের গরম রক্তকে নসিহতের মাধ্যমে বরফের মত ঠাণ্ডা করে দেওয়া হচ্ছে। অথচ সেদিকে চিন্তাশীল জ্ঞানীগুণী মুসলমানদের কোনো সচেতন ভূমিকা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

যাদেরকেই মহান আল্লাহ নসিহত করার যোগ্যতা দিয়েছেন তা যদি তারা যথাযথভাবে চালু রাখতেন খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলের সমাজ ব্যবস্থাকে আজও আমরা দেখতে পেতাম।

চিন্তাশীল শিক্ষিত ঈমানদার মুসলমানগণ ইসলামের বৈশিষ্ট্যগুলোকে যেন ইসলামের মধ্যে দেখতে পাই সেজন্যে আমরা সকলে সচেতনতার সঙ্গে

চরম চেষ্টা চালিয়ে যাব। আল্লাহ! আমাদের মধ্যে ইসলামী চেতনাকে পুনরায় আরেকবার জাগ্রত করে দাও। আমীন।

প্রশ্ন ঃ মহান আল্লাহ যে একক সত্তা ও তা কুরআনের কোথায় কোথায় আছে?

উত্তর ঃ প্রথমে সূরাহ বাকারার ১৬৩ নং আয়াতে আছে وَإِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ - وَاحِدٌ "আর তোমাদের ইলাহ তো এক ও একক সত্তা।" সূরাহ নিসার ১৭১ নং আয়াতে রয়েছে - إِنَّمَا اللَّهُ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ তিনি মহান আল্লাহ তো মাত্র এক জনই। সূরাহ ইউসুফের ৩৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে "সেই এক মহান আল্লাহ যিনি সব কিছুর উপর বিজয়ী"। সূরাহ ইব্রাহিমের ৪৮ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলছেন ঃ - قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ "এবং সব কিছুই সেই এক মাত্র মহা পরাক্রমশালী মহান আল্লাহর সামনে স্পষ্ট হয়ে উপস্থিত হবে।" সূরাহ ইখলাসের ১ম আয়াত ঃ "বল সেই আল্লাহ একক সত্তা"।

এছাড়াও সূরাহ মায়েদার ৭৩ নং আয়াত, সূরাহ ইবরাহিমের ৫২ নং আয়াত, সূরাহ আন-নাহলের ৫৪ নং আয়াত, সূরাহ কাহাফের ১১০ নং আয়াত, সূরাহ আম্বিয়ার ১০৮ নং আয়াত, সূরাহ হজ্বের ৩৪ নং আয়াত, সূরাহ আনকাবুতের ৪৬ নং আয়াত, সূরাহ আস্ সফ্ফাতের ৪ নং আয়াত, সূরাহ ছয়াদের ৬৫ নং আয়াত, সূরাহ যুমারের ৬ নং আয়াত, সূরাহ বাকারার ১৩৩ নং আয়াত এবং সূরাহ তওবার ৩১ নং আয়াত, "তোমাদের ইলাহ মাত্র একই সত্তা, যিনি একই আল্লাহ।"

এছাড়া পরোক্ষভাবে আরও বহু আয়াতে মহান আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে বহু যুক্তি আনা হয়েছে। **(সওয়াল জওয়াব ৭, ৮ ও ৯ কিতাবের ৫০-৬৩ পৃঃ)**

তাওহীদের মৌলিক উপাদান বা রুকন দুইটি

তাওহীদের প্রথম রুকন বা মৌলিক বিষয় হচ্ছে, **"তাগুতকে অস্বীকার করা"** আর দ্বিতীয় রুকন বা মৌলিক বিষয় হচ্ছে, **"অদ্বিতীয় মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা"**। তার প্রমাণ হচ্ছে সূরাহ বাক্বারার ২৫৬ নং আয়াত।

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا - وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ "ফামাই ইয়াকফুর বিত্ তাগুত ওয়া ইউমিম্‌বিল্লাহি ফাক্বদিস তামসাকা বিল উরওয়াতিল উসক্ব লান ফিছামা লাহা ওয়াল্লাহু ছামিউন আলিম

অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করবে ও মহান আল্লাহর উপর ঈমান আনবে সে এমন এক মজবুত হাতল ধরবে যা কখনো ছিঁড়ে যাবার নয়। আর মহান আল্লাহ্ হলেন সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাময়।"

উপরে উল্লেখিত আয়াতে কালিমায় **'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহুকে'** বুঝানো হয়েছে। এটাই মূলতঃ তাওহীদের কালিমা। যেমন এ বিষয়ে প্রিয় নবীজী বলেছেন, "যে ব্যক্তি লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ বললো আর মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য সকল উপাস্যকে অস্বীকার করলো তার জান ও মাল পবিত্র (অর্থাৎ কাফিরদের জান ও মালের মত গণীমতের মাল নয়) এবং তার হিসাবের ভার মহান আল্লাহর উপরই ন্যস্ত (অর্থাৎ মনের কুফরী বিচার মহান আল্লাহই করবেন"। (মুসলিম)

আমরা অত্র অধ্যায়ে শুধুমাত্র তাওহীদের প্রথম রুকন নিয়ে সংক্ষেপে আলোচন করব। আর তাওহীদের দ্বিতীয় রুকন সম্পর্কে জানতে হলে মৎ প্রণীত **"সত্যিকারের মুমিন-মুসলিমের পরিচয়"** নামক আলোড়ন সৃষ্টিকারী পুস্তকটি দয়া করে পাঠ করুন।

প্রথম রুকন ঃ তাগুতকে অস্বীকার করা

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা (মহান আল্লাহ আপনাদেরকে সরল ও সঠিক পথের দিশা দান করুন) আপনাদেরকে জেনে রাখতে হবে যে, তাগুতের কুফরী ব্যতীত একজন বান্দা কখনো **"মুওয়াহ্যিদ"** (তথা মহান আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী) হতে পারে না। আর তাগুত কি জিনিস তা জানা ব্যতীত তাগুতকে অস্বীকার করা কখনো সম্ভব নয়।

আভিধানিকভাবে তাগুতের সংজ্ঞা ঃ

তাগুত আরবী তুগইয়ান শব্দ থেকে উৎসারিত। যার অর্থ সীমা লংঘন করা, অবাধ্যতা, জুলুম বা অন্যায়ের ক্ষেত্রে সীমালংঘন কারীকে **'তাগী'** বা সীমালংঘন কারী বলা হয়। অত্যধিক সীমালংঘন কারীকে **'তাগীয়াহ'** বলা হয়। কঠিনতম সীমালংঘন কারী বা মহা অবাধ্যকে **'তাগুত'** বলা হয়। এভাবে আমরা দেখছি যে, আভিধানিকভাবে **'তাগুত'** অর্থ মহা সীমালংঘন কারী। (জাইনুদ্দীন রাজী, মুখতারুস সিহাহ পৃষ্ঠাঃ ১৬৫)।

আভিধানিকভাবে সকল সীমালংঘন কারীকে তাগুত বলা হয়। তবে পবিত্র কুরআনের পরিভাষায় 'তাগুত' অর্থ শাইত্বন। এছাড়া মহান আল্লাহকে

ছাড়া যা কিছুর ইবাদাত, পূজা বা উপাসনা করা হয় তাকে 'তাগুত' বলা হয়। (বাকারা-২৫৭, নিসা-৭৬, বুখারী ৪/১৬৭৩, তাবারী, তাফসীর- ৩/১৮-১৯)। যেমন মহান আল্লাহ্ সুবহানা ওয়া তা'আলা সূরাহ হাক্কার ১১ নং আয়াতে বলেনঃ

إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاء حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ - অর্থাৎ যখন জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল তখন আমি তোমাদেরকে চলন্ত নৌযানে আরোহণ করিয়াছিলাম।" এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, যখন পানি বৃদ্ধি পেয়ে তার সীমা অতিক্রম করেছিল।

শরীয়াতের পরিভাষায় তাগুতের সংজ্ঞা ঃ

এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই **'তাগুত'** যে মহান আল্লাহদ্রোহী হয়েছে এবং সীমা লংঘন করেছে আর মহান আল্লাহর কোন হক্বকে নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করেছে এবং এমন বিষয়ে নিজেকে মহান আল্লাহর সাথে সমকক্ষ বানিয়েছে, যা একমাত্র মহান আল্লাহর জনা খাস।

কোন মাখলুক (সৃষ্টি) কর্তৃক মহান আল্লাহ্ তা'আলার কার্যাবলীর যে কোন কার্য সম্পাদনের বিষয়টি নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করা যেমন সৃষ্টি করা, রিজিক দান অথবা শরীআত (তথা বিধান) রচনা। এসব বিষয়গুলো সম্পাদনের ব্যাপারকে যে ব্যক্তি নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করবে অর্থাৎ কেউ যদি বলে, আমি সৃষ্টি করি, আমি রিজিক দান করি, আমি বিধান (তথা আইন- কানুন) রচনা করি, সেই তাগুত।

এ সংজ্ঞাটি উত্তম এবং ব্যাপক অর্থজ্ঞাপক মহান আল্লাহ্ ব্যতীত যারই ইবাদাত করা হয়, এমন সব কিছুই এ সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। যে সব মাবুদ (উপাস্য) কে তাগুত হিসাবে গণ্য করা হয় সে গুলোর মধ্যে মূর্তি, এমন সব কবর, গাছ, পাথর ও অচেতন পদার্থ যেগুলোর উপাসনা করা হয়। মহান আল্লাহর আইন ব্যতীত এমন সব আইন যার মাধ্যমে বিচার ফায়সালা চাওয়া হয়। এমন সব বিচারক তাগুতের অন্তর্ভুক্ত যারা মহান আল্লাহর আইনের বিরোধি আইন দ্বারা মানুষের মধ্যে বিচার ফায়সালা করে। শাইত্বন, যাদুকর, গণক (যারা ইলমে গায়েবের বিষয়ে কথা বলে), উপাস্য হতে যারা রাজী, যারা নিজেদেরকে কোন কিছু হালাল, হারাম করা ও আইন রচনা করার অধিকার রাখে বলে মনে করে, তারা সবাই তাগুত। তাদেরকে অস্বীকার করা ওয়াজিব। তাদের কাছ থেকে এবং তাদেরকে যারা উপাসনা করে উভয়ের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান অতি আবশ্যক।

প্রধান প্রধান তাগুত ঃ

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ, ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব রহিমাহুল্লাহ এবং মাওলানা সৈয়দ আবুল আলা মওদুদী রহিমাহুল্লাহ বলেন ঃ তাগুতের সংখ্যা অনেক। তবে পাঁচ ধরনের তাগুত নেতৃত্বের আসনে রয়েছে।

(এক) গাইরুল্লাহুর (মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু) ইবাদাতের দিকে আহবানকারী শাইত্বন। যেমন এ বিষয়ে মহান আল্লাহ সূরাহ ইয়াসীনের ৬০-৬১ নং আয়াতদ্বয়ে বলেন ঃ

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ - وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ -

"আলাম আহ্হাদ ইলাইকুম ইয়া বানী আদামা আল্লা তা'আবুদুশ শাইত্বনা ইন্নাহু লাকুম আদুউ উম মুবীন, ওয়া আনিবুদুনি হাজা সিরাতুম মুস্তাক্বীম" অর্থাৎ হে বানী আদম ! আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দেইনি যে, তোমরা শাইত্বনের ইবাদাত করো না। কেননা, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। আর (কেবলমাত্র খালিছভাবে একনিষ্ঠ হয়ে) আমারই ইবাদাত কর, এটাই হল সরল পথ।"

(দুই) মহান আল্লাহর আইন পরিবর্তনকারী জালিম শাসক এবং মানুষের তৈরী শাসনতন্ত্র যে শাসক রাষ্ট্রে কায়িম করে। যেমন এ বিষয়ে মহান আল্লাহ সূরাহ নিসার ৬০ নং আয়াতে বলেন ঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ -

অর্থাৎ আপনি কি তাদেরকে দেখেন নি, যারা দাবী করে যে, আপনার প্রতি যা নাজিল করা হয়েছে এবং আপনর পূর্বে যা নাজিল করা হয়েছে তার প্রতি ঈমান আনয়ন করেছে। তারা বিরোধপূর্ণ বিষয়কে ফায়সালার জন্য তাগুতের দিকে নিয়ে যেতে চায় অথচ তাদের প্রতি তাকে (তথা তাগুতকে) অমান্য করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।"

যেমন মহান আল্লাহর আইন পুরুষ ও মহিলা চোরের হাত কাটা। কিন্তু এই আইন পরিবর্তন করে অন্য যে কোন আইন প্রয়োগ করাই হচ্ছে তাগুতের কাজ। এছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর আইনের বাইরে যে কোন

আইন প্রয়োগ করাই তাগুতের কাজ। পৃথিবীর যে ব্যক্তি বা দল এ কাজ করবে সেই তাগুত হবে। যেমন মহান আল্লাহ এ বিষয়ে বলেন ঃ

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ - "ওয়াস সারিক্বু ওয়াস সারিক্বতু'উ ফাক্বতাউ আইদিয়াহুমা জাযাআম বিমা কাসাবা নাকালাম মিনাল্লাহি ওয়াল্লাহু আঝিঝুন হাকিম অর্থাৎ যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে তাদের হাত কেটে দাও তাদের কৃত কর্মের সাজা হিসেবে। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে হুশিয়ারী মহান আল্লাহ্ পরাক্রান্ত জ্ঞানময়।" (মায়িদা-৩৮)

যেমন কেউ যদি বলে, 'কোন ব্যক্তি যদি কোন শিশুকে অথবা কোন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিকে সাগরে ডুবিয়ে মেরে ফেলে তাহলে তার কিসাস নেই। (হিদায়া- ৪/৫৬৬) অথচ মহান রব্বুল আ'লামীন সূরাহ বাক্বারার ১৭৮ নং আয়াতে বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى - "ইয়া আইউহাল্লাজীনা আমানু কুতিবা আলাই কুমুল কিসাসু ফিল ক্বতলা অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের প্রতি হত্যার (বা নিহতদের) ব্যাপারে কিসাস গ্রহণ ফরজ করা হয়েছে।" মহান আল্লাহ সূরাহ বাক্বারার ১৭৯ নং আয়াতে আরো বলেন ঃ

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ - "ওয়ালাকুম ফিল কিসাসি হাইয়্যাতুই ইয়া উলিল আলবাবী লাআল্লাকুম তাত্তাক্বুন অর্থাৎ হে বুদ্ধিমানগণ ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্যে জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার।"

উল্লেখিত সূরাহ বাক্বারার ১৭৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনু কাসীর তার প্রণীত জগৎবিখ্যাত তাফসীর ইবনু কাসীরে বলেন ঃ "আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ হচ্ছে,দ হে জ্ঞানীরা ! তোমরা জেনে রেখো যে, কিসাসের মধ্যে মানবগোষ্ঠির অমরত্ব রয়েছে। এর মধ্যে বড় দূরদর্শিতা রয়েছে। যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে যে, একজনের পরিবর্তে অপরজন নিহত হচ্ছে, সুতরাং দু'জন মারা যাচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যদি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখা যায় তবে জানা যাবে যে, এটা জীবনেরই কারণ। হত্যা করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির স্বয়ং এই ধারণা হবে যে, সে যাকে হত্যা করতে যাচ্ছে তাকে হত্যা করা তার আদৌ উচিত হবে না। নতুবা তাকেও নিহত হতে হবে। এই ভেবে সে হত্যার কাজ হতে বিরত থাকবে। তাহলে দু'ব্যক্তি মৃত্যু হতে বেঁচে যাচ্ছে। (ইবনু কাসীর)

তিনি আরো বলেন, পূর্বের কিতাবসমূহের মধ্যেও তো মহান আল্লাহ তা'আলা এই কথাটি বর্ণনা করেছিলেন যে, **আলক্বত্‌লু আনফাল ক্বত্‌লি** অর্থাৎ হত্যা হত্যাকে বাঁধা দেয়, কিন্তু পবিত্র কুরআনুল কারীমের মধ্যে অত্যন্ত বাকপটুতা ও ভাষালংকারের সাথে এই বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর বলা হচ্ছে, 'এটা তোমাদের বেঁচে থাকার কারণ। **প্রথমত ঃ** তোমরা মহান আল্লাহপাকের অবাধ্যতা থেকে রক্ষা পাবে। **দ্বিতীয়ত ঃ** না কেউ কাউকে হত্যা করবে, না সে নিহত হবে। সুতরাং পৃথিবীতে সর্বত্র নিরাপত্তা ও শান্তিবিরাজ করবে। (ঐ)

(তিন) মহান আল্লাহ্ সুবহানা ওয়া তা'আলার নাজিলকৃত বিধি-বিধান, আইন-কানুন, হুকুম-আহকাম, রুলস-রেগুলেশান্‌স ছাড়া অন্য বিধানে দেশে ফায়সালা করে। যেমন ঃ এ বিষয়ে সূরাহ মায়িদায় মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

- وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ "ওয়া মাললাম ইয়াহকুম বিমা আনজালাল্লাহু ফাউলায়িকা হুমুল কাফিরুন অর্থাৎ যে সব লোক মহান আল্লাহ্ যা (তথা যে বিধি-বিধান, আইন-কানুন, হুকুম-আহকাম ইত্যাদি) অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী ফায়সালা করে না তারাই কাফির।" ঐ একই সূরাহতে রব্বুল আ'লামীন আরো বলেন ঃ

- وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ "ওয়া মাললাম ইয়াহকুম বিমা আনজালাল্লাহু ফাউলায়িকা হুমুজ জ্বলিমুন অর্থাৎ যেসব লোক মহান আল্লাহ্ যা (তথা আইন-কানুন) অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী ফায়সালা করে না তারাই জালিম।" ঐ একই সূরাহতে মহান আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা আরো বলেন,

- وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ "ওয়া মাললাম ইয়াহকুম বিমা আনজালাল্লাহু ফাউলায়িকা হুমুল ফাসিক্বুন অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ যা নাজিল করেছেন তদনুসারে যারা ফায়সালা করে না, তারাই পাপাচারী বা ফাসিক।" (মায়িদা– ৪৪,৪৫,৪৭)

এর দ্বারা এমন বিচারক বুঝান হয়েছে, যে মহান আল্লাহর শরীআতকে পরিবর্তনকারী কোন বিধান বা আইনের সাহায্যে বিচার ফায়সালা করে। যেমন ঃ সারা বিশ্বে গণতান্ত্রিক বা যে কোন প্রক্রিয়ায় যে বিচার ব্যবস্থা মানুষ প্রবর্তন করে তা হচ্ছে তাগুতি ব্যবস্থা।

(চার) মহান আল্লাহ্ ব্যতীত যে ব্যক্তি ইলমে গায়েব জানে বলে দাবী করে। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا - অর্থাৎ তিনি আলিমুল গায়িব (অদৃশ্যের জ্ঞানী) বস্তুত তিনি স্বীয় গায়েবের (অদৃশ্য) বিষয় কারো কাছে প্রকাশ করেন না।" (জ্বিন-২৬) সূরাহ আনআমের ৫৯ নং আয়াতে এ বিষয়ে মহান আল্লাহ্ আরো বলেনঃ

وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ -

অর্থাৎ আর অদৃশ্যের চাবী তারই নিকটে রয়েছে তিনি ব্যতীত অন্য কেহ তা জানে না। স্থল ও সমুদ্রভাগে যা কিছু আছে তা তিনিই জানেন তাঁর অজানাতে একটি পাতাও ঝরে পড়ে না। মাটির অন্ধকারে এমন কোন শষ্য কণাও অংকুরিত হয় না অথবা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কোন বস্তুই নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।"

(পাঁচ) মহান আল্লাহ্ ছাড়া যার ইবাদত করা হয় এবং এ ইবাদাত গ্রহণে যে রাজী বা সন্তুষ্ট থাকে। যেমন এ বিষয়ে মহান আল্লাহ্ সূরাহ আম্বিয়ার ২৯ নং আয়াতে বলেন,

وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ- অর্থাৎ তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বলবে যে, তিনি (মহান আল্লাহ্) ব্যতীত আমিই উপাস্য। এ কারনেই তাকে আমি জাহান্নামের শাস্তি দিব। আর এভাবেই আমি জালিমদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।

যেমন ঃ বাংলাদেশ ও উপমহাদেশের যে সমস্ত জীবিত বা মৃত পীরকে পূজা করা হয়। পীরের কাছে কোন কিছু চাওয়া, সন্তান চাওয়া, পীরকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা, পীরকে সিজদা দেওয়া, পীরের কবরের আশে-পাশে ঘোরা-ফেরা করা ও সলাত আদায় করা সমস্ত কাজগুলি মারাত্মক শিরক। মহান আল্লাহর কাছে যার কোন ক্ষমা নেই। এই কাজগুলি যারাই করবে তারা তাগুতকে অনুসরণকারী হিসেবে মুশরিক্ব ও কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

তাগুতকে কিভাবে অস্বীকার করতে হবে ?

পাঁচভাবে তাগুতকে অস্বীকার করা অপরিহার্য ঃ

(এক) তাগুতের ইবাদাত বাতিল ও আক্বীদা পোষণের মাধ্যমে

মহান আল্লাহ্ সুবহানা তা'আলা ইরশাদ করেণ ঃ

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ- "জালিকা বিআন্নাল্লাহা হুওয়াল হাক্কু ওয়া আন্না মা-ইয়াদউনা মিন দুনিহী হুওয়াল বাতিলূ ওয়া আন্নাল্লাহা হুওয়াল আলিইউল কাবীর অর্থাৎ এটা এজন্য যে, মহান আল্লাহই প্রকৃত সত্য আর মহান আল্লাহ ছাড়া তারা যাকে ডাকে তা বাতিল ও অসত্য। মহান আল্লাহই সবার উচ্চে এবং মহান আল্লাহই মহান।" (হাজ্ব-৬২)

(দুই) তাগুতকে পরিত্যাগ ও তাগুত থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে ঃ

এর অর্থ হচ্ছে তাগুতের ইবাদাত পরিত্যাগ করা, পরিহার করা। যেমন এ বিষয়ে মহান আল্লাহ্ সূরাহ নাহলের ৩৬ নং আয়াতে বলেন ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ - "ওয়ালাক্বদ বাআছনা- ফীকুল্লি উম্মাতির রাসূলান আনি বুদুল্লাহা অজতানিবুদ তাগুত অর্থাৎ আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি এই মর্মে যে, তোমরা মহান আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তাগুতদেরকে বর্জন কর।"

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মহান আল্লাহর আইন হল কোন নর বা নারী চুরি করলে হাত কাটতে হবে, কিন্তু বর্তমানে আমাদের প্রচলিত সমাজের বা রাষ্ট্রের আইন হলো জেল বা জরিমানা। সুতরাং এখানে মহান আল্লাহর আইন পরিবর্তিত হচ্ছে। মহান আল্লাহর আইন যেই পরিবর্তন করুক আমরা তার বিরুদ্ধে। এটাই মহান আল্লাহর বিধান। মহান আল্লাহ্ সূরাহ হজ্বের ৩০ নং আয়াতে আরো বলেন ঃ

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ - অর্থাৎ সুতরাং তোমরা মূর্তিদের অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাক।" এটা অবশ্যই জেনে রাখতে হবে যে, তাগুতের কাছে বিচার ফায়সালার জন্য গমন করা, তাদের মাধ্যমে সাহায্য কামনা করা এবং তাদের জন্য নজর মানা, মান্নত করা, তাদের ইবাদাত করার মধ্যেই শামিল। একথা জেনে রাখা প্রয়োজন যে, তাগুত তিনভাবে পরিত্যাগ করা যায়।

প্রথমত ঃ আক্বীদা বা বিশ্বাসগত ভাবে।

দ্বিতীয়ত ঃ কথার মাধ্যমে।

তৃতীয়ত ঃ কাজের মাধ্যমে।

উপরে উল্লেখিত তিনটি ক্ষেত্রে বান্দা তাগুতকে পরিত্যাগ করতে না পারলে সম্পূর্ণরূপে তাগুতকে পরিত্যাগ করা সম্ভব নয়। কেননা, যে ব্যক্তি কথা ও কাজের মাধ্যমে তাগুতকে পরিত্যাগ করে কিন্তু আক্বীদাগতভাবে পরিত্যাগ করে না, তার অবস্থা মুনাফিক্বের মত। যে ব্যক্তি আক্বীদাগতভাবে তাগুতকে পরিত্যাগ করে কিন্তু কাজের মাধ্যমে পরিত্যাগ করে না তার অবস্থা ঐ ব্যক্তির মতো, যে তাগুতকে সিজদা করে অথবা তার উদ্দেশ্যে মান্নত করে অথবা বিচার ফায়সালার জন্য তাগুতের কাছে যায়। আবার এ দাবীও করে যে তার আক্বীদা শুদ্ধ আছে।

শেখ সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ্ রহিমাহুল্লাহ তার তাইসীরুল আজীজির হামীদ নামক গ্রন্থের ৪১৯ নং পৃষ্ঠায় বলেন, যে ব্যক্তি তাগুতের কাছে বিচার ফায়সালা নিয়ে যায়, সে মুমিন ও নয় এমনকি মুসলিম ও নয়। অথচ আমরা আজ যে বিচার ব্যবস্থার অধীনে তা তাগুতি বিচার ব্যবস্থা। সুতরাং আমাদেরকে সাবধান হতে হবে। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন ঃ এই জন্যই যে ব্যক্তির কাছে মহান আল্লাহর কিতাব ছাড়া বিচার ফায়সালা চাওয়া হয়, তাকেই তাগুত নামে আখ্যায়িত করা হয় অর্থাৎ মহান আল্লাহর কিতাব ছাড়া বিচার ফায়সালা তাগুত। (মাজমুউল ফতোয়া) হাফেজ ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেন ঃ প্রত্যেক কওমের ঐ ব্যক্তিই হচ্ছে তাগুত, কওমের লোকেরা মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে বাদ দিয়ে যার কাছে বিচার ফয়সালা চায়। (এলামু মুকিঈন)

(তিন) দুশমনি বা শত্রুতার মাধ্যমে ঃ

মহান আল্লাহ্ সুবহানা ওয়া তা'আলা সূরাহ শুআরার ৭৫-৭৭ আয়াতে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এর ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ - أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ - فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ - অর্থাৎ তোমরা এবং তোমাদের বাপদাদারা যে সব জিনিসের ইবাদাত করে আসতেছো সেগুলি কি কখনো তোমরা চোখ মেলে দেখেছ ? এরা সবাইতো আমার দুশমন একমাত্র রব্বুল আলামীন ছাড়া।"

(চার) ক্রোধ ও ঘৃণার মাধ্যমে ঃ

মহান আল্লাহ্ এ বিষয়ে সূরাহ মুমতাহিনার ৪নং আয়াতে বলেন ঃ

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ -

অর্থাৎ তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাঁর সংগী গণের মধ্যে সুন্দর আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল ঃ তোমাদের সাথে এবং তোমরা মহান আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদাত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমরা যতক্ষণ না একক মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, ততক্ষণ তোমাদের ও আমাদের মধ্যে থাকবে চির শত্রুতা, ক্রোধ ও ঘৃণা।

(পাঁচ) অস্বীকার বা কুফরী করার মাধ্যমে ঃ

অর্থাৎ তাগুতকে অস্বীকার করা। তাগুতের যারা উপাসনা করে এবং নেতৃত্বের আসনে বসায় তাদেরকে অস্বীকার করা এবং যে ব্যক্তি কুফরী মতবাদের (গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র ইত্যাদি) প্রবর্তন করে অথবা কুফরীর দিকে আহবান জানায় তাকে অস্বীকার করা।

ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব রহিমাহুল্লাহ বলেন ঃ আদম সন্তানের উপর মহান আল্লাহ তা'আলা সর্ব প্রথম যে ফারজটি চাপিয়ে দিয়েছেন তা হচ্ছে তাগুতকে অস্বীকার করা এবং মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা। এর প্রমাণ হচ্ছে মহান আল্লাহর বাণী–

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ - অর্থাৎ আমি প্রত্যেক উম্মাতের কাছে এ মর্মে রাসূল পাঠিয়েছি যে, তোমরা মহান আল্লাহর ইবাদাত কর আর তাগুত থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকো।" (নাহল-৩৬)

তিনি আরো বলেন ঃ তাগুতের সাথে কুফরী করা অর্থাৎ তাগুতকে অস্বীকার করা ব্যতীত কেউ মুমিন হতে পারবে না। এর প্রমাণ হচ্ছে মহান আল্লাহর বাণী–

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا- অর্থাৎ যে তাগুতকে অস্বীকার করে এবং মহান আল্লাহর উপর ঈমান আনে সে যেন এমন এক শক্তিশালী রশী ধরলো যা কোনদিন-ই ছিঁড়ে যাবার নয়। (বাক্বারাহ-২৫৬)

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা ! আপনাদেরকে মহান আল্লাহর ওয়াস্তে বলছি, আপনারা আপনাদের দ্বীনের মূলকে আঁকড়ে ধরুণ। আঁকড়ে ধরুন আদ্যোপান্ত এবং আপাদমস্তক তথা এ-টু-জেড বা টপ টু বটম, 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহর' সাক্ষ্য প্রদান করুণ। এর অর্থ অনুধাবন করুন। এ কালিমাকে ভালবাসুন। ভালবাসুন তাওহীদের ধারক ও বাহকদেরকে। তাদেরকে আপনারা আপনাদের ভাই হিসেবে গ্রহণ করে নিন যদিও তারা আপনাদের কাছ থেকে দুরে অবস্থান করছে। আসুন আমরা আপোষে দলাদলি ত্যাগ করে সবাই এক সাথে মহান আল্লাহর রুজ্জু (তথা তাওহীদ) কে ধারণ করি। তাগুতগুলোকে অস্বীকার করি। তাদের বিরুদ্ধাচরণ করি। তাদেরকে মনে প্রাণে ঘৃণা করি। আমীন। সুম্মা আমীন।।

কালেমা শাহাদাত

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ -

আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ হক্ব মাবুদ বা সার্বভৌমত্বের মালিক নেই, তিনি একক সত্ত্বা, তার কোনো শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা তার বান্দা ও রাসূল।

কালেমা শাহাদাতের বিপ্লবী ঘোষণা

ইসলামের দ্বিতীয় কালেমাই হচ্ছে কালেমা শাহাদাত বা সাক্ষ্যবাণী। এ কালেমাকে আমরা সাধারণত তিন জায়গায় পড়ে থাকি – (এক) শুধু কালেমা পড়ার ক্ষেত্রে, (দুই) আজানের মধ্যে, (তিন) আত্তাহিয়াতুর মধ্যে। এ কালেমাকে অবলম্বন করে কয়েকটি প্রশ্ন করা যায়। সেই প্রশ্নগুলির জবাবই দেবো ইনশাআল্লাহ। প্রশ্নগুলি নিম্নরূপ। যথা ঃ

(এক) এর নাম কালেমা শাহাদাত হলো কেন?

(দুই) এটা দ্বিতীয় কালেমা হলো কেন?

(তিন) আজান ইকামতে কেন তা পড়া হয়?

(চার) শাহাদাত বা সাক্ষ্য মানল কে?

(পাঁচ) কার নিকট সাক্ষ্য দেব?

(ছয়) কেন সাক্ষ্য দেব?

(সাত) কি সাক্ষ্য দেব?

(আট) কিসের মাধ্যমে সে সাক্ষ্য দেব? শুধু কি কথার মাধ্যমে?

(নয়) ইসলামী জীবন-জিন্দিগীতে এ কালেমার গুরুত্ব কতটুকু?

এর নাম সাক্ষ্যবাণী হলো কেন এবং এটা দ্বিতীয় কালেমা হলো কেন?

আমরা প্রথম কালেমা পড়ে মহান আল্লাহর নিকট শপথ গ্রহণ করেছিলাম এই মর্মে যে আমরা মহান আল্লাহ ছাড়া আর কারও হুকুম মানব না। আর মহান আল্লাহর হুকুম গ্রহণ করব তার রাসূলের নিকট থেকে। তাহলে আইনত এর পরবর্তী কাজটা হতে হবে এমন যেন আমাদের যে কোনো কাজ বা যে কোন আচরণই হোক না কেন তা দেখে যখন কেউ জিজ্ঞাসা করবে যে, তুমি এ কাজ কেন করলে, তা হলে তার জবাবে যেন বলতে পারি যে, মহান আল্লাহর হুকুম অথবা নবীর নির্দেশ, তাই করেছি। যেমন কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে যে তুমি কেন নামায পড়? কেন রোজা রাখ? কেন হজ্ব কর? যাকাত দাও? তাহলে এর প্রত্যেকটির জবাবে বলি **"আল্লাহর হুকুম তাই করি"**, ঠিক এইভাবে জবাব দিবে হবে কালেমা তাইয়েবা পড়া মুসলমানদেরকে তাদের প্রত্যেকটি কাজের বেলায়। অর্থাৎ আমাদের কথা-বার্তা, চাল-চলন, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরী-বাকুরী, চাষাবাদ, লেনদেন, যুদ্ধ, সন্ধি–চুক্তি আন্তর্জাতিক নীতি-নির্ধারণ এর প্রত্যেকটির ব্যাপারে কালেমা পড়া মুসলমানদের কাজ হবে মহান আল্লাহকে ইলাহ্ বা একমাত্র হুকুমদাতা হিসাবে মানার ভিত্তিতে।

তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা যখন থেকে প্রথম কালেমা পড়েছেন ও তার প্রচার শুরু করেছেন তখন থেকেই তিনি চেষ্টা শুরু করেছেন, কালেমা ভিত্তিক সমাজ গড়তে। এভাবে চেষ্টা করে যখনই তিনি বুঝেছেন যে, তিনি তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে মহান আল্লাহর দ্বীনের পথে চালাতে পারছেন তখন তিনি কালেমা শাহাদাত নিজে পড়লেন ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে পড়তে বললেন। এর দ্বারা ঘোষণা করা হলো যে, আমি কালেমা তাইয়েবায় যা পড়েছি বা যা অঙ্গীকার করেছি তা সত্যই আমার বাস্তব জীবনে মেনে চলি। এই দেখ আমার বাস্তব জীবনই তার সাক্ষি। কালেমা তাইয়েবা পড়া ব্যক্তিদের সামনে একটা প্রশ্ন সর্বদাই এবং প্রতিনিয়তই ভাসমান অবস্থায় উপস্থিত রয়েছে, তা হলো এই যে, তুমি কালেমা তাইয়েবা পড়ে যা স্বীকার করে নিয়েছ, তোমার সামগ্রিক জীবনযাপন কি সেই মুতাবিক করছ? তার জবাবই হচ্ছে কালেমা

শাহাদাত। অর্থাৎ কালেমা তাইয়েবায় বলেছিলাম লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু এর পরে আমাকে প্রশ্ন করা হলো যে, তা কি তুমি তোমার বাস্তব জীবনে মেনে চল? যদি তা মেনে চলি, তা হলে আমি বলব - আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অআশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি অর্থাৎ আমার নিজেকে তার প্রমাণ হিসাবে হাজির করছি যে, আমি সত্যই মহান আল্লাহকে একমাত্র হুকুমদাতা হিসাবে মেনে চলি। তাই অন্য কারও হুকুম মানিনা এবং মহান আল্লাহর নিরঙ্কুশ প্রভুত্বের মধ্যে আমরা আর কাউকে শরীক বা অংশীদার করিনা অর্থাৎ মহান আল্লাহ ছাড়া আর কারও তৈরি আইন-কানুন মেনে চলিনা। আমরা যাকে মহান আল্লাহর রাসূল হিসাবে মেনে নিয়েছি তারই দেওয়া ব্যবস্থা অনুযায়ী জীবন-যাবন করি। আমরা যে তা করি এই দেখ আমাদের বাস্তব জীবনই তার প্রমাণ। এই হলো প্রকৃতপক্ষে এ কালেমার আসল মর্মকথা – এই জন্য এটা মুসলমানদের জন্য হলো দ্বিতীয় কালেমা।

আজান ইক্বামতে কেন কালেমা শাহাদাত

আজান শব্দের বাংলা অনুবাদ ঃ দূর থেকে লোকদেরকে আহ্বান করা। আহ্বান শুরু করা হয় **"আল্লাহু আকবার"** বলে। আল্লাহ আকবার অর্থ **"মহান আল্লাহ সব চাইতে বড়"**; একথাটা প্রত্যহ আজান ইকামাত ও ফরজ ওয়াজিব এবং সুন্নাত নামায মিলিয়ে মোট ২৩৮ বার বলতে হয়। এ কথা কেন বলতে হয় তা বুঝার পরই আজানে কেন কালেমা শাহাদাত তা বুঝা যাবে।

আজানের উদ্দেশ্য ২টি **(এক)** মুসল্লীদের নামাজের জন্য ডাকা **(দুই)** ইসলামের দিকে সাধারণভাবে সবাইকে আহ্বান জানান। এই আহ্বানের প্রথম কথাটাই হচ্ছে **"মহান আল্লাহ সব চাইতে বড়"** একথা বলার অর্থ হলো শয়তান মানুষকে ধোকা দেয়, সে মানুষের মাথায় তাদের জ্ঞানের অগোচরে এমন একটা ধারণা ঢুকায় যে, মহান আল্লাহ ছাড়া আরও এমন অনেক শক্তি রয়েছে যারা কোনো কোনো ব্যাপারে মহান আল্লাহর চাইতে বড় (নাউযুবিল্লাহ)। যেমন ঃ কোনো ব্যাপারে ফেরাউন বড়, কোনো ব্যাপারে আবু জেহেল বড়, কোনো ব্যাপারে আব্রাহাম লিংকন বড়, কোনো ব্যাপারে লেনিন বড়, কোনো ব্যাপারে কার্ল মার্কস বড়, কোনো ব্যাপারে মাও সেতুং বড় – এইভাবে বিভিন্ন ব্যাপারে মানুষ বিভিন্ন ব্যক্তিকে, কোথাও শক্তিকে, কোথাও বস্তুকে বড় মনে করে। তাই, যে মুসলমান জাতি মহান আল্লাহকেই সব চাইতে বড় বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে এবং যে মহাসত্য, তা প্রতিদিন কমপক্ষে ৫ বার ঘোষণা দেয় সারা দুনিয়ার মানুষের সামনে। কারণ যা মহাসত্য তা যদি আমি ঘোষণা করার মত

মনোবল না রাখি তবে আমি যে মহান আল্লাহকে সর্বশক্তিমান বলে মেনে নিয়েছি এবং এটাই যে মহাসত্য প্রমাণ কোথায়? তাই আজানের প্রথম কথায়ই ঘোষণা করা হয় যে, **"আমার আল্লাহই সব চাইতে বড়"**। হে দুনিয়ার মানুষ তোমরা শোন এবং মানো। অতঃপর আমি যখন ঘোষণা করব যে, মহান আল্লাহই সব চাইতে বড়, তখন আমার সম্মুখে প্রশ্ন এসে হাজির হয় যে, তুমি যা বলছ তা কি তুমি মান? তারই জবাবে বলতে হয় কালেমা শাহাদাত – এর কথাগুলি অর্থাৎ আমি আল্লাহু আকবার বলে যা ঘোষণা করছি আমি তা বাস্তব জীবনে আমি। আমি যে তা মানি তার সাক্ষ্য আমার বাস্তব জীবনের যাবতীয় কার্যকলাপ। মুয়াজ্জিন যখন এসব কথা বলে আজান দেন তখন অন্যান্যদেরকেও সে কথাগুলি উচ্চারণ করতে হয় এই জন্যে যে, শুধু মুয়াজ্জিনেই নয়, বরং আমরাও তার সাক্ষ্য দিচ্ছি।

তাহলে বলুন, এভাবে আজান দেওয়ার ও এভাবে কালেমা শাহাদাত পড়ার অধিকার কখন আমাদের থাকতে পারে। যখন সত্যই আমরা জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশভাবে মহান আল্লাহর প্রভুত্বকে মেনে নিয়ে সেই মুতাবিক চলা শুরু করি তখন এভাবে কালেমা শাহাদাত পড়ার অধিকার আমরা পাই। নইলে কালেমা শাহাদাত পড়লে কালেমা পড়া হয় ঠিকই কিন্তু কালেমার মধ্যে যা বলি, আর বাস্তবে যা করি, তার মধ্যে মিল থাকেনা মোটেই। ফলে কথা ও কাজে মিল না হলে তার নাম হয় মুনাফিক্বী–অর্থাৎ বাস্তব জীবনে কালেমার উপর না চলে কালেমা পড়লে মুসলমানিত্ব নষ্ট হবে, তা আমি বলছি না, তবে তাতে কমপক্ষে মুনাফিক্বের খাতায় অবশ্যই নাম উঠবে।

তাহলে আজানে ইকামতে কেন কালেমা শাহাদাত পড়ি তা এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে অবশ্যই বুঝা গেল। আর বুঝা গেল কেনইবা আজানের জবাব দিতে হয়। জবাব দিতে হয় এ জন্য যে, মুয়াজ্জিন যা ঘোষণা করেছেন তা শুধু মুয়াজ্জিনেরই ঘোষণা নয়, তা আমাদেরও ঘোষণা।

সাক্ষ্য মানল কে?

সাক্ষ্য মেনেছে খোদ আল্লাহ। মহান আল্লাহর ভাষায় আল্লাহ বলেছেন – ইন্নাদ দ্বীনা ইন্দাল্লাহিল ইসলাম অর্থাৎ আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবন ব্যবস্থাই হচ্ছে ইসলাম। তাই আমাদের দাবী যে, ইসলামই একমাত্র খাঁটি দ্বীন – যা মেনে চললে হইকালের ও পরকালের জীবনে শান্তি পাওয়া যাবে। আর কুফরী মতবাদগুলি সবই বাতিল – যা মেনে চললে ইহকালেও অশান্তি,

পরকালেও অশান্তি। আমাদের এ দাবী ইথারের মাধ্যমে আমরা পেশ করি দুনিয়ার তামাম মানুষের সম্মুখে।

কার নিকট সাক্ষ্য দিব?

মহান আল্লাহর কথা এবং আমাদের দাবী যে ঠিক তার প্রমাণ চায় বিশ্ববাসী যারা ইসলাম মানে না তারা সবাই। তাই মহান আল্লাহ আমাদেরকে সাক্ষী মানলেন যে, হে মুসলিম জাতি যারা আশহাদু আল্লা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহ্‌দাহু লা-শরীকালাহু অআশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অরাসূলুহু কথাকে মেনে নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছ তারা ইসলামের পথে চলে সারা দুনিয়ার মানুষকে দেখাও যে মহান আল্লাহ সত্য সত্যই বলেছেন ইসলামই মহান আল্লাহর মনোনীত দ্বীন যা মেনে চললে দুনিয়ার জীবনেও পরম শান্তি পাওয়া যায় এবং পরকালেও পরম শান্তি পাওয়া যাবে। মহান আল্লাহ যে সাক্ষ্য দিতে বলেছেন –এটা আমার কল্পনা নয় –এটা বাস্তব। এটা আল কুরআনের হুকুম। এ সাক্ষ্যর অর্থ নিজেকে বিশ্বের দরবারে প্রমাণ হিসাবে হাজির করা। মহান আল্লাহ বললেন,

আমি তোমাদেরকে একটা মধ্যপন্থী জাতি বানিয়েছি যেন তোমরা লোকদের জন্য সাক্ষ্য বা প্রমাণ স্বরূপ হতে পারে এবং রাসূলও যেন তোমাদের জন্য সাক্ষ্য স্বরূপ হতে পারেন। এর অর্থ এই যে, তোমরা হবে সারা দুনিয়ার মানুষের সামনে প্রমাণ স্বরূপ। তোমরা সঠিক পথে জীবন-যাপন করছ তাই তোমাদের চরিত্রে কোন খুঁত নেই তা কেমন ভাবে প্রমাণ করবে? এর জবাবে মহান আল্লাহ বলেছেন, তোমাদের জন্যে রাসূল তার সাক্ষী।

কেন সাক্ষ্য দেব?

সাক্ষ্য এ জন্যে যে, মহান আল্লাহ বলেছেন, রাসূলের নিখুঁত চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে তোমরা যেমন মুসলমান হয়েছ, তেমন যেন সারা দুনিয়ার মানুষ তোমাদের মধ্যে সে নিখুঁত চরিত্র দেখে মুগ্ধ হয়ে যায় এবং তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করে। এই জন্যেই আমাদেরকে সাক্ষ্য দিতে হবে। এবার চিন্তা করুন, অন্য জাতির লোকের মধ্যে যে সব দোষ রয়েছে তা হুবহু যদি আমাদের মধ্যেও থাকে তবে অন্যান্য জাতি কি দেখে একথা মানবে যে, ইসলামই ঠিক আর অন্য ধর্ম বেঠিক। মহান আল্লাহ পাক অন্যত্র আরও স্পষ্ট করে বলেন যে, "হে ঈমানদারগণ, তোমরা মহান আল্লাহর কথা যে সত্য তার সাক্ষ্য স্বরূপ দাণ্ডায়মান হও।" মহান আল্লাহর এ কথাগুলি নিছক কোনো নীতিকথা নয়; এ

হচ্ছে মহান আল্লাহর কড়া হুকুম। এ নির্দেশের মূল তাৎপর্য এই যে, মুসলমানরা যা মুখে প্রচার করবে তা নিছক তাদের মুখের প্রচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবে না, তার প্রতিফলন ঘটবে বাস্তব জীবনে। মুসলমানদের বাস্তব জীবনের কার্যকলাপ, যথা তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, ব্যবসায়-বাণিজ্য, চাকুরি-বাকরী, লেন-দেন, আয়-ব্যয়-সঞ্চয়, জ্ঞান-চর্চা, শিক্ষা-দীক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, বিচার-ফয়সালা, জাতীয় সম্পদ বণ্টন, আন্তর্জাতিক নীতিনির্ধারণ, যুদ্ধ, সন্ধি-চুক্তি এ সবগুলিই হতে হবে আদর্শ স্থানীয় যা নির্ণীত হবে আল্লাহর বিধান মুতাবিক আর এ সবের মাধ্যমে সারা দুনিয়াকে দেখাতে হবে যে দেখ আমাদের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, বৈষয়িক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক ইত্যাদি জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগের প্রত্যেকটিই আদর্শ স্থানীয়। আরও সহজ ভাষায় ব্যাপারটাকে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। অর্থাৎ আমাদেরকে দেখাতে হবে যে দেখ আমাদের মধ্যে জোর জুলুম নেই, অন্যায় অবিচার নেই, চুরি ডাকাতি, ফাঁকিবাজি, ফেরেব বাজি, ধোকাবাজি এসব নেই। চোরা কারবার, লোক ঠকানো, সুদী কারবার, মুনাফাখুরি কারবার এ সব আমাদের মধ্যে নেই। মিথ্যা আমরা বুঝিনা। নির্যাতন উৎপীড়ন এসবও আমাদের মধ্যে নেই। বেহায়াপনা ও অশ্লীল কোন কার্যকলাপ আমরা জানিনা। নারী নির্যাতন বা মাতৃজাতির প্রতি কোন প্রকার অন্যায় আচরণ আমাদের মধ্যে নেই। আমাদের মধ্যে শিরকের কোন গন্ধ বাতাস নেই। আমরা অতর্কিতে আক্রমণ, গুপ্তহত্যা, স্মাগলিং ইত্যাদি কাজ অত্যন্ত ঘৃণা করি। আমাদের কথা ও কাজে কোন গরমিল নেই। তাই আমাদের সমাজে কোন অশান্তিও নেই। উপরোক্ত আয়াত শরীফে মহান আল্লাহ পাকের এই নির্দেশটাই অত্যন্ত কড়াভাবে দান করা হয়েছে গোটা মুসলিম সমাজের উপর।

অতঃপর মহান আল্লাহর দেওয়া এ দায়িত্ব যদি মুসলমান আদায় না করে তবে তার অবস্থা কেমন হবে তা মহান আল্লাহ বলেছেন নিম্নোক্ত ভাষায় তার চাইতে বড় জালেম আর কে হতে পারে যার নিকট মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে অথচ সে তা গোপন করে। অর্থাৎ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মুসলমানদের নিকট এমন নির্ভুল জীবনব্যবস্থা রয়েছে যা পালন করলে আমরা দুনিয়ার সামনে মহান আল্লাহর কথার সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ দণ্ডায়মান হতে পারি। কিন্তু তা যদি না করি অর্থাৎ মহান আল্লাহর তরফ থেকে আমাদের নিকট আল কুরআনের মাধ্যমে সর্বাধিক সুন্দর জীবন ব্যবস্থা যা রয়েছে তা যদি জীবনের বাস্তব কার্যকলাপ দ্বারা প্রকাশ না করে গোপন করি,

তবে আমাদের চাইতে বড় জালেম আর কেউ হবে না। অতঃপর যদি তা গোপন করেই চলি অর্থাৎ মহান আল্লাহ আমাদেরকে কিভাবে জীবন যাপন করতে বলেছেন তা যদি আমাদের বাস্তব কার্যকলাপ দ্বারা দুনিয়ার সামনে তুলে ধরতে না পারি তাহলে প্রকারান্তরে কুরআনী ব্যবস্থাপনা যা মহান আল্লাহ আমাদের নিকট গচ্ছিত রেখেছেন-এজন্যে যে আমরা তা দুনিয়ার সামনে তুলে ধরব – তা গোপন করা হয়। অমুসলমানরা তা জানতেই পারে না যে, মুসলমানদের নিকট কি সুন্দর জীবনব্যবস্থা রয়েছে। কারণ তারা আল-কুরআন পড়ে দেখে না, দেখে মুসলমানদের চরিত্র। পূর্ব যামানায় এ সাক্ষ্য দানের দায়িত্ব যাদের উপর ছিল তাদের মধ্যে যারা যে দায়িত্ব ঠিক মত পালন করেনি তাদের যে অবস্থায় পতিত হতে হয়েছিল তা মহান আল্লাহ পাক নিম্নরূপ ভাষায় বলেছেন –

"লাঞ্ছনা গঞ্জনা অধঃপতন দূরবস্থা তাদের উপর চেপে বসল। আর তারা মহান আল্লাহর গজবের মধ্যে পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ল।" এর থেকে বুঝা যায় আজও যদি আমরা এই সাক্ষ্যদানে ব্যর্থ হই অর্থাৎ যে অবস্থায় কালেমা শাহাদাত পড়তে হবে সে অবস্থা সৃষ্টি করতে না পারি তবে আমাদের উপরও তদ্রূপ গজব আসার কথা যা ইয়াহুদদের উপর এসেছিল। হিসাব করলে মনে হয় যেন সে ধরণের দূরবস্থা আমাদের উপরও মাঝে মাঝে আসে। আবার মহান আল্লাহ আমাদের সুযোগ দেন এজন্যে যেন আমরা কালেমা শাহাদাত পাঠের উপযোগী হই।

'উপযোগী হই' কথাটার ব্যাখ্যা পুনরায়ও কিছু বলছি। যদি কোন ব্যক্তি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার কারণে ভালো স্বাস্থ্যবান হয়, অর্থাৎ সে যদি মুহাম্মদ আলী ক্লের ন্যায় শক্তিশালী হয় তবে তখনই সে এ কথা বলায় উপযোগী হয় যে, **"স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে সে যে সত্যই স্বাস্থ্যবান হয়, দেখ আমি তার সাক্ষী"** –দেখ আমার নিখুঁত স্বাস্থ্য। এবার ধরুন দেশের সরকার সাধারণভাবে স্বাস্থ্য পালন সম্পর্কে সবাইকে উপদেশ দিলেন – আর বললেন আমার উপদেশ মেনে চললে তোমরা প্রত্যেকেই স্বাস্থ্যবান হতে পারবে। গায়ে সিংহের ন্যায় শক্তি হবে – ইত্যাদি। অতঃপর কিছু লোক তা মানতে চাইল আর কিছু লোক তা মানতে চাইল না। এবার যারা তা মানতে চাইল তাদেরকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বললেন আমি সরকারের পক্ষ হতে স্বাস্থ্য পালন সম্পর্কে যে উপদেশ দিয়েছিলাম তাতে আমি বলেছিলাম, সরকারের দেওয়া উপদেশ যে মেনে চলবে তার স্বাস্থ্য ভালো হবে। সরকারের এ কথার সত্যতা প্রমাণ করার জন্যে তোমরা তাদের সাক্ষী হয়ে যাও। অর্থাৎ তোমরা রুগ্নদের সম্মুখে তোমাদের

স্বাস্থ্য নিয়ে দণ্ডায়মান হও এবং তাদেরকে তোমাদের স্বাস্থ্যের দিকে তাকিয়ে দেখতে বল। বল যে, এই দেখ সরকারের কথার সত্যতা আমাদের স্বাস্থ্য দিয়ে প্রমাণ করছি। এই ভাবে যদি ভালো স্বাস্থ্যবানরা তাদের স্বাস্থ্য নিয়ে রুগ্নরা এ কথা বলতে পারে না যে, তোমাদের স্বাস্থ্য পালনবিধি ভালো নয়, বরং তার সরকারের দেওয়া স্বাস্থ্যবিধি পালন না করে যে ভুল করেছে – এটা বুঝতে পারবে এবং স্বাস্থ্য বিধি নিজেরাও পালন করার জন্যে মনে মনে প্রস্তুত হবে। এবার বলুন স্বাস্থ্যবিধি পালন করা যে ভালো তার প্রমাণ বা সাক্ষ্য স্বরূপ সমাজের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার উপযোগী কে? যে স্বাস্থ্যবান সেই? নাকি যে রুগ্ন সে? এবার যদি একদল রুগ্নলোক যাদের গায়ের চামড়া হাড়ের সঙ্গে লেগে গিয়েছে – দাঁড়ানোর মত ক্ষমতাও যাদের নেই – তারা যদি আর একদল রুগ্ন –যাদের স্বাস্থ্য ওদের চাইতে অপেক্ষাকৃত কিছুটা ভালো তাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলে যে, আমরা সরকারের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলি, এর ফলে দেখ আমাদের কেমন উত্তম স্বাস্থ্য। দেখ আমরা নিজেদেরকে তার প্রমাণ স্বরূপ সমাজের সম্মুখে হাজির করছি। সমাজ দেখুক এবং বুঝুক যে, সরকারের উপদেশ মেনে চললে সকলে কেমন স্বাস্থ্যবান হতে পারে। তাহলে সমাজের সাধারণ লোক যারা সরকারের দেওয়া স্বাস্থ্যবিধি পালনে বিশ্বাসী নয়, তারা মনে করবে যে, সরকারী উপদেশ না মেনে তো ভালোই করেছি। যদি মানতাম তাহলে তো ওদের মত চামড়া হাড়ের সঙ্গে লেগে যেত। তখন এরূপ সাক্ষ্যদানের ফল দাঁড়াবে এই যে, **(এক)** স্বাস্থ্যমন্ত্রী, যার মাধ্যমে সরকারী স্বাস্থ্য পালন নীতি পাই তাকে মানুষ ধোকাবাজ ও মিথ্যুক বলে মনে করবে। **(দুই)** তার কথা কেউই মানবেনা। **(তিন)** কেউ যেন তা না মানে সে জন্য অবিশ্বাসীরা চরম চেষ্টা করবে। **(চার)** আর যারা স্বাস্থ্য মন্ত্রীর উপদেশ আদতে মানে না কিন্তু মানার দাবী করে তারা যে সত্যই তা মানে কি না মানে সে খোঁজ অন্যেরা করবে না বরং তারা মনে করবে যে এরা সত্যিই মিথ্যা সরকারের নকল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে এরূপ রুগ্ন হয়ে গেছে এর বুঝ বুঝে এই রুগ্নদের সম্পর্কে তারা ধারণা করবে যে, এদের মত অধম নির্বোধ আর দ্বিতীয়টি কেউ হতে পারেনা কারণ এরা এমন বদ্ধ পাগল যে, ভুয়া স্বাস্থ্যমন্ত্রীর উপদেশ মেনে মেনে এরা একেবারে শুকিয়ে হাড় হয়ে গেছে তবুও তাই মেনে চলবে। এ গোষ্ঠিকে তারা অধম, তালকানা, বদ্ধপাগল, নিরেট মুর্খ ইত্যাদি মনে করবে। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চিন্তা করলে জ্ঞানে এটাই স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়বে যে, ঐ রুগ্ন ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যবানের দাবীদার হওয়াও যেমন, বর্তমান মুসলিম সমাজের কালেমা শাহাদাত পড়াও তেমন।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে বলেছিলেন যে, তোমরা মুসলিম জাতি আমার নির্দেশ মেনে চল। তোমাদের জীবনের প্রতিটি দিকই সুন্দর হয়ে গড়ে উঠুক। চিরশান্তি নেমে আসুক। তোমাদের জীবনে দূর হয়ে যাক তোমাদের সমাজ থেকে যাবতীয় অন্যায় অপকর্ম। দুঃখকষ্ট চিরতরে বিদায় নিক তোমাদের জীবন থেকে। সারা দুনিয়ার মানুষ অবাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখুক তোমাদের দিকে যে, তোমরা প্রতিটি দিক থেকেই পৃথিবীর যে কোনো জাতি অপেক্ষা উত্তম এবং তোমাদের সমাজ একটি নিখুঁত বেহেশতি সমাজ। আর তা দেখানোর জন্যে অন্যদেরকে আহ্বান জানাও এই কথা বলে যে, দুনিয়ার মানুষ দেখুক যে, মুসলমানরা মিথ্যা জানেনা–অন্যায় অপকর্ম বোঝে না। লোকের ক্ষতি করা জানেনা। সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়া, বেপর্দা, বেহায়াপনা বোঝে না। তাদের সমাজে মিথ্যা, ফাঁকিবাজি, ধোকাবাজি, মুনাফাখোরী, মজুতদারী, হাইজ্যাক, গুপ্ত হত্যা ইত্যাদি ধরনের কিছুই নেই। এরই সাক্ষ্য বহন করা উচিত ছিল আমাদের সামগ্রিক সমাজব্যবস্থা দ্বারা। তাহলেই **"ইসলামই যে খাঁটি জীবনব্যবস্থা তোমরা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তার প্রমাণ স্বরূপ দণ্ডায়মান হও"** এর হুকুম মুতাবিক আমাদের কালেমা শাহাতাদের মাধ্যমে সাক্ষ্য দানটা ন্যায়সঙ্গত হতে পারত। কিন্তু আমাদের সাক্ষ্যটা হলো এমন যে, মুখে বলছি দেখ আমি কত সুস্থ ও কত সবল কিন্তু বাস্তবে হাড্ডি কংকালসার। উঠে দাঁড়ানোর মত ক্ষমতাও নেই। অর্থাৎ মুখে বলি – আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আমার জীবন চরিত্র দিয়ে যে, আমি একমাত্র মহান আল্লাহকেই প্রভু জেনে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমাকে তাঁর প্রেরিত রাসূল হিসাবে মেনে নিয়ে সেই মানার ভিত্তিতেই জীবন-যাপন করি। যার কারণে আমাদের মুসলিম সমাজে শুধু শান্তি আর শান্তি। শুধু মঙ্গল আর মঙ্গল। শুধু কল্যাণ আর কল্যাণ। এটা হলো আমাদের মুখের ভাষা ও মুখের দাবী।

কিন্তু বাস্তবে আমাদের সাক্ষ্য হলো এইরূপ যে, হে দুনিয়ার মানুষ তোমরা বাংলার মুসলমানদের দিকে চেয়ে দেখ। আমরা দুনিয়ার যত অপকর্ম আছে তার সবগুলিরই ওস্তাদ। হে দুনিয়ার অন্যান্য জাতি তোমরা যদি চুরি, ডাকাতি, রাহাজানী, মদমাতালি, হাইজ্যাক, গুপ্তহত্যা, স্মাগলিং, মজুতদারী, মুনাফাখোরী, মুনাফেক্বী, জালিয়াতি, ফাঁকিবাজি, ফেরেববাজি, ধোকাবাজি, এমন কি ফাঁকি দিয়ে নকল করে কিভাবে শিক্ষিত হওয়া যায় এসব যদি না জান তবে আস – আমরা বাংলার মুসলমানরা তা শিখিয়ে দেব। ওসব ব্যাপারে আমরা ওস্তাদ। কাজেই আমাদের কার্যকলাপ দেখে দুনিয়ার অন্যান্য জাতি মুসলমান হয়ে যাও। দেখ আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা মেনে আমরা কত

হাজারও বিষয়ের ওস্তাদ বনেছি। হে দুনিয়ার মানুষ – তোমরা দেখ এবং বিচার কর যে, মহান আল্লাহর এ কথাটা অর্থাৎ– আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অআশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু অর্থাৎ এটা কত খাঁটি কথা। এই হলো কালেমা শাহাদাতের মাধ্যমে আমাদের সাক্ষ্য দান। এবার বলুন, আমাদের যা চরিত্র, এই যদি হয় আমাদের সাক্ষ্য দানের বিষয়বস্তু তাহলে কি দুনিয়ার অমুসলিম জাতি যারা আল কুরআন ও আল হাদিসের অনুসারী নয় তারা কি ইসলামকে সঠিক জীবনব্যবস্থা বলে মানে? তারা তো মানবেই না বরং আমাদের সাক্ষ্যদানের ধরণ দেখে তারা **(এক)** মহান আল্লাহকে অস্বীকার করবে **(দুই)** মহান আল্লাহর রাসূলকে ধোকাবাজ মনে করবে **(তিন)** দুনিয়ার কেউ যেন আমাদের কথা না শোনে সে জন্য চেষ্টা করবে। আর **(চার)** আমাদেরকে মনে করবে চরম নির্বোধ, অধম, বোকা, নিরেট মুর্খ ও ধর্মীয় নেশাগ্রস্ত।

বলাবাহুল্য, আমরা কালেমা শাহাদাতের বাস্তব রূপ সমাজ জীবনে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছি, সাধারণ মুসলমান যারা ধর্মীয় ব্যাপারে পরিচালিত হন বাতিল পীর মুর্শিদদের দ্বারা তারা তো সত্যই অজ্ঞ অথচ ঈমান তাদের ঠিকই রয়েছে। কিন্তু ধর্মীয় পরিচালকগণ তাদের বুঝাতে পারছেন না– শুধু বুঝাতে পারছে না তা নয় বরং তারা অনেক ক্ষেত্রে এমন বুঝাচ্ছেন যার ফলে শিক্ষিত মুসলমানরা ধোকায় পড়ে লেনিন, কার্ল মার্কস, মাও সেতুং প্রমুখ নাস্তিকদের অনুগামী হচ্ছে। দোষ তাদের নয় যারা নাস্তিক হচ্ছে; দোষ তাদের যারা মুসলমানদের ধর্মীয় নেতা সেজে মুসলমানদের কমপক্ষে কালেমার ব্যাখ্যাটাও বুঝাতে পারছেন না। বরং তারা ধর্মটাকে করে নিয়েছেন বিনাপুঁজির ব্যবসায়ের একটা মূলধন। আজকার অবস্থা হচ্ছে এই যে, যারাই ধর্মীয় নেতা, যাদের উপর দ্বীনের তাবলীগের দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে তাদের অধিকাংশই তাবলীগ তো করেনই না বরং তাদের দাও শুধু টাকা। তারা পানিতে একটু ফুঁক দিলেই তাদের পাঁচটাকা পাওনা হয়ে যায়। তাঁরা মিলাদ পড়বে, বলবে দাও টাকা। মোরদার জন্য কিছু পড়ে সওয়াব রেসানি করবে বলবে দাও টাকা। এমনকি তারা মরলে তাদের কারও কারও কবরেও বলে দাও টাকা। তাদেরই কথা মহান আল্লাহ বলেছেন "হে ঈমানদার ব্যক্তিগণ ! তোমাদের অধিকাংশ পীর-মুর্শিদ জনগণের অর্থ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে এবং তারা সাধারণ লোকদেরকে দ্বীনের পথে চলতে বাধা প্রদান করে (সূরাহ তওবা)"। এই যদি হয় ধর্ম প্রচারকদের অবস্থা, তাহলে যারা কুরআন হাদিস নিজে পড়েনি কিন্তু বোধ-শক্তি আছে, তারা নাস্তিক ছাড়া আর কি হবে বলে আমরা আশা করতে পারি? হ্যাঁ,

তবে যারা সংসারের কাজকর্ম ছেড়ে শুধু তাবলীগের কাজে নিয়োজিত থাকবেন তাদেরকে টাকা অবশ্যই পেতে হবে। তবে সে পাওয়া পানিতে ফুঁক দিয়ে নয়: তা নিতে হবে ইসলামী সরকারের কাছ থেকে তাবলিগী ভাতা হিসাবে। কেউ যদি বলেন যে সরকার তা নিশ্চয় দেবে তবে তা আদায় করার যোগ্যতা থাকতে হবে। মুসলমানদের টাকায় যেখানে মূর্তি কায়েম হতে পারে সেখানে মুবাল্লিগরা কি তাবলীগী ভাতা পেতে পারেন না? নিশ্চয় পারেন। কিন্ত সে ভাতা যদি আমরা পানিতে ফুঁক দিয়েই আদায় করে নেই তাহলে সরকারের কাছে তা চাইবই বা কোন মুখে আর সরকার তা দেবেইবা কেন? তার তাবলীগী ভাতা পেতে হলে আগে জিহাদ করা লাগবে, ইসলামী হুকুমত কায়েম করা লাগবে। তবেই সেই ইসলামী সরকার তাবলীগী ভাতা দেবে, পরে পূর্বে নয়।

কি সাক্ষ্য দেব এবং কিসের মাধ্যমে সাক্ষ্য দেব

এখানে সাক্ষ্য অর্থ প্রমাণ। আমাদেরকে সমাজের সম্মুখে প্রমাণ করতে হবে যে ইসলামই একমাত্র খাঁটি জীবন-ব্যবস্থা। তা প্রমাণ করতে হবে আমাদেরকে আমাদের বাস্তব জীবনের যাবতীয় কার্যকলাপের মাধ্যমে –যা পূর্বে বলা হয়েছে। যেন অন্যান্য জাতি তা উপলব্ধি করতে পারে"।

ইসলামী জীবন জিন্দিগীতে এ কালেমার গুরুত্ব কতটুকু

এর গুরুত্ব অপরিসীম। এ কালেমা আমাদেরকে সর্বক্ষণই স্মরণ করায় যে, তোমাদের চরিত্রে ও বাস্তব জীবনে একমাত্র ইসলামেরই প্রতিফলন ঘটাতে হবে। এ কথাটা প্রতিনিয়তই যেন আমাদের স্মরণে থাকে এবং কখনও যেন ভুল না হয় সে জন্যে **(এক)** কালেমা শাহাদাত পড়ার বেলায় **(দুই)** আজান ইকামাতে এবং **(তিন)** আত্তাহিয়াতুর মধ্যে পড়তে হয় এ কালেমাকে। এ কালেমা আমাদেরকে সর্বক্ষণই বলতে থাকে যে, তোমাদের চিন্তা-ভাবনা, শিক্ষাদীক্ষা, শিল্পকলা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক কার্যকলাপ, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা, জ্ঞানচর্চা, আমল, আখলাক, আচার-আচরণ, লেন-দেন, পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন, যুদ্ধ, সন্ধি-চুক্তি থেকে শুরু করে জীবনের যাবতীয় ক্ষেত্রে, এমনকি তোমাদের কৃষিক্ষেত্রে, শিল্পকলা, কলকারখানা, রেডিও, টেলিভিশন, যানবাহন ইত্যাদির প্রত্যেকটিতেই যেন ইসলামের সৌন্দর্যের সাক্ষ্য বহন করে। তা যে করে, তারই ঘোষণা দেওয়া হয় কালেমা শাহাদাতের মাধ্যমে। এ আলোচনা থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে এ কালেমার গুরুত্ব আমাদের বাস্তব জীবনে অপরিসীম। এ কালেমাসমূহ আমাদের মনে যে ঈমানের জন্ম

দেয় এখন সে ঈমান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব। **(কালিমার হাকিকত পুস্তকের ৩০-৪২ পৃঃ)**

একটি ধর্ম সম্পর্কে সঠিকভাবে জানার উপায়

ক. একটি ধর্মের অনুসারীদের পর্যবেক্ষণ করো না, বরং ঐ ধর্মের প্রকৃত উৎস সম্পর্কে জানো।

বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্মের অনুসারীরা তাদের নিজেদেরকে এবং নিজেদের বিশ্বাসকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে ফেলেছে। এ কথাটি হিন্দুধর্মের জন্য যেমন প্রযোজ্য তেমনি প্রযোজ্য ইসলাম এবং খ্রিস্টধর্মের বেলায়ও।

একটি ধর্ম সম্পর্কে জানার জন্য ঐ ধর্মের অনুসারীদের পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করা যে কারো জন্য সঠিক পদ্ধতি হতে পারে না। কারণ, অধিকাংশ অনুসারীই তাদের ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে সচেতন নয়। এভাবে কোনো ধর্ম সম্পর্কে জানার সবচেয়ে সঠিক পদ্ধতি হচ্ছে, ঐ ধর্মের উৎসসমূহ সম্পর্কে জানা অর্থাৎ ঐ ধর্মের পবিত্র গ্রন্থসমূহ সম্পর্কে গভীর জ্ঞানার্জন করা।

খ. ইসলামের প্রকৃত উৎসসমূহ

সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের সূরাহ আলে ইমরানের ১০৩ নং আয়াতে বলেছেন– وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ -

অর্থ : তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে সম্মিলিতভাবে ধারণ করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। (ইমরান-১০৩)

এখানে **'আল্লাহর রজ্জু'** বলতে মহাগ্রন্থ আল কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, মুসলমানদের বিভক্ত হওয়া উচিত নয়। আর তাদের ঐক্যের মূল বিষয় হলো ইসলাম ধর্মের প্রকৃত উৎস তথা মহিমান্বিত **'আল-কোরআন'**। মহান আল্লাহ তা'আলা মহিমান্বিত আল-কোরআনের বেশ কয়েকটি আয়াতে এ কথাও বলেছেন যে, মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের সূরাহ নিসার ৫৯ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ -

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমর মহান আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বশীলদের আনুগত্য করো। (নিসা-৫৯)

পবিত্র আল কুরআনকে বোঝার জন্য অধিকতর নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি হলো-যাঁর প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে- সেই নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর দেয়া ব্যাখ্যা সম্পর্কে জানা। এভাবে ইসলাম সম্পর্কে জানার সবচেয়ে সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য উপায় হলো ইসলামের প্রকৃত উৎসসমূহ সম্পর্কে অবগত হওয়া। আর তা হলো : মহিমান্বিত আল-কোরআন (যা মহান আল্লাহর কথা) এবং ছহীহ হাদীসসমূহ (যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এর নিজস্ব কর্ম, নিজস্ব উক্তি এবং অনুমোদন)।

গ. হিন্দুধর্মের প্রকৃত উৎসসমূহ

একইভাবে, হিন্দুধর্ম সম্পর্কে জানার সবচেয়ে সঠিক এবং বিশুদ্ধ পদ্ধতি হচ্ছে এ ধর্মের প্রকৃত উৎসসমূহ সম্পর্কে গভীর জ্ঞানার্জন করা। আর তা হচ্ছে : হিন্দুধর্মের পবিত্র গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করা। হিন্দুধর্মের সবচেয়ে পবিত্র এবং বিশুদ্ধ গ্রন্থসমূহ হচ্ছে বেদ, উপনিষদ, ইতিহাস, শ্রীমৎ ভগবদগীতা ও পুরাণ ইত্যাদি।

আমাদেরকে বিশ্বের এ দুটো গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ ইসলাম এবং হিন্দুধর্ম সম্পর্কে জানতে হবে এ ধর্ম দুটোর প্রকৃত গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে। তাই এগুলো সম্পর্কিত আলোচনা এ বইতে ক্রমান্বয়ে উপস্থাপন করা হবে।

ঘ. ঐসব সাদৃশ্যতার প্রতি নজর দিতে হবে যেগুলো সাধারণতঃ অজ্ঞাত

আমাদের গবেষণা কর্ম 'ইসলাম ও হিন্দুধর্মের সাদৃশ্যসমূহ'- এখানে আমরা ঐসব মিলসমূহের আলোচনা করব না যেগুলো এ উভয় ধর্মের অধিকাংশ অনুসারীদের জানা রয়েছে। যেমন, একজন মানুষের সবসময় সত্য কথা বলা উচিত, তার মিথ্যা কথা বলা উচিত নয়, তার চুরি করা উচিত নয়, তার দয়ালু হওয়া উচিত, তার নিষ্ঠুর হওয়া উচিত নয় ইত্যাদি। এর পরিবর্তে আমরা ঐসব মিলসমূহই আলোচনা করব যেগুলো এ উভয় ধর্মের সব অনুসারীদের সাধারণভাবে জানা নেই এবং এগুলো তাদেরই জানা রয়েছে যারা তাদের ধর্মগ্রন্থসমূহের বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে অবগত রয়েছেন।

ইসলামের পরিচয়

১. ইসলামের সংজ্ঞা

'ইসলাম' একটি আরবি শব্দ। এটির উৎপত্তি হচ্ছে **সালমুন** শব্দ থেকে। যার অর্থ **শান্তি**। অথবা **সিলমুন** থেকে। যার অর্থ 'তোমার ইচ্ছেকে আল্লাহর নিকট সমর্পণ কর।' সংক্ষেপে বলা যায়, **'ইসলাম'** অর্থ হচ্ছে 'স্বীয় ইচ্ছেকে মহান আল্লাহ তাআলার নিকট সমর্পণের মাধ্যমে শান্তি অর্জন করা।'

পবিত্র কুরআন এবং হাদীসের বিভিন্ন জায়গায় **'ইসলাম'** শব্দের উল্লেখ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে সূরাহ আলে-ইমরানের **১৯** নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإِسْلاَمُ -

অর্থ : নিঃসন্দেহে ইসলামই মহান আল্লাহর নিকট একমাত্র পছন্দনীয় জীবন ব্যবস্থা।

(২) একজন মুসলিমের পরিচয়

একজন মুসলিম হচ্ছেন এমন ব্যক্তি যিনি তার সব শক্তি-সামর্থ্যকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট সমর্পণ করে । পবিত্র কুরআন এবং হাদীসের বিভিন্ন জায়গায় **'মুসলিম'** শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন সূরাহ আলে-ইমরানের ৬৪ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন– اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ -

অর্থ: তোমরা সাক্ষী থাকো, নিশ্চয়ই আমরা মুসলিম।

(৩) ইসলাম সম্পর্কে একটি ভুল ধারণা

কিছু লোকের মধ্যে একটি ভুল ধারণা রয়েছে । আর তা হলো ইসলাম একটি নতুন ধর্ম যা ১৪০০ বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত্-তাসলিমা ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। যা হোক, আমাকে পরিষ্কার করে বলতে হয় যে, ইসলাম এমন কোনো একক ধর্মের নাম নয়, যা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত্-তাসলিমা কর্তৃক প্রথম বারের মতো উপস্থাপিত হয়েছে এবং যে অর্থে তাঁকে ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় তা যথার্থ নয়।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে যে, মানুষের পরিপূর্ণ আনুগত্য কেবল একক ও অদ্বিতীয় সৃষ্টির্কতা প্রভুর জন্যই নির্ধারিত। এটা মানবজাতির প্রতি মহান প্রভুর এমন একটি নির্দেশনা, যা সৃষ্টির একেবারে জন্মলগ্ন থেকেই

ধারাবাহিকভাবে অবতীর্ণ হয়ে আসছে। নূহ নবীউল্লাহ আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা, ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা, ইসমাঈল জাবীউল্লাহ আলাইহিস সালাম আত-তাসলিমা, ইসহাক আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা, ইয়াকুব আলাইহিস সালাম আত্–তাসলিমা, মূসা কালিমুল্লাহ আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা, দাউদ খলিফাতুল্লাহ আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা, সোলাইমান আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা, এবং ঈসা রুহুল্লাহ আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা সহ অন্য নবীরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁদের সবাই একই বিশ্বাস ও তাওহীদ (আল্লাহর একত্ববাদ), রিসালাত (নবুয়াতি) এবং আখিরাত (পরকাল) সম্পর্কে একই সংবাদ পরিবেশন করেছেন। এই নবিগণ আলাইহিমুস সালাম আত্-তাসলিমা ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না যা তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের নামে নামকরণ করা হয়েছে। তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের পূর্বসূরিদের প্রচারিত আক্বীদা এবং বাণীর পুণরাবৃত্তি করেছেন মাত্র।

যাহোক, মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত-তাসলিমা ছিলেন মহান আল্লাহর সর্বশেষ নবী। আল্লাহ তাঁর দ্বারা একই নির্ভেজাল আক্বিদার পুণরাবৃত্তি করিয়েছেন যা তাঁর পূর্বে অন্যসব নবীও প্রচার করে গিয়েছিলেন। এ নির্ভেজাল বাণী ইতোপূর্বে কলুষিত হয়ে গিয়েছিল এবং বিভিন্ন সময় মানুষের দ্বারা বহুবিধ ধর্মে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল অর্থাৎ তারা নানা ধর্মে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। ফলে এ নির্ভেজাল আক্বিদায় ভেজাল ও ভুল আক্বিদার সংমিশ্রণ ঘটেছিল। আল্লাহ তাআলা এসব ভুল আক্বিদার অপসারণ করা এবং ইসলামের সঠিক ও প্রকৃতস্বরূপ মানবজাতির সামনে তুলে ধরার জন্যে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা কে প্রেরণ করেন ।

যেহেতু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা এর পরে আর কোনো নবী নেই, তাই তাঁর প্রতি এমন একটি মহাগ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছিল (মহিমান্বিত কুরআন)। যার প্রতিটি শব্দকে এমনভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে যাতে পরবর্তীকালের প্রতিটি মুহূর্তের জন্য তা হেদায়াতের উৎস হিসেবে টিকে থাকতে পারে। এভাবে সব নবীর প্রচারিত ধর্মই ছিল–মহান আল্লাহর ইচ্ছের নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং এজন্য একটি মাত্র শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যাকে আরবিতে বলা হয় **'ইসলাম'** । ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা এবং ঈসা আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা ও মুসলিম ছিলেন।

যেমন : মহান আল্লাহ সূরাহ আলে-ইমরানের ৫২ নং আয়াতে ঈসা আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা সম্পর্কে বলেছেন–

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللهِ آمَنَّا بِاللهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ -

অর্থঃ অতঃপর যখন ঈসা আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা তাদের মধ্যে কুফরির ব্যাপারে অবগত হলেন তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্য থেকে কারা আল্লাহর জন্য সাহায্যকারী হবে ? হাওয়ারীরা বলল, আমরাই আল্লাহর সাহায্যকারী হব। আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান আনয়ন করেছি। সাক্ষী থেক যে, নিশ্চয়ই আমরা মুসলিম।

এছাড়া ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা সম্পর্কে সূরাহ আলে-ইমরানের ৬৭ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلاَ نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ -

অর্থঃ ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা ইয়াহুদি বা নাসারা ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম। আর তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

হিন্দুদের পরিচয়

(১) একজন হিন্দুর পরিচয়

ক. 'হিন্দু' শব্দটির ভৌগোলিক তাৎপর্য রয়েছে এবং এটা প্রকৃতপক্ষে ঐসব লোকদেরকে বুঝাতে ব্যবহৃত হয় যারা সিন্ধু নদের তীরে অথবা সিন্ধু নদের পানি দ্বারা সিক্ত হয় এমন এলাকায় বসবাস করে ।

খ. ঐতিহাসিকদের মতে, এ শব্দটি প্রথম ঐসব পারস্যদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছিল যারা হিমালয় পর্বতের উত্তর পশ্চিম দিক দিয়ে ভারতে আগমন করেছিল । **'হিন্দু'** শব্দটি আরবিয়দের দ্বারাও ব্যবহৃত হতো।

গ. হিন্দু' শব্দটি ভারতীয় সাহিত্যে অথবা হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থসমূহে মুসলমানদের ভারতে আগমনের পূর্বে কোথাও উল্লেখ ছিল না এ তথ্যটি **'এনসাইক্লোপিডিয়া অভ রিলিজিয়নস অ্যান্ড ইথিকস–৬ : ৬৯০** এ পরিবেশিত হয়েছে ।

ঘ. জওহারলাল নেহেরু তাঁর **'ডিসকভারি অভ ইন্ডিয়া'** বইয়ের ৭৪ ও ৭৫ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন , খ্রিস্টীয় ৮ম শতাব্দীর পূর্বে 'হিন্দু' শব্দটি দ্বারা 'মানুষকে' বুঝানো হতো এবং কোনোভাবেই নির্দিষ্ট কোনো ধর্মের অনুসারীদেরকে বুঝানো হতো না । কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের অনুসারীদেরকে বুঝানোর জন্য 'হিন্দু 'শব্দটির ব্যবহার নিঃসন্দেহে পরবর্তীকালের ঘটনা ।

ঙ. সংক্ষেপে বলা যায় যে, 'হিন্দু' শব্দটি একটি ভৌগোলিক পরিভাষা যেটা 'সিন্ধু' নদের তীরে বসবাসকারী লোকদেরকে বুঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে অথবা যারা ভারতে বসবাস করে তাদের বুঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে ।

২. হিন্দুধর্মের পরিচিতি

ক. হিন্দুতত্ত্ব বা হিন্দুধর্ম কথাটি **'হিন্দু'** শব্দ 'থেকে গৃহীত হয়েছে । **'নিউ এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকার -২০ : ৫৮১ পৃষ্ঠায়'** বলা হয়েছে 'হিন্দুধর্ম' নামটি ইংরেজি ভাষায় ইংরেজরা ব্যবহার শুরু করে ঊনবিংশ শতাব্দীতে। এর দ্বারা হিন্দুস্থানের জনগণের বহুবিধ বিশ্বাস বা আক্বিদাকে বুঝানো হয়ে থাকে। বৃটিশ লেখকরা ১৮৩০ সালে প্রথম **'হিন্দুধর্ম'** শব্দটির ব্যবহার শুরু করেন। এর দ্বারা তারা মূলত ভারতের ঐসব সমবিশ্বাসের লোকদেরকে বুঝাতো যারা মুসলমান বা খ্রিস্টান নয়।

খ. হিন্দু পন্ডিতদের মতে, **'হিন্দুইজম'** বা **'হিন্দুতত্ত্ব'** শব্দটি একটি মিথ্যা পরিভাষা। আর **'হিন্দুধর্ম'** বলতে **'সনাতন ধর্ম'**'কে বুঝানো হয়ে থাকে। সনাতন ধর্ম হচ্ছে চিরন্তন ধর্ম অথবা এর দ্বারা বৈদিক ধর্মকে বুঝায় যার অর্থ বেদের ধর্ম। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, **'এ ধর্মের অনুসারীরা 'বেদতত্ত্ববাদী' হিসেবে পরিচিত।'**

এখন, আমরা ইসলাম ধর্মের আক্বিদার বিষয়গুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এবং ঐগুলোকে হিন্দুধর্মের ধর্মগ্রন্থসমূহে বর্ণিত মতবাদসমূহের সাথে তুলনা করে দেখবো। আমরা আরো যাচাই করবো ইসলাম এবং হিন্দুধর্মে প্রভু সম্পর্কে কী কী বলা হয়েছে, সেগুলো এতদুভয়ের মাঝে তুলনাও করে দেখবো।

ইসলামে ঈমানের বিষয়বস্তু এবং ঐগুলোর সাথে হিন্দুধর্মীয় ধর্মগ্রন্থসমূহে প্রদত্ত ধর্মবিশ্বাসের তুলনা

সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ তা'আলা মহিমান্বিত কুরআনের সূরাহ বাকারার ১৭৭ নং আয়াতে বলেছেন–

لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّين -

অর্থ : পূর্বদিকে এবং পশ্চিমদিকে মুখ ফেরানোর মধ্যে কোনো সৎকাজ বা সওয়াব নিহিত নেই। বরং প্রকৃত সৎকর্ম বা পুণ্যের কাজ করছে ঐ ব্যক্তি, যিনি মহান আল্লাহ, শেষ বিচারের দিন, ফিরিশতা, আসমানি কিতাবসমূহ এবং নবিগণের প্রতি যথার্থ ঈমান আনয়ন করেছে।'

সহীহ মুসলিমের প্রথম খন্ডের কিতাবুল ঈমানের ৬ নং হাদীসে বর্ণিত আছে-একজন লোক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর নিকট আগমন করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা! ঈমান কী? উত্তরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা তাঁকে বললেন, 'ঈমান হচ্ছে তুমি বিশ্বাস আনবে মহান আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবের প্রতি, তাঁর নবিগণের প্রতি, পরকালের পুনরুত্থানের প্রতি এবং তোমার তাক্বদীরের (অদৃষ্টের) প্রতি।' এভাবে ইসলামে ঈমানের বিষয়গুলো হচ্ছে–

১. তাওহীদ (ঈমানের প্রথম বিষয় হচ্ছে তাওহীদ। আর তা হচ্ছে সব সৃষ্টির স্রষ্টা একক, চিরন্তন।)

২. আল্লাহর ফিরিশতাগণের প্রতি বিশ্বাস,

৩. আল্লাহর প্রেরিত কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস,

৪. তাঁর নবিগণের প্রতি বিশ্বাস,

৫. পরকালের জীবনের প্রতি বিশ্বাস,

৬. অদৃষ্টের প্রতি বিশ্বাস।

এখন, আমাদেরকে এ দুটো ধর্মে মহান আল্লাহর অস্তিত্ব বা গুণাবলী সম্পর্কে কী কী ধারণা দেয়া হয়েছে তা ঐ ধর্ম দুটোর ধর্মগ্রন্থসমূহের বক্তব্যের আলোকে আলোচনা করবো এবং এতদুভয়ের মাঝে কোনো সমতা আছে কিনা

তাও পর্যালোচনা করবো। প্রথমে আমরা হিন্দুধর্মে প্রভু সম্পর্কিত যেসব বক্তব্য আছে তা আলোচনা করবো।

৫. হিন্দুধর্মে প্রভু সম্পর্কিত ধারণা

যদি আপনি কোনো সাধারণ হিন্দুকে জিজ্ঞেস করেন যে, তারা কয়জন আল্লাহয় বিশ্বাস করে ? তাদের কেউ কেউ বলবে, তিনজন। কেউ কেউ বলবে, তেত্রিশজন। আবার কেউ কেউ বলবে, এক হাজার জন। কেউ কেউ হয়তো এটাও বলবে, তেত্রিশ কোটি দেবতা। কিন্তু যদি আপনি এ প্রশ্নটি কোন একজন শিক্ষিত হিন্দুকে জিজ্ঞেস করেন, যিনি হিন্দু ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন। তাহলে এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলবেন, একজন হিন্দু অবশ্যই এবং প্রকৃতপক্ষেই একজন প্রভুতে বিশ্বাস করেন এবং কেবল একজন সৃষ্টিকর্তারই উপাসনা করেন।

ইসলাম এবং হিন্দুধর্মের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সম্বন্ধবাচক শব্দ ব্যবহারে

ইসলাম বলে, **Everything is God's** অর্থাৎ **'সবকিছুই মহান আল্লাহর (সৃষ্টি)'**। পক্ষান্তরে, হিন্দুধর্মে বলা হয়, **Everything is God** অর্থাৎ **'সবকিছুই প্রভু'**।

একজন মুসলমান এবং একজন হিন্দুর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হলো–একজন সাধারণ হিন্দু স্বর্বেশ্বরবাদের দর্শনে বিশ্বাসী। অর্থাৎ সে বিশ্বাস করে, **'সবকিছুই প্রভু, গাছ একজন প্রভু, সূর্য একজন প্রভু, চন্দ্র একজন প্রভু, সাপ একজন প্রভু, বানর একজন প্রভু, মানুষ একজন প্রভু।'** পক্ষান্তরে মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, **'এ সব কিছুই একমাত্র মহান আল্লাহর (সৃষ্টি)।'**

মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, সবকিছুই প্রভুর (সৃষ্টি) অর্থাৎ সবকিছুই প্রভুর সাথে (স্রষ্টা-সৃষ্টির) সম্পর্কে সম্পর্কিত। সবকিছুই এক এবং একমাত্র একক চিরন্তন সত্তার মালিকানাধীন। গাছের মালিক প্রভু, সূর্যের মালিকও প্রভু, চন্দ্রের মালিকও প্রভু, সাপের মালিকও প্রভু, মানুষের মালিকও প্রভু অর্থাৎ পৃথিবীর সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা বা মালিক হলেন একমাত্র মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন।

এভাবে হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে প্রধান পার্থক্য **'সম্বন্ধবাচক'** শব্দের ব্যবহারের মধ্যে নিহিত। হিন্দুরা বলেন, **'সবকিছুই প্রভু'**। আর মুসলমানরা বলেন, **'সবকিছুই প্রভুর'**। আমরা যদি সম্বন্ধবাচক

(Apostrophe) শব্দের ব্যবহারজনিত সমস্যার সমাধান করতে পারি তাহলে পৃথিবীতে হিন্দু এবং মুসলমানরা এক হয়ে যাবে। তাদের মাঝে কোনো পার্থক্য থাকবে না।

মহাগ্রন্থ আল-কোরআনের সূরাহ আলে ইমরানের ৬৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে–قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ-

অর্থ : তোমরা এমন সাধারণ বিষয়ের প্রতি আসো– যা তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে সমান। আলোচনার প্রথম শর্ত হচ্ছে এই যে, আমরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবো না।

সুতরাং আমাদেরকে এমন সব সমান বিষয়ের প্রতি আলোচনা করা দরকার যেগুলো ইসলাম ও হিন্দুধর্ম গ্রন্থসমূহে বিশ্লেষণ করে পাওয়া যায়।

উপনিষদ

উপনিষদ হচ্ছে হিন্দুধর্ম গ্রন্থসমূহের মধ্যে অন্যতম পবিত্র ধর্মগ্রন্থ।

১. চান্দগোয়া উপনিষদের ৬ নং অধ্যায়ের ২ নং সেকশনের ১ নং ধারায় বলা হয়েছে Ekam Evadvitiyam অর্থাৎ, **'তিনি এক, একমাত্র একক এবং অদ্বিতীয়।'** (রাধাকৃষ্ণের রচিত মূল উপনিষদের ৪৪৭ এবং ৪৪৮ নং পৃষ্ঠা এবং প্রাচ্যের পবিত্র গ্রন্থসমূহ, খন্ড-১, উপনিষদ, ১৯ অংশের ৯৩ নং পৃষ্ঠা)

২. সুভাস ভাট্টারার উপনিষদের ৬ নং অধ্যায়ের ৯ নং ধারায় বলা হয়েছে– Nacasya kascij Janita na cadhipah অর্থাৎ, **'তাঁর কোনো অংশীদার নেই এবং তাঁর কোনো প্রভুও নেই'**। (রাধাকৃষ্ণের রচিত মূল উপনিষদের ৭৪৫ নং পৃষ্ঠা এবং প্রাচ্যের পবিত্র গ্রন্থসমূহ খন্ড-১৫, উপনিষদ, ২য় অংশের ২৬৩ রং পৃষ্ঠা)

৩. সুভাস ভাট্টারার উপনিষদের ৪ নং অধ্যায়ের ১৯ নং ধারায় বলা হয়েছে- ঃ asya pratima asti. অর্থাৎ, **'তাঁর মতো আর কেউ নেই।'** (রাধাকৃষ্ণের মূল উপনিষদের ৭৩৬, ৭৩৭ নং পৃষ্ঠা এবং প্রাচ্যের পবিত্র গ্রন্থসমূহ খন্ড, ১৫, উপনিষদ ২য় অংশের ২৫৩ নং পৃষ্ঠায়)

৪. সুভাস ভাট্টারার উপনিষদের ৪ নং অধ্যায়ের ২০ নং ধারায় বলা হয়েছে– Na samdrse tisthati rupam asya na caksusa pasyati kas canainam. অর্থাৎ **"তাঁর আকার দেখা যায় না, কেউ তাঁকে চোখ দ্বারা দেখতে পায় না"** (রাধাকৃষ্ণের রচিত মূল উপনিষদ ৭০৭ নং পৃষ্ঠা এবং প্রাচ্যের পবিত্র গ্রন্থসমূহ খন্ড ১৫, উপনিষদ ২ নং অংশের ২৫৩ নং পৃষ্ঠা)

শ্রীমৎ ভগ্বদগীতা

হিন্দুধর্ম গ্রন্থসমূহের মধ্যে শ্রীমৎ ভগ্বদগীতা সবচেয়ে জনপ্রিয় ধর্মগ্রন্থ। এ গ্রন্থের ৭ : ২০-এ বলা হয়েছে– **'যাদের বুদ্ধি-জ্ঞান পার্থিব কোনো বস্তু দ্বারা চুরি হয়ে গেছে তারাই উপদেবতার উপাসনা করে।'** অর্থাৎ 'যারা বস্তুবাদী তারাই শুধু উপদেবতার উপাসনা করে।'-এ কথার অর্থ হচ্ছে বস্তুবাদীরা সত্য প্রভুকে ছেড়ে প্রতিমার উপাসনায় নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখে।

এছাড়া ভগ্বদগীতার ১০ : ৩-এ শ্লোকে বর্ণিত আছে- **'তিনি সেই সত্তা যিনি আমাকে জন্মের পূর্ব থেকেই জানেন, যাঁর কোনো আদি নেই, তিনি হচ্ছেন জগৎসমূহের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী প্রভু।'**

ইয়াজুর বেদ

হিন্দুধর্ম গ্রন্থসমূহের মধ্যে পবিত্র গ্রন্থ হচ্ছে **বেদ। মৌলিকভাবে বেদ ৪ প্রকার : ঋগ বেদ, ইয়াজুর বেদ, শ্যাম বেদ এবং অথর্ব বেদ।**

১. ইয়াজুর বেদের ৩২ অধ্যায়ের ৩ নং ধারায় বলা হয়েছে- "na tasya pratima asti" অর্থাৎ **'তাঁর ব্যাপারে কোনো কল্পনা করা যায় না।' এটা আরো বলেছে, "তিনি হচ্ছেন এমন সত্তা যিনি জন্মগ্রহণ করেন নি, তিনি আমাদের উপাসনার যোগ্য।'** (ইয়াজুর বেদ ৩২ : ৩) (দেবী চাঁদ এম.এ.কর্তৃক রচি ইয়াজুর বেদ, পৃষ্ঠা ৩৭৭)

২. ইয়াজুর বেদের ৪০ নং অধ্যায়ের ৮ নং ধারায় বলা হয়েছে- **'তিনি হচ্ছেন নিরাকার এবং বিশুদ্ধ।'** (র‍্যালফ আই, এইচ, গ্রিফিথ কৃর্তৃক রচিত ইয়াজুর বেদ, পৃষ্ঠা ৫৩৮)

৩. ইয়াজুর বেদের ৪০ নং চ্যাপ্টারের ৯ নং ধারায় বলা হয়েছে- **'সে জাহেলিয়াতে প্রবেশ করে, যে প্রাকৃতিক কোনো জিনিসের উপাসনা করে।'** যেমন, প্রাকৃতিক কোনো বিষয় বায়ু, পানি, আগুন, সূর্য এবং

চন্দ্র ইত্যাদি কোনো প্রাকৃতিক বিষয়ের উপাসনা করা। এটি আরো বলেছে, **'তারা গভীর মূর্খতায় নিমজ্জিত যারা সৃষ্টির উপাসনা করে।** যেমন : টেবিল, চেয়ার, পুতুল ইত্যাদি তৈরিকৃত জিনিসের উপাসনা করা।' (র‍্যালফ আই, এইচ. গ্রিফিথ কর্তৃক রচিত ইয়াজুর বেদ শ্যামহিতা-এর পৃষ্ঠা-৫৩৮)

অথর্ব বেদ

১. অথর্ব বেদের ৫৮ নং অধ্যায়ের ৩ নং ধারায় বলা হয়েছে- **'প্রভু অত্যন্ত মহান'**। (অথর্ব বেদের খন্ড ২, উইলিয়াম ড্রুইট-হিটটি, পৃষ্ঠা ৯১০)

ঋগ বেদ

১. ঋগ বেদ বই নং ১, স্তুতিগান নং ৬৪, ধারা ৪৬-এ বলা হয়েছে- **'মহাজ্ঞানীরা এক প্রভুকে বিভিন্ন নামে ডাকে।'**

সত্য এক, প্রভু একক, কিন্তু জ্ঞানীরা তাকে বিভিন্ন নামে ডেকে থাকুন। এ একই কথা বলা হয়েছে ঋগ বেদের বই নং ১০, স্তুতিস্তাবক ১১৪-ধারা-৫-এ।

২. ঋগ বেদের বই ২, স্তুতিস্তাবক-১-এ বলা হয়েছে ঋগ বেদে মহাক্রম প্রভুর কমপক্ষে ৩৩ টি গুণাবলির বর্ণনা পাওয়া যায়। এসব গুণের অনেকের বর্ণনাই ঋগবেদের বই-২, স্তুতিস্তাবক-১-এ উল্লিখিত হয়েছে।

ক. ব্রহ্ম = স্রষ্টা = খালিক : ঋগ বেদ বই-২, স্তুতিস্তাবক-১, ধারা-৩

ঋগ বেদে স্রষ্টার যেসব গুণের কথা বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে প্রভুর অন্যতম সুন্দর গুণ হচ্ছে এই যে, তিনি একজন **ব্রহ্ম**। **'ব্রহ্ম' অর্থ স্রষ্টা**। যদি এটাকে আরবিতে অনুবাদ করা হয় তাহলে দাঁড়ায় **'খালিক'**। ইসলাম মহান প্রভুকে খালিক, স্রষ্টা বা ব্রহ্ম বলে ডাকতে নিষেধ করে না। কিন্তু কেউ যদি বলে ব্রহ্ম, তথা সর্বশক্তিমান প্রভূর- চারটি মাথা এবং প্রতি মাথায় একটি মুকুট এবং চারটি হাত আছে। তবে এক্ষেত্রে ইসলামের বড় আপত্তি রয়েছে। কারণ, এ ধরনের বর্ণনা প্রভু সম্পর্কে মানুষের মনে কল্পনার সৃষ্টি করে। আর এ বর্ণনা ইয়াজুর বেদের ৩২ নং অধ্যায়ের ৩ নং ধারার বর্ণনার সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা সেখানে বলা হয়েছে, 'তাঁর সম্পর্কে কল্পনাও করা যায় না।'

খ. বিষ্ণু = পালনকর্তা = রব : ঋগ বেদ বই-২, স্তুতিস্তাবক-১, ধারা ৩ ঋগ বেদে প্রভুর জন্য একটি সুন্দর গুণের কথা বলা হয়েছে। যেমন বই-২ স্তুতিস্তবক-১, ধারা-৩-এ বলা হয়েছে যে, বিষ্ণু। **'বিষ্ণু'** অর্থ হচ্ছে রক্ষাকর্তা বা পালনকর্তা। আপনি যদি এ শব্দটাকে আরবিতে অনুবাদ করেন তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় **'রব'**। আর কেউ যদি সর্বশক্তিমান প্রভুকে **'রব'** 'রক্ষাকর্তা' কিংবা **'বিষ্ণু'** হিসেবে আখ্যায়িত করে তাতে ইসলামের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু যদি কেউ বলে যে, বিষ্ণুই হচ্ছে সর্বশক্তিমান প্রভু এবং এ বিষ্ণুর চারটি হাত আছে, ডান হাতদ্বয়ের একটি হাত দ্বারা শঙ্খ বর্ম বা খোলস এবং বিষ্ণু পাখি কিংবা সাপের ছোবলের সামনে বাহনে উপবিষ্ট- তাহলে এক্ষেত্রে ইসলামের ঘোর আপত্তি আছে। কারণ, বিষ্ণুর এ ধরনের বর্ণনা সর্বশক্তিমান প্রভুর আকৃতি সম্পর্কে ধারণার সৃষ্টি করে। আর এ বর্ণনা ইয়াজুর বেদের ৪০ নং অধ্যায়ের ৮ নং ধারার বর্ণনার সম্পূর্ণ বিপরীত।

৩. ঋগ বেদের বই-৮, স্তুতিস্তাবক-১, ধারা-১-এ বলা হয়েছে-! **'তিনি (প্রভু) ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা করো না। তিনি একমাত্র স্বর্গীয়। কেবল তারই প্রশংসা করো।'** (ঋগ বেদ সমিতি, খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-১ এবং ২)

৪. ঋগ বেদের বই-৫,স্তুতিস্তাবক-৮১, ধারা-১-এ বলা হয়েছে- **'সত্যিই স্বর্গীয় স্রষ্টার গৌরব অত্যন্ত সুমহান।'** (ঋগ বেদ সমিতি, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৮০২ এবং ১৮০৩)

৫. ঋগ বেদের বই-৬, স্তুতিস্তাবক-৪৫, ধারা-১৬-এ বলা হয়েছে- **'তাঁরই প্রশংসা করো যার কোনো তুলনা নেই এবং তিনি একক।'** (র‍্যাঙ্ক টি. এইচ. গ্রিফিথ কর্তৃক রচিত ঋগ বেদ, পৃষ্ঠা-৬৪৮)

হিন্দু বেদান্তের ব্রহ্মসূত্র

হিন্দু বেদান্তের ব্রহ্মসূত্র হচ্ছে- **'সৃষ্টিকর্তা কেবল একজন এবং দ্বিতীয় কোনো দেবতা নেই, আদৌ নেই, কখনো ছিল না এবং কখনও হবেও না।'**

উপরে বর্ণিত সব ধারা এবং অধ্যায় হিন্দুধর্মের প্রকৃত ধর্মগ্রন্থসমূহ থেকে নেয়া হয়েছে। এসব ধারা স্পষ্টভাবে স্রষ্টা সর্বশক্তিমান প্রভুর একত্ব এবং অদ্বিতীয়তা প্রমাণ করে। অধিকন্তু, এসব ধারা সত্য প্রভু একক আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য দেবতার অস্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছে। এসব ধারা অত্যন্ত সুন্দরভাবে একেশ্বরবাদ তথা তৌহিদের ধারণাকে স্পষ্ট করে দেয়।

অতএব, কেউ যদি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে হিন্দুধর্ম গ্রন্থসমূহকে অধ্যয়ন করে তবে তিনি হিন্দুধর্মের প্রভু সম্পর্কিত যথার্থ ধারণা বুঝতে এবং উপলব্ধি করতে পারবে।

৬. ইসলামে প্রভু সম্পর্কিত ধারণা

আল-কোরআন একেশ্বরবাদ তথা তৌহিদের ধারণাই উপস্থাপন করেছে। সুতরাং আপনি হিন্দুধর্মে ও ইসলামের মধ্যে প্রভু তথা মহান আল্লাহর ধারণা সম্পর্কিত বক্তব্যের মধ্যে মিল দেখতে পাবেন।

ক. ব্যাখ্যাসহ সূরাহ ইখলাস

ইসলামের মতে, মহান প্রভুর সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পবিত্র কুরআনের সূরাহ ইখলাসে দেয়া হয়েছে। যেমন : সূরাহ-১১২, আয়াত (১-৪)-এ বলা হয়েছে–

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ - اللَّهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ - وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ -

অর্থ : হে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা ! আপনি বলুন, তিনিই আল্লাহ যিনি একক এবং অদ্বিতীয়। মহান আল্লাহ চিরন্তন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ (তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন)। তিনি কাউকে জন্মদান (জৈবিকভাবে) করেন নি এবং তাঁকেও কেউ জন্ম দেয় নি। আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

এখানে **'আসসামাদ'** শব্দটির অর্থ হচ্ছে চিরন্তন অস্তিত্ব হওয়ার গুণটি শুধুই মহান আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য। সুতরাং বিশ্বে অন্যসব প্রাণীর অস্তিত্ব ক্ষণকালের জন্য অথবা শর্তযুক্ত। এর আরো অর্থ হচ্ছে– মহান আল্লাহ কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর ওপর নির্ভরশীল নন বরং অন্য সব ব্যক্তি এবং বস্তুই তার ওপর নির্ভরশীল।

এটা ধর্মতত্ত্বের কষ্টিপাথর

সূরাহ ইখলাস অর্থাৎ আল কুরআনের ১১২ নং সূরাহটি হচ্ছে ধর্মতত্ত্বের কষ্টিপাথর। **'Theo'** শব্দটি গ্রিক- যার অর্থ হচ্ছে প্রভু এবং **'logy'** অর্থ হচ্ছে তত্ত্ব। এভাবে **Theology** অর্থ হচ্ছে-প্রভুতত্ত্ব এবং সূরাহ ইখলাস হচ্ছে-প্রভুতত্ত্বের কষ্টিপাথর।

যদি আপনি কোনো স্বর্ণের অলঙ্কার কিনতে বা বিক্রি করতে চান তাহলে আপনাকে সর্বপ্রথম এটাকে যাচাই করে নিতে হবে। এ ধরনের স্বর্ণ অলঙ্কারের যাচাই-বাচাই কেবল স্বর্ণকারের কষ্টিপাথরের সাহায্যেই করা সম্ভব। সে স্বর্ণ অলঙ্কারের কষ্টিপাথরের সাথে ঘষবে এবং এর রঙকে ঘর্ষণকৃত পাথরের রংয়ের সাথে তুলনা করে দখবে। যদি এটার রং ২৪ ক্যারেট স্বর্ণের রঙের মতো উজ্জ্বল হয় তাহলে স্বর্ণকার আপনাকে বলবে যে, আপনার অলঙ্কারে ব্যবহৃত স্বর্ণ হচ্ছে ২৪ ক্যারেট প্রকৃত স্বর্ণ। যদি এটি উচ্চ গুণসম্পন্ন প্রকৃত স্বর্ণ না হয় তাহলে স্বর্ণকার আপনাকে বলবে যে, এটা হয়তো ২২ ক্যারেট স্বর্ণ, নয়তো ১৮ ক্যারেট স্বর্ণ অথবা এটা আদৌ স্বর্ণ নয়। এটা হতে পারে নকল কারণ, কথায় বলে, **'চকচক করলেই সোনা হয় না।'**

একইভাবে সূরাহ ইখলাস (পবিত্র কুরআনের ১১২ নং সূরাহ) হচ্ছে-প্রভুতত্ত্বের কষ্টিপাথর-যেটা এ সত্য যাচাই করতে পারে যে, তুমি যে প্রভুর ইবাদত করছ তিনি প্রকৃত প্রভু নাকি মিথ্যা প্রভু। কারণ, সূরাহ ইখলাস হচ্ছে-কুরআনে প্রদত্ত সর্বশক্তিমান প্রভুর চার লাইনে দেয়া পরিচয়। যদি কেউ সর্বশক্তিমান প্রভুর প্রতি বিশ্বাসী হওয়ার দাবি করে তাহলে তাকে এ চার লাইনের পরিচয়ের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করতে হবে। আমরা মুসলমানরা সৃষ্টিকর্তা বলতে মহান আল্লাহকে বুঝি। মহিমান্বিত কুরআনের সূরাহয় ইখলাস হচ্ছে একটি অগ্নিপরীক্ষা। এটা হচ্ছে-**'ফুরকান'** তথা পার্থক্যকারী। যেটা সত্য প্রভু এবং মিথ্যা প্রভুত্বের দাবিদার মহান আল্লাহর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। সুতরাং পৃথিবীতে ভিন্নধর্মী মানুষ যেসব দেবতার উপাসনা করে সেসব দেবতা যদি পবিত্র আল-কোরআনের সূরাহ ইখলাসের বর্ণিত গুণাবলি অর্জন করতে পারে, তাহলে সে দেবতার উপাসনা করা অর্থবহ এবং সেই দেবতাই প্রকৃত প্রভু। আর যদি তা অর্জন করতে না পারে, তবে সে দেবতাকে বর্জন করতে হবে।

খ. প্রভুর গুণাবলি

মহান আল্লাহ সবচেয়ে সুন্দর সুন্দর নামের অধিকারী।

১. পবিত্র কুরআনের ১৭ নং সূরাহর ১১০ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

قُلِ ادْعُواْ اللّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَـنَ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الأَسْمَاء الْحُسْنَى -

অর্থ : হে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা! আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহকে 'আল্লাহ' নামে ডাক অথবা 'রহমান' নামে ডাক।

তবে তোমরা তাঁকে যে নামেই ডাকো না কেন (সেটাই উত্তম)-তিনি সবচেয়ে সুন্দর সুন্দর নামের অধিকারী।

আপনি মহান আল্লাহকে যেকোনো নামে ডাকতে পারেন কিন্তু সে নামটি অবশ্যই সুন্দর হওয়া উচিত এবং সে নামটি এমন হওয়া উচিত নয় যে, তাতে মানসিকভাবে প্রভুর কোনো কল্পনা অঙ্কিত হয়।

মহান প্রভুর কমপক্ষে ৯৯ টি গুণবাচক নাম রয়েছে। এসব গুণবাচক নামের মধ্যে রয়েছে **'আর রহীম' 'আল হাকীম'** অর্থাৎ, পরম দয়াবান, পরম দয়ালু এবং সর্বজ্ঞ। এতোসব গুণবাচক নামের মধ্যে একটিমাত্র নাম হিরন্ময় আর সেটা হচ্ছে **'আল্লাহ'**। পবিত্র কুরআন এ বাণীটির পুনরাবৃত্তি করেছে যে, মহান আল্লাহ সুন্দরতম নামসমূহের অধিকারী। আর আল-কোরআনে বর্ণিত এই সুন্দর সুন্দর নামের মাধ্যমেই আল্লাহর একত্ব প্রমাণিত। কারণ আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নামের একটিরও কোন স্ত্রী বাচক বা বহুবচন শব্দ নেই। সূরাহ আল আরাফের ১৮০ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

وَلِلَّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ -

অর্থ : মহান আল্লাহর জন্য রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। অতএব তোমরা তাঁকে সেই সব নামেই ডাকো, আর যারা তাঁর নাম বিকৃত করে তাদেরকে বর্জন করো, তাদের কৃতকর্মের ফল তদেরকে শীঘ্রই দেয়া হবে। সূরাহ ত্ব-হার ৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে- اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى -

অর্থ : মহান আল্লাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো হক্ব ইলাহ্ নেই, সুন্দর সুন্দর নাম তাঁরই। সূরাহ আল-হাশরের ২৩ ও ২৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ - هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ -

অর্থ : তিনিই মহান আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোনো হক্ব ইলাহ নেই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত। তারা যাকে শরিক স্থির করে আল্লাহ তা হতে পবিত্র, মহান। তিনিই মহান আল্লাহ, সৃজনকর্তা, উদ্ভাবন কর্তা, রূপদাতা, তাঁরই সব উত্তম নাম। আকাশমণ্ডলি ও

পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

গ. 'আল্লাহ' নামটি 'গড' তথা 'প্রভু' নামের চেয়ে অধিকতর পছন্দনীয়

মুসলমানরা সর্বশক্তিমান স্রষ্টাকে ইংরেজি শব্দ **'গড'**-এর পরিবর্তে **'আল্লাহ'** নামেই ডাকতে বেশি পছন্দ করে। এ আরবি শব্দটি খাঁটি এবং স্বতন্ত্র আর এটি ইংরেজি শব্দ **'গড'**-এর মতো নয়। নিম্নে **'গড'** শব্দটির অর্থ পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হলো: যদি আপনি **'গড'** শব্দটির সাথে **'s'** অক্ষর যোগ করেন তাহলে শব্দটি দাঁড়ায় **Gods** যেটা **God** শব্দের বহুবচন অথচ আল্লাহ হলেন একক এবং অদ্বিতীয়। তাই **'আল্লাহ'** শব্দের বহুবচন হয় না। যদি আপনি **God** শব্দের সাথে **dess** যোগ করেন তাহলে শব্দটি দাঁড়ায় **Goddess** যেটা হয় গড শব্দের স্ত্রীবাচক শব্দ। অথচ মহিলা আল্লাহ কিংবা পুরুষ আল্লাহর ন্যায় কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। মহান আল্লাহর কোনো লিঙ্গ ভেদ নেই। আবার আপনি যদি **God** শব্দের সাথে **Father** শব্দটি যোগ করেন তাহলে শব্দটি দাঁড়ায় **`Godfather'** যেমন, **He is my Godfather**. এর অর্থ হচ্ছে, সে আমার অভিভাবক। কিন্তু ইসলামে **'আল্লাহ আব্বা'** বলতে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। আবার আপনি যদি **Mother** শব্দটি **God**- এর সাথে যোগ করেন তাহলে শব্দটি দাঁড়ায় **Godmother** কিন্তু ইসলামে **'আল্লাহ আম্মু'** কিংবা **'আল্লাহ মাদার'** বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। অনুরূপভাবে যদি আপনি God শব্দের পূর্বে **Tin** শব্দটি যোগ করেন তাহলে এটি হয় **Tingod** যার অর্থ হলো **'মিথ্যা প্রভু'**। কিন্তু ইসলামে **'মিথ্যা আল্লাহ'** কিংবা **'নকল আল্লাহ'** বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। **'আল্লাহ'** শব্দটি হচ্ছে একটি স্বতন্ত্র শব্দ। এটি দ্বারা মানসপটে কোনো কিছুর চিত্রাঙ্কন করতে পারে এমন কিছুকে বুঝায় না। আর এর পূর্বে কিংবা পরে কোনো শব্দ বা শব্দাংশ যোগ করা যায় না। মুসলমানরা সর্বশক্তিমান স্রষ্টাকে বুঝাতে **'আল্লাহ'** শব্দটির ব্যবহারকেই সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে। কিন্তু মাঝে মাঝে তারা যখন অমুসলিমদের সাথে আলোচনা করে তখন আল্লাহর পরিবর্তে অপূর্ণাঙ্গ শব্দ **God**-এর ব্যবহার করে থাকে।

'আল্লাহ' শব্দটির ব্যবহার হিন্দুধর্ম গ্রন্থসমূহেও পাওয়া যায়

'আল্লাহ' শব্দটি- যা দ্বারা আরবিতে সর্বশক্তিমান প্রভুকে বুঝায়, তার ব্যবহার নিম্নোক্ত হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহতেও পাওয়া যায়। যেমন:

–ঋগ বেদ বই-২, স্তুতিস্তাবক-১, ধারা-১১

–ঋগ বেদ বই-৩, স্তুতিস্তাবক-৩০, ধারা-১০

–ঋগ বেদ বই-৯, স্তুতিস্তাবক-৬৭, ধারা-৩০

–একটি উপনিষদ আছে যার নামই হলো ALO উপনিষদ।

৭. ইসলাম ও হিন্দুধর্ম গ্রন্থসমূহের সমর্থক আয়াতসমূহ

ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, ইসলামের বক্তব্য অনুযায়ী প্রভুর সর্বোৎকৃষ্ট পরিচয় পবিত্র কুরআনের ১১২ নং সূরাহর (১-৪) নং আয়াতে দেয়া হয়েছে। যেমন–

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ - اللَّهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ - وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ -

অর্থ : হে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা আপনি বলুন, সেই আল্লাহ একক এবং অদ্বিতীয়। তিনি চিরন্তন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। তিনি কাউকে জন্মদান (জৈবিকভাবে) করেন নি বরং তাঁকেও কেউ জন্ম দেয় নি। আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

হিন্দুধর্ম গ্রন্থসমূহে এমন অনেক অনুচ্ছেদ রয়েছে যেগুলো পবিত্র কুরআনের সূরাহ ইখলাসের মর্মার্থের সমর্থক। যেমন–

ইসলাম ধর্ম	হিন্দুধর্ম
কুলহু ওয়াল্লাহু আহাদ অর্থ : বলুন, তিনি আল্লাহ, একক এবং অদ্বিতীয়। (সূরাহ ইখলাস)	তিনি কেবল একজন এবং অদ্বিতীয়। (চান্দগোয়া উপনিষদ ৬ : ২ : ১)
আল্লাহুস সামাদ। লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ। অর্থ : মহান আল্লাহ চিরন্তন, স্বয়ংসম্পূর্ণ। তিনি কাউকে জন্ম (জৈবিকভাবে) দেন নি, আর কেউ তাঁকে জন্ম দেয় নি। (সূরাহ	তিনি সেই সত্তা যাকে কেউ জন্ম দেয় নি, তাঁর কোনো শুরু নেই, তিনি সমগ্র পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী প্রভু। (ভগবদগীতা ১০ : ৩) এবং তাঁর কোনো পিতা-মাতা নেই, নেই কোনো প্রভু। (সুবাসভাট্টারা উপনিষদ

ইখলাস)	৬ : ৯)
অলাম ইয়া কুল্লাহু কুফুআন আহাদ। অর্থ : আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। (সূরাহ ইখলাস)	'তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।' (সুবাস ভাট্টারা উপনিষদ ৪ : ১৯ আর ইয়াজুর বেদ ৩২ : ৩)

স্মরণ করে দেখুন যে, হিন্দুধর্মের ব্রহ্মসূত্র পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেছে–

Ekam Brahm, devitity naste naste neh na naste kinchan **'সৃষ্টিকর্তা কেবল একজন, দ্বিতীয় কোনো দেবতা নেই। আদৌ নেই, কখনো ছিল না এবং ভবিষ্যতেও কখনো হবে না।'**

৮. ইসলাম এবং হিন্দুধর্মে ফিরিশতাদের ধারণা

এখন, আমরা এ দুটি প্রধান ধর্মে প্রভুর ফিরিশতা সম্পর্কিত বিশ্বাসের সত্যতা যাচাই-বাচাই করে দেখবো এবং এ দুটির মাঝে কোনো মিল আছে কিনা তাও খুঁজে দেখবো।

১. ইসলামে ফিরিশতা

ফিরিশতারা মহান আল্লাহ তা'আলার সম্মানিত সৃষ্টি। তাদেরকে নূর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সাধারণত এদেরকে দেখা যায় না। তাদের নিজেদের পক্ষ থেকে স্বাধীনভাবে কোনো কিছু করার ক্ষমতা নেই এবং তারা সবসময় সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালনে রত থাকেন। নিজেদের স্বাধীন ক্ষমতা না থাকার কারণে তারা প্রভুর কোনো নির্দেশ অমান্য করতে পারে না। বিভিন্ন ধরনের কাজের জন্য বিভিন্ন ধরনের ফিরিশতা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নিযুক্ত হন। যেমন : জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা-কে মহান আল্লাহর বাণী তাঁর নবীদের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। যেহেতু ফিরিশতারা প্রভুর সৃষ্টি, তাই তারা প্রভু নয় তারা প্রভুর সেবক। মুসলমানরা কখনোও ফিরিশতাদের উপাসনা করে না।

২. হিন্দুধর্মে ফিরিশতা

হিন্দুধর্ম গ্রন্থে 'ফিরিশতা' সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট ধারণা নেই। যাহোক, হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে, একশ্রেণীর দেবদূত আছে। তারা এমন সব

কাজ করে যেসব কাজ সাধারণ মানুষের দ্বারা করা সম্ভব নয়। এসব হিন্দুদের কেউ কেউ ইসলামের ফিরিশতাদের সাথে তুলনা করে নি। এসব দেবদূতের উপাসনা করে। প্রকৃতপক্ষে ফিরিশতাদের সাথে দেবতাদের কোন তুলনা বা সাদৃশ হয় না।

৯. ইসলাম এবং হিন্দুধর্মে কিতাব অবতীর্ণের ধারণা

এখন, আমরা ইসলাম ধর্মে ধর্ম গ্রন্থ। আসমানি কিতাব অবতীর্ণের এবং হিন্দুধর্ম গ্রন্থসমূহে মানবজাতির দিকনির্দেশনার ব্যাপারে যেসব বক্তব্য রয়েছে সেগুলো অধ্যয়ণ করে দেখবো।

ইসলামে কিতাব অবতীর্ণের ধারণা

১. আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক যুগেই আসমানি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। পবিত্র কুরআনের সূরাহ রাদ-এর ৩৮ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

- لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ **অর্থ :** প্রত্যেক যুগেই একটি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল।

২. পবিত্র কুরআনে চারটি প্রধান আসমানি কিতাবের নাম উল্লিখিত হয়েছে। যুগে যুগে বিশ্ব মানবতার পথ নির্দেশনা দেবার জন্য আল্লাহ তা'আলা বেশ কিছু কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। পবিত্র কুরআনে মাত্র চারখানা কিতাবের নাম উল্লেখ আছে। এগুলো হলো, **যাবুর, তাওরাত, ইঞ্জিল এবং কুরআন।** যাবুর ছিল ওহী। এটা দাউদ আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল। তাওরাতও ছিল ওহী। এটা মূসা আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল। ইঞ্জিলও ছিল ওহী। এটা ঈসা আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল। মহিমান্বিত কুরআন ছিল সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত ওহী। আর এটা অবতীর্ণ সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ চূড়ান্ত রাসূল মহানবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর ওপর।

৩. পূর্ববর্তী সব আসমানি কিতাবই কেবল একদল নির্দিষ্ট মানুষের নিকট নির্দিষ্ট সময় এবং যুগের জন্য অবতীর্ণ হয়েছিল। মহিমান্বিত কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের সব আসমানি কিতাবই নির্দিষ্ট সময়ের এবং নির্দিষ্ট মানুষের হেদায়াতের জন্য এসেছিল।

৪. আল-কোরআন সমগ্র দানব ও মানবতার হেদায়াতের জন্য অবতীর্ণ হয়েছিল। যেহেতু কুরআন হচ্ছে সর্বশক্তিমান আল্লাহর সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত অবতীর্ণ হওয়া আসমানি কিতাব তাই এটা কেবল মুসলমানদের কিংবা আরববাসীদের হেদায়াতের জন্য অবতীর্ণ করা হয় নি। বরং এটা সমগ্র বিশ্ব মানবতার জন্যই অবতীর্ণ করা হয়েছে। এছাড়া কুরআন কেবল মহানবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর যুগের মানুষের জন্য অবতীর্ণ করা হয় নি বরং এটা পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত আগত সমগ্র মানুষের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে পথ নির্দেশক হিসেবে।

ক. পবিত্র কুরআনের সূরাহ ইবরাহিমের ১ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন–

الَر كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ -

অর্থ : আলিফ-লাম-রা। আমি আপনার নিকট এমন একটি কিতাব অবতীর্ণ করেছি-যা দ্বারা আপনি মানবজাতিকে ঘন অন্ধকার হতে আলোর পথে নিয়ে আসতে পারেন। তাদের কল্পিত প্রভুকে ত্যাগ করে সে প্রভুর পথে-যিনি পরাক্রমশালী এবং চির প্রশংসিত।

যেহেতু এটা হচ্ছে শেষ বিচার দিবস পর্যন্ত চূড়ান্ত নির্দেশনা। সুতরাং এর যথার্থতা এবং পবিত্রতা রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য। এ জন্যেই পবিত্র কুরআনের সুরা আল-হিজরের ৯ নং আয়াতে মহান আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন– إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ -

অর্থ : নিশ্চয়ই আমি এ জিকর (কিতাব) নাযিল করেছি এবং আমিই এর (যে কোনো ধরনের বিকৃতি থেকে) হেফাজতকারী।

খ. মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের সূরাহ ইবরাহিমের ৫২ নং আয়াতে বলেছেন–

هَـذَا بَلاَغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَـهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ -

অর্থ : এটা মানবজাতির জন্য প্রেরিত বাণী। যাতে এর দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা যায় এবং তাদেরকে এ তথ্য প্রদান করা যায় যে, নিশ্চয়ই তিনি একমাত্র মাবুদ এবং এর থেকে জ্ঞানীরা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

গ. আল্লাহ তা'আলা পবিত্র আল-কোরআনের সূরাহ আল-বাকারার ১৮৫ নং আয়াতে বলেছেন–

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ

অর্থ : রমজান এমন একটি মাস, যাতে এমন কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছিল যা বিশ্বমানবতার জন্য পথ প্রদর্শক, হেদায়াতের সুস্পষ্ট প্রমাণ এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী।

ঘ. মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের ৩৯ নং সূরাহ যুমারের ৪১ নং আয়াতে বলেছেন– إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ -

অর্থ : নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট মানবজাতির (নির্দেশনার) জন্য সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি।

আল-কোরআন হচ্ছে মহান প্রভুর কথা। এটা ইসলামের সবচেয়ে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। এটা হচ্ছে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত অবতীর্ণ আসমানি কিতাব। এটি ইংরেজি পঞ্জিকার ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল।

৫. পূর্ববর্তী সব ধর্মগ্রন্থে আল-কোরআনের কথা উল্লিখিত হয়েছে এবং অন্যান্য ধর্মেও আল-কোরআনের উল্লেখ পাওয়া যায়। এটা পবিত্র কুরআনের সূরাহ শূরার ১৯৬ নং আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে–

وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ -

অর্থ : নিশ্চয়ই পূর্ববর্তী লোকদের জন্য প্রেরিত কিতাবে এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

মহিমান্বিত আল-কোরআনের বর্ণনা এবং মহান আল্লাহর এই সর্বশেষ ও চূড়ান্ত কিতাবের উল্লেখ পূর্ববর্তী সব ধর্মগ্রন্থেই এবং অন্য সব ধর্মেই পাওয়া যায়।

৬. হাদীস : কোরআন ব্যতীত ইসলামের জন্য যে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ রয়েছে তার নাম হাদীস। হাদীস হচ্ছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর কাজ, কথা এবং ঐতিহ্যের সমষ্টি। এসব হাদীস হচ্ছে মহিমান্বিত কুরআনের পরিপূরক। সুতরাং এসব হাদীস দ্বারা কুরআনের কোনো

শিক্ষাকে খারিজ করা যায় না এবং এগুলো কুরআনের কোনো বক্তব্যের বিপরীতও হতে পারে না।

হিন্দুধর্মের গ্রন্থসমূহ

হিন্দুধর্মে দু ধরনের পবিত্র গ্রন্থ রয়েছে। যেমন : শ্রুতি এবং স্মৃতি।

শ্রুতি হচ্ছে এমন সব বাণী যেগুলো **শ্রুত, অনুধাবিত, অবহিত অথবা অবতীর্ণকৃত**। এটা হচ্ছে হিন্দুধর্মের সবচেয়ে প্রাচীন এবং পবিত্রতম ধর্মগ্রন্থ। **শ্রুতিকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। বেদ এবং উপনিষদ। আর এ দু' শ্রেণীকেই স্বর্গীয় হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়। স্মৃতি, শ্রুতির মতো এতো পবিত্র নয়।** যদিও এটা বর্তমানে হিন্দুদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ এবং জনপ্রিয় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। স্মৃতি হচ্ছে স্মরণ করা বা স্মৃতিপটে অঙ্কন করা। এ হিন্দু সাহিত্য কর্মটি অনুধাবন করা সহজ। কারণ এটা জগতের সত্যসমূহকে প্রতীকবাদ এবং পুরাণতত্ত্বের বর্ণনা করে। স্মৃতিকে স্বর্গীয় মূল হিসেবে বিবেচনা করা হয় না বরং এটাকে মানবীয় রচনা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। স্মৃতি তালিকা ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং সমাজের কার্যাবলিকে বিধিবদ্ধ করে দেয়। এটি ব্যক্তিদেরকে তাদের প্রত্যাহিক কার্যাবলি সম্পর্কে নির্দেশনা এবং বিধিবদ্ধ করে দেয়। এগুলো ধর্মশাস্ত্র হিসেবে পরিচিত। স্মৃতি গ্রন্থসমূহ বিভিন্ন ধরনের লেখা নিয়ে গঠিত। যেমন, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে পৌরাণিক গ্রন্থসমূহ এবং ইতিহাস গ্রন্থসমূহ। হিন্দুধর্মে কয়েকটি ধর্মগ্রন্থ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে **বেদ, উপনিষদ এবং পুরাণ**।

১. বেদ

ক. **'বেদ'** শব্দটি সংস্কৃত শব্দ Vid থেকে নেয়া হয়েছে। Vid অর্থ হচ্ছে **'জানা'**। সুতরাং 'বেদ' অর্থ হচ্ছে চমৎকার জ্ঞান বা পবিত্র জ্ঞান । বেদে চারটি প্রধান বিভাগ রয়েছে (যদিও তাদের মতানুযায়ী এ সংখ্যা ১,১৩১ এবং যার মধ্য থেকে প্রায় এক ডজনের কোনো হদিস পাওয়া যায় না। পাঠান জেলীর মহা বৈশ্যের মতে, ঋগ বেদ ২১ প্রকারের, অথর্ব বেদ ৯ প্রকারের, ইয়াজুর বেদ ১০১ প্রকারের এবং শ্যাম বেদ ১০০০ প্রকারের)

খ. ঋগ বেদ, ইয়াজুর বেদ এবং শ্যাম বেদ-এসব গ্রন্থকে অধিকতর প্রাচীন হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং এগুলো একত্রে 'ত্রিবেদ' বা 'ত্রিবিজ্ঞান' নামে পরিচিত। ঋগ বেদ সবচেয়ে প্রাচীন এবং এটা তিনটি দীর্ঘ এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রচিত হয়েছে। ঋগ বেদ প্রধানত প্রশংসাসূচক গানের সঙ্কলন। ইয়াজুর

বেদ ত্যাগের মহিমা সংক্রান্ত সূত্রাবলির সঙ্কলন। শ্যাম বেদ হচ্ছে সুর সঙ্গীতের সঙ্কলন। অথর্ব বেদ হচ্ছে প্রচুর সংখ্যক মন্ত্র সংক্রান্ত সূত্রাবলির সংকলন।

গ. চার প্রকার বেদ সঙ্কলনের বা অবতীর্ণের সঠিক তারিখ সম্পর্কে কোন সর্বসম্মত মতামত পাওয়া যায় না। **আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দায়ানন্দের** মতে, বেদগুলো ১,৩১০ মিলিয়ন বছর পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল। অন্য পন্ডিতের মতে, এগুলো ৪,০০০ বছরের চেয়ে অধিক পুরাতন নয়।

ঘ. একইভাবে এসব গ্রন্থসমূহ কোথায় এবং কার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে সে সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে। যদিও মতপার্থক্য রয়েছে তবুও বেদকে হিন্দু ধর্ম গ্রন্থসমূহের মধ্যে সবচেয়ে নির্ভেজাল এবং হিন্দুধর্মের প্রকৃত ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

২. উপনিষদ

'উপনিষদ' শব্দটি **'উপ'** যার অর্থ **'নিকট'**, নি, যার অর্থ **'নিচ'** এবং **'ষদ'** যার অর্থ **'বসা'** থেকে সংকলিত। সুতরাং উপনিষদ শব্দের অর্থ হচ্ছে **'নিচে এবং নিকটে বসা'**। একদল লোক শিক্ষকের নিকটে পবিত্র মতবাদসমূহ শেখার জন্য তাঁর নিকটে বসে। শ্যামকারার মতে, উপনিষদ শব্দটি **'ষদ'** শব্দমূল থেকে উৎকলিত। এর অর্থ ঢিলা করা. পৌঁছানো, কিংবা ধ্বংস করা। আর 'উপ' এবং **'নি'** এতে প্রত্যয় হিসেবে সংযুক্ত হয়েছে। সুতরাং উপনিষদ অর্থ হচ্ছে 'ব্রহ্ম জ্ঞান' যার দ্বারা অজ্ঞতাকে ধ্বংস করা হয়।

উপনিষদের সংখ্যা ২০০-এর বেশি। যদিও ভারতের ঐতিহ্যে এ সংখ্যা ১০৮ টি বলে ধরা হয়। প্রধান উপনিষদের সংখ্যা ১০ টি। যাহোক, কেউ কেউ এ সংখ্যাকে ১০-এর বেশি বলে মনে করেন। অন্যদের মতে, এ সংখ্যা ১৮ টি।

খ. **'বেদান্ত'** শব্দের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে উপনিষদ। যদিও বর্তমানে শব্দটি উপনিষদ ভিত্তিক দার্শনিক তত্ত্বের জন্য ব্যবহৃত হয়। শাব্দিকভাবে, বেদান্ত, অর্থ হচ্ছে বেদের পরিসমাপ্তি। উপনিষদ হচ্ছে বেদের পরিশিষ্ট অংশ এবং কালানুক্রমে তারা বৈদিক যুগের শেষে এসেছিলেন।

গ. কোনো কোনো পন্ডিতের মতে, বেদের চেয়ে উপনিষদ উৎকৃষ্টতর।

৩. ইতিহাস-মহাকাব্য

হিন্দুধর্মে দুটি ইতিহাস বা মহাকাব্য রয়েছে যাঁর নাম রামায়ণ এবং মহাভারত।

ক. রামায়ণ হচ্ছে একটি মহাকাব্য, যেটি রামের জীবন চরিত নিয়ে আলোচনা করে। অধিকাংশ হিন্দুই রামায়ণের কাহিনী সম্পর্কে অবহিত।

খ. মহাভারত হচ্ছে অন্য একটি মহাকাব্য, যেটি দুজন কাজিন অর্থাৎ পান্দাবাস এবং কাওরাবাসের মধ্যে দ্বন্দ্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছে। এটি কৃষ্ণের জীবন নিয়েও আলোচনা করেছে। অধিকাংশ হিন্দুই মহাকাব্য মহাভারতের কাহিনী সম্পর্কে কম-বেশি অবগত।

৪. ভগ্বদগীতা

ভগ্বদগীতা হিন্দুধর্ম গ্রন্থসমূহের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সর্বজন পরিচিত একটি ধর্মগ্রন্থ। এটি মহাকাব্য মহাভারতের একটি অংশমাত্র এবং এর বিশ্বপর্বের (২৫-৪৩) পর্ব অর্থাৎ ১৮ টি পর্ব দিয়ে রচিত। এটি কৃষ্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনকে যেসব উপদেশ দিয়েছিল তারই বর্ণনা মাত্র।

৫. পুরাণ

যথার্থতা বিচারে পরবর্তী ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে পুরাণ যেটি সবচেয়ে বেশি পঠিত ধর্মগ্রন্থ। **'পুরাণ'** শব্দের অর্থ হচ্ছে **'প্রাচীন'**। পুরাণে বিশ্ব সৃষ্টির ইতিহাস আর্য উপজাতির প্রাচীন ইতিহাস এবং হিন্দুধর্মের দেবতাদের জীবনেতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। পৌরাণিক গ্রন্থসমূহ বেদের ন্যায় অবতীর্ণ হওয়া বাণী। এটা বেদের সমসাময়িককালে অথবা বেদের নিকটবর্তী সময়ে অবতীর্ণ হওয়া বাণী। এটা বেদের সমসাময়িককালে অথবা বেদের বিকটবর্তী সময়ে অবতীর্ণ হয়েছিল। মহাশ্বেরী বৈশ্য পুরাণকে ১৮ টি খন্ডে বিভক্ত করেছেন। এসব খন্ডের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ভভৈষ্য পুরাণ। এটাকে এ ধরনের নামকরণের কারণ হলো, এতে ভবিষ্যতের ঘটনা সম্পর্কে সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে। হিন্দুরা ভভৈষ্য পুরাণের কথাকে প্রভুর কথা হিসেবে মনে করে। মহাশ্বেরী বৈশ্যকে এ বইয়ের নিছক সম্পাদক হিসেবে মনে করা হয়। আর এর প্রকৃত লেখক হলেন স্বয়ং প্রভু।

৬. অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ

এছাড়া আরো কিছু হিন্দু ধর্মগ্রন্থ রয়েছে যেমন : মনু এবং স্মৃতি ইত্যাদি।

৭. সবচেয়ে নির্ভেজাল হিন্দু ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে বেদ

হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে সবচেয়ে নির্ভেজাল হিসাবে বিবেচনা করা হয় বেদকে। অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থই বেদের যথার্থতাকে বাতিল করে দেয় না। হিন্দু পন্ডিতদের মতে, বেদের সাথে কোনো ধর্মগ্রন্থের বক্তব্যের বৈপরিত্য দেখা দিলে, বেদের কথাই প্রাধান্য পাবে। এভাবে আমরা ফিরিশতা এবং কিতাবের ধারণা সম্পর্কে ইসলাম এবং হিন্দুধর্মের গ্রন্থসমূহের বক্তব্যের মধ্যে মিল খুঁজে পাই। আলোচ্য বইয়ের পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা নবুয়ত, পরকাল, ভাগ্যলিপি এবং ইবাদতের ব্যাপারে ইসলাম এবং হিন্দুধর্মের মধ্যে যে মিল রয়েছে তা যাচাই করে দেখবো। এখন আমরা ইসলাম এবং হিন্দুধর্মের মধ্যে নবুয়ত এবং প্রভুর গুণাবলির ধারণার মধ্যে সমতা যাচাই করে দেখবো।

১০. ইসলাম এবং হিন্দুধর্মের আলোকে নবুয়তের ধারণা

ক. ইসলামের রাসূলের ধারণা

মহান আল্লাহর রাসূল এবং নবিগণ হচ্ছেন এমন সব ব্যক্তিবর্গ যাঁদেরকে সর্বশক্তিমান প্রভু তাঁর বাণী মানবজাতির নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য দূত হিসেবে মনোনীত করেছেন। প্রতিটি জাতির নিকটই রাসূল প্রেরিত হয়েছিল।

ক. আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের দশম সূরাহ, সূরাহয়ে ইউনূসের ৪৭ নং আয়াতে বলেছেন–

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاء رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ -

অর্থ : প্রতিটি জাতির জন্যই রাসূল প্রেরিত হয়েছিল। অতঃপর যখন তাদের রাসূল তাদের সামনে আসতেন তখন তাদের মধ্যকার বিষয়গুলোকে ন্যায়সঙ্গতভাবে ফয়সালা করে দিতেন। যাতে তাদের প্রতি জুলুম করা না হয়।

খ. আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের ১৬তম সূরাহ, সূরাহয় নাহলের ৩৬ নং আয়াতে বলেছেন–

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ -

অর্থ : প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমি অবশ্যই একজন নবী প্রেরণ করেছি। (তিনি ঐ জাতিকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন) তোমরা মহান আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুত তথা শয়তানের হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করো। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে মহান আল্লাহ অনেককে হেদায়াত দান করেছেন এবং অনেকের জন্য ভ্রষ্টতাকে নির্দিষ্ট হয়ে আছে। আর তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং মিথ্যাবাদীদের পরিণতি পর্যবেক্ষণ করো।

গ. মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের ৩৫ তম সূরাহ, সূরাহয় ফাতিরের ২৪ নং আয়াতে বলেছেন- وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خلَا فِيهَا نَذِيرٌ -

অর্থ : এমন কোনো উম্মত ছিল না যাদের মধ্যে একজন সতর্ককারী (নবী) প্রেরিত হয় নি।

ঘ. পবিত্র কুরআনের ১৩তম সূরাহ, সূরাহয় রাদের ৭ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– - وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ অর্থ : আর প্রত্যেক উম্মতের জন্যই একজন পথপ্রদর্শক (নবী) ছিলেন।

কয়েকজন নবীর নাম কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে

নবী আদম শাফীউল্লাহ আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা, নবী শীষ আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা, নবী ইদরীস আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা, নবী নূহ নাবীউল্লাহ আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা, নবী হুদ আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা, নবী সালেহ আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা, নবী ইবরাহীম খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা, নবী লুত আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা, নবী ইসমাইল জাবীউল্লাহ আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা, নবী ইসহাক আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা, নবী ইয়াকুব আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা, নবী ইউসুফ আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা, নবী শুয়াইব খতিবুল আম্বিয়া আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা, নবী মূসা কালিমুল্লাহ আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা, নবী দাউদ খলিফাতুল্লাহ আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা, নবী সোলায়মান আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা, নবী ইলিয়াস আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা, নবী ইল্ইয়াসা আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা, নবী আজিজ (উযাইর)

আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা (অনেকের মতে ইনি নবী ছিলেন না, লোকমান আলাইহিস সালামের মত একজন মহান আল্লাহর প্রিয়পাত্র ছিলেন), নবী আইউব আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা, নবী যুলকিফল আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা, নবী ইউনূস আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা, নবী যাকারিয়া আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা, নবী ইয়াহ্ইয়া আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা, নবী ঈসা রুহুল্লাহ আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মোহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা।

পবিত্র কুরআনে শুধু কয়েকজন নবীর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে

ক. পবিত্র কুরআনের ৪র্থ সূরাহ, সূরাহ নিসার ১৬৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيمًا -

অর্থঃ কতিপয় নবীর কাহিনী আমি ইতোপূর্বে আপনার নিকট বর্ণনা করেছি এবং কতিপয় নবীর কাহিনী আপনার নিকট বর্ণনা করি নি। আর মহান আল্লাহ স্বয়ং মূসা আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা-এর সাথে সরাসরি কথা বলেছেন।

খ. পবিত্র কুরআনের ৪০ তম সূরাহ, সূরাহ মুমিনের ৭৮ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন– وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ-

অর্থঃ আপনার পূর্বে আমি অনেক রাসূল ও নবী প্রেরণ করেছি। তাদের মধ্য থেকে আপনার নিকট অনেকের কাহিনী বর্ণনা করেছি এবং অনেকের কাহিনী আপনার নিকট বর্ণনা করি নি।

আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক ১ লাখ ২৪ হাজার নবী পাঠানো হয়েছে।

'মিশকাতুল মাসাবীহ' গ্রন্থের ৩য় খন্ডের ৫৭৩৭ নং হাদীসে এবং **'মাসনাদে আহমদ বিন হাম্বল'** গ্রন্থের ৫ম খন্ডের ২৬৫-২৬৬ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, 'আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক ১ লাখ ২৪ হাজার জন নবী প্রেরিত হয়েছেন।' (হাদীস জইফ)

পূর্ববর্তী নবীদেরকে কেবল স্বগোত্রীয় লোকদের নিকট পাঠানো হয়েছে।

মহানবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর পূর্বে যে সকল নবীর আগমন ঘটেছিল তাদের সবাই স্বগোত্রীয় এবং স্বজাতির লোকদের নিকটই প্রেরিত হয়েছিল এবং তাঁদের দ্বারা প্রচারিত বাণী কেবল ঐ নির্দিষ্ট সময়ের জন্যই প্রযোজ্য ছিল।

নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা হলেন সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ চূড়ান্ত রাসূল।

পবিত্র কুরআনের ৩৩ তম সূরাহ, সূরাহ আহযাবের ৪০ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا -

অর্থ : মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা তোমাদের মধ্য থেকে কোন পুরুষের পিতা নন এবং তিনি হলেন আল্লাহর রাসূল এবং নবীদের সীলমোহর (সর্বশেষ)। আর আল্লাহ তা'আলা সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত হয়েছেন।

ক. যেহেতু মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা ছিলেন সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ চূড়ান্ত আল্লাহর রাসূল তাই তিনি কেবল মুসলমানদের কিংবা আরবদের হেদায়াতের জন্য প্রেরিত হন নি। বরং তিনি সমগ্র দানব ও মানবজাতির হেদায়াতের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। পবিত্র কুরআনের ২১তম সূরাহ, সূরাহয়ে আম্বিয়ার ১০৭ নং আয়াতে এটা এভাবে বর্ণিত হয়েছে– وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ -

অর্থ : নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছি।

খ. পবিত্র কুরআনের ৩৪তম সূরাহ, সুরাহ সাবা-এর ২৯ নং আয়াতে আরো বর্ণিত হয়েছে **"অমা আরসাললাকা ইল্লা কাফ্ফাতাল লিন নাসি বাশীরাউ ও নাজিরাউ অলা কিন্না আকছারান্নাসি লা-ইয়া' লামুন"**

অর্থ : আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদানকারী এবং সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানে না।

গ. সহীহ্ বুখারীর ১ম খন্ড কিতাবুস সালাতের ৫৬তম অধ্যায়ের ৪২৯ নং হাদীসে বর্ণিত আছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন, 'প্রত্যেক নবীকেই তার স্বগোত্রীয় লোকদের হেদায়াতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে কিন্তু আমি মোহাম্মাদ সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত হয়েছি।'

ঘ. হিন্দুধর্মে অবতার এবং রাসূলের ধারণা

১. সাধারণ হিন্দুদের মতানুযায়ী 'অবতার'

ক. সাধারণ হিন্দুদের নিকট অবতারের ধারণাটি হলো, **'অবতার'** শব্দটি একটি সংস্কৃত পরিভাষা। এখানে **'অব'** অর্থ হচ্ছে **'নিচ'** এবং **'তার'** অর্থ হচ্ছে **'মুক্তি উৎসব'**। এভাবে **'অবতার'** অর্থ হচ্ছে নিচে অবতরণ করা বা নিচে নেমে আসা। অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে অবতারের অর্থ হচ্ছে-(হিন্দু ধর্মতত্ত্বে) ভূ-পৃষ্ঠে দেবতার অবতরণ বা পৃথিবীতে আত্মাকে শারীরিকরূপে মুক্তি দান করা। সাধারণ কথায়, সাধারণ হিন্দুদের মতানুযায়ী অবতার হচ্ছে সর্বশক্তিমান প্রভুর পৃথিবীতে শারীরিক অবয়বের রূপ ধারণ করে নেমে আসা।

একজন সাধারণ হিন্দু বিশ্বাস করে যে, সর্বশক্তিমান প্রভু শারীরিক রূপ ধারণ করে ধর্মকে রক্ষা করার জন্য এবং দৃষ্টান্ত স্থাপন করার বা মানবজাতির কল্যাণে বিধান জারি করার জন্য পৃথিবীতে নেমে আসেন। পবিত্র গ্রন্থ বেদের কোথাও **'অবতার'** সম্পর্কিত কোনো তথ্য নেই। যেমন: শ্রুতি। যাহোক : এটা স্মৃতি কথা পৌরাণিক গ্রন্থ এবং ইতিহাসের বইতে লেখা আছে।

খ. হিন্দুধর্মের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সর্বাধিক পঠিত বইতে অবতারের ধারণা পাওয়া যায় :

ক. ভগ্বদগীতার ৪র্থ অধ্যায়ের ৭-৮ নং ধারায় উল্লেখ আছে, 'হে ভারতবাসী' যখন সত্য অবলুপ্ত হবে এবং অসত্য মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করবো সত্যকে রক্ষার জন্য, দুষ্টকে ধ্বংস করার জন্য এবং সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। আমি প্রত্যেক যুগেই জন্মগ্রহণ করি।

খ. পুরাণের ৯ : ২৪ : ৫৬-তে উল্লেখ আছে, 'যখন সত্য বিলুপ্ত হবে এবং পাপাচার বেড়ে যাবে, মহিমান্বিত প্রভু তখন নিজেকে মনুষ্যরূপে আবির্ভূত করেন।

২. বেদ এবং ইসলামে অবতারের কোনো ধারণা নেই বরং আছে রাসূলের ধারণা

ইসলাম একথা বিশ্বাস করে না যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ মানুষের রূপ ধরে পৃথিবীতে আসেন। বরং তিনি মানুষের মধ্য থেকে একজনকে মনোনীত করেন এবং তাদের সাথে উচ্চ পর্যায় থেকে যোগাযোগ করা হয় যাতে তারা আল্লাহর বাণীকে মানবজাতির নিকট পৌঁছে দিতে পারেন আর এসব ব্যক্তিদেরকে বলা হয় প্রভুর দূত বা সংবাদবাহক। আর এ দূত বা সংবাদবাহকরাই হলেন নবী। **'অবতার'** সম্পর্কে ইতিপূর্বে যা আলোচিত হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে নিচে নেমে আসা বা নিচে অবতরণ করা। কিছু পন্ডিত বর্ণনা করেছেন যে, **'প্রভুর অবতরণ'** নির্দেশ করে যে, প্রকৃতপক্ষে একজন মানুষের আবির্ভাব যাঁর সাথে প্রভুর বিশেষ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। চার প্রকার বেদের বেশ কিছু জায়গায়ই প্রভুর সাথে মানুষের এ সম্পর্কের কথা বর্ণিত হয়েছে।এভাবে যদি আমরা সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ধর্মগ্রন্থ বেদের সাথে ভগ্বদগীতা এবং পুরাণের বক্তব্যকে তুলনা করে দেখি তাহলে আমরা ভগ্বদগীতা এবং পুরাণের সাথে ঐ বক্তব্যের সাথে একমত হবো যাতে **'অবতার'** বলতে প্রভু কর্তৃক মানুষের মনোনয়নকে বুঝানো হয়েছে। ইসলামে এ ধরনের মানুষকে নবী হিসেবে আখ্যায়িত করে।

১১. প্রভুর গুণাবলি

প্রাণী বা বস্তুতে নরত্ব আরোপ সম্পর্কিত

ক. প্রভুর মানুষকে বোঝানোর জন্য মানবীয় রূপ ধারণ করার দরকার হয় না

এক সময় অনেক অ-সেমিটীয় ধর্ম ছিল কিংবা অন্যান্য ধর্মও প্রাণী বা বস্তুতে নরত্ব আরোপ সম্পর্কিত দর্শনে বিশ্বাসী ছিল। যেমন : প্রভুর মানবীয় রূপ ধারণ করার ধারণা। যারা এতে বিশ্বাসী তাদের পক্ষে সাধারণ যুক্তি রয়েছে। তারা বলেন যে, সর্বশক্তিমান প্রভু এতোই নির্ভেজাল এবং পবিত্র যে, তিনি মানুষের কঠোরতা, ব্যর্থতা, দুর্বলতা, অনুভূতি, আবেগ এবং লোভ সম্পর্কে অনবহিত। তিনি জানেন না কীভাবে একজন লোক আহত কিংবা সমস্যাগ্রস্ত অবস্থায় তার অনুভূতি প্রকাশ করে। সুতরাং মানুষের আচরণ বা ব্যবহারকে শাসন করার জন্য প্রভু পৃথিবীতে মানুষের রূপে নেমে আসেন। এ

যুক্তির কারণে এটাকে খুবই যৌক্তিক মনে হতে পারে। কিন্তু আমাদের এটা যাচাই করা উচিত।

খ. সৃষ্টিকর্তা একটি নির্দেশনামূলক পুস্তিকা প্রস্তুত করেছেন

মনে করুন, আমি একটি টেপ রেকর্ডার উৎপাদন করি। এখন আমার কি টেপ রেকর্ডার হওয়া প্রয়োজন এই জন্য যে, কোনটি ভালো বা মন্দ টেপ রেকর্ডার তা জানার জন্য ? উৎপাদকের কখনোই নিজেকে একটি টেপ রেকর্ডারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না একথা বুঝার জন্য যে, সাধারণ ব্যবহার বা ভুল ব্যবহারের কারণে টেপ রেকর্ডারের কী কী অসুবিধা হচ্ছে। সুতরাং উৎপাদনকারী হিসেবে ব্যবহারকারীর জন্য আমি একটি নির্দেশিকা পুস্তিকা লিখে দিব। এ পুস্তিকায় আমি বলব, "একটি অডিও ক্যাসেট শোনার জন্য, একটি ক্যাসেট প্রবেশ করান এবং 'প্লে' চিহ্নিত বাটনে চাপ দিন। আবার বন্ধ করার জন্য, **'স্টপ'** চিহ্নিত বোতামে চাপ দিন। যদি আপনি দ্রুত সামনে যেতে চান তাহলে 'ফাস্ট ফরওয়ার্ড' বোতামে চাপ দিন। এটিকে অতি উষ্ণ জায়গায় রাখবেন না তাহলে এটা ধ্বংস হয়ে যাবে। এটাকে পানিতে ডোবাবেন না, তাহলে এটি অকেজো হয়ে যাবে। উৎপাদনকারী একটি নির্দেশনা পুস্তিকা অথবা ব্যবহারকারীর পুস্তিকা লিখবেন যেটিতে ঐ যন্ত্রের ব্যবহারের জন্য করণীয় বা বর্জনীয় কাজ লেখা থাকবে।

গ. মহিমান্বিত কুরআন মানুষের জন্য নির্দেশনা পুস্তিকা

একইভাবে আমাদের প্রভু এবং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে মানুষের জন্য কোন্‌টি ভালো এবং কোন্‌টি মন্দ তা জানার জন্য মানুষের রূপ ধরে আগমনের প্রয়োজন পড়ে না। তিনিই সেই সত্তা, যিনি এ বিশাল জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাঁর নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন। তাঁর কেবল কর্তব্য হচ্ছে মানুষের কল্যাণের জন্য নির্দেশিকা পুস্তিকা অবতীর্ণ করা। এ ধরনের পুস্তিকা সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে নিচের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করবে :

(ক) মানুষের বেঁচে থাকার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (খ) কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে (গ) চিরন্তন সফলতা লাভের জন্য তাদের কী করা উচিত এবং কী ধরনের কাজ থেকে তাদের বিরত থাকা উচিত? সৃষ্টিকর্তার পক্ষ হতে মানবজাতির জন্য সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত নির্দেশিকা পুস্তিকা হচ্ছে মহিমান্বিত আল-কোরআন।

ঘ. আল্লাহ তা'আলা রাসূলদেরকে মনোনীত করেন

মহান আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিকা পুস্তিকা লেখার জন্য ব্যক্তিগতভাবে নেমে আসার প্রয়োজন হয় না। তিনি মানুষের মধ্য থেকে একজন মানুষকে মনোনীত করেন এবং তার সাথে কিতাবের মাধ্যমে উচ্চ পর্যায়ের যোগাযোগ রক্ষা করেন। এ ধরনের মনোনীত লোকদেরকে বলা হয় প্রভুর নবী বা সংস্কারক। প্রভু এ ধরনের লোকদের নিকট তার মতামত কিতাবের মাধ্যমে জানিয়ে দেন।

প্রভু মানুষের রূপ ধরেন নি বা ধরবেন না

ক. প্রভু সবকিছু করতে পারেন না

কিছু কিছু লোক বলেন যে, প্রভু সবকিছু করতে পারেন তাহলে তিনি কেন মানুষের রূপ ধরতে পারবেন না? যদি প্রভু মানুষের রূপ ধারণ করেন তখন তিনি আর প্রভু থাকেন না। কারণ, মানুষের গুণাবলি এবং প্রভুর গুণাবলি সম্পূর্ণ আলাদা।

১. প্রভু অমর, মানুষ হচ্ছে মরণশীল। আপনি একজন 'প্রভুমানব' হতে পারেন না। উদাহরণস্বরূপ, একজন অমর এবং একজন মরণশীল একই সময়ে দুটি গুণের অধিকারী হতে পারেন না। এটা নিঃসন্দেহে অর্থহীন। প্রভুর কোনো শুরু নেই। কিন্তু মানব জীবনের শুরু আছে। আপনি এমন একজন ব্যক্তি হতে পারেন না যার শুরু নেই এবং একই সময়ে যার শুরু আছে। প্রভুর কোনো শেষ নেই। মানব জীবনের শেষ আছে। আপনি একই সময়ে এমন দুটি গুণের অধিকারী হতে পারেন না যাদের মধ্য থেকে একজনের শেষ নেই এবং অন্যজনের শেষ আছে। এটা অর্থহীন।

২. প্রভুর খাওয়ার প্রয়োজন হয় না

সর্বশক্তিমান প্রভুর খাওয়ার প্রয়োজন হয় না। মানুষের খাওয়ার প্রয়োজন হয়। মহিমান্বিত আল-কোরআনের সূরাহ আনআমের ১৪ নং আয়াতে বলেছেন– وَهُوَ يُطْعِمُ وَلاَ يُطْعَمُ -

অর্থঃ আর তিনি সেই সত্তা যিনি খাওয়ান, কিন্তু তাঁকে খেতে হয় না।

৩. প্রভুর বিশ্রাম এবং ঘুমের প্রয়োজন হয় না

প্রভুর বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না। মানুষের বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। প্রভুর ঘুমের প্রয়োজন হয় না। মানুষের ঘুমের প্রয়োজন হয়। পবিত্র আল-কোরআনের সূরাহ বাকারার ২৫৫ নং আয়াতে বলেছেন–

اللَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ -

আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুঅল হাউউল কাইউম লা তাহ্ খুজুহু সিনাতুউ অলা নাউমুন, লাহু মাফিস সামাঅতি অমা ফিল আরজ

অর্থঃ মহিমান্বিত আল্লাহ। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো হক্ব মা'বুদ নেই। তিনি চিরস্থায়ী এবং চিরঞ্জীব। তন্দ্রা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না এবং ঘুমও। ভূ-মন্ডল এবং নভোমন্ডলে যা কিছু আছে সবই তাঁর।

খ. অন্য মানুষের উপাসনা করা একটি পাপের কাজ

যদি প্রভু মানুষের রূপ ধারণ করেন, তাহলে তার প্রভু হওয়া থেকে বিরত হওয়া উচিত এবং একজন মানুষের উপাসনা করার মধ্যে কোনো উপকার নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মনে করুন, আমি একজন অত্যন্ত বুদ্ধিমান শিক্ষকের ছাত্র এবং আমি নিয়মিতভাবে তাঁর নির্দেশনা এবং পড়াশুনায় তার সহযোগিতা গ্রহণ করি। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার শিক্ষক দুর্ঘটনায় পতিত হলেন এবং তাঁর স্মৃতি বিলোপ হয়ে গেল। অর্থাৎ তাঁর স্মৃতি এমনভাবে হারিয়ে গেল যা আর উদ্ধার করা সম্ভব নয়। এখন পড়াশুনার ক্ষেত্রে ঐ শিক্ষকের নির্দেশনা কিংবা সহযোগিতা চাওয়া আমার জন্য বোকামি ছাড়া অন্য কিছু হবে না। কারণ, ঐ শিক্ষক দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার পর যখন তার স্মৃতিলোপ পেয়েছে তখন তিনি আর পড়াশুনার নির্দেশনা প্রদানে বিশেষজ্ঞ নন। একইভাবে, কীভাবে একজন মানুষ এমন একজন প্রভুর উপাসনা করতে পারে এবং তাঁর নিকট স্বর্গ প্রার্থনা করতে পারে যে তাঁর স্বর্গীয় যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে এবং নিজেকে আপনার এবং আমার মতো মানুষে রূপান্তরিত করেছে? যদি একজন মানুষ একজন মানুষের উপাসনা করে তাহলে কেন অন্য লোকেরা আপনার এবং আপনার পাশে অন্যান্য লোকের উপাসনা করতে পারবে না?

গ. মানুষ প্রভু হতে পারে না

সুতরাং অস্তিত্ব আছে এমন কোনো জীব একই সময় প্রভু এবং মানুষ উভয় হতে পারে না। যদি প্রভু তাঁর ঐশ্বরীয় শক্তি প্রদর্শন করেন তাহলে তিনি

আর মানুষ হতে পারেন না। কারণ, মানুষের ঐশ্বরীয় শক্তি থাকে না। আবার যদি প্রভু মরণশীল হন যেটা প্রকৃতপক্ষে মানুষের গুণ, তাহলে তিনি আর প্রভু থাকেন না। কারণ, প্রভু হলেন অমর। এছাড়া একই মানুষ প্রভু হতে পারে না। কারণ, মানুষের জন্য প্রভু হওয়া সম্ভব নয়। যদি এরূপ হওয়া সম্ভবই হয়- তাহলে আপনি এবং আমিও প্রভু হতে পারতাম এবং ঐশ্বরীয় শক্তির অধিকারী হতে পারতাম। এ কারণেই প্রভু কখনো মানুষের রূপ ধারণ করবেন না অথবা মানুষের রূপ ধারণ করতে পারেন না। পবিত্র কুরআন প্রভুর মানুষের রূপ ধারণ করা সম্পর্কিত ধারণার বিপরীত বক্তব্যের সমর্থক। প্রভুর মানুষের রূপ ধারণ করা সম্পর্কিত ধারণা অযৌক্তিক।

ঘ. প্রভু অপ্রভুচিত কোনো কাজ করবেন না

ইসলাম এ কথা বলে না যে, প্রভু যে কোনো ধরনের কাজ করতে পারেন। বরং ইসলাম বলে যে, প্রভুর সমগ্র বস্তুর ওপর ক্ষমতা রয়েছে। কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে আমরা বুঝতে চাই যে, প্রভু সাধারণ সব কাজ করতে পারেন। কারণ তিনি স্বর্গীয় গুণাবলির অধিকারী।

(ক) প্রভু কখনো মিথ্যা কথা বলেন না

প্রভু কেবল প্রভুচিত কাজই করেন। তিনি অপ্রভুচিত কোনো কাজ করেন না। প্রভু মিথ্যা বলতে পারেন না। এমনকি মিথ্যা বলার কিংবা বিবৃতি প্রদানের ইচ্ছেও তিনি করতে পারেন না। প্রভু কখনোই মিথ্যা বলতে পারেন না। কারণ মিথ্যা বলা অপ্রভুচিত কাজ। প্রভু যে মুহূর্তে মিথ্যা কথা বলেন, তখন তাঁর প্রভুত্ব বাতিল হয়ে যাবে।

(খ) প্রভু কোনো অবিচার করবেন না

প্রভু অবিচার করতে পারেন না কিংবা কোনো অন্যায় কাজ বা অন্যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ইচ্ছেও করতে পারেন না। তিনি এ ধরনের কাজ করবেন না এবং এ ধরনের কাজ তিনি করতে পারেন না কারণ অন্যায়কারী বা অবিচারকারী হওয়া অপ্রভুচিত কাজ। পবিত্র কুরআন ৪র্থ সূরাহ, নিসার ৪০ নং আয়াতে বলেছে– - إِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

অর্থঃ মহান আল্লাহ কখনোই সামান্য পরিমাণও অবিচার করেন না।

যে মুহূর্তে প্রভু অন্যায় কাজ করেন তখন তাঁর প্রভুত্ব বাতিল হয়ে যায়। অনুগ্রহ করে চিন্তা করুন যে, প্রভু একই সময়ে প্রভূ হতে এবং প্রভু না

হতে পারেন না। তিনি সৃষ্টিকর্তা হিসেবে ঐশ্বরীয় গুণাবলির এবং অমরতার গুণাবলি আর তাঁর সৃষ্টির এসব গুণাবলির অধিকারী হতে পারেন না বা হতে পারেন এটা কীভাবে সম্ভব?

(গ) প্রভু ভুল করতে পারবেন না

পরিপূর্ণতা কেবল সৃষ্টিকর্তার গুণ। তাঁর সৃষ্টি কখনো এ গুণের অধিকারী হতে পারে না। আমরা শুধু ধারাবাহিকভাবে উন্নতির চেষ্টা করতে পারি কিন্তু কখনোই পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পারি না।

সুতরাং প্রভু কি কখনো ভুল করতে পারেন? তিনি কখনো ভুল করতে পারবেন না। ভুল করা মানুষের স্বভাব। ভুল করা অপ্রভুচিত কাজ। পবিত্র কুরআনে ২০ তম সূরাহ, সূরাহয় ত্বহার ৫২ নং আয়াতে বলেছে–

قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى -

অর্থঃ আমার প্রভু ভূল করেন না এবং বিস্মৃতও হন না। গ্রহণ না করে শুধু কল্পনা করে দেখুন যে, প্রভু যদি ভুল করার প্রতিশ্রুতি দিতেন, তাহলে প্রভু যখন ভুল করতেন তখনই তিনি আর প্রভু থাকতেন না।

(ঘ) প্রভু ভুলে যাবেন না

প্রভু ভুলে যাবেন না কারণ ভুলে যাওয়া অপ্রভুচিত কাজ। পবিত্র কুরআনের ২০তম সূরাহ, সূরাহয় ত্বহার ৫২নং আয়াতে বলেছেন–

لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى -

অর্থ: আমার প্রভু ভুল করেন না এবং ভুলে যান না।

যে মুহূর্তে প্রভু ভুলে যান তখন তিনি আর প্রভু থাকেন না।

(ঙ) প্রভু শুধু প্রভুচিত কাজই করেন

১. সমগ্র বস্তুর ওপরই মহান আল্লাহর ক্ষমতা রয়েছে

পবিত্র কুরআন বেশ কয়েকটি জায়গায় বলেছে। যেমন, ২য় সূরাহ সূরাহয় বাকারার ১০৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে– - أَنَّ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

অর্থঃ নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ সমগ্র বস্তুর ওপর ক্ষমতা রাখেন।

এই একটি বর্ণনা আমাদের বোধোদয়ের জন্য নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে জোর দিয়ে বলা হয়েছে–

১. সূরাহ বাকারার ১০৯ নং আয়াত

২. সূরাহ বাকারার ২৮৪ নং আয়াত

৩. সূরাহ আলে ইমরানের-এর ২৯ নং আয়াত

৪. সূরাহ নাহল-এর ৭৭ নং আয়াত

৫. সূরাহ ফাতির-এর ১ নং আয়াত

২. মহান আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন তাই করতে পারেন

মহিমান্বিত কুরআনের ৮৫ তম সূরাহ সূরাহতুল বুরুজের ১৬ নং আয়াতে বলেছে– - فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ অর্থাৎ **'মহান আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন তাই করতে পারেন।'** এখন, আমি নিশ্চিত যে, আপনি নিজে একথা বিনয় এবং বিশ্বস্ততার সাথে স্বীকার করবেন যে, প্রভু কেবল প্রভুচিত বিষয়েরই ইচ্ছে পোষণ করেন অপ্রভুচিত বিষয়ের তিনি ইচ্ছে পোষণ করেন না। মানুষের জন্য আরোপীয় গুণাবলি যেমন, ভুলে যাওয়া, ভুল করা, দুর্বলতা অনুভব করা, খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা, ঈর্ষা এবং পছন্দ করা-ইত্যাদি গুণ মহান আল্লাহর জন্য আরোপ করার মাধ্যমে কেউ যেন তার প্রভুকে উপহাস করল এবং এ ঠাট্টায় মেতে ওঠল। আপনি কি চিন্তা করতে পারেন আমরা মানুষেরা কীভাবে মানুষের এসব গুণকে প্রভুর জন্য সাব্যস্ত করে তাঁর প্রতি ন্যায় বিচার করে থাকি? তাই এটা কি কোনো ভালো পছন্দ এবং সত্যিকার যাচাই নয় যে, আমাদের প্রভু এ ধরনের যাবতীয় ত্রুটি যা অজ্ঞ মানুষরা তাঁর প্রতি আরোপ করে থাকে তা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ? এজন্য মহিমান্বিত কুরআনের ৫৯তম সূরাহ, সূরাহয় হাশরের ২৩ নং আয়াতে বলেছে– - سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ **অর্থঃ** হে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলুন, মুশরিকরা যে বিষয় মহান আল্লাহর প্রতি আরোপ করে থাকে তা থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। **(ডাঃ জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, মনিমুক্তা -১/২৫৫-২৮৭)**

ঈমানের শাখা প্রশাখা

ঈমান হচ্ছে এমন বীজের ন্যায়, যার থেকে জন্ম নিয়েছে এক মজবুত শক্তিশালী গাছ, যে গাছের শিকড় মজবুত ভাবে আঁকড়ে ধরেছে জমীনের গভীরতাকে। আর সুবিস্তৃতভাবে উর্ধ্বাকাশে প্রসারিত করেছে ব্যাপক শাখা-প্রশাখা। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء - تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ -

অর্থাৎ "আলামতারা কাইফা জারাবাল্লাহু মাছালান কালিমাতান তাইয়্যিবাতান কাছারাতিন তৈয়্যিবাতিন আসলুহা ছাবিতুন ওয়া ফার উহা ফিস সামায়ী তুউতি উকুলাহা কুল্লা হিনীন বিইযনী রাব্বিহা ওয়া ইয়াজ রিবুল্লাহুল আমছালা লিন্ নাছি লায়াল্লাহুম ইয়াতাজাক্কারুন অর্থাৎ তুমি কি লক্ষ্য কর না, মহান আল্লাহ তা'আলা কেমন উপমা বর্ণনা করেছেন ঃ পবিত্র বাক্য (কালেমা তৈয়েবা) হলো পবিত্র বৃক্ষের মত। তাঁর শিকড় মজবুত এবং শাখা আকাশে উত্থিত। সে পালনকর্তার নির্দেশে অহরহ ফল দান করে। মহান আল্লাহ মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন- যাতে তাঁরা চিন্তা ভাবনা করে। (ইবরাহীম– ২৪-২৫)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন ঃ পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত পবিত্র বৃক্ষ হচ্ছে খেজুর গাছ এবং অপবিত্র বৃক্ষ হচ্ছে হান্যল তথা মাকাল বৃক্ষ। (মাযহারী, তিরমিযী, নাসায়ী ও অন্যান্য)

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ একদিন আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। জনৈক ব্যক্তি তার কাছে খেজুর বৃক্ষের শাস নিয়ে এল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা সাহাবায়ে কেরামকে একটি প্রশ্ন করলেন ঃ বৃক্ষ সমূহের মধ্যে একটি বৃক্ষ হচ্ছে মরদে- মুমিনের দৃষ্টান্ত। বল, এ কোন বৃক্ষ ? ইবনে উমর বলেন ঃ আমার মনে চাইল যে বলে দেই- খেজুর বৃক্ষ। কিন্তু মজলিসে আবু বকর, উমর ও অন্যান্য প্রধান প্রধান সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তাদেরকে নিশ্চুপ দেখে আমি বলার সাহস পেলাম না। এরপর স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বললেন ঃ এ হচ্ছে খেজুর বৃক্ষ। (মুসনাদে আহমাদ)

এ বৃক্ষ দ্বারা মুমিনের দৃষ্টান্ত দেয়ার কারন এই যে, কালিমায়ে তাইয়্যিবার মধ্যে ঈমান হচ্ছে মজবুত ও অনড় শিকড় বিশিষ্ট, দুনিয়ার বিপদাপদ একে টলাতে পারে না। কামেল মুমিন সাহাবী ও তাবেয়ী, বরং প্রতি যুগের খাঁটি মুসলমানের এমন দৃষ্টান্তবিরল নয়, যারা ঈমানের মোকাবেলায় জান, মাল ও কোন কিছুর পরওয়া করেন নি। দ্বিতীয় কারন তাঁদের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা। তারা দুনিয়ার নোংরামী থেকে সব সময় দূরে সরে থাকেন, যেমন ভূ-পৃষ্ঠের ময়লা আবর্জনা উচুঁ বৃক্ষকে স্পর্স করতে পারে না। তৃতীয় গুণ হচ্ছে। খেজুর বৃক্ষের শাখা যেমন আকাশের দিকে উচ্চে ধাবমান, মুমিনের ঈমানের ফলাফলও অর্থাৎ সৎকর্মও আকাশের দিকে উত্থিত হয়। কারণ পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"ইলাইহি ইয়াসআদুল কালিমুত তাইয়্যিবা অর্থাৎ পবিত্র বাক্যাবলী, মহান আল্লাহর যেসব যিকির, তাসবীহ তাহলীল, তেলাওয়াতে পবিত্র কুরআন ইত্যাদি করে, সেগুলো সকাল বিকাল মহান আল্লাহর কাছে পৌঁছতে থাকে।

অতএব ঈমানের বীজ থেকে জন্ম নিয়েছে এই যে গাছ, এর শাখা প্রশাখা গুলো হচ্ছে ঈমানেরই অংগ-প্রত্যংগ। এ জন্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন ঃ ঈমানের সত্তরটিরও অধিক শাখা রয়েছে, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ (মূল) হলো এটি ঘোষণা দেয়া যে, **"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ অর্থাৎ মহান আল্লাহ ছাড়া কোন হক্ব ইলাহ নাই।"** নিম্নতমটি হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক (ইট, পাথর, কাটা) জিনিস অপসারিত করা এবং লজ্জাশীলতাও ঈমানের একটি শাখা। (বুখারী, মুসলিম)

অপর একটি হাদীসে বলা হয়েছে- ঈমানের ষাটের অধিক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। আমার মনে হয় এরূপ সংখ্যার ব্যবহার দ্বারা ঈমানের শাখা প্রশাখার আধিক্য বুঝানো হয়েছে। শাইখ রাগিব আত্ তাবাখ বলেছেন, মূলত ঈমানের এই শাখা প্রশাখা সমূহই গোটা হাদীসে নববীর বিষয়বস্তু। অর্থাৎ এ বিষয়গুলো নিয়েই হাদীসের যাবতীয় আলোচনা। বুখারীর খ্যাতনামা ব্যাখ্যাদাতা হাফিজে হাদীস শাইখ ইবনে হাজার আসকালানী রহিমাহুল্লাহ তাঁর রচিত বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফতহুল বারীতে বলেছেন ঃ

ঈমানের শাখাসমূহ মানুষের দিল, জবান এবং শারীরিক আমলসমূহের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। অতঃপর তিনি পবিত্র কুরআন হাদীসের আলোকে এগুলোর একটা তালিকা পেশ করেছেন। আমরা তাঁর গ্রন্থের আলোকে ঈমানের শাখা প্রশাখাসমূহ নিম্নে উল্লেখ করছি।

(ক) অন্তরের ঈমানী আমল সমূহ

মন বা অন্তর্গত ঈমানী আমলসমূহের মধ্যে মানুষের আক্বীদাহ বিশ্বাস, লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা আকাংখা শামিল রয়েছে। এগুলো নিম্নরূপ ঃ

(১) মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান অর্থাৎ মহান আল্লাহর যাত সিফাত ও তাওহীদের প্রতি ঈমান আনা। তাঁর সংগে কাউকেও শরীক না মানা এবং কাউকে তার সমকক্ষ না মানা।
(২) মহান আল্লাহর ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান।
(৩) পবিত্র কুরআন ও কুরআনের পূর্বেকার মহান আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান।
(৪) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এর রিসালাত এবং তার পূর্বেকার নবী রাসূলগণের প্রতি ঈমান।
(৫) তাকদীরের ভাল মন্দের প্রতি ঈমান।
(৬) আখিরাতের প্রতি ঈমান। এর মধ্যে রয়েছে কবরের সওয়াল জওয়াব, পুনরুত্থান, হাশর, মীযান, পুলসীরাত, জান্নাত ও জাহান্নাম ইত্যাদি।
(৭) মহান আল্লাহর মহব্বত (হুববুল্লাহ)
(৮) মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অপরের প্রতি মহব্বত (হুব্বুন ফিল্লাহ)
(৯) মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কারো সাথে শত্রুতা করা।
(১০) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা পাকের মুহাব্বত।
(১১) নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা কে শ্রেষ্ঠ জানা এবং উসওয়ায়ে হাসানা বলে মানা।
(১২) ইখলাছ বা আন্তরিকতা ও এক নিষ্ঠতা।
(১৩) তাওবা।
(১৪) মহান আল্লাহর ভয়।
(১৫) মহান আল্লাহর রহমতের আশা।
(১৬) কৃতজ্ঞতা (শোকর)
(১৭) আনুগত্য।
(১৮) সবর।
(১৯) মহান আল্লাহর ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্টি।

(২০) তাওয়াক্কুল।
(২১) সহানুভূতি, দয়া, করুনা।
(২২) বিনয়, বড়দের প্রতি সম্মান, ছোটদের প্রতি স্নেহ, অহংকার বর্জন, নিজ মতকে অগ্রাধিকার না দেওয়া এবং হিংসা থেকেও দূরে থাকাও বিনয়ের অন্তর্ভুক্ত।

(খ) জবানী বা মৌখিক ঈমানী আমল সমূহ ঃ

এ পর্যায়ে সাতটি আমল রয়েছে।

(১) তাওহীদের মৌখিক স্বীকৃতি।
(২) পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত।
(৩) ইলম অর্জন।
(৪) শিক্ষা দান।
(৫) দু'আ।
(৭) জিকর ও ইসতিগফার।
(৮) বাজে, অশ্লীল ও মিথ্যা কথা থেকে বিরত থাকা।

(গ) দৈহিক ঈমানী আমল সমূহ ঃ

দৈহিক ঈমানী আমল আটত্রিশটি (৩৮টি)। এর মধ্যে পনেরটি ব্যক্তিগত জীবনের সংগে সম্পর্কিত। ছয়টি পারিবারিক ও বংশীয় জীবনের সাথে সম্পর্কিত এবং সতেরটি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সাথে সম্পর্কিত।

ব্যক্তিগত জীবন ঃ

(১) মানসিক ও শারিরীক পবিত্রতা।
(২) গোপন অংগ সমূহ ঢেকে রাখা।
(৩) ফরজ ও নফল সলাত।
(৪) যাকাত এবং অন্যান্য দান সাদাকা।
(৫) ক্রীতদাস মুক্ত করা।
(৬) বদান্যতা। ফকীর মিসকিনদের খাওয়ানো এবং মেহমানদারী এর অন্তর্ভুক্ত।
(৭) ফরজ ও নফল সিয়াম।
(৮) হাজ্জ এবং উমরা।
(৯) কাবা তওয়াফ।

(১০) ইতেকাফ।
(১১) লায়লাতুল কদর খোঁজার উদ্দেশ্যে শবে বেদারী।
(১২) স্বীয় দ্বীনের হিফাজত এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে হিজরাত।
(১৩) মান্নত পূর্ণ করা।
(১৪) নিখাদ ঈমান প্রমাণের চেষ্টা সাধনা করে যাওয়া।
(১৫) কাফফারা আদায় করা।

পারিবারিক জীবনে ঃ

(১) বিবাহ শাদী করে পূতপবিত্র জীবন যাপন।
(২) স্ত্রী ও সন্তান সন্ততির হক আদায় করা।
(৩) পিতা মাতার সংগে নেক ও সম্মানজনক আচরণ করা। তাদের নাফরমানী না করা এবং সন্তানদের সুশিক্ষা দান।
(৪) আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখা।
(৫) নেককার ও সালেহ মুরুব্বী লোকদের মান্য করা।
(৬) চাকর ও চাকরানীদের সাথে কোমল আচরণ করা।

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ঃ

১. ইনসাফ ভিত্তিক শাসন।
২. জামাআতের অন্তর্ভুক্ত থাকা।
৩. উলুল আমর এর আনুগত্য।
৪. মানুষের সংশোধনের কাজ। এর মধ্যে রয়েছে পারস্পারিক মত বিরোধ দূর করনের কাজে পরস্পরের সহযোগীতা করা, ভ্রাতৃত্ব, জনগণের সংশোধন এবং আমর বিল মারুফ ও নেহী আনিল মুনকার।
৫. ইসলামী আইন ও দন্ড কার্যকর করা।
৬. জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ।
৭. আমানত ও করয সময় মত ফিরিয়ে দেয়া।
৮. প্রতিবেশীদের সাথে সুসম্পর্ক ও সদাচার।
৯. উত্তম লেনদেন ও পারস্পরিক সু সম্পর্ক।
১০. হালাল উপার্জন।
১১. যেখানে খরচ করা কর্তব্য সেখানে খরচ করা।
১২. অপব্যয় না করা।

১৩. সালাম দেয়া এবং সালামের জওয়াব দেয়া।
১৪. যে হাঁচি দেয় তার আলহামদুলিল্লার জবাবে ইয়ার হামুকাল্লাহ বলা।
১৫. মানুষকে দুঃখ কষ্ট দেয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করা।
১৬. বাজে ও বেহুদা কাজ থেকে দূরে থাকা।
১৭. জনপথ থেকে মানুষকে কষ্টদায়ক জিনিস (কাঁটা, ইট, পাথর, ডালপালা, কলার ছোবলা ইত্যাদি) অপসারণ করা।

ঈমানের যে সব কাজ অন্তরের (দেলের) দ্বারা সমাধা হয় তার বিবরণ ঃ

মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান ঃ ঈমান বিল্লাহ

'উসূলুস-সালাসাহ' একটি যৌগিক পরিভাষা। উসূল (আল উসুলু) শব্দটি বহুবচন, এর একবচন হলো 'আসল' (আসলুন) শব্দের অর্থ ভিত্তি, মূল, নিয়ম কানুন, foundation ইত্যাদি এবং সালাসাহ (আস-সালাসাহ) অর্থ তিন, তিনটি। অর্থাৎ আল- উসূল আস-সালাসাহ (আল উসুলুস সালাসাহ) বলতে বুঝায় তিনটি মূলনীতি।

দুনিয়ার জীবন শেষে পারলৌকিক জীবনের সূচনাতে মহান আল্লাহ প্রত্যেকের জন্য একটি পরীক্ষা রেখেছেন। যে পরিক্ষায় প্রশ্ন হবে তিনটি (অন্য বর্ণনায় চারটির কথা বলা হয়েছে)। এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর প্রদানের উপর একজন ব্যক্তির পারলৌকিক জীবনের সফলতা বা ব্যর্থতা নির্ভর করে। এ দুনিয়ার হাজারো পরীক্ষার সাথে এ পরীক্ষাটির কিছু পৃথক বৈশিষ্ট্যের কারণে পরীক্ষাটি অনন্য ও তাৎপর্যপূর্ন হয়ে আছে। উদাহরণস্বরূপ- (১) এ পরীক্ষাটি দু'বার হবে না। (২) এ পরীক্ষাটিতে ব্যক্তির উত্তরের মানোন্নয়নের বা পুনঃসংশোধনের সুযোগ নেই। (৩) পরীক্ষায় বহুনির্বাচনী অথবা বিকল্প প্রশ্ন থাকবে না। (৪) সবগুলো প্রশ্নের উত্তর বাধ্যতামূলক দিতে হবে। (৫) প্রতিটি প্রশ্ন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

এবার আলোচনা করবো সেসব প্রশ্নগুলো ও সেগুলো থেকে নির্গত উসুলসমূহ নিয়ে, যে গুলোর উপর কিনা নির্ভর করছে আমাদের পারলৌকিক মুক্তি।

প্রথমেই কবরের **প্রথম প্রশ্ন 'মান রব্বুকা- তোমার প্রভু কে?** আর এই প্রশ্নের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা উসূল হলো **মা'রিফাতুর রব।** সুতরাং একজন মুমিন মৃত্যু পর্যন্ত পড়াশোনা, ইল্‌ম, আমল, দাওয়াত ও সবরের

মাধ্যমে তার প্রতিপালকের সন্ধান করবে, তাকে চিনবে, জানবে এবং তার সাথে আপন সম্পর্ক স্থাপন করবে। আর এ কাজ গুলো করার মাধ্যমে অর্জিত হবে মা'রিফাতুর রব অর্থাৎ ঈমানের প্রথম উসূল।

কবরের দ্বিতীয় প্রশ্ন 'ওয়ামা-দীনুকা দ্বীন তোমার কি? এই প্রশ্নের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা উসূল হলো **মা'রিফাতুত দীন**। একজন মুমিন মৃত্যু পর্যন্ত দীনের জ্ঞান অর্জন করবে, দীনের উপর আমল করবে, দীনের দাওয়াত দিবে, দীনের উপর সবর করবে এবং এসবের মাধ্যমে অর্জিত হবে ঈমানের দ্বিতীয় উসূল অর্থাৎ **মা'রিফাতুত দীন**।

কবরের তৃতীয় প্রশ্ন হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা অনুসারে এ প্রশ্নটি দু'রকম হতে পারে।

এক. 'ওয়ামান নাবীয়্যুকা' তোমার নবী কে?

দুই. 'মা হাযার রাজুলু' এই ব্যক্তি কে?

তবে দুটি প্রশ্নেরই উদ্দেশ্য একমুখী বা একই এবং উত্তরও একটি বা একই। আর এই প্রশ্নের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা উসূল হলো **মা'রিফাতুন নবী** সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা। একজন মুমিন মৃত্যু পর্যন্ত সুন্নাতে নববীর জ্ঞান অর্জন করবে, সুন্নাতে নববীর পূর্ণ অনুসরণ করবে, এর উপর আমল করবে এবং এর উপর দাওয়াত দিবে। আর এসবের মাধ্যমে অর্জিত হবে ঈমানের তৃতীয় উসূল অর্থাৎ **মা'রিফাতুন নবী** সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা।

এতক্ষণ আমরা ঈমানের অত্যাবশ্যকীয় তিনটি উসূল সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত জ্ঞান লাভ করলাম। এ পর্যায়ে আমরা ঈমানের এই তিন উসূলের তাৎপর্য, বিশ্লেষণ, করণীয়, আমল ও ইবাদাতের ধারাবাহিক আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

পবিত্র কুরআন ও সহীহ সুন্নার আলোকে আমাদের ঈমানের এ তিন উসূলের উপর চারটি করণীয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন। সেগুলো হচ্ছে যথাক্রমে **ইল্‌ম, আমল, দাওয়াত ও সবর**। সুতরাং এ পর্যায়ে আমাদের আলোচ্য বিষয় ঈমানের তিন উসূলের উপর চারটি করণীয় কর্ম : **যার প্রথমটি হচ্ছে ইল্‌ম**।

পবিত্র কুরআন ও সহীহ সুন্নার আলোকে আমরা জানতে পারি যে ঈমানের এ তিন উসূল সম্পর্কিত জ্ঞান ফরযে আইন অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলিম নারী, পুরুষের উপর এ জ্ঞান অর্জন করা বাধ্যতামূলক। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেছেন, **তলাবুল ইলমি**

ফারিজাতুন আলা কুল্লি মুসলিমিন অর্থাৎ "প্রত্যেক মুসলিমের উপর ইলম সন্ধান করা ফরয।" সুনান ইবনু মাজাহ (hadithbd.com), হা/২২৪; (শাইখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

আর এ সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করাকে বলা হয় **'ইলমে মা'রিফাত' বা পরিচয় সম্বন্ধীয় জ্ঞান**। এ ব্যাপারে হাসান আল বাসরি রহিমাহুল্লাহু তা'আলা, সুফিয়ান আস সাওরি রহিমাহুল্লাহু তা'আলা সহ পূর্বেকার যুগের উলামায়ে কিরামগণ বলতেন, **"মা'রিফাত হল ঈমানের তিন উসূল সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ করা।"**

ঈমানের তিন উসূলের উপর দ্বিতীয় করণীয় কর্ম হচ্ছে 'আমল'। ঈমানের প্রতিটি উসূলের সাথে কিছু আমল ও ইবাদাত রয়েছে এবং এ গুলো ফরয অর্থাৎ বাধ্যতামূলক। এগুলো শারী'আত অর্থাৎ ইসলামের বিধিবিধানের অন্তর্ভুক্ত।

ঈমানের তিন উসূলের উপর তৃতীয় করণীয় কর্ম হচ্ছে **'আদ দাওয়াতু ইলাইহি'** অর্থাৎ তার দিকে দাওয়াত। মহান আল্লাহর পথে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করতে হবে ঈমানের এই তিন উসূলের উপরে। প্রত্যেক মুসলিমের ঈমানের এ তিন উসূলের উপর দাওয়াত দেওয়া ফরযে 'আইন ।

ঈমানের তিন উসূলের উপর চতুর্থ করণীয় কর্ম হচ্ছে **'আস-সাবরু আলাল আ'দা ফীহি'** অর্থাৎ এই তিন উসূলের উপরে দাওয়াত দিতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের বাধাবিঘ্ন ও বিপদের সম্মুখীন হলে তাতে ধৈর্যধারণ করা। এটা ফরযে আইন অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয।

ঈমানের তিন উসূলের উপর এ চার করণীয়ের ব্যাপারে মহান আল্লাহ সূরাহ আল-আসর এ বলেন, وَالْعَصْرِ - إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ - إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ -

"মহাকালের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। তবে তারা নয়, যারা ঈমান এনে সৎকর্ম করেছে এবং একে অপরকে সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।" (সূরাহ আল-আসর)

এতক্ষণ আমরা ঈমানের তিন উসূলের উপর চার করণীয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করলাম। একজন মুমিনের জীবনে এ তিন উসূল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। প্রতিটি উসূলের সাথে রয়েছে সংশ্লিষ্ট ইবাদাত ও আমল। কোন ব্যক্তি যদি ঈমানের এ তিন উসূলের কোনটির উপর আমল পরিত্যাগ করে, তবে তার ফলাফল হিসেবে কবরের তিন প্রশ্নের জবাব দিতেও সে ব্যর্থ হবে। একজন ব্যক্তি ঈমানের যেই উসূলের উপর আমল পরিত্যাগ করবে, ঠিক সেই

উসূলের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের জবাব দিতে সে ব্যর্থ হবে। অথচ কবরে সফলতা লাভের জন্য তিনটি প্রশ্নের উত্তরই বাধ্যতামূলক। এ পর্যায়ে আমরা জানব সে তিন উসূলের বিশ্লেষণ ও তৎসংশ্লিষ্ট ইবাদাতসমূহ সম্পর্কে।

পূর্ববর্তী আলোচনাসমূহ থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, আমাদের এক নাম্বার উসূলটির নাম **মা'রিফাতুর রব। অর্থাৎ রবের পরিচয় সম্পর্কিত জ্ঞান।** এ পর্যায়ে আমরা রবের পরিচয় সম্পর্কে জানার চেষ্টা করবো এবং রবের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করবো। এরপর এ উসূলটির সাথে সম্পর্কিত ইবাদাতসমূহ সম্পর্কে জানব।

মহান আল্লাহ এ বিশ্ব জগতে প্রাণের অস্তিত্ব ঘটিয়েছেন এবং এসবের লালন-পালন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে যাচ্ছেন অত্যন্ত নিঁখুতভাবে। কারণ তিনি হলেন সমগ্র বিশ্ব জগতের রব। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ – "সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যিনি সমগ্র বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক।" (সূরাহ আল-ফাতিহা : ২ আয়াত)

অতএব এ বিশ্ব জগতের রবের পরিচয় এ বিশ্ব জগতেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা রবের অসংখ্য আয়াত বা নিদর্শনের মাঝে নিহিত। সে নিদর্শন গুলোর মাঝে রয়েছে রাত, দিন, চন্দ্র, সূর্য, সপ্ত আকাশ, সপ্ত জমিন এবং তার মধ্যস্থিত অগণিত প্রাণীকুল এবং ফুল, ফল ও শষ্যরাজী। এ সবই মহান আল্লাহর নিদর্শন। এ সকল নিদর্শনের মাধ্যমে রবের পরিচয় খুঁজে নিয়ে একমাত্র রবের ইবাদাত করতে হবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ -

"তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে দিবস, রজনী, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চন্দ্রকেও না; মহান আল্লাহকে সিজদা কর, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা নিষ্ঠার সাথে শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদাত করে থাকো।" (সূরাহ ফুসসিলাত : ৩৭ আয়াত)

যিনি রব তিনিই একমাত্র মা'বূদ। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ - الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ – "হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবের ইবাদাত কর, যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা তাক্বওয়া অবলম্বন কর। যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে করেছেন বিছানা, আসমানকে ছাদ এবং আসমান থেকে নাযিল করেছেন বৃষ্টি। অতঃপর

তাঁর মাধ্যমে উৎপন্ন করেছেন ফল-ফলাদি, তোমাদের জন্য রিজকস্বরূপ। সুতরাং তোমরা জেনে-বুঝে মহান আল্লাহর জন্য সমকক্ষ নির্ধারণ করো না।" (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ২১-২২ আয়াত)

এতক্ষণ আমরা ঈমানের প্রথম উসূল অর্থাৎ মা'রিফাতুর রবের অংশ হিসেবে রবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানলাম। এবার জানব, এ উসূলের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু ইবাদাত সম্পর্কে।

মা'রিফাতুর রবের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রথম ইবাদাত হচ্ছে **দু'আ** (আদদু'আ)। দু'আ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। এ ইবাদাত পালনে কার্পণ্য নিষিদ্ধ। কোনরূপ অহংকারের বশবর্তী হয়ে দু'আ পরিত্যাগ করা জাহান্নামে প্রবেশের কারণ হবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ - "তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি সাড়া দেব। যারা আমার ইবাদাতে অহংকার করে তারা সত্বরই জাহান্নামে দাখিল হবে লাঞ্ছিত হয়ে।" (সূরাহ গাফের : ৬০ আয়াত)

দু'আ একমাত্র মহান আল্লাহর কাছেই করতে হবে। মহান আল্লাহ ব্যতীত বা মুমিন কোন নবী, রাসূল, ফেরেশ্‌তা, ওলী' আওলীয়া বা কবর, মাজার, গাছ, পাথর, মূর্তি ইত্যাদির কাছে চাওয়া নিঃসন্দেহে শিরক। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ – "যে কেউ মহান আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকে ডাকে, তার কাছে যার সনদ নেই, তার হিসাব তার পালণকর্তার কাছে আছে। নিশ্চয় কাফিররা সফলকাম হবে না ।" (সূরাহ আল-মু'মিনূন : ১১৭ আয়াত)

মা'রিফাতুর রবের সাথে সংশ্লিষ্ট দ্বিতীয় ইবাদাত হচ্ছে **খাউফ** (আল-খউফ)। অর্থাৎ মহান আল্লাহকে ভয় করা। জীবনের সকল কাজে কর্মে, গোপনে, প্রকাশ্যে, সর্বত্র একমাত্র মহান আল্লাহকে ভয় করতে হবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ - "সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না। আর তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাকো, তবে আমাকে ভয় কর।" (সূরাহ আলে-ইমরান : ১৭৫ আয়াত)

মা'রিফাতুর রবের সাথে সংশ্লিষ্ট তৃতীয় ইবাদাত হচ্ছে **আর রাযা** (আর রাজাউ) অর্থাৎ আশা করা, ভরসা করা। জীবনের সকল ভাল কাজের বিনিময় একমাত্র মহান আল্লাহর হাতে। তাই মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে ভালো কাজের বিনিময় আশা করা নিঃসন্দেহে শিরক। তাই আশা

করতে হবে একমাত্র মহান আল্লাহর কাছেই। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا - "অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদাতে কাউকে শরীক না করে।" (সূরাহ আল-কাহফ : ১১০ আয়াত)

মা'রিফাতুর রবের সাথে সংশ্লিষ্ট চতুর্থ ইবাদাত হচ্ছে **তাওয়াক্কুল** (আত্-তাওয়াকুলু) অর্থাৎ নির্ভরশীলতা। বাধাবিঘ্ন, বিপদ আপদে বা জীবনের সর্বক্ষেত্রে একজন মুমিনকে নির্ভর করতে হবে একমাত্র মহান আল্লাহর উপরে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ - "আর মহান আল্লাহর উপর ভরসা কর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।" (সূরাহ আল-মায়েদাহ : ২৩ আয়াত)

মা'রিফাতুর রবের সাথে সংশ্লিষ্ট পঞ্চম ইবাদাত হচ্ছে আর-রুগবাহ ওয়ার-রুহবাহ **ওয়াল খুশু** অর্থাৎ খুশু, খুযু, আগ্রহ, ভয়, সম্মান, এই সব কিছু থাকতে হবে একমাত্র মহান আল্লাহর প্রতি। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ - "তারা সৎকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়তো, তারা আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকতো এবং তারা ছিল আমার কাছে বিনীত।" (সূরাহ আল-আম্বিয়া: ৯০ আয়াত)

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي - "কাজেই তাদের আপত্তিতে ভীত হয়ো না। আমাকেই ভয় কর।" (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ১৫০ আয়াত)

মা'রিফাতুর রবের সাথে সংশ্লিষ্ট ষষ্ঠ ইবাদাত হচ্ছে **'ইনাবা** (আল ইনাবাতু) অর্থাৎ একনিষ্ঠ হওয়া, ফিরে আসা। ভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্তিতে পতিত হওয়ার পর ফিরে আসতে হবে একমাত্র রবের দিকে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ - "তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অভিমূখী হও এবং তাঁর আজ্ঞাবহ হও তোমাদের কাছে আযাব আসার পূর্বে। এরপর তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।" (সূরাহ আয-যুমার: ৫৪ আয়াত)

মা'রিফাতুর রবের সাথে সংশ্লিষ্ট সপ্তম ইবাদাত হচ্ছে আল-ইস্তিয়ানা (আল-ইস্তিআনাতু) অর্থাৎ সাহায্য চাওয়া, সাহায্য প্রার্থনা করা। জীবনের সকল ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় একমাত্র মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - "আমরা

একমাত্র তোমারই ইবাদাত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।" (সূরাহ আল-ফাতিহা : ৫ আয়াত) অর্থাৎ মহান আল্লাহর অনুগত বান্দা কেবল মহান আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করে।

মা'রিফাতুর রবের সাথে সংশ্লিষ্ট অষ্টম ইবাদাত হচ্ছে আল-ইস্তিয়াযা (আল ইস্তিয়াজাতু) অর্থাৎ আশ্রয় প্রার্থনা করা। মহান আল্লাহ যাকে আশ্রয় দেন নভোমন্ডলের ও ভূমন্ডলের কেউ নেই তাকে ক্ষতি করার, আর মহান আল্লাহ যাকে তার আশ্রয় থেকে বের করে দেন, নভোমন্ডলের ও ভূমন্ডলের কেউ নেই তাকে রক্ষা করার। সুতরাং আল্লাহর আশ্রয়ের চাইতে বড় কোন আশ্রয় নেই। এ জন্য মহান আল্লাহ আমাদেরকে শিখিয়েছেন কিভাবে তার কাছে আশ্রয় চাইতে হয়। মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ - "বলুন! আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার।" (সূরাহ আল-ফালাক্ব : ১ আয়াত)

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ – "বলুন! আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার।" (সুরাহ আন-নাস : ১ আয়াত)

মা'রিফাতুর রবের সাথে সংশ্লিষ্ট নবম ইবাদাত হচ্ছে আল-ইস্তিগাসা (আল ইস্তিগাছাতু) অর্থাৎ পরিত্রাণ করার ক্ষমতা, সাহায্য করার ক্ষমতা, বাঁচানোর ক্ষমতা। গাউস হলেন একমাত্র মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন। পরিত্রাণ বা মুক্তি লাভ করতে, বাঁচতে ও আশ্রয় চাইতে হলে একমাত্র মহান আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে । মহান আল্লাহ বলেন, إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ - "আর স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের রবের নিকট ফরিয়াদ করছিলে, তখন তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন।" (সূরাহ আল-আনফাল : ৯ আয়াত)

মা'রিফাতুর রবের সাথে সংশ্লিষ্ট দশম ইবাদাত হচ্ছে আয যাবহু (আজ-জাবহু) অর্থাৎ যবেহ করা। কোন পশু-পাখি যবেহ করার বৈধ প্রয়োজনে একমাত্র মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যই যবেহ করতে হবে। মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দ্যেশ্যে একটি প্রাণীও যদি যবেহ করা হয় নিঃসন্দেহে তা শির্কের অন্তর্ভুক্ত হবে।

মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ - "বল! নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু মহান আল্লাহর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টির রব, তাঁর কোন শরীক নেই।" (সূরাহ আল-আন'আম : ১৬২-১৬৩ আয়াত)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেন, **লা'আনাল্লাহু জাবাহা লিগইরিল্লাহি** অর্থাৎ "যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে যবেহ করে আল্লাহ তাকে লা'নাত করেন।" (সহীহ মুসলিম (হাদীস একাডেমী, hadithbd.com), হা/৫০১৯)

মা'রিফাতুর রবের সাথে সংশ্লিষ্ট আরেকটি ইবাদাত হচ্ছে, আন নাযর (আন-নাজরু) অর্থাৎ মান্নত করা। বিপদ-আপদে মান্নত একমাত্র মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যেই করতে হবে, কোনো কবর কিংবা দরবারের উদ্দেশ্য মান্নত করা শিরক । মহান আল্লাহ বলেন, يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا - "তারা মান্নত পূর্ণ করে এবং সেদিনকে ভয় করে যার অকল্যাণ হবে সুবিস্তৃত ।" (সূরাহ আল-ইনসান : ৭ আয়াত)

এ পর্যায়ে আমরা জানতে পারলাম, মা'রিফাতুর রবের বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট ইবাদাতসমূহ সম্পর্কে। **এ পর্যায়ে আমরা জানব ঈমানের দ্বিতীয় উসূল মা'রিফাতুত দীন সম্পর্কে ।**

ঈমানের দ্বিতীয় উসূল মা'রিফাতুত দীন কবরের দ্বিতীয় প্রশ্ন "ওয়ামা দীনুকা ?" এর উপর প্রতিষ্ঠিত। কবরের এই দ্বিতীয় প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে ঈমানের এই দ্বিতীয় উসূলটির উপর আমলের বিকল্প নেই। মা'রিফাতুত দীন অর্থাৎ দীনের পরিচয়, প্রসিদ্ধ হাদীস, হাদীসে জিবরীলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সে আলোকে আমরা মা'রিফাতুত দীনের তিনটি স্তর সম্পর্কে জানতে পারি। এক. ইসলাম। দুই. ঈমান। তিন. ইহসান। হাদীসে জিবরীল 'আলাইহিস সালামে এই তিনটি বিষয়কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা দীন বলে উল্লেখ করেছেন। এ পর্যায়ে আমরা দীনের এই তিনটি বিষয়ের ধারাবাহিক আলোচনা করে যাব ইনশাআল্লাহ ।

ইসলাম হলো, এক আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে নেওয়া, মুহাম্মাদ কে মহান আল্লাহর রাসূল হিসেবে মেনে নেওয়া, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রমাযানে সিয়াম রাখা এবং হজ্জ করা। এ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা হাদীসে জিবরীলে উল্লেখ করেছেন, "ইসলাম হল তুমি এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, মহান আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মা'বূদ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা মহান আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, রমাযানের সিয়াম পালন করবে এবং বায়তুল্লাহ পৌঁছার সামর্থ্য থাকলে হজ্জ পালন করবে।" (সহীহুল বুখারী (তাওহীদ, hadithbd.com), হা/৫০; সহীহ মুসলিম, হা/১)

ইসলামের রুকন হলো এ পাঁচটিই।

ঈমান হল, মহান আল্লাহর উপরে, ফেরেশতাদের উপরে, কিতাবসমূহের উপরে, রাসূলদের উপরে, পরকালের উপরে এবং তাকদীরের ভালো-মন্দের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করা। এ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা হাদীসে জিবরীলে উল্লেখ করেছেন, "ঈমান হল মহান আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশ্তাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান আনবে, আর তাকদিরের ভালমন্দের প্রতি ঈমান রাখবে ।" (প্রাগুক্ত)
ঈমানের রুকন হলো এ ছয়টিই।

ইহসান হল সার্বক্ষণিক অন্তরের মধ্যে মহান আল্লাহর তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণের অনুভূতি জাগ্রত করা যে, আমি মহান আল্লাহকে দেখছি, অথবা মহান আল্লাহ আমাকে দেখছেন। এ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা হাদীসে জিবরীলে উল্লেখ করেছেন, **আন তা'বুদাল্লাহা কাআন্নাকা তারাহু ফাইন-লাম তাকুন তারাহু ফাইন্নাহু ইয়ারাকা** অর্থাৎ "ইহসান হলো এমনভাবে ইবাদাত-বন্দেগী করবে যেন তুমি মহান আল্লাহকে দেখছো, যদি তুমি তাকে নাও দেখো, তাহলে ভাববে তিনি তোমাকে দেখছেন।" (প্রাগুক্ত) ইহসানের রুকন হলো এ একটিই।

এ পর্যায়ে আমরা জানলাম ঈমানের দ্বিতীয় উসূল মা'রিফাতুত দীন সম্পর্কে। এবার আমরা আলোচনা করবো **ঈমানের তৃতীয় উসূল মা'রিফাতুন** নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা সম্পর্কে।
ঈমানের তিন উসূলের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিতে আমরা ইতোঃমধ্যে জানতে পেরেছি যে, **মা'রিফাতুন নবী** সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা হলো একজন মুমিন মৃত্যু পর্যন্ত সুন্নাতে নববীর জ্ঞান অর্জন করবে, সুন্নাতে নববীর পূর্ণ অনুসরণ করবে, এর উপর আমল করবে এবং এর উপর দাওয়াত দিবে। আর এসবের মাধ্যমে অর্জিত হবে ঈমানের তৃতীয় উসূল অর্থাৎ **মা'রিফাতুন নবী** সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা।
অতএব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা সম্পর্কে যে বিষয়গুলো গুরুত্ব সহকারে জানতে হবে সেগুলো হলো, **রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা সমগ্র বিশ্ববাসীর (সমগ্র মানব ও দানবের) জন্য কিয়ামত পর্যন্ত রাসূল।** অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ কোন নির্দিষ্ট দেশ বা জাতির জন্য প্রেরিত হন নি এবং কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্যও প্রেরিত হন নি। এ সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي

رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا - "বলে দাও, হে মানব মন্ডলী! তোমাদের সবার প্রতি আমি মহান আল্লাহর প্রেরিত রাসূল।" (সূরাহ আল-আ'রাফ : ১৫৮ আয়াত)

মা'রিফাতুন নবী সম্পর্কে দ্বিতীয় যে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে জানতে হবে তা হলো, ইসলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা থাকাকালীন পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা ১০ম হিজরীর ৯ই জিলহাজ্জ তারিখে আরাফার ময়দানে সুস্পষ্টভাবে ঘোষনা করে এ আয়াত নাযিল করেছেন, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا - "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্নাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসেবে পছন্দ করলাম।" (সূরাহ আল-মায়েদাহ : ৩ আয়াত)

সুতরাং পূর্ণাঙ্গ এ দীনের মধ্যে কোন নতুন আক্বীদা বা আমল সংযোজন বা দীন থেকে কোন আক্বীদা বা আমল বিয়োজন নিঃসন্দেহে বিদ'আত। আর প্রতিটি বিদ'আত ভ্রষ্টতা।

মা'রিফাতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা সম্পর্কে তৃতীয় যে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে জানতে হবে তা হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা মৃত্যুবরণ করেছেন এর প্রতি ঈমান আনতে হবে। এটি ফরয। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন,

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ - "নিশ্চয় তোমারও মৃত্যু হবে এবং তাদেরও মৃত্যু হবে।" (সূরাহ যুমার : ৩০ আয়াত)

মা'রিফাতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা এর সাথে সংশ্লিষ্ট চতুর্থ যে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে করতে হবে তা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-সহ সকল নবীদের অনুসরনীয় পদ্ধতিতে দাওয়াহ ইলাল্লাহের কাজ করতে হবে। পৃথিবীতে যত নবী এসেছেন, তাদের সবার দাওয়াতের বিষয়বস্তু ছিল একটাই। আর তা হল **আনি'বুদুল্লাহ অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করো। ওয়াজতানিবুত ত্বাগূত অর্থাৎ ত্বাগূতকে পরিহার করো,** ত্বাগূতকে ছেড়ে দাও। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ - "আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা মহান

আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তাগূত থেকে নিরাপদ থাক।" (সূরাহ আন-নাহল : ৩৬ আয়াত)

এ পর্যায়ে আমাদের জানতে হবে ত্বাগূত কাকে বলে? ত্বাগূত হলো, যারা আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহর ইবাদাত পালন থেকে সরিয়ে অন্য মা'বূদের ইবাদাতের দিকে ধাবিত করে। 'ত্বাগূত' অনেক প্রকারের রয়েছে তন্মধ্যে কুরআন ও সুন্নার আলোকে শীর্ষে আছে পাঁচ প্রকার। সেগুলো হলো যথাক্রমে,

(১) ইবলীশ, তার উপর মহান আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক (ইবলিসু লা'আনাহুল্লাহু)।

(২) মহান আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদাত করা হয় এবং সে ইবাদাত প্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট থাকে (অমান উবিদা'মিন দুনিল্লাহি ওয়াহুওয়া রাজীন)। যেমন, কারো সিজদা গ্রহণ করা, মান্নত গ্রহণ করা ইত্যাদি।

(৩) যে ব্যক্তি মানুষকে তার নিজের ইবাদাতের দিকে আহ্বান করে (মান দাআন নাসা ইলা ইবাদাতি নাফসিহী)।

(৪) যে ব্যক্তি ইলমে গাইব- এর দাবী করে (মানিদ দা'আ শাইআন মিন ইলমিল গাইবি)।

(৫) যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর নাযিলকৃত কুরআন ও সুন্নাহ বাদ দিয়ে অন্য আইন-কানুন দিয়ে বিচার ফায়সালা পরিচালনা করে (মান হাকামা বি গাইরি মা আনজালাল্লাহু)।

আম্বিয়া আলাইহিমুস সাল্লামগণের কেউ যখনই দুনিয়াতে আসতেন, মহান আল্লাহর ইবাদাত করার পাশাপাশি ত্বাগূতকে পরিহার করার নির্দেশ দিতেন। তাদের দাওয়াতের মূল বাক্যের **"লা ইলাহা" এর মানে হল ওয়াজ তানিবুতত্বাগূত** অর্থাৎ সকল প্রকারের ত্বাগূতকে পরিহারের নির্দেশ এবং **'ইল্লাল্লাহ' মানে হল ওয়া'বুদুল্লাহ** অর্থাৎ সকল প্রকার ত্বাগূতকে বর্জন করে একমাত্র মহান আল্লাহর ইবাদাতের প্রতি আহ্বান। সুতরাং ঈমানের তৃতীয় উসূলের অংশ হিসেবে আম্বিয়া আলাইহিমুস সাল্লামগণের দাওয়াতের অনুসরণীয় পদ্ধতিতে আমাদের দাওয়াতের বিষয়বস্তু হবে একমাত্র মহান আল্লাহর ইবাদাতের প্রতি আহ্বান এবং ত্বাগূত বর্জনের নির্দেশ ।

আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে এই উসূলুস সালাসাহ ভালোভাবে জানার, বুঝার, এর উপর আমল করার, এর উপর দাওয়াত দেওয়ার এবং এর উপর সবর ও ইস্তিকামাত থাকার তাওফীক্ব। দিন। আল্লাহুমা আনতা রববুনা ফারজুকনাল ইস্তিকামাত। আমীন! ইয়া রব্বাল আলামীন! সুবহানাকা আল্লাহুম্মা

অবিহামদিকা আশহাদু আল্লা-লা-ইলাহা ইল্লা আনতা আসতাগফিরুকা অআতুবু ইলাইকা।

মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান (১)

'আল-ঈমানু বিল্লাহ তথা মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান বলতে বুঝায় মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে একত্বের অধিকারী মনে করে তাওহীদের ভিত্তিতে এবং সকল প্রকার শিরকমুক্ত হয়ে মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। সুতরাং আল- ঈমানু বিল্লাহ কয়েকটি বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত।

প্রথম বিষয় হলো, মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসটি হতে হবে তাওহীদের ভিত্তিতে।

দ্বিতীয় বিষয় হলো, মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসটি হতে হবে শিরকমুক্তভাবে।

তৃতীয় বিষয় হলো, মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যদি শিরক থেকে যায়, তবে পূর্ণাঙ্গ তাওহীদ অর্জিত হয় না। পূর্ণাঙ্গ তাওহীদ অর্জিত হলে সেখানে শিরক থাকে না। তাই মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তাওহীদ ও শির্কের মিশ্রণ থেকে মুক্ত থাকতে হবে। আমরা আজকের আলোচনায় জানব 'তাওহীদ (আত তাওহীদ) সম্পর্কে।

'তাওহীদ' (আত তাওহীদ) শব্দটি আরবী, যা ওয়াহ্দা ক্রিয়ামূল থেকে নির্গত। এর অর্থ: এক হওয়া, একক হওয়া, অতুলনীয় হওয়া, ঃড় নব ধষড়হব, ঁহরয়ঁব, ঁহসধঃপযবফ, ংরহমঁষধৎ, রহপড়সঢ়ধৎধনষব ইত্যাদি।

পরিভাষায় তাওহীদ হলো, মহান আল্লাহকে সৃষ্টি, রাজত্ব, কর্তৃত্ব ও পরিচালনার একচ্ছত্র অধিপতি হিসেবে মেনে নিয়ে একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করা এবং তাঁর সকল নাম ও গুণাবলীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

মহান আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা তাওহীদের পরিচয় বর্ণনা করে সূরা আল-ইখলাসে বলেন,

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ - اللَّهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ - وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ -

"বল, তিনিই মহান আল্লাহ, একক, অদ্বিতীয়। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। আর তাঁর কোন সমকক্ষও নেই।" (সূরাহ আল-ইখলাস)

সূরা আল-ইখলাসে শুধুমাত্র তাওহীদের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা সূরাহ আল-ইখলাসকে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ বলেছেন। (সহীহুল বুখারী (তাওহীদ,

hadithbd.com), হা/৫০১৩) কেননা **'তাওহীদ'** কুরআনের তিনটি মৌলিক আলোচনা যথাক্রমে **তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের** অন্যতম একটি।

ইসলামে প্রবেশের জন্য অপরিহার্য হলো তাওহীদ । অন্তরে এ বিশ্বাস লালন করা যে, আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা একমাত্র স্রষ্টা, রিজকদাতা, পরিচালক, পালনকর্তা, নিয়ন্ত্রক এবং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করা। কেউ যদি মহান আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, আর মহান আল্লাহ একক হওয়ার ব্যাপারে বিশ্বাস না করে, তবে সে নিঃসন্দেহে কাফির ও মুশরিক্ব। এ ধরণের অবিশ্বাস নিয়ে কখনো মুসলিম হওয়া যায় না। মহান আল্লাহর একত্বে যদি কোন ফেরেশ্তা, জিন, মানুষ, দেব-দেবী, গাছ, পাথর, মূর্তি, অগ্নি, নক্ষত্র, কবর ইত্যাদিকে অংশীদার মনে করা হয়, তবে তা হবে শিরক। তাই ইসলামে প্রবেশের বিশুদ্ধ তাওহীদের বাক্য শিক্ষা দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেন, **আশহাদু আন লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু অহ্দাহু লা-শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু** অর্থাৎ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মহান আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই। তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা তাঁর বান্দা ও রাসূল।" (সহীহুল বুখারী, হা/৩৪৩৫; সহীহ মুসলিম (হাদীস একাডেমী, যধনরঃযনফ.পড়স), হা/৪৬)

যুগে যুগে যত আম্বিয়া আলাইহিস সালাম আত্ তাসলিমা দুনিয়ায় আগমন করেছেন, প্রত্যেকেই স্ব-স্ব-উম্মাহকে তাওহীদের দিকে আহ্বান করেছেন। যেমন, স্বজাতিকে তাওহীদের দিকে নূহ আলাইহিস সালাম আত্ তাসলিমা এর আহ্বানের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ - "আমি তো নূহকে তার কওমের নিকট প্রেরণ করেছি। অতঃপর সে বলেছে, 'হে আমার কওম! তোমরা মহান আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন (সত্য) ইলাহ নেই।" (সূরাহ আল-আ'রাফ : ৫৯ আয়াত)

স্বজাতিকে তাওহীদের দিকে হূদ আলাইহিস সালাম আত্ তাসলিমা-এর আহ্বানের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ - "আর আদ জাতির কাছে (প্রেরণ করেছিলাম) তাদের ভাই হুদকে। সে বলেছিল, 'হে আমার কওম! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের জন্য কোন (সত্য) ইলাহ নেই।" (সূরাহ হূদ ঃ ৫০ আয়াত)

স্বজাতিকে তাওহীদের দিকে সালেহ আলাইহিস সালাম আত্ তাসলিমা এর আহ্বানের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ - "আর সামূদ জাতির প্রতি (পাঠিয়েছিলাম) তাদের ভাই সালেহকে। সে বলল, 'হে আমার কওম! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন (সত্য) ইলাহ নেই ।" (সূরাহ হূদ ঃ ৬১ আয়াত)

স্বজাতিকে তাওহীদের দিকে শুআইব আলাইহিস সালাম আত্ তাসলিমা-এর আহ্বানের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ - "আর মাদইয়ানে আমি (পাঠিয়েছিলাম) তাদের ভাই শু'আইবকে। সে বলল, 'হে আমার কওম! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন (সত্য) ইলাহ নেই ।" (সূরাহ হূদ ঃ ৮৪ আয়াত)

এভাবে প্রত্যেক নবী আলাইহিস সালাম আত্ তাসলিমা তাওহীদের দিকে আহ্বান করেছেন। আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা এ প্রসঙ্গে বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ - "আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি যে, তার প্রতি এই ওহী ব্যতীত যে, আমি ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং তোমরা কেবলমাত্র আমারই ইবাদাত কর।" (সূরাহ আল-আম্বিয়া: ২৫ আয়াত)

আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করার নির্দেশ দিয়েছেন, যা তাওহীদের অন্যতম মৌলিক শিক্ষা। আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা বলেন, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - "আমরা কেবলমাত্র আপনারই ইবাদাত করছি এবং কেবলমাত্র আপনারই নিকট সাহায্য চাচ্ছি।" (সূরাহ ফাতিহা ঃ ৫ আয়াত)

তাওহীদ সম্পর্কে প্রতিটি মুসলিমের স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। কেননা তাওহীদ সম্পর্কে না জানার কারণে অনেক মানুষকে ব্যক্তি ঈমান ও এক্বীনের দাওয়াত দিয়ে নিজেই আবার শিরকে লিপ্ত হন। কেউ কেউ মাসজিদে সালাত আদায় করে আবার মাজারে গিয়েও সিজদা দেন। কেউ আবার মহান আল্লাহর নামে যবেহ, মানত দু'আ ইত্যাদি করে আবার বিভিন্ন পীর-বুযুর্গের নামেও মানত, যবেহ, দু'আ ইত্যাদি করে থাকেন। কেউ আবার মানুষকে আইন প্রণয়নকারীও মনে করে থাকেন।

দুনিয়াতে কেবল নাস্তিক সম্প্রদায় ছাড়া সকলেই বিশ্বাস করেন যে, সকল সৃষ্টির একজন স্রষ্টা আছেন। সুতরাং হিন্দু, বৌদ্ধ, ইয়াহুদী, খ্রীষ্টান প্রভৃতি

সকল সম্প্রদায় এক গ্রষ্টায় বিশ্বাসী। এমনকি ফেরাউন, নমরূদ, আবূ জাহল, আবূ লাহাব প্রমুখ কাফেররা সকলেই ছিলো এক গ্রষ্টায় বিশ্বাসী। তবে একজন মুসলিমের সাথে তাদের বিশ্বাসের পার্থক্য হলো তাওহীদ। একজন মুসলিম গ্রষ্টায় বিশ্বাস করেন তাওহীদের। আর একজন অমুসলিম তাওহীদের ভিত্তি ছাড়াই গ্রষ্টায় বিশ্বাসী। একজন মুশরিক্ব বিশ্বাস করেন যে, সব সৃষ্টির একজন গ্রষ্টা আছেন, তবে তার পাশাপাশি দেব-দেবী, গাছ-পাথর, মূর্তি, বুজুর্গ, জিন ইত্যাদিরও ঐশ্বরিক ক্ষমতা আছে, এবং তারা গ্রষ্টার প্রিয়ভাজন। তাই এদের নামে মান্নত, যবেহ বা দু'আ করলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। কেননা গ্রষ্টার সাথে আর যার পূজা করা হয়, তার সাথে গ্রষ্টার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং তাদের সন্তুষ্ট আর তাদের মাধ্যমেই গ্রষ্টার কাছে কিছু চাইতে হয়। এভাবে তারা বিভিন্ন নেককার ব্যাক্তিদের ভক্তি, পূজা ইত্যাদি শুরু করে। তাদের মূর্তি বানিয়ে যুগ যুগ ধরে সেগুলোকে উপাসনা করতে থাকে। এ ধরণের বিশ্বাস তাওহীদ বিরোধী এবং শিরক। সুতরাং কেউ যদি আল্লাহকে গ্রষ্টা হিসেবে মেনে নেওয়ার পর এ ধরণের শিরকযুক্ত বিশ্বাস অন্তরে পালন করেন অথবা কোন মাজার বা পীর- বুজুর্গের কাছে গিয়ে সন্তান কামনা করেন, এগুলোকে সিজদা করেন, এগুলোর নামে মান্নত বা যবেহ ইত্যাদি করেন, আবার পাশাপাশি সালাত, সিয়াম, হজ্জ ইত্যাদিও পালন করেন, তবুও সে মুশরিক্ব।

তাওহীদ ৩ প্রকার, সেগুলো হলো :

(১) তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ অর্থাৎ প্রতিপালনের একত্ব।

(২) তাওহীদুল আসমা'য়ি ওয়াস সিফাত অর্থাৎ নাম ও গুণাবলীর একত্ব।

(৩) তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ অর্থাৎ ইবাদাত বা উপাসনার একত্ব।

এ তিন প্রকার তাওহীদের একটির সাথে অপরটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এর কোন একটি বাদ দিয়ে অপরটিতে বিশ্বাস স্থাপন করলেও পূর্ণাঙ্গ তাওহীদ অর্জিত হবে না, যেমন- লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু বাক্যটি তাওহীদের তৃতীয় প্রকার তথা তাওহীদুল উলূহিয়্যাহর সাথে সম্পর্কিত/পক্ষান্তরে কবরে প্রথম যে প্রশ্নটি করা হবে, তাহলো, মান রব্বুকা যা তাওহীদের প্রথম প্রকার তথা তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহর সাথে সম্পর্কিত। এখানে কেউ যদি তাওহীদুল উলূহিয়্যাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন না করেন, তবে তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহর উপর তার বিশ্বাস কোন কাজে আসবে না।

যুগে যুগে কাফির মুশরিক্বরা তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ ও তাওহীদুল আসমা'য়ি ওয়াস সিফাত- এর বিষয়াবলীর কিছু কাঁটছাট করে প্রায় সবই

মেনে নিত। কিন্তু তাওহীদুল উলূহিয়্যাহর ব্যাপারে তারা জোর আপত্তি তুলতো। তারা একক গ্রষ্টার ইবাদাতের পাশাপাশি ফেরেশ্তা, নবী, নেককার বান্দা, জিন, দেব-দেবী, পাথর, গাছপালা, মূর্তি ইত্যাদির ইবাদাত করতো। তাই যুগে যুগে নবী রাসূল আলাইহিস সালাম আত্ তাসলিমা-গণ স্ব-স্ব-উম্মাহকে তাওহীদুল উলূহিয়্যাহর প্রতি বারবার আহ্বান করেছেন। আমরা তাওহীদের এ তিনটি প্রকার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

সম্মানিত দ্বীনি ভাই ও বোনেরা, তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ অর্থাৎ প্রতিপালনের একত্ব হলো, এ বিশ্বাস অন্তরে লালন করা যে, মহান আল্লাহই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, নির্দেশদাতা, আইনদাতা, রিজকদাতা, পরিচালক, সংহারক, নিয়ন্ত্রক ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। মহান আল্লাহর সৃষ্টি, নির্দেশ, বিধান প্রণয়ন ইত্যাদিতে কারো অংশীদার সাব্যস্ত করা শিরক। সুতরাং মহান আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কারো অংশীদারিত্ব মেনে নেওয়া, তাঁর আইন বাদ দিয়ে অন্য কাউকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা, তাঁর আইন বাদ দিয়ে অন্য কারো আইন দ্বারা পরিচালিত হওয়া, তিনি ব্যতীত অন্য কাউকে রিজক দাতা হিসেবে মেনে নেওয়া, তিনি ব্যতীত অন্য কারো কাছে ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি কামনা করা, তিনি ব্যতীত অন্য কাউকে সর্বদ্রষ্টা, সর্বশ্রোতা ও হাজির-নাজির মেনে নেওয়া, যেমন- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা) নেককার, পীর, বুযুর্গ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ কবর থেকেও সব কিছু দেখেন ও শুনেন এবং মিলাদ ও কিয়ামে হাজির হোন ইত্যাদি প্রকারান্তরে মহান আল্লাহর প্রভুত্বের মধ্যে অন্য কারো প্রভুত্ব মেনে নেওয়ার শামিল। এজন্যই আল্লাহ "আযযা ওয়া জাল্লা কবরে বান্দাকে প্রশ্ন করবেন যে, মান রব্বুকা অর্থাৎ প্রভু হিসেবে সে কাকে গ্রহণ করেছে। (সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত, hadithbd.com), হা/৪৭৫৩; সুনান ইবন মাজাহ, হা/৪২৬৮; শাইখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

মহান আল্লাহ হলেন একমাত্র সর্বদাতা, পরিত্রাণকারী, সর্বাবস্থায় সাহায্যকারী। তিনি ব্যতীত আর কোন সর্বদাতা, পরিত্রাণকারী ও সর্বাবস্থায় সাহায্যকারী নেই। অথচ মুসলিমদের মধ্যে অনেকেই মহান আল্লাহর এসকল গুণাবলির ব্যাপারে বিশ্বাস পোষণ করার পর, দুনিয়ার কিছু মানুষকে **খাজা, গরীবে নেওয়াজ, গাউসুল আযম** ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করে থাকেন। কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এ ধরণের শব্দগুলোর ব্যবহার মহান আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের সাথে সাংঘর্ষিক এবং নিঃসন্দেহে শিরক। **'খাজা'** শব্দটি ফার্সী, এর অর্থ উদার, দাতা, সক্রিয় ইত্যাদি। **গরীবে নেওয়াজ** এর অর্থ গরীবের সাহায্যকারী

দরিদ্রের মহান দাতা ইত্যাদি। **গাউসুল আযম** অর্থ মহান পরিত্রাণকারী। অতএব, **খাজা, গরীবে নেওয়াজ ও গাওসুল আযম** উপাধিগুলো কেবলমাত্র আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা ব্যতীত অন্য কারো ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা এবং এ ধরণের বিশ্বাস পোষণ করা শিরক। এর উদাহরণ হিন্দুদের **লক্ষ্মী, সরস্বতী বা** বৌদ্ধদের গৌতম বুদ্ধের পূজা করার মতোই কেননা লক্ষ্মী, সরস্বতী বা গৌতম বুদ্ধ এরা ছিলো মানুষ। অতঃপর বিধর্মীরা এদেরকে বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত করে তাদেরকে দেবতার আসনে বসিয়েছে।

কাফির মুশরিকরা তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহর বিষয়াবলী মেনে নিত। তারা এগুলো বিশ্বাস করত। তবে তাদের এ বিশ্বাসে স্রষ্টার প্রতি একত্বের বিশ্বাস ছিল না। যার প্রমাণ আমরা কুরআনুল কারীমে পেয়ে থাকি। আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা এ প্রসঙ্গে বলেন, قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ - "বল! 'আসমান ও যমীন থেকে কে তোমাদের রিজক দেন? অথবা কে (তোমাদের) শ্রবণ ও দৃষ্টিসমূহের মালিক? আর কে মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন, আর জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন? কে সব বিষয় পরিচালনা করেন'? তখন তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'। সুতরাং, তুমি বল, 'তারপরও কি তোমরা তাক্বওয়া অবলম্বন করবে না'?" (সূরাহ ইউনুস ঃ ৩১ আয়াত)

তাওহীদুল আসমা'য়ি ওয়াস সিফাত অর্থাৎ নাম ও গুণাবলীর একত্ব হলো, অন্তরে এ বিশ্বাস লালন করা যে, মহান আল্লাহর অসংখ্য সুন্দর সুন্দর নাম ও গুণাবলীর অধিকারী এবং তিনি সকল পূর্ণতার গুণে গুণান্বিত। তাঁর এ সকল নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে তিনি একক, এক্ষেত্রে তাঁর কোন অংশীদার নেই। তাঁর কোন সৃষ্টির সাথে তাঁর এ সকল নাম ও গুণাবলী তুলনীয় বা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। মহান আল্লাহর প্রশংসনীয় সুন্দর সুন্দর নামের সংখ্যা অসংখ্য, যার সবগুলো আমাদের কাছে প্রকাশিত নয়, তবে যে ফযীলাতময় নামগুলো আমাদের কাছে প্রকাশিত তাঁর সংখ্যা ৯৯টি। (সহীহুল বুখারী, হা/৭৩৯২) আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা বলেন, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ - "আর মহান আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ। সুতরাং তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাক। আর তাদেরকে বর্জন কর যারা তাঁর নামে বিকৃতি ঘটায়। তারা যা করতো অচিরেই তাদেরকে তার প্রতিফল দেয়া হবে।" (সূরাহ আল-আ'রাফ : ১৮০ আয়াত)

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা অনুযায়ী আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা নিরাকার নন। তবে তাঁর আকার কি রকম সে সম্পর্কে জানা যায় না, তাঁর আকার তাঁর কোন সৃষ্টির সাথেও তুলনীয় নয় এবং এ ধরণের তুলনা করা নিঃসন্দেহে শিরক। কুরআন ও সুন্নায় তাঁর আকার থাকার ব্যাপারে বহুসংখ্যক প্রমাণ রয়েছে। যেমন আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা বিভিন্ন সময়ে নিজের হাত, পা, চোখ, মুখমন্ডল ইত্যাদির ব্যাপারে উল্লেখ করে বলেন, "যারা তোমার নিকটে বাইআত গ্রহণ করে তারাতো আল্লাহরই নিকটে বাইআত গ্রহণ করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর।'

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ - وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ - "যমীনের উপর যা কিছু রয়েছে, সবই ধ্বংসশীল। আর থেকে যাবে শুধু মহামহিম ও মহানুভব তোমার রবের চেহারা। (সূরাহ আর-রাহমান ঃ ২৬-২৭ আয়াত)

وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي - "আর আমি আমার পক্ষ থেকে তোমার প্রতি ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছিলাম, যাতে তুমি আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হও।" (সূরাহ ত্ব-হা ৩৯ আয়াত)

يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ - "সে দিন পায়ের গোছা উন্মোচন করা হবে। আর তাদেরকে সিজদা করার জন্য আহ্বান জানানো হবে, কিন্তু তারা সক্ষম হবে না।" (সূরাহ আল-কালাম ঃ ৪২ আয়াত)

তবে আল্লাহর আকার তাঁর কোন সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। মহান আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা এ প্রসঙ্গে বলেন, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ - "কোন কিছুই তার সদৃশ নয়।" (সূরাহ আশ-শূরা ঃ ১১ আয়াত)

তিনি অন্যত্র আরো বলেন,

فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ - "সুতরাং তোমরা আল্লাহর জন্য অন্য কোন দৃষ্টান্ত স্থাপন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ জানেন, আর তোমরা জান না। (সূরাহ আন-নাহল ঃ ৭৪ আয়াত)

আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা সর্বত্র বিরাজমান নন বরং তিনি মহান আরশে আজীমের উপর সমুন্নত। তবে তাঁর ইল্‌ম, শ্রবণ, দৃষ্টি ও ক্ষমতা দ্বারা তিনি সর্বত্র খবর রাখেন। গ্রষ্টার সর্বত্র বিরাজমান হওয়ার আক্বীদাটি বিধর্মীদের যেমন- হিন্দুরা মনে করে যে, সকল জীবেই গ্রষ্টার অবস্থান রয়েছে। তাই জীবের পূজা করা মানে গ্রষ্টার পূজা করা। যেমন তাঁরা বলে থাকে, হরির উপর হরি, হরি শোভা পায়, হরিকে দেখিয়া হরি হরিতে লুটায়।' যেমন তাঁরা আরো বলে থাকে, "নরই নাবায়ন, যত্র জীব, তত্র শীব, ইত্যাদি। এ আক্বীদাটি অনেক মুসলিমদের মধ্যেও প্রবেশ করেছে, যেমন- অনেক মুসলিম মনে করেন যে,

আল্লাহ ‘আযযা ওয়া জাল্লা কলবের ভেতরে অবস্থান করেন। তাই পীর বুযুর্গদের সিজদা করা মুলত আল্লাহরই সিজদা করা, না‘উযুবিল্লাহ। স্বয়ং আল্লাহ ‘আযযা ওয়া জাল্লা নিজের অবস্থান সম্পর্কে বলেন, الرَّحْمَـٰنُ عَلَـى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ - “দয়াময় মহান আরশের উপর উঠেছেন।” (সূরাহ ত্ব-হা : ৫ আয়াত)

তবে মহান আল্লাহকে কোন স্থানে সীমাবদ্ধ করা যাবে না।

মু‘আবিয়াহ ইবনুল হাকাম আস-সুলামী রাজিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “একদা আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল! আমার একটি বাঁদী আছে। আমি তাকে সামান্য কারণে জোরে থাপ্পড় মেরেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর কাছে এটা কষ্টদায়ক মনে হল । আমি বললাম, তাকে আযাদ করে দেই? তিনি বললেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে আসো। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাকে নিয়ে এলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, **আইনাল্লাহু** মহান আল্লাহ কোথায়? সে বলল, **ফিস সামায়ি** আকাশে। এরপর বললেন, মান আনা? আমি কে? সে বললো, আনতা রাসূলুল্লাহি আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা তখন তিনি আমাকে বললেন, তাকে আযাদ করে দাও, কারন সে মু‘মিনা।” (সহীহ মুসলিম, হা/১০৮৬; সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত, hadithbd.com), হা/৩২৮২)

মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান

তাওহীদ তথা একত্ববাদ প্রধানত তিন প্রকার। যার একটি অপরটির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, সেগুলো হলো যথাক্রমে,

(১) তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ অর্থাৎ প্রতিপালনের একত্ব। রুবূবিয়্যাহ, ক্ষমতা, সার্বভৌমত্ব ইত্যাদির ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করা।

(২) তাওহীদুল আসমা'য়ি ওয়াস সিফাত অর্থাৎ নাম ও গুণাবলীর একত্ব। আল্লাহর সকল নাম ও গুণাবলী ঠিক যে অর্থ ও গূঢ়ার্থ প্রকাশ করে, ঠিক সেই অর্থ ও গূঢ়ার্থে আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় ।

(৩) তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ অর্থাৎ ইবাদাত বা উপাসনার একত্ব’ এর অপর নাম হলো, তাওহীদুল ইবাদাহ অর্থাৎ সকল প্রকার ইবাদাত তথা প্রার্থনা, কুরবানী, মান্নত, তাওয়াক্কুল ও নির্ভরতা ইত্যাদি একমাত্র আল্লাহর জন্যই হওয়া।

যুগে যুগে কাফির মুশরিক্বদের সাথে নবী-রাসূল আলাইহিস সাল্লাম আত্-তাসলিমাগণের মূল দ্বন্দ্ব ছিল **'তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ'** তথা তাওহীদুল ইবাদাত নিয়েই। কাফির মুশরিক্বরা মূলত মহান আল্লাহর ইবাদাতকে অস্বীকার করতো না, বরং যুগে যুগে ফিরাউন, আবূ লাহাব, আবূ জাহল এরা সবাই মহান আল্লাহর ইবাদাত করেছে। তবে তারা এক আল্লাহর ইবাদাত করতো না। তারা এক আল্লাহর ইবাদাতের পাশাপাশি ফেরেশ্তা, আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা, জিন, গাছ, পাথর, অগ্নি, সূর্য, নক্ষত্র ইত্যাদিরও ইবাদাত করতো। তারা মনে করতো, তাদের বানানো এ সকল মনগড়া মা'বূদদের সন্তুষ্টি করতে পারলেই এদের মাধ্যমে সহজেই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব হবে। তাই তারা মহান আল্লাহর পাশাপাশি এ সকল মনগড়া মা'বূদদের জন্যও কিছু ইবাদাতকে নির্দিষ্ট করে নেয়। পক্ষান্তরে নবী-রাসূল আলাইহিস সাল্লাম আত্-তাসলিমাগণ সকল মনগড়া মা'বূদকে বর্জন করে কেবলমাত্র এক আল্লাহর ইবাদাতের প্রতি আহ্বান করেন। নবী-রাসূল আলাইহিস সাল্লাম আত্-তাসলিমাগণের কেবলমাত্র এক আল্লাহর প্রতি ইবাদাতের আহ্বানই হলো, তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ তথা তাওহীদুল ইবাদাহ বা ইবাদাতের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর একত্ব।

তাওহীদুল ইবাদার দাবী হলো, কালেমার প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করা। কালেমা হলো, **লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহু** (আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্য মা'বূদ নেই), যার গূঢ়ার্থ হলো **ইবাদাতা ইল্লা লিল্লাহি বা লা মা'বুদা বিহাক্কিন ইল্লাল্লাহু** অর্থাৎ মহান আল্লাহ ছাড়া ইবাদাত পাওয়ার অধিকারী কেউ নেই।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকট কালেমা **" লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহু"** এর গূঢ়ার্থ ভিন্ন ভিন্ন। যেমন-

শিয়াদের মতে এর অর্থ হলো **লা খিলাফাতা ইল্লাল্লাহু** অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কারো রাজত্ব, সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্ব নেই ।

খারেজীদের মতে কালেমার অর্থ হলো **লা হাকিমা ইল্লাল্লাহু** অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন আইনদাতা নেই। জাবরিয়্যাদের মতে কালেমার অর্থ হলো, **লা খালিফা লি আফআলিহী ইল্লাল্লাহু** অর্থাৎ বান্দা তার নিজ কর্মের গ্রষ্টা নন, বরং মহান আল্লাহই বান্দার আমলের গ্রষ্টা। বান্দা যা করে, তা সব মহান আল্লাহই করিয়ে থাকেন। কিছুর থেকে কিছুই হয় না, যা কিছু হয় মহান আল্লাহর থেকেই হয় ইত্যাদি।

মহান আল্লাহ একত্ববাদের অধিকারী। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর উপর ঈমান আনবে, সে শুধুমাত্র মহান আল্লাহরই ইবাদাত করবে। একটি সুই বা সুইয়ের সুতাও যদি চাওয়ার দরকার হয়, সে তা চাইবে একমাত্র মহান আল্লাহর কাছেই। যদি ইবাদাতের উদ্দেশ্যে সামান্য মাথা ঝুকানোও হয়, তবে তা হবে একমাত্র মহান আল্লাহর জন্যই। সকল প্রকার কুরবানী, মান্নত, দু'আ শুধুমাত্র মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যেই হতে হবে। সকল প্রকার ইবাদাত একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই করতে হবে। এটাই হলো, তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ বা তাওহীদুল ইবাদার দাবী।

তাওহীদুল ইবাদাহ বুঝার আগে আমাদের বুঝতে হবে ইবাদাত কাকে বলে?

ইবাদাহ (আল ইবাদাতি) অর্থ উপাসনা, দাসত্ব, ভক্তি-বিনয়, ড়িৎংযরঢ়, ইত্যাদি। শরী'আতের পরিভাষায়, "কারো প্রতি পরিপূর্ণ ভালোবাসা, বিনয়, ভক্তি ও ভীতির বহিঃপ্রকাশ ঘটানোকে ইবাদাত বলা হয়।"

মহান আল্লাহর ইবাদাত বিভিন্ন মাধ্যমে করা হয়ে থাকে, যেমন- সালাত, যাকাত, হজ্জ, কুরবানি, দু'আ ইত্যাদি। আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদের সৃষ্টি করেছেন, একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করার জন্য । আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা এ প্রসঙ্গে বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ - "আর জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদাত করবে।" (সূরাহ আয-যারিয়াত : ৫৬ আয়াত)

মহান আল্লাহ একমাত্র ইবাদাত পাওয়ার হকদার। তবে মুসলিমদের মধ্যে অনেকেই মহান আল্লাহর ইবাদাতে শিরক করে থাকে। যেমন- মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে পালনীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত হলো একমাত্র তাঁরই উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করা। যুগে যুগে কাফির মুশরিক্বরা মহান আল্লাহ ছাড়া আর যার পূজা করতো, তাদের জন্য তারা পশু বহন করে নিয়ে আসত এবং তাদের নামে সেগুলোকে তারা যবেহ করতো। আমাদের দেশেও ঠিক একইভাবে পীর বা মাজারের উদ্দেশ্যে পশু বহন করে নিয়ে গিয়ে সেগুলোকে সেখানে ঐ পীর বা মাজারের উদ্দেশ্যে যবেহ করে থাকে, যা একটি স্পষ্ট শিরক। এধরণের কাজ মুশরিক্বদের আক্বীদা ও বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত। পীর বা মাজারে শায়িত ব্যক্তিদেরকে বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী মনে করে তাদের উদ্দেশ্যে পশু বহন করে নিয়ে গিয়ে যবেহ করার মাধ্যমে তারা মূলত পীর বা মাজারে শায়িত ব্যক্তিদের নৈকট্য, শাফা'আত ও দুনিয়াবী উদ্দেশ্য হাসিলের চেষ্টা করে থাকেন। এভাবে তারা মূলত মহান আল্লাহর ইবাদাতের পাশাপাশি ঐ মাজারে

শায়িত কোন বান্দার ইবাদাত করে থাকেন। যদি একান্তই পশু যবেহ করে খাওয়াতেই হয়, তবে তা বিশেষ স্থানে এবং বিশেষ উদ্দেশ্যে কেন? মহান আল্লাহর বান্দারা সব জায়গায় রয়েছেন। সুতরাং নিজ এলাকায় পশু যবেহ করে খাওয়ালেই হয়, তাতেই মহান আল্লাহর নৈকট্য খুব সহজেই পাওয়া যাবে। কোন মাজার বা পীরের উদ্দেশ্যে পশু বহন ও যবেহ করা তাওহীদুল উলূহিয়্যাহর বিপরীত এবং সরাসরি শিরক।

একমাত্র মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে পালনীয় একটি ইবাদাত হলো নযর বা মান্নত। কোন উদ্দেশ্য পূরণ বা কোন বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য কোন কাজ। যেমন- নফল সালাত ও সিয়াম, অর্থ দান, পশু কুরবানী ইত্যাদিকে নিজের জন্য আবশ্যক করে নেওয়াই হলো নযর বা মান্নত। মান্নত একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই করা যাবে। কেউ যদি বলে যে, "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার কর, তবে অমুক মাজারে আমি টাকা দিব", তবে এটাই হবে শিরক । যা তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ বা তাওহীদুল ইবাদার খিলাফ।

একমাত্র মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে পালনীয় একটি ইবাদাত হলো দু'আ। দু'আ কোনরূপ মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি একমাত্র আল্লাহর কাছেই করতে হবে। আর যখন এর মধ্যে কোন মাধ্যম প্রবেশ করবে, তখনই দু'আ হয়ে যাবে শিরক। আল্লাহ ছাড়া আর কারো নিকট প্রার্থনা করা যাবে না। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর কাছেও না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর নামে সহীহ হাদীস ভিত্তিক যতগুলো দরূদ পড়া হয়, সেখানে মূলত মহান আল্লাহর কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর জন্য দু'আ করা হয়। তাই দরূদ পাঠ করার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর ইবাদাত করা হয় না, বরং একমাত্র মহান আল্লাহরই ইবাদাত করা হয়। রাসূলুল্লাহ এর কাছ থেকে ইবাদাত ও প্রার্থনার নিয়মকানুন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হবে, কিন্তু ইবাদাত ও প্রার্থনা রাসূল কে উদ্দেশ্য করে করা যাবে না। কেননা এর হকদার একমাত্র আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লাহ। 'সিজদা' মহান আল্লাহর একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। তাই একমাত্র মহান আল্লাহ ব্যতীত আর কারো কাছে মাথা নত করা যাবে না।

সকল প্রকার ইবাদাতের বহিঃপ্রকাশ মহান আল্লাহ ছাড়া আর কারো উদ্দেশ্যে করা যাবে না। যদি কেউ আল্লাহ ছাড়া আর কারো সামান্যতম ইবাদাতও করে, তবেই সে মুশরিক্ব। মহান আল্লাহ তার থেকে কোন ইবাদাতই গ্রহণ করবেন না। এ জন্যই আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা কুরআনুল কারীমের যত

জায়গায় তাঁর ইবাদাতের কথা বলেছেন, সেখানে একনিষ্ঠভাবে শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদাতের নির্দেশ দিয়েছেন।

ইবাদাত কবুল হওয়ার শর্ত তিনটি, তন্মধ্যে একটি হলো 'ইখলাস' (আল-ইখলাস) তথা একনিষ্ঠতা। অর্থাৎ ইবাদাত একনিষ্ঠভাবে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই হতে হবে। কোন লোক দেখানো ইবাদাতসহ সকল প্রকার শিরকযুক্ত ইবাদাত আল্লাহ কবুল করবেন না। আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা বলেন,- وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ "আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ইবাদাত করে, তাঁরই জন্য দীনকে একনিষ্ঠ করে ।" (সূরাহ আল-বায়্যিনাহ : ৫ আয়াত)

মহান আল্লাহ আরো বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ -

"হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবের ইবাদাত কর, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদেরকে, যাতে তোমরা তাক্বওয়া অবলম্বন কর।" (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ২১ আয়াত)

মহান আল্লাহ আরো বলেন, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا - "তোমরা ইবাদাত কর মহান আল্লাহর, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না ।" (সূরাহ আন-নিসা : ৩৬ আয়াত)

তিনি আরো বলেন, لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا - "দীন গ্রহণের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই। নিশ্চয় হিদায়াত স্পষ্ট হয়েছে ভ্রষ্টতা থেকে। অতএব, যে ব্যক্তি তাগূতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই সে মজবুত রশি আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয়।" (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ২৫৬ আয়াত)

অর্থাৎ একনিষ্ঠ তাওহীদের অধিকারী ব্যক্তি মহান আল্লাহর ইবাদাত এমনভাবে করে যে, তার ইবাদাতে কোন শিরক থাকে না। আর এটাই হলো তাওহীদুল ইবাদার দাবী।

ওলী অর্থ বন্ধু। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা হলো, **আল মুউমিনুনা কুল্লাহুম আউলিয়া-উর রহমানি অআকরামু হুম ইন্দাল্লাহি আতাউওয়াআহুম অআতবাউহুম লিল কুরআনী** অর্থাৎ "সকল মুমিন করুণাময় আল্লাহর ওলী । তাঁদের মধ্য থেকে যে যত বেশি আল্লাহর অনুগত ও কুরআনের অনুসরণকারী সে ততবেশি আল্লাহর নিকট সম্মানিত (ততবেশি

বেলায়াতের অধিকারী)।" (ইমাম তাহাবী, শারহুল-আক্বীদা (আল-মাকতাবাহ আশ-শামিলাহ) ২৩৭ পৃ.)

আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা বলেন, اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ - "যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদের অভিভাবক, তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন।" (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ২৫৭ আয়াত)

সুতরাং নির্দিষ্ট করে কাউকে আল্লাহর ওলী বলা নিষেধ। সাহাবায়ে কিরাম রাজিয়াল্লাহু আনহুম তারা সকলেই ছিলেন আল্লাহর ওলী। তাদের ব্যাপারে দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ এসেছে। অথচ তারা কখনই একে অপরকে ওলী বলে সম্বোধন করেননি। কোন ব্যক্তির ব্যাপারে এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয় যে, লোকটা জান্নাতে যাবে। মৃত্যুর পূর্বে লোকটি কুফরিও করতে পারে। অথবা তার কোন গুনাহের কারণে সে জাহান্নামীও হতে পারে। যেমন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর সময়ে এক ব্যক্তি ঈমান আনয়নের পর আত্মহত্যার মাধ্যমে জাহান্নামী হয়ে যায়। সাহল ইবনু সা'দ আস-সা'ঈদী থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত এক ব্যক্তির দিকে তাকালেন। লোকটি ছিল ধনী এবং প্রভাবশালী লোকদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বললেন, কেউ জাহান্নামী লোক দেখতে চাইলে, সে যেন এই লোকটিকে দেখে। (ফলে) এক লোক তার পেছনে পেছনে যেতে লাগল । সে যুদ্ধ করতে থাকলো অবশেষে আহত হয়ে গেল। তখন সে শীঘ্রই মৃত্যু কামনা করলো, সে তারই তরবারীর অগ্রভাগ বুকের উপর রেখে সজোরে এমনভাবে চাপ দিল যে, তলোয়ারটি তার বক্ষ ভেদ করে পৃষ্ঠদেশ পার হয়ে গেল। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বললেন, কোন লোক এমন কাজ করে যায়, যা দেখে লোকেরা একে জান্নাতী লোকের কাজ বলে মনে করে। কিন্তু (আসলে) সে জাহান্নামবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। আর কোন বান্দা এমন কাজ করে যায়, যা দেখে লোকেরা একে জাহান্নামীদের কাজ বলে মনে করে। অথচ সে জান্নাতী লোকদের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুতঃ শেষ অবস্থার উপরই 'আমালের ফলাফল নির্ভর করে। (সহীহুল বুখারী (তাওহীদ, hadithbd.com), হা/৬৪৯৩)

কাফির মুশরিকরা আল্লাহর ইবাদাতের পাশাপাশি আল্লাহর নৈকট্যভাজন বান্দা বা ওলীদেরও উপাসনা করতো। মহান আল্লাহর ইবাদাতের ক্ষেত্রে তারা মুসলিমদের মতো আল্লাহ, আল্লাহুম্মা, রব্বানা, রব্বী ইত্যাদি শব্দ

ব্যবহার করতো। যেমন আবূ জাহল ও তার বাহিনী বদরের যুদ্ধের পূর্বে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বলেন, وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَـٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ - আর স্মরণ কর, যখন তারা বলেছিল, 'হে আল্লাহ, যদি এটি সত্য হয় আপনার পক্ষ থেকে তাহলে আমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করুন অথবা আমাদের উপর অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক আযাব নিয়ে আসুন'। (সূরাহ আল-আনফাল : ৩২ আয়াত)

আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা আবূ জাহলের দু'আকে কবুল করে নিয়ে অন্যত্র এ প্রসঙ্গে বলেন,- إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ "(ওহে কাফিরগণ!) তোমরা মীমাংসা চাচ্ছিলে, মীমাংসা তো তোমাদের কাছে এসে গেছে;" (সূরাহ আল-আনফাল : ১৯ আয়াত)। সুতরাং এরাই আবার তাওয়াফের সময়ে মহান আল্লাহর নামে তাওয়াফের পাশাপাশি তাদের সে সকল মনগড়া উপাসকদেরও তাওয়াফ করতো। এ প্রসঙ্গে ইবনু 'আব্বাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, মুশরিকরা বলত, **'লাব্বায়কা লা- শারীকা লাকা'**। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলতেন, তোমাদের ক্ষতি হোক, ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও (সামনে আর বলো না)। তারা এর সাথে আরও বলতো, **ইল্লা শারীকান হুওয়া লাকা তামলিকুহু অমা মালাকা ইয়া কুলুনা হাজা অহুম ইয়াতুফুনা বিল বাইতি অর্থাৎ** "কিন্তু হে আল্লাহ! তোমার আরও একজন শারীক আছে- তুমিই যার মালিক এবং সে কিছুরই মালিক নয়।" তারা এ কথা বলতো আর বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করতো। (সহীহ মুসলিম (হাদীস একাডেমী, hadithbd.com), হা/২৭০৫)

অর্থাৎ তারা ছোটখাটো বিপদ-আপদ ও প্রয়োজনে কেবল আল্লাহর নৈকট্যভাজন প্রিয় বান্দাদের নিকট চাইতো, আর যেকোন বড় ও জটিল বিষয়গুলোতে তারা মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতো। এর উদাহরণ পেশ করে মহান আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা বলেন, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ - "তারা যখন নৌযানে আরোহণ করে, তখন তারা একনিষ্ঠভাবে মহান আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে স্থলে পৌঁছে দেন, তখনই তারা শিরকে লিপ্ত হয়।" (সূরাহ আল-আনকাবূত : ৬৫ আয়াত)

কাফির মুশরিকদের এ ধরণের শিরকী আক্বীদার মূল কারণ হলো মহান আল্লাহর ক্ষমতাকে দুনিয়াবী ক্ষমতার সাথে তুলনা করা। দুনিয়াতে যেমন ক্ষমতা পরিচালনার জন্য অনেক লোকজনের প্রয়োজন হয়, তারা ধরে নিয়েছে

যে, মহান আল্লাহরও তেমনি বিশ্ব পরিচালনার জন্য তাঁর নৈকট্যভাজনদের প্রয়োজন হয়। এ সকল নৈকট্যভাজনগণ মহান আল্লাহর পাশে থেকে বিশ্ব পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দায়–দায়িত্বসমূহ পালন করে থাকেন, নাউযুবিল্লাহ। তারা আরোও বিশ্বাস করেন যে, মহান আল্লাহর এ সকল নৈকট্যভাজনগণ শাফা'আতের ক্ষমতা রাখেন। অথচ শাফা'আতের ব্যাপারে আল্লাহ "আযযা ওয়া জাল্লা বলেন,- مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে?" (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ২৫৫ আয়াত) অর্থাৎ মহান আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কেউ কারো জন্য শাফা'আত করতে পারবে না ।

বর্তমানে মুসলিমদের মধ্যেও অনেকে কাফির মুশরিক্বদের মতো সুনিশ্চিত শাফা'আত লাভের আশায় সরাসরি মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে না ঝুঁকে বিভিন্ন পীর বুযুর্গদেরকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন। তারা বলেন, "আমি আমার কলবের প্রতি মুতাওয়াজ্জাহ আছি, আমার কলব পীর সাহেব কিবলাহর কলব হয়ে, অমুক অমুক কলবে অতঃপর রাসূল হয়ে আল্লাহর দিকে," নাউযুবিল্লাহ। এগুলো শিরক।

মুসলিমদের কিবলাহ একটিই; আর তা হলো বাইতুল্লাহ। এর বাইরে যদি কিবলাহ বানানো হয়, যেমন- পীর সাহেব কিবলাহ, এটা হবে শিরক ।

এছাড়াও নবী-রাসূল আলাইহিস সাল্লাম আত্-তাসলিমাগণ ও নেককার বান্দাদের মুজিযাহ ও কারামাত কাফির মুশরিক্বদের অন্তরে এই ধারণার জন্ম দিয়েছে যে, নবী-রাসূল আলাইহিস সাল্লাম আত্-তাসলিমাগণ ও নেককার বান্দাদের অলৌকিক ক্ষমতা রয়েছে। তারা চাইলেই সে ক্ষমতার মাধ্যমে ছোটখাটো বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে। তাই তাদেরকেও যদি উপাসনার মাধ্যমে আকৃষ্ট করা যায়, তবে তাদের সে সকল অলৌকিক ক্ষমতা দ্বারা উপকৃত হওয়া যাবে। এগুলোই মূলত শিরক, যা তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ তথা তাওহীদুল ইবাদার খিলাফ। আমাদের ঈমানের মূল বিষয় হলো তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ। আমরা একমাত্র মহান আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি এবং মেনে নিয়েছি যে, **লা -ইলা-হা- ইল্লাল্লাহু** অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্য মা'বূদ নেই। যার গূঢ়ার্থ হলো **লা-ইবাদাতা ইল্লা লিল্লাহি** অর্থাৎ **আল্লাহ ছাড়া আর কারো সামান্যতম ইবাদাতও করা যাবে না।**

কিন্তু আজ আমরা অনেকেই জেনে বা না জেনে আমাদের ইবাদাতগুলোকে বিভিন্ন কবর, মাজার ও পীর কেন্দ্রিক করে নিচ্ছি। আবার আমরাই নিজেদের মুসলিম পরিচয় দিচ্ছি, কিন্তু কাজ করছি মুশরিক্বদের

মতো। এ জাতীয় সকল শিরক থেকে মুক্ত হয়ে তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ তথা তাওহীদুল ইবাদাহয় বিশ্বাসী হতে হবে। নতুবা আমাদের মৃত্যু ঈমানের সাথে হবে না। মৃত্যুর সময়ে আমাদের কালেমাহ নসীব হবে না।
আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা আমাদের সবাইকে তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ ভালোভাবে অনুধাবন করে খালেস মুমিন হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন। আমীন! ইয়া রব্বাল 'আলামীন!

মহান আল্লাহর প্রতি ঈমানের অর্থ মহান আল্লাহর একত্বে বা তাওহীদে বিশ্বাস করা। বিভিন্ন সহীহ হাদীসে প্রিয় নবীজী মহান আল্লাহর প্রতি ঈমানের বর্ণনা দিয়েছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, প্রিয় নবীজী বলেন, "ইসলামকে পাঁচটি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, তাহলো "বিশ্বাসের সাক্ষ্য দেওয়া যে, মহান আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মাবুদ বা উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল, সালাত কায়েম করা, জাকাত প্রদান করা, রামাজান মাসের সিয়াম পালন করা, বাইতুল্লাহর হাজ্ব আদায় করা।" (বুখারী, মুসলিম)

আনাস ইবনু মালিক রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবীজী বলেছেনঃ "যে কোন ব্যক্তি যদি সাক্ষ্য প্রদান করে যে মহান আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ বা উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা তাঁর বান্দাহ ও রাসূল, তবে তার জন্য মহান আল্লাহ জাহান্নামের আগুন হারাম বা নিষিদ্ধ করে দেবেন।" (মুসলিম)

আল্লাহ শব্দের তাৎপর্য ঃ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেন ঃ মহান আল্লাহর একশোতে এক কম নিরানব্বই নাম আছে। যে এ নাম গুলিতে (তাঁকে) স্মরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য)

মহান আল্লাহর এই যে নিরানব্বই নাম তা কিন্তু মহান আল্লাহর গুণ, প্রকৃত স্বরূপ নয়, কেননা গুণ হতে বস্তু পৃথক। শিখার জ্যোতি যেমন প্রকৃত শিখা নয়। মহান আল্লাহর গুণও তেমনি মহান আল্লাহ নয়। মহান আল্লাহ হচ্ছেন আসল সত্ত্বা (ইসমে যাত, ইসমে আযম), বাকী নামগুলো তাঁর বিশেষণ (ইসমে সিফাত)। মহান আল্লাহকে কেন্দ্র করে নামগুলি ছড়িয়ে আছে।

মহান আল্লাহ তা'আলা কিন্তু এই নিরানব্বই নামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এর বাইরেও তিনি। মানুষের জ্ঞান সসীম কাজেই আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি যতদূর নাগাল পায় ততদূর পর্যন্তই মহান আল্লাহ নিজের পরিচয় দিয়াছেন। এখানে শুধু এতটুকু বলিতে চাই যে, মহান আল্লাহকে কেহ নিজের উপর কিয়াস করিবেন না। যেমন মহান আল্লাহ, তেমনি তাঁহার সিফাত। যেমন মহান আল্লাহ যে কি? এবং কেমন ? তাহা আমাদের জ্ঞানের বাহিরে। অবশ্য আমাদের অকাট্য বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে তিনি বা তাঁহার সিফাত আমাদের মত নিশ্চয়ই নয়। তাই পবিত্র কুরআনে সকল পরিচয়ের উর্দ্ধে নিজের স্বরুপ বর্ণনা করেছেন ঃ

- لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ **"লাইছা কামিসলিহি শাইউন** অর্থাৎ কোন কিছুই তাঁর মত নহে (আশ শূরা– ১১) অর্থাৎ কোন বস্তুই মহান আল্লাহর মত নহে। তবে কেমন ? তাহা হৃদয়ঙ্গম করা লোক শক্তির বাহিরে। যেমন এ বিষয়ে মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ - وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

ওয়ালাম ইয়া কুল্লাহু কুফুআন আহাদ অর্থাৎ তার তথা মহান আল্লাহর সমকক্ষ আর কেউ নেই। (ইখলাছ-৪) অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ আরো বলেছেন,

- فَلاَ تَضْرِبُواْ لِلّهِ الأَمْثَالَ إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

"ফালা তাজরিবু লিল্লাহি আমছালা ইন্নাল্লাহা ইয়ালামু ওয়া আনতুম লা তা'আলামুন অর্থাৎ তোমরা মহান আল্লাহর জন্য উপমা বা তুলনা স্থাপন করবে না। নিশ্চয় মহান আল্লাহ জানেন আর তোমরা জান না।" (নাহল-৭৪) অন্য আয়াতে আল্লাহ সুবহানা ওয়া তা'আলা আরো বলেন,

- اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَا الْحُسْنَى

"আল্লাহু লা-ইলা-হা-ইল্লা হুওয়া লাহুল আসমা উল হুসনা অর্থাৎ মহিমান্বিত আল্লাহ, তিনি ছাড়া প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই, সমস্ত উত্তম নাম তাঁরই।" (তাহা-৮)

মহিমান্বিত বিশ্বস্রষ্টা মহাপ্রভুকে বহু নামে অভিহিত করা হয়, কিন্তু সমস্তই তাহার গুণ বাচক নাম, তাঁহার প্রকৃত নাম হইতেছে **'আল্লাহ'**। (দুররে মুনসুর, লিসান, কামুস)

তাই জাহিলিয়াত যুগে আরবের প্রতিমা পূজকগণ তাহাদের কোন দেবতাকেই বিশ্বচরাচরের সৃষ্টিকর্তা বলিয়া স্বীকার করিতেন না। তাহারা সৃষ্টিকর্তাকে মহান আল্লাহ নামেই অভিহিত করিতেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ -

অর্থাৎ যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছে, চন্দ্র ও সূর্যকে কর্মে নিয়োজিত করেছে ? তবে তারা অবশ্যই বলবে 'আল্লাহ'। তাহলে তারা কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। (আনকাবুত– ৬১) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ - سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ-

অর্থাৎ বলুন, সপ্তাকাশ ও মহা আরশের মালিক কে ? এখন তারা বলবে ঃ **'আল্লাহ'**। বলুন, তবুও কি তোমরা ভয় করবে না ? (মুমিনুন– ৮৬-৮৭) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ - سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ -

অর্থাৎ বলুন, তোমাদের জানা থাকলে বল, কার হাতে সব বস্তুর কর্তৃত্ব, যিনি রক্ষা করেন এবং যার কবল থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না। এখন তারা বলবে ঃ 'আল্লাহর'। বলুন, তাহলে কোথা থেকে তোমাদের যাদু করা হচ্ছে ? (মুমিনুন– ৮৮-৮৯)

আল্লাহ শব্দের অপভ্রংশে হিব্রু ভাষায় এল, এলোয়া ও এলোহিম রূপে এবং সংস্কৃত ভাষায় অল্ল, অল্লা রূপে দৃষ্টিগোচর হয়। (Standard dictionary, বাঙ্গালা ভাষার অভিধান)

আল্লাহ নামবাচক বিশেষ্যপদ মাত্র, ক্রিয়াপদে উহা বুৎপত্তি সিদ্ধ নহে। এই মহিমান্বিত নাম শুধু মাত্র বিশ্বপতি জগতস্রষ্টার জন্যই নির্দিষ্ট। বাইবেল ও বেদ গ্রন্থে এবং প্রাচীনতম ভাষাসমূহে এই শব্দ সৃষ্টিকর্তা, আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শক, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বগ্রাহী, সর্ব্বব্যাপক ও বিভূষণ কারীর জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। পবিত্র কুরআন মজীদে মহান আল্লাহকে বহু নামে অভিহিত করা হইয়াছে কিন্তু

তিনি স্বয়ং নিজের জন্য মহান আল্লাহ নাম গ্রহণ করিয়াছেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي -

"ইন্নানী আনাল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা আনা, ফাআহ বুদনী ওয়া আকিমুছ সলাতা লি জিক্‌রী অর্থাৎ আমিই **'আল্লাহ'** আমি ব্যতীত কোন হক্ব ইলাহ নেই। অতএব আমার এবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে সলাত (নামাজ) কায়েম কর। (তাহা– ১৪)

সমগ্র পবিত্র কুরআনে উপরোক্ত ভাবে অন্য কোন নামে মহিমান্বিত প্রভু মহান আল্লাহ নিজেকে বিঘোষিত করেণ নাই। সুতরাং ইহাই তাঁহার আপন নাম **ইসমে যাত, ইসমে আযম**।

ইলাহ শব্দের আভিধানিক অর্থ ঃ

ইলাহ শব্দের আভিধানিক অর্থ হইতেছে উপাস্য, অর্চনার যোগ্য, স্রষ্টা, অন্নদাতা, ব্যবস্থাপক, ক্ষমতাশালী প্রভু, রক্ষাকারী, সুরক্ষণকারী, আশ্রয়দাতা, মুক্তি দাতা, সাহায্য কারী, পাপ মোচন কারী, উদ্ধার কর্তা, ত্রাণ কর্তা, নিরাপত্তা দানকারী ও প্রিয়তম। যেরূপ শিশু জননীর জন্য সমুৎসুক ও ব্যাকুল হইয়া থাকে। সেরূপ মানুষ স্বীয় প্রয়োজনে যাহার সাহায্যের নিমিত্ত আকুল এবং অনুগ্রহ ও আশ্রয়ের জন্য যাহার দিকে ধাবিত এবং বিপদাপদে যাহার দিকে অগ্রসর হয়, তাহাকে **'ইলাহ'** বলে। (লিসানুল আরব, Lane's lexicon)

যাহার উপাসনা করা হয় না, সে ইলাহ হইতে পারে না। ইলাহ তাহার উপাসকের স্রষ্টা, অন্নদাতা ও নিয়ামক এবং তাহার উপর ইলাহের প্রভুত্ব সর্বদা কার্যকরী। যাহার মধ্যে উল্লেখিত গুণাবলী নাই, সে ইলাহ নয়। লিসান।

মানুষ তাহার প্রতিপালককে ইলাহ রূপে গ্রহণ করিতে পারিলে, তাহার হৃদয়ে সে আর কাহাকেও স্থান দেয় না অর্থাৎ কাহারও দ্বারা সে আকর্ষিত হয় না এবং মহিমান্বিত মহান আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারো মহব্বত তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে না। (লিসান)

অতএব ইলাহ শব্দের আভিধানিক অর্থ এই দাঁড়াইল যে ঃ "মহান আল্লাহ ব্যতীত উপাস্য, অর্চনার যোগ্য, ক্ষমতাশালী প্রভু, রক্ষাকর্তা, আশ্রয় দাতা, সুরক্ষণকারী, মুক্তিদাতা, সাহায্যকারী, পাপ কালিমা বিধৌতকারী, উদ্ধারকর্তা, ত্রাণকর্তা, নিরাপত্তা দান কারী, আশ্রিত বৎসল, প্রিয়তম প্রেমাস্পদ,

স্রষ্টা, অন্নদাতা, প্রতিপালক, নিয়ামক ও ব্যবস্থাপক কেউ নাই। (কালেমা তৈয়্যেবা)

আল্লাহ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ

ইসলামী মতে সমগ্র বিশ্বজগতের একচ্ছত্র অধিপতি একমাত্র মহান আল্লাহ। মহান আল্লাহর সত্ত্বাগত নাম মহান আল্লাহ। তাঁর এই– **"আল্লা-হ"** নামটি আল-কুরআনে ২৬৯৮ জায়গায় উল্লেখিত হয়েছে। সেজন্য মহান আল্লাহ ছাড়া আর কারও নাম মহান আল্লাহ রাখা হয়নি। (আকীদাতুল মুসলিমীন ১ম খণ্ড, ৭৯ পৃষ্ঠা)

মহান আল্লাহ শব্দটি কোন শব্দ থেকে গঠিত কিনা– এ ব্যাপারে ইসলামী বিদ্বানদের মধ্যে মতভেদ আছে। আল্লামা কালবী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে বলেন, মহান আল্লাহ শব্দটি **ইসমে–জা–মিদ**। অর্থাৎ এ শব্দটি কোন শব্দ থেকে উৎপন্ন নয়। এর মধ্যকার – **"আলিফ ও লাম"** – বর্ণ দুটি এর অপরিহার্য অঙ্গ। এই আলিফ–লামটি আরবী ব্যাকরণের নিয়মানুসারে "মা'রিফাহ বা বিশেষকরণের **"আলিফ ও লা–ম"** নয়। (ঐ – ৮০ পৃষ্ঠা)

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে জারীর তাবারী রহিমাহুল্লাহ বলেন, মহান আল্লাহ শব্দটির আসল হচ্ছে– ইলা–হ। ইলা–হ শব্দের প্রথম বর্ণ হামযাহ উড়িয়ে দিয়ে ওর সাথে আলিফ লা-ম যোগ করার ফলে মহান **আল্লাহ** হয়েছে। অর্থাৎ মহান আল্লাহ শব্দটি হচ্ছে **আল + ইলা – হ = আল্লা–হ**। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস রাজিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, **আল্লাহু হুঅল্লাযী ইয়া'লাহূ কুল্লু শাইয়িন ওয়া ইয়া'বুদুহু কুল্লু খলক্বিন**– অর্থাৎ মহান আল্লাহ সেই, যাঁর উপাসনা করে প্রত্যেক জিনিসই এবং যাঁর গোলামী করে প্রত্যেক সৃষ্টিই। তাই মহান **আল্লাহ** শব্দের অর্থ –**যুলউলুহিয়্যাহ অলউবূদিয়্যাহ**, অর্থাৎ মহান আল্লাহ উপাসনা ও গোলামী পাবার যোগ্য। *(তাফসীরে তাবারী ১ম খণ্ড, ৪০ ও ৪১ পৃষ্ঠা)*

আল্লামা সীবওয়াহ বর্ণনা করেছেন খলীল থেকে যে, মহান আল্লাহ শব্দের আসল **ইলা-হ** শব্দটি ফিয়া–লের ওযনে। যেমন না–স শব্দটির আসল উনা-স। কারও মতে, মহান আল্লাহ শব্দের আসল **"লা–হ"**। সম্মানার্থে ওতে আলিফ ও লা–ম যোগ করে মহান আল্লাহ করা হয়েছে। কারও মতে, ইলা–হ আসলে ছিল ভিলা–হ (ওয়াও যের দিয়ে)। এর হামযাহটি ওয়াও দ্বারা বদলে দেওয়া হয়েছে। যেমন ইশা–হ ও ইসা–দাহ শব্দের হামযাটা বদলে ভিশা–হ

এবং ভিসা–দাহ করা হয়েছে। আরবী – **"অলাহা"** –শব্দের অর্থ তাহাইয়্যারা বা হতভম্ব হওয়া। ভিলা–হ বা ইলাহকে মহান আল্লাহ এজন্য বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহর প্রকৃতি বুঝতে সবারই বুদ্ধি হতভম্ব হয়ে যায়।

বিশিষ্ট তা–বিঈ যাহহাক বলেন, মহান আল্লাহর নাম ইলাহ এজন্য হয়েছে যে, সমস্ত সৃষ্টি তাদের সব প্রয়োজনে একমাত্র তাঁরই কাছে আশ্রয় নেয় এবং তাদের বিপদাপদে শুধু তাঁরই কাছে সবাই কাঁদাকাটা করে। *(তাফসীরে কুরতুবী ১ম খণ্ড, ৭২ ও ৭৩ পৃষ্ঠা)*

হাফিয ইবনে কাসীর রহিমাহুল্লাহ বলেন, রব্ব তাবা–রক ওয়া তা'আ–লার বিশেষ নাম মহান **আল্লাহ**। এটা এমনই নাম যে নামটা তাঁর ছাড়া আর কারও নামই নেই। এজন্য আরবদের ভাষায় অন্য কারও ব্যাপারে মহান **আল্লাহ** নামটি পরিচিত হয়নি। ইমাম রা–যী কতিপয় বিদ্বান থেকে বলেন, মহান আল্লাহ শব্দটি হিব্রু ভাষার শব্দ। এটা আরবী শব্দ নয়। তারপর তিনি বলেন, এই মতটি অতি দুর্বল। *(তাফসীর ইবনে কাসীর ১ম খণ্ড, ২০, ২১ পৃষ্ঠা)*

আল্লাহ নামের বিকল্প শব্দই নেই

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন নিজের নামের ব্যাপারে বলেন ঃ

هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا -

অর্থাৎ **"তুমি কি তাঁর সমগুণসম্পন্ন কাউকেও জান?"** (সূরাহ মারইয়্যাম ১৯ ঃ ৬৫)। এজন্য মহান আল্লাহ শব্দের প্রতিশব্দ পৃথিবীর কোন ভাষাতেই নেই। যেমন বাংলায় মহান আল্লাহর ভাবার্থে ঈশ্বর ও ভগবান প্রভৃতি শব্দ বলা হয়। উক্ত শব্দগুলোর স্ত্রীলিঙ্গ ঈশ্বরী ও ভগবতী আছে। তাই ঐ শব্দগুলো মহান আল্লাহর সমনাম হতেই পারে না। এজন্য বাংলা ভাষাতে মহান আল্লাহর বিকল্প কোন শব্দ না লিখে **'আল্লাহ'** শব্দটিই লেখা উচিত।

তেমনি ইংরেজী ভাষায় মহান আল্লাহর বিকল্প শব্দ God –ও লেখা চলবে না। কারণ গড–এর স্ত্রীলিঙ্গ Goddess আছে।

অথচ মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেছেন ঃ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ

"তাঁর কোন সঙ্গিনী নেই।" (সূরাহ আন'আম ৬ঃ ১০১)

তাই ইংরেজীতেও মহান আল্লাহর বিকল্প শব্দ **"গড"** না লিখে আল্লাহই লিখতে হবে। এজন্য সৌদি সরকার কর্তৃক অনূদিত ও প্রকাশিত ইংরেজি কুরআনের কোথাও God না লিখে Allah শব্দ লেখা আছে।

ফারসী ভাষায় মহান আল্লাহর বিকল্প শব্দ – **"খোদা"** – লেখা হয় বাংলা ভাষায়ও খোদা শব্দটি ঢালাওভাবে ব্যবহার করা হয়। **"খোদা"** শব্দটাও মহান আল্লাহর সমার্থবোধক শব্দ নয়। কারণ, খোদা শব্দের অর্থ মালিকও হয়। যেমন ফারসীতে বলা হয়–না–ও–খোদা। বহুল প্রচলনে না–খোদা অর্থাৎ নৌকার মালিক মাঝি। তাই মহান আল্লাহর বিকল্প হিসেবে খোদা শব্দটি ব্যবহার করলে মহান আল্লাহর অর্থ উপাস্য হওয়ার মধ্যে বিকৃতভাব প্রকাশ পায়। যার মধ্যে কিছুটা শিরকের গন্ধ আসে। অতএব মহান আল্লাহর বিকল্প শব্দ হিসেবে খোদা শব্দও লেখা চলবে না।

ফারসী ভাষায় মোটেই জ্ঞান নেই এমন কিছু বাঙালী লেখক বাংলাতে খোদা শব্দটিকে **"খুদা"** লিখেছেন। এরূপ উচ্চারণ ভুল। তাই ঐ বানান লেখকদের ভুলটা সংশোধন করে নেওয়া উচিত। খোদা শব্দের শব্দগত প্রকৃতি জানার আগে ইতোপূর্বে অনেক বইয়ে আমি নিজেও খোদা শব্দটি লিখেছি। তাই সবাইকে জানিয়ে আগামীর জন্য ঐ ভুলটা আমি নিজেও সংশোধন করে নিলাম। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে প্রকৃত সত্য গ্রহণ করার তাওফীক্ব দিন। (আমীন) *(ঈমান ও আক্বীদা ১/ ২৬-২৮ পৃ:)*

অন্য একটি হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, মহান আল্লাহর নামগুলো নিরানব্বই সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। যেমন বিখ্যাত সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত কিংবা দুর্দশাগ্রস্ত হয়, অতঃপর সে যদি একটি দু'আ পড়ে তাহলে মহান আল্লাহ তার ঐ দুশ্চিন্তা এবং দুঃখ দূর করে দেবেন। ঐ দু'আর মধ্যে এই শব্দগুলো আছে ঃ **আসআলুকা বিকুল্লি ইসমিন হুওয়া লাকা সাম্মাইতা বিহী নাফসাকা আও আনযালতু ফী কিতা-বিকা আও আল্লামতাহূ আহাদাম মিন খলক্বিকা আভিসতা'সারতা বিহী ফী 'ইলমিল গাইবি ইনদাকা**।

অর্থাৎ আমি তোমার কাছে ভিক চাচ্ছি তোমার সেই সমস্ত নামের দোহাই দিয়ে যা দ্বারা তুমি নিজের নাম রেখেছো। কিংবা যা তুমি তোমার গ্রন্থে নাযিল করেছো। অথবা যা তুমি তোমার সৃষ্টির মধ্যে কাউকে শিখিয়েছো কিংবা তোমার নিকটে যে অদৃশ্য জ্ঞান আছে তাতে তুমি যে নামকে প্রাধান্য দিয়েছো।

(আহমাদ, আবূ ইয়ালা, তাবারানী, বাযযার, মাজমাউয যাওয়া–য়িদ ১০ খণ্ড–১৮৬ পৃষ্ঠা, বাইহাকীর কিতা-বুল আসমা ওয়াসসিফাত, তাফসীর দুররে মানসূর ৩য় খণ্ড–২৭১ পৃষ্ঠা)

উক্ত, হাদীসটিতে এ কথা পরিষ্কার রয়েছে যে, মহান আল্লাহর এমন অনেক নাম আছে, যার জ্ঞানের দোহাই দ্বারা তিনি কোন জিনিসকে প্রাধান্য দেন। তাই তিরমিযীর ভাষ্যকার আল্লামা ইবনুল আরাবী মালিকী তাঁর **'আ–রিয়াতুল আহয়াযী'** গ্রন্থে কোন বিদ্বান থেকে বলেন যে, তিনি পবিত্র কুরআন ও হাদীস থেকে মহান আল্লাহর এক হাজার নাম সংগ্রহ করেছেন। অবশ্য প্রকৃত জ্ঞান তো মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে আছে। *('আকীদাতুল মুসলিমীন ১ম খণ্ড, ৭৮ পৃঃ তাফসীল ফাতহুল বায়ান ৩য় খণ্ড, ৪১৩ পৃঃ)*।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা একবার দু'আ কবূলের জন্য অযূ করে মাসজিদে ঢুকে দু' রাক'আত সালাত আদায়ের পর একটি দু'আ পড়ার কথা 'আয়িশা রাজিআল্লাহু আনহাকে বলেন। ঐ দু'আর মধ্যে এই শব্দগুলো আছে ঃ **আল্লা–হুম্মা ইন্নী আসআলুকা বি–জামীয়ি আসমা–য়িকাল হুসনা কুল্লিহা মা–'আলিমনা মিনহা ওয়ামা–লাম না'লাম** –অর্থাৎ হে আমার মহান আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ভিক চাচ্ছি তোমার সেই সমস্ত উত্তম নামগুলোর দোহাই দিয়ে যার মধ্যে কিছু আমরা জানি এবং কিছু আমরা জানিই না। *(বাইহাকী, তাফসীর দুররে মানসূর ৩য় খণ্ড, ২৭১ পৃষ্ঠা)*।

তাই ইমাম রা–যী কিছু বিদ্বান থেকে এ কথা উল্লেখ করেছেন যে, মহান আল্লাহর পাঁচ হাজার নাম আছে। পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসে এক হাজার। তাওরাতে এক হাজার। ইনজীলে এক হাজার। যাবূরে এক হাজার। আরও লাওহে মাহফূযে এক হাজার।

(তাফসীরে কাবীর ১ম খণ্ড, ৭৯ পৃষ্ঠা; তাফসীর ইবনে কাসীর ১ম খণ্ড, ২০ পৃষ্ঠা) ***(ঈমান ও আক্বীদা ১/ ২৯-৩১ পৃ:)***

মহান আল্লাহর গুণবাচক বিভিন্ন নাম

আগে বর্ণিত বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে মহান আল্লাহর নিরানব্বইটি নামের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কোন সহীহ হাদীসে ঐ নামগুলোর উল্লেখ নেই। তবে যঈফ তথা দুর্বল সূত্রের হাদীসে ঐ নামগুলোর উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন ইমাম তিরমিযী, ইবনুল মুনযির, ইবনে হিব্বান, ইবনে মানদাহ, তাবারানী, হাকিম, ইবনে মারদুইয়া ও বাইহাক্বী প্রমুখ আবূ হুরায়রা রাজিআল্লাহু

আনহু থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেন ঃ নিশ্চয়ই মহান আল্লাহর নাম নিরানব্বই –এক কম একশো। যে ব্যক্তি তা আয়ত্ব করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তিনি বিজোড়। বিজোড়কে ভালোবাসেন। নামগুলো এই ঃ

(১) আল্লাহ। (২) আর-রহমান। (৩) আর–রহীম। (৪) আল–মালিক। (৫) আল–কুদ্দুস। (৬) আস–সালাম। (৭) আল–মু'মিন। (৮) আল–মুহাইমিন। (৯) আল–'আযীয। (১০) আল–জাব্বার। (১১) আল–মুতাকাব্বির। (১২) আল খা–লিক্ব। (১৩) আল বা–রী। (১৪) আল–মুসাওভির। (১৫) আল–গফফার। (১৬) আল–ক্বাহহা–র। (১৭) আল ওয়াহহা–ব। (১৮) আর রাযযা–ক্ব। (১৯) আল– ফাত্তা–হ (২০) আল 'আলীম। (২১) আল ক্বা–বিয। (২২) আল বা–সিত্ব। (২৩) আল খা–ফিয। (২৪) আর রা–ফি' (২৫) আল মু'ঈয। (২৬) আল মুযিল্লু। (২৭) আস–সামীউ। (২৮) আল বাশীর। (২৯) আল হাকাম (৩০) আল আ'দল (৩১) আল লাত্বীফ। (৩২) আল খাবীর। (৩৩) আল হালীম। (৩৪) আল 'আযীম। (৩৫) আল গফুর। (৩৬) আশ শাকুর। (৩৭) আল আলী। (৩৮) আল কাবীর। (৩৯) আল হাফীয। (৪০) আল মুকিত। (৪১) আল হাসীব। (৪২) আল জালীল (৪৩) আল কারীম। (৪৪) আর রাকীব। (৪৫) আল মুজীব। (৪৬) আল ওয়া–সি'উ। (৪৭) আল হাকীম (৪৮) আল ওয়াদুদ। (৪৯) আল মাজীদ। (৫০) আল বা–'ঈস। (৫১) আশ শাহীদ। (৫২) আল হাক্ব। (৫৩) আল ওয়াকীল। (৫৪) আল কাভিইয়্যু। (৫৫) আল মাতীন। (৫৬) আল ওয়ালিইয়্যু। (৫৭) আল হামীদ। (৫৮) আল মুহস্বী। (৫৯) আল মুবদী। (৬০) আল মু'ঈদ। (৬১) আল মুহয়ী। (৬২) আল মুমীত। (৬৩) আল হাইয়্যু। (৬৪) আল কাইয়্যুম। (৬৫) আল ওয়া–জিদ। (৬৬) আল মা–জিদ। (৬৭) আল ওয়া–হিদ। (৬৮) আল আহাদ। (৬৯) আস সামাদ। (৭০) আল ক্বা-দির। (৭১) আল মুকতাদির। (৭২) আল মুক্বাদ্দিম। (৭৩) আল মুআখখির। (৭৪) আল আউওয়াল। (৭৫) আল আ–খির। (৭৬) আয যা–হির। (৭৭) আল বা–ত্বিন। (৭৮) আল বার। (৭৯) আত তাওওয়া–ব। (৮০) আল মুন্তাক্বিম। (৮১) আল আ'ফুওই। (৮২) আর রাউফ। (৮৩) মা–লিকুল মুলকি যুলজালা–লি ওয়াল ইকরা–ম। (৮৪) আল ওয়া–লী। (৮৫) আল মুতা'আ–ল। (৮৬) আল মুক্বসিত্ব। (৮৭) আল জা–মি'উ। (৮৮) আল গানিইয়্যু। (৮৯) আল মুগনী। (৯০) আন নূর। (৯১) আল মা-নিউ। (৯২) আন না–ফিউ। (৯৩) আয যা–ররু। (৯৪) আল হা–দী। (৯৫) আল বাদী'।

(৯৬) আল বা–ক্বী। (৯৭) আল ওয়া–রিস। (৯৮) আর রশীদ। (৯৯) আস সবূর। (তাফসীর দুররে মানসূর ৩য় খণ্ড, ২৭০ পৃষ্ঠা)

হাফিয আবূ নু'আইম বর্ণনা করেন, মুহাম্মাদ ইবনে জা'ফার থেকে। মুহাম্মাদ বলেন, আমি আমার পিতা আবূ জা'ফার ইবনে মুহাম্মাদ আস সাদিককে মহান আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন তা পবিত্র কুরআনে আছে এরূপ। *(তাফসীর দুররে মানসূর ৩য় খণ্ড, ২৭১, পৃষ্ঠা)*

উক্ত জা'ফার আস সাদিকের পবিত্র কুরআন থেকে সংগৃহীত নিরানব্বইটি নামের মধ্যে অধিকাংশ নামই এর আগে তিরমিযী বর্ণিত যঈফ হাদীসটিতে আছে। আর তাঁর সন্ধানকৃত কিছু নাম এমন আছে যা পূর্বোক্ত হাদীসটিতে সেই। সেগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো ঃ

সূরাহ আল-ফা–তিহায় আছে ঃ (১) রব্ব এবং সূরাহ বাক্বারাতে আছে ঃ (২) ক্বাদীর। (৩) কা–ফী। (৪) শা–কির। (৫) ইলা–হ। (৬) ক্বরীব। (৭) নাসীর। (৮) শাদীদ। (৯) সারী'অ। সূরাহ আ–লে 'ইমরানে আছে ঃ (১০) ক্বা–য়িম। (১১) স্বা–দিক্ব। (১২) মুন'ইম। (১৩) মুতাফাযযিল। সূরাহ আল–আন'আমে আছে ঃ (১৪) ফ–ত্বির। (১৫) বুরহা–ন। সূরাহ আনফালে আছে ঃ (১৬) আল–মাওলা। (১৭) আন–নাসীর। সূরাহ ইবরাহীমে আছে ঃ (১৮) মান্না–ন। সূরাহ হিজরে আছে ঃ ১৯) খালাক্ব। সূরাহ মারইয়ামে আছে ঃ (২০) ফার্দ। সূরাহ নূরে আছে ঃ (২১) মুবীন। সূরাহ যুমারে আছে ঃ (২২) 'আ–লিম। সূরাহ মু'মিনে আছে ঃ (২৩) গা–ফির। (২৪) রফী'। সূরাহ কামারে আছে ঃ (২৫) মালিক।

হাফিয ইবনে **'আবিদ দুনয়্যা 'আদ্ দু'আ'** গ্রন্থে এবং আল্লামা তাবারানী, আবুশ শাইখ, হা–কিম, ইবনে মারদুইয়া, আবূ নু'আইম ও বাইহাক্বী প্রমুখ আবূ হুরায়রা রাজিআল্লাহু আনহু –এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা মহান আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে নিম্নের নামগুলো অন্যান্য বর্ণনায় নেই। তা হলো এই ঃ (১) আল–হান্নান। (২) আল বা–দী। (৩) আল মুগীস। (৪) আদ দা–য়িম। (৫) আল–মুনীর। (৬) আল–জামীল। (৭) আস–স্বাদিক্ব। (৮) আল –ক্বাদীম। (৯) আল্লাম (১০) আল–মুদাব্বির। (১১) আল–কাফীল। *(তাফসীর দুররে মানসূর ৩য় খণ্ড, ২৭০ পৃঃ)*

হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী রহিমাহুল্লাহ (মৃতঃ ৮৫২ হিঃ) আল –কুরআন থেকে মহান আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম খুঁজে বের করেছেন। তন্মধ্যে নিম্নের নামগুলো পূর্বে বর্ণিত জা'ফার আস সাদিক–এর অনুসন্ধানকৃত নামের মধ্যে নেই। তা হলো এই ঃ (১) আল মুস্তা'আ–ন। (২) আল–খাফিই। (৩) আল গা–লিব। (৪) আল আকরম। (৫) আল আ'লা–। *(আল 'আকীদাতু ফিল্লা-হ ১৯২ পৃষ্ঠা)*

ইমাম ইবনে হাযম রহিমাহুল্লাহ (মৃতঃ ৪৫৬ হিঃ) বলেন, যেসব হাদীসে মহান আল্লাহর নামগুলোর উল্লেখ আছে সে হাদীসগুলোর একটিও সহীহ নয়। তবে ঐসব নামগুলোর মধ্যে আমার নিকটে প্রায় ৮০টি নাম সঠিক। (তাইসীরুল আযীযিল হামীদ ৬৪৪ পৃষ্ঠা)

ইমাম জা'ফার ইবনে মুহাম্মাদ ও সুফইয়ান ইবনে 'উয়াইনাহ এবং আবূ যায়দ লুগাভী ও ইবনে হাজার আসকালানী আর ইমাম ইবনে হাযম মহান আল্লাহর যেসব নামগুলোর উল্লেখ করেছেন তার সংখ্যা ১৬৫ (একশো পয়ষট্টি)। মোটকথা মহান আল্লাহর নামগুলো সীমাবদ্ধ নয়। *(ঐ– ৬৪৩ও ৬৪৪ পৃষ্ঠা)* ***(ঈমান ও আক্বীদা ১/ ৩১-৩৪ পৃ:)***

মহান আল্লাহ তা'আলার গুণের বর্ণনা

মহান আল্লাহ পবিত্র। মহান আল্লাহ একক। মহান আল্লাহর অস্তিত্ব ও গুণের কোন তুলনা নেই। কোন বস্তু তাঁর সমকক্ষ নয়। কোন বস্তুকে তার সাথে তুলনা করা চলে না। তাঁর অস্তিত্ব ও গুণে কোন ত্রুটি নেই। তাঁর পিতা-মাতা নেই, তাঁর ছেলেমেয়ে ও স্ত্রী নেই। তার পানাহার নেই। তাঁর নিদ্রা-তন্দ্রা নেই। তিনি সদা জাগ্রত। তাঁর কোন জিনিসের দরকার নেই। সমস্ত জিনিসই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি সব সময় ছিলেন, সব সময় আছেন আর সব সময় থাকবেন। তাঁর অস্তিত্ব কখনো ধ্বংস হবে না। তিনি সারাজাহান সৃষ্টি করেছেন আর সমস্ত মাখলুককে তিনি পালন করেন। তিনি সারা জাহানের মালিক-মুখতার, কেউ তার অংশীদার নেই। তিনি সবার কথা শুনেন, সব কিছুকে দেখেন। তিনি সকলের অবস্থা জানেন, তাঁর কাছে কিছুই গোপন নেই। আসমান ও যমীনের প্রকাশিত, অপ্রকাশিত যা কিছু আছে এবং অন্তরে যা গোপন কথা আছে সমস্তই মহান আল্লাহ সমানভাবে জানেন। তার অসীম ক্ষমতা ও অপার হিকমত, তার কুদরত প্রত্যেক জিনিসে বিরাজমান। তিনি যে জিনিস ইচ্ছা করেন সেই জিনিস হয়, তার ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই হয় না। সমস্ত জাহান তিনি একা দেখাশোনা

করেন। এতে তার কোন ক্লান্তি নেই। দুনিয়ার সমস্ত কাজ তাঁর হাতে, তার কাছে কারো কোন অধিকার নেই। যাকে ইচ্ছা বাদশাহী দান করেন আর যার কাছ থেকে ইচ্ছা বাদশাহী ছিনিয়ে নেন। যাকে ইচ্ছা বড় মালদার করেন যাকে ইচ্ছা তাকে নাচার গরীব করেন। যাকে চান সুখ দেন, যাকে চান দুঃখ দেন। সমস্ত সুখ-দুঃখ তার হাতে। তাঁরই হাতে সকলের রুযী, তাঁরই হাতে সকলের জীবন মরণ। সকলের অন্তর তাঁর হাতে, হিদায়েত, গোমরাহী তাঁরই হাতে। সবার উপরে মহান আল্লাহ আছেন সকল বিষয়ে তাঁর এলেম আছে। সারা মাখলুকের উপর তার মহান আরশ, মহান আরশের উপর তিনি বিরাজমান, সমুন্নত। এতে মনে করো না, মহান আল্লাহ দূরে আছেন, জেনো রেখো, তোমার ঘাড়ের মোটা (শাহ্) রগের চেয়েও তিনি তোমার কাছে আছেন। মহান আল্লাহর আরশের উপর বিরাজমান সমুন্নত থাকাটাকে তোমাদের তক্তের উপর থাকা মনে করোনা। কেননা, থাকার জন্য তোমরা মুখাপেক্ষী, কিন্তু মহান আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। আরশ যখন ছিল না, তখন তিনি যেমন ছিলেন, এখনো তিনি তেমনি আছেন। প্রকাশ্যে তার উপর ঈমান রাখবে, ঈমানের হাল হকিকত মহান আল্লাহর উপর সোপর্দ করবে। এভাবে তার উঠা, নামা, হাত, চেহারা, পা, চোখ যত গুণ আছে- তার উপর ঈমান আনবে, নিজের উপর কিয়াস করবে না। মহান আল্লাহ পাক কেমন, তার ভেদ কি তিনি ছাড়া কেউ জানে না। দুনিয়াতে কেউ তাকে দেখতে পাবে না, আখেরাতে মুমিনরা তাকে দেখবেন। তাঁর রহমত যেমন বড়ই প্রশস্ত, তার আযাব তেমনি বড় শক্ত। তিনি বড় প্রতাপশালী। তার প্রতাপে নিয়োজিত ফেরেশতারা থর থর করে কাঁপে। মহান আরশ তাঁর প্রতাপের ভার সামলাতে না পেরে চড়চড় শব্দে সব সময় ডাকতে আছে। তাঁর প্রতাপের কথা সব সময় দিলে রাখবে, সর্বদা তাঁর গযবের ভয় করবে। তার রহমতের আশাধারী হয়ে তার উপর ভরসা রাখো। দেলে তার মহব্বত রাখো। তার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উপর রাযী থাকো। সর্বদা তার নিয়ামতের শোকর করো, মছিবতে হাম্েশা সবর করো। সুখে-দুঃখে সদা তাঁকে ডাকো, তাঁর স্মরণ থেকে গাফেল থেকোনা। খাঁটি বন্দেগী কেবলমাত্র তারই করো, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। তিনি কিসে রাযী হবেন, দিন রাত সর্বদা সেই ধান্দায় থাকো তিনি সব ধরনের সৎগুণাবলীতে গুনান্বিত এবং যাবতীয় অসৎ গুণাবলী হইতে পবিত্র। তিনিই সমস্ত জগতকে মানুষ ও মানুষের কার্যাবলীকে, বস্তু ও বস্তুর গুণাবলীকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা তাহার সৃষ্ট বান্দা। সুতরাং আমাদের উপর তাহার যথেচ্ছা হুকুম জারী করার অধিকার রহিয়াছে এবং এই অধিকার বলেই তিনি আমাদের জীবন যাপনের যাবতীয়

আবশ্যক নিয়ম-পদ্ধতি নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। আমরা তাহার এই সকল নিয়ম পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া চলিতে বাধ্য। তাহার কোন হুকুম বা কার্যই অন্যায় অবিচার প্রসূত নহে। তিনি যাহা করেন, সবই ন্যায় সবই সৃষ্টির মংগলের জন্য করেন। অন্যায় অবিচার তখনই হয় যখন কেহ অন্যের রাজ্যে, অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে, আর তিনি যাহা করেন তাহা তাঁহার নিজের রাজ্যে ও নিজের অধিকারে করেন। তিনি তাহার সৃষ্ট যে বস্তু যাহাকে যেরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন উহাই তাহার উপযোগী, উহা তাহার জন্য মংগল। তিনি যাহাকে যাহাই দান করেন, অনুগ্রহ করিয়াই করেন, কিছুই তাঁহার পক্ষে অবশ্য কর্তব্য নয়। তিনি পাপের শাস্তি ও পূণ্যের পুরষ্কার দেন, কিন্তু কোনটিতেই তিনি বাধ্য নহেন।

এরূপ বিশ্বাসের ফল এই যে, বিশ্বাসী ব্যক্তির পূর্ণ জীবন মহান আল্লাহর হুকুমের অধীন হইয়া যায়। সে কখনও মহান আল্লাহর হুকুমের খেলাফ কিছু করিতে পারে না। যাহার ঈমান এই ফল দান করে নাই তাহার ঈমানের শক্তি সম্পর্কে তাহার শংকিত হওয়াই উচিত। (নূরুল ঈমান)

মহান আল্লাহর প্রতি ঈমানের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, মানুষকে মহান আল্লাহর অস্তিত্ব, তার গুণরাজি, তার অধিকার, তার ক্ষমতা ও তার একত্ব সম্পর্কে সঠিক ও স্বচ্ছ জ্ঞান লাভ করতে হবে। এগুলোর উপর পূর্ণ প্রত্যয় লাভ করতে হবে। এগুলোর প্রতি **"ইক্বরার বিল লিসাণ" 'তাসদীক্ব বিল জাণান' 'আমাল বিল আরকাণ'** অর্থাৎমৌখিক স্বীকৃতি, আন্তরিক বিশ্বাস প্রত্যয় এবং বাস্তব কর্মে এগুলোর প্রতিফলন ঘটাতে হবে। এভাবেই মহান আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ঈমান আনতে হবে।

পবিত্র কুরআন থেকে ঈমান বিয যাতের ও ঈমান বিস সিফাতের পরিচয় ঈমান বিয যাত

অর্থাৎ মহান আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা। এই বিশ্ব জাহান, এর সৃষ্টি, এর সুনিয়ন্ত্রিত বিধি সম্মত ব্যবস্থাপনা, হাওয়ার গতি, বৃষ্টির আগমন, দিন ও রাতের আবর্তন, চাঁদ-সূর্য-গ্রহ উপগ্রহের গতিশীলতা, ঋতুর পরিবর্তন, বীজ থেকে বৃক্ষের জন্ম, ইথারের বিস্ময়কর ক্ষমতা, অণু পরমাণুর মহাশক্তি ইত্যাদিতে মহান আল্লাহর অস্তিত্বে পূর্ণ আস্থা ও প্রত্যয় লাভের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي الأَلْبَابِ -

অর্থাৎ নিশ্চয় আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য রয়েছে অসংখ্য নিদর্শন। (আল-ইমরান–১৯০)

আল্লাহর খলিল ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা এভাবেই মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ - وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ - فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الآفِلِينَ - فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ - فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ - إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ -

অর্থাৎ স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম পিতা আযরকে বললেন ঃ তুমি কি প্রতিমা সমূহকে উপাস্য (ইলাহ) মনে কর ? আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি ও তোমার সম্প্রদায় প্রকাশ্য পথভ্রষ্ট। আমি এরূপ ভাবেই ইবরাহীমকে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের অত্যাশ্চর্য বস্তুসমূহ দেখাতে লাগলাম যাতে সে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে যায়। অতঃপর যখন রজনীর অন্ধকার তার উপর সমাচ্ছন্ন হল, তখন সে একটি তারকা দেখতে পেল। বলল ঃ এটি আমার প্রতিপালক। অতঃপর যখন তা অস্তমিত হল, তখন বলল ঃ আমি অস্তগামীদেরকে ভালবাসি না। অতঃপর যখন চন্দ্রকে ঝলমল করতে দেখল, বলল ঃ এটি আমার প্রতিপালক। অনন্তর যখন তা অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন বলল ঃ যদি আমার প্রতিপালক আমাকে পথ প্রদর্শন না করেন, তবে অবশ্যই আমি বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের অন্তভূর্ক্ত হয়ে যাবো। অতঃপর যখন সূর্যকে চকচক করতে দেখল, বলল ঃ এটি আমার পালনকর্তা, এটি বৃহত্তর। অতঃপর যখন তা ডুবে গেল, তখন বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যেসব বিষয়কে শরীক কর, আমি ওসব থেকে মুক্ত। আমি একমুখী হয়ে স্বীয় আনন (অর্থাৎ অন্তরের মুখ) ঐ সত্ত্বার দিকে করেছি যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং কস্মিন কালেও আমি মুশরিক্বদের অন্তর্ভূক্ত নই। (আনআম: ৭৪-৭৯)

বস্তুতঃ মানুষ বুদ্ধিমান জীব। সত্যিকারের বুদ্ধি ও যুক্তির নিকট মহান আল্লাহর অস্তিত্ব এক মহাসত্য ও অতিশয় বাস্তব ব্যাপার। তাঁর মৌলিক সত্তার অস্তিত্ব ও বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করবার মত নয়। তাঁর সৃষ্টিধর্মী শক্তি, বিশ্বজাহানের উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ, তাঁর ব্যবস্থাপনা, তার গুণরাজী, তাঁর শক্তি ও তার পূর্ণতার উপলব্ধির মাধ্যমেই তাঁর পরিচয় লাভ করতে হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ - لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ -

অর্থাৎ তিনিই মহান আল্লাহ তোমাদের পালনকর্তা। তিনি ব্যতীত কোন হক্ব উপাস্য নেই। তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা। অতএব, তোমরা তাঁরই এবাদত কর। তিনি প্রত্যেক বস্তুর কার্যনির্বাহী। দৃষ্টি সমূহ তাকে প্রত্যক্ষ করতে পারে না, কিন্তু সকল দৃষ্টিই তাঁর আয়ত্বে। তিনি অত্যন্ত সূক্ষদর্শী এবং সব বিষয়ে জ্ঞাত। (আনআম: ১০২-১০৩)

প্রত্যেক মুসলিমকেই পরিপূর্ণ প্রশান্তি ও প্রত্যয় সহকারে মহান আল্লাহর অস্তিত্বে আস্থা স্থাপন করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে এটাই ঈমানের বীজ। এখান থেকেই ঈমানিয়াতের যাত্রা শুরু হয়। এখান থেকেই গজিয়ে উঠবে ঈমানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা ঃ

إِنَّ اللهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ - فَالِقُ الإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ - وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ - وَهُوَ الَّذِيَ أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ - وَهُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُواْ إِلِى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ -

অর্থাৎ মহান আল্লাহ বীজ ও দানা দীর্ণকারী। তিনিই জীবিতকে মৃত হতে বের করে আনেন আর মৃতকে বের করে আনেন জীবিত হতে। এসব কাজের আসল কর্তা হচ্ছেন স্বয়ং মহান আল্লাহ। তাহলে, তোমরা ভ্রান্তপথে কোথায় যাচ্ছ ? তিনিই রাতের আবরণ দীর্ণ করে রঙিন প্রভাতের উন্মেষ ঘটান। তিনিই রাতকে শান্তিময় বানিয়ে দিয়েছেন। চাঁদ ও সূর্যের উদয় অস্তের হিসাব

নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। মূলতঃ এ সবই মহা পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানীর নির্ধারিত পরিমাণ। তিনিই তোমাদের জন্যে তারকা রাজীকে মরু সমুদ্রের গভীর অন্ধকারে পথ জানার উপায় বানিয়ে দিয়েছেন। লক্ষ্য কর, আমরা নিদর্শন সমূহ স্পষ্ট করে বলে দিয়েছি তাদের জন্যে যারা জ্ঞান রাখে। তিনিই একটি মাত্র আত্মা হতে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। তারপর প্রত্যেকের জন্যে একটি অবস্থান স্থল রয়েছে। গচ্ছিত রাখার জায়গা। এই নিদর্শন সমূহ আমরা পরিষ্কার ভাবে বর্ণনা করলাম তাদের জন্য যারা জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে এবং তিনি আসমান থেকে পানি বর্ষন করেছেন যার সাহায্যে সব রকমের উদ্ভিদ গজিয়ে দিয়েছেন এবং এর দ্বারা শস্য- শ্যামল ক্ষেত খামার ও গাছপালার সৃষ্টি করেছেন। তারপর এটা হতে বিভিন্ন কোষসম্পন্ন দানা বের করেছেন। খেজুরের মোচা থেকে থোকা থোকা ফল বানিয়েছেন, যা নাকি ভারের চাপে নুইয়ে পড়ছে। আর আংগুর, জয়তুন ও আনারের বাগান সাজিয়ে দিয়েছেন। সেখানে ফলসমূহ পরস্পরের সদৃশ, অথচ প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন। এ গাছগুলো যখন ফল ধারণ করে তখন এদের ফল বের হওয়া এবং পেকে যাওয়ার অবস্থাটা একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে চেয়ে দেখো। এসব কিছুতে সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহ নিহিত রয়েছে তাদের জন্যে যারা ঈমান আনবে। (আনআম– ৯৫-৯৯) মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ

- إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي অর্থাৎ আমিই আল্লাহ, আমি ব্যতীত কোন হক্ব ইলাহ নেই। অতএব আমার এবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে সলাত কায়েম কর। (তাহা– ১৪)

ঈমান বিস সিফাত

প্রত্যেক মুসলিমকেই মহান আল্লাহর গুণরাজির উপর পরিপূর্ণ ঈমান আনতে হবে। নিছক মহান আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করা দ্বীন ইসলামের তেমন কোন বৈশিষ্ট্য নয়। কারণ মহান আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, আসলে এমন কোন জাতিই নেই। মূলতঃ ইসলামের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য এই যে, সে মহান আল্লাহর অস্তিত্বের সংগে তাঁর উলুহিয়াতের স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট ধারণা পেশ করে। এ জন্যেই প্রত্যেক মুসলিমকেই মহান আল্লাহর গুণাবলীর স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট ধারণা মগজে বদ্ধমূল করতে হবে। সে অনুযায়ী নিজের ঈমান, আক্বীদাহ, মানহাজ ও মন-মানসিকতা তৈরী করতে হবে এবং আক্বীদাহ ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে নিজের চরিত্র ও পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। নিম্নে মহান আল্লাহর গুণরাজির কিছু পরিচয় পবিত্র কুরআনের আলোকে প্রদান করা হইল ঃ মহান আল্লাহ বলেন ঃ

- اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى অর্থাৎ মহান আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্যিকারের ইলাহ নেই। তাঁর রয়েছে সর্বোত্তম নামসমূহ। (তাহা– ৮)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন ঃ মহান আল্লাহর এক কম একশ অর্থাৎ নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলোকে হিফাজত করলো সে জান্নাতে প্রবেশ করলো। (বুখারী)

বস্তুতঃ মহান আল্লাহ তা'আলাই সমস্ত সুন্দর গুণ ও বৈশিষ্টের অধিকারী। পবিত্র কুরআনে তিনি নিজেই তার অনেক গুণ ও সিফাত সমূহের বর্ণনা করেছেন। এসব নাম তার বিশাল বিস্তৃত কুদরতের প্রকাশবহ। **আর মহান আল্লাহর এসব নামগুলির হিফাজত করার অর্থ হচ্ছে এগুলোকে জানা, বুঝা, আয়ত্ব করা, এগুলোর দাবী অনুযায়ী আমল করা। নিজ জীবনে মহান আল্লাহর সেসব অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা এবং এসব নামে মহান আল্লাহকে ডাকার মাধ্যমে তাঁর এসব গুণ ও সিফাতের স্বীকৃতি দেয়া।** মহান আল্লাহ বলেন ঃ

- وَلِلَّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا অর্থাৎ সুন্দরতম নামসমূহের অধিকারী মহান আল্লাহ। সুতরাং সেসব নাম ধরে তোমরা তাঁকে ডাকো। (আরাফ– ১৮০)

অতএব আমাদেরকে মহান আল্লাহর সবগুলো নাম ও এগুলোর তাৎপর্য জানা উচিত। এগুলোর তাৎপর্য অনুযায়ী এসব নামে তাকে ডাকা উচিত, তাঁর নিকট দু'আ ও আবেদন নিবেদন করা উচিত। কোন অবস্থাতেই মহান আল্লাহর এসব নাম থেকে কোন মুমিন ব্যক্তির গাফিল থাকা উচিত নয়। মূলত গুণবাচক নাম সমূহের মাধ্যমেই মহান আল্লাহর সঠিক পরিচয় জানা সম্ভব। তাই এসব নামের সঠিক তাৎপর্য জানা না থাকলে এসব বিষয়ে শিরক অনুপ্রবেশের আশংকা থাকে।

এই কারণে মনে হয় পবিত্র কুরআন মজীদে নবী-রাসূলগণের দু'আ ও অন্যান্য দু'আয় মহান আল্লাহর গুণবাচক নামের (যেমন, রব, মওলা, অলী প্রভৃতি) অধিক ব্যবহার দেখা যায়।

নিম্নে আমরা তাই মহান আল্লাহর কতিপয় গুণবাচক নামের অর্থ ও তাৎপর্য আলোচনা করছি ঃ

(১) **আল্লাহ** اللَّهُ। এ হচ্ছে বিশ্বস্রষ্টার অস্তিত্বের নাম। সমস্ত গুণরাজি, যাবতীয় প্রকারের কল্যাণ ও পুত-পবিত্রতার শিরোমনি এ নাম। তিনি ছাড়া এ

নাম আর কারো জন্য কখনো ব্যবহৃত হয়নি এবং হতে পারবে না। সুতরাং ইহাই তার আপন নাম ইসমে যাত, ইসমে আযম। সৃষ্টি, ক্ষমতা, জ্ঞান, প্রশংসা ও করুণার উৎস এ নাম। এ নাম সৃষ্টির আগে থেকে ছিল এবং সৃষ্টি ধ্বংসের পরেও থাকবে। এ নামের অস্তিত্ব অবিনশ্বর, চিরস্থায়ী, চিরন্তন, শ্বাশ্বত।

- اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى অর্থাৎ মহান আল্লাহ তিনি ছাড়া আর কোন সত্যিকারের ইলাহ নেই। তাঁরই জন্য সমস্ত সুন্দরতম নাম। (তাহা– ৮)

- اللهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ অর্থাৎ মহান আল্লাহ, তিনি ছাড়া আর কোন সত্যিকারের ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব শ্বাশ্বত। (বাকারা– ২৫৫)

গোলামী, দাসত্ব, আনুগত্য, কুরবানি, নজর-মান্নত, ত্যাগ-তৎপরতা এ সবকিছু একমাত্র তাঁরই জন্যে নির্দিষ্ট করতে হবে। সমস্ত কামনা বাসনা ইচ্ছা আকাংখা কেবলমাত্র তাকেই জানাতে হবে। সাহায্য কেবলমাত্র তাঁর নিকটই চাইতে হবে। তাকেই ভয় করতে হবে। সমস্ত মহব্বত ও ভালবাসা তাঁরই জন্যেই কেন্দ্রীভূত করতে হবে।

(২) **ইলাহ** إِلَهَ। ইলাহ শব্দটি মূলত মহান আল্লাহর গুণবাচক নাম সমূহের কেন্দ্রবিন্দু। ইলাহ থেকেই গঠিত হয়েছে মহান আল্লাহ শব্দ। ইলাহ দ্বারা বোঝা যায় মহান আল্লাহ ব্যতীত উপাস্য, অর্চনার যোগ্য, ক্ষমতাশালী প্রভু, রক্ষা কর্তা, আশ্রয়দাতা, সুরক্ষণকারী, মুক্তিদাতা, সাহায্যকারী, পাপ কালিমা বিধৌতকারী, উদ্ধার কর্তা, ত্রাণ কর্তা, নিরাপত্তা দানকারী, আশ্রিত বৎসল, প্রিয়তম প্রেমাস্পদ, স্রষ্টা, অন্নদাতা, প্রতিপালক, নিয়ামক ও ব্যবস্থাপক কেউ নাই।

- وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاء إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ অর্থাৎ আসমান ও যমীনে তিনি একজনই ইলাহ এবং ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রয়োগের জন্যে যে জ্ঞান ও কৌশলের প্রয়োজন তা সবই তার আছে। (যুখরুখ– ৮৪)

وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ - قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاء أَفَلَا تَسْمَعُونَ - قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ -

অর্থাৎ তিনিই মহান আল্লাহ ! তিনি ছাড়া আর কোন হক্ব ইলাহ নেই। দুনিয়া ও আখিরাতে সমস্ত প্রশংসা শুধুমাত্র তারই জন্যে। একমাত্র তিনিই

ক্ষমতা, নির্দেশ দান ও সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তারই নিকট তোমাদের ফিরে যেতে হবে। বলো, তোমরা কখনো ভেবে দেখেছো। মহান আল্লাহ যদি ক্বিয়ামতের দিন পর্যন্ত তোমাদের উপর রাতকে স্থায়ী করে দেন, তবে তোমাদেরকে প্রভাত এনে দিতে পারে এমন কোন 'ইলাহ' আছে কি ? তোমাদের কি শ্রবণশক্তি নেই। বলো, তোমরা কি চিন্তা করে দেখেছো। মহান আল্লাহ যদি ক্বিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ীভাবে তোমাদের উপর দিন চাপিয়ে দেন, তবে বিশ্রাম লাভের জন্য তোমাদেরকে রাত এনে দিতে পারে এমন কোন ইলাহ আছে কি ? তোমাদের কি দৃষ্টি শক্তি নেই। (কাসাস: ৭০-৭২)

মহান আল্লাহর এই নামের দাবী হচ্ছে এই যে, মানুষ শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সার্বভৌমিত্ব, নির্দেশ, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও রাজত্বকে মেনে নেবে এবং শুধুমাত্র তাঁকেই অভাব পূরণ কারী, সমস্যা ও জটিলতা থেকে মুক্তি দান কারী, আশ্রয় দানকারী, সাহায্য-সহযোগীতা প্রদানকারী তত্ত্বাবধান ও সংরক্ষণ কারী এবং আহবানে সাড়াদানকারী মেনে নেবে, তাকে উপাস্য ও আনুগত্য লাভের একমাত্র অধিকারী মেনে নেবে।

এই 'ইলাহর' অধিকার বা দাবীকে যারা নফস, সমাজ, রাষ্ট্র, ক্ষমতা ও শক্তিশালী ব্যক্তি, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা অন্য যে কারো বা কিছুর প্রতি আরোপ করে তারা শিরক করে।

(৩) **রব** رَبّ এর মৌলিক ও প্রাথমিক অর্থ হচ্ছে **'প্রতিপালক'** কিন্তু এ শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তারিত অর্থে পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে। এসব অর্থকে মৌলিক ভাবে চার ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) প্রতিপালক, প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ কারী, প্রশিক্ষণদানকারী ও ক্রমবিকাশ দাতা। যেমন ঃ

- رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا অর্থাৎ হে রব ! আমাকে জ্ঞান দান করো বা জ্ঞান বৃদ্ধি করুণ। (তাহা– ১১৪)

মাগিছি কাতর প্রাণে করুণা তোমার, জ্ঞান বুদ্ধি বৃদ্ধি কর প্রভু গো আমার। (মসলায়ে জরুরীয়া)

- قَالَ مَعَاذَ اللهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ অর্থাৎ ইউসুফ বললো ঃ মহান আল্লাহর আশ্রয় ! আমার রব তো আমাকে উত্তম মর্যাদায় রেখেছেন। (ইউসুফ– ২৩)

(খ) দায়িত্বশীল তত্ত্বাবধায়ক, পর্যবেক্ষণ এবং অবস্থার সংশোধন ও পরিবর্তনের দায়িত্বশীল ঃ

فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ - الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ - وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ - وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ -

অর্থাৎ বিশ্ব নিখিলের রব যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আমাকে পথ প্রদর্শন করেন পানাহার করান আমি পীড়িত হলে আরোগ্য দান করেন। তিনি ছাড়া তোমাদের অন্যসব (রব) তো আমার দুশমন। (শোয়ারা– ৭৭-৮০)

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا - অর্থাৎ তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের রব। তিনি ছাড়া আর কোন প্রকৃত ইলাহ নেই। তাই তাঁকেই সকল ব্যাপারে দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হিসাবে গ্রহণ করো। (মুজজাম্মিল– ৯)

(গ) কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালনকারী, নেতৃত্ব দানকারী, আনুগত্য লাভের অধিকারী এমন ক্ষমতাশালী যার নির্দেশ ও কর্তৃত্ব সকলকে মেনে চলতে হয়।

تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ - অর্থাৎ এই শর্তে একমত হও যে, আমাদের (উভয় পক্ষের) কেও যেনো মহান আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে রব না বানায়। (ইমরান– ৬৪)

(ঘ) মালিক ও মনিব

رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ - অর্থাৎ তিনি আসমান ও যমীন এবং এতদুভয়ের মাঝে যা কিছু আছে সব কিছুর মালিক। যেসব বস্তুর পর সূর্যোদয় হয়, তিনি সেগুলোরও মালিক। (সাফফাত– ৫)

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ - الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ -

অর্থাৎ সুতরাং তাদের উচিত এই (কাবা) ঘরের মালিকের ইবাদাত করা যিনি তাদের রিযিক সরবরাহের ব্যবস্থা করেছেন এবং ভয়ভীতি থেকে তাদের নিরাপদ রেখেছেন। (কোরাইশ)

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্যে, যিনি সারে জাহানের রব। (সূরাহ ফাতিহা– ২) এখানে রব শব্দটি সবগুলো অর্থের সমন্বয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। (**'রব'** এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানতে হলে দয়া করে পাঠ করুন মৎ প্রণীত আলোড়ন সৃষ্টিকারী ভুবনবিখ্যাত কিতাব **''সত্যিকারের মুমিন-মুসলিমের পরিচয়''** নামক পুস্তকটি)

মোট কথা মহান আল্লাহকে **'রব'** মেনে নেয়ার অর্থ এই যে, আমি একমাত্র মহান আল্লাহকেই নিজের মালিক, মনিব, মুরুব্বি, প্রতিপালক, পর্যবেক্ষণ, সংরক্ষণ কারী, শাসক, আইনদাতা, নির্দেশ দান কারী, আনুগত্যের অধিকারী, তত্ত্বাবধায়ক ও ব্যবস্থাপক মেনে নিয়েছি।

৪। **আল হাকিম** اَلْحَكِيمُ। এর অর্থ হচ্ছে মহান আল্লাহই একমাত্র সার্বভৌম সত্তা, শাসন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব শুধু তারই, আইন-বিধান ও হুকুম দানের ক্ষমতা শুধু তাঁরই আছে।

- وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللهِ অর্থাৎ তাদের নিকট তাওরাত আছে। তাতে মহান আল্লাহর আইন ও বিধান লিখিত আছে। (মায়িদা– ৪৩)

- بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ অর্থাৎ নির্দেশ দান, ক্ষমতা এবং শাসন ও সার্বভৌম ক্ষমতা মহান আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। তিনি নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা তার ছাড়া আর কারো গোলামী করোনা আইন বিধান মেনে নিয়োনা। (ইউসুফ– ৪০)

৫। **আল হাকাম** اَلْحَكَمُ। **'হাকাম'** এবং **'হাকেম'** এ শব্দদ্বয় মূলগত অর্থের দিক থেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ। **'হাকেম'** মানে হুকুম কর্তা, আইন ও বিধান দাতা আর **'হাকাম'** মানে আইন ও বিধান অনুযায়ী বিচার কর্তা ফায়সালা কারী। মহান আল্লাহর বিশেষণ **'আল হাকাম'** মানে তিনিই একমাত্র বিচার কর্তা, নিরঙ্কুশ ফায়সালাকারী। তাঁর ফায়সালাই সকলকে মেনে নিতে হবে।

- أَفَغَيْرَ اللهِ أَبْتَغِي حَكَمًا অর্থাৎ আমি কি মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য ফায়সালা কারী খুঁজবো ? (আনআম– ১১৪)

- أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ অর্থাৎ তারা কি জাহিলিয়াতের বিচার কামনা করে। অথচ দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্যে মহান আল্লাহর চেয়ে উত্তম ফায়সালা কারী কে আছে ? (মায়িদা– ৫০)

- وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ অর্থাৎ তোমরা যখন লোকদের মাঝে বিচার ফায়সালা করবে, তখন যেন ইনসাফের সাথে বিচার ফায়সালা করো। (নিসা– ৫৮)

- وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللهُ অর্থাৎ তাঁদের মাঝে মহান আল্লাহর অবতীর্ণ আইন বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করো। (মায়িদা– ৪৯)

- وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ অর্থাৎ যারা মহান আল্লাহর নাযিল করা আইন বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না তারা কাফির। (মায়িদা– ৪৪)

وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ - অর্থাৎ (নূহ বলল ঃ হে মহান আল্লাহ)। নিশ্চয়ই তোমার ওয়াদা সত্য এবং তুমিই সব বিচারকের সেরা বিচারক।" (হুদ– ৪৫)

৬। **আল হাকিম** ঃ মূল শব্দ হিকমাতা এর অর্থ জ্ঞান বিজ্ঞান কৌশল, প্রকৌশল ও বিজ্ঞতা। আর মহান আল্লাহর **'হাকীম'** হওয়ার অর্থ এই যে, তিনিই সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞান কৌশল, প্রকৌশল ও বিজ্ঞতার উৎস ও আধার। সৃষ্টির কাঠামো ও বান্দাহদের যাবতীয় মোয়ামেলায় তিনি সুকৌশলে ও বিজ্ঞতার সাথে ফায়সালা করেনঃ

- إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا **ইন্নাল্লাহা কানা আলিমান হাকিমান** অর্থাৎ মহান আল্লাহ অতিশয় জ্ঞানী এবং জ্ঞান বিজ্ঞতা ও কৌশলের আধার। (দাহর– ৩০)

৭। **আল খালিক** اَلْخَالِقُ। অর্থাৎ মহান আল্লাহ সৃষ্টির পরিকল্পনা কারী। অবস্থা ও পরিবেশের প্রেক্ষিতে তিনিই সর্বোত্তম ভাবে সৃষ্টির 'নীল নকসা' প্রস্তুত কারী।

৮। **আল বারীউ** اَلْبَارِئُ অস্তিত্ব দান কারী অর্থাৎ তিনিই সৃষ্টিকে সম্পূর্ণ শূণ্যতার ও অনস্তিত্বের অন্ধকার থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করেণ।

৯। **আল মুছাওবিরু** اَلْمُصَوِّرُ। আকৃতি দান কারী, অর্থাৎ মহান আল্লাহ তা'আলাই গোটা সৃষ্টির পরিকল্পনা তৈরী করেন, অনস্তিত্ব থেকে সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন এবং প্রত্যেক সৃষ্টিকেই উপযুক্ত ও পছন্দসই আকৃতি দান করেন।

- هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ অর্থাৎ তিনি মহান আল্লাহ ! তিনিই সৃষ্টির পরিকল্পনা প্রস্তুতকারী, সৃষ্টির অস্তিত্ব এবং আকৃতি দান কারী। (হাশর– ২৪)

১০। **আল খালিকু** اَلْخَالِقُ। যে কোনো সময় যে কোন প্রকার সৃষ্টি করতে তিনি সক্ষম।

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ -

অর্থাৎ যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি এরি মতো সৃষ্টির শক্তি রাখেন না ? হ্যাঁ, অবশ্যই তিনি যে কোনো প্রকার সৃষ্টির নিরঙ্কুশ ক্ষমতা রাখেন এবং এ ব্যাপারে তিনি অতিশয় বিজ্ঞ। (ইয়াসিন– ৮১)

১১। **আল কাদীরু** اَلْقَادِرُ মহাশক্তিধর। অর্থাৎ যে কোনো সময় যে কোনো শক্ত, কঠিন ও বিরাট কাজ করার তিনি শক্তি ও ক্ষমতা রাখেন।

অর্থাৎ মানুষ কি ধারণা করছে যে, তার বিগলিত হাড় সমূহ আমরা একত্রিত করব না ? হ্যাঁ, অবশ্যই তা করবো। তাঁকে পুনরায় পূর্ণাঙ্গভাবে তৈরী করতে আমি সম্পূর্ণ সক্ষম। (কিয়ামাহ– ৩-৪)

১২। **আল কাদীরু** اَلْقَادِرُ শক্তি ক্ষমতার আধার। তিনি সকল কিছুর উপর পরিপূর্ণ শক্তি, ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ রাখেন।

- إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ অর্থাৎ নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ সকল কিছুর উপর পূর্ণ শক্তি ও ক্ষমতা রাখেন। (বাকারা– ২০)

১৩। **আল মুক্তাদিরু** اَلْمُقْتَدِر মহাশক্তিমান, স্বাধীন, প্রবল পরাক্রমশালী, কোন কিছুতেই বাধ্য নন।

- وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ -كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ অর্থাৎ আর ফিরাউনের লোকদের নিকট সাবধানবাণী ও হুশিয়ারী এসেছিল। কিন্তু তারা আমার সমস্ত নিদর্শন মিথ্যা বলে অমান্য করল। অবশেষে আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম, প্রবল পরাক্রমশীলের পাকড়াও। (ক্বামার: ৪১-৪২)

- إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ - فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ অর্থাৎ মহান আল্লাহর নাফরমানী থেকে বিরত থাকা লোকেরা নিশ্চিতই জান্নাত ও ঝর্ণা সমূহের মধ্যে হবে। প্রকৃত সম্মান মর্যাদার স্থান মহাশক্তিমান স্বাধীন সম্রাটের নিকট। (কামার: ৫৪-৫৫)

১৪। **আল অলিউ** اَلْوَالِي পৃষ্ঠপোষক, সাহায্যকারী, অভিভাবক, বন্ধু।

- اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ অর্থাৎ মহান আল্লাহ মুমিনদের সাহায্যকারী পৃষ্ঠপোষক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন। (বাকারা– ২৫৭)

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ - অর্থাৎ (ইউসুফ দোয়া করলো ঃ) আসমান ও যমীনের স্রষ্টা। ইহকাল ও আখিরাতে তুমিই আমার অলী। (ইউসুফ– ১০১)

১৫। **আল মাওলা** الْمَوْلَى আশ্রয়দাতা, পৃষ্ঠপোষক, বন্ধু, সাহায্যকারী, অভিভাবক, সমর্থক।

- وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ অর্থাৎ মহান আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো। তিনিই তোমাদের অভিভাবক মওলা। তিনিই উত্তম বন্ধু ও সাহায্যকারী। (হজ্জ– ৭৮)

- وَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ مَوْلاَكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ অর্থাৎ জেনো রেখো, তোমাদের পৃষ্ঠপোষক আশ্রয় দানকারী। তিনি সর্বোত্তম বন্ধু ও সাহায্যকারী। (আনফাল– ৪০)

- ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ অর্থাৎ (কাফিরদের এই অশুভ পরিণতির কারণ এই যে) তাদের কোনো মাওলা নেই অথচ মহান আল্লাহ মুমিনদের মওলা। (মুহাম্মাদ– ১১)
رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ -

অর্থাৎ (হে মহান আল্লাহ!) তুমিই আমাদের মওলা কাফিরদের প্রতিকূলে তুমি আমাদের সাহায্য করো। (বাকারা–শেষ আয়াত)

১৬। **আল মালিকু** اَلْمَلِكُ অর্থাৎ মহান আল্লাহই সেই সত্ত্বা যিনি সবকিছুর প্রকৃত মালিক। তার সম্মুখে সকলেই নিঃস্ব, অসহায়।

- قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء অর্থাৎ বলো ঃ হে মহান আল্লাহ ! সমগ্র রাজ্য ও সাম্রাজ্যের মালিক। তুমি যাকে ইচ্ছে করো রাজ্যদান করো। (আল ইমরান – ২৬)

১৭। **আল মালিকু** اَلْمَلِكُ সম্রাট, শাসক, কর্তা অর্থাৎ মহান আল্লাহই নিখিল জগতের একমাত্র ও প্রকৃত সম্রাট

- فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ অর্থাৎ মহান আল্লাহ অতিশয় উচ্চ ও মর্যাদাবান। তিনিই প্রকৃত সম্রাট বা মালিক। তিনি

ব্যতীত কোন হক্ব মাবুদ নাই, তিনি সম্মানিত আরশের মালিক। (মুমিনুন– ১১৬)

- قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ - مَلِكِ النَّاسِ অর্থাৎ বলো ঃ আমি আশ্রয় চাই সমগ্র মানুষের রবের নিকট, সমগ্র মানুষের বাদশার নিকট। (নাস)

১৮। **আর রহমান** اَلرَّحْمَانُ অত্যধিক দয়াপরবশ, দয়ার সাগর, অতিশয় অনুরাগী অর্থাৎ মহান আল্লাহই সেই মেহেরবান সত্ত্বা, যিনি মানবজাতির প্রতি সীমাহীন অনুরাগী, করুনাময়, দয়াপরবশ। তিনি অনুগ্রহ করে মানুষকে সৃষ্টি করে তার শ্রেষ্ঠ নেয়ামত সমূহ দ্বারা তাদের ভূষিত করেছেন।

- الرَّحْمَانُ - عَلَّمَ الْقُرْآنَ - خَلَقَ الْإِنسَانَ - عَلَّمَهُ الْبَيَانَ অর্থাৎ দয়া ও অনুরাগের সাগর তিনি। তিনিই তো পবিত্র কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন, মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে কথা বলা শিখিয়েছেন। (রহমান– ১-৪)

১৯। **আর রাহীম** اَلرَّحِيْمُ অর্থাৎ তিনি সেই সত্ত্বা, যার করুনা ও অনুগ্রহ চির প্রবহমান। তার স্থায়ী রহমতের ধারা কখনও ছিন্ন হয় না। মুমিনদের প্রতি তার রহমতের ধারা দুনিয়ায় এবং আখেরাতেও অবিচ্ছিন্নভাবে বর্ষিত হতে থাকবে।

- وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا অর্থাৎ মুমিনদের প্রতি তাঁর করুনার ধারা অবিরাম প্রবহমান। (আহযাব– ৪৩)

২০। **আল আজিজু** اَلْعَزِيزُ মহা পরাক্রমশালী। তিনি সমস্ত ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী। তার ক্ষমতা সর্বব্যাপী কার্যকর। তার ক্ষমতার বাইরে কেউ নেই, কিছুই নেই।

- إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ অর্থাৎ মহান আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী বিজ্ঞানময়। (লুকমান– ২৭)

- فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا অর্থাৎ সমস্ত ক্ষমতা ও ইয্যতের মালিক একমাত্র মহান আল্লাহ। (নিসা– ১৩৯)

২১। **আল জাব্বারু** اَلْجَبَّارُ তিনি অতিশয় কঠোর অত্যন্ত জবরদস্ত শক্তির অধিকারী। সৃষ্টির যে কোন শক্তি তার সম্মুখে সম্পূর্ণ দুর্বল ও অসহায়। সৃষ্টি জগতকে ধ্বংস করে পুনঃ সৃষ্টির তিনি দুর্বার ক্ষমতা রাখেন।

- هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ অর্থাৎ তিনি একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তিও নিরাপত্তা দাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মাহাত্মশীল। (হাশর– ২৩)

২২। **আল কাহ্হার** اَلْقَهَّارُ দুর্দন্ড প্রতাপশালী, অতিশয় ক্ষমতাধর, কঠিন শাস্তিদাতা- **লিমানিল মুলকুল ইয়াওমা লিল্লাহিল ওয়াহিদীল কাহ্হার** অর্থাৎ আজকে শাসন ও ফরমান কার হাতে, একক, অদ্বিতীয় মহান আল্লাহর হাতে। যিনি দুর্দন্ড প্রতাপশালী, ক্ষমতাধর ও কঠিন শাস্তিদাতা। (মুমিন- ১৬)

২৩। **আল কাইউন** اَلْقَوِيُّ অতিশয় শক্তিশালী, তাঁর শক্তির নিকট কারো শক্তিই খাটে না।

২৪। **আল কাহিরু** اَلْقَاهِرُ অর্থাৎ তিনি বান্দাদের উপর শক্তি, ক্ষমতা ও ইখতিয়ার রাখেন।

- وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ অর্থাৎ তিনি বান্দাদের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। (আনআম– ৬১)

২৫। **আশ শাদিদু** شَدِيدُ অত্যন্ত শক্ত ও কঠোর ভাবে পাকড়াও কারী, তাঁর পাকড়াও থেকে কেউ রেহাই পাবে না।

- كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ অর্থাৎ এদের আচরণ হচ্ছে ফেরাউন এবং তাঁর পূর্বেকার লোকদের আচরণের মতো। তারা মহান আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিল। অতএব, তাদের অপরাধের কারনে মহান আল্লাহ তাদের পাকড়াও করলেন। নিশ্চয় মহান আল্লাহ জবরদস্ত শক্তিশালী, কঠিন শাস্তিদাতা। (আনফাল– ৫২)

২৬। **আল মুতাকাব্বির** اَلْمُتَكَبِّرُ গর্ব, অহংকার এবং শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র অধিকারী। তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের অংশীদার কেউ নেই। (হাশর– ২৩)

২৭। **আল কাবিরু** اَلْكَبِيرُ অতিশয় বড় ও শ্রেষ্ঠ।

২৮। **আল আলিউ** اَلْعَلِيُّ চরম উন্নত ও শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী।

- وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ অর্থাৎ সমস্ত গর্ব, অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্ব তাঁরই জন্যে নির্দিষ্ট। (জাসিয়া- ৩৭)

-أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ অর্থাৎ এবং নিশ্চিতই মহান আল্লাহ অতিশয় মহান ও শ্রেষ্ঠ। (লোকমান– ৩০)

২৯। **আল মুতাআলী** اَلْمُتَعَالِي সর্বাবস্থায় অতি উচ্চ, উন্নত, শ্রেষ্ঠ ও মহান।

- عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ অর্থাৎ গোপন ও প্রকাশ্য সবই তাঁর জ্ঞাত। তিনি শ্রেষ্ঠ, মহান এবং সর্ব্বোচ মর্যাদার অধিকারী। (রা'দ– ৯)

৩০। **আল আ'লা** اَلْعَلِيُّ সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ।

- سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى অর্থাৎ তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ রবের পবিত্রতা বর্ণনা কর। (আ'লা– ১)

৩১। **আল আফুউ** اَلْعَفُوُّ অত্যধিক ক্ষমাশীল।

৩২। **আল গাফুরু** اَلْغَفُورُ অতিশয় দয়ার্দ্র, করুনাময়, ক্ষমাশীল।

- فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا অর্থাৎ সে সময় বেশী দূরে নয় যখন মহান আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দেবেন, মহান আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল- করুনাময়। (নিসা– ৯৯)

৩৩। **আশ শাকুরা** اَلشَّكُورُ মর্যাদাদানকারী। সততা, আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতার মূল্য দান কারী।

- وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ অর্থাৎ আর তারা বলবে ঃ শোকর সেই মহান আল্লাহর যিনি আমাদের চিন্তা দূর করেছেন। নিশ্চয়ই আমাদের রব অতিশয় ক্ষমাশীল ও বিনীতের মর্যাদা দান কারী । (ফাতির–৩৪)

৩৪। **আল গাফিরু** غَافِرِ অপরাধ ক্ষমাকারী।

- غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ অর্থাৎ মহান আল্লাহই তো অপরাধ ক্ষমাকারী ও তাওবা কবুল কারী। (মুমিনুন– ৩)

৩৫। **আশ শাকুরু** اَلشَّكُورُ মূল্য ও মর্যাদা দানকারী।

৩৬। **আল গাফফারু** اَلْغَفَّارُ অতিশয় ক্ষমাশীল ও দানশীল।

- فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا অর্থাৎ আমি বললাম, তোমরা তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা চাও। তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল । (নূহ– ১০)

৩৭। **আর রাউফু** اَلرَّؤُفُ সীমাহীন অনুগ্রহশীল ও সহানুভূতিশীল।

- وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ অর্থাৎ মহান আল্লাহ বান্দাদের প্রতি সীমাহীন অনুগ্রহশীল ও সহানুভূতিশীল। (ইমরান– ৩০)

৩৮। **আশ-শাহিদু** اَلشَّهِيدُ অর্থাৎ সর্বত্র উপস্থিত, সবকিছুর সাক্ষ্য। প্রতিটি জিনিসের উপর তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ।

- وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ অর্থাৎ আর মহান আল্লাহ সবকিছুর সাক্ষ্য। প্রতিটি জিনিসের উপর তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ। (মুজাদালাহ– ৬)

৩৯। **আস সামীউ** اَلسَّمِيعُ বান্দার গোপন ও প্রকাশ্য সব কথা তিনি শুনেন।

৪০। **আল বাসিরু** اَلْبَصِيرُ তার নিখিল সাম্রাজ্যের প্রতিটি অণু পরমাণুর উপর তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ। তাঁর বান্দার গোপন ও প্রকাশ্য যাবতীয় আমল ও আচরণের উপর তিনি দৃষ্টি রাখেন এবং সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদান করেণ।

- إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ অর্থাৎ নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ সবকিছু শুনেন এবং তিনি সর্বদ্রষ্টা। (মুমিন– ২০)

- وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ অর্থাৎ মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। (ইমরান– ১৫)

৪১। **আল আলীমু** اَلْعَلِيمُ প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন সবকিছু তিনি জানেন।

- عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ অর্থাৎ তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন। (হাশর– ২২)

৪২। **আল আলীমু** اَلْعَلِيمُ অতিশয় জ্ঞানী, জ্ঞানের আধার। বান্দার প্রতিটি কথা, কাজ, চিন্তা কল্পনা ও উত্তেজনা সম্পর্কে তিনি সঠিক ভাবে জ্ঞাত।

- إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ অর্থাৎ নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ সর্বজ্ঞাতা। তিনি সবকিছুর খবর রাখেন। (লুকমান– শেষ আয়াত)

৪৩। **আল খাবিরু** اَلْخَبِيرُ তিনি সব বিষয়ে খবর রাখেন।

- وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ অর্থাৎ তোমাদের সকল কর্মতৎপরতা (ভালমন্দ) সম্পর্কে মহান আল্লাহ খবর রাখেন। (মুজাদালাহ– ১৩)

৪৪। **আল মুহীতু** مُحِيطٌ পরিবেষ্টন কারী। অর্থাৎ কোন কিছুই তার শক্তি ও জ্ঞানের বাইরে নয়।

- أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا মহান আল্লাহর জ্ঞান সবকিছুর উপর পরিব্যাপ্ত। (তালাক– ১২)

- وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُّحِيطٌ অর্থাৎ মহান আল্লাহ তাদেরকে আড়াল থেকে পরিবেষ্টন করে আছেন। (বুরুজ– ২০)

৪৫। **আল মু'মিনু** ٱلْمُؤْمِنُ আশ্রয়, নিরাপত্তা ও প্রশান্তি দানকারী।

৪৬। **আল মুহাইমিনু** ٱلْمُهَيْمِنُ রক্ষণাবেক্ষণ কারী।

- الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ অর্থাৎ মহান আল্লাহই বান্দার প্রকৃত আশ্রয়দাতা। নিরাপত্তা দানকারী, অন্তরে প্রশান্তি দানকারী এবং প্রকৃত রক্ষণাবেক্ষণ কারী। (হাশর–২৩)

৪৭। **আল হাফিজু** ٱلْحَفِيظُ সংরক্ষণকারী, নিরাপত্তাদানকারী, হিফাজতকারী।

- فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا অর্থাৎ মহান আল্লাহ সর্বোত্তম রক্ষাকারী সংরক্ষক। (ইউসুফ– ৬৪)

৪৮। **আল হাফিজু** ٱلْحَفِيظُ আসমান ও জমীনের প্রতিটি জিনিসকে তিনি হিফাজত করছেন। তিনি বান্দার হিফাজতকারী।

- إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমার রব সবকিছুর হেফাজতকারী। (হুদ– ৫৭)

৪৯। **আন নাসিরু** النَّصِيرُ প্রকৃত মদদগার, সাহায্যকারী।

- فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ অর্থাৎ তিনিই তোমাদের মাওলা। সর্বোত্তম মাওলা তিনি আর প্রকৃষ্ট সাহায্যকারী (হজ্জের শেষ আয়াত)

৫০। **আর রাকিব** ٱلرَّقِيبُ তিনি বান্দাদের তৎপরতার উপর পূর্ণ দৃষ্টি ও লক্ষ্য রাখেন।

- إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا অর্থাৎ নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তোমাদের উপর কড়া দৃষ্টি রাখেন। (নিসা– ১)

৫১। **আল হাফিউ**-তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন ও খেয়াল রাখেন। বান্দাদের প্রতি মেহেরবান।

- إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا অর্থাৎ অবশ্যই তিনি আমার প্রতি খেয়াল রাখেন। (মরিয়াম– ৪৭)

৫২। **আল মুজীব** اَلْمُجِيب দু'আ শ্রবণকারী ও কবুলকারী।

- أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ অর্থাৎ যখন কেউ আমাকে ডাকে, আমি তার ডাকে সাড়া দিই। (বাকারা– ১৮৬)

৫৩। **আল কুদ্দুছ** اَلْقُدُّوسُ অতিশয় পবিত্র ও ত্রুটিমুক্ত। অর্থাৎ মহান আল্লাহপাক সর্বপ্রকার ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে, অতিশয় পূত-পবিত্র। (হাশর– ২৩)

৫৪। **আস্ সালাম** اَلسَّلَامُ সর্বপ্রকার কমতি ও দুর্বলতা থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত – সহীসালেম।

- هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَـهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ তিনি ছাড়া আর কোন হক্ব ইলাহ নেই। তিনি প্রকৃত সম্রাট পূত পবিত্র ও সহীসালেম। (হাশর– ২৩)

৫৫। **আল মাতিন** اَلْمَتِينُ তিনি সুদৃঢ় ও নিরংকুশভাবে প্রতিষ্ঠিত।

- إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ অর্থাৎ নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ অধিক রিযিকদাতা, ক্ষমতাধর ও সুপ্রতিষ্ঠিত। (যারিয়াত– ৫৮)

৫৬। **আল হালিম** اَلْحَلِيمُ অতিশয় উচ্চ ও মহা মর্যাদাবান। পরম ধৈর্যশীল ও সীমাহীন সহিষ্ণু। তিনি শাস্তি প্রদানে তাড়াহুড়া করেণ না। বান্দাদেরকে শোধরানো ও অনুশোচনার অবকাশ দিয়ে থাকেন। তিনি কখনও উত্তেজিত ও ধৈর্য হারা হন না। তার সকল কর্ম কান্ডই সুপরিকল্পিত এবং সম্মান, সম্ভ্রম ও মর্যাদা ব্যঞ্জক।

- إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا অর্থাৎ নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল দয়াবান, মাফীদানকারী (ফাতির– ৪১)

৫৭। **আল আজিম** اَلْعَظِيمِ তিনি নিজ অস্তিত্ব ও গুণাবলীতে অতিশয় শ্রেষ্ঠ ও মহান।

- فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ অর্থাৎ অতএব, তুমি তোমার শ্রেষ্ঠ মহান রবের পবিত্রতা বর্ণনা করো। (ওয়াকিয়া– ৭৪ ও শেষ আয়াত)

৫৮। **আল ওয়াসিউ** وَاسِعٌ তিনি অত্যন্ত মুক্ত ও প্রসস্ততার অধিকারী। বান্দাদের প্রতি তিনি বড়ই উদার ও সহানুভূতিশীল।

- وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ অর্থাৎ এবং মহান আল্লাহ অত্যন্ত উদার প্রশস্ততার অধিকারী জ্ঞানী। (বাকারা– ২৪৭)

৫৯। **আল হাইউ** اَلْحَيُّ চিরঞ্জীব, চিরজীবি, ঘুম, তন্দ্রা, অবচেতনা ইত্যাদি থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত।

৬০। **আল কাইউম** اَلْقَيُّومُ চিরন্তন, চিরশ্বাশ্বত। চিরকাল থেকে আছেন, চিরকাল থাকবেন। সৃষ্টির কাঠামোকে ধারণ করে আছেন।

- وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ অর্থাৎ ভরসা করো সেই সত্তার উপর যিনি মৃত্যুহীন, চিরঞ্জীব এবং প্রশংসাহ পবিত্রতা ঘোষণা কর। (ফোরকান– ৫৮)

- اللَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ অর্থাৎ মহান আল্লাহ তিনি ছাড়া আর কোনো প্রকৃত ইলাহ নেই। তিনি চিরজীবি, চিরস্থায়ী, চিরশ্বাশ্বত। তাকে কখনও না নিদ্রা স্পর্শ করে আর না তন্দ্রা। (বাকারা– ২৫৫)

৬১। **আল হাক্ব** اَلْحَقُّ তিনি প্রকৃত সত্য, অতি বাস্তব। তাঁর অস্তিত্বকে কেউ অস্বীকার করলে তার কিছুই যায় আসে না।

- ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ অর্থাৎ এটা এই জন্য যে, মহান আল্লাহর অস্তিত্বই পরম সত্য, আর তাঁকে ছাড়া তারা যাদেরকে ডাকছে, সবই বাতিল-মিথ্যা। (লোকমান– ৩০)

- أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ অর্থাৎ আর তারা জানতে পারবে যে, মহান আল্লাহ অবশ্যই সত্য এবং তিনি সত্যকে সত্য হিসেবে প্রকাশকারী। (নূর– ২৫)

৬২। **আল গানিউ** اَلْغَنِيُّ মুখাপেক্ষীহীন। তাঁর কোনো অভাব নেই, কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই, তাঁর সবই আছে এবং এইসব কিছু তাঁরই। তাই সবাই এবং সবকিছু তাঁর মুখাপেক্ষী।

- وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ অর্থাৎ যে কেউই মহান আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করে, সে নিজের কল্যাণের জন্যেই তা করে।

নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ নিখিল জগতে কারোরই মুখাপেক্ষী নন। (আন কাবুত– ৬)

৬৩। **আল হামিদু** اَلْحَمِيدُ স্বপ্রশংসিত। আপন অস্তিত্ব ও গুণাবলীর সৌন্দর্য ও পবিত্রতায় মহীয়ান। সমস্ত প্রশংসা ও পবিত্রতা শুধু তাঁরই জন্যে নির্ধারিত। তিনি কারো প্রশংসা লাভের মুখাপেক্ষী নন।

وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِۦ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ - অর্থাৎ যে কেউ শোকর করবে, তার শোকর তার নিজের জন্যেই কল্যাণকর। আর যে অকৃতজ্ঞ হবে (তার জেনে রাখা দরকার যে) অবশ্যই মহান আল্লাহ মুখাপেক্ষীহীন স্বপ্রসংশিত। (লোকমান– ১২)

৬৪। **আল মাজীদু** اَلْمَجِيدُ তিনি অতিশয় মহীয়ান ও মর্যাদাবান।

وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُود - ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ - অর্থাৎ তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়, মহান আরশ অধিপতি, মহান ও শ্রেষ্ঠতম। (বুরুজ– ১৪-১৫)

৬৫। **আল ওয়ারিছু** اَلْوَارِثُ তিনিই সবকিছুর প্রকৃত ও চিরন্তন মালিক।

৬৬। **আল মুহী** اَلْمُحْيِى জীবন দানকারী।

وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ - অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমরা জীবন দানকারী ও মৃত্যুদান কারী এবং আমরাই সবকিছুর প্রকৃত মালিক ওয়ারিশ। (হিজর– ২৩)

৬৭। **আল ফাতিরু** সব কিছুর তিনিই একমাত্র স্রষ্টা।

فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ - **ফাতিরাস সামাঅতি অল আরজা আন্তা অলিউ ফিদ দুনিয়া অল আাখিরাহ** অর্থাৎ আসমান যমীনের স্রষ্টা। তুমিই দুনিয়া ও আখেরাতে আমার সাহায্যকারী পৃষ্ঠপোষক। (ইউসুফ– ১০১)

৬৮। **আল আউআলু** اَلْأَوَّلُ তিনি সৃষ্টি জগত সৃষ্টির পূর্ব থেকে আছেন।

৬৯। **আল আখিরু** اَلْآخِرُ তিনি সৃষ্টি জগতের ধ্বংসের পরেও থাকবেন।

৭০। **আজ জাহিরু** اَلْظَّاهِرُ তিনি সর্বত্র প্রকাশমান।

৭১। **আল বাতিনু** اَلْبَاطِنُ তিনি প্রচ্ছন্ন।

- هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ - وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ অর্থাৎ তিনি আদি, তিনি অন্ত। তিনি প্রকাশমান, তিনি প্রচ্ছন্ন। প্রতিটি বিষয়ে তিনি অবহিত। (হাদীদ– ৩)

৭২। **আল বাদীউ** اَلْبَدِيعُ নব স্রষ্টা। কোন প্রকার উদাহরণ ছাড়াই তিনি পয়দা করেণ। অদ্বিতীয় স্রষ্টা ও আবিষ্কর্তা।

বাদিউস সামাঅতি অল আরজ অর্থাৎ তিনিই আসমান যমীনের অদ্বিতীয় স্রষ্টা ও আবিষ্কর্তা।

৭৩। **আর রাফিউ** اَلرَّافِعُ অতিশয় উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী।

- رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ অর্থাৎ তিনি অতিশয় উচ্চ মর্যাদার অধিকারী মহান আরশ অধিপতি। (মুমিন– ১৫)

৭৪। **আন নূরু** اَلنُّورُ আলোকময়।

- اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ **আল্লাহু নূরুস সামাঅতি অল আরজ** অর্থাৎ আল্লাহই আসমান ও যমীনের নূর। (নূর– ৩৫)

৭৫। **আল আকরাম** اَلْإِكْرَامُ পরম সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। বান্দার সাথে সম্মান ও মর্যাদা বাহক আচরণ করেন।

- اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ অর্থাৎ পড় এবং তোমার রব বড়ই সম্মানিত ও মর্যাদাবান। (আলাক– ৩)

৭৬। **আছ ছামাদু** اَلصَّمَدُ মুখাপেক্ষীহীন, প্রয়োজন মুক্ত। সবাই এবং সবকিছুই তার মুখাপেক্ষী।

- قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ - اللَّهُ الصَّمَدُ অর্থাৎ বল ঃ তিনি মহান আল্লাহ। তিনি একক, অদ্বিতীয়। তিনি প্রয়োজনমুক্ত মুখাপেক্ষীহীন এবং সকলেই তার মুখাপেক্ষী। (ইখলাস– ১-২)

৭৭। **আত্ তাওওয়াব** اَلتَّوَّابُ অর্থাৎ তিনি বান্দার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখেন। বান্দার তওবা কবুল করেন। ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ - الرَّحِيمُ **সুম্মা তাবা আলাইহিস লিইয়াতুবু ইন্নাল্লাহা হুঅত তাওয়াবুর রহীম।**

অর্থাৎ অতঃপর মহান আল্লাহ তাদের প্রতি দৃষ্টি দিলেন যেনো তারা তওবা করে তাঁর দিকে ফিরে আসে। নিশ্চয়ই তিনি তওবা কবুলকারী করুনার আধার। (তাওবাহ– ১১৮)

৭৮। **আল ওয়াহ্হাব** اَلْوَهَّابُ অতিশয় দাতা ও দানশীল।

- وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً - إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ অর্থাৎ (ওগো প্রভু) তোমার নিকট থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর। নিশ্চয়ই তুমি অতিশয় দাতা ও দানশীল। (ইমরান– ৮)

৭৯। **আর রায্যাকু** اَلرَّزَّاقُ সৃষ্টিকূলকে অধিক অধিক রিযিক দানকারী। প্রয়োজন পূরণকারী।

- إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ অর্থাৎ নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ অধিক অধিক রিযিক দানকারী অতিশয় ক্ষমতাধর ও দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত। (যারিয়াত– ৫৮)

৮০। **আল মুক্বীতু** اَلْمُقِيتُ জীবিকা দানকারী। প্রত্যেক সৃষ্টিকে তার সঠিক অংশ পুরাপুরিভাবে দান করেন।

- وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا অর্থাৎ প্রতিটি জিনিসকে সঠিক অংশ দিতে মহান আল্লাহ সম্পূর্ণ সক্ষম। (নিসা– ৮৫)

৮১। **আল কারীম** اَلْكَرِيمُ মুক্ত ও উদার দাতা, অধিক দাতা। অত্যন্ত সদাচারী।

- يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ - الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ - فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ অর্থাৎ হে মানুষ ! কোন জিনিস তোমাকে তোমার 'করীম' রবের ব্যাপারে ধোকায় ফেলেছে ? তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাকে সুস্থ-সঠিক বানিয়েছেন। তোমায় ভারসাম্যপূর্ণ করেছেন এবং যে আকৃতিতে ইচ্ছে করেছেন তোমাকে সুসংযোজিত করেছেন। (ইনফিতার– ৬-৮)

৮২। **আল কাবিরু** اَلْكَبِيرُ অতিশয় নিকটবর্তী।

- إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমার রব অতিশয় নিকটবর্তী দোয়া কবুলকারী। (হুদ– ৬১)

৮৩। **আল ওয়াকিলু** اَلْوَكِيلُ কর্মকর্তা, দায়িত্বশীল। যার উপর নির্ভর করা যায়।

- وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ অর্থাৎ তারা বললো ঃ মহান আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি সর্বোত্তম কর্মকর্তা। (ইমরান –১৭৩)

৮৪। **আল ওয়াদুদু** اَلْوَدُوْدُ পরম বন্ধু, দয়া ও মহব্বতের উৎস।

- وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ - ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ অর্থাৎ তিনিই অত্যন্ত ক্ষমাশীল। পরম বন্ধু মহান আরশ অধিপতি। (বুরুজ– ১৪-১৫)

৮৫। **আল মুসতাআনু** اَلْمُسْتَعَانُ তিনিই সেই সত্ত্বা যার নিকট সাহায্য চাওয়া যেতে পারে।

- فَصَبْرٌ جَمِيلٌ - وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ অর্থাৎ উত্তম ভাবে আমি ধৈর্য্য ধারণ করবো। তোমরা যা কিছু বলছো, সে বিষয়ে মহান আল্লাহর নিকটই সাহায্য চাওয়া যেতে পারে। (ইউসুফ– ১৮)

৮৬। **আল হাদী** اَلْهَادِي সঠিক পথ প্রদর্শন কারী। কিতাব ও রাসূল প্রেরক।

- وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ অর্থাৎ মহান আল্লাহ মুমিনদেরকে সঠিক সোজা পথ প্রদর্শন করেন। (হজ্জ– ৫৪)

৮৭। **আল বাররু** اَلْبَرُّ সহানুভূতিশীল।

- إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ অর্থাৎ নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ সহানুভূতিশীল মেহেরবান। (তূর– ২৮)

৮৮। **আল ফাত্তাউ** اَلْفَتَّاحُ সঠিক সিদ্ধান্তও ফায়সালা দানকারী। যাবতীয় সমস্যার সমাধান কারী।

- قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ অর্থাৎ বলে দিন ঃ আমাদের রব আমাদেরকে একত্রিত করবেন। অতঃপর আমাদের মাঝে সঠিক ফায়সালা করবেন। নিশ্চয়ই তিনি সঠিক ফায়সালাকারী জ্ঞানী। (সাবা– ২৬)

৮৯। **আল লাতিফ** اَللَّطِيفُ তিনি অতিশয় সূক্ষ কৌশল অবলম্বন কারী সূক্ষদর্শী।

- إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ অর্থাৎ নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ বড়ই সূক্ষদর্শী সর্বজ্ঞাতা। (লোকমান– ১৬)

৯০। **আল হাসিবু** اَلْحَسِيبُ হিসাব গ্রহণকারী।

- إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا অর্থাৎ নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ প্রত্যেকটি জিনিসের ব্যাপারে হিসাব নেবেন। (নিসা–৮৬)

৯১। **আল জামিউ** اَلْجَامِعُ মহান আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করবেন।

- رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ অর্থাৎ পরওয়ারদেগার ! তুমি অবশ্যই সেদিন মানুষকে একত্রিত করবে, যে দিনটি আসার ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ নেই। (ইমরান – ৯)

৯২। **আল কাফী** كَافٍ বান্দার (যে কোনো প্রয়োজনের) জন্য তিনি যথেষ্ট।

- أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ অর্থাৎ মহান আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন ? (যুমার– ৩৬)

৯৩। **আল গালিব** غَالِبٌ পূর্ণ ক্ষমতাশীল ও পরিপূর্ণ বিজয়ী।

- وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ অর্থাৎ নিজ কর্ম সম্পাদনে মহান আল্লাহ পূর্ণ বিজয়ী। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। (ইউসুফ– ২১)

৯৪। **আল মুন্‌তাকিমু** اَلْمُنْتَقِمُ প্রতিশোধ গ্রহণকারী। তিনি তার মুমিন বান্দাদের দুশমনদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করে থাকেন।

- فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ۖ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ অর্থাৎ যারা অত্যাচার ও অপরাধ করেছিলো আমরা সেই সব পাপীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছি। আর মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব। (রুম– ৪৭)

৯৫। **আল ক্বায়িমু বিল কিসতি** قَائِمًا بِالْقِسْطِ তিনি পরিপূর্ণ ন্যায় ও ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত।

- وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ অর্থাৎ তিনি ন্যায় ও ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত, তিনি ছাড়া আর কোনো হক্ব মাবুদ নাই। (আল ইমরান – ১৮)

৯৬। **আল বাসিতু** اَلْبَاسِطُ প্রশস্ততা ও ব্যাপকতা দান কারী।

- اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ অর্থাৎ যাকে ইচ্ছে করেন, মহান আল্লাহ রিযিকের ব্যাপকতা ও আধিক্য দান করেন। (রায়াদ– ২৬)

৯৭। **আল মুনয়িমু** অর্থাৎ নেয়ামত ও অনুগ্রহ দান কারী।

- وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَـٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ অর্থাৎ যারা মহান আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে চলে, তারা ঐ সমস্ত লোকদের সাথে থাকবে যাদেরকে মহান আল্লাহ নেয়ামত অনুগ্রহ দানে ভূষিত করেছেন। (নিসা– ৬৯)

৯৮। **আল মুয়িজজু** اَلْمُعِزُّ সম্মান ও ইজ্জত দানকারী।

৯৯। **আল মুজিল্লু** اَلْمُذِلُّ অপদস্থকারী।

تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ - অর্থাৎ তুমি যাকে ইচ্ছে করো সম্মান ও ইজ্জত দান করো আর যাকে ইচ্ছে লজ্জিত ও অপদস্থ করো। সমস্ত কল্যাণের চাবিকাঠি তোমারই মুষ্টিবদ্ধে। (আল ইমরান – ২৬)

১০০। **জুলজালালী ওয়াল ইকরাম** ذُو اَلْجَلَالِ وَالْإِكْرَامُ মহাসম্মানিত মাহাত্বপূর্ণ।

- تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ অর্থাৎ তোমার রবের নাম বড়ই বরকত শালী, মহা সম্মানিত, মাহাত্বপূর্ণ। (রহমান– ৭৮)

১০১। **আল ওয়াহিদু** اَلْوَاحِدُ তিনি এক, শুধুই একক।

১০২। **আল আহাদু** اَلْأَحَد তিনি একক। অর্থাৎ তাঁর জাত ও গুণাবলীতে তিনি সম্পূর্ণ অদ্বিতীয় ও একক। কেউই তার শরীক নেই এবং কারো সাথে তার কোন আত্মীয়তা নেই। তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই। সবাই এবং সবকিছুই এই এক এককের মুখাপেক্ষী।

- لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ - لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ অর্থাৎ আজ রাজত্ব কার ? একক প্রবল পরাক্রান্ত মহান আল্লাহর। (মুমিন– ১৬)

- قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ - اللَّهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ - وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ অর্থাৎ বলুন, তিনি মহান আল্লাহ একক, অদ্বিতীয়। মহান আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জম্ম দেননি এবং কেউ তাকে জম্ম দেয়নি এবং তার সমতুল্য কেউ নেই। (ইখলাছ) [ঈমানের পরিচয় নামক বই হইতে গৃহীত]

১০৩। **আল-আকরাম** পরম সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। তিনি বান্দার সাথে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদা ব্যঞ্জক আচরণ করেন। - اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ **ইক্বরা ওয়া রব্বুকাল আকরাম** অর্থাৎ পড় এবং তোমার রব বড়ই সম্মানিত ও মর্যাদাবান (আলাক্ব ঃ ৩)

মহান আল্লাহর গুণবাচক নামকে কিভাবে গ্রহণ করতে হবে সে সম্পর্কে হাদিস

"ইন্না লিল্লাহি তিসআতাও' ওয়া তিসয়িনা ইছমান মিআআতান গাইরা ওয়াহিদাতিন মান আহছাহা দাখালাল জান্নাতা অর্থাৎ মহান আল্লাহর ৯৯ টি নাম আছে, যারা এ নামগুলিকে পূর্ণরূপে গ্রহণ ও সংরক্ষণ করতে পারবে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। এখানে **'আহছা'** শব্দ থেকে বুঝান হয়েছে মহান আল্লাহর নামগুলির অর্থ জানবে ও বাস্তবে তা গ্রহণ ও সংরক্ষণ করবে। গ্রহণ ও সংরক্ষণ এর অর্থও দু'টি-

(১) মহান আল্লাহর প্রত্যেকটি নামের সংগে নিজের সম্পর্ক দৃঢ় করা। একে বলে (তায়াল্লুক বিল্লাহ) বা মহান আল্লাহর সংগে সম্পর্ক দৃঢ় করা।

(২) মহান আল্লাহর নামের মধ্যে মহান আল্লাহর যে গুণের পরিচয় পাওয়া যায় সেই গুণের চরিত্র নিজের মধ্যে সৃষ্টি করার জন্যে চেষ্টা করা। একে বলে (তাখাল্লোক বিল্লাহ) অর্থাৎ মহান আল্লাহর গুণাবলীর অনুরূপ করে নিজের চরিত্র গঠন করা।

অর্থাৎ ঈমানে মুজমাল নামক কালেমার মধ্যে আমরা যে বললাম, **"আমানতু বিল্লাহি কামা হুয়া বিআসমায়িহি ওয়া ছিফাতিহি"** বা মহান আল্লাহর গুণবাচক নামের মধ্যে মহান আল্লাহর যে গুণের পরিচয় পেয়েছি সেই পরিচয় বা সেই গুণাবলী সহকারেই মহান আল্লাহকে মানলাম। এর অর্থ হল ঃ

(১) মহান আল্লাহর প্রত্যেকটি গুণের সংগে নিজের সম্পর্ক দৃঢ় করা এবং

(২) মহান আল্লাহর গুণের অনুরূপ করে নিজের চরিত্র গঠন করা।

এবার আসুন মহান আল্লাহর গুণবাচক নামগুলিকে বুঝার চেষ্টা করি এবং তদনুরূপ (ক) মহান আল্লাহর সংগে সম্পর্ক দৃঢ় করি ও (খ) সেই মুতাবিক চরিত্র গঠন করি।

মহান আল্লাহর নাম, অর্থ ও ব্যাখ্যা

১। اللَّهُ **আল্লাহ ঃ (ক) সম্পর্ক দৃঢ়করণ**। এটা মহান আল্লাহ পাকের যা-তি নাম। এর একটা শাব্দিক অর্থও রয়েছে, যেমন- পূর্ব যামানার কিছু মুহাক্কিক আলিম বলেছেন - আল + ইলাহ = আল্লাহ। **ইলাহ অর্থ সার্বভৌমত্বের অধিকারী**, আর আল শব্দ দ্বারা সেটাকে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে অর্থাৎ মহান আল্লাহ শব্দের অর্থ দাঁড়াল সার্বভৌম ক্ষমতার একমাত্র ও একচ্ছত্র অধিকারী। তাহলে এ নামের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক দৃঢ় করতে হলে একমাত্র মহান আল্লাহকেই সার্বভৌমত্বের মালিক মনে করতে হবে এবং আমাদের বাস্তব কাজের সঙ্গে তার এইরূপ মিল রাখতে হবে যে মহান আল্লাহর রাজত্বের মধ্যে আর কারও প্রাধান্য মানব না। সর্বদাই মহান আল্লাহর নাম স্মরণ করব, জিকির করব এবং সর্বদাই এই অনুভূতি নিজের মধ্যে জাগ্রত রাখব যে মহান আল্লাহর রাজত্বে আর কারও মাতুব্বরি নাই।

খ) তদনুরূপ চরিত্র গঠন ঃ এ নামের বিশ্বাস থেকে এমন চরিত্র গঠন করতে হবে যেন মহান আল্লাহর সার্বভৌমত্বের মধ্যে অন্য কারও সার্বভৌমত্বের দাবী বা যে কোন পন্থায় মানুষের চোখে ধূলা দিয়ে তার কোন প্রকার প্রয়োগ আদৌ যেন বরদাস্ত না করি।

২। اَلرَّحْمَانُ **আর রহমানু** ঃ বা অত্যন্ত দয়ালু।

৩। اَلرَّحِيْمُ **আর রাহীমু** ঃ এই একই অর্থবোধক শব্দ।

ক) **সম্পর্ক দৃঢ়করণ ঃ** নিজের প্রতি মহান আল্লাহকেই একমাত্র পরমদাতা ও দয়ালু হিসাবে মেনে নেওয়া। এরূপ মানতে পারলে মনে কখনও এমন খেয়াল স্থান পাবে না যে বিপদকালে চীন, আমেরিকা বা ভারত রাশিয়ার দয়ার উপর নির্ভর করতে হবে। সে সর্বদাই মহান আল্লাহর দয়ার উপর নির্ভর করবে।

খ) **তদনুরূপ চরিত্র গঠন ঃ** মহান আল্লাহ যেমন আমার প্রতি পরমদাতা ও দয়ালু তেমন আমার চরিত্রের মধ্যেও নিষ্ঠুরতা থাকবে না, আমিও মহান আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দাতা ও দয়ালু হব।

৪। اَلْمَلِكُ **আল মালিকু ঃ** মহান আল্লাহই একমাত্র সর্বেসর্বা বাদশাহ।

ক) সম্পর্ক স্থাপন ও দৃঢ়করণ ঃ মানুষ যেমন রাষ্ট্র প্রধানকে ভয় করে চলে এবং রাষ্ট্র প্রধানের হুকুম অমান্য করাকে চরম শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে

মনে করে ঠিক তেমনই আমি যেহেতু অন্য কাউকে নয়, একমাত্র মহান আল্লাহকেই বাদশাহ বলে মানি তখন মহান আল্লাহর আইন মেনে চলাই হবে আমার বাস্তব জীবনের যাবতীয় আমল।

খ) তদনুরূপ চরিত্র গঠন ঃ বাদশার আনুগত্য ও দাসত্বই হবে চরিত্রের বিশেষ গুণ। এরপর ৫ম থেকে **১১**শ নাম পর্যন্ত মহান আল্লাহর এমন ৭টি নাম উল্লেখ করা হয়েছে যার মধ্যে বলা হয়েছে মহান আল্লাহ কি ধরণের গুণ সম্পন্ন বাদশাহ।

৫। اَلْقُدُّوسُ **আল কুদ্দুস** ঃ যাবতীয় অন্যায়, জুলুম, নির্যাতন ও যে কোন প্রকার ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র, এমন এক বাদশাহ মহান আল্লাহ।

৬। اَلْسَّلَامُ **আস্ সালামু** ঃ মহান আল্লাহই শান্তিদানকারী বাদশাহ অর্থাৎ মহান আল্লাহই এমন বাদশাহ যার আইনেই সমাজে শান্তি আসতে পারে অর্থাৎ মহান আল্লাহর দেয়া সূর্য ছাড়া যেমন দিন হয় না তেমন মহান আল্লাহর বাদশাহী না হলেও সমাজে সালাম বা শান্তি আসতে পারে না।

৭। اَلْمُؤْمِنُ **আল মু'মিনু** ঃ নিরাপত্তাদানকারী বাদশাহ।

৮। اَلْمُهَيْمِنُ **আল মুহাইমিনু** ঃ রক্ষণাবেক্ষণকারী বাদশাহ।

৯। اَلْعَزِيزُ **আল আযিযু** ঃ মহা সম্মানিত, মহা প্রভাবশালী ও মহা শক্তিধর বাদশাহ।

১০। اَلْجَبَّارُ **আল্ জাব্বারু** ঃ যা খুশী তা করার মত শক্তিশালী বাদশাহ।

১১। اَلْمُتَكَبِّرُ **আল্ মুতাকাব্বিরু** ঃ সব রকম শক্তি ও গুণের বড়াই করার মত একমাত্র বাদশাহ।

ক) সম্পর্ক দৃঢ়করণ ঃ মহান আল্লাহকে উপরোক্ত শক্তি ও গুণের এক মাত্র অধিকারী বাদশাহ হিসাবে মেনে নিয়ে (মহান আল্লাহর) প্রতি এমন ভয় পোষণ করতে হবে যেন অন্য কোন ব্যক্তির প্রতিই সেই ধরণের ভয় ভীতি না থাকে এবং মনে এমন অবস্থা রাখতে হবে যে আমার বাদশার চাইতে আর কোন শক্তিধর বাদশাহ হ'তেই পারে না। কাজেই আমরা আমাদের সর্বোচ্চ

শক্তিধর বাদশার যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ আনুগত্য করতে পারব ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কোন প্রকার ভয় নেই।

খ) তদনুরূপ চরিত্র গঠন ঃ যদি মহান আল্লাহ কাউকে নেতৃত্ব বা বাদশাহী দান করেন তা'হলে তিনিও যেন নিরাপত্তাদানকারী, সংরক্ষণকারী ও ন্যায় বিচারক সুলভ চরিত্র গঠন করেন। আর তিনি যেন অশান্তির প্রবর্তক না হয়ে শান্তির প্রবর্তক হতে পারেন এবং তিনি যেন মহান আল্লাহকে মূল বাদশাহ হিসাবে মেনে নিয়ে নিজেকে মহান আল্লাহর খলিফা মনে করে মহান আল্লাহর প্রতি ভয় পোষণ করেন এবং যেন মহান আল্লাহর তাবেদার হ'য়ে চলার মত চরিত্র গঠন করেন।

১২। اَلْخَالِقُ **আল্ খালিকু ঃ** দৃশ্যমান বস্তুসমূহের সৃষ্টিকর্তা।

১৩। اَلْبَارِئُ **আল বারিউ ঃ** রুহু এবং অদৃশ্যমান বস্তু সমূহের সৃষ্টিকর্তা।

১৪। اَلْمُصَوِّرُ **আল্ মুসাওব্বিরু ঃ** মহান আল্লাহ আকার আকৃতি দানকারী।

ক) সম্পর্ক দৃঢ়করণ ঃ এই সব সৃষ্টির কারণে একমাত্র মহান আল্লাহরই কৃতজ্ঞতা বা শোকর আদায় করা।

খ) তদনুরূপ চরিত্র গঠন ঃ মহান আল্লাহর এই সব গুণ যে মহান আল্লাহ ছাড়া কোন মানুষের মধ্যে নেই এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে মেজাজকে গড়ে তোলা অর্থাৎ মহান আল্লাহকেই সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও রক্ষাকর্তা হিসাবে মেনে নিয়ে সেই মহান আল্লাহর আনুগত্যের ভিত্তিতে জীবনকে গড়ে তোলার মত মেজাজ সৃষ্টি করা।

১৫। اَلْغَفَّارُ **আল্ গাফফারু ঃ** মহান আল্লাহ বহু বড় ক্ষমাকারী।

ক) সম্পর্ক দৃঢ়করণ ঃ মহান আল্লাহ ক্ষমাকারী হিসাবে তিনি যদি গুনাহ মাফ না করেন তবে একটি মানুষও পরিত্রাণ পেতে পারবে না। অথচ মহান আল্লাহ মানুষকে মাফ করেন এবং করবেন। এর জন্যে অহরহ মহান আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করা দরকার।

খ) তদনুরূপ চরিত্র গঠন ঃ আমাদের প্রত্যেকের যেমন ক্ষমার প্রয়োজন রয়েছে তেমন আমাদেরও উচিৎ মানুষকে ক্ষমা করা। যখন কেউ আপনার প্রতি কোন অন্যায় ব্যবহার করে ক্ষমা চাইবে তখন আপনাকে হিসাব করে দেখতে

হবে এর চাইতে বড় অপরাধ আমি মহান আল্লাহর প্রতি কখনও করেছি কিনা এবং সেই অপরাধ থেকে মহান আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুক আমি তা চাই কিনা। এটা যদি আপনি চান তবে আপনার চরিত্রে এমন গুণ থাকা উচিৎ যে, যে কোন প্রকার বড় অপরাধ যেন আপনি ক্ষমা করতে পারেন। নইলে শেষ বিচারের দিনে কোন অপরাধের জন্যে মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইলে মহান আল্লাহ যখন বলবেন যে তুমি আমার অমুক বান্দার অমুক অপরাধ ক্ষমা করনি। কাজেই আমি তোমার তার চাইতে বড় অপরাধ কেন ক্ষমা করব। সেদিন যেন লা জবাব না হতে হয় সেইরূপ হিসাব করেই নিজেকে ক্ষমাশীল হতে হবে। হ্যাঁ, তবে আপনার ক্ষমা যেন অন্যের জুলুমের পথ প্রশস্ত না করে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই ক্ষমা করতে হবে।

১৬। اَلْقَهَّارُ **আল কাহ্হারু** ঃ প্রভাব বিস্তারকারী মহা শক্তিধর।

(ক) সম্পর্ক দৃঢ়করণ ঃ মহা শক্তিধর হিসাবে তার ভয়ে সর্বদা ভীত থাকা যেন তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই আমার দ্বারা না হয়ে যায়।

(খ) তদনুরূপ চরিত্র গঠন ঃ মহান আল্লাহ 'আল কাহ্হারু' হিসাবে তার সৃষ্টির উপর যেমন প্রভাব বিস্তার করেন তেমন কু-প্রবৃত্তি ও সামাজিক নীতি বিবর্জিত কার্যকলাপের প্রতি অত্যন্ত কঠোর হয়ে তা দমন করার মত স্বভাব নিজের মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে।

১৭। اَلْوَهَّابُ **আল্ ওয়াহ্হাবু** ঃ মহান আল্লাহ অত্যন্ত বেশী দাতা।

(ক) সম্পর্ক দৃঢ়করণ ঃ অত্যন্ত দাতা হিসাবে মহান আল্লাহর বেশী বেশী শোকরিয়া আদায় করা।

(খ) তদনুরূপ চরিত্র গঠন ঃ মহান আল্লাহ যেমন বড় দাতা তেমনি নিজের চরিত্র ও সেইভাবে গঠন করতে হবে। অর্থাৎ গরীব-দুঃখী, ইয়াতীম, মিসকীন সবাইকে বেশী দান খয়রাত করতে হবে।

১৮। اَلرَّزَّاقُ **আর রাযযাকু** ঃ মহান আল্লাহই একমাত্র রুজী দেনেওয়ালা।

(ক) সম্পর্ক দৃঢ়করণ ঃ রুজির ব্যাপারে মহান আল্লাহর উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হবে এবং মহান আল্লাহর দেয়া হাত, পা, চোখ, কান, বিবেক, বুদ্ধি ইত্যাদি ব্যবহার করে মহান আল্লাহর দেখানো পথে হালাল রুজি উপার্জনের চেষ্টা করতে হবে।

(খ) তদনুরূপ চরিত্র গঠন ঃ অর্থাৎ মহান আল্লাহ যেমন আমাকে রুজি দেন তেমন আমার উপর যারা নির্ভরশীল তাদেরও রুজির জন্যে আমাকে সচেষ্ট হতে হবে।

১৯। اَلْفَتَّاحُ **আল ফাত্তাহু ঃ** বন্ধ দরজা যিনি খুলে দেন অর্থাৎ বিদ্যা, বুদ্ধি, রুজি ও বিভিন্ন প্রকার লাভের দরজা যিনি খুলে দেন।

২০। اَلْعَلِيمُ **আল আলীমু ঃ** সর্বজ্ঞ বা যিনি সব কিছুই জানেন।

(ক) সম্পর্ক দৃঢ়করণ ঃ সকল প্রকার অসুবিধার রুদ্ধ কারাগারের দ্বার উদঘাটন করে নিস্কৃতি দেন যিনি। যাবতীয় বিপদ মুছিবত থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে তারই মুখাপেক্ষী হব। যিনি সর্বজ্ঞ বা সবজান্তা। তার নিকট থেকে জ্ঞানার্জনের জন্যে সদা সচেষ্ট থাকতে হবে আর যেহেতু তিনি সবকিছু জানেন তাই নিজেকে সদা সতর্ক অবস্থায় রাখতে হবে যেন নিজের মধ্যে এমন কিছু প্রকাশ না পায় যা মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে দূষণীয়।

(খ) তদনুরূপ চরিত্র গঠন ঃ যতদূর সম্ভব অন্যের মধ্যে জ্ঞান দান এবং অন্যান্যদের জন্যে বিভিন্ন প্রকার লাভজনক ব্যবস্থার দরজা খুলে দেয়া।

২১। اَلْقَابِضُ **আল ক্বাবিজু ঃ** সংকীর্ণকারী।

২২। اَلْبَاسِطُ **আল বাসিতু ঃ** প্রশস্তকারী।

(ক) সম্পর্ক দৃঢ়করণ ঃ যে কোন ব্যাপারে যে কোন কিছুকে মহান আল্লাহই সংকীর্ণ করতে পারেন ও করে থাকেন। আবার তিনি তা প্রশস্ত করতে পারেন ও করে থাকেন। কাজেই তারই প্রতি সদা সন্ত্রস্ত অবস্থায় দোয়ায় লিপ্ত থাকা, যেন তিনি সংকীর্ণ অবস্থা থেকে উদ্ধার করে প্রশস্ত অবস্থা এনে দেন।

(খ) তদনুযায়ী চরিত্র গঠন ঃ মহান আল্লাহ যখন যে অবস্থায় রাখেন তা সহ্য করার মত ধৈর্য্যশীল হওয়া।

২৩। اَلْخَافِضُ **আল খাফিছু ঃ** তিনিই অবনতি দানকারী।

২৪। اَلرَّافِعُ **আর রাফি ঃ** তিনিই উন্নতি দানকারী।

(ক) সম্পর্ক দৃঢ়করণ ঃ যেহেতু তাঁর হাতে উন্নতি অবনতি কাজেই তাঁরই নিকট সর্বদা অবনতির হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে উন্নতি লাভের জন্যে প্রার্থনা করতে থাকা এবং তাঁরই দেখানো পথে উন্নতি লাভের চেষ্টা করা।

(খ) তদনুযায়ী চরিত্র গঠন ঃ নিজে যেমন অবনতির হাত থেকে বেঁচে উন্নতি করতে চাই তেমন আমি যেন কারও উন্নতির পথকে বন্ধ করে না দেই।

২৫। اَلْمُعِزُّ **আল মুয়িযযু ঃ** ইজ্জত দানকারী।

২৬। اَلْمُذِلُّ **আল মুজিল্লু ঃ** ইজ্জত হরণকারী, অপদস্তকারী।

(ক) সম্পর্ক দৃঢ়করণ ঃ যিনি ইজ্জতের মালিক তাঁরই নিকট সদা-সর্বদা বলা দরকার যে তিনি যেন বেইজ্জতির হাত থেকে উদ্ধার করেন।

(খ) তদনুরূপ চরিত্র গঠন ঃ আমি যেমন নিজে অসম্মানিত হতে চাই না তেমন আমার দ্বারা যেন কেউ অসম্মানিত না হন।

২৭। اَلسَّمِيعُ **আস সামীয়ু ঃ** সব কিছু যিনি শোনেন।

২৮। اَلْبَصِيرُ **আল বাসীরু ঃ** সব কিছু যিনি দেখেন।

(ক) সম্পর্ক দৃঢ়করণ ঃ কোন গোপন স্থানেও যেন এমন কিছু না করি যা মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে দূষণীয়। কারণ, তাঁর শ্রবণ ও দর্শন এড়ানোর কোন পথ নেই।

(খ) তদনুরূপ চরিত্র গঠন ঃ মহান আল্লাহর ভয়ে সর্বদা ভীত থাকা।

২৯। اَلْحَكَمُ **আল হাকামু ঃ** মহান আল্লাহই আসল হুকুমদাতা ও আসল আইন প্রণেতা।

(ক) সম্পর্ক দৃঢ়করণ ঃ মহান আল্লাহকেই প্রকৃত হুকুমকর্তা ও আইনদাতা হিসাবে মেনে নিয়ে জীবন যাপন করা।

(খ) তদনুরূপ চরিত্র গঠন ঃ মহান আল্লাহই যেহেতু প্রকৃত আইন প্রণেতা ও হুকুমদাতা কাজেই আমার হুকুম যেন মহান আল্লাহর হুকুমেরই প্রতিধ্বনি হয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন, সলাত কায়েম কর, আমিও সেই সলাত কায়েম করারই হুকুম প্রদান করব এবং তিনি হুকুম করেছেন চোরের হাত কাটতে ও ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যাদন্ড দিতে বা

১০০ শত দোররা মারতে, আমিও যখন রাষ্ট্রপ্রধান হব তখন আমিও মহান আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে ঐ হুকুমই জারি করব যে হুকুম মহান আল্লাহ জারী করেছেন। মহান আল্লাহ বলেছেন ঘুষ চলবে না আমিও বলব ঘুষ চলবে না। মহান আল্লাহ বলেছেন, সুদভিত্তিক নয়; যাকাত ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা চালু করতে হবে। আমি বলব, সুদ ভিত্তিক নয়; যাকাত ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা চালু করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেছেন মেয়ে পুরুষের অবাধ মেলামেশা চলবে না, আমিও বলব মেয়ে পুরুষের অবাধ মেলামেশা চলবে না। এভাবে মহান আল্লাহ হাকাম হিসেবে যা বলেছেন আমিও হাকামের প্রতিনিধি হিসেবে তাই বলব (এর পর থেকে ব্যাখ্যা কিছুটা সংক্ষেপ করব যেন বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি না পায়।)

৩০। اَلْعَدْلُ **আল আদলু** ঃ ন্যায়পরায়ণ ও ন্যায় বিচারক। এই কথা বুঝানোর জন্যেই বলা হয়েছে মহান আল্লাহ "আহকামুল হাকিমীন" বা সর্বোপরি হুকুমদাতা। অতএব মহান আল্লাহর হুকুম ছাড়া আর কারও হুকুমই মানব না এবং আদল বা ন্যায় বিচারক মহান আল্লাহর শুকরিয়া সর্বদাই আদায় করব।

৩১। اَللَّطِيفُ **আল লাতীফু** ঃ মহান আল্লাহ বড় সূক্ষদর্শীও বিপদকালে মেহেরবাণী করনেওয়ালা। এর জন্যে প্রয়োজন তার শুকরিয়া আদায় করা ও নিজের মধ্যে বিপদকালে মানুষের উপকার করার মত মনোভাব সৃষ্টি করা।

৩২। اَلْخَبِيرُ **আল খাবীরু** ঃ গোপন খবর রাখনেওয়ালা। কাজেই মনের যাবতীয় গোপন পাপ থেকে মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতে হবে।

৩৩। اَلْحَلِيمُ **আল হালীমু** ঃ অতিরিক্ত ধৈর্য্যশীল। কাজেই আমাদেরও অতি ধৈর্য্যশীলের বান্দা হয়ে অতি ধৈর্য্যশীল হতে হবে।

৩৪। اَلْعَظِيمُ **আল আজীমু** ঃ আল্লাহ মহানেরও মহান বা অতি মহান। কাজেই আমরা মহান আল্লাহকে মহান বলে স্বীকার করে নিয়ে সেই মহান আল্লাহর মহান আজ্ঞাবহ দাস হব।

৩৫। اَلْغَفُورُ **আল্ গাফুরু** ঃ ক্ষমাশীল আল্ গাফফারু এর সমার্থবোধক।

৩৬। ٱلشَّكُورُ **আশ শাকুরু** ঃ যে কাজ যেমন ভাবে করা উচিৎ সে কাজ তেমনি ভাবে করনেওয়ালা এবং মানুষের ছোট কাজের বড় মর্যাদা দেনেওয়ালা।

আমাদেরকেও মহান আল্লাহ যে কাজ যেভাবে করতে বলেছেন যদি সে কাজ সেই ভাবেই করি তাতেই মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় হয় আর তার বিপরীত ভাবে কাজ করলে ঐটার নামই হয় জুলুম। কাজেই আমরা যেন জালেম না হয়ে শাকের হই সেজন্যে সর্বদাই হুঁশিয়ার থাকতে হবে।

৩৭। ٱلْعَلِيُّ **আল আলিয়্যু** ঃ মহান আল্লাহ অতি বড় মহান।

৩৮। ٱلْكَبِيرُ **আল কাবীরু** ঃ আল আজিমু এর প্রায় সম অর্থবোধক শব্দ।

৩৯। ٱلْحَفِيظُ **আল হাফীজু** ঃ সারা বিশ্বের সব কিছুই সংরক্ষণ কারী। মহান আল্লাহ যেমন বিশ্বের হেফাজতকারী তেমন আমাদেরও হতে হবে হেফাজতকারী, হুঁশিয়ার থাকতে হবে যেন খেয়ানতকারী না হই।

৪০। ٱلْمُقِيتُ **আল মুক্বীতু** ঃ সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিমান ও সকলেরই রুজিদাতা। কাজেই রুজির জন্যে তাঁরই মুখাপেক্ষী হব এবং তাঁর দেয়া রুজির একটা ভাগ অন্যদেরকেও দেব।

৪১। ٱلْحَسِيبُ **আল হাসীবু** ঃ সবার হিসাব গ্রহণকারী। কাজেই নিজেকে সর্বদাই হিসাব করে কাজ করতে হবে যেন হিসাব গ্রহণকারীর হিসাবে দায়ী না হয়ে পড়ি।

৪২। ٱلْجَلِيلُ **আল জালীলু** ঃ অতি বড় মর্যাদাশীল।

৪৩। ٱلْكَرِيمُ **আল কারীমু** ঃ অতি বড় উদার দয়ালু। কাজেই সেই মহান আল্লাহর উপযুক্ত মর্যাদা দিতে হবে এবং তাঁর দয়া ও উদারতার শোকরিয়া আদায় করতে হবে এবং নিজেকেও হতে হবে উদার।

৪৪। ٱلرَّقِيبُ **আর রাকীবু** ঃ ভিতর বাহির সব কিছু যিনি দেখেন, শোনেন ও জানেন। কাজেই তাঁর চোখ এড়িয়ে কিছু করার ক্ষমতা নেই কারও। এটা হিসাব করেই চলা উচিত।

৪৫। اَلْمُجِيبُ **আল মুজীবু** ঃ করুণ প্রার্থনা শ্রবণকারী। কাজেই যে কোন অসহায় পরিস্থিতিতে তাঁর নিকট কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করব তিনি তা শুনবেন ও দিবেন।

৪৬। اَلْوَاسِعُ **আল ওয়াসিয়ু** ঃ মহান আল্লাহর সব কিছুই অফুরন্ত। কাজেই তাঁর বান্দা হয়ে আমরা অবশ্যই কারও দ্বারস্থ হতে পারি না। দ্বারস্থ হব একমাত্র মহান আল্লাহর। কারণ সব কিছুরই অফুরন্ত ভান্ডার রয়েছে মহান আল্লাহরই নিকট।

৪৭। اَلْحَكِيمُ **আল হাকীমু** ঃ মহান আল্লাহ সর্ববিধ জ্ঞান বিজ্ঞানের অ ধিকারী।

৪৮। اَلْوَدُودُ **আল ওয়াদুদু** ঃ প্রেমময় মহান আল্লাহ। মহান আল্লাহর সঙ্গে যে প্রেম করতে পারে তার প্রেমটাই স্থায়ী আর অন্যান্যদের সঙ্গে যে প্রেম তা ক্ষণস্থায়ী। কাজেই স্থায়ী প্রেমময় মহান আল্লাহর সঙ্গেই আমাদের ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন করা উচিৎ।

৪৯। اَلْمَجِيدُ **আল মাজীদু** ঃ মহান আল্লাহই সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন।

৫০। اَلْبَاعِثُ **আল বায়িছু** ঃ ক্বিয়ামতের দিনে পুনরুত্থানকারী।

৫১। اَلشَّهِيدُ **আশ্ শাহীদু** ঃ প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষ্যদাতা।

৫২। اَلْحَقُّ **আল হাক্কু** ঃ মহান আল্লাহই মহাসত্য।

৫৩। اَلْوَكِيلُ **আল ওয়াকীলু** ঃ মহান আল্লাহই সকল প্রকার কার্য সম্পন্নকারী।

৫৪। اَلْقَوِيُّ **আল কায়্যু** ঃ মহা শক্তিশালী। মহান আল্লাহ অটুট, মহান আল্লাহই শক্তিশালী।

৫৫। اَلْمَتِينُ **আল মাতিন** ঃ তিনি সুদৃঢ় ও নিরংকুশভাবে প্রতিষ্ঠিত।

৫৬। اَلْوَلِيُّ **আল ওয়ালিয়্যু** ঃ মহান আল্লাহই একমাত্র সাহায্যকারী বন্ধু।

৫৭। اَلْحَمِيدُ **আল হামিদু** ঃ মহান আল্লাহই প্রকৃত প্রশংসার উপযুক্ত।

৫৮। اَلْمُحْصِيُ **আল মুহসিয়্যু** ঃ মানুষের জাহের বাতেন যাবতীয় কথা, কাজ ও খেয়ালকে হিসাবের জন্যে গুণে গুণে হেফাজতকারী।

৫৯। اَلْمُبْدِئُ **আল মুবদীউ** ঃ সকলের প্রথম সৃষ্টিকর্তা।

৬০। اَلْمُعِيدُ **আল মুয়ীদু** ঃ আখেরাতের জীবনের জন্য সকলকে পুনরায় সৃষ্টিকর্তা।

৬১। اَلْمُحْيِى **আল মুহয়ী** ঃ মহান আল্লাহ জীবন ও হায়াতদাতা।

৬২। اَلْمُمِيتُ **আল মুমীতু** ঃ মহান আল্লাহ মৃত্যুদাতা।

৬৩। اَلْحَىُّ **আল হাইয়ু** ঃ চিরঞ্জীব।

৬৪। اَلْقَيُّومُ **আল কাইয়ুমু** ঃ চির প্রতিষ্ঠিত।

৬৫। اَلْوَاجِدُ **আল ওয়াজিদু** ঃ প্রকৃত ধনী।

৬৬। اَلْمَاجِدُ **আল মাজীদু** ঃ প্রকৃত সম্মানী।

৬৭। اَلْوَاحِدُ **আল ওয়াহিদু** ঃ মহান আল্লাহ এক, একক সত্ত্বা।

৬৮। اَلْأَحَد **আল আহাদু** ঃ তিনি একক।

৬৯। اَلْصَّمَدُ **আস সামাদু** ঃ অভাব ও দোষত্রুটি মুক্ত এবং যার সিদ্ধান্ত কেউ রদ-বদল করতে পারে না। মহান আল্লাহ **'সামাদ'** বলেই নিম্নোক্ত ফরিয়াদগুলি কেবলমাত্র মহান আল্লাহর নিকট পেশ করা হয়। যেমন ঃ-

ইয়া কাজিয়াল হাজাত– হে অভাব মোচনকারী।

ইয়া কাফিয়াল মুহিম্মাত– হে সমস্যার সমাধানকারী।

ইয়া হাল্লালাল মুশকীলাত– হে মুশকিল আসানকারী।

ইয়া দাফিয়াল বালিইয়াত– হে বিপদ আপদ দূরকারী।

ইয়া শাফিয়াল আমরাদ– হে রোগ মুক্তিকারী।

ইয়া মুছাব্বিবুল আসবাব– হে উপায় উপকরণ সৃষ্টিকারী।

ইয়া রাফিয়াদ্দারাজাত– হে সম্পদ ও মর্যাদা দানকারী, ইত্যাদি নামে মহান আল্লাহকে যে ডাকা হয় তার কারণ এসব কিছু দেওয়ার মত গুণ ও ক্ষমতা যার মধ্যে থাকে তিনিই যেহেতু **'সামাদ'** তাই আল্লাহর নিকটই ওসব চাওয়া হয়।

৭০। اَلْقَادِرُ **আল কাদিরু** ঃ শক্তিমান।

৭১। اَلْمُقْتَدِرُ **আল মুক্‌তাদিরু** ঃ সর্বশক্তিমান দুইটাই সব অর্থবোধক শব্দ।

৭২। اَلْمُقَدِّمُ **আল মুকাদ্দিমু** ঃ অগ্রগামী করনেওয়ালা।

৭৩। اَلْمُؤَخِّرُ **আল মুয়াখখিরু** ঃ পশ্চাতগামী করনেওয়ালা।

৭৪। اَلأَوَّلُ **আল আউয়ালু** ঃ মহান আল্লাহই আদি।

৭৫। اَلْآخِرُ **আল আখিরু** ঃ মহান আল্লাহই শেষ বা অন্ত।

৭৬। اَلْظَّاهِرُ **আজ জাহিরু** ঃ তিনিই প্রকাশ্য বিষয় জানেন।

৭৭। اَلْبَاطِنُ **আল বাতিনু** ঃ তিনিই গোপন বিষয় জানেন।

৭৮। اَلْوَالِي **আল ওয়ালি** ঃ তিনিই প্রথম অধিকার বিস্তারকারী বাদশাহ।

৭৯। اَلْمُتَعَالِي **আল মুতায়ালী** ঃ সর্বোপরি ক্ষমতাশালী।

৮০। اَلْبَرُّ **আল বাররু** ঃ তিনিই পরম উপকারী বন্ধু।

৮১। اَلْتَّوَّابُ **আত তাউয়াবু** ঃ তিনিই তওবার তৌফিক দানকারী ও তওবা কবুলকারী।

৮২। اَلْمُنْتَقِمُ **আল মুনতাকিমু** ঃ তিনিই শাস্তিদানকারী।

৮৩। اَلْعَفُوُّ **আল আফুব্বু** ঃ মহান আল্লাহ ক্ষমাকারী।

৮৪। اَلْرَّؤُفُ **আর রাউফু** ঃ তিনিই অতিশয় সদয়।

৮৫। مَالِكُ اَلْمُلْكُ **মালিকুল মুলকি** ঃ সমস্ত বিশ্ব জাহানের রাজা। তিনি পৃথিবীরও রাজা আকাশেরও রাজা।

৮৬। ذُو اَلْجَلَالِ وَاَلْإِكْرَامُ **জুলজালালি ওয়াল ইকরাম** ঃ তিনিই সমস্ত প্রভাব প্রতিপত্তির মালিক।

৮৭। اَلْمُقْسِطُ **আল মুকসিতু** ঃ তিনিই ন্যায় বিচারক।

৮৮। اَلْجَامِعُ **আল জামিয়ু** ঃ হাশরে তিনিই সবাইকে সমবেতকারী।

৮৯। اَلْغَنِيُّ **আল গানিয়্যু** ঃ তিনিই প্রকৃত ধনী।

৯০। اَلْمُغْنِيُّ **আল মুগনি** ঃ তিনি ধনী করনেওয়ালা।

৯১। اَلْمَانِعُ **আল মানিয়্যু** ঃ তিনি ধনী না করলে কেউ ধনী হতে পারে না এবং তিনি ধনী করলে কেউ রদ করতে পারে না।

৯২। اَلْضَّارُ **আদ জাররু** ঃ অনিষ্টের মালিক মহান আল্লাহ।

৯৩। اَلْنَّافِعُ **আন নাফিয়্যু** ঃ উপকারের মালিকও মহান আল্লাহ।

৯৪। اَلْنُّورُ **আন্ নূরু** ঃ তিনিই আলো ও আলোর মালিক।

৯৫। اَلْهَادِي **আল হাদি** ঃ তিনিই হেদায়েতের মালিক।

৯৬। اَلْبَدِيعُ **আল বাদিয়্যু** ঃ বিনা উপাদানে সবকিছুর প্রথম অস্তিত্বদাতা ও সৃষ্টিকর্তা।

৯৭। اَلْبَاقِي **আল বাকি** ঃ সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর শুধু তিনিই বাকি থাকবেন।

৯৮। اَلْوَارِثُ **আল ওয়ারিছু** ঃ সকলের সকল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন মহান আল্লাহ।

৯৯। اَلْرَّشِيدُ **আর রাশীদু** ঃ মহান আল্লাহ্ সর্বদা সর্বক্ষেত্রে ন্যায় ও সত্যের উপর রয়েছেন।

১০০। اَلْصَّبُورُ **আছ ছাবূরু** ঃ মহান আল্লাহ অসীম ধৈর্য্যশীল।

আস সাত্তারু ঃ মহান আল্লাহ মানুষের দোষ গোপনকারী। তিনি যদি প্রত্যেকটি মানুষের যাবতীয় দোষ ত্রুটি জাহির করে দিতেন তাহলে দুনিয়ার একটি মানুষও লজ্জায় বাইরে বের হতে পারত না।

উপরে মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের **১**টি যা-তি নাম ও ৯৯ টি সিফাতী বা গুণবাচক নামের মধ্যে মহান আল্লাহর যে গুণের পরিচয় পাওয়া গেল সেই পরিচয় সহকারে মহান আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করতে হবে এবং মহান আল্লাহর গুণের প্রতিচ্ছায়া ঘটাতে হবে নিজের চরিত্রের মধ্যে। অর্থাৎ মহান আল্লাহ রহমান হিসাবে যত দয়ালু তত দয়ালু তো মহান আল্লাহর সৃষ্টি মানুষ হয়ে হওয়া যাবে না ঠিকই কিন্তু মানুষ যতটুকু দয়ালু সাধারণতঃ হতে পারে আমাকে ততটুকু দয়ালু হতে হবে। ঠিক তদ্রুপ মহান আল্লাহ তার

বিরুদ্ধবাদীদের যাবতীয় কুকর্ম দেখছেন অথচ তাদের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস করে দিচ্ছেন না। চরমভাবে ছবর করে যাচ্ছেন। আমরা তত ছবরকারী হতে পারব না ঠিকই কিন্তু মানুষের জন্যে যতটুকু সম্ভব ততটুকু ছাবের বা ধৈর্য্যশীল হতে হবে। এভাবে মহান আল্লাহর প্রত্যেকটি সিফাতের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক যেমন দৃঢ় করতে হবে তেমনি চরিত্রের মধ্যেও তার প্রতিফলন ঘটাতে হবে। তবেই **'কামা হুয়া বি আসমায়িহি ওয়া সিফাতিহি'** কথার হক্ব আদায় করে উক্ত কথার প্রতি ঈমান আনা হয়। নইলে শুধু তোতা পাখির মত পড়লেই ঈমান হয় না। অতঃপর **"কাবিলতু জামিয়া আহকামিহি ওয়া আরকানিহি"** কথার মাধ্যমে বলা হয় যে মহান আল্লাহর যাবতীয় আইন কানূন ও বিধি বিধান কবুল করে নিলাম। এবার চিন্তা করুন কার আইন কানূন মেনে নেওয়ার কথা স্বীকার করা হচ্ছে। যার ১টি যা-তি নাম ও ৯৯ টি সিফাতি নামের মধ্যে যাকে স্বীকার করে নিয়েছি - তারই যাবতীয় আইন কানূন মেনে নেওয়ার স্বীকারোক্তি হচ্ছে কাবিলতু শব্দের মধ্যে। (কালিমার হাকিকত)

'কাবিলতু' শব্দের তাৎপর্য

এটাকে সহজ করে বুঝার জন্যে একটি বাস্তব উদাহরণ দিচ্ছি। দেখুন **'কাবিলতু'** শব্দটা আরবী শব্দ হলেও আমরা বিবাহিত ও বিবাহিতা মুসলমানরা সবাই এ শব্দটার সঙ্গে পরিচিত। বিবাহের সময় এই কাবিলতু শব্দ মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেই অথবা তার অনুরূপ অর্থবোধক শব্দ হ্যাঁ বা হু শব্দ দ্বারা একজন স্ত্রী একজন পুরুষকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করে নেয়, ঠিক তদ্রুপ একজন পুরুষও এই একই শব্দ দ্বারা একজন মহিলাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করে নেয়। এই শব্দটা মাত্র একবারই মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে। আর তার প্রতিক্রিয়া জারী থাকে কবরে যাওয়া পর্যন্ত। অর্থাৎ একবার মাত্র **'কাবিলতু'** বলার কারণে; একটা মেয়ের জীবন যাপনের গতিধারা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন হয়ে যায়। যে মেয়েটা **'কাবিলতু'** বলার পূর্ব পর্যন্ত ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন। কিন্তু **'কাবিলতু'** বলার সঙ্গে সঙ্গে সে হয়ে পড়ে সম্পূর্ণ পরাধীন। যাকে স্বামী বলে স্বীকার করে নেয় তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে আর কিছুই করার অধিকার রাখে না। ঠিক তেমনই একটা মানুষ মহান আল্লাহকে যখন বলে, হে মহান আল্লাহ ! আমি তোমার সমস্ত আইন কানূন (কাবিলতু) গ্রহণ করলাম। তখন তারও জীবন যাপনের যাবতীয় গতিধারা ও কার্যকলাপ **'কাবিলতু'** কথার ভিত্তিতে পরিবর্তিত হতে হবে। নইলে **'কাবিলতু'** শব্দ দ্বারা যা স্বীকার করা হয় তা বাস্তবে মানা হয় না। একটা মেয়ে যেমন একজন পুরুষকে স্বামী হিসাবে **'কাবিলতু'** বলে স্বীকার

করে নেয়ার পর আর কারও স্ত্রীত্ব গ্রহণ করতে পারেনা। তেমন একজন মানুষ মহান আল্লাহর যাবতীয় আইন কানূন **'কাবিলতু'** বলে মেনে নেয়ার পর আর কারও আইনই মেনে নিতে পারে না।

এখানে মনে রাখতে হবে মহান আল্লাহর আইন মানার অর্থ শুধু সলাত, সিয়াম ও দাড়ী টুপির আইন মানাই নয়; বরং মহান আল্লাহর আইন বলতে বুঝাবে পবিত্র কুরআন ও সহী হাদিসের মাধ্যমে মহান আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলীমা যত কথা বলেছেন এবং যত প্রকার হুকুম আহকাম জারী করেছেন তার প্রত্যেকটি আইন স্বীকার করা এবং তা বাস্তব জীবনে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পালন করা। এরই নাম হচ্ছে সত্যিকার অর্থে **'কাবিলতু'** বা মেনে নিলাম। অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তা ব্যক্তি জীবনেই হোক বা রাষ্ট্রীয় কিংবা সামাজিক জীবনেই হোক অথবা ব্যবসা বাণিজ্য, যুদ্ধ, সন্ধি, চুক্তি, লেখাপড়া, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য-সংস্কৃতি, যা-ই হোক না কেন তার সবই মহান আল্লাহর বিধান মুতাবিক যদি পালন করা হয় তবেই মহান আল্লাহকে কাবিলতু বাক্য অনুযায়ী স্বীকার করা হয়, তা বাস্তবেও মানা হয়। নইলে মুখে মহান আল্লাহকে বললাম মহান আল্লাহর যাবতীয় হুকুম আহকাম **'কাবিলতু'** বা মেনে নিলাম আর বাস্তবে যদি অফিস আদালতে, কল কারখানায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, সমস্ত ব্যাপারেই মহান আল্লাহর আইন মেনে চলতে না পারি তবে ঈমানে মুজমালের স্বীকারোক্তির প্রকৃত হক আদায় হয় না। কাজেই সকল ক্ষেত্রেই এ ধরনের মানার নামই সত্যিকার ঈমান আনা। অন্যথায় মুখে এক প্রকার স্বীকার করে কাজে তার বিপরীত কিছু করলে মহান আল্লাহর সঙ্গে ধোঁকাবাজি ছাড়া আর কিছুই হয় না।

মহান আল্লাহর পরিচয় পবিত্র হাদীস হইতে

১। আবু হুরাইরা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন ঃ আমি সমস্ত শিরক কারীদের শিরক হতে মুক্ত। যদি কেউ তাঁর কাজে আমার সাথে শিরক করে, আমি তাকে ও তার শরীককে বর্জন করি। (মুসলিম)

২। আবু মুসা রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে ঃ তিনি বলেছেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা পাঁচটি বাক্য নিয়ে আমাদের সামনে দন্ডায়মান হলেন– অতঃপর বললেনঃ নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তা'আলা নিদ্রা যান না এবং তাঁর নিদ্রার প্রয়োজন হয় না। আমলের মাপকাঠি

হ্রাস ও বৃদ্ধি করেন। রাত্রের আমলগুলি দিনের আমল শুরু হওয়ার আগে এবং দিনের আমল রাতের আমল শুরু হওয়ার আগেই তাঁর কাছে পৌঁছানো হয়। তিনি নূরের পর্দা দ্বারা বেষ্টিত। যদি তিনি তা উম্মোচন করেন। তাহলে তাঁর চেহারার জ্যোতি তাঁর সৃষ্টির যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে, তা জ্বালিয়ে দিবে। (মুসলিম)

৩। আবু হুরাইরা রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা হইতে বর্ণিত আছে যে, মহান আল্লাহর দক্ষিণ হস্ত পরিপূর্ণ, যা কোন খরচই কমাতে পারে না। এমনকি রাত দিন অবিরাম খরচ করলেও না। তোমরা কি দেখেছো যে, আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি হতে তিনি এ পর্যন্ত কত খরচ করেছেন ? প্রকৃতপক্ষে তার ডান হাতে যা আছে তা কমেনা। এবং তার অন্য হাতে মাপকাঠি, যা তিনি হ্রাস ও বৃদ্ধি করেন। (বুখারী, মুসলিম)

৪। আবু জর রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা দুটো বকরীকে পরস্পর শিং দ্বারা একে অন্যকে আঘাত করতে দেখে বললেন ঃ হে আবু জর, তুমি কি জান, এই বকরী দুটো পরস্পরকে আঘাত কেন করছে ? তদুত্তরে আমি বললাম, আমি জানি না। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বললেন ঃ কিন্তু আল্লাহ ভাল জানেন এবং ক্বিয়ামত দিবসে তিনি উভয়ের মধ্যে শ্রীঘ্রই মীমাংশা করবেন। (আহমাদ)

৫। আবু হুরাইরা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে ঃ আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা পবিত্র কুরআনের অত্র আয়াত পাঠ করলেন ঃ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ - إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا - নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তোমাদের হুকুম করছেন– তোমাদের আমানতসমূহ আমানতকারীর নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য। নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ শ্রবণ কারী ও দর্শনকারী। (নিসা– ৫৮)। অতঃপর তিনি বৃদ্ধা অংগুলীদ্বয় তাঁর কর্ণদ্বয়ে এবং তর্জনীদ্বয় চক্ষুদ্বয়ের উপর রাখলেন। (আবুদাউদ ও অন্যান্য)

৬। ইবনে উমর রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন ঃ গায়েবের চাবি (অদৃশ্যের) পাঁচটি। ইহা মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউই জানে না।

১. কেউ-ই জানে না যে, আগামীকাল কি হবে।

২. কেউ-ই জানে না যে, মায়ের পেটে কি আছে।

৩. কেউ-ই জানে না যে, আগামীকাল সে কি অর্জন করবে।

৪. কেউ-ই জানে না যে, সে কোথায় মারা যাবে এবং

৫. কেউ জানে না যে, কবে বৃষ্টি হবে। (বুখারী, মুসলিম)

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত ও খবর রাখেন। তিনি কিছু বিষয়ের জ্ঞান মানুষকে দিয়েছেন কিন্তু সকল দৃশ্য অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান কেবল তাঁরই। কিছু লোক এটা বুঝেছেন যে, আল কুরআন এ দাবি করে যে, মহান আল্লাহ তাআলাই শুধু মায়ের উদরে যে সন্তান আছে তার ছেলে-মেয়ে সম্পর্কে জানেন। আল কুরআনের ৩১ নং সূরাহ লুকমানের ৩৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ - وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا - وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ -

অর্থ : অবশ্যই মহান আল্লাহ তাআলার কাছে ক্বিয়ামতের আগমন জ্ঞান আছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন, তিনিই জানেন যা গর্ভাশয়ে বিদ্যমান আছে। কোনো মানুষই বলতে পারে না আগামিকাল সে কি অর্জন করবে এবং কোথায় মৃত্যুবরণ করবে। নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তাআলা সবকিছু জানেন।

আজ বিজ্ঞানের উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং আল্ট্রাসনোগ্রামের মাধ্যমে মায়ের উদরের সন্তানের লিঙ্গ (নারী-পুরুষ) সম্পর্কে সহজে নির্ধারণ করা যাচ্ছে। একথা ঠিক যে, এ আয়াতের বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও অনুবাদের মধ্যে একথাও বলা হয়েছে যে, শুধু মহান আল্লাহই জানেন মায়ের গর্ভে অবস্থিত বাচ্চা ছেলে না মেয়ে। কিন্তু আপনি এ আয়াতের আরবি মতন (মূল) বিশ্লেষণ করে দেখতে পাবেন যে, ইংরেজি শব্দ **Sex**-এর কোনো আরবি শব্দ ব্যবহৃত হয় নি। মূলত পবিত্র কুরআনে যা বলেছে তাহলো গর্ভে যা আছে তার জ্ঞান কেবল মহান আল্লাহ তাআলারই আছে। অনেক তাফসীরকারকদের ভুল হয়েছে, তারা এর অর্থ এটা বুঝেছেন যে, মহান আল্লাহ তাআলা মাতৃগর্ভের বাচ্চার sex-সম্পর্কে জানেন। একথা ঠিক নয়, এখানে লিঙ্গের দিকে ইঙ্গিত করা হয় নি। বরং ইঙ্গিত এ দিকে যে, মাতৃজঠরের বাচ্চার প্রকৃতি কী হবে। সে কি স্বীয় পিতা-মাতার জন্য বরকত ও সৌভাগ্যের কারণ হবে নাকি দুর্ভাগ্যের।

সে কি সমাজের জন্য করুণার কারণ হবে নাকি শাস্তির। সেকি সৎ হবে নাকি অসৎ, সে জান্নাতে যাবে না জাহান্নামে। এ সকল বক্তব্যের জ্ঞান একমাত্র মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলারই। দুনিয়ার কোনো বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এ পর্যায়ে উন্নতি হয়নি যার দ্বারা এ সকল প্রশ্নোত্তর বা সমাধান করতে পারে। না, কুরআনের বক্তব্য ও ব্যাখ্যা ঠিকই আছে, মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ অদৃশ্যের খবর জানে না। কোনো যন্ত্রের দ্বারা অদৃশ্যের বস্তুকে দৃশ্য করে দেখার নাম অদৃশ্যের খবর জানা নয়, বরং বিনা কোনো মাধ্যম বা অসীলায় কোনো অদৃশ্যের খবর বলে দেওয়াকে **'গায়ব জানা'** বলা হয়। আপনার পেটের উপরে জামা-গেঞ্জির ভিতরে কী বাঁধা আছে আমি জানি না, বিনা অসীলায় তা বলে দিতে পারলে আমি গায়েব- জান্তা। কিন্তু কোনো যন্ত্র লাগিয়ে বলে দিলে আমি গায়েব-জান্তা নই।

এইভাবেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা গায়েব জানতেন না। কিন্তু তিনি অনেক গায়েবের খবর বলেছেন। যেহেতু তিনি অহীর মাধ্যমে বলেছেন, তাই গায়বী খবর বলা সত্ত্বেও **'গায়েব-জান্তা'** ছিলেন না। **'গায়েব-জান্তা'** কেবল মহান আল্লাহ। তিনি বলেছেন,

قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ -

অর্থাৎ, বল, 'মহান আল্লাহ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না এবং ওরা কখন পুনরুত্থিত হবে (তাও) ওরা জানে না।' (নাম্‌ল ঃ ৬৫)। **(দ্বীনি প্রশ্নোত্তর কিতাবের ৬০ পৃঃ)।**

বাস্তবতার সাথে সূরাহ লুক্বমানের ৩৪নং আয়াতের কোনো বিরোধিতা নেই। কেননা আয়াতটি গায়েবী সংক্রান্ত। আর শিশু মাতৃগর্ভে থাকাবস্থায় গায়েবী বিষয়গুলো হলো - সে কত দিন মায়ের পেটে থাকবে, কত দিন দুনিয়াতে বেঁচে থাকবে, কেমন আমল করবে, সে কতটুকু রিযিক্ব গ্রহণ করবে, সৌভাগ্যবান হবে , না-কি দুর্ভাগ্যবান হবে। গঠন পূর্ণ হওয়ার পূর্বে ছেলে না মেয়ে হবে এ সম্পর্কে অবগত হওয়া ইলমে গায়েবের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা গঠন পূর্ণ হওয়ার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বিষয়ের জ্ঞানের মতই হয়ে যায়। *(ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন-১৫, পৃঃ ৪১-৪৩)। **(প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম কিতাবের ১১৬ পৃঃ)।***

৭। আবু হুরাইরা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করার সময় একটি টুকরা লিখে আরশের উপর তাঁর নিকট রাখলেন। এতে লিখেছেন ঃ ইন্না রাহ্মাতি সাবাক্বাত গাযাবী অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমার রহমত আমার গযবের উপর জয়লাভ করেছে। (বুখারী)

৮। আবু মুসা আশআরী রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ রাত্রে তার রহমতের হাত প্রসারিত করেন যেন, দিনের গোনাহ গাররা তাঁর নিকট খাঁটি তওবা করে এবং দিনের বেলা হাত প্রসারিত করেন যেন, রাত্রের গোনাহগাররা খাঁটি তওবা করে (এরূপ প্রসারিত করতে থাকবেন) যতক্ষণ পর্যন্ত ক্বিয়ামত সংঘটিত না হয়। (মুসলিম)

৯। আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন ঃ কাফিররা যখন কোন সৎকাজ করে, তখন তারা ওর বিনিময়ে পৃথিবীতে রিযিক (জীবিকা) প্রাপ্ত হয়ে থাকে। আর মহান আল্লাহ মুমিন বান্দাদের সৎকাজের প্রতিফল আখেরাতের জন্য সঞ্চিত রাখেন এবং তাদের নেক কাজের প্রতিদান স্বরূপ তাদেরকেও দুনিয়াতে (জীবিকা) দেওয়া হয়ে থাকে। (মুসলিম)

১০। মুসলিমে আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে আরও বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি পানাহারের পর মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে, মহান আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হন।

১১। আনাস ইবনে মালিক রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন ঃ যখন মহান আল্লাহর কোন বান্দা মহান আল্লাহর নিকট তওবা করে, তখন মহান আল্লাহ তোমাদের মধ্য হইতে ঐ ব্যক্তির চেয়েও বেশী খুশী হন, যে ব্যক্তি পানিবিহীন মরুভূমিতে তার বাহনের উপর ছিল। অতঃপর বাহনটি পালিয়ে গেল, যার উপর তার খাদ্য ও পানীয় ছিল। অতঃপর সে উহার প্রাপ্তি হতে নিরাশ হয়ে গেল। তৎপর সে একটি গাছের নিকট এসে ওটার ছায়ায় শয়ন করল এবং তাঁর বাহন প্রাপ্তির ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়ল। লোকটি যখন এরূপ অবস্থায় ছিল, তখন হঠাৎ বাহনটি তার নিকট দন্ডায়মান অবস্থায় দেখতে পেল। অতঃপর (সে বাহনটির লাগাম ধরল এবং আনন্দের আতিশয্যে বলল ঃ **"হে মহান আল্লাহ !**

তুমি আমার বান্দা, আমি তোমার প্রভু।" আনন্দের আতিশয্যে সে উল্টো কথা বলে ফেলল। (বুখারী ও মুসলিম)

১২। উমর রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে ঃ তিনি বলেছেন যে, হাওয়াযিন গোত্রের (দাস-দাসীগণকে) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এর সম্মুখে আনয়ন করা হল। হঠাৎ দাসীদের মধ্য হতে একজন মেয়ে লোককে দৌড়াতে দেখা গেল, অতঃপর সে একটি শিশুকে পেয়ে তার পেটের সাথে জড়িয়ে ধরল এবং তাকে দুধ পান করতে দিল। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বললেন ঃ তোমরা কি জান যে, এই মেয়ে লোকটি তার সন্তানকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করতে পারে ? তদুত্তরে (উপস্থিত) আমরা সকলে বলে উঠলাম, মহান আল্লাহর শপথ ! কখনও নয়। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বললেন ঃ উক্ত স্ত্রী লোকটির সন্তানের স্নেহ হতেও মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অধিকতর স্নেহশীল ও দয়ালু।

১৩। আবু হুরাইরা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ রহমতকে একশত ভাগে বিভক্ত করে তার নিকট নিরানব্বই অংশ রাখলেন এবং অবশিষ্ট একভাগ পৃথিবীতে বন্টন করলেন- তার দ্বারা সৃষ্ট জীব পরস্পরে মায়া মমতায় আবদ্ধ। এমনকি চতুষ্পদ জন্তু তার বাচ্চাকে বিপদ হতে বাঁচাবার জন্য তার ক্ষুর উত্তোলিত করে। (বুখারী ও মুসলিম)

১৪। সালমান ফার্সী রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন ঃ প্রত্যেকটি রহমত আসমান ও যমীনের মধ্যে বিস্তৃত এবং তাতে আরও আছে ঃ যখন শেষ বিচারের দিন আসবে, তখন ঐ রহমত দ্বারা পূর্ণতা দান করবেন। (মুসলিম)

১৫। আবু জার গিফারী রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন ঃ আকাশ কেঁপে উঠল। কেননা মহান আল্লাহর ভয়ে আসমান কেঁপে উঠার উপযুক্ত। আকাশে চার অংগুলি পরিমাণ স্থান খালি নাই, যেখানে কোন ফিরিশতা আল্লাহকে সিজদারত অবস্থায় নেই। আমি যা জানি, যদি তোমরা তা জানতে, তবে তোমরা অবশ্যই কম হাসতে এবং অধিক ক্রন্দন করতে এবং বিছানায় স্ত্রীদের সাথে সুখ গ্রহণ করতে না এবং তোমরা উচুঁ পাহাড়ের দিকে (লোকালয়হীন

স্থানে), অবশ্যই চলে যেতে। সে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে। (তিরমিযী)

১৬। আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন ঃ আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তবে অবশ্যই কম হাসতে এবং অধিক কাঁদতে এবং বিছানায় স্ত্রীদের সংগ সুখ লাভ করতে না। (বুখারী, মুসলিম)

১৭। জুনদুব রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি বলল ঃ মহান আল্লাহর শপথ ! মহান আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন না। অতঃপর মহান আল্লাহ বললেন ঃ কে শপথ করে বলে, আমি অমুক ব্যক্তিকে ক্ষমা করবো না ? বরং আমি তাকে ক্ষমা করলাম এবং তোমার সৎকাজগুলি নিষ্ফল করলাম। (মুসলিম)

১৮। আবু হুরাইরা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন ঃ মুমিনগণ যদি জানত মহান আল্লাহর নিকট কত কঠিন শাস্তি লুকায়িত আছে, তাহলে কেউ তার জান্নাতের আশা পোষণ করত না। আর যদি কাফিররা জানত মহান আল্লাহর রহমত কত বড় তাহলে কেউ তার জান্নাত হতে নিরাশ হতো না। (মুসলিম)

১৯। ইবনে মাসউদ রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন ঃ জান্নাত ও জাহান্নাম তোমাদের জুতার ফিতার চেয়েও অধিক কাছে। (বুখারী)

২০। আবু হুরাইরা রাজিয়াল্লাহু আনহু, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা হইতে বর্ণনা করেছেন ঃ একজন পতিতা রমণী একটি কুকুরকে প্রখর রৌদ্রে কোন এক কূপের নিকট ঘুরতে দেখল এবং প্রচন্ড গরমের কারণে পিপাসায় তার জিহ্বা বের হয়ে আসছিল। তখন ঐ পতিতা মেয়েলোকটি কুকুরটির জন্য তার মোজা খুলে পানি উঠাল। তৎপর ওকে পানি পান করাল। এর ফলে মহিলার সমস্ত গোনাহ মাফ হয়ে গেল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা আরও বলেছেন ঃ একজন মহিলা একটি বিড়ালের কারনে জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। সে বিড়ালকে বন্দী করে। তাকে খেতে দিত না এবং পোকা মাকড় খাবার জন্যও

বিড়ালকে ছেড়ে দিত না। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস জুহরী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন ঃ এ হাদীসের ভাবার্থে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, মানুষেরা যেন নেক কাজ করে শুধু তার উপর ভরসা না করে এবং কেউ খারাপ কাজ করেও যেন মহান আল্লাহর রহমত হতে নিজেকে বঞ্চিত মনে না করে। (বুখারী, মুসলিম)

২১। আবু হুরাইরা রাজিয়াল্লাহু আনহু, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা হইতে বর্ণনা করেছেন ঃ মহান আল্লাহ আশ্চর্য হবেন এমন সম্প্রদায়কে দেখে, যাদেরকে শিকলাবদ্ধ অবস্থায় জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। (বুখারী, মসনদে আহমাদ)

২২। আবু মুসা আশআরী রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন ঃ কষ্ট সহ্য করার উপর এবং গালি ও ভৎর্সনা শ্রবণ করার ব্যাপারে মহান আল্লাহর চেয়ে অধিকতর ধৈর্যশীল আর কেই নেই। কেননা তার বান্দারা পুত্র সন্তানের অধিকারী দাবী করে, এতদসত্ত্বেও তিনি তাদেরকে ক্ষমা করেন ও অন্ন দান করেন। (বুখারী)

২৩। আবু হুরাইরা রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন জিবরাইলকে ডেকে বলেন, হে জিবরাইল ! আল্লাহ তার অমুক বান্দাকে ভালবাসেন, সুতরাং তুমিও তাকে ভালবাস। ফলে জিবরাইল তাকে ভালবাসেন। অতঃপর তিনি আকাশ রাযীকে বলতে থাকেন, মহান আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে ভালবাসেন, তোমরাও তাকে ভালবাস। অতঃপর আসমান বাসীগণ তাকে ভালবাসেন এবং দুনিয়াতেও তিনি গৃহীত হন। (বুখারী, মুসলিম)

২৪। জাবীর বিন আব্দুল্লাহ আল বাজালী রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এর নিকট বসেছিলাম, এমন সময় তিনি পূর্ণিমার রাত্রের চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন– নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের প্রভুকে দেখবে, যেমনভাবে এই চাঁদকে দেখছ, যে দেখার মধ্যে তোমরা কোন সন্দেহ পোষণ করতে পারো না। যথাসম্ভব তোমরা সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বের সলাত আদায়ে গাফিলতি করো না। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা পাঠ করলেন ঃ তোমরা সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে রবের তাসবীহ আদায় কর। (তাহা-২১) (কুতুবে সিত্তাহ)

২৫। আবু হুরাইরা রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার ওলীর সাথে শত্রুতা করে, আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আর বান্দারা যে সব কার্য দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করে, ওর মধ্যে ফরজ কার্য আমার নিকট অধিক প্রিয়। আর আমার বান্দা নফল কার্যের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকবে। এমনকি আমি তাকে ভালবাসব। যখন আমি তাকে ভালবাসি তখন আমি তার শ্রবনেন্দ্রিয় হই, যা দ্বারা সে শ্রবণ করে এবং চোখ হই যা দ্বারা সে দেখে, হাত হই যা দ্বারা সে ধরে, পা হই যা দ্বারা সে চলে। যদি সে আমার নিকট কিছু প্রার্থনা করে অবশ্যই তাকে তা দান করি। আর যা হতে বাঁচতে চায় তা হতে বাঁচাই। আমি কোন কাজ করতে দ্বিধা করি না, একমাত্র আমার ঐ মুমিন বান্দার রুহ কবজ ছাড়া। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে এবং আমিও তার এই অনিচ্ছায় জোর করতে চাই না। অথচ তাকে মরতেই হবে। (বুখারী)

২৬। আবু হুরাইরা রাজিয়াল্লাহু আনহু, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা হইতে বর্ণনা করেছেন ঃ যখন রাত্রির এক তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে, তখন মহান আল্লাহ নিম্ন আকাশে অবতরণ করেন এবং বলেন কে আছ আমাকে ডাকবে, তার ডাকে আমি সাড়া দেব, যে ব্যক্তি আমার নিকট কিছু যাঞ্চা করবে আমি তাকে তা দান করবো, যে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করবো। (বুখারী, মুসলিম)

২৭। আবু মুসা আশআরী রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন ঃ দুটি জান্নাত যার আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদি স্বর্ণের তৈরী এবং দুটি জান্নাত যার আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদি রৌপ্যের তৈরী। জান্নাতে আদন নামক জান্নাতে অবস্থান কারী জান্নাতবাসীগণ এবং মহান আল্লাহর দীদারের মধ্যে শুধু গৌরবের চাঁদর থাকবে, যার দ্বারা তার মুখমন্ডল আবৃত থাকবে। (বুখারী)

ঈমান বিল হুকুক

বান্দাহর উপর মহান আল্লাহর কি কি অধিকার রয়েছে সেগুলো জানা ও সেগুলোর প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন করাই হচ্ছে ঈমান বিল হুকুক। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই জানতে হবে মহান আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী জীবন যাপন করার সঠিক পন্থা কি ? তাঁকে আরো জানতে হবে কি কি জিনিস মহান আল্লাহ পছন্দ করেন যা তাকে পালন করতে হবে এবং কি কি কাজ মহান আল্লাহ অপছন্দ

করেন যা থেকে তাকে বিরত থাকতে হবে। এ উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহর গুণবাচক নাম সমূহের মাধ্যমেও আমরা জানতে পারি এসব নামের মধ্যে কি কি দাবী ও অধিকার রয়েছে বান্দাহর উপর।

বস্তুতঃ মানুষের উপর মহান আল্লাহর প্রধানতম হক হচ্ছে এই যে, মানুষ উলূহিয়াত (মহান আল্লাহর একত্বকরণে ও সার্বভৌমত্ব) কে নিরংকুশ ভাবে মহান আল্লাহর জন্যে ঘোষণা দেবে এবং এ ব্যাপারে কখনও কোনো অবস্থাতেই অন্য কাউকেও তার শরীক করবে না। এ শুধু ঘোষণা দিলেই চলবে না। এ হতে হবে তার আন্তরিক প্রত্যয় ও ঈমান এবং তার জিন্দেগীতে বাস্তবভাবে রূপায়িত হতে হবে এ ঘোষণা ঃ যেমন ঃ মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ - وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ - অর্থাৎ তাদেরকে এ ছাড়া আর কোন হুকুমই দেয়া হয়নি যে, তারা মহান আল্লাহর বন্দেগী করবে, নিজেদের আনুগত্যকে তাঁরই জন্যে খালিস করে সম্পূর্ণরূপে একনিষ্ঠ ও একমুখী হয়ে। (বাইয়েনাহ– ৫) মহান আল্লাহ আরও বলেন ঃ

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ - أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ- অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ ! এ কিতাব আমরা তোমার প্রতি পরম সত্যতা সহকারে অবতীর্ণ করেছি। অতএব শুধুমাত্র মহান আল্লাহরই দাসত্ব গ্রহণ করো। তার আধিপত্য, প্রভূত্ব, মালিকানা, সার্বভৌমত্ব, বিধি বিধান এবং পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব ও আনুগত্য স্বীকার করো। সাবধান বস্তুতঃ আধিপত্য, কর্তৃত্ব ও আনুগত্যের একমাত্র অধিকারী মহান আল্লাহই। (যুমার– ২-৩) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ - কুল ইন্নামা উমিরতু আন আ'বুদাল্লাহা অলা উসরিকু বিহী অর্থাৎ আপনি ঘোষণা করে দিন, আমি নির্দেশিত হয়েছি মহান আল্লাহরই দাসত্ব করতে এবং তাঁর সাথে কাউকেও শরীক না বানাতে। (রাদ– ৩৬)

মুয়াজ বিন জাবাল রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত ঃ তিনি বলেন ঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এর পেছনে একই গাধায় সওয়ার ছিলাম। আমার ও তার মধ্যে খুব সামান্যই ব্যবধান ছিলো।

তিনি আমাকে বললেন ঃ মুয়াজ ! তুমি কি জান বান্দাহর উপর মহান আল্লাহর কি হক্ব ও অধিকার রয়েছে ? এবং মহান আল্লাহর উপরই বা বান্দাহর কি হক্ব ও অধিকার রয়েছে ? আমি বললাম ঃ মহান আল্লাহ ও তার রাসুলই এ বিষয়ে সর্বাধিক জানেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বললেন ঃ বান্দাহর উপর মহান আল্লাহর হক্ব ও অধিকার হচ্ছে এই যে, বান্দাহ শুধুমাত্র মহান আল্লাহরই দাসত্ব করবে এবং তার সাথে কাউকেও বা কোন কিছুকেই শরীক করবে না। মহান আল্লাহর নিকট বান্দাহর হক্ব হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সাথে কাউকেও শরীক করে না, মহান আল্লাহ তাকে শাস্তি দেবেন না। (বুখারী, মুসলিম)

বস্তুতঃ মানুষের উপর মহান আল্লাহর প্রধানতম হক্ব এটাই যে, মানুষ নিরংকুশ ভাবে মহান আল্লাহর দাসত্বকে মেনে নেবে এবং এ ব্যাপারে কাউকেও শরীক করবে না। মহান আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, কর্তৃত্ব ও আধিপত্যকে নিরংকুশ ও অবিভাজ্যভাবে মেনে নিতে হবে। ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রীয় ও আর্ন্তজাতিক ভাবে মহান আল্লাহর এ অধিকার প্রতিষ্ঠার আপোষহীন সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে হবে। মহান আল্লাহর সিফাত এবং পবিত্র কুরআনের সার্বিক আলোচনা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এর বাণীর আলোকে মহান আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ অধিকার আমাদের সার্বিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আমাদেরকে ঘোষণা দিতে হবে ঃ

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - لَا شَرِيكَ لَهُ - وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ - অর্থাৎ আমার সলাত, আমার সমস্ত ত্যাগ কোরবানী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু সব কিছুই বিশ্ব নিখিলের রব মহান আল্লাহর জন্যে। তাঁর কোনোই শরীক নেই। এরই নির্দেশ আমাকে দেয়া হয়েছে এবং আমিই সর্ব প্রথম অবনত মস্তকে তা মেনে নিলাম। (আনআম–১৬২-১৬৩) অতএব, একক আল্লাহ তা'আলার সমস্ত হুকুম পালন করাই হচ্ছে মানুষের উপর মহান আল্লাহর অধিকার আর এটাই হচ্ছে মানুষের সঠিক মর্যাদা।

ঈমান বিল ইখতিয়ারাত

অর্থাৎ মহান আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতার উপর পূর্ণ ঈমান ও আস্থা পোষণ করা। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই ঈমান রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহ তা'আলার শক্তি ও ক্ষমতার বাইরে কিছুই নেই। তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা সর্বত্র কার্যকর। মানুষকে জানতে হবে মহান আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলার পরিণতি

কি ? মানুষ যে যতো শক্তিমানই হোকনা কেন সে কোনো অবস্থাতেই মহান আল্লাহর ক্ষমতা ও পাকড়াওর বাইরে যেতে পারবে না। যেমন ঃ মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا - لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ - فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ - يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ - فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ -

হে জ্বীন ও মানুষের দল, তোমরা যদি পৃথিবী ও নভোমন্ডলের সীমা লংঘণ করে পালিয়ে যেতে সক্ষম হও, তবে গিয়ে দেখনা। না, তোমরা পালায়ে যেতে পারবে না। কারণ সর্বত্রই আমার ক্ষমতা ও আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত। তোমাদের রবের কোন শক্তি ও ক্ষমতাকে তথা অনুগ্রহকে তোমরা অবিশ্বাস করবে ? তোমাদের উপর আগুনের শিখা ও ধুয়া ছেড়ে দেওয়া হবে, যেগুলোর মোকাবেলা তোমরা করতে পারবে না। তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ শক্তি ও ক্ষমতাকে অস্বীকার করবে। (আর রহমান– ৩৩-৩৬)

মহান আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতাকে অমান্য করা, তাঁর বিধান লংঘণ করা, মহান আল্লাহর নির্দেশের নাফরমানী করা তার রাসূলদের নাফরমানী করা মহান আল্লাহ বরদাশত করেন না। এমন অপরাধীরা যতো বড় শক্তিশালীই হোক না কেন মহান আল্লাহর শক্তি ও পাকড়াও থেকে তাদের রেহাই নেই। যেমনঃ মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا - إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا - وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا -

হে নবী ! এসব অমান্যকারী মিথ্যাবাদী মহারথীদের সাথে বোঝাপড়ার কাজটি আমার উপর ছেড়ে দাও। আর কিছু সময়ের জন্য এদেরকে এ অবস্থায়ই চলতে দাও। আমার নিকট এদের জন্য দুর্বহ বেড়ী রয়েছে, দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা আগুন রয়েছে আরো রয়েছে গলায় আটকে যাওয়া খাদ্য এবং যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। (মুজ্জাম্মিল– ১১-১৩) মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ - كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ - ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ - إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ -

এসব লোকেরা কি কখনও যমীনে চলাফেরা করেনি ? তাহলে তারা তাদের পূর্বগামী লোকদের পরিণাম দেখতে পেত। তারা তো এদের তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী ছিল আর এদের অপেক্ষা অনেক বেশী ও ব্যাপক নিদর্শনাদি জমীনের বুকে রেখে গেছে। কিন্তু মহান আল্লাহ তাদের গোনাহর কারনে তাদেরকে পাকড়াও করলেন আর মহান আল্লাহর পাকড়াও থেকে তাদের বাঁচানোর কেউ-ই ছিল না। তাদের এই (সাংঘাতিক) পরিণাম এই জন্যে হয়েছিল যে, তাদের রাসূলগণ তাদের নিকট সুস্পষ্ট দলীল ও নিদর্শনাদি নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু তারা তাদেরকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল। শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহ তাদের পাকড়াও করলেন। নিশ্চয়ই তিনি বড় শক্তিধর এবং শাস্তি দানে বড় কঠোর। (মুমিন– ২১-২২) মহান আল্লাহ বলেনঃ

عَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا - অর্থাৎ তোমাদের নিকট আমরা সাক্ষ্যদাতা বানিয়ে একজন রাসূল পাঠিয়েছি যেমন করে আমরা ফেরাউনের নিকট একজন রাসূল পাঠিয়েছিলাম। ফেরাউন রাসূলকে অমান্য করল তাই আমি তাকে মজবুত ভাবে পাকড়াও করেছি। (মুযযাম্মিল– ১৬) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ - أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ - وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ - تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ - فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ -

তুমি কি দেখনি তোমার রব হাতীওয়ালাদের সংগে কি (আচরণ) করেছেন ? তিনি কি তাদের ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে দেননি ? তিনি তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠিয়ে দিলেন, এরা তাদের উপর পাকা মাটির পাথর নিক্ষেপ করছিল। এতে তাদের অবস্থা এমন করে দিলো যেমন জন্তু জানোয়ারের ভক্ষণ করা ভূষি। (আল ফীল)

পক্ষান্তরে যারা সত্যিকার ভাবে দাসত্ব কবুল করে তাঁর খেলাফত প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্ম নিয়োগ করে মহান আল্লাহ তাঁর অসীম শক্তি ও কুদরাতে তাঁদেরকে সাহায্য করেন এবং তাদের বিজয় দান করেন। আর তাদের যারা বিরোধিতা করে তাদেরকে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করেন। চতুর্দিক থেকে কাফিরদের সম্মিলিত বিরোধিতা ও জিঘাংসার মুখে মহান আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এর তখনকার ছোট্ট কাফেলাটি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَاذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ - অর্থাৎ স্মরণ

কর সেই সময়ের কথা, যখন তোমরা ছিলে খুবই অল্প সংখ্যক। জমীনে তোমাদের প্রভাব প্রতিপত্তি হীন মনে করা হতো। তোমরা ভয় করছিলে যে, লোকেরা তোমাদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়। এমতাবস্থায় মহান আল্লাহ তা'আলা তোমাদের আশ্রয় স্থল যোগাড় করে দিলেন। নিজের দেয়া সাহায্য দ্বারা তোমাদের হাতকে মজবুত করে দিলেন; আর তোমাদের উত্তম রিযিক দান করলেন, যেন তোমরা শোকর গুযার হও। (আনফাল– ২৬) মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا - وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ - অর্থাৎ যারা অত্যাচার ও অপরাধ করেছিল, আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছি। এমনি করে মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব। (রুম– ৪৭) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا - سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ -

সে সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন তোমার আল্লাহ ফেরেশতাদের প্রতি ইশারা করে বললেন ঃ আমি তোমাদের সংগেই রয়েছি। মুমিনদের অটল, অবিচল ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাখো। আমি এখনই এ কাফিরদের দিলে ভীতির উদ্রেক করে দিচ্ছি, অতএব তোমরা তাদের ঘাড়ের উপর আঘাত হানো এবং জোড়ায় জোড়ায় ঘা লাগাও। এরূপ এই জন্যেই করা হয় যে, এরা মহান আল্লাহ ও রাসূলের সাথে মোকাবেলা করে। বস্তুতঃ যারা মহান আল্লাহ ও রাসূলের সাথে মোকাবেলা করবে, মহান আল্লাহ ও তাদের জন্যে নিদারুণ কঠোর। (আনফাল– ১২-১৩)

বস্তুতঃ মহান আল্লাহ তা'আলা যে মহা পরাক্রমশালী, তাঁর শক্তি ও ক্ষমতার বাইরে যে কিছুই নাই, তাঁর নাফরমানী করলে তার পাঁকড়াও থেকে যে কেউই রক্ষা পাবে না, যারা আন্তরিক ভাবে তার পথে কাজ করে তিনি যে তাদেরকে যে কোন সংগীন অবস্থায়ও সাহায্য করার ক্ষমতা রাখেন এবং এরূপ ঈমানদারদের বিরোধিতা কারীদেরকে যে তিনি শাস্তি প্রদান করেন, সম্রাটকে সর্বহারা, সর্বস্বহারাকে সম্রাট, সম্মানিতকে লাঞ্ছিত, স্বচ্ছলকে অস্বচ্ছল, অস্বচ্ছলকে স্বচ্ছল, সুদিনকে দুর্দিন, দুর্দিনকে সুদিন, করার যে তিনি অসীম ও দুর্ণিবার ক্ষমতা রাখেন তাঁর এরূপ যাবতীয় গুণরাজির আলোকে তাঁর ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও প্রত্যয় স্থাপন করতে হবে। পূর্ণাঙ্গ আস্থা ও ঈমান আনতে হবে। কারণ মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ - بِيَدِكَ الْخَيْرُ - إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - অর্থাৎ বল ঃ হে মহান আল্লাহ ! নিখিল সাম্রাজ্যের মালিক ! তুমি যাকে চাও রাজ্য দান করো আর যার থেকে ইচ্ছে রাজ্য কেড়ে নাও। যাকে চাও সম্মানিত করো আর যাকে ইচ্ছে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করো। সমস্ত মংগল ও কল্যাণ তোমার ইখতিয়ারাধীন। নিঃসন্দেহে তুমি সর্বশক্তিমান, ক্ষমতার আধার। (আল-ইমরান– ২৬)

মহান আল্লাহ আজ্জা অজাল্লাহু সম্পর্কে প্রতিটি মুমিন-মুসলিমের যে জ্ঞান জানা অবশ্য কর্তব্য। সেগুলো হলো:

(১) মহান আল্লাহ কে ?

(২) মহান আল্লাহ কোথায় ?

(৩) মহান আল্লাহ কেমন ?

(৪) বান্দার সাথে মহান আল্লাহর সম্পর্ক কী ?

সুধী পাঠক! এটা সকলের জানাশোনা বিষয় যে, কবরে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করে তিনটি প্রশ্ন করা হবে। তন্মধ্যে প্রথমটি হলো, مَنْ رَبُّكَ؟ "তোমার রব কে ?" দ্বিতীয়টি হলো, مَا دِينُكَ؟ "তোমার দ্বীন কী ?" তৃতীয়টি হলো, مَنْ نَبِيُّكَ؟ "তোমার নবী কে ?"

যারা উত্তর দিতে সক্ষম হবে, তাদের চতুর্থ আরেকটি প্রশ্ন করা হবে। তা হলো, وَمَا يُدْرِيكَ؟ "কীভাবে তুমি এসব বিষয়ে জেনেছো ?"

এসব প্রশ্নের উত্তর হাদীছে বলে দেওয়া হয়েছে। চতুর্থ প্রশ্ন ও উত্তর অনেকেই জানে না। কিন্তু প্রথম তিনটি প্রশ্নের উত্তর দুনিয়ার প্রায় শতকরা ৯৯ জন বালেগ মুসলিম জানে বলা যায়। উত্তর অত্যন্ত সহজ, মাত্র একটি করে শব্দ। যথা : (১) মহান আল্লাহ (২) ইসলাম (৩) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এমনকি মুসলিম অধ্যুষিত ও সংখ্যালঘু কাফের দেশের কাফেররা এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর যুগে ও সর্বযুগের মুনাফেক্বরা এসব প্রশ্নের উত্তর জানত ও জানে। কিন্তু কাফের বাদে প্রায় সবার দুনিয়ায় জানা থাকা সত্ত্বেও কবরে কাফের ও মুনাফেক্বরা কেউ এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না। তার কারণ তারা দুনিয়াতে উত্তর

জানলেও মহান আল্লাহর পরিচয় ঠিকঠাক মতো জানত না। জেনে থাকলেও পরিচয় অনুযায়ী বিশ্বাস, সম্মান ও মর্যাদা দিত না।

সঠিক কথা এটাই যে, শুধু কাফের ও মুনাফেক্বরাই নয়; বরং মুসলিম নামধারীরাও যদি মহান আল্লাহর সঠিক পরিচয় দুনিয়াতে না জানে, তবে তারাও কাফের, মুশরিক্ব ও মুনাফেক্বদের মতো এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না; বরং দুনিয়াতে তারা মুসলিম পরিচয়ে বসবাস করলেও তারা এক ধরনের কাফের বলে গণ্য হবে। এটা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর ছহীহ হাদীছ ও ইমামগণের ফতওয়া অনুযায়ী প্রমাণিত। অতএব, মহান আল্লাহর পরিচয়ের ক্ষেত্রে উল্লেখিত ৪টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ থেকে জানলেই যথেষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ।

প্রথম প্রশ্ন : "মহান আল্লাহ কে ?"

এটা মহান আল্লাহর পরিচয় জানার ক্ষেত্রে একেবারে প্রাথমিক প্রশ্ন এবং সবচেয়ে মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ। সম্পূর্ণ কুরআনের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ আয়াত এই প্রশ্নের উত্তর সংশ্লিষ্ট। বলা যেতে পারে, অন্য প্রশ্নগুলো এরই ব্যাখ্যামূলক ও অন্তর্ভুক্ত। এরূপ প্রশ্ন মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার দরজা খুলে দেয়। মক্কার কাফেররাও এ প্রশ্ন করেছিল- انْسُبْ لَنَا رَبَّكَ؟ "হে মুহাম্মাদ! আপনি আমাদের নিকট আপনার রবের পরিচয় তুলে ধরুন"। তাদের এ প্রশ্নটিকে মহান আল্লাহ অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করে উত্তর হিসেবে সূরাহ আল-ইখলাছ নাযিল করেছেন। এই সূরাহটিকে মহান আল্লাহর পরিচিতির সূরাহও বলা হয়। সূরাহটি হচ্ছে-

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ - اللهُ الصَّمَدُ- لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ- وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ -

"বলুন, তিনি মহান আল্লাহ, একক অদ্বিতীয়। মহান আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও জন্ম দেওয়া হয়নি। তার সমকক্ষ কেউ নেই" (আল-ইখলাছ, ১১২/১-৪)।

এই পরিচয়ের প্রতি ঈমান-বিশ্বাস রাখতে হবে এবং যথাযথভাবে বুঝতে হবে আর মহান আল্লাহর এই পরিচয় অনুযায়ী তাঁকে সম্মান ও মর্যাদা দিতে হবে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয়, কাফের-মুশরিক্বরা তো দূরের কথা অধিকাংশ মুসলিম নামধারীরাও এই পরিচয় অনুযায়ী মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ ও মর্যাদা প্রদান করে না। অনেক মুসলিম মহান আল্লাহ এক বিশ্বাস করলেও সর্বক্ষেত্রে এক বিশ্বাস করে না। বিপদাপদ ও বিভিন্ন প্রয়োজনে

অন্য মা'বূদে বিশ্বাসী। পীর-ফক্বীর ও মাযার-কবরে ধর্না দেয় এবং প্রার্থনা করে থাকে। এভাবে সে এগুলোকে মহান আল্লাহর সমকক্ষ বানায়। ইয়াহূদীরা বলে, উযাইর আল্লাহর পুত্র। খ্রিষ্টানরা বলে, যিশুখ্রিষ্ট (ঈসা আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা) আল্লাহর পুত্র। হতভাগা অনেক মুসলিম পরিচয় দানকারীরা বলে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা মহান আল্লাহর যাতি নূর বা নূর থেকে তৈরি বলে বিশ্বাস ও দাবি করে। এ ধরনের আক্বীদা-বিশ্বাস পোষণকারীরা আল্লাহর পরিচয় নষ্টকারী। সূরাহ আল-ইখলাছের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণকারী হিসেবে কাফের ও মুরতাদ বলে গণ্য হবে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : "মহান আল্লাহ কোথায় ?"

মুসলিম সমাজে এই প্রশ্নের তিন রকম উত্তর শোনা যায়। যেমন :

(ক) কেউ বলে মহান আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান।

(খ) আবার কেউ বলে মহান আল্লাহ মুমিনদের ক্বলবের ভিতর।

(গ) কেউ বলে, মহান আল্লাহ আরশের উপরে রয়েছেন। শেষের বক্তব্যটির ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে সাতটি আয়াত রয়েছে (আল-আরাফ, ৭/৫৪; ইউনুস, ১০/৩; ত্বোহা, ২০/৫; আর-রা'দ, ১৩/২; আল-ফুরক্বান, ২৫/৫৯; আস-সাজদাহ, ৩২/৪; আল-হাদীদ, ৫৭/৪)।

প্রথম দুটি উত্তর ভারতবর্ষের অধিকাংশ মুসলিম বলে থাকে এবং বিশ্বাস করে। কিন্তু মক্কা মদীনাসহ অধিকাংশ আরব মুসলিমদের উত্তর ও আক্বীদা বিশ্বাস হলো, "মহান আল্লাহ উপরে, আসমানে বা আরশের উপরে"। মহান আল্লাহ তদীয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা, কুরআন, সুন্নাহ, ছাহাবী, তাবেঈ ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীন ইমামগণের দৃষ্টিতে সঠিক আক্বীদা-বিশ্বাস এটাই। মহান আল্লাহর উপরে বিদ্যমান থাকার ব্যাপারে এক হাজারের বেশি দলীল রয়েছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এক মহিলাকে দাসত্বের শিকলমুক্ত করার জন্য এবং তিনি মুমিনা কি-না এটা যাচাই করার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "মহান আল্লাহ কোথায় ?" মহিলাটি উত্তরে বলেছিলেন, মহান আল্লাহ আসমানে। আবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমি কে ? সেই মহিলাটি বলেছিলেন, আপনি আল্লাহর রাসূল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা তার মালিককে বলেছিলেন, "তুমি একে স্বাধীন করে দাও, নিশ্চয়ই মহিলাটি মুমিনা"।

আরশ ও কুরসী সংক্রান্ত আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাহ

আরশ পরিচিতি

আরশ মহান আল্লাহর সৃষ্টিসমূহের মধ্যে একটি মহান সৃষ্টি যা তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টির পূর্বেই সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ তা'আলা সেটাকে পানির উপর সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে প্রকান্ড, সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে প্রশস্ত ও সবচেয়ে ভারী সৃষ্টি এটি। মহান 'আরশ হচ্ছে লাল ইয়াকূতের। সেটি গম্বুজের মতো। তার রয়েছে পায়া, তার রয়েছে ছায়া, তাকে বহন করে আটজন বৃহৎ সৃষ্টির ফিরিশতা, ফিরিশতাগণ মহান 'আরশের চারপাশে তাওয়াফ করে, তারা তাদের রবের যিকির শব্দ ও মৌমাছির গুঞ্জনের মতো করে, মহান 'আরশ কারও কারও মৃত্যুতে তার জন্য কেঁপে উঠেছে, তার রয়েছে ক্যাঁ ক্যাঁ শব্দ। রেহেম বা আত্মীয়তার সম্পর্ক তার সাথে ঝুলে আছে, মহান আল্লাহ তা'আলা তার উপর লিখে রেখেছেন, আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রাধান্য পাবে। মহান 'আরশ আসমান ও যমীনসমূহের উপরে, 'আরশের নিচে জান্নাত। মহান আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমীন সৃষ্টির পরে মহান 'আরশের উপর উঠেছেন। মহান 'আরশ মহান আল্লাহ তা'আলার সবচেয়ে নিকটতম সৃষ্টি। মহান আল্লাহ তা'আলা যেদিন আসমান ও যমীনকে ভাঁজ করে রাখবেন, সে কিয়ামতের দিন তিনি মহান 'আরশকে ভাজঁ করবেন না, বরং মহান 'আরশকে জান্নাত ও জাহান্নামের মতো অবশিষ্ট রাখবেন, বিনষ্ট করবেন না। কুরসী মহান 'আরশের চেয়ে ক্ষুদ্র আকৃতির। কুরসী মহান আল্লাহ তা'লার দু' পা রাখার স্থান আর তা মহান 'আরশের জন্য সিঁড়ির মতো। এ হচ্ছে 'আরশের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। আমরা এখন এগুলো দলীল প্রমাণসহ আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। ওয়ামা তাওফীক্বি ইল্লাবিল্লাহি আলাইহি তাও ওয়াক কালতু ওয়া ইলাইহি উনিব।

'আরশ শব্দের অর্থ

মহান 'আরশ' শব্দের আভিধানিক অর্থ, সাধারণতঃ যা উঁচু ও উপরে থাকে তাকেই বুঝায়। পবিত্র কুরআনুল কারীমে সে অর্থে 'আরশ শব্দটির ব্যবহার এসেছে। (যেমন সূরাহ আল-আ'রাফ, আয়াত: ১৩৭; সূরাহ আন-নাহল, আয়াত: ৬৮; সূরাহ আল-আন'আম, আয়াত: ১৪১) তবে পরিভাষায় তা রাজা-বাদশাদের বসার খাটকে বুঝায়। যেমন-মহান আল্লাহ তা'আলা সাবার রাণী সম্পর্কে বলেছেন, **ওয়ালা হা আরশুন আজীম** অর্থাৎ "আর তার

রয়েছে বড় একটি 'আরশ বা বসার স্থান"। (সূরাহ আন-নামল, আয়াত: ২৩) তাছাড়া মহান 'আরশ শব্দের অন্য অর্থও হতে পারে। তবে যখন কোনো রাজাধিরাজের সাথে সম্পৃক্ত হয় তখন তা কেবল রাজা-বাদশাদের খাটকেই বুঝায়। ইবনুল কাইয়্যেম, মুখতাসারুস সাওয়া'য়িকুল মুরসালাহ (১/১৭,১৮)।

শরী'আতের পরিভাষায়:

মহান আল্লাহর মহান'আরশ হচ্ছে পায়া বিশিষ্ট একটি খাট যা ফিরিশতাগণ বহন করে; আর তা জগত-সৃষ্টির উপর গম্বুজের মতো, সকল সৃষ্টিকুলের ছাদ, সবার উপরে ও সবচেয়ে বড়।

ইমাম ত্বাবারী রাহিমাহুল্লাহ - وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ (ওয়া-তারাল মালা-য়িকাতা হা-ফ্ফিনা মিন হাউলিল আরশী (সূরাহ-জুমার আয়াত-৭৫) এর ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে মহান 'আরশ অর্থ খাট। তারপর তিনি সেটা তার সনদ দিয়ে সুদ্দী থেকে বর্ণনা করে বলেন, মহান 'আরশের চার পার্শ্বে তারা ঘিরে আছে, আর মহান 'আরশ হচ্ছে খাট।" (ত্বাবারী, ২৪/৩৭-৩৮)।

ইমাম ত্বাবারী রাহিমাহুল্লাহ অন্য আয়াত 'জুল আরশী' (সূরাহ মুমিন/গাফির, আয়াত ১৫) এর ব্যাখ্যায় বলেন, খাটওয়ালা, যা তিনি ব্যতীত সকল কিছুকে পরিবেষ্টনকারী। (ত্বাবারী (২৪/৪৯)।

বাইহাক্বী বলেন, তাফসীরকারদের মত হচ্ছে. মহান 'আরশ বলতে বুঝানো হয়েছে 'খাট'কে, আর তা একটি দেহ বিশিষ্ট বস্তু, যা মহান আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। ফিরিশতাদেরকে তা বহন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তাদেরকে সেটার সম্মান ও সেটার চার পাশে তাওয়াফ করে ইবাদাত করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন তিনি যমীনের বুকে একটি ঘর বানিয়েছেন, বনী আদমকে তার চারপাশে তাওয়াফ করার নির্দেশ দিয়েছেন, সালাতে সেটার দিকে মুখ করতে আদেশ করেছেন। তাফসীরকারগণ যে মতের দিকে গিয়েছেন সেটার স্বপক্ষে পবিত্র কুরআন, সহীহ হাদীস, আছার এর প্রমাণসমূহ রয়েছে। (বাইহাক্বী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত: ৪৯৭।)

তিনি আরও বলেন, 'আল-আরশ' তা বিবেকবানদের বিখ্যাত মত অনুযায়ী খাটকে বলা হয়।

ইমাম ইবন কাসীর রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আরশ হচ্ছে এমন খাট যার পায়া রয়েছে, ফিরিশতারা তা বহন করে, আর তা জগতের উপর গম্বুজের মতো, সকল সৃষ্টিকুলের ছাদ। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১/১২)

ইমাম যাহাবী বলেন, 'তোমার কী ধারনা সে ' আরশের ব্যাপারে, যা সর্বোচ্চ মহান সত্তা নিজের জন্য গ্রহণ করেছেন, তার উচ্চতা, প্রশস্ততা, পায়া, গঠনশৈলী, বহনকারী, কুরূবীগণ, যারা সেটাকে চারপাশে ঘিরে আছে, তার সৌন্দর্য ও তার মূল্য সম্পর্কে? যেখানে বলা হচ্ছে যে, লাল রুবী পাথরের তৈরি।' আল-উলু, ৫৭।

বস্তুত ত্বাবারী, বাইহাকী, ইবনু কাসীর, যাহাবী তারা যে মতটি বলেছেন, এটিই সকল সালাফে সালেহীনের মত।

'আরশের দলীল-প্রমাণঃ

'আরশের দলীল-প্রমাণ অনেক। তবে আমরা কয়েকটি বর্ণনা করব,

মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী, - ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ "আরশের অধিকারী ও সম্মানিত।" (সূরাহ আল-বুরূজ, আয়াত: ১৫)

আল্লাহ তা'আলার বাণী, - الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ "দয়াময় (আল্লাহ্) 'আরশের উপর উঠেছেন।" (সূরাহ ত্বা-হা, আয়াত: ০৫)

আল্লাহর বাণী, - رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ "তিনি সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী, 'আরশের অধিপতি।" (সূরাহ গাফির, আয়াত: ১৫)

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেন, "যখন তোমরা আল্লাহর কাছে চাইবে তখন তাঁর কাছে ফিরদাউস চাইবে; কারণ তা জান্নাতের মধ্যমনি, সর্বোচ্চ জান্নাত আর তার উপরে রয়েছে রহমানের 'আরশ।" সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৭৯০। অপর হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "সেদিন মানুষ বেহুঁশ হয়ে যাবে, তখন আমিই প্রথম হুঁশে আসব, তখন আমি দেখব যে, মূসা আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা 'আরশের পায়াসমূহের কোনো একটি অংশ ধরে আছেন, আমি জানি না তিনি কি বেহুঁশ হয়েছিলেন, নাকি আমার আগে হুঁশে ফিরেছেন, নাকি যাদেরকে আল্লাহ বেহুঁশ হওয়া থেকে ব্যতিক্রম করেছেন তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত।" সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৪১১। কুরআন ও হাদীসে এ জাতীয় ভাষ্য অনেক।

‘আরশের কিছু বৈশিষ্ট্যঃ

মহান আল্লাহর ‘আরশের যেসব বৈশিষ্ট্য কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত তা হচ্ছে,

‘আরশ হচ্ছে খাট: ইবন ক্বুতাইবাহ বলেন, বাতিলপন্থীরা ‘আরশ বলতে খাট ব্যতীত অন্য কিছু বুঝাতে চায়, অথচ আলেমগণ ভাষাতে ‘আরশ বলে খাটকেই বুঝেন। ইবন ক্বুতাইবাহ, আল-ইখতিলাফু ফিল লাফযি পৃ. ২৪০।

অনুরূপ ইবন কাসীর বলেন, অভিধানে ‘আরশ বলতে খাটকেই বুঝানো হয়। এটা গোলক নয়, আরবরা তা বুঝে না। আর কুরআন কেবল আরবদের ভাষাতেই নাযিল হয়েছে। তাদের নিকট ‘আরশ হচ্ছে পায়া বিশিষ্ট চৌকি বা খাট। আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (১/১১-১২)

‘আরশ পায়া বিশিষ্টঃ ইবন আবিল ইয্য বলেন, শরী‘আতে ‘আরশকে পা বিশিষ্ট বলা হয়েছে যা ফিরিশতাগণ বহন করেন। যেমন, হাদীস এসেছে, “মানুষেরা বেহুঁশ হয়ে যাবে, তারপর প্রথম আমি হুঁশে আসব, তখন আমি দেখব যে, মুসা আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা ‘আরশের পায়াসমূহের একটি আঁকড়ে ধরে আছেন। আমি জানি না তিনি কি আমার আগে হুঁশে এসেছেন, নাকি তূর পাহাড়ের সে বেহুঁশ হওয়ার প্রতিদানস্বরূপ তাকে আর বেহুঁশ হতে হয়নি?” সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৩৯৮। এ হাদীস দ্বারা তাদের মতের খন্ডন হয়ে যায়, যারা ‘আরশ বলতে মুলক বা রাজত্ব বুঝেছেন; রাজত্বের আবার পায়া হয় কী করে? রাজত্বের পায়া ধরা হবে কী করে? দেখুন: শারহুত ত্বাহাওয়িয়্যাহ, পৃ. ৩১০-৩১১।

‘আরশ সৃষ্ট জিনিসঃ আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ -

“তিনিই তো মহান আল্লাহ্, তোমাদের রব; তিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ্ নেই। তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা; কাজেই তোমরা তাঁর ‘ইবাদাত কর।” আর তিনি হলেন সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক (সূরাহ আল-আন‘আম, আয়াত: ১০২)

অনুরূপ মহান আল্লাহর বাণী, - وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

"আর তিনি মহান 'আরশের রব'। (সূরাহ আত-তাওবাহ, আয়াত: ১২৯) হাফেয ইবন হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এ আয়াত ইঙ্গিত করছে যে, 'আরশ লালন-পালনকৃত জিনিস। আর যা পালনকৃত জিনিস হবে তা অবশ্যই সৃষ্ট হবে। ইবন হাজার, ফাতহুল বারী (১৩/৪০৫) তাছাড়া হাদীসে 'আরশ সৃষ্টির কথা স্পষ্টভাবে এসেছে, যেখানে বলা হয়েছে, "আর তিনি পানির উপর তাঁর 'আরশ সৃষ্টি করলেন।"সুনানে তিরমিয়ী, হাদীস নং ৩১০৯

আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাদেরকে 'আরশ বহন করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাদেরকে এর সম্মান করা ইবাদাত হিসেবে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ -

"যারা 'আরশ বহন করে আর যারা 'আরশের চার পাশে রয়েছে তারা তাদের রবের সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ করে।" (সূরাহ গাফির, আয়াত: ০৭)

তিনি আরও বলেন,

وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ -

"আর সেদিন আপনার রবের 'আরশ বহন করবে আটজন।" (সূরাহ আল-হাক্কাহ, আয়াত: ১৭)

ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, আটজন ফিরিশতা রয়েছেন যারা বন্য ছাগলের সূরতে রয়েছেন। তিনি আরও বলেন, তাদের পায়ের খুর থেকে হাঁটু পর্যন্ত সত্তর বছরের রাস্তার দূরত্ব। সহীহ, দারেমী, আর-রাদ্দু আলাল বিশর আল-মারিসী, ৪৪৯; ইবন খুযাইমাহ, আত-তাওহীদ ১০৯; ইবন আবী শাইবাহ, আল-'আরশ ৩৭৭; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক (২/৩৭৮) এবং সহীহ বলেছেন, আর যাহাবী একমত হয়েছেন।

অনুরূপ জাবের ইবন আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেছেন, "আমাকে 'আরশ বহনকারী আল্লাহর ফিরিশতাদের মধ্যে একজন ফিরিশতার বর্ণনা দিতে অনুমতি দেয়া হয়েছে, তার কানের লতি থেকে কাঁধের দূরত্ব সাতশ' বছরের রাস্তা।" ইবন কাসীর, আত-তাফসীর (৪/৪১৪); ইবন হাজার, ফাতহুল বারী (৮/৬৬৫)।

অপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেছেন, "যে কেউ সকাল বেলা বলবে, **আল্লাহুম্মা ইন্না আসবাহনা নুশ হিদুকা ওয়া নুশহিদু হামালাতা আরশিকা অমালায়িকাতাকা ওয়া জামিই খালক্বিকা আন্নাকা আন্তাললাহু লা-ইলাহা ইল্লা আনতা অহদাকা লা-শারীকা ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুকা ওয়া রাসূলুকা** অর্থাৎ 'হে আল্লাহ আমরা সকালে উপনীত হয়েছি, আপনাকে সাক্ষী রাখছি, আপনার 'আরশ বহনকারীদেরকে সাক্ষী রাখছি, সকল ফিরিশতাদেরকে সাক্ষী রাখছি এবং আপনার সকল সৃষ্টিকে সাক্ষী বানাচ্ছি যে, নিশ্চয় আপনিই হচ্ছেন আল্লাহ, কেবল আপনি ব্যতীত আর কোনো সত্য ইলাহ নেই, আপনার কোনো শরীক নেই, আর মুহাম্মাদ আপনার দাস ও আপনার রাসূল' আল্লাহ তার চারভাগের একভাগ সে দিনের জন্য (জাহান্নাম থেকে) মুক্ত করে দিবেন। আর যে কেউ দু'বার বলবে, আল্লাহ তার অর্ধেক অংশকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবেন, আর যে কেউ চার বার বলবে, আল্লাহ তাকে সে দিনের জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবেন।" হাসান, বুখারী , আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং ১৭৬: নাওয়াওয়ী, আল-আযকার, হাদীস নং ৭৪ ।ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, 'আরশ বহনকারীদের কারও কারও পায়ের গোড়ালী থেকে দু' পায়ের নিচ পর্যন্ত পাঁচশ' বছরের দূরত্ব। বাইহাক্বী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত ৫০৫; ইবন আবী শাইবাহ, আল-'আরশ, ৩৭১।

ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহু **আল্লাজীনা ইয়াহ মিলুনাল আরশা ওয়ামান হাউলাহু এবং অইয়াহমিলু আরশা রববিকা ফাউক্বাহুম ইয়াউমায়িজীন সামানিইয়াতুন** এ আয়াতদ্বয়ের তাফসীরে বলেন, এ আয়াত প্রমাণ করছে যে, আল্লাহর এমন কিছু ফিরিশতা রয়েছেন যারা তার 'আরশ বহন করে, আরও কিছু রয়েছেন যারা 'আরশের চারপাশে ঘিরে থাকে। আরও প্রমাণ করছে যে, **কিয়ামতের দিন 'আরশ বহন করবে আটজন। নাক্বদু তা'সীসিল জাহমিয়া (১/৫৭৫)। এ বক্তব্য তাদের বিপরীত, যারা বলে, 'আরশ বলে রাজত্ব বুঝানো হয়েছে; কারণ রাজত্ব আটজনের বহনের বিষয় নয়। আরও একটি বিষয় এখানে জানানো দরকার তা হচ্ছে, ইবন কাসীর ও ইবনুল জাওযী প্রাধান্য দিয়েছেন যে বর্তমানে 'আরশ বহনকারী ফিরিশতা চার জন আর কিয়ামতের দিন তা হবে আটজন।**

'আরশ হচ্ছে সর্বোচ্চ সৃষ্টি, সর্ববৃহৎ সৃষ্টি, সকল সৃষ্টির ছাদ, তা জগতের উপর গম্বুজের মতো, তার নিচের অংশ তার তুলনায় বিস্তীর্ণ ভূমিতে

একটি কড়ার মতো। ইমাম ইবন আবী যামানীন বলেন, "আহলুস সুন্নাহ'র মত হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা 'আরশ সৃষ্টি করেছেন, সেটাকে সকল সৃষ্টির সর্বোচ্চে ও উপরে রাখার মাধ্যমে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন।" ইবন আবী যামানীন, উসুলুস পৃ. ২৮২।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আর 'আরশ তা তো গম্বুজের মতো; কারণ সুনান গ্রন্থে আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহ জুবাইর ইবন মুত'ঈম রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, **ইন্নাল্লাহা ফাউক্বা আরশিহী ওয়া আরশুহু ফাউক্বা সামাঅতিহী** "নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর 'আরশের উপর, আর তাঁর 'আরশ সকল আসমানের উপর" সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৭২৬।তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা তাঁর আঙ্গুলকে গম্বুজের মতো করে দেখালেন। আর 'আরশ সবকিছুর উপর সেটার প্রমাণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা এর বাণী, "যখন তোমরা কোনো কিছু চাইবে তখন তাঁর কাছে ফিরদাউস চাইবে, কারণ তা মধ্য বা সর্বোত্তম জান্নাত, সর্বোচ্চ জান্নাত। তার উপরে রহমানের 'আরশ, আর তা থেকেই জান্নাতের নালাসমূহ প্রবাহিত।" সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৭৯০। সুতরাং এসব দ্বারা বুঝা গেল যে, আরশ সর্বোচ্চ সৃষ্টি, সৃষ্টির ছাদ, আর তা কুব্বা বা গম্বুজের মতো। মাজমূ'উল ফাতাওয়া (৫/১৫১)। অনুরূপ আবু যর রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর বিখ্যাত হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন, **আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনার কাছে যা নাযিল হয়েছে তন্মধ্যে কোন আয়াত সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন, "আয়াতুল কুরসী", তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বললেন, "হে আবু যর, সাত আসমান কুরসীর তুলনায় বিস্তীর্ণ ভূমিতে ফেলে রাখা একটি রিং এর মতো, আর কুরসী থেকে 'আরশের বাড়তি হচ্ছে সে কোনো বিস্তীর্ণ ভূমিতে পড়ে থাকা রিং এর মতো।"** সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস নং ৩৬১।

আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমীন সৃষ্টির আগেই 'আরশ সৃষ্টি করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলাই ছিলেন, তাঁর সাথে তিনি ব্যতীত আর কিছু ছিল না, আর তাঁর 'আরশ ছিল পানির উপর, তিনি সবকিছু যিকির তথা লাওহে মাহফূযে লিখলেন, আর আসমান ও যমীন সৃষ্টি করলেন।" সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩১৯১। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 'আরশ প্রথম সৃষ্টি। ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমু'উল ফাতাওয়া (১৮/২১৩); ইবন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ

(১/৯)। আর এটিই অধিকাংশের মত বলে ইবন কাসীর ও ইবন হাজার রাহিমাহুল্লাহ আবুল আ'লা আল-হামাদানী থেকে বর্ণনা করেছেন।এর বিপরীতে কেউ কেউ বলেছেন, প্রথম সৃষ্টি কলম। তাদের দলীল হচ্ছে, **ইন্না আউঅলা মা খালাক্বাল্লাহুল কালামা-ফাক্বলা-উখতুব** "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা প্রথম কলমকে সৃষ্টি করেন তখন বলেন, লিখ।" সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২১৫৫। বস্তুত এখানে অনেকেই হাদীসে আসা **'কালাম' শব্দটিকে 'নাসব' হিসেবে পড়েছেন, তখন অর্থ হবে, কলম লিখার ক্ষেত্রে প্রথম, সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রথম নয়।**

আসমান ও যমীন সৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায়: আসমান ও যমীন সৃষ্টির পর্যায়সমূহ সম্পর্কে ধারণা 'আরশ সৃষ্টি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ - وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ - ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ -

"বলুন, 'তোমরা কি তাঁর সাথেই কুফরী করবে যিনি যমীন সৃষ্টি করেছেন দু'দিনে এবং তোমরা কি তাঁর সমকক্ষ তৈরী করছ ? তিনি সৃষ্টিকুলের রব! আর তিনি স্থাপন করেছেন অটল পর্বতমালা ভূপৃষ্ঠে এবং তাতে দিয়েছেন বরকত এবং চার দিনের মধ্যে এতে খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন সমভাবে যাঞ্চাকারীদের জন্য। তারপর তিনি আসমানের প্রতি ইচ্ছে করলেন, যা (পূর্বে) ছিল ধোঁয়া। অতঃপর তিনি ওটাকে (আসমান) ও যমীনকে বললেন, 'তোমরা উভয়ে আস ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়।' তারা বলল, 'আমরা আসলাম অনুগত হয়ে।' অতঃপর তিনি সেগুলোকে সাত আসমানে পরিণত করলেন দু'দিনে এবং প্রত্যেক আসমানে তার নির্দেশ ওহী করে পাঠালেন এবং আমরা নিকটবর্তী আসমানকে সুশোভিত করলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং করলাম সুরক্ষিত। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের ব্যবস্থাপনা।" (সূরাহ ফুসসিলাত, আয়াত: ৯-১২) আয়াত অনুযায়ী আসমান ও যমীন সৃষ্টির স্তরবিন্যাস নিম্নোক্তভাবে হবে:

প্রথম স্তর: যমীন সৃষ্টি, আর তা দু'দিনে: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ -

“বলুন, ‘তোমরা কি তাঁর সাথেই কুফুরী করবে যিনি যমীন সৃষ্টি করেছেন দু‘দিনে?” (সূরাহ ফুসসিলাত, আয়াত: ০৯)

দ্বিতীয় স্তর: যমীনকে বিস্তৃত করেছেন, আল্লাহ তা’আলা বলেন,

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا - أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا - وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا -

“আর যমীনকে এর পর বিস্তৃত করেছেন। তিনি তা থেকে বের করেছেন তার পানি ও তৃণভূমি, আর পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন।” (সূরাহ আন-নাযি‘আত, আয়াত: ৩০-৩২)

যমীন বিস্তৃত করার অর্থই হচ্ছে, তা থেকে ঝর্ণা বের করা, নদী-নালা বের করা, ক্ষেত-খামার ও ফসলের উপযোগী করা, আর এটাই খোরাকীর ব্যবস্থা করা, তারপর তার উপর পাহাড় পর্বত পেরেগের মতো গেঁথে দেয়া; যাতে তা টল-টলায়মান না হয়ে যায়। অন্য আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ -

“এবং আমরা পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছি সুদৃঢ় পর্বত, যাতে যমীন তাদেরকে নিয়ে এদিক-ওদিক ঢলে না যায় এবং আমরা সেখানে করে দিয়েছি প্রশস্ত পথ, যাতে তারা গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে পারে।” (সূরাহ আল-আম্বিয়া, আয়াত : ৩১) ইবন ‘আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেন, আর যমীন অস্থির হলো, তখন পাহাড় দিয়ে সেটাকে সুস্থির করলেন। সহীহ সনদে, ইবন জারীর, তাফসীর বাইহাক্বী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত: ১২৭; হাকিম বলেন, বর্ণনাটি সহীহ, যাহাবী তার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন।

সেটা অনুযায়ী আল্লাহ তা‘আলা যমীন সৃষ্টি ও তা বসবাস উপযোগী করেছেন চারদিনে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ -

“আর তিনি স্থাপন করেছেন অটল পর্বতমালা ভূপৃষ্ঠে এবং তাতে দিয়েছেন বরকত এবং চার দিনের মধ্যে এতে খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন।” (সূরাহ ফুসসিলাত, আয়াত: ১০)

তৃতীয় স্তরঃ আর তা হচ্ছে সাত আসমান সৃষ্টি, যা তিনি ধোঁয়া থেকে সৃষ্টি করেছেন। সে ধোঁয়া হচ্ছে পানির বাষ্প। এ হচ্ছে মোট ছয় দিন। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا -

"অতঃপর তিনি সেগুলোকে সাত আসমানে পরিণত করলেন দু' দিনে এবং প্রত্যেক আসমানে তার নির্দেশ ওহী করে পাঠালেন।" (সূরাহ ফুসসিলাত, আয়াত: ১২)

ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, তারপর তিনি পানির বাষ্পকে উপরে উঠালেন, আর এতে করে আসমানসমূহ আলাদা হলো।

তারপর তিনি সকল আসমানে তাঁর ফয়সালা জারী করলেন, তারকাসমূহকে নিকটতম আসমানে রাখলেন তার সৌন্দর্য্যের জন্য, তাকে হিফাযতের জন্য।

আসমান ও যমীন সৃষ্টির পরে আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের উপর উঠেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ -

"তোমাদের রব তো মহান আল্লাহ, যিনি আসমানসমূহ ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি 'আর্শের উপর উঠলেন। তিনি সব বিষয় পরিচালনা করেন। তাঁর অনুমতি লাভ না করে সুপারিশ করার কেউ নেই। তিনিই মহান আল্লাহ, তোমাদের রব; কাজেই তোমরা তাঁরই ইবাদাত কর। তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?" (সূরাহ ইউনুস, আয়াত: ০৩)

তিনি আরও বলেন,

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ -

"আল্লাহ যিনি আসমানসমূহ উপরে স্থাপন করেছেন খুঁটি ছাড়া, তোমরা তা দেখছ। তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন এবং সূর্য ও চাঁদকে নিয়মাধীন করেছেন; প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলবে। তিনি সব বিষয়

পরিচালনা করেন, আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা তোমাদের রবের সঙ্গে সাক্ষাত সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পার।" (সূরাহ আর-রা'দ, আয়াত: ০২)

ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, তিনি সবকিছু সৃষ্টির আগেও 'আরশের উপর ছিলেন। তাবারী, আত-তাফসীর (২৯/১৭); ইবন আবী শাইবাহ, আল-আরশ ৩০৭, এর দ্বারা বুঝা গেল, আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমীন সৃষ্টির আগেও তাঁর 'আরশের উপর ছিলেন, যখন তাঁর 'আরশ পানির উপর ছিল। যখন তিনি আসমান ও জমীন সৃষ্টি করেন তখন ও তিনি সৃষ্টির উপর ছিলেন। তারপর আসমান ও যমীন সৃষ্টির পরে আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের উপর আরোহন করেন।

আল্লাহ তা'আলার আরশ আল্লাহ তা'আলার সবচেয়ে বড় সৃষ্টি: 'আরশ অনেক বড়, অনেক সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ সৃষ্টি। আল্লাহ তা'আলা সেটার সম্মান বৃদ্ধি করেছেন সেটার উপর উঠার সাথে নিজেকে বিশেষিত করে। আর এ উপরে উঠার ধরন আমরা জানি না। যেভাবে সেটা তাঁর মর্যাদা ও সম্মানের সাথে উপযোগী সেভাবেই তিনি তার উপর উঠেছেন। কুরআনে কারীমের একুশটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের কথা উল্লেখ করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি তাঁর 'আরশের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, - اللَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

"আল্লাহ, তিনি ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই, তিনি মহা 'আরশের রব।" (সূরাহ আন-নামল, আয়াত: ২৬)

তিনি আরও বলেন,

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ - لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ -

"সুতরাং আল্লাহ মহিমান্বিত, প্রকৃত মালিক, তিনি ছাড়া কোনো হক্ক ইলাহ নেই; তিনি সম্মানিত 'আরশের রব।" (সূরাহ আল-মুমিনূন, আয়াত: ১১৬)

তিনি আরও বলেন,

ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ - فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ -

"আরশের অধিকারী ও সম্মানিত। তিনি যা ইচ্ছে তা-ই করেন।" (সূরাহ আল-বুরূজ: ১৫-১৬)

এসব আয়াতে যদি **"আল-আযীমে, আল-কারীমে, আল-মাজীদে"** পড়া হয়, তবে সেটা 'আরশের গুণবাচক। আর যদি **'আল-আজীমু, আল-কারীমু, আল-মাজীদু'** পড়া হয়, তবে সেটা আল্লাহর গুণবাচক। অনুরূপ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বিপদের সময় যে দো'আ পড়তেন, তা হচ্ছে, **লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুল আজীমুল হালিম, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু রব্বুল আরশিল আজীম, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু রব্বুস সামাঅতি ওয়া রববুল আরজী ওয়া রববুল আরশিল কারীম** অর্থাৎ "আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই, তিনি অতীব মহান ও অত্যন্ত সহিষ্ণু; আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই, তিনি আসমানসমূহের রব, যমীনের রব ও সম্মানিত 'আরশের রব।" সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৩৪৬; সহীহ মুসলিম,হাদীস নং ২৭৩০।

আল্লাহ তা'আলার 'আরশ সবচেয়ে প্রশস্ত সৃষ্টি, তা আসমান ও যমীন থেকে বহু বহু গুণ প্রশস্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা 'আরশ ও কুরসী সম্পর্কে বলেন, **"সাত আসমান তো কুরসীর মাঝে কেবল বিস্তীর্ণ ভূমিতে পড়ে থাকা একটি রিং এর মতো, আর কুরসীর তুলনায় 'আরশের বাড়তি হচ্ছে সে রিং এর তুলনায় বিস্তীর্ণ ভূমির ন্যায়।"** হাসান হাদীস, ইবন আবী শাইবাহ, হদীস নং ৫৮; ইবন হিব্বান, আস-সহীহ, হাদীস নং ৩৬১; আর শাইখ আলবানী সেটাকে সহীহ বলেছেন, আস-সিলসিলাহ আস-সহীহাহ, নং ১০৯।

আল্লাহ তা'আলা 'আরশকে তাঁর নাম রহমানের সাথে সম্পৃক্ত করে বর্ণনা করেছেন: আল্লাহ বলেন, - الرَّحْمَـٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ

"দয়াময় (আল্লাহ) 'আরশের উপর উঠেছেন।" (সূরাহ ত্বা-হা, আয়াত: ০৫)

তিনি আরও বলেন,

الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَـٰنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا -

"তিনি আসমানসমূহ, যমীন ও এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেন; তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠলেন। তিনিই 'রহমান', সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে যে অবহিত তাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।" (সূরাহ আল-ফুরক্বান, আয়াত: ৫৯)

ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম রহিমাহুল্লাহ বলেন, রহমান নামটিকে ‘আরশের সাথে সম্পৃক্ত করার হিকমত হচ্ছে, মহান আল্লাহ আমাদেরকে জানাচ্ছেন যে, তিনি সবচেয়ে প্রশস্ত সৃষ্টির উপর উঠেছেন, সবচেয়ে বড় গুণ নিয়ে। কারণ, ‘আরশ সকল সৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করে আছে, সবকিছুর জন্য তা প্রশস্ত। আর সৃষ্টির জন্য রহমতও তাদের সবার জন্য প্রশস্ত। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ ۚ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ ۖ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ -

“আর আমার রহমত সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে।” (সূরাহ আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৫৬) মাদারিজুস সালেকীন (১/৩৩)।

মহান আল্লাহ ‘আরশের উপর লিখেছেন, তাঁর রহমত তাঁর ক্রোধের ওপর প্রাধান্য পাবে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেন, “যখন আল্লাহ সৃষ্টিকর্ম সম্পন্ন করলেন, তখন তাঁর কাছে তাঁর ‘আরশের উপর লিখে নিয়েছেন, **ইন্না রহমাতি সাবাক্বাত গাজাবী** অর্থাৎ ‘আমার রহমত আমার ক্রোধের ওপর প্রাধান্য পাবে।” সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৮৭২।

‘রেহেম ‘আরশের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে নিয়েছে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেন, “রেহেম ‘আরশের সাথে লটকে আছে, সে বলে, যে আমার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করবে আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করবেন, আর যে আমার সাথে সম্পর্কচ্যুতি ঘটাবে আল্লাহ তার সাথে সম্পর্কচ্যুতি ঘটাবেন।” সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৫৫।

‘আরশ সবচেয়ে ভারী জিনিস শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ,আর - রিসালাতুল ‘আরশিয়্যাহ, পৃ. ০৮। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা তাঁর স্ত্রী জুওয়াইরিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার কাছ থেকে ফজরের সালাতের পর বের হলেন, তখন তিনি তাঁর সালাতের স্থানে বসা ছিলেন, তারপর চাশতের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা এসে দেখেন এখনও জুয়াইরিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা সে বসায় আছেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা তাকে বললেন, তুমি কি এখনো সে বসায় রয়েছ, যাতে আমি তোমাকে ছেড়ে গিয়েছিলাম? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বললেন, "আমি তোমার কাছ থেকে যাওয়ার পরে তিনটি বাক্য বলেছি, যা ওজন করলে তুমি দিনের এতক্ষণ সময় ধরে যা বলেছ তা থেকে বেশি ভারী হবে, **সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি আদাদা খালক্বিহী, ওয়া রিজা নাফসিহী, ওয়া যিনাতা আরশিহী ওয়া মিদাদা কালিমাতিহী।**" সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭২৬।

'আরশ লাল রূবী পাথর (ইয়াকূত): ইমাম যাহাবী বলেন,

"তোমার কী ধারণা সে 'আরশের ব্যাপারে, যা সর্বোচ্চ মহান সত্তা নিজের জন্য গ্রহণ করেছেন, তার উচ্চতা, প্রশস্ততা, পায়া, গঠনশৈলী, বহনকারী, কুরূবীগণ, যারা সেটাকে চারপাশে ঘিরে আছে, তার সৌন্দর্য ও তার মূল্য সম্পর্কে? যেখানে বলা হচ্ছে যে, লাল রুবী পাথরের তৈরি।" আল-'উলূ, ৫৭।

ইমাম ইবন কাসীর রহিমাহুল্লাহ বলেন,

"কোনো কোনো সালাফ বলেন, 'আরশের দু'দিকের দূরত্ব পঞ্চাশ হাজার বছরের দূরত্বের মতো, আর সেটা লাল রূবী পাথরের তৈরি।"(৫৬) ইবন আবী শাইবাহ, আল-আরশ; ইবন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া (১/১৯); আত-তাফসীর (৪/৪২৯)।

'আরশ সকল সৃষ্টির উপর গম্বুজের মতো: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেছেন,

"নিশ্চয় তার 'আরশ তাঁর আসমানসমূহের উপর এরকম, তারপর তা তিনি তার আঙ্গুলগুলো দিয়ে দেখালেন যে, তা এগুলোর উপর গম্বুজের মতো।" (৫৭) সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৭২৬।

অপর বর্ণনায় এসেছে, "নিশ্চয় আল্লাহর 'আরশ তাঁর আসমান ও যমীনের উপর এরকম, গম্বুজের মতো।" (৫৮) ইবন আবী আসেম, আস-সুন্নাহ (১/২৫২) নং ৫৭৫।

ইমাম ইবন কাসীর রাহিমাহুল্লাহ 'আরশের বর্ণনায় বলেন, 'তা এমন এক খাট, যাতে পায়া রয়েছে, যা ফিরিশতারা বহন করে, আর তা জগতের উপর গম্বুজের মতো, যা সকল সৃষ্টির উপর ছাদ। ইবন কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১/১৯)।

‘আরশের রয়েছে ছায়াঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেছেন,

“যারা আল্লাহর জন্য পরস্পরকে ভালোবাসবে, তারা নূরের মিম্বরের উপর আল্লাহর ‘আরশের ছায়ায় অবস্থান করবে, যে দিন তার ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না।” আহমাদ (৩৬/৩৮৪); ইবন হিব্বান ২৫১০; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক (৪/১৬৯); ইবনুল মুবারক, আয-যুহদ ৭১৫; আর তিনি সেটাকে সহীহ বলেছেন।

অপর বর্ণনায় এসেছে, “আমার সম্মান ও আনুগত্যের কারণে যারা পরস্পরকে ভালোবেসেছে, (দুনিয়ার কারণে নয়) তারা কোথায়? আজ আমি তাদেরকে আমার ‘আরশের ছায়ায় ছায়া দান করব, যেদিন আমার ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না।”সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৬৬।

অপর হাদীসে এসেছে, “সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর ‘আরশের ছায়ায় রাখবেন, যেদিন তার ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না।” সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৬০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০৩১।

অপর হদীসে এসেছে, “যে কেউ কোনো অভাবীকে ঋণ আদায়ে সময় দিবে অথবা তার থেকে তা বাদ দিয়ে দিবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা‘আলা তাকে তাঁর ‘আরশের নিচে ছায়ায় রাখবেন, যেদিন তার ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না।” তিরমিযী, হাদীস নং ১৩০৬। হাশরের দিনে মহান আল্লাহর আরশের নিচে ছায়া পাওয়ার জন্য নিম্নের দু‘আটি আমাদের সকলের সালাতের সিজদায়, সালাতের শেষ বৈঠকে সালামের পূর্বে ও অন্যান্য সময়ে পাঠ করা উচিত। **আল্লাহুম্মা আজিল্লীনী তাহতা, আরশিকা, ইয়াওমা লা জিল্লা ইল্লা জিল্লু আরশিকা।**

‘আরশ কারও সাক্ষাতের জন্য খুশী হয়ে কেঁপে উঠেছিল: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেন, “সা‘দ ইবন মু‘আযের মৃত্যুতে রহমানের ‘আরশ কেঁপে উঠেছিল।” (৬৪) সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৮০৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪৬৬; হাদীসের শব্দ বিন্যাস মুসলিমের।

অপর বর্ণনায়, “আরশ কেঁপে উঠেছিল আল্লাহ কর্তৃক সা‘দের ভালোবাসার কারণে।” (৬৫) হাকিম, আল-মুস্তাদরাক (৩/২০৬); যাহাবী, আল-উলু: ৭১ আর তিনি এর সনদকে উত্তম বলেছেন।

অপর বর্ণনায়, "যখন সা'দ ইবন মু'আয রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর মৃত্যু হলো, তখন তার মা চিৎকার করে কাদঁতে লাগলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা তাকে বললেন, "তোমার অশ্রু কি সম্বরণ করবে না, তোমার পেরেশানী কি চলে যাবে না, তোমার সন্তান হচ্ছে প্রথম ব্যক্তি যার জন্য আল্লাহ হাঁসলেন, আর তার 'আরশ খুশিতে কেঁপে উঠেছে।" ইবন খুযাইমা, আত-তাওহীদ, হাদীস নং ২৩৭; আহমাদ, আল-মুসনাদ ২৭৫৮১।

'আরশের রয়েছে ভারজনিত শব্দঃ

কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আসমানসমূহ উপর থেকে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়, আর ফিরিশতাগণ তাদের রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং যমীনে যারা আছে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।" (সূরাহ আশ-শূরা, আয়াত: ০৫) ইমাম ত্বাবারী, ইবন কাসীর ও ক্বুরতুবী ইবন 'আব্বাস, দাহহাক, ক্বাতাদাহ, সুদ্দী ও কা'ব আল-আহবার থেকে বর্ণনা করেন, এ চূর্ণ হওয়ার উপক্রম ও ফেটে যেতে চাওয়া কেবল আল্লাহর সম্মান ও মর্যাদার কারণেই। ক্বাতাদাহ বলেন, এ ফেটে যাওয়ার উপক্রম হওয়া আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্য ও দাপটের কারণেই। ইবন জারীর আত-তাফসীর (৭/২৫)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেন, "তোমরা আল্লাহর কাছে ফিরদাউস চাও; কেননা তা জান্নাতের সর্বোত্তম স্থান, আর ফিরদাউসের অধিবাসীরা 'আরশের 'আত্বীত্ব' বা ভারের শব্দ শুনতে পাবে।" সহীহ, ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ, ১৯৫; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক (২/৩৭১) আর তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। জান্নাতুল ফিরদাউস চাওয়ার দু'আটি নিম্নরূপঃ

আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাল জান্নাতাল ফিরদাউস। এ দু'আটি আমাদের সবাইকে সালাতের সিজদায়, সালাতের শেষ বৈঠকে সালাম ফিরানোর পূর্বে, সালাতের সালাম ফিরানোর পরে ও অন্যান্য সময়ে কমপক্ষে তিনবার আর উর্ধ্ব পক্ষে সাতবার পাঠ করা উচিত। অপর হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেছেন, "আসমান ভারজনিত শব্দ করছে, আর এ ভারজনিত শব্দ করা তার জন্য যথার্থ ; কারণ এর এমন চার আঙ্গুল স্থান নেই যাতে একজন ফিরিশতা তার কপাল রাখা অবস্থায় নেই; আল্লাহর জন্য সাজদায় রত রয়েছে।" সহীহুত তারগীব ৩৩৮০।

ফিরিশতাগণ 'আরশের চারপাশে তাওয়াফ করেনঃ ইমাম বাইহাক্বী বলেন, তাফসীরবিদগণের মত হচ্ছে, 'আরশ হচ্ছে খাট, আর তা একটি বস্ত যা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, তাঁর ফিরিশতাদেরকে বহন করার নির্দেশ দিয়েছেন সেটাকে সম্মান করা ও তার চার পাশে তাওয়াফের মাধ্যমে ইবাদাত করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন তিনি যমীনে একটি ঘর নির্মাণ করেছেন, বনী আদমকে সেটার তাওয়াফের নির্দেশ দিয়েছেন। এবং সেটার দিকে ফিরে সালাত আদায় করার আদেশ করেছেন। তাদের মতের পক্ষে কুরআনের বহু আয়াত, হাদীসের বহু ভাষ্য ও বহু আসার সেটার প্রতি প্রকাশ্য প্রমাণ দিচ্ছে। বাইহাক্বী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত:৪৯৭।

যিকিরকারীদের যিকির 'আরশের চারপাশে গুঞ্জন তৈরি করে: হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেছেন, "তোমরা আল্লাহর সম্মান ও মর্যাদা বর্ণনা করে যেসব **তাসবীহ, তাহলীল, তাহমীদ** করো সেগুলো 'আরশের চারপাশে ঘুরতে থাকে, মৌমাছির গুঞ্জনের মতো তাদের গুঞ্জন শোনা যায়; এগুলো যিকিরকারীর কথা স্মরণ করতে থাকে, তোমাদের কেউ কি চায় না তার জন্য হবে অথবা সর্বদা তার জন্য থাকবে এমন কেউ যে তার কথা (সেখানে) স্মরণ করবে?" সহীহ, আহমাদ, আল-মুসনাদ (৪/২৭১)। কা'ব আল-আহবার বলেন, উত্তম কালেমা 'আরশের চারপাশে মৌমাছির গুঞ্জনের মতো গুঞ্জরিত হতে থাকে, যা তার যিকিরকারীর কথা স্মরণ করতে থাকে। সহীহ, ইবন আবী শাইবাহ, আল-আরশ, ৪০৭; যাহাবী, আল-উলু ৯৩।

অপর বর্ণনায় কা'ব বলেন, **"সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার** এগুলোর রয়েছে গুঞ্জন 'আরশের চারপাশে, যা মৌমাছির গুঞ্জনের ন্যায়, যারা এগুলোর আমল করেছে তাদের কথা স্মরণ করে।" যাহাবী, আল-উলু, ৯৩; ইবন আবী শাইবাহ, আল-আরশ, ৪০৫;

'আরশ হচ্ছে আসমান ও যমীনের উপরঃ

'আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, "নিকটতম আসমান ও যার তার কাছে তার মধ্যকার দূরত্ব পাঁচশত বছর, প্রতি আসমানের দূরত্ব পাঁচশত বছর, সপ্তম আসমান ও কুরসীর দূরত্ব পাঁচশত বছর, কুরসী থেকে পানির দূরত্ব পাঁচশত বছর, আর 'আরশ পানির উপর, আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপর, তবে তিনি জানেন তোমাদের অবস্থা, যার উপর তোমরা আছ।" সহীহ, ইবন খুযাইমাহ, আত-তাওহীদ ১০৫;

‘আরশ জান্নাতের উপরঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেছেন, “জান্নাতে রয়েছে একশটি স্তর, যা আল্লাহ তা‘আলা তাঁর পথের মুজাহিদদের জন্য তৈরি করে রেখেছেন। প্রতি দু‘টি দরজার মধ্যে দূরত্ব, আসমান ও যমীনের মধ্যকার দূরত্বের মত, সুতরাং যখন তোমরা আল্লাহর কাছে চাইবে তখন তাঁর কাছে ফিরদাউস চাইবে, কারণ তা মধ্যম বা সর্বোত্তম জান্নাত, সর্বোচ্চ জান্নাত, আর তার উপর রয়েছে রহমানের ‘আরশ, তা থেকেই জান্নাতের নালাসমূহ প্রবাহিত।” সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৪২৩।

ক্বাতাদাহ বলেন, ফিরদাউস হচ্ছে, জান্নাতের উঁচু ভূমি (মালভূমি), মধ্যম ভূমি, সর্বোচ্চ, সর্বোৎকৃষ্ট ও সবচেয়ে উপরের স্থান। সুতরাং জান্নাত, সে তো গম্বুজের মতো; কারণ তার মধ্যমনি হচ্ছে উঁচু অংশ। (৭৬) ইবন হাজার, ফাতহুল বারী (৬/১৩)।

‘আরশকে আল্লাহ তা‘আলা পানির উপর সৃষ্টি করেছেনঃ আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ -

“আর তিনিই আসমানসমূহ ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, আর তাঁর ‘আরশ ছিল পানির উপর।” (সূরাহ হূদ, আয়াতঃ ০৭)

মুজাহিদ বলেন, “আর তার ‘আরশ পানির উপর ছিল” অর্থাৎ আসমান ও যমীন সৃষ্টির আগে তাঁর ‘আরশ পানির উপরে ছিল। তাফসীর ত্বাবারী।

অনরূপ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আল্লাহ তা‘আলার হাত পরিপূর্ণ, রাত-দিন যতই খরচ করুক তাতে কম পড়ে না অথবা খরচ তাতে ঘাটতি ঘটায় না। দিন-রাত তিনি বদান্যতার সাথে প্রদান করেন। আরও বলেন, তোমরা আমাকে জানাও, তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টির পর থেকে যা খরচ করেছেন তা তার হাতে যা আছে তাতে সামান্যতম ও ঘাটতি ঘটায়নি। আর তার ‘আরশ ছিল পানির উপর, অপর হাতে মীযান, সেটাকে (বান্দার আমল নেক ও বদ অনুযায়ী) তিনি নীচু করেন ও উপর করেন।” সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৪১১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৯৩।

হাফেজ ইবন হাজার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘এখানে পানি দ্বারা সমুদ্রের পানি বুঝানো হয়নি। কারণ সমুদ্রের পানি তো আসমান ও যমীন

সৃষ্টির পরে অস্তিত্বে আসলো। বরং এটা ভিন্ন প্রকার পানি যা 'আরশের নিচে যেভাবে আল্লাহ চেয়েছেন।' ইবন হাজার ফাতহুল বারী (১৩/৪১১)।

ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমাকে **ওয়া কানা আরশুহু 'আলা উল মায়ি** এ আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, এ পানি কিসের উপর ছিল ? তিনি বলেন, তা ছিল বাতাসের পিঠের উপর। তাবারী, তাফসীর (১৫/২৪৯); হাকিম, আল-মুস্তাদরাক (২/৩৪১) এবং বলেছেন, এটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তের ওপর সহীহ, যাহাবী তাতে একমত হয়েছেন।

সুলাইমান আত-তাইমী বলেন, "যদি আমাকে প্রশ্ন করা হয়, আল্লাহ কোথায়? তবে জবাবে বলবো, উপরে। আর যদি আমাকে প্রশ্ন করা হয়, আসমান সৃষ্টির আগে আল্লাহর 'আরশ কোথায় ছিল? তাহলে অবশ্যই বলবো, পানির উপর।আর যদি বলে, পানি সৃষ্টির আগে তাঁর 'আরশ কোথায় ছিল? তবে অবশ্যই বলবো, আমি জানি না।" বুখারী, খালকু 'আফ'আলিল ইবাদ ১২৭। যদি প্রশ্ন করা হয়, **আল্লাজীনা ইয়াহমিলুনা উল আরশা এবং ওয়া কানা আরশুহু আলা উল মায়ি** এর মাঝে সামঞ্জস্য কীভাবে হবে? তখন উত্তর হবে, আসমান ও যমীন সৃষ্টির আগে 'আরশ পানির উপরে থাকা অবস্থায় বহন করা হয়েছিল। আর আসমান ও যমীন সৃষ্টির পরে আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাদেরকে পানির উপরে থেকে 'আরশ বহন করার নির্দেশ দিলেন।

আল্লাহ তা'আলা তিনি আসমান ও যমীনসমূহের উপর, জান্নাতের উপর এবং 'আরশের উপরঃ হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেছেন,

"তোমরা কি জান, আসমান ও যমীনের দূরত্ব কত? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, না। আল্লাহর শপথ আমরা জানি না। রাসূল বললেন, এ দুয়ের মধ্যে দূরত্ব হয় এক, না হয় দুই অথবা তিন ও সত্তর বছর, আর তার উপরে থাকা আসমান ও অনুরূপ দূরত্বে, এভাবে রাসূল সাত আসমান গুণে বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, সাত আসমানের পরে একটি সমুদ্র রয়েছে যার উপর ও নিচের দূরত্ব এক আসমান থেকে আরেক আসমানের দূরত্ব। তার উপর রয়েছে আটটি বন্য ছাগল, যাদের খুর ও হাঁটুর মাঝখানের দূরত্ব এক আসমান ও অপর আসমানের মাঝখানের দূরত্বের মতো। তারপর এদের পিঠে রয়েছে 'আরশ; যার উপর ও নিচের মধ্যকার দূরত্ব এক আসমান ও আরেক আসমানের মাঝখানের দূরত্বের মতো। আর মহান আল্লাহ এর উপর। সহীহ। তিরমিযী, হাদীস নং ৩৩২০; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১৯৩; আহমাদ, আল-মুসনাদ

(১/২০৭); ইবনুল কাইয়্যেম, তাহযীবুস সুনানে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন (৭/৯২); যদিও কোনো কোনো আলেম দুর্বল বলেছেন।

আসমান থেকে আসমানের দূরত্ব এ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, ৭০ বছর অথচ অপর হাদীসে পাঁচশত বছর, এর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান হচ্ছে, এটি সফর কীভাবে করা হচ্ছে সেটার উপর নির্ধারিত হবে। যদি উটে সফর করে তবে ৫০০ বছর আর যদি দ্রুতগামী ঘোড়ায় সফর হয় তবে তা হয়ে যাবে ৭০ বছর। ইবনুল কাইয়্যেম, তাহযীবুস সুনান (৭/৯৪)।

'আরশ আল্লাহর সবচেয়ে নিকটতম সৃষ্টিঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেন,

"কিন্তু আমাদের রব তাঁর সত্তা বরকতময়, তাঁর নাম অনেক সুউচ্চ, তিনি যখন কোনো নির্দেশ জারী করেন, তখন 'আরশ বহনকারীগণ তাসবীহ পাঠ করেন, তারপর যে আসমান তাদের কাছে আছে সেখানকার অধিবাসীরা তাসবীহ পাঠ করেন, এভাবে তাসবীহের ধারা পৌঁছতে পৌঁছতে তা যমীনের নিকটতম আসমানে পৌঁছে যায়। তারপর যারা 'আরশ বহনকারীদের নিকটতম আসমানে আছে তারা 'আরশ বহনকারীদেরকে বলেন, তোমাদের রব কী বলেছেন? তখন তিনি তাদেরকে সে ব্যাপারে সংবাদ দেন। তখন আসমানবাসীরা একে অপরের নিকট সে সংবাদ আদান-প্রদান করেন, অবশেষে সে সংবাদ যমীনের নিকটতম আসমানে পৌঁছে যায়, অতঃপর জিন্নেরা সেটার শোনা অংশকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে তাদের বন্ধুদের কানে ঢেলে দেয়, আর তাদের উপর আগুন নিক্ষেপ করা হয়, অতঃপর তারা যা সঠিকভাবে চুরি করে নিয়ে আসতে পেরেছে তা সত্য হয়, কিন্তু তারা সেটাতে মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটায় ও বৃদ্ধি ঘটায়।" সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২২২৯।

হাদীস থেকে বুঝা গেল যে, 'আরশ বহনকারীরা প্রথম আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ লাভ করেন। তারপর তারা তাদের নিকটস্থ আসমানবাসীদের কাছে তা পৌঁছে দেন। এভাবে তারা আল্লাহ তা'আলার নিকটতম সৃষ্টি হওয়ার অর্থ হচ্ছে 'আরশও তাদের নিকট, কারণ তারাই তো তা বহন করে থাকে।

এর দ্বারা আরও বুঝা গেল যে, 'আরশ আসমান ও যমীনের উপরে, জান্নাতের উপরে, আর তা সকল সৃষ্টির সর্বোচ্চ। সকল সৃষ্টি যতই উঁচু ও উপরে হোক না কেন তা 'আরশের নিচে।

কিয়ামতের দিন আসমান ও যমীন ভাঁজ করে আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাতের উপর রাখবেন, কিন্তু 'আরশ ও কুরসী ভাঁজ করা হবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً - فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ - وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ - وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ -

"আর পর্বতমালা সহ পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হবে এবং মাত্র এক ধাক্কায় ওরা চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে যাবে। ফলে সেদিন সংঘটিত হবে মহাঘটনা, আর আসমান বিদীর্ণ হয়ে যাবে ফলে সেদিন তা দুর্বল-বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। আর ফিরিশতাগণ আসমানের প্রান্তদেশে থাকবে এবং সেদিন আটজন ফিরিশতা আপনার রবের 'আরশকে ধারণ করবে তাদের উপরে।" (সূরাহ আল-হাক্বাহ, আয়াত: ১৪-১৭)

সুতরাং পাহাড় চূর্ণ হয়ে যাবে, যমীন ফেটে চৌচীর হয়ে যাবে, কিন্তু নিঃসন্দেহে 'আরশকে তার বহনকারীরা বহন করবে, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ -

"আর তারা আল্লাহকে যথোচিত সম্মান করেনি অথচ কিয়ামতের তিন সমস্ত যমীন থাকবে তাঁর হাতের মুঠিতে এবং আসমানসমূহ থাকবে ভাঁজ অবস্থায় তাঁর ডান হাতে। পবিত্র ও মহান তিনি, তারা যাদেরকে শরীক করে তিনি তাদের ঊর্ধ্বে।" (সূরাহ আয-যুমার, আয়াত: ৬৭)

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ -

"যেদিন এ যমীন পরিবর্তিত হয়ে অন্য যমীন হবে এবং আসমানসমূহও; আর মানুষ উন্মুক্তভাবে উপস্থিত হবে এক, একচ্ছত্র অধিপতি আল্লাহর সামনে।" (সূরাহ ইবরাহীম, আয়াত: ৪৮)

অনুরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেছেন,

"কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলা যমীনকে মুঠিবদ্ধ করবেন, আর আসমানকে ডান হাতে ভাঁজ করে রাখবেন, তারপর বলবেন,

“আমি রাজাধিরাজ, যমীনের বাদশারা কোথায়?” সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৮১২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭৮৭; শব্দ বিন্যাস মুসলিমের।

সুতরাং আসমান ও যমীন কিয়ামতের দিন মুষ্টিবদ্ধ করা হবে, ভাঁজ করা হবে, পরিবর্তন করা হবে, তবে ‘আরশ এর ব্যতিক্রম; কারণ সেটার সাথে ‘আরশের উল্লেখ আসেনি। আল্লাহ তা‘আলা কেবল সেগুলোকে ভাঁজ করবেন যা তিনি ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন, তিনি এ ছয়দিন ও আসমান-যমীন সৃষ্টির আগেই তো ‘আরশকে সৃষ্টি করেছিলেন। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আর ‘আরশ, সেটা তো ছয়দিনে আল্লাহ তা‘আলা যা সৃষ্টি করেছেন তার বাইরের জিনিস, সুতরাং তা ধ্বংস কিংবা চূর্ণ হবে না। বরং বিখ্যাত হাদীস সেটাই প্রমাণ করে যা কুরআন প্রমাণ করছে, তা হচ্ছে আল্লাহর ‘আরশ অবশিষ্ট থাকবে। নাকদু তা’সীসিল জাহমিয়্যাহ (১/১৫৫)।

‘আরশ ধ্বংস হবে না, যেমনিভাবে জান্নাত ও জাহান্নাম ধ্বংস হবে নাঃ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ - وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -

“আর তারা (প্রবেশ করে) বলবে, ‘সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্য করেছেন এবং আমাদেরকে অধিকারী করেছেন এ যমীনের; আমরা জান্নাতে যেখানে ইচ্ছে বসবাসের জায়গা করে নেব।’ অতএব নেক আমলকারীদের পুরস্কার কত উত্তম! আর আপনি ফিরিশতাদেরকে দেখতে পাবেন যে, তারা ‘আরশের চারপাশে ঘিরে তাদের রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে। আর তাদের মধ্যে বিচার করা হবে ন্যায়ের সাথে এবং বলা হবে, সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহর প্রাপ্য।” (সূরাহ আয-যুমার, আয়াত: ৭৪-৭৫)

এ আয়াত প্রমাণ করছে যে, কিয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশ শেষ হওয়া পর্যন্ত ‘আরশ অবশিষ্ট থাকবে, এমনকি জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশের পরও। অনুরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যখন তোমরা আল্লাহর কাছে চাইবে তখন তার কাছে ফিরদাউস চাইবে; কেননা তা মধ্যম বা সর্বোত্তম জান্নাত, সর্বোচ্চ জান্নাত, মনে হচ্ছে, (রাসূল বলেছেন) তার

উপর রহমানের 'আরশ, আর তার থেকে জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত।" সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৭৯০।

সালাফে সালেহীন আল্লাহর 'আরশের ব্যাপারে যা যা বলেছেন তা কুরআন ও সহীহ হাদীসের ওপর নির্ভর করেই বলেছেন, সালাফে সালেহীন তাদের কিতাবে এসব তথ্য সবসময় উল্লেখ করতেন। (রহমান আরশের উপর উঠেছেন- ৩৯-৫৯ পৃ:)

কুরসী সংক্রান্ত আলোচনা

কুরসী শব্দের অর্থ:

কুরসী শব্দটি আরবী ভাষায় **'কারস'** থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। অভিধানে কারস অর্থ একত্রিত করা। সেটা অনুযায়ী চেয়ারকে কুরসী বলার কারণ হচ্ছে এর কাঠগুলো এক বিশেষ ধরনে একত্রিত করা হয়। সুতরাং যা কোনো কিছুকে একসাথে করে তাই কুরসী বলে অভিধানে গণ্য।কাগজ একত্রিত করলে সেটাকে আরবীতে বলা হয় **'কুররাসাহ'**। আলেমগণকেও **'কারাসী'** বলা হয়; কারণ তারা ইলম একত্রিত করেন।

পরিভাষায়: কুরসী হচ্ছে, "বৃহৎ এক দেহ বিশিষ্ট সৃষ্ট বস্তু, যা 'আরশের সামনে পড়ে আছে, 'আরশ তার থেকে অনেক বড়, আর কুরসী হচ্ছে মহান আল্লাহ তা'আলার পা রাখার স্থান।" ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী, শারহুত তাহাওয়িয়্যাহ পৃ. ২১৩।

ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, কুরসী কুরআন, হাদীস ও জমহূর সালাফের ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত। মাজমূ'উল ফাতাওয়া (৬/৫৮৪)।

সুদ্দী বলেন, আসমান ও যমীন সবই কুরসীর অভ্যন্তরে। আর কুরসী রাব্বুল আলামীনের 'আরশের সামনে। (রহমান আরশের উপর উঠেছেন-৬১)

কুরসীর কিছু বৈশিষ্ট্য:

কুরআনে কারীমের মাত্র একটি আয়াতে কুরসীর কথা এসেছে, তা হচ্ছে,

اللَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ -

"আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না, নিদ্রাও নয়। আসমানসমূহে যা রয়েছে ও যমীনে যা রয়েছে সবই তাঁর। কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তাদের সামনে ও পিছনে যা কিছু আছে তা তিনি জানেন। আর যা তিনি ইচ্ছে করেন তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কোনো কিছুকেই তারা পরিবেষ্টন করতে পারে না। তাঁর 'কুরসী' আসমানসমূহ ও যমীনকে পরিব্যাপ্ত করে আছে; আর এ দু'টোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর জন্য বোঝা হয় না। আর তিনি সুউচ্চ সুমহান।" (সূরাহ আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ২৫৫)

তবে এ আয়াতকে কুরআনের সবচেয়ে বড় আয়াত বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা ঘোষণা করেছেন। হাদীসে এসেছে, উবাই ইবন কা'ব রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা আমাকে বললেন,"হে আবুল মুনযির! তুমি কি জান, আল্লাহর কিতাবের মধ্যে যা তোমার কাছে আছে তাতে কোন আয়াতটি সবচেয়ে বড়? তিনি বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালো জানেন। তিনি বলেন, হে আবুল মুনযির, তুমি কি জান, আল্লাহর কিতাবের মধ্যে যা তোমার কাছে আছে তাতে কোন আয়াতটি সবচেয়ে বড়? আমি বললাম, **"আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল ক্বাইয়্যুম** (সূরাহ আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ২৫৫), তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা আমার বুকে থাপ্পড় দিয়ে বললেন, 'আল্লাহর শপথ, হে আবুল মুনযির! ইলম যেন তোমার জন্য অত্যন্ত আনন্দ প্রদানকারী বস্তু হয়।" সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮১০।

তাছাড়া আয়াতুল কুরসী এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা সেটাকে ঈমানদারের জন্য দুনিয়াতে শয়তান থেকে সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৩১১ আর মৃত্যুর পরে জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাত লাভের কারণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ত্বাবারানী, হাদীস নং ৭৫৩২।

কুরসী 'আরশের ছেয়ে ছোট: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেন, "আরশের তুলনায় কুরসী তো বিস্তীর্ণ যমীনের উপর লোহার একটি ফেলে রাখা রিং।" (সহীহ। ইবন জারীর আত-ত্বাবারী, সহীহ সনদে, ইবন আবী শাইবাহ, আল-'আরশ ৫৮।)

অপর হাদীসে ইবন মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, "সপ্তম আসমান ও কুরসীর দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ' বছর, আর কুরসী থেকে পানির দূরত্ব পাঁচশ' বছরের 'আরশ পানির উপর আর আল্লাহ 'আরশের উপর, সেখানে থেকেও তিনি তোমাদের অবস্থা ভালো করে জানেন। সহীহ ইবন খুযাইমাহ, আত-তাওহীদ, ১০৫;

কুরসী পা রাখার স্থান; ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, "কুরসী হচ্ছে মহান রাব্বুল ইয্যতের পা রাখার স্থান, অথচ 'আরশের পরিমাণ আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না আর 'আরশ, তার পরিমাণ তো আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না।" (সহীহ। আদ-দারেমী, আর-রাদ্দু আলাল মারিসী পৃ. ৭১) ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমার অনুরূপ বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে, আবু মূসা আল- আশ'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে, ইবন মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে, আর প্রখ্যাত তাবে'য়ী মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ থেকে। আবু মূসা আল-আশ'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, "কুরসী হচ্ছে, দু পায়ের স্থান, আর তার রয়েছে ভারজনিত শব্দ, যেমনিভাবে বাহনের উপর হাওদাজে ভারের কারণে শব্দ হয়ে থাকে। (বাইহাক্বী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত ৫০৯; যাহাবী, আল-উলু ৮৪।)

ইমাম ক্বুরতুবী ও বাইহাক্বী বলেন, হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী, কুরসী হচ্ছে 'আরশের সামনে একটি সৃষ্টি; আর 'আরশ তার থেকে অনেক বড়। ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী শারহুত ত্বাহাওয়িয়্যাহ গ্রন্থে বলেন, আর কুরসী, তা যেমনটি একাধিক সালাফ বলেছেন, তা হচ্ছে, 'আরশে উঠার সিড়ির মতো। (শারহুত ত্বাহাওয়িয়্যাহ, ৩১৩।)

কুরসীর ব্যাপারে বিভিন্ন ভুল মতামতঃ

কুরসী বলতে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত কী বুঝেন তা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু দূর্ভাগ্যের বিষয়, এ কুরসী নিয়েও কিছু লোক সঠিক পথবিচ্যুত হয়েছে। তাদের মতগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো:

এক. কোনো কোনো আলেমের মতে, 'আরশ ও কুরসী একই জিনিস। এটি হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। তবে কয়েকটি কারণে এটি শুদ্ধ নয়।

ইবন ‘আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে এ বর্ণনা শুদ্ধ নয়, যেমনটি ইমাম ইবন কাসীর রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন। তাছাড়া কুরআন, হাদীস ও আসারে এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য বর্ণিত হয়েছে।

দুই. কুরসী বলে বাস্তবে কিছু নেই। কুরসী একটি ধারণা করা জিনিস মাত্র, যা দিয়ে উপমা দেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলার বড়ত্বের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে মাত্র। যারা আল্লাহর যেসব গুণকে অস্বীকার করে যা আল্লাহর বড়ত্ব প্রকাশক, তারাই সাধারণত এ ধরনের কথা বলে। তারা আল্লাহর বড়ত্ব প্রকাশক আয়াতসমূহ যেমন,

وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ -

“সকল যমীন তাঁর মুষ্ঠির ভিতর থাকবে, আর আসমানসমূহ তাঁর ডান হাতে ভাঁজ করা থাকবে।” (সূরাহ আয-যুমার, আয়াত: ৬৭) এ জাতীয় আয়াত ও হাদীসসমূহ সম্পর্কে মনে করে থাকে যে, এগুলো দ্বারা উদ্দেশ্য বড় বড় ধারণায় নিপতিত করা উদ্দেশ্য। বাস্তবে সে রকম নয়। এরা সাধারণত দীনের সঠিক জ্ঞানে দীন না বুঝে আবেগ দিয়ে চলতে চায়। মু‘তাযিলারা এটা সাধারণত বলে থাকে, তাদের সাথে কিছু আশায়েরা মতবাদের লোকও রয়েছে। বর্তমান কালের তাফসীরকারকদের মধ্য হতে সাইয়্যেদ কুতুব তার যিলালুল কুরআনে সূরাহ আয-যুমারের ৬৭ নং আয়াতে এ মতকে পছন্দ করেছেন এবং একটি মৌলিক নীতি হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

বস্তুত এ জাতীয় কথা বলা বড় ধরনের পথভ্রষ্টতা। কারণ:

এ জাতীয় কথা বলার অর্থ হচ্ছে দীনকে খেয়াল খুশির অধীন করে দেয়া। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা বলেছেন সেগুলোকে যদি এভাবে দেখা হয়, তাহলে গায়েবী কোনো জিনিসেই আর ঈমান থাকবে না। নাউযুবিল্যাহ।

মু‘তাযিলা মুফাসসিররা এ নীতির ওপর ভিত্তি করেই যা তাদের যুক্তিবিরুদ্ধ হয়ে যায় সেটাকেই এ পর্যায়ে নিয়ে রাখে। যেমনটি করেছেন যামাখশারী তার তাফসীরে।

কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বহু ভাষ্যকে এভাবে খেয়াল বা ধারণাপ্রসূত মনে করা সুস্পষ্ট কুফুরী। কুরআন ও হাদীসে যা এসেছে তার ওপর ঈমান না আসলে সে আল্লাহর বাণী ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে বিশ্বাসী হতে পারেনি।

তিন. কুরসী বলে ইলম বা জ্ঞান বুঝানো হয়েছে। এটি ইবন ‘আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। এ মতটিও শুদ্ধ নয়। কারণ, ইবন ‘আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে যা বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত হয়েছে এটি তার বিপরীত।

আরবী ভাষায় তার যে অর্থ হয়, তাতে কুরসী বলে ইলম বা জ্ঞান অর্থ নেয়া যায় না।

তাছাড়া শরী‘আতের নসও তা বুঝাচ্ছে না। এগুলো কালামশাস্ত্রবিদদের বাড়তি কথার অন্তর্ভুক্ত।

কুরসী সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন যে, তা আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টন করে আছে (সূরাহ বাক্বারাহ: ২৫৫)। কিন্তু আল্লাহর ইলম তো আরও ব্যাপক, আল্লাহ বলছেন,

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ -

“যারা ‘আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা এর চারপাশে আছে, তারা তাদের রবের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সাথে এবং তাঁর ওপর ঈমান রাখে, আর মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, ‘হে আমাদের রব! আপনি দয়া ও জ্ঞান দ্বারা সবকিছুকে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছেন। অতএব যারা তাওবা করে এবং আপনার পথ অবলম্বন করে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন। আর জাহান্নামের শাস্তি থেকে আপনি তাদের রক্ষা করুন।” (সূরাহ গাফির, আয়াত: ০৭)

তিনি আরও বলেছেন,

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -

“তিনিই যমীনে যা আছে সব তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি আসমানের প্রতি মনোনিবেশ করে সেটাকে সাত আসমানে বিন্যস্ত করেছেন; আর তিনি সবকিছু সম্পর্কে সবিশেষ অবগত।” (সূরাহ আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ২৯) সেটার পরিধিতে আসমান ও যমীনের বাইরে জান্নাত, জাহান্নামও রয়েছে।

কোনো কোনো মুহাদ্দিস ও মুফাসসির থেকে কুরসী অর্থ ইলম বর্ণিত হলেও মনে রাখতে হবে যে, তারা এটা বাড়তি একটি অর্থ হিসেবে বলে থাকবেন। অর্থাৎ যেহেতু আসমান ও যমীন এ দু'টি কুরসীতে অতীব ক্ষুদ্র, তাই তিনি সেগুলোর মধ্যকার সবকিছুর জ্ঞানই রাখেন। সম্ভবত এটা বলা উদ্দেশ্য। মহান আল্লাহই ভালো জানেন।

চার. কারও কারও মতে, কুরসী বলে রাজত্ব বুঝানো হয়েছে, তারা 'আরশকেও রাজত্ব হিসেবে বুঝেছে। বস্তুত তাদের বক্তব্যও শুদ্ধ নয়। ইতোপূর্বে তাদের বক্তব্য খণ্ডন করা হয়েছে। (শারহু সালেহ আলুশ শাইখ, শারহুত তাহাওয়িয়্যাহ, রহমান আরশের উপর উঠেছেন ৬১-৬৫)

মহান আল্লাহ সবকিছুর উপরে থাকা এবং 'আরশের উপর উঠা

মহান আল্লাহ সবকিছুর উপরে তা একেবারে শত শত আয়াত, শত শত হাদীস, আল্লাহর সকল রাসূলগণের ইজমা' বা ঐকমত্য, আল্লাহর নাযিলকৃত সকল কিতাবের ঐকমত্যের ভাষ্য, সাহাবীগণ তথা উম্মতের প্রথম সারীর সকলের ইজমা', আর সকল গ্রহণযোগ্য তাবে'য়ী, ইসলামের সকল হাদীসের ইমাম, তাফসীরের ইমাম, ফিকহের ইমাম, মানব মনের স্বাভাবিক প্রকৃতি এসবই প্রমাণ করছে। মহান আল্লাহ যে সবকিছুর উপরে তাঁর মহান 'আরশের উপর রয়েছেন এ ব্যাপারে আমরা শত শত আয়াত ও হাদীস পেশ করতে পারব, আর সালাফে সালেহীনের সকলেই এ আকীদাহ-বিশ্বাস পোষণ করতেন, এ ব্যাপারে সন্দেহ করার অর্থই হচ্ছে মহান আল্লাহ সম্পর্কে ঈমান বিশুদ্ধ না হওয়া। কারণ 'উপর থাকা' এটি বস্তুত তাঁর সত্তাগত গুণ মহান রাব্বুল আলামীন সবকিছুর উপরে আছেন এটা সকল মানুষের ফিত্বরাত বা স্বভাবজাত আকীদাহ। এ ফিত্বরাত যার ওপর আল্লাহ তা'আলা মানুষদের সৃষ্টি করেছেন তা যখন পরিবর্তন হয়ে যায় তখনই মানুষ এর ভিন্ন কথা বলে। এ ব্যাপারে আমাদের পূর্ববর্তী আলেমগণের অনেকেই স্বতন্ত্র গ্রন্থও লিখেছেন। যেমন,

আবু উবাইদাহ মা'মার ইবনুল মুসান্না (২১০ হিজরী), ফাদ্বায়িলুল 'আরশ। (কাশফুয যুনূন ২/১২৭৬)

আবু উবাইদ আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ আল-হারাওয়ী, কিতাবুল 'আরশ (মাজাল্লাতু মা'হাদুল মাখতূতাতি ১/২৯, পৃ.২০)

আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবন উসমান ইবন আবী শাইবাহ (২৯৭ হিজরী), আল-আরশু ওমা রুওয়িয়া ফীহি।

আবুল ফাদ্বল মুহাম্মাদ ইবন ত্বাহের ইবন আলী ইবন আহমাদ আল-মাক্বদেসী, আশ-শাইবানী, ইবনুল কাইসারানী (৫০৭ হিজরী), মাসআলাতুল উলু ওয়ান নুযূল।

আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবন আহমাদ ইবন কুদামাহ, (৬২০ হিজরী) ইসবাতু সিফাতিল 'উলু।

আবু মুহাম্মাদ মাহমূদ ইবন আবুল কাসেম আদ-দিশতী (৬৬৫ হিজরী) ইসবাতুল হাদ্দি লিল্লাহি ও বিআন্নাহু আলা 'আরশিহী।

আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ আহমাদ ইবন আবদুল হাদী ইবন আবদুল হামীদ ইবন আবদুল হাদী ইবন ইউসুফ ইবন মুহাম্মাদ ইবন কুদামাহ আল-মাকদেসী, আদ-দিমাশকী, আস-সালেহী, আল-হাম্বলী। (৭৪৪ হিজরী), আল-কালামু 'আলা মাসআলাতিল ইস্তেওয়া 'আলাল 'আরশি।

আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন উসমান আয-যাহাবী (৭৪৮ হিজরী) আল-'উলূ লিল আলিয়্যিল আযীম।

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদা ইবন আহমাদ আজ-জাহাবী (৭৪৮ হিজরী)। 'আরশ ওয়ামা রুওয়িয়া ফীহি।

আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন উসমান আয-যাহাবী (৭৪৮ হিজরী) আল- আরবা'ঈন ফী সিফাতি রাব্বিল 'আলামিন।

শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন আবী বকর ইবন আইয়্যুব ইবনুল কাইয়্যেম (৭৫১ হিজরী) ইজতিমা'উল জুয়ূশিল ইসলামিয়্যাহ ফী গাযওয়িল মু'আত্তিলাতিল জাহমিয়্যাহ।

১২- শাইখ মুহাম্মাদ ইবন নাসের আল-হাযেমী, (১২৮৩ হিজরী), কিতাবুস সিফাত।

১৩- শাইখ হামূদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন হামূদ ইবন আবদুর রহমান আত-তুওয়াইজরী (মৃত ১৪১৩ হিজরী), ইসবাতু উলুওয়িল্লাহি ওয়া মুবায়ানাতিহী লিখালকিহী, ওয়ার রাদ্দি আলা মান যা'আন্না মা'য়িয়্যাতাল্লাহি লিল খালকি যাতিয়্যাহ।

আর বর্তমানকালে যারা এ বিষয়ে আলাদা গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন,

মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ দুওয়াইশ, 'উলুওয়ুল্লাহি 'আলা খালকিহি।

উসামাহ আল-কাসসাস, উলুওয়ুল্লাহি আলা খালকিহি।

আবুল হাসান খুজলী ইবরাহীম উমার, ইসবাতু উলওয়িল্লাহি 'আলা খালকিহী।

মুহাম্মাদ আশরাফ আল-হিজাযী, আল-ইস্তেওয়া ইন্দা আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ।

আবদুল হাদী ইবন হাসান ওয়াহবী, আল-কালেমাতুল হিসান ফী বায়ানি উলুওয়ির রহমান।

আবু রামলাহ মুহাম্মাদ আল-মানসূর ইবরাহীম, ইস্তেওয়াউল্লাহি আলাল আরশি বাইনা তাসলীমিস সালাফি ওয়া তা'ওয়ীলিল খালাফ।

তাছাড়া সকল আকীদাহ'র কিতাবেই এটাকে আলাদা গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করা হয়েছে।

আল্লাহর কর্মগত গুণসমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ হচ্ছে "আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁর'আরশের উপর উঠা এবং সেখানে থাকা" এ গুণটি। এ গুণটি যতক্ষণ কেউ স্বীকার না করবে ততক্ষণ সে ঈমানদার বলে বিবেচিত হবে না; কারণ সে তার রবকে চিনতে পারেনি। তার রবের অবস্থান মর্যাদা সম্পর্কে জানতে পারেনি। (রহমান আরশের উপর উঠেছেন- ৬৬-৬৭)

আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক "ইস্তেওয়া আলাল 'আরশ" তথা 'আরশের উপর উঠার প্রমাণ

"ইস্তেওয়া আলাল 'আরশ" এর উপর কুরআন থেকে দলীল

কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা 'ইস্তেওয়া আলাল 'আরশ' এর ঘোষণা প্রদান করেছেন। সেগুলো হচ্ছে,

সূরাহ আল-আ'রাফে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ -

“নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ যিনি আসমানসমূহ ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি ‘আরশের উপর উঠেছেন।” (সূরাহ আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৫৪)

সূরাহ ইউনুসে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ -

“তোমাদের রব তো আল্লাহ, যিনি আসমানসমূহ ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি ‘আরশের উপর উঠলেন। তিনি সবকিছু পরিচালনা করেন।” (সূরাহ ইউনুস, আয়াত: ০৩)

সূরাহ আর-রা‘দ এ আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ -

“আল্লাহ, যিনি আসমানসমূহ উপরে স্থাপন করেছেন খুঁটি ছাড়া, তোমরা তা দেখছ। তারপর তিনি ‘আরশের উপর উঠেছেন”। (সূরাহ আর-রা‘দ, আয়াত: ০২)

সূরাহ ত্বা-হা তে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

الرَّحْمَـٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ -

“রহমান ‘(দয়াময়) আরশের উপর উঠেছেন”। (সূরাহ ত্বা-হা, আয়াত: ০৫)

সূরাহ আল-ফুরকানে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَـٰنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا -

“তিনি আসমানসমূহ, যমীন ও এ দু‘য়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেন; তারপর তিনি ‘আরশের উপর উঠলেন। তিনিই ‘রহমান’, সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে যে অবহিত তাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।” (সূরাহ আল-ফুরকান, আয়াত: ৫৯)

সূরাহ আস-সাজদাহয় আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ -

"আল্লাহ, যিনি আসমানসমূহ, যমীন ও এ দু'য়ের অন্তর্বর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন।" (সূরাহ আস-সাজদাহ, আয়াত: ০৪)

সূরাহ আল-হাদীদে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ -

"তিনি ছয় দিনে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন।" (সূরাহ আল-হাদীদ, আয়াত: ০৪)

উপরে আসা আয়াতসমূহের ভাষ্যে **'ইস্তেওয়া আলাল 'আরশ'** কথাটির অর্থ আমরা করেছি, "আরশের উপর উঠলেন"। এর কারণ কী? কারণ এর মাধ্যমে আমরা আল্লাহর একটি **'সিফাতে ফি'লিয়্যাহ'** বা কর্মগত গুণ সাব্যস্ত করার বিষয়টি প্রমাণ করতে চাচ্ছি।

সরাসরি কুরআনুল কারীমের সাতটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নিজ পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে তাঁর এ গুণটির কথা বলেছেন। এত স্পষ্টভাবে বার বার আসা এ গুণটিকে কিনা অস্বীকার করে, কিংবা অপব্যাখ্যা করে, তারা কী আসলে আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে কিনা এ ব্যাপারে একজন ঈমানদারের মনে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। (রহমান আরশের উপর উঠেছেন -৬৯-৭০)

'ইস্তেওয়া আলাল 'আরশ' এর উপর হাদীস থেকে দলীল

আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর হাদীসে এসেছে, নবী তার হাত ধরলেন, তারপর বললেন, হে আবু হুরায়রা! "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আসমান, যমীন ও তার মাঝখানের সবকিছু সৃষ্টি করলেন তারপর তিনি তার 'আরশের উপর উঠলেন।" নাসায়ী, আত-তাফসীর, তাফসীর সূরাহতুস সাজদাহ ২/১৫৩; নং ১৫৪, আরও অনেকে। আলবানী রাহিমাহুল্লাহ মুখতাসারুল উলু (১১২) তে এর সনদকে জাইয়েদ বলেছেন। আর তাফসীর আন-নাসায়ী এর মুহাক্কিকদ্বয় এর সনদকে হাসান বলেছেন।

কাতাদাহ ইবনুন নু'মান রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমাকে বলতে শুনেছি, "যখন আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির কাজ সম্পন্ন

করলেন তখন তিনি তার 'আরশের উপর উঠলেন।" (আল-খাল্লাল আস-সুন্নাহ; ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমাউল জুয়ূশিল ইসলামিয়্যাহ, ১০৭, ১০৮ আর বলেছেন, বুখারীর শর্ত অনুযায়ী এর সনদ; সহীহ আলা-উলু পৃ.১১০, আর বলেন, এর বর্ণনাকারীরা সবাই নির্ভরযোগ্য; যাহাবী, আল-আরশ, (২/৯০) আরো অনেকে। তবে মনে রাখা দরকার এ হাদীসের মত আরেক হাদীসে কেউ কেউ বাড়িয়ে বলে, "তারপর তিনি পায়ের উপর পা রেখে পিঠের উপর শুয়ে পড়লেন"। এটি বানোয়াট যা আমাদের বর্ণিত হাদীস নয়।)

আবু রাযীন আল-উকাইলী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বললেন: "তারপর তিনি পানির উপর তাঁর 'আরশ তৈরি করেন। তারপর তিনি তাঁর 'আরশের উপরে উঠেছেন।" অন্য বর্ণনায় আছে, "অতঃপর 'আরশের উপরে ছিলেন। তারপর 'আরশের ঊর্ধ্বে হন।" (ইমাম যাহাবী বলেন, এটি হাসান হাদীস। ইমাম তিরমিযী (হাদীস নং ৩১০৯) তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান।)

"ইস্তেওয়া 'আলাল 'আরশ" এর ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকীদাহ'র মৌলিক দিকসমূহ

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন।

الرَّحْمَـٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ -

"রহমান দয়াময় আরশের উপর উঠেছেন।" (সূরাহ ত্বা-হা, আয়াত: ০৫)

সুতরাং কোনো মানুষের ঈমান ও তাওহীদ ততক্ষণ শুদ্ধ হবে না, যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলার জন্য এ গুণটি সাব্যস্ত না করবে। যতক্ষণ বিশ্বাস না করবে যে, তিনি স্বয়ং সত্তাগতভাবে তাঁর গুণসমেত সম্মানিত 'আরশের উপর উঠেছেন। যে 'আরশ সকল আসমান ও যমীনের উপরে, সকল সৃষ্টির উপরে, বাস্তবিক অর্থেই, কোনোরূপক অর্থে নয়। তিনি তাঁর সৃষ্টিকুল থেকে আলাদা। এতে কোনো ধরন নির্ধারণ করা যাবে না, শরীর বা দেহ সাব্যস্ত করে নয়, উদাহরণ দিয়ে নয়, অপব্যাখ্যা করে নয়, অর্থহীন করে নয় এবং বিকৃতি সাধন করে নয়।

আরও বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে, আসমান তাঁকে বহন করে না, তাঁকে ছায়া দেয় না, তাঁকে পরিবেষ্টন করে না। 'আরশও তাঁকে বহন করে না, কুরসীর ও তিনি সাহায্য নেন না, বরং তিনি তাঁর আরশের উপর, 'আরশকে

তিনি পরিবেষ্টন করেন। তিনি 'আরশ ও তার চেয়ে নিম্ন যা কিছু আছে সবকিছু থেকে অমুখাপেক্ষী। নূরের পর্দা তাঁকে সৃষ্টি থেকে পর্দাবৃত করে দেয় না, বরং তাঁর চেহারার আলোতে জলসে যাওয়া থেকে পর্দাসমূহ সৃষ্টিকে পর্দাবৃত করে। তিনি সৃষ্টিকে শত পর্দার পিছন থেকেও দেখেন, তাদের গোপন শলা-পরামর্শ শোনেন, ভালো কিংবা মন্দ যাই তারা করুক না কেন, আর তিনি জানেন অন্তরের অন্তঃস্থলে যা কেউ গোপন করেছে, যা কোনো অন্তর আড়াল করে রেখেছে। তিনি 'আরশের উপর থেকেই তাদের জীবন-জীবিকা নিয়ন্ত্রণ করেন, বরং সকল কিছুই তিনিই পরিচালনা করেন।

(ইস্তেওয়া 'আলাল 'আরশ) এর ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদাহ নিম্নোক্ত কয়েকটি পয়েন্টে আমরা তুলে ধরতে পারিঃ

আল্লাহ তা'আলা তিনি মহান 'আরশের উপর উঠেছেন। এ 'উঠা' বাস্তব অর্থেই। এ ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নায় যা এসেছে তা সাব্যস্ত করেন। তারা কোনো প্রকার অর্থ বিকৃতি করে তা সাব্যস্ত করার নীতি গ্রহণ করেন না। আর অর্থ না করে কেবল শব্দের ওপর ঈমান আনা যা কারও কারও নিকট 'তাফওয়ীদ্ব' নামে পরিচিত তা তাদের নীতি নয়। বরং তা জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায়ের মত।

আল্লাহ তা'আলার মহান 'আরশের উপর উঠা এটি একটি 'ফি'লী সিফাত' কর্মগত গুণ যা আল্লাহর ইচ্ছা ও চাওয়ার সাথে সম্পৃক্ত। তখন যা ইচ্ছা তা করেন। তাঁর কর্মে বাধা প্রদানকারী কেউ নেই।

আল্লাহ তা'আলার মহান 'আরশের উপর উঠা, তাঁর সবকিছুর উপরে থাকার অতিরিক্ত আরেকটি গুণ। কারণ সবকিছুর উপরে থাকা তাঁর সত্তাগত গুণ যা মানব মনের স্বাভাবিক নীতি, বিবেকের যুক্তি, সকল জাতির ঐকমত্য দ্বারা সাব্যস্ত। কিন্তু মহান 'আরশের উপর উঠার বিষয়টি তিনি বা তাঁর রাসূল না জানালে আমাদের জানার কোনো সুযোগ নেই।

মহান 'আরশের উপর উঠা' এ কথাটি আমরা বুঝি; কিন্তু তিনি কীভাবে 'আরশের উপর উঠলেন সেটা আমাদের কারও জানা নেই। এ জন্য সুফইয়ান আস-সাওরী, আল-আওযা'ঈ, লাইস ইবন সা'দ, সুফইয়ান ইবন 'উয়াইনাহ, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকসহ বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ ইমামগণ বলতেন, **আমির্রুহা কমা জা-আত বালা কায়ফিন**। "এ ভাষ্যগুলোকে কোনো প্রকার ধরন নির্ধারণ ব্যতীত সাব্যস্ত করে যাও।" মারাসীলে আবী দাউদ, পৃ. ১৮২; আস-

সিফাত লিদ দারাকুতনী, ৭১; আল-উলু পৃ. ১৫৬, সিয়ার (৮/৪৬৭); আকীদাতুস সালাফ পৃ. ৬৮; বাইহাক্বী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত (২/১৫৮,৩০৭)। এখানে লক্ষণীয় যে তারা সবাই **'ধরন নির্ধারণ ব্যতীত'** কথাটি বলেছেন। সুতরাং অর্থ সাব্যস্ত যদি না করা হয় তাহলে এ 'ধরন নির্ধারণ ব্যতীত' কথাটির মূল্য থাকে না।

'আরশের উপর উঠা'র ধরন সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদ'আত বা নতুন বিষয়; কারণ সাহাবায়ে কেরাম এ প্রশ্নটি তুলেননি; তারা জানতেন যে, এটি গায়েবী বিষয়; আর গায়েবী বিষয়ে যতটুকু আল্লাহ জানিয়েছেন ততটুকুতেই আমাদের সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। কোনো কোনো সাহাবী, তাবে'য়ীদের স্পষ্টভাবে ধরন সম্পর্কে প্রশ্ন করাকে বিদ'আত বলা হয়েছে।

'আরশের উপর উঠা'র ধরনের প্রকৃত বিষয়টি আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিতে হবে। তবে এর অর্থ এটা নয় যে, 'আরশের উপর উঠার কোনো ধরন নেই, বরং ধরন আছে; কারণ যেকোনো কাজ ও বস্তুরই একটি ধরন আছে; কিন্তু আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর উঠার ধরন আল্লাহও বলেননি, তাঁর রাসূলও বলেননি, তাঁর সাহাবীগণও নির্ধারণ করে কিছু বলেননি, আর আমরা আল্লাহকেও দেখিনি, তাঁর মতোও কাউকে দেখিনি, আমাদের বিবেকের যুক্তি দ্বারা নির্ধারণ করা অসম্ভব। সুতরাং ধরন নির্ধারণ করার কোনো সুযোগ নেই। তবে অর্থ অবশ্যই জানা আছে। কারণ, সালাফগণ এর অর্থ করেছেন, স্পষ্ট করে বর্ণনা দিয়েছেন, যারা অর্থ করে না সেসব জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লড়েছেন, বই লিখেছেন। আর এ 'ইস্তেওয়া' শব্দটি একেবারে স্পষ্ট ও প্রকাশিত আরবী শব্দ, যার অর্থ আরবী ভাষার অভিধানে পাওয়া যায়। সুতরাং অর্থ করতে হবে, অর্থ না করলে জাহমিয়্যাহ ফেরকার লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক 'আরশের উপর উঠার বিষয়টি কখনও মুতাশাবিহ বা অস্পষ্ট আয়াত সমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা আল্লাহর সিফাতের আয়াতগুলোর কোনোটিই মুতাশাবিহ বা অস্পষ্ট আয়াতসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়। সালাফে সালেহীন এগুলোর অর্থ করেছেন যা আমরা ইতোপূর্বে দেখিয়েছি।

আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক 'আরশের উপর উঠার বিষয়টি কখনও সৃষ্টিকুলের কারও উঠার মতো নয়। কারণ, যেভাবে তার সত্তার অস্তিত্ব আমরা স্বীকার করি ধরন না জেনেও, তেমনিভাবে তার গুণের ধরন না জেনেও আমরা তা মানতে বাধ্য।

সবচেয়ে বড় সৃষ্টি। 'আরশ আল্লাহর বহনকারী নয়। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং 'আরশ ও তার বাহকসহ সকল সৃষ্টির রক্ষাকারী।

আল্লাহ তা'আলার 'আরশ সবকিছুর উপর। মহান আল্লাহ তার 'আরশের উপরে অর্থাৎ সবকিছুর উপরে। তার কাছে আমলনামা উত্থিত হয়, ফিরিশতারা উঠেন, রূহ উপরে নীত হয়, হাত তার দিকেই তোলা হয়। সুতরাং মহান আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত হবে, সত্তাগতভাবে উপরে থাকা, ক্ষমতা ও মর্যাদাগত উপরে থাকা, গুণগতভাবে উপরে থাকা।

'আরশ' শব্দের ভাষাগত দু'টি অর্থ রয়েছে, এক কোনো কিছুর উপরস্থিত জিনিস। সকল সৃষ্টির উপরে 'আরশ। দুই বিছানা, যার উপর অবস্থান করা হয়। এ অর্থেও আল্লাহর তা'আলার 'আরশ প্রযোজ্য।

'আরশের উপরে থাকার পরও তিনি সৃষ্টির সবকিছু সম্পর্কে জানেন, দেখেন, শুনেন, সাহায্য- সহযোগিতা করেন, তাদের কর্মকান্ড তিনিই পরিচালনা করেন, এটাই তার সাথে থাকার অর্থ। এটিই সালাফে সালেহীন ইমামগণ অর্থ করেছেন ও ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এটা কোনো অপব্যাখ্যা নয় বা বিকৃতি নয়। এ ব্যাপারে জাহমিয়্যাহ, সর্বেশ্বরবাদী, অহংবাদী, সোহংবাদী ও হুলুলী সম্প্রদায় ব্যতীত অপর যাবতীয় ফেরকার লোকেরা আহলুস সুন্নাতের আকীদাহ'র বিরোধিতা করেনি।

'আরশের উপর থেকেও আল্লাহ তা'আলা বান্দার নিকটবর্তী হন, যেভাবে সেটা তার জন্য প্রযোজ্য। কুরআন ও হাদীসে যেখানে আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে, তা প্রকৃত অর্থেই নিকটবর্তী হওয়া। তবে তার ধরন আমাদের অজানা।

'আরশের উপর থেকেও তিনি নিকটবর্তী আসমানে নাযিল হন, সেটার ওপর ঈমান আনতে হবে। তার নাযিল বা অবতীর্ণ হওয়া প্রকৃত অর্থেই, সেটার ধরন আমাদের অজানা। এটা তার উপরে থাকাকে নিষেধ করে না। কারণ এটা আল্লাহর ব্যাপার, তার সত্তার অস্তিত্ব যেভাবে ধরন না দেখে মানতে পারি, তেমনি তার গুণাবলিও সেভাবে ধরন না দেখে মানতে হবে।

আসমান তাকে বহন করে না, তাকে ছায়াও দেয় না, আর আসমান তাকে ঘিরেও রাখতে পারে না। কোনো স্থান তাকে ঘিরে রাখে না বরং তিনি সবকিছুকে তার জ্ঞান, ক্ষমতা ও পরিচালনা দ্বারা পরিবেষ্টন করে আছেন। সত্তাগতভাবে ঘিরে থাকা নয়, অনুরূপ সৃষ্টিও স্রষ্টার অভ্যন্তরে নয়।

‘আরশ তাকে বহন করে না, কুরসীরও সাহায্য তার লাগে না। বরং তিনিই ‘আরশ, কুরসী ও সেগুলোর বাহকদেরকে তার কুদরতে বহন করে আছেন। তিনিই আসমানকে তার বড়ত্ব দিয়ে উপরে তুলে রেখেছেন, তাকে যমীনের উপর পড়ে যাওয়া থেকে নিয়ন্ত্রণ করে আছেন। ইবন ‘আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেন, “যে কুরসীর অভ্যন্তরে আসমান ও যমীনের জায়গা হয় তা তার দু‘কদম রাখার স্থান, আর ‘আরশের পরিমাণ যিনি সেটা সৃষ্টি করেছেন তিনি ব্যতীত আর কেউ জানে না। আর আসমানসমূহ আল্লাহ তা‘আলার সৃষ্টির উপর যেন একটি মরুভূমির উপর একটি গম্বুজ।” সহীহ, আবদুল্লাহ ইবন ইমাম আহমাদ, ৫৮৬; ইবন খুযাইমাহ, আত-তাওহীদ (১/২৪৮);হাকিম, মুস্তাদরাক (২/২৮২), এর সনদকে আলবানী রাহিমাহুল্লাহ মুখতাসারুল উলু গ্রন্থে সহীহ বলেছেন।

আল্লাহ তা‘আলা ‘আরশের মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। কারণ, তিনি ‘আস-সামাদ’। বরং সবাই তার মুখাপেক্ষী। সবাই ফকীর, তিনিই হচ্ছেন দাতা।

‘আরশ ও কুরসী ভিন্ন ভিন্ন জিনিস। ‘আরশের সামনে কুরসী একটি স্থান, যাতে আসমান-যমীন সহ সকল সৃষ্টির জায়গা হয়। তবুও ‘আরশের সামনে কুরসীর কোনো তুলনা হয় না। কুরসী ‘আরশের সামনে ফেলে রাখা একটি ছোট ভূমি ব্যতীত আর কিছু নয়। আর আল্লাহর ‘আরশের পরিমাণ আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না। মহান আল্লাহ সেখানে থেকেও তার সৃষ্টির সকল অবস্থা জানেন, দেখেন। তাদের ডাক শুনেন ও তাদের প্রয়োজন পূরণ করেন।

কুরসী হচ্ছে ‘আরশের সামনে থাকা মহান আল্লাহর পা রাখার স্থান, যা ইবন ‘আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে। আর এটাই বিশুদ্ধ আকীদাহ যা একজন ঈমানদার পোষণ করবে, কখনও তা শুধু জ্ঞান নয়, বা শুধু রাজত্ব নয় যেমনটি ভ্রষ্ট লোকরা বলে থাকে।

আল্লাহ তা‘আলা তার ‘আরশের উপর কথাটি বুঝানোর জন্য বলতে হবে, তিনি তার সৃষ্টি থেকে আলাদা। অর্থাৎ তিনি কখনও তার সৃষ্টির কারও সাথে মিশে যাননি, কারও ভিতরে ঢুকে পড়েননি, কারও সাথে লেগে থাকেননি। সুতরাং তাকে সত্তাগতভাবে সব স্থানে আছে বলা কুফুরী।

যে কেউ আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর উঠার বিষয়টি অস্বীকার করবে, তাকে তার সৃষ্ট আসমান ও যমীনের উপর অবস্থিত 'আরশের উপর উঠা ও সেখানে থাকার বিষয়টি মানবে না, তাকে সৃষ্টিকুল থেকে আলাদা সত্তায় সৃষ্টিকুলের বাইরে মানবে না, সে কাফির হয়ে যাবে, আল্লাহ তা'আলার লা'নতের হক্বদার হবে। কারণ, সে কুরআন ও হদীসের ভাষ্যকে অস্বীকার করছে।

আল্লাহ তা'আলার 'আরশের সামনে সৃষ্টিজগত থেকে নূরের পর্দাসমূহ রয়েছে, যার কারণে সৃষ্টি পুড়ে অঙ্গার হয়ে যাচ্ছে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ঘুমান না, তার জন্য ঘুম উপযোগীও নয়, পাল্লা উপরে উঠান এবং নিচে নামান (বান্দার আমল অনুযায়ী), তার কাছে দিনের আমল রাতে উপস্থাপন করা হয়, আর রাতের আমল দিনে তুলে ধরা হয়। তার পর্দা হচ্ছে নূরের। যদি তিনি সে পর্দা উম্মুক্ত করতেন তবে তার চেহারার আলোর ঝলকানি তার সৃষ্টির যতটুকুতে তার চোখ পড়ত সবটুকুই পুড়ে যেত।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭৯)

ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "তার সেসব পর্দা, যা দিয়ে তিনি বান্দাদের থেকে নিজেকে আলাদা রেখেছেন, তা কখনও তার বান্দাদের সবচেয়ে নিম্ন যমীনে যা আছে তা দেখতে ও শুনতে তার কোনো বাধা হয় না। (আল-'আরশ, পৃ. ২৮৯।)

ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তবে পর্দাসমূহ সৃষ্টিকুলের নিকট তার আলো আসতে বাধা দেয়। কারণ হাদীসে এসেছে, "তার পর্দা হচ্ছে নূরের। যদি তিনি সে পর্দা উম্মুক্ত করতেন তবে তার চেহারার আলোর ঝলকানি তার সৃষ্টির যতটুকুতে তার চোখ পড়ত সবটুকুই পুড়ে যেত"। এর অর্থ হচ্ছে, তার চোখ সকল সৃষ্টিকে দেখে, কিন্তু তার চেহারার আলো সেটা পর্দা দ্বারা আবৃত। (মাজমূ'উল ফাতাওয়া (৬/১০)।)

ইমাম দারেমী বলেন, যে এ পর্দার পরিমাণ নির্ণয় করতে পারবে যা দিয়ে মহা প্রতাপশালী রব পর্দার অন্তরালে রয়েছেন? কে বলতে পারবে সেটা কেমন? তবে তিনি সবকিছুকে তার ইলম বা জ্ঞানে পরিবেষ্টন করে আছেন। "সবকিছুর সংখ্যা তিনি গুণে রেখেছেন" (সূরাহ আল-জিন্ন, আয়াত: ২৮) এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, তিনি সৃষ্টিকুল থেকে আলাদা, তাদের থেকে পর্দার আড়ালে। জিবরীল 'আলাইহিস সালাম আল্লাহর নৈকট্যবান ফিরিশতা হওয়া

সত্ত্বেও সে পর্দার নিকটে যাওয়ার অধিকার রাখেন না। (দারেমী, আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যা ৩১; আল-রাদ্দু আলা বিশর আল-মারিসী ৫২৬।)

ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, "সবকিছু সম্পর্কে চিন্তা কর, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে চিন্তা করো না; কারণ সপ্তম আসমান ও তার কুরসীর মাঝখানে হাজার নূর। আর তিনি তার উপরে। (এর সনদ উত্তম। আসবাহানী, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব (২/১৭৩)।)

চিন্তা না করার কারণ হচ্ছে আল্লাহ সম্পর্কে চিন্তা করে কোনো কূল কিনারা করতে কেউ পারবে না। কারণ চিন্তাজগত কেবল সৃষ্টির মাঝেই কার্যকর হয়, স্রষ্টার মাঝে নয়। (রহমান আরশের উপর উঠেছেন-৮২-৮৬)

সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্য

আবু বকর আস-সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু (১৩ হিজরী)

"ইবন 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু হলো, তখন আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, হে মানুষেরা, যদি মুহাম্মাদ তোমাদের ইলাহ বা মা'বুদ হয়ে থাকেন, যার তোমরা ইবাদাত করেছ, তবে তোমাদের সে ইলাহ মারা গেছেন। আর যদি তোমাদের ইলাহ হয়ে থাকেন মহান আল্লাহ তা'আলা, যিনি আসমানের উপরে আছেন, তাহলে তোমাদের ইলাহ মারা যাননি। তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেন, - وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ

'মুহাম্মাদ তো কেবল একজন রাসূল, তার পূর্বেও অনেক রাসূল চলে গেছেন।' (সূরাহ আলে ইমরান: আয়াত ১৪৪)" ইবন আবী শাইবাহ, আল-মুসান্নাফ (২০/৫৬০-৫৬২), নং ৩৮১৭৬। যাহাবী, আল-উলু। অনুরূপ বর্ণনা যাহাবী, আল-আরশ।)

'উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু (২৩ হিজরী)

"উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু যখন শাম দেশে আসলেন, তখন মানুষ তাকে সাদর সম্ভাষণ জানাতে এসেছিল, তখন তিনি তার উটের উপর ছিলেন। তারা বললো, হে আমিরুল মুমিনীন, যদি আপনি কোনো দামী অনারব ঘোড়া বা খচ্চরের উপর উঠতেন কারণ আপনার সাথে গণ্যমান্য ও বড় বড় মানুষেরা সাক্ষাত করবে, তখন 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, আমি তোমাদের এখানে দেখতে চাই না। যা কিছু ঘটবে তা তো ওখান থেকেই হবে, আর তিনি

আসমানের দিকে ইঙ্গিত করলেন।" ইবন আবী শাইবাহ, আল-মুসান্নাফ (১৮/৩১৯), নং ৩৪৫৩৬; (১৯/১৩৮), নং ৩৫৫৮৪;

অপর বর্ণনায় 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু খাওলা বিনতে সা'লাবাহ এর কথা শুনার জন্য দেরী করলে একজন কারণ জিজ্ঞাসা করলে 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, "এ এমন এক মহিলা, যার অভিযোগ আল্লাহ সাত আসমানের উপর থেকে শুনেছেন, এ হচ্ছে খাওলা বিনতে সা'লাবাহ, আল্লাহর শপথ, যদি সে আমার সাথে কথা বলা ত্যাগ না করে রাত পর্যন্ত ও চালিয়ে যায় তবে আমিও তার কথা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিব না, যতক্ষণ না সে তার প্রয়োজন শেষ করছে। তবে যদি সালাতের সময় হয় তবে আমি সেটা পড়বো, তারপর আবার তার কাছে ফিরে আসব, যতক্ষণ না সে তার প্রয়োজন পূরণ করছে।" ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ পৃ.১২০।

অপর বর্ণনায় তিনি বলেছিলেন, "দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ ও শাসকের জন্য ধ্বংস, আসমানের শাসকের সামনে, যেদিন তার সাথে তার সাক্ষাত হবে।" (যাহাবী, আল-উলু নং ১৭১; আল-আরশ।)

ইমাম লালেকাঈ রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

الرَّحْمَـٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ -

"মহান আল্লাহর বাণী, 'আল্লাহ 'আরশের উপর উঠেছেন' (সূরাহ ত্বা-হা, আয়াত: ০৫) এর ব্যাপারে যা এসেছে তার বর্ণনা, আর এটার বর্ণনায় যে, নিশ্চয় আল্লাহ তার 'আরশের উপরে আসমানের উপরে।" এ আয়াত প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ তা'আলা উপরে, আর তার ইলম তার যমীন ও আসমানের সর্বত্র, আর এটি বর্ণিত হয়েছে, 'উমার ও ইবন মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে....আর এটিই ইমাম আহমাদ এর মত।" (শারহু উসূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (২/৩৮৮)। তারপর তিনি বহু আলেমের নাম বর্ণনা করেছেন, যারা এ আকীদাহ-বিশ্বাসের কথা বলেছেন।

আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু (৮ম হিজরী)

ইবন আবদুল বার বলেন, আমাদের কাছে সহীহ সনদে এসেছে যে, আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু স্ত্রীর জেরা থেকে বাঁচার জন্য যে কবিতা আবৃতি করেছিলেন তা হচ্ছে,

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য-আর জাহান্নাম কাফিরদের শেষ ঠিকানা। আর 'আরশের উপর রয়েছেন রাব্বুল আলামীন। আর নিশ্চয় 'আরশ তা তো পানির উপর ভাসছে। আর সে 'আরশকে বহন করছে শক্ত-সামর্থ্য আল্লাহর নিশান লাগানো ফিরিশতাগণ।"

তখন তার স্ত্রী বলেছিলেন, আমি আল্লাহর ওপর ঈমান আনলাম আর আমার চক্ষুকে মিথ্যা সাব্যস্ত করলাম।" (ইবন আসাকির, তারিখ(২৮/১১২, ১১৪); যাহাবী, আস-সিয়ার (১/২৩৮)।

উম্মুল মুমিনীন যায়নাব বিনতে জাহাশ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা (২১ হিজরী)

"যায়নাব রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের ওপর গর্ব করতেন এবং বলতেন, তোমাদেরকে তোমাদের পরিবার বিয়ে দিয়েছে আর আমাকে আল্লাহ স্বয়ং বিয়ে দিয়েছেন সাত আসমানের উপর থেকে।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৯৮৪।)

অপর বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলতেন, "হে নবী, রহমান তার 'আরশের উপর থেকে আমাকে আপনার সাথে বিয়ে দিয়েছেন, জিবরীল ছিলেন এ বিয়ের দুতিয়াল, আর আমি আপনার চাচাতো বোন।" (ইমাম 'আসসাল সহ আরও বর্ণনা করেছেন হাকিম, আল-মুস্তাদরাক (৪/২৭), নং ৬৭৭৭; ইবন কুদামাহ, ইসবাতু সিফাতিল 'উলু পৃ. ৯৭, নং ১৭।)

আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু (৩২ হিজরী)

আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বিভিন্নভাবে আল্লাহ তা'আলা তার 'আরশের উপর থাকার বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। যেমন,

এক বর্ণনায় এসেছে, আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "শেষ আসমান ও কুরসীর মাঝে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ' বছর এবং কুরসী ও পানির মাঝে অনুরূপ (দূরত্ব)। 'আরশ পানির উপরে আর মহান আল্লাহ 'আরশের উপরে। তার কাছে তোমাদের আমলের কিছুই গোপন থাকে না। এই হাদীস লালেকাঈ ও বাইহাকী সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। (দারেমী, আর-রাদ্দু 'আলাল জাহমিয়্যাহ, পৃ. ২৭৫; ইবন খুযাইমাহ, আত-তাওহীদ (১/২৪২-২৪৩) হা/১৪৯;)

এই হাদীস আরও বর্ণনা করেছেন আবু বকর ইবন মুনযির, আবদুল্লাহ ইবন আহমাদ ইবন হাম্বল, আবুল কাসিম ত্বাবারানী, আবু 'উমার ইবন 'আব্দিল বার, আবু 'উমার তলামানকী প্রমুখ ও আবু আহমাদ 'আসসাল। (যাহাবী, কিতাবুল 'আরশ, (অনুবাদ, আব্দুল্লাহ মাহমূদ)।

অপর বর্ণনায় এসেছে, তিনি আল্লাহর বাণী,

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ -

"তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠলেন" (সূরাহ আস-সাজদাহ, আয়াত: ০৪।) এর তাফসীরে বলেন,

"আরশ পানির উপর আর আল্লাহ 'আরশের উপর, তবে তিনি জানেন যার উপর তোমরা রয়েছ।" (সহীহ বুখারী, খালকু আফ'আলিল ইবাদ, পৃ. ৪৩ বাইহাকী, আল-আসমা ওয়াস -সিফাত (২/২৯০)।

অপর বর্ণনায় এসেছে, আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, "নিশ্চয় বান্দা কোনো ব্যবসা কিংবা শাসক হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে, সে চায় যেন তার জন্য তা সহজ করে দেয়া হোক, তখন আল্লাহ তার দিকে সাত আসমানের উপর থেকে তাকান আর ফিরিশতাদের বলেন, তাকে এ কাজ থেকে ফিরিয়ে দাও, যদি তার জন্য তা সহজ করে দিই তবে তো আমি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করালাম।" যাহাবী, আল-উলু, ১০৪; ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ১৬০।

অপর বর্ণনায় আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

"আমি তোমাদের নিকট যখন কোনো হাদীস বর্ণনা করি, তখন তোমাদের নিকট সেটার সত্যতার স্বপক্ষে আল্লাহর কিতাব থেকে প্রমাণ নিয়ে আসি। যখন কোনো বান্দা বলে, **সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, তাবারাকাল্লাহ'** তখন একজন ফিরিশতা সেগুলোকে কব্জা করে নেয়, তারপর সেগুলোকে নিয়ে উপরে উঠতে থাকে, যখনই কোনো ফিরিশতাদের মজলিস দিয়ে অতিক্রম করে যায় তখনই তারা তার প্রবক্তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে, অবশেষে সেটা নিয়ে সে রহমানের চেহারার সামনে উপস্থিত হয়। তারপর আব্দুল্লাহ তিলাওয়াত করলেন,

مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ -

"তার দিকেই উত্থিত হয় উত্তম বাক্যসমূহ, আর উত্তম আমল তিনিই উপরে উঠান"। (সূরাহ ফাতির: আয়াত ১০) (ত্বাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর, ৯/২৩৩; হাদীস নং ৯১৪৪; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, ২/৪৬১; হাদীস নং ৩৫৮৯; যাহাবী সহীহ বলেছেন।)

অপর বর্ণনায় এসেছে, "ইবন মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তিনি একথা খুতবায় বলতেন, মহান রাব্বুল আলামীন জান্নাতীদের জন্য প্রতি জুমু'য়ায় নিজেকে প্রকাশ করবেন, সাদা কর্ফুরের স্তুপে, অতঃপর তিনি জান্নাতীদের জন্য এমন সম্মান ও মর্যাদার ব্যবস্থা করবেন, যার মতো কোন কিছু তারা পূর্বে দেখেনি। আর তারা মহান রাব্বুল আলামীনের তেমন নিকটে থাকবে যেমন তারা (দুনিয়ার বুকে) জুমায় জমায়েত হওয়ার প্রতিযোগিতা করে থাকে"। (যাহাবী, আল-উলু ১০৪। সনদ জাইয়েদ)

ইব্ন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা (৬৮ হিজরী)

ইব্ন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বিভিন্ন বর্ণনায় আমরা 'আরশের উপর উঠা ও আল্লাহর 'আরশের উপরে অবস্থানের বিষয়টি দেখতে পাই। নিম্নে কয়েকটি বর্ণনা পেশ করা হলো :

ফাররা বলেন, **"সুম্মাসতাওয়া"** এর অর্থ, তারপর উপরে উঠেন। এটি ইব্ন আব্বাস বলেছেন। আর তা তোমার কোন ব্যক্তি সম্পর্কে বলা যে ব্যক্তি বসা ছিল। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়ালো। (বাইহাকী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত ২/৩১০)

ইমাম বাগাওয়ী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ইবন আব্বাস ও অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, **"সুম্মাসতাওয়া ইলাসসামায়ি"** এর অর্থ, **"ইরতাফা'আ ইলাস সামায়ি"** আকাশের উপরে উঠলেন। (তাফসির বাগওয়ী ১/৫৯)

তাছাড়া আল্লাহর বাণী,

ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ -

শয়তান বলেছিল, তারপর আমি তাদের সামনে থেকে, পিছনের দিক থেকে, ডান দিক থেকে, বাঁ দিক থেকে বণী আদমের কাছে আসব।" (সূরাহ

আল আরাফ, আয়াত-১৭) । এ আয়াতের তাফসীরে ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, "সে বলেনি, আমি তাদের উপর থেকে আসবো; কারণ সে জানে যে, আল্লাহ তা'আলাই তাদের উপরে। (আল লালকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিক্কাদি আহলিস সুন্নাহ, পৃ-৬৬১)

অনুরূপভাবে 'আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার মৃত্যুর সময় ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা তাকে বলেছিলেন, "আপনি তো ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে প্রেয়সী স্ত্রী আর তিনি পবিত্র ব্যতিত কোন কিছুকে পছন্দ করতেন না, আর আল্লাহ আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন সাত আসমানের উপর থেকে।" (দারেমী, আল রাদ্দু আলাল জাহমিয়াহ, ৮৪, হাসান সনদে)

অপর বর্ণনায় ইবন 'আব্বাস থেকে এসেছে, তিনি 'আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার গুণ বর্ণনা করছিলেন, সেখানে তিনি বলেন, " আর আল্লাহ আপনার পবিত্রতা সাত আসমানের উপর থেকে নাযিল করেছেন, যা জিবরীল আমীন নিয়ে এসেছেন, ফলে এমন হয়েছে যে, আল্লাহর এমন কোন মাসজিদ নেই যেখানে আল্লাহর কথা স্মরণ করা হয়, সেখানেই দিনের প্রান্তে ও রাতের বিবিধ প্রহরে সেটা তিলাওয়াত করা হয়। তখন 'আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা বললেন, হে ইবন আব্বাস, সেটা তুমি ছাড়, যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, আমি আশা করতাম যদি আমি বিস্মৃত ভূলে যাওয়া জিনিস (তুচ্ছ বস্তু) হতে পারতাম। (মুসনাদ আহমদ ৪/২৯৮, নং ২৪৯৬)

অপর বর্ণনায় এসেছে, ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন,

"আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস বলেন, তোমরা সবকিছু নিয়ে গবেষণা করো, আল্লাহর সত্তা নিয়ে গবেষণা করো না। কেননা আসমান সমূহ ও তাঁর কুরসীর মাঝে সাত হাজার নূর আছে। আর আল্লাহ তা'আলা এসবের উপরে।" এই হাদীস ইবন 'আব্বাস থেকে হাসান সনদে বাইহাকী বর্ণনা করেছেন আল-আসমা ওয়াস-সিফাত গ্রন্থে, অনুরূপভাবে আবুশ শাইখ আসবাহানী, আল-'আযামাহ গ্রন্থে এবং অন্যান্যগণও বর্ণনা করেছেন। (ইবন আবী শাইবাহ, কিতাবুল আরশ, নং ১৬, আসবাহানী, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/১৭৩)

অপর বর্ণনায় আবু মালিক, আবু সালেহ বর্ণনা করেন ইবন আব্বাস 'আব্বাস থেকে এবং মুররা বর্ণনা করেন ইবন মাসউদ এবং বেশ কয়েকজন সাহাবী থেকে, আল্লাহর বাণী **সুম্মাস তাওয়া ইলাস সামায়ি** এর অর্থে এসেছে,

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ছিলেন পানির উপরে, তার আরশের উপরে। পানির পূর্বে তিনি কিছুই সৃষ্টি করেননি। তিনি যখন সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করতে চাইলেন, তখন পানি থেকে ধোঁয়া বের করলেন। ধোঁয়া পানির উপরে উঠলো এবং উপরে থেকে গেল, অতঃপর তিনি তার নাম রাখলেন সামা বা আসমান। এরপর তিনি শুকালেন ও তাকে যমীন করে দিলেন। তারপর তা আলাদা করে সাত যমীন বানিয়ে দিলেন। আরও বলেছেন, তিনি যা সৃষ্টি করতে পছন্দ করেছিলেন তা থেকে ফারেগ হয়ে 'আরশের উপরে উঠলেন।"

ইমাম যাহাবী বলেন, এ হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবন জারীর আত-তাবারী তার তাফসীরে মূসা ইবন হারুন থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের বর্ণনা করেছেন 'আমর ইবন হাম্মাদ, তিনি বলেন, আমাদের বর্ণনা করেছেন আসবাত্ব, সুদ্দী থেকে। (তাবারী, আত-তাফসীর ১/৪৩৫-৪৩৬, ইবন কাসীর, আত-তাফসীর ১/৬৭-৬৮)

হাদীসে বলা হলো, সমস্ত সৃষ্টির পূর্বে 'আরশ সৃষ্টি করা হয়। তারপর 'আরশ সৃষ্টির পর আল্লাহ তার উপর উঠেন। এর মতো আল্লাহর বাণী হচ্ছে; " আর তিনিই এমন সত্তা যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে, আর তাঁর আরশ ছিল পানির উপর।"

হাসান বসরী রহিমাহুল্লাহ (১১০ হিজরী)

প্রখ্যাত তাবে'য়ী হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি সূরাহ আল-বাকারার ২৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, " তারপর তিনি আসমানের উপর ইস্তেওয়া করলেন, তিনি বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, উপরে উঠলেন।" (ইবন আবী হাতেম, আত-তাফসীর ১/৭৫,৬/১৯২৫)

অনুরূপভাবে তিনি ইসরাফীল 'আলাইহিস সালামকে আল্লাহর সবচেয়ে নিকটতম সৃষ্টি বলেছেন, যিনি 'আরশের নিচে মাথা রেখে আছেন। হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহু বলেন,

"তোমার রবের সবচেয়ে নিকটে আর কোন সৃষ্টি নেই। তার ও তার রবের মাঝে সাতটি পর্দা। প্রত্যেক পর্দার দূরত্ব পাঁচশত বছরের, আর ইসরাফীল তাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকটে, তার মাথা 'আরশের নিচে, তার দু'পা সপ্তম যমীনের সীমানায়।" (ইবন কুদামা, ইসবাতু সিফাতিল 'উলূ, পৃ ১৬১,১৬২, নং ৭০)

তাছাড়া ইমাম ইবন কুদামাহ আল-মাকদেসীও হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহু থেকে বর্ণনা করেন, যাতে তিনি ইউনুস 'আলাইহিস সালামের দো'আ বর্ণনা করেছেন, যেখানে আল্লাহ তা'আলার উপরে অবস্থান করার কথাটি বর্ণিত হয়েছে। (ইবন কুদামা, ইসবাতু সিফাতিল উলূ, ৫৯)

ইমাম আবু হানীফা নু'মান ইবন সাবিত রাহিমাহুল্লাহ (১৫০ হিজরী)

আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ ঊর্ধ্ব আকাশের সুরাইয়া তারকার মতো ব্যক্তিত্ব। এ মহান ব্যক্তিত্বের রয়েছে আকীদাহ'র ক্ষেত্রে স্বচ্ছ ভাষ্য। কিন্তু তার পরবর্তী অনুসারীদের মধ্যে জাহমী, মু'তাযিলী ও মাতুরিদী আকীদাহ,র প্রভাব বেশি হওয়ার কারণে তারা তার অনেক ভাষ্যকে নিজেদের মত করে ব্যাখ্যা করেছে, অস্বীকার করেছে, অংশ বিশেষ বাদ দিয়ে দিয়েছে। আবার কেউ কেউ তাকে বিশুদ্ধ আকীদাহ থেকে ভিন্ন কিছু সাব্যস্ত করার জন্য যাবতীয় প্রচেষ্টা নিবদ্ধ করেছে। তারা তার সেসব বক্তব্যের অপব্যাখ্যা করার জন্য চেষ্টা চালিয়া যাচ্ছে। যে বক্তব্যগুলোর মাধ্যমে তিনি কুরআন ও হাদীসের প্রকাশ্য শত শত ভাষ্য এবং তার পূর্ববর্তী বিশুদ্ধ আকীদাহ-বিশ্বাসের ধারক-বাহক সাহাবায়ে কেরাম, বড় বড় তাবে'য়ীগণের মতের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে প্রদান করে সোনালী চেইনের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। এ মহান ব্যক্তিত্ব প্রকৃতই একজন সংস্কারক ছিলেন, মাযলূম, অপবাদ আরোপকৃত। আমরা এ ইমামের সেসব বক্তব্য এখানে বর্ণনা করব যা তার থেকে বিশ্বস্ত লোকেরা বর্ণনা করেছে, যা কেউ পরিবর্তন করেনি বলে আমাদের বিশ্বাস হয়েছে, যা একজন ইমামের শানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আল্লামা আবুল মা'আলী মাহমূদ শুকরী আল-আলুসী বলেন, আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ আর রহমানু আলাল আরশিস তাওয়া এর তাফসীরে বলেছেন অর্থাৎ উপরে উঠেছেন। (গায়াতুল আমানী ফির রাদ্দি আলান নাবহানী (১/৪৬০)।

আবু মুতী' হাকাম ইবন আবদুল্লাহ বালখী আল-ফিকহুল আকবার -এ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,

"আমি আবু হানীফাকে জিজ্ঞাসা করলাম এমন ব্যক্তি সম্পর্কে যে বলে, আমি জানি না আমার রব আসমানের উপর না যমীনে? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি স্বীকার করলো না আল্লাহ 'আরশের উপরে, সে কুফুরী করলো। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "পরম করুণাময় 'আরশের উপর উঠেছেন।" তার

‘আরশ সাত আসমানের উপরে। আমি বললাম: যদি সে বলে- তিনি আরশের উপর উঠেছেন, কিন্তু জানি না আরশ আসমানের উপরে না জমিনে। তিনি বললেন- ‘আরশ আসমানের উপরে থাকাকে যে অস্বীকার করলো, সে কুফুরী করলো।” আল-কিকহুল আবসাত্ব পৃ. ৪৯; শারহুল আবসাত্ব লিস সামারকান্দী পৃ.১৭।

উল্লেখ্য যে, এ বর্ণনাটি ইবন তাইমিয়্যাহ’র ইমাম ইবনুল কাইয়্যেমের বিভিন্ন গ্রন্থে এবং ইমাম যাহাবীর আল-উলূ ও আল-‘আরশ গ্রন্থে এভাবে এসেছে। তাছাড়া তা ইমাম ইবন আবিল ইযয আল-হানাফীও শারহুত তাহাওয়িয়্যাহ গ্রন্থেও তা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বর্তমান ফিকহুল আবসাত্ব এর যে ব্যাখ্যাগ্রন্থ দেখতে পাওয়া যায় তাতে মতন, শরহ ও হাশিয়া একসাথে লেখায় বিভ্রান্তির উৎপত্তি হয়েছে। ফলে কোনো কট্টর জাহমী হানাফী এ বর্ণনাকে অস্বীকার করতে দুঃসাহস করেছে। (আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ‘র আকীদাকে বিকৃত করার ব্যাপারে আরও বিস্তারিত জানতে ইবন আবিল ইয এর শারহুত তাহাওয়িয়্যাহ পড়ুন, পৃ. ২৮৮; শাইখ মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দীন আল-আলবানী, মুখতাসারুল উলূ, ১৩৬-১৩৭, নং ১০৩।)

এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, তিনি বলেছেন, “যে কেউ আল্লাহ তা‘আলার উপরে থাকাকে অস্বীকার করবে সে কাফের হয়ে যাবে”। (ইমাম যাহাবী, আল-উলু ১০১-১০২; আল-আরশ ২/২২৭ অনুবাদ, আব্দুল্লাহ মাহমূদ।)

তদ্রূপ মোল্লা আলী-কারী বর্ণনা করেন, ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ তাঁর ওয়াসিয়্যাহ কিতাবে বর্ণনা করেন,“আমরা স্বীকৃতি দিই যে, আল্লাহ তা‘আলা ‘আরশের উপর উঠেছেন, তবে সেটার প্রতি প্রয়োজনীয়তা কিংবা সুস্থিরতার জন্য, তিনিই তো ‘আরশ ও ‘আরশ ব্যতীত সবকিছুর সংরক্ষক। যদি তিনি মুখাপেক্ষী হতেন তাহলে জগত সৃষ্টি ও তা পরিচালনা করতে সক্ষম হতেন না, সৃষ্টির মতো। আর যদি তার বসা কিংবা সুস্থির হওয়ার প্রয়োজন হতো তবে ‘আরশের সৃষ্টির পূর্বে তিনি কোথায় ছিলেন? সুতরাং তিনি তা থেকে পবিত্র, অতি উঁচু।” (শারহুল ফিকহিল আকবার পৃ. ৬১; কিতাউল ওয়াসিয়্যাহ, ২৬।)

মোল্লা আলী আল-ক্বারী রাহিমাহুল্লাহ আরও বলেন’

"জেনে রাখ যে, ইমামে আ'যম আল-ফিকহুল আকবার গ্রন্থটি তার জীবদ্দশায় গ্রন্থিত করেছেন। অপরদিকে 'আল-ওসিয়্যাহ কিতাবটি মৃত্যুর সময় গ্রন্থিত করেছেন।" (শারহুল ফিকহিল আকবার পৃ.১৬৯।)

ইমাম আবদুর রহমান আল-আওযা'ঈ রহিমাহুল্লাহ (১৫৭ হিজরী)

ইমাম আবদুর রহমান আল-আওযা'ঈ রহিমাহুল্লাহ হচ্ছেন, তাবে তাবে'য়ীগণের বিখ্যাত চারজন আলেমের একজন। যাদেরকে বলা হতো, মালিক; হিজাযবাসীদের ইমাম, আওযা'ঈ; শামবাসীদের ইমাম, লাইস; মিসরবাসীদের ইমাম, সাওরী; ইরাকবাসীদের ইমাম। তার সময়ে যখন আল্লাহর 'আরশের উপর উঠার গুণটি অস্বীকার করার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল তখন তিনি আল্লাহর গুণের ব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছিলেন। যেমন,

মুহাম্মদ ইবন শু'আইব ইবন সাবূর থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, "এক লোক ইমাম আওযা'ঈকে (আর-রহমান 'আলাল 'আরশিস্তাওয়া) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, 'তিনি তার 'আরশের উপর' যেভাবে তিনি বলেছেন, আর আমি তো তোমাকে পথভ্রষ্ট ব্যক্তিই দেখতে পাচ্ছি।" (তাফসীর আস-সা'লাবী (৪/২৩৯)।

তার থেকে আরও বর্ণিত আছে তিনি বলেছেন, "আমরা ও তাবে'য়ীগণ পর্যাপ্ত পরিমাণ ছিলাম। আমরা বলতাম- "আল্লাহ তার 'আরশের উপর এবং সুন্নাহ'য় আল্লাহর যেসব গুণ বর্ণিত হয়েছে, তার প্রতি আমরা ঈমান রাখি।" এ বক্তব্য বাইহাকী 'আল-আসমা ওয়াস-সিফাত' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এর রাবীগণ- ইমাম ও নির্ভরযোগ্য। (বাইহাকী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত (২/৩০৪), নং ৮৬৫; ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ, পৃ. ২২৯।)

ইমাম মালিক ইবন আনাস রহিমাহুল্লাহ (১৭৯ হিজরী)

জা'ফার ইবন আবদুল্লাহ বলেন, এক লোক ইমাম মালিক ইবন আনাস রহিমাহুল্লাহ এর কাছে এসে বললেন,

'হে আবু আব্দিল্লাহ, (সুম্মা ইস্তাওয়া 'আলাল 'আরশ) তিনি কীভাবে ইস্তাওয়া করলেন ? জা'ফার ইবন আবদুল্লাহ বলেন, আমি ইমাম মালিককে কোনো কথায় এত কষ্ট পেতে দেখিনি যে কষ্ট তিনি এ কথার দ্বারা পেয়েছিলেন। এমনকি তিনি ঘর্মাক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। উপস্থিত সবাই মাথা নিচু করে রাখলো। জা'ফার ইবন আবদুল্লাহ বলেন, **আল কাইফু গইরু মা'ক্বুলিন অল ইস্তিওয়াউ মিনহু গইরু মাজহুলিন অল ঈমানুউ বিহী ওয়াজিবুন**

অস সুউওয়ালু আনহু বিদআতুন অর্থাৎ এরপর ইমাম মালিক এর অবস্থা স্বাভাবিক হয়, তখন তিনি বলেন, "ধরন তো বিবেকের যুক্তি ধারণ করতে পারে না, তার ইস্তেওয়া ('আরশের উপর উঠার) বিষয়টি অজানা নয়। তার ওপর ঈমান আনা ফরয আর সেটা (ধরন) সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদ'আত।" আমার তো আশঙ্কা হচ্ছে তুমি পথভ্রষ্ট কেউ হবে। তারপর তাকে বের করে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হলো, ফলে তাকে বের করে দেয়া হলো। " (আল-আজুররী, আশ-শরী'আহ নং ৭২০।)

অপর বর্ণনায় এসেছে, আহমাদ ইবন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন সুরাইজ ইবনুন নু'মান, তিনি বলেন, আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবন নাফে', তিনি বলেন, আমাদেরকে মালিক রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা সর্বোপরে, আর তার জ্ঞান সব জায়গায়, কোনো স্থান তার জ্ঞানের আওতার বাইরে নয়।" (আজুররী, আশ-শরী'আহ: নং ৭২০; যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৮/১০১)।

শাইখুল ইসলাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহিমাহুল্লাহ (১৮১ হিজরী)

ইমাম বুখারীর শিক্ষক আলী ইবন হাসান ইবন শাকীক রহিমাহুল্লাহ থেকে প্রমাণিত, তিনি বলেন,

"আমি 'আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারককে বললাম: আমাদের মহান রবকে আমরা কীভাবে চিনবো? তিনি বললেন: সপ্তম আসমানের ঊর্ধ্বে তার 'আরশের উপরে, তার সৃষ্টিকুল থেকে পৃথক।" (আদ-দারেমী, আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ পৃ. ৬৭; সহীহ সনদে; যাহাবী, আল-আরশ, ২/২৩৯; অনুবাদ, আব্দুল্লাহ মাহমূদ।)

অন্য বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেছেন, "সপ্তম আসমানের ঊর্ধ্বে তার 'আরশের উপরে। আমরা জাহমিয়্যাদের মতো বলবো না, তিনি এ যমীনে।" (সহীহ বুখারী, খলকু আফ'আলিল 'ইবাদ, পৃ.৩০;)

এ ব্যাপারে আহমাদ ইবন হাম্বলকে বলা হলে তিনি বললেন, এটাই আমাদের মত। (ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমু'উল ফাতাওয়া (৫/২৫)

অপর বর্ণনায় আলী ইবনুল হুসাইন ইবন শাকীক বলেন, "আমি ইবনুল মুবারককে জিজ্ঞাসা করলাম, আমাদের রবের পরিচয় আমাদের কীভাবে তুলে ধরা উচিৎ? তিনি বললেন: সপ্তম আসমানের ঊর্ধ্বে তার 'আরশের

উপরে। আমরা জাহমিয়্যাদের মতো বলবো না, তিনি এ যমীনে।" (যাহাবী, আল-'উলূ, পৃ. ১১০; আস-সিয়াব (৮/৪০২-৪০৩)।

অপর বর্ণনায় এসেছে, এক লোক ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞেস করেন, "হে আবু আবদুর রহমান, আমি এত পরিমাণ আল্লাহর কাছে জাহমিয়্যাদের বিরুদ্ধে বদ-দো'আ করে যাচ্ছি যে, আমি আল্লাহর (তাদের উপর 'আযাবের) ভয় করছি, তখন ইবনুল মুবারক বললেন, ভয় পেয়ো না; কারণ তারা মনে করছে, তুমি যে আল্লাহকে আসমানের উপর আছে বলছ সেটা কিছুই না।" (ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া (৫/১৮৪); যাহাবী, আল-'উলূ, পৃ. ১১; আল-'আরশ (২/২৪২)।

"প্রত্যেক জাতি গোষ্ঠীই যার ইবাদাত করে তাকে চিনে, কিন্তু জাহমিয়্যারা তার ব্যতিক্রম (তারা তাদের রবকে চিনে না; কারণ রব কোথায় আছেন সেটাই জানে না)।" (৩৭৪) ইমাম বুখারী, খালকু আফ'আলিল ইবাদ, পৃ.৩৮)

ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইদরীস আশ-শাফে'য়ী রহিমাহুল্লাহ (২০৪ হিজরী)

ইমাম শাফে'য়ী আল-মুত্তালেবী রাহিমাহুল্লাহ, বিখ্যাত চার ইমামের একজন। তিনি ইমাম মালিকের ছাত্র আর ইমাম আহমাদের উস্তাদ। এখানে এ জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তির বিভিন্ন উক্তি দিয়ে আমরা জাহমিয়্যাহ ও তাদের মতো যারা মত পোষণ করে তাদের মতামত খন্ডন করব।

ইমাম শাফে'য়ী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর খিলাফত হক্ব ও সত্য; যা আল্লাহ তা'আলা আসমানের উপর থেকে ফয়সালা করেছেন আর তিনিই তার বান্দাদেরকে এর ওপর ঐকমত্যে পৌঁছার তাওফীক দিয়েছেন।" (ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ.১৬৫।)

তিনি আরও বলেন, "আমি যে নীতির ওপরে আছি এবং আমার দেখা সুফইয়ান, মালিক প্রমুখদের মতো আহলে হাদীসদের যে নীতির ওপর পেয়েছি, তা হলো "আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো ইলাহ নেই আর নিশ্চয় মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল" - এ শাহাদাতের স্বীকারোক্তি দেয়া। এরপর তিনি আরও অনেক কিছু উল্লেখ করেন। অতঃপর তিনি বলেন, আল্লাহ তার আসমানে তার 'আরশের উপরে। তিনি সৃষ্টিকুলের নিকটবর্তী হন যেভাবে ইচ্ছা করেন এবং দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন যেভাবে ইচ্ছা করেন। এভাবে তিনি সমস্ত

আকীদাহ উল্লেখ করেন।" (যাহাবী, আল-'উলূ, পৃ. ১২০; আল-আরশ, ২/২৯০।)

হাসান ইবন হিশাম আল-বালাদী বলেন, নিম্নের অসিয়তটি মুহাম্মাদ ইবন ইদরীস আশ-শাফে'য়ীর-

"ইমাম শাফে'য়ী অসিয়ত করেন, সাক্ষ্য দিবে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো ইলাহ নেই, তার কোনো শরীক নেই। সে অসিয়তে আরও রয়েছে, কুরআন আল্লাহর কালাম, মাখলূক নয়, আল্লাহকে কিয়ামতের দিন স্বচক্ষে দেখা যাবে, তার দিকে মুমিনরা তাকাবেন, তার কথা শুনবেন, আর আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপর রয়েছেন। এরপর তিনি গোটা অসিয়ত উল্লেখ করেন, যা বর্ণনা করেছেন হাক্কারী ও হাফিয আবদুল গনী তার আকীদাহ গ্রন্থে। (যাহাবী আল-'উলূ, পৃ. ১২০ আল-আরশ, ২/২৯০; অনুবাদ, আব্দুল্লাহ মাহমূদ; ইবনুল কাইয়্যেম, মুখতাসার সাওয়াইক (২/২১২-২১৩)।

ইবন আবী হাতিম বলেন, আমি ইউনুসকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি ইমাম শাফে'য়ীকে বলতে শুনেছি, আল্লাহর রয়েছে অনেক নাম ও গুণাবলি। দলীল দ্বারা প্রমাণিত হওয়ায় কারো সুযোগ নেই তা প্রত্যাখ্যান করা। দলীল দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার পরে কেউ তার বিরোধিতা করলে সে কাফির। আর দলিল দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার পূর্বে করলে অজ্ঞতার ওজর রয়েছে। কেননা নাম ও গুণাবলির জ্ঞান বিবেক-বুদ্ধি, দর্শন ও চিন্তা-ভাবনা দ্বারা অর্জন হয় না। আমরা এসব গুণাবলি সাব্যস্ত করি এবং তার থেকে সাদৃশ্যকে অস্বীকার করি, যেমনিভাবে আল্লাহ নিজের থেকে অস্বীকার করেছেন। আল্লাহ বলেছেন, **লাইসা কামিছলিহী শাইউন ওয়াহুঅস সামিউল বাসির** "তার মতো কোনো কিছুই নেই, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।" (যাহাবী, আল-'উলূ, পৃ. ১২১; আল-আরশ ২/৩১০।)

সাহাবী বলেন, এটি শাইখুল ইসলাম আবুল হাসান আল-হাক্কারী বর্ণনা করেছেন শাফে'য়ীর আকীদায়, তাছাড়া অন্যরাও তা বর্ণনা করেছেন। সনদের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।

তাছাড়া ইমাম শাফ'য়ী রাহিমাহুল্লাহ সে বিখ্যাত হাদীসটি তার মুসনাদে বর্ণনা করেন, যাতে জুমু'আর দিন সম্পর্কে এসেছে, এটি সেদিন, যেদিন তোমাদের রব 'আরশের উপর উঠেছেন।" (আশ-শাফে'য়ী, আল-মুসনাদ, পৃ.০৭।)

ইমাম শাফে'য়ীর এ ধরনের অনেক বক্তব্য রয়েছে। শাইখুল ইসলাম আবুল হাসান আল-হাক্কারী, হাফিয আবু মুহাম্মাদ আবদুল গনী, আবুল হাসান ইবন শুকর ও অন্যান্যগণ উসূল ই'তিকাদ-এ ইমাম শাফে'য়ীর বক্তব্যগুলো জমা করেছেন, যা মানুষের নাগালে রয়েছে। (রহমান আরশের উপর উঠেছেন-১৮৫)

ওয়াহাব ইবন জারীর রহিমাহুল্লাহ (২০৬ হিজরী)

ওয়াহাব ইবন জারীর ইবন হাযেম আল-মুহাদ্দিস, আবুল 'আব্বাস আল-আযদী, তাদের মাওলা। বসরার অধিবাসী। অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী, তিনি বলেন,

"সাবধান! তোমরা জাহমের মত থেকে বেঁচে থাকবে, তারা বলতে চায়, আসমানের উপর কিছু (আল্লাহ) নেই, এটা তো ইবলিসের শেখানো বুলি ছাড়া আর কিছু নয়, এটা কুফুরী ছাড়া আর কিছু নয়।" (ইবন কুদামা আল-মাকদেসী, আল-'উলূ, পৃ.১০১; যাহাবী আল-'উলূ, পৃ. ১১৮; আল-'আরশ (২/২৬৮)।

অপর বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, "জাহমী যিন্দীকরা এটাই বলতে চায় যে, তিনি 'আরশের উপর উঠেননি।" (বুখারী, খালকু আফ'আলিল 'ইবাদ, পৃ. ৩০।)

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ (২৪১ হিজরী)

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইমাম, যিনি জাহমিয়্যাদের বিরুদ্ধে একাই পাহাড়সম দাঁড়িয়েছিলেন, যার দিকে সম্পর্কযুক্ত হতে পারা ঈমানদারের জন্য গর্বের বিষয়। যার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকে অন্তরের বক্রতা হিসেবে ধর্তব্য, যিনি মহান আল্লাহর 'আরশের উপর উঠা এবং 'আরশের উপর থাকা সংক্রান্ত আকীদায় তারই মতো আরও ইমাম যেমন আবু হানীফা, আওজা'ঈ, সুফইয়ান সাওরী, মালিক ও শাফে'য়ীসহ অন্যান্য মহৎ ব্যক্তিত্বের অনুরূপ বক্তব্য প্রদান করেছেন। নিম্নে আমরা তার কয়েকটি নমুনা তুলে ধরছি:

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল আর-রাদ্দু 'আলায যানাদিকাতি ওয়াল জাহমিয়্যাহ গ্রন্থে বলেন, সে গ্রন্থ সংকলন ও বর্ণনা করেছেন তার সন্তান আবদুল্লাহ-

"অধ্যায়: জাহমিয়্যারা আল্লাহর 'আরশের উপরে থাকাকে অস্বীকার করে। আমি তাদেরকে বললাম, তোমরা আল্লাহর 'আরশের উপরে থাকাকে অস্বীকার করো। অথচ আল্লাহ বলেন, "পরম করুণাময় 'আরশের উপর উঠেছেন" তারা বললো, আল্লাহ সাত যমীনের নিচে যেমনটি তিনি 'আরশের উপরে, আসমানে, যমীনে। আমরা বললাম, মুসলিমরা এমন অনেক স্থান জানে যেখানে রবের মহত্ত্বের কিছুই নেই। তোমাদের দেহে, তোমাদের ভিতরে, পায়খানায় ও খারাপ স্থানে আল্লাহর মহত্ত্বের কিছুই নেই। আল্লাহ আমাদের জানিয়েছেন, তিনি আসমানের উপরে। আল্লাহ বলেন, "যিনি আসমানে আছেন, তিনি তোমাদের সহ যমীন ধসিয়ে দেয়া থেকে কি তোমরা নিরাপদ হয়ে গেছ, অতঃপর আকস্মিকভাবে তা থর থর করে কাঁপতে থাকবে? যিনি আসমানে আছেন, তিনি তোমাদের উপর পাথর নিক্ষেপকারী ঝড়ো হাওয়া পাঠানো থেকে তোমরা কি নিরাপদ হয়ে গেছ?" "তারই পানে উত্থিত হয় ভালো কথা আর নেক আমল তিনি তা উপরে উঠান।" "নিশ্চয় আমি তোমাকে পরিগ্রহণ করব, তোমাকে আমার দিকে উপরে উঠিয়ে নিবো।" "বরং আল্লাহ তার কাছে তাকে তুলে নিয়েছেন।" "তারা তাদের উপরস্থ রবকে ভয় করে।" এভাবে আল্লাহ সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি আসমানের উপরে।

ইমাম যাহাবী বলেন, আবু বকর আল-খাল্লাল আস-সুন্নাহতে পুরোটাই বর্ণনা করেছেন। অধিকাংশরা ভিন্ন ভিন্নভাবে একাধিক জায়গায় বর্ণনা করেছেন। কাযী আবু ইয়া'লা আল-ফাররা ইবতালুত তাবীল গ্রন্থে তা বর্ণনা করেছেন। (আর-রাদ্দু 'আলাল জাহমিয়্যাহ, ৯২-৯৩; ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, ২০১-২০২।)

অনুরূপভাবে মারওয়াজী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি আবু 'আবদুল্লাহ আহমাদ ইবন হাম্বলকে বললাম, এক ব্যক্তি বলে "আমি বলবো যেমন আল্লাহ বলেছেন "তিনজনের কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন হিসেবে আল্লাহ থাকেন না" আমি এতটুকুই বলবো, এর বেশি বলবো না।"

আহমাদ ইবন হাম্বল বললেন, এটা জাহমিয়্যাদের কথা। আমি বললাম, তাহলে আমরা কীভাবে বলবো? তিনি বললেন, "তিনজনের কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন হিসেবে আল্লাহ থাকেন না" আর পাঁচজনের ও হয় না, যাতে ষষ্ঠজন হিসেবে তিনি থাকেন না।" আল্লাহর জ্ঞান সর্বত্র, আল্লাহর জ্ঞান তাদের সাথে। তারপর আরও বললেন, আয়াতের প্রথমাংশ প্রমাণ করে, তিনি তাদের সাথে মানে তার ইলম তাদের সাথে।

এটি ইবন বাত্তাহ 'উমার ইবন মুহাম্মাদ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবন দাউদ, তিনি মারওয়াযী থেকে। ইবানাহ (৩/১৬০-১৬১), নং ১১৭; যাহাবী, আল-'উলূ, পৃ.১৩০; আল-আরশ ২/৩১৪, অনুবাদঃ আব্দুল্লাহ মাহমূদ; ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ২০১।)

অপর বর্ণনায় এসেছে, "ইমাম আহমাদকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল সে ব্যক্তি সম্পর্কে যে বলেন, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন আর তিলাওয়াত করে, ("তিনজনের কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন হিসেবে আল্লাহ থাকেন না) তখন ইমাম আহমাদ বলেন, সে তো জাহমীদের মত অবলম্বন করেছে, তারা আয়াতের শেষের অংশ নিয়েছে, প্রথম অংশ ছেড়ে দিয়েছে, আল্লাহ জানেন...) (সূরাহ আল-মুজাদালাহ, আয়াতঃ ০৭) সুতরাং তার ইলম বা জ্ঞান তাদের সাথে। আর আল্লাহ তা'আলা সূরাহ 'ক্বাফ' এ বলেন, (আমরা জানি তা তার (মানুষের) অন্তরে ওয়াসওয়াসা হিসেবে আসে, আর আমরা তার নিকটে তার ঘাড়ের শিরার চেয়েও) সুতরাং তার ইলম (জ্ঞান) তাদের সাথে।" (যাহাবী আল-'উলূ, পৃ. ৩০; ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমাউল জুয়ূশিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৭৭।)

হাম্বাল ইবন ইসহাক্ব বলেন, "আমি আবু আবদুল্লাহ আহমাদ ইবন হাম্বলকে বললাম, আল্লাহর বাণীঃ "তিনি তোমাদের সাথে" ও "তিনজনের কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন হিসেবে আল্লাহ থাকেন না" - এর অর্থ কী? তিনি বললেন, তার জ্ঞান সবকিছুকে বেষ্টন করে আছে। আমাদের রব 'আরশের উপরে, পরিধি ও ধরন জানা ছাড়াই। এটি লালেকাঈ আস-সুন্নাহ'তে বর্ণনা করেছেন। (আস-সুন্নাহ (৩/৪০২), নং ৬৭৫; ইবনে কুদামাহ, ইসবাতু সিফাতিল 'উলূ, পৃ. ১১৬ নং ৯৫;)

ইউসুফ ইবন মূসা আল-কাত্তান বলেন, "আহমাদ ইবন হাম্বলকে বলা হলো, আল্লাহ সাত আসমানের উর্ধ্বে তার 'আরশের উপরে, তার সৃষ্টি থেকে আলাদা, তার জ্ঞান ও ক্ষমতা সর্বত্র? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি তার 'আরশের উপর, কোনো কিছু তার জ্ঞানের অগোচরে নয়।" এটি খাল্লাল ইউসুফ থেকে বর্ণনা করেছেন। (ইবন বাত্তাহ, আল- ইবানাহ (৩/১৫৯) হা ১১৫।)

ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী রহিমাহুল্লাহ (২৫৬ হিজরী)

ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ তার সহীহ'র শেষের অনুচ্ছেদ; 'আর-রাদ্দু 'আলাল জাহমিয়্যা'য় আল্লাহর বাণী: **ওয়া কানা আরশুহু আলাল মায়ি** "আর আল্লাহর 'আরশ পানির উপরে ছিল"- অধ্যায়ে ইমাম বুখারী বলেন, আবুল 'আলিয়াহ বলেন, **ইস্তিওয়াহ ইলাস সামায়ি** অর্থাৎ আসমানের উপরে উঠেছেন এর অর্থ হচ্ছে, ইরতাফাআহ উপরে উঠেছেন। মুজাহিদ বলেন, আলা আলাল আরশি 'আরশের উপরে হয়েছেন। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী যয়নাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন, 'আমার বিবাহ দিয়েছেন আল্লাহ সাত আসমানের উপর থেকে।' (সহীহ বুখারী পৃ. ১৫৫৪-১৫৫৫।)

অনুরূপভাবে তিনি সেসব আয়াতও উল্লেখ করেছেন যাতে আমলনামা আল্লাহ তা'আলার দিকে উত্থিত হয় বুঝা যায়।

তদ্রূপ তিনি অনুচ্ছেদ বিন্যাস করেছেন,

অনুচ্ছেদ, আল্লাহর বাণী, "তার কাছেই উত্থিত হবে উত্তম কালেমাসমূহ"। (সূরাহ ফাতির: ১০) যার মাধ্যমে তিনি আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর উপরে সাব্যস্ত করেছেন।

অনুচ্ছেদ, আল্লাহর বাণী, "যা আমি নিজ দু'হাতে সৃষ্টি করেছি।" (সূরাহ সাদ: ৭৫) যার মাধ্যমে তিনি আল্লাহর দু'হাত সাব্যস্ত করেছেন।

অনুচ্ছেদ, আল্লাহর বাণী, "যাতে আপনি আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হতে পারেন।" (সূরাহ ত্বা-হা: ৩৯) যার মাধ্যমে তিনি আল্লাহর চোখ সাব্যস্ত করেছেন।

অনুচ্ছেদ, আল্লাহর বাণী, "আর আল্লাহ তোমাদেরকে তার সত্তার ব্যাপারে ভয় দেখাচ্ছেন" (সূরাহ আলে ইমরান: ২৮) এর মাধ্যমে তিনি আল্লাহর জন্য সত্তা, নফস, ব্যক্তি গুণ সাব্যস্ত করেছেন।

অনুচ্ছেদ, আল্লাহর বাণী, "সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে কেবল তার চেহারা ব্যতীত" (সূরাহ আল-ক্বাসাস: ৮৮) এর মাধ্যমে তিনি আল্লাহ তা'আলার চেহারা সাব্যস্ত করেছেন।

অনুচ্ছেদ, আল্লাহর বাণী, "বলুন, সাক্ষী হিসেবে বড় জিনিস কী" (সূরাহ আল-আন'আম: ১৯) এর মাধ্যমে তিনি নিজেকে জিনিস সাব্যস্ত করেছেন।

অনুচ্ছেদ- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী কোন ব্যক্তি মহান আল্লাহ তাআলার চেয়ে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নেই" (বুখারী, ৭৪১৬) এর মাধ্যমে তিনি আল্লাহর জন্য ব্যক্তি শব্দের ব্যবহার সাব্যস্ত করেছেন।

অনুচ্ছেদ, আল্লাহর বাণী, "আর তার আরশ পানির উপর" (সূরাহ হূদ: ৭) "তিনি মহা 'আরশের রব"। (সূরাহ আত- তাওবাহ: ১২৯) এর মাধ্যমে তিনি আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর উপরে হওয়া, 'আরশের উপরে তার উঠা, 'আরশের উপরে তার নিজেকে সমুন্নত করা, এ ব্যাপারে আবুল আলিয়া, মুজাহিদের বর্ণনা নিয়ে আসেন। তারপর তিনি আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর থাকা সংক্রান্ত হাদীসসমূহ নিয়ে আসেন।

অনুচ্ছেদ, আল্লাহর বাণী, "প্রতিদিন তিনি কোনো কাজে থাকেন" (সূরাহ আর-রহমান: ২৯).. আল্লাহর বাণী, "যাতে করে আল্লাহ তা'আলার কর্ম সাব্যস্ত করেন, তিনি এখনও প্রতিনিয়ত তার কাজ করে যান, যা ইচ্ছা তিনি নতুন করে করেন সে গুণ সাব্যস্ত করেন।

অনুচ্ছেদসমূহ, আল্লাহ তা'আলার বাণী সংক্রান্ত অনেকগুলো অনুচ্ছেদ বিন্যাস করেন। আল্লাহ তা'আলার বাণীর শব্দ রয়েছে, বর্ণের মাধ্যমে হয়, আল্লাহ তা'আলা জিবরীলকে শব্দ করে ডাকেন, এসব প্রমাণ করেন।

অনুচ্ছেদ, আসমান, যমীনসহ সকল সৃষ্টিকে অস্তিত্ব প্রদান, এর মাধ্যমে তিনি আল্লাহ তা'আলার কর্ম ও নির্দেশ দেয়া সাব্যস্ত করেন, সুতরাং রব তো এমন সত্তা যার রয়েছে সত্তা, গুণ, কর্ম, নির্দেশ। তিনি স্রষ্টা অস্তিত্ব প্রদানকারী সৃষ্ট নন, আর যা তাঁর কর্ম নির্দেশ সৃষ্টিকরণ ও অস্তিত্বে আনয়ন করা দ্বারা হবে তা হবে কর্ম, সৃষ্ট ও অস্তিত্ব প্রদানকৃত। (সহীহ বুখারী, কিতাবুত তাওহীদ ওয়ার রাদ্দি আলাল জাহমিয়া।)

তাছাড়া তিনি তার খালকু আফ'আলিল 'ইবাদ গ্রন্থে ইসলামে প্রসিদ্ধ ইমামদের থেকে বহু বর্ণনা নিয়ে এসেছেন, যা দ্বারা তিনি আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর ওঠা সাব্যস্ত করেছেন। দেখুন: খালকু আফ'আলিল ইবাদ, পৃ. ২৯-৪৫।

ইমাম ইয়াহইয়া ইবন মু'আয আর-রাযী রাহিমাহুল্লাহ (২৫৮ হিজরী)

ইয়াহইয়া ইবন মু'আয আর-রাযী রহিমাহুল্লাহ বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপর, সৃষ্টিকুল থেকে আলাদা, আর তিনি সবকিছু জ্ঞানে পরিবেষ্টন করে আছেন।" (যাহাবী, দেখুন, মুখতাসারুল 'উলু ১৩৯।)

ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী রাহিমাহুল্লাহ (২৬১ হিজরী)

ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন-নাইসাপূরী রাহিমাহুল্লাহ তার সহীহতে 'আরশ সংক্রান্ত হাদীসগুলো নিয়ে এসেছেন, তিনি যেসব হাদীস নিয়ে এসেছেন তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে,

আল্লাহ তা'আলা তার নিকট তার 'আরশের উপর তার কিতাবে এটা লিখে রাখা যে তার ক্রোধের ওপর দয়া প্রাধান্য পাবে, যেমন তিনি বর্ণনা করেছেন,

ইন্নাহ রাহমাতি তাগলিবু গাজাবি "যখন আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করলেন, তখন তিনি তার কিতাবে লিখলেন, যা তার নিকট 'আরশের উপর রয়েছে, নিশ্চয় আমার রহমত আমার ক্রোধের ওপর প্রাধান্য পাবে।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭৫১।)

সূর্য কর্তৃক 'আরশের নিচে সাজদাহ করা, তিনি বর্ণনা করেন,

"এ সূর্য চলতে থাকে, অবশেষে তার সুনির্দিষ্ট অবস্থানস্থলে 'আরশের নিচে যায়, তখন সেটি 'আরশের নিচে সাজদায় পড়ে যায়, এভাবে প্রতিনিয়ত সে তা করতে থাকবে, অবশেষে তাকে বলা হবে, উঠ, যে দিক থেকে এসেছ সেদিকে ফিরে যাও।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৫৯।)

বড় শাফা'আতের জন্য 'আরশের নিচে সাজদায় পড়ে যাবেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা, যেমন হাদীসে এসেছে, "অতঃপর আমি সামনে চলবো, 'আরশের নিচে আসবো এবং সাজদায় পড়ে যাবো, তারপর আল্লাহ আমার জন্য উন্মুক্ত করে দিবেন এবং আমাকে তার উত্তম প্রশংসা, সুন্দর স্তুতির কিছু অংশ ইলহাম করবেন যা তিনি আমার আগে আর কারও জন্য উন্মুক্ত করেননি। তারপর বলা হবে, হে মুহাম্মাদ, আপনার মাথা উঠান, আপনি চান আপনাকে দেয়া হবে, আপনি সুপারিশ করুন আপনার সুপারিশ কবুল করা হবে। তখন আমি আমার মাথা উঠাবো এবং বলব, হে রব, আমার উম্মত, আমার উম্মত। তখন বলা হবে, হে মুহাম্মাদ, আপনার উম্মতের মধ্যে তাদেরকে জান্নাতের দরজাসমূহের ডান দিকের দরজাসমূহ দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করান, যাদের ওপর কোনো হিসাব নেই। তদুপরি অন্য দরজাতেও তারা অন্যান্য মানুষের সাথে অংশীদার থাকবে।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯৪।)

‘আরশ থেকে আল্লাহর নির্দেশ জারী করা ও কথা বলার বর্ণনা প্রদান। হাদীসে এসেছে,

“আমাদের রব যিনি বরকতময়, তার নাম সুউচ্চ, তিনি যখন কোনো ফয়সালার নির্দেশ জারী করেন, ‘আরশের বাহকরা তখন তাসবীহ পাঠ করতে থাকেন, তারপর তাদের নিকটবর্তী আসমানের ফিরিশতাগণ তাসবীহ পাঠ করতে থাকেন, তারপর সে তাসবীহ পৌঁছে যায় নিকটতম আসমান পর্যন্ত। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যারা ‘আরশ বহনকারীদের নিকটবর্তী আসমানে আছেন, তারা ‘আরশ বহনকারীদের বলেন, তোমাদের রব কী বলেছেন? তখন ‘আরশ বহনকারীগণ তাদেরকে আল্লাহ যা বলেছেন যা জানায়।” (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২২২৯।)

মি‘রাজের হাদীস, যাতে স্পষ্টভাবে আসমানের দিকে উত্থিত হওয়া, প্রতিটি আসমান পার হয়ে উপরে উত্থিত হওয়ার বর্ণনা এসেছে। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭২।)

ইমাম ইবন মাজাহ রাহিমাহুল্লাহ (২৭৩ হিজরী)

প্রসিদ্ধ হাফিয আবু আবদুল্লাহ ইবন মাজাহ তার আস-সুনান গ্রন্থের আস-সুন্নাহ অনুচ্ছেদের সূচনায় অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা করেছেন। তার মধ্যে রয়েছে: অধ্যায়: জাহমিয়্যারা যা অস্বীকার করে। তারপর তিনি বিভিন্ন হাদীস নিয়ে আসেন, তন্মধ্যে আবু রাযীন এর বিখ্যাত হাদীসও নিয়ে আসেন যাতে ‘আরশের উল্লেখ রয়েছে। হাদীস নং ১৮২) আর উল্লেখ করেছেন তাঁর অন্যান্য কর্মগত গুণ যেমন, হাশরের মাঠে কাউকে কাছে ডেকে নেয়া (হাদীস নং ১৮৩), বিবিধ কারণে আল্লাহর হাসি (হাদীস নং ১৮১, ১৯১, ২০০), জান্নাতীদের সাথে উপর থেকে তাকানো, কথা বলা, নিজেকে জান্নাতীদেরকে দেখানো, তারা সে নি'আমত ভোগ করা, সেখানে রবের নূর ও বরকত অবশিষ্ট থাকা (হাদীস নং ১৮৪, ১৮৭), হাশরের মাঠে প্রত্যেকের সাথে রবের কথা বলা (হাদীস নং ১৮৫), জাবের ইবন আবদুল্লাহ'র পিতা আবদুল্লাহ ইবন হারামের মৃত্যুর পর রাব্বুল আলামীন তার সাথে সরাসরি কথা বলা (হাদীস নং ১৯০), হাশরের দিন যমীনকে মুষ্টিবদ্ধ করা, আসমানকে ডান হাতে ভাঁজ করে রাখা (হাদীস নং ১৯২, ১৯৮), 'আরশের উপর রাব্বুল আলামীনের অবস্থান (হাদীস নং ১৯৩), আল্লাহ তা'আলা যখনই ফয়সালাগত নির্দেশ প্রদান করেন, তখন ফিরিশতাদের অবস্থা কেমন হয় (হাদীস নং ১৯৪) মহান আল্লাহ রাত-দিন বান্দার আমলের ওজন বাড়ান ও কমান (হাদীস নং ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭),

মানুষের অন্তর আল্লাহর দু' আঙ্গুলের মাঝখানে হওয়ায় চাইলে তিনি ঠিক রাখেন, চাইলে তিনি বক্র করে দেন, (হাদীস নং ১৯৯), আল্লাহর কথা আর নবীর প্রচার (হাদীস নং ২০১), প্রতিদিনই আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ অবস্থায় থাকেন, কাউকে ক্ষমা করেন, কাউকে বিপদমুক্ত করেন, কাউকে উচ্চ মর্যাদা প্রদান করেন, কাউকে মর্যাদায় নীচু করেন (হাদীস নং ২০২) যাহাবী, আল-আরশ, (২/৩৩৮) অনুবাদঃ আব্দুল্লাহ মাহমূদ।,এভাবে তিনি আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় সিফাতে ফি'লিয়্যাহ বা কর্মগত গুণ সাব্যস্ত করেন। এ সবগুলোই আশ'আরী ও মাতুরিদীরা হয় অর্থহীন করে, না হয় অপব্যাখ্যা করে থাকে। তারা এটার নাম দিয়েছে 'হুলুল হাওয়াদিস বিল্লাহ' বা আল্লাহর প্রাচীন সত্তায় নতুন কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটা। (না'উযুবিল্লাহ)

ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান ইবন আশ'আস আস-সিজিস্তানী রাহিমাহুল্লাহ (২৭৫ হিজরী)

ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান ইবন আশ'আস আস-সিজিস্তানী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর কিতাবে এমনসব হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে এটা সুস্পষ্ট হয় যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর হওয়ার বিষয়টি স্বতঃস্ফূর্ত বিষয় হিসেবে মনে করতেন। যেমন তিনি তাঁর কিতাবে জাহমিয়্যাদের বিরুদ্ধে অধ্যায় বিন্যাস করে বলেছেন, 'বাবুন ফিল জাহমিয়্যাহ' তারপর তিনি আল্লাহ তা'আলার গুণসমূহ বর্ণনা করে এমন হাদীসসমূহ নিয়ে এসেছেন, বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা সাত আসমানের উপর তাঁর 'আরশের উপর রয়েছেন সেটার ওপর কয়েকটি হাদীস নিয়ে এসেছেন। তারপর 'আরশ বহনকারীদের বর্ণনায় আসা হাদীস নিয়ে এসেছেন। (আবু দাঊদ আস-সিজিস্তানী (৭/১১১), কিতাবুস সুন্নাহ, অধ্যায় নং ১৯, হাদীস নং ৪৭২১-৪৭২৮।)

আবু 'ঈসা মুহাম্মাদ ইবন 'ঈসা আত-তিরমিযী রাহিমাহুল্লাহ (২৭৯ হিজরী)

ইমাম আবু 'ঈসা মুহাম্মাদ ইবন 'ঈসা আত-তিরমিজী রহিমাহুল্লাহ, যিনি রাহিমাহুল্লাহ জামে'উত তিরমিজীর গ্রন্থকার, তিনি তাঁর গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে মহান আল্লাহ সম্পর্কে তার আকীদাহ তুলে ধরেন। যেমন তিনি বলেন, ওয়াহুওয়া আলাল আরশি কামা ওয়াছাফা নাফছাহু ফী কিতাবিহী। "আর তিনি তাঁর 'আরশের উপর রয়েছেন যেমনটি তিনি তাঁর কিতাবে তাঁর নিজেকে

গুণান্বিত করেছেন।" (তিরমিযী, আল-জামে'উ (৫/৪০৩); হাদীস নং ৩২৯৮ এর ব্যাখ্যায়।)

অন্যত্র ইমাম তিরমিযী রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক 'জাহান্নামে পা রাখার কারণে তা পূর্ণ হবে' উক্ত হাদীসটি বর্ণনার পরে বলেন, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা থেকে এরকম অনেক অনেক বর্ণনা এসেছে, যাতে দেখার বিষয়টি এসেছে যে, নিশ্চয় মানুষ তাদের রবকে দেখবে, অনুরূপভাবে 'পা' এর উল্লেখ, তদ্রূপ আরও যা এসেছে, এ ব্যাপারে আলেম (জ্ঞানী) ইমামগণ যেমন সুফইয়ান আসসাওরী, মালিক ইবন আনাস, ইবনুল মুবারক, ইবন 'উয়াইনাহ, ওকী' অনুরূপ আরও যারা আছেন, তারা এগুলো বর্ণনা করেছেন, তারপর বলেছেন, এ হাদীসগুলো বর্ণনা করা হবে, আমরা এগুলোর অর্থের উপর ঈমান আনব, বলা যাবে না, সেটা কেমন বা সেটার ধরন কী? এই যে মত হাদীস বিশারদগণ গ্রহণ করেছেন যে, এগুলোকে যেভাবে এসেছে সেভাবে বর্ণনা করা হবে, আমরা এগুলোর অর্থের ওপর ঈমান আনব, কিন্তু ব্যাখ্যা করা হবে না, ধারণা করা হবে না, জিজ্ঞাসা করা হবে না যে সেটা কেমন বা সেটার ধরন কী? এটাই হচ্ছে আলেমগণের নীতি যা তারা অবলম্বন করেছেন এবং সেটার দিকেই গিয়েছেন।" (জামে'উত তিরমিযী (৪/৬৯১), হাদীস নং ২৫৫৭ এর ব্যাখ্যা।)

অন্যত্র বান্দার দান আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক ডান হাতে গ্রহণ করার হাদীসটি আনয়ন করার পর তিনি বলেন, "একাধিক আলেম বলেছেন যে, এ হাদীস ও এর মতো অনুরূপ বর্ণনা যাতে আল্লাহর সিফাত বা গুণের বর্ণনা এসেছে, যেমন মহান আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলা কর্তৃক প্রতি রাতে নিকটতম আসমানে অবতরণ করা, এগুলোর ব্যাপারে তারা বলেছেন, এ বর্ণনাগুলো অবশ্য সাব্যস্ত করতে হবে, এগুলোর ওপর ঈমান আনতে হবে, তবে ধারণা করা যাবে না এবং প্রশ্ন করা হবে না, কীভাবে তা হলো? এ রকমই বর্ণিত হয়েছে, মালিক থেকে সুফইয়ান ইবন 'উয়াইনাহ থেকে ও ইবনুল মুবারক থেকে। তারা এসব হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, এগুলোকে ধরন নির্ধারণ না করে চালিয়ে নাও। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আলেমগণ এ রকমই বলেছেন। কিন্তু জাহমিয়্যাহ, তারা এসব বর্ণনাকে অস্বীকার করেছে। তারা বলে যে, এগুলো সাব্যস্ত করলে তাশবীহ হয়ে যায়। অথচ আল্লাহ তাআলা কুরআনের একাধিক জায়গায় তাঁর জন্য শোনা, দেখা ও হাত গুণ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। জাহমিয়্যারা এসব আয়াতের অপব্যাখ্যা করেছে, তারা এগুলোর এমনসব ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছে যা কোনো আলেম কখনও করেননি।

তারা বলে যে, আল্লাহ তাআলা আদমকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেননি। তারা আরও বলে, এখানে 'ইয়াদ' অর্থ শক্তি। অথচ ইসহাক ইবন ইবরাহীম (রাহওয়াইহ) বলেন, তাশবীহ বা সাদৃশ্য স্থাপন তো তখন হবে যখন বলা হবে, হাত কোনো হাতের মত, বা কোনো হাতের অনুরূপ, শোনা কোনো শোনার মত বা কোনো শোনার অনুরূপ। সুতরাং যখন বলা হবে, কোনো শোনার মত শোনা কিংবা কোনো শোনার অনুরূপ তখনই কেবল সেটা দ্বারা সাদৃশ্য স্থাপন করা হয়ে যায়। কিন্তু যদি বলা হয়, যেমনটি আল্লাহ বলেছেন, হাত, শোনা ও দেখা, তারপর আর সেটা কী রকম বা সেটার ধরন সম্পর্কে প্রশ্ন না করে, কোনো শোনার মত শোনা কিংবা কোনো শোনার অনুরূপ না বলে, তখন সেটা দ্বারা তাশবীহ বা সাদৃশ্য স্থাপন করা হয় না। আর তিনি তো তেমন, যেমন তিনি তাঁর কিতাবে বলেছেন, **লাইছা কামিছলিহী শাইউন ওয়াহুঅস সামিউল বাছির** অর্থাৎ "তার মতো কোনো কিছু নেই, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।" (সূরাহ আশ-শূরা, আয়াত: ১১) (জামেউত তিরমিযী (৩/৪১), হাদীস নং ৬৬২ এর ব্যাখ্যায়।)

উসমান ইবন সাঈদ আদ-দারেমী রাহিমাহুল্লাহ (২৮০ হিজরী)

ইমাম যাহাবী এ মহান ইমাম সম্পর্কে বলেন, 'উসমান আদ-দারেমী বিদ'আতীদের চোখের কাঁটা ছিলেন। সিয়ার (১৩/৩২২)। তিনি সহীহ আকীদাহ'র এক অনন্য সিপাহসালার। তিনি জাহমীদের বিরুদ্ধেই দু'টি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। একটি হচ্ছে আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ, আরেকটি হচ্ছে, আন-নাকদ্দু আলাল বিশর আল-মারীসী।

তন্মধ্যে আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যা' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেন, "হামদ জাতীয় সকল প্রশংসা (কেবলমাত্র মহান) আল্লাহর জন্য, তাঁরই মালিকানায় আসমান, যমীনে, এতোদুভয়ের মাঝে, মাটির নিচে যা কিছু আছে সব। গায়েব এর জ্ঞানী তিনি, আসমান ও যমীনের শষ্য দানা পরিমাণ বস্তুতও তাঁর অগোচরে নেই। সৃষ্টির গোপন রহস্য ও প্রকাশ্য জিনিস সবই তিনি জানেন, তিনি জানেন যা তোমরা অর্জন করো। আমরা আল্লাহর হামদ ঘোষণা করছি তাঁর যাবতীয় হামদ দিয়ে, আমরা তাকে গুণান্বিত ঘোষণা করছি যাতে তিনি নিজেকে গুণান্বিত করেছেন এবং রাসূল তাকে গুণান্বিত করেছেন। তিনিই মহান আল্লাহ, পরম দয়ালু, অনুগ্রহকারী, নিকটে, ডাকে সাড়া প্রদানকারী, কথা বলতে সক্ষম, কথা বলেন, ইচ্ছা করেন, ইরাদা করেন, যা ইচ্ছা তা করতে পারেন। তিনি সবকিছুর প্রথম, তিনি সবকিছুর শেষ, যাবতীয় নির্দেশ তাঁর

আগের ও পরের। তাঁরই যাবতীয় সৃষ্টি ও নির্দেশ, সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ কতই না বরকতময়। তাঁর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম, আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর তাসবীহ পাঠ করে, আর তিনিই প্রবল পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। তিনি সংকুচিত করেন, প্রশস্ত করেন, কথা বলেন, সন্তুষ্ট হন, অসন্তুষ্ট হন, রাগ করেন, পছন্দ করেন, ঘৃণা করেন, অপছন্দ করেন, হাসেন, নির্দেশ দেন ও নিষেধ করেন, সম্মানিত চেহারার অধিকারী, সর্বশ্রোতার গুণ হিসেবে শ্রোতা, সর্বদ্রষ্টার গুণ হিসেবে দ্রষ্টা, স্পষ্ট বাণীর অধিকারী, দু' হাতের অধিকারী, দুই মুষ্ঠির অধিকারী, ক্ষমতার অধিকারী, প্রতিপত্তির অধিকারী, বড়ত্বের অধিকারী, প্রাচীন ইলমের অধিকারী, সর্বদা এরকম আছেন, এ রকম থাকবেন। তাঁর 'আরশের উপর উঠেছেন, সৃষ্টিকুল থেকে পৃথক, সেখানে থাকার সৃষ্টির কোনো কিছু তার থেকে অনুপস্থিত নেই। তাঁর জ্ঞান তাদের সবাইকে পরিবেষ্টন করে আছে। তাঁর চোখ তাদের মধ্যে কার্যকর, তাঁর মতো কোনো কিছু নেই, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। সুতরাং আমরা এ রবের উপরই ঈমান আনি, তাঁরই ইবাদাত করি, তাঁর জন্যই সালাত আদায় করি, তাঁর জন্যই সাজদাহ করি। তাই যে কেউ এমন কোনো ইলাহের ইবাদাত করবে যার গুণ এর বিপরীতে, সে তো আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদাত করলো, তাঁর উপাস্যকে ইলাহ বলার সুযোগ নেই।" (দারেমী, আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ, পৃ. ০১।)

অন্যত্র গ্রন্থের অধ্যায় বিন্যাসে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁর 'আরশের উপর উঠার বিষয়টি সাব্যস্ত করার বিষয়ে বলেন,"রব তাবারকা ওয়া তা'আলার 'আরশের উপর উঠা, আসমানের উপরে থাকা, সৃষ্টি থেকে আলাদা সত্তা হওয়ার বিষয়ে আলোচনার অধ্যায়"। এটাও তারা অস্বীকার করেছে, অথচ আল্লাহর তা'আলা বলেন, "নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ্ যিনি আসমানসমূহ ও যমীন ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন।" তিনি আরও বলেন, "যিনি যমীন ও সমুচ্চ আসমানসমূহ সৃষ্টি করেছেন তাঁর কাছ থেকে এটা নাযিলকৃত, দয়াময় (আল্লাহ্) 'আরশের উপর উঠেছেন। যা আছে আসমানসমূহে ও যমীনে এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী স্থানে ও ভূগর্ভে তা তাঁরই। আর যদি আপনি উচ্চকণ্ঠে কথা বলেন, তবে তিনি তো যা গোপন ও অতি গোপন সবই জানেন। আল্লাহ্, তিনি ছাড়া অন্য কোনো সত্য ইলাহ নেই, সুন্দর নামসমূহ তাঁরই।" তিনি আরও বলেন, "আল্লাহ্, যিনি আসমানসমূহ, যমীন ও এ দু'য়ের অন্তর্বর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ছয়দিনে। তারপর তিনি 'আর্শের উপর উঠেছেন। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই এবং সুপারিশকারীও নেই; তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? তিনি

আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন, তারপর সবকিছুই তাঁর সমীপে উত্থিত হবে এমন এক দিনে যার পরিমাণ হবে তোমাদের গণনা অনুসারে হাজার বছর। তিনি, গায়েব ও উপস্থিত (যাবতীয় বিষয়ে) জ্ঞানী, প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।" (দারেমী, আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ, পৃ. ৪০)

তাছাড়া এ গ্রন্থের অন্যত্র তিনি 'আরশ ও মহান আল্লাহর তার উপর থাকার বিষয়টি সাব্যস্ত করেছেন, আরও সাব্যস্ত করেছেন আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক 'আরশের উপর অবস্থানের পর বান্দাদের থেকে পর্দা গ্রহণ, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক শেষ রাত্র, 'আরাফার মাঠে বিকালে, হাশরের মাঠে, জান্নাতীদের জন্য বিশেষ করে নেমে আসা, আল্লাহ তা'আলাকে 'আরশের উপরে দেখা ইত্যাদি বিষয়াদি আলোচনা করেন। (দারেমী, আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ, ১-১০২।)

অতঃপর তিনি বলেন,

নবীজীর হাদীস, সাহাবী, তাবেয়ীগণ এবং তাদের পরের লোকদের এ বিষয়ের ভাষ্য এত বেশী যে তা আমাদের এ কিতাবে জায়গা হবে না। তবে আমরা কেবল সেটা তাতে সংক্ষেপ করেছি যা দিয়ে বিবেকবানরা দলীল নিতে পারে যে, পুরো উম্মত এমনকি পূর্ববর্তী উম্মতগণও আল্লাহকে চেনার ব্যাপারে কখনও সন্দেহ প্রকাশ করতেন না যে, তিনি আসমানের উপরে, তাঁর সৃষ্টি থেকে আলাদা। (আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যা পৃ. ৬৩, নং ৯৮।)

অনুরূপভাবে ইমাম উসমান ইবন সা'ঈদ আদ-দারেমী তার আন-নাকদ্বু 'আলা বিশর আল- মারাসী নামক গ্রন্থেও আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁর "আরশের উপর থাকার বিষয়ে বলেন, "মুসলিমরা একমত যে, আল্লাহ তার পূর্ণাঙ্গতার সাথে 'আরশের উপরে, আসমানসমূহের উর্ধ্বে ইমাম যাহাবী এর ব্যাখ্যা করে বলেন, আমি বলি, এ ব্যাপারে সবচেয়ে স্পষ্ট কথা হচ্ছে, আল্লাহর বাণী, "রহমান "আরশের উপর উঠেছেন"। (সূরাহ ত্বা-হা, আয়াত: ০৫) সুতরাং যেভাবে আসছে সেভাবে বলা হোক, যেমনটি সালাফে সালেহীনের মানহাজ, কোনো প্রকার প্রতীক্ষা কিংবা ঝগড়া কিংবা মু'তাযিলাদের অপব্যাখ্যা থেকে দূরে থাকা হোক, "হে আমাদের রব আমরা ঈমান আনলাম তাতে যা আপনি নাযিল করেছেন আর আমরা রাসূলের অনুসরণ করলাম" (সূরাহ আলে ইমরান, আয়াত: ৫৩), যাহাবী, আস-সিয়ার: (১৩/৩২৫); যাহাবী, আল-আরশ, (২/৩৩৮) অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমূদ।)

উক্ত গ্রন্থে আরও বলেন, "আহলে সুন্নাহ'র মতে, আল্লাহ তাঁর পূর্ণাঙ্গতার সাথে তাঁর 'আরশের উপরে, তিনি জানেন ও শুনেন 'আরশের উপর থেকে। সৃষ্টিজগতের গোপন কোনো বস্তু তাঁর থেকে গোপন নেই। কোনো কিছু তাঁর থেকে আড়ালে নয়।" (ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, ২২৮ ইত্যাদি।)

ইমাম যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'উসমান ইবন সাঈদ আদ-দারেমী রাহিমাহুল্লাহ হচ্ছেন একজন ইমাম এবং পূর্ববাসীদের হাফিয। তিনি ২৮২ হিজরীতে মারা যান। সাঈদ ইবন আবু মারইয়াম, নু'আইম ইবন হাম্মাদ, মূসা ইবন ইসমা'ঈল, ফারওয়া ইবন আবিল মাগরা, আবদুল্লাহ ইবন রাজা, মুসলিম ইবন ইবরাহীমসহ অন্যান্য ইমাম থেকে তিনি হাদীস শুনেন। ইমাম বুখারী তার ব্যাপারে বলেন, আমি উসমান ইবন সাঈদের মতো কাউকে দেখিনি। আর 'উসমানও তার মতো কাউকে দেখেননি। তিনি ইবনুল আরাবী থেকে আরবী সাহিত্য শিখেন। ফিকহ শিখেন বুওয়াইতী থেকে। আর হাদীস শিখেন ইয়াহইয়া ইবন মাঈন ও আলী ইবন আল- মাদীনী থেকে। এসব শাস্ত্রে তিনি বুৎপত্তি অর্জন করেন। তার প্রশংসা করেছেন একাধিক আহলে ইলম। (যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায (২/৬২২); আল-আরশ (২/৩৩৫), অনুবাদ, অনুবাদ; আব্দুলাহ মাহমুদ; আল-'উলূ, পৃ. ১৪৩।)

ইমাম আবু বকর ইবন আবী দাউদ আস সিজিস্তানী রাহিমাহুল্লাহ (৩১৬ হিজরী)

ইমাম আবু দাউদ'আস সিজিস্তানীর সুযোগ্য সন্তান। আকীদাহ'র উপর তার একটি পূর্ণাঙ্গ কবিতা রয়েছে, যেখানে তিনি আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদাহ তুলে ধরেছেন। সেখানে তিনি আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রতি রাতে প্রথম আসমানে নেমে আসার বিষয়টি তুলে ধরেছেন, যা দ্বারা তিনি তাঁর আরশের উপরে থাকাকেও সাব্যস্ত করলেন। তিনি বলেন, "আল্লাহর রজ্জুকে ধরে রাখ, হিদায়াতের অনুসরণ কর বিদ'আতী হয়ো না, তাহলেই তুমি সফলকাম হতে পারবে। আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ কর, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু "আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে এসেছে, এতে তুমি নাজাত পাবে ও লাভবান হবে।

আর বলো, মহা দাপুটে আল্লাহ প্রতি রাতে নেমে আসেন, কোনো ধরন নির্ধারণ ছাড়াই তা সাব্যস্ত কর, সে একক প্রশংসিত সত্তা কতই না প্রভাবশালী। প্রতি রাতে তিনি নিকটতম আসমানে নেমে আসেন, তাঁর দয়ার প্রদর্শনী করেন,

তখন আসমানের দরজাসমূহ ফাঁকা হয় এবং খোলা হয়। তিনি বলতে থাকেন, আছে কি কেউ ক্ষমাপ্রার্থী, ক্ষমাশীল পাবে বা ক্ষমাশীলের সাথে কথা বলবে, আর কেউ কি কল্যাণ চাইবে তাহলে তাকে তা প্রদান করা হবে? এ হাদীসগুলো এমন লোকেরা বর্ণনা করেছেন, যাদের বর্ণিত হাদীস কখনও অস্বীকার করা যায় না, সাবধান সেসব লোক ক্ষতিগ্রস্থ ও নিন্দিত হবে যারা এদের ওপর মিথ্যারোপ করবে। (ইবন আবী দাউদ, আল-হায়িয়্যাহ। ইবন আবদুল হাদী, আল-কালাম আল মাসআলাতিল ইস্তেওয়া 'আলাল 'আরশ, পৃ. ৭২।) এখানে আলাহ তা'আলার 'আরশের উপর থাকা সাব্যস্ত হচ্ছে; কারণ তিনি 'আরশের উপর থেকেই নিকটতম আসমানে নেমে আসেন। কীভাবে নেমে আসেন সেটার ধরন আমাদের জানা নেই, আর সেটার ধরন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করাও বিদ'আত।

আবুল হাসান আল-আশআরী রাহিমাহুল্লাহ (৩২৪ হিজরী)

আবুল হাসান 'আলী ইবন ইসমা'ঈল আল-আশ'আরী রাহিমাহুল্লাহ, যিনি মুসলিম বিশ্বের ৪র্থ শতক ও তার পরের লোকদের নিকট মহান ইমাম হিসেবে সুপরিচিত হয়ে আছেন, তিনি আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর উঠার ব্যাপারে কী আকীদাহ পোষণ করতেন, সেটা জানা খুবই জরুরী। আমরা এখানে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে এ বিষয়ে তার মতামত তুলে ধরার প্রয়াস পাব।

তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ইখতিলাফুল মুসাল্লীন ও মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন গ্রন্থে রাফিজী, খারেজী, জাহমিয়্যাহ সহ বিভিন্ন ফিরকার আলোচনা শেষে বলেন, "আহলুস সুন্নাহ ও আহলুল হাদীসের বক্তব্য উল্লেখকরণ। তাদের মূল বক্তব্য হলো: আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতা, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, আল্লাহর পক্ষ থেকে যা এসেছে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা থেকে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের থেকে যা বর্ণিত হয়েছে -সবের স্বীকৃতি দেয়া। তারা এসবের কিছুই প্রত্যাখ্যান করেন না। তিনি আরও বলেন, আল্লাহ তাঁর 'আরশের উপরে। যেমন আল্লাহ বলেন: **আর রাহমানু আলাল আরশিস তাওয়া** অর্থাৎ রহমান তার 'আরশের উপরে উঠেছেন। তাঁর দুহাত রয়েছে। তবে ধরন অজানা। যেমন আল্লাহ বলেন, "তাকে আমি আমার দু' হাতে সৃষ্টি করেছি।" নিশ্চয় আল্লাহর অনেক নাম রয়েছে। বলা যাবে না, নামসমূহ গাইরুল্লাহ। যেমনটি মু'তাযিলা ও খারেজীরা বলে।

তারপর তিনি বলেন, "এসবের তারা আদেশ দেন, নিজেরাও মেনে চলেন এবং বিশ্বাস করেন। **ইস্তিওয়া**-(উপরে উঠা) দ্বারা **ইস্তীলা**-দখল করা অর্থ করা অবৈধ। আমরা যেসব আকীদাহ উল্লেখ করলাম তা আমাদেরও আকীদাহ। আমরা এমন আকীদাহ'ই রাখি। আমাদের তাওফীক নেই আল্লাহ ছাড়া।" (যাহাবী, আল-আরশ, (২/৩৭৪) অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমূদ ।)

অনুরূপভাবে আবুল হাসান আল-আশ'আরী উক্ত কিতাবে অধ্যায় রচনা করেন আল্লাহ তা'আলা কি কোনো স্থানে ছাড়া অপর স্থানে আছেন? নাকি তিনি কোনো স্থানেই নেই, নাকি তিনি সর্বস্থানে।' তারপর তিনি বলেন, এ ব্যাপারে **১৭**টি মত রয়েছে। তন্মধ্যে আহলুস সুন্নাহ ও আহলুল হাদীসের মত হচ্ছে,

"আর তিনি 'আরশের উপরে। আল্লাহ বলেন, **আর রাহমানু আলাল আরশিস তাওয়া** "পরম করুণাময় 'আরশের উপর উঠেছেন।" আমরা আল্লাহকে ছাড়িয়ে আগে বাড়িয়ে গিয়ে কোনো কথা বলবো না। বরং বলবো: তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন। তবে ধরন অজানা। (আরও বলবো:) আল্লাহর দু'হাত রয়েছে। আল্লাহ বলেন, **খালাক্বতু বিইয়াদাই ইয়া** "আমার দুহাতে সৃষ্টি করেছি।" (আরও বলবো:) তিনি দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন, যেমনটি হাদীসে এসেছে।

মু'তাযিলারা বলে, আল্লাহ 'আরশের উপর 'ইস্তিওয়া' হয়েছেন মানে 'ইস্তাওলা' বা দখল করেছেন। মু'তাযিলা বলে, হাত অর্থ নি'আমত। আরও বলে, আল্লাহর বাণী: **তাজরীই বি আ'হ ইউনিনা** "যা আমার চোখের সামনে চলতে লাগল।" -এই আয়াতে "আমার চোখ" বলতে উদ্দেশ্য "আমার ইলম"। (মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন: ২১১।)

অনুরূপভাবে ইমাম আবুল হাসান আশআরী আল-ইবানাহ ফী উসূলিদ দিয়ানাহ গ্রন্থের 'ইস্তিওয়া' অধ্যায়ে বলেন,

"যদি কেউ বলে, ইস্তিওয়া (আরশের উপর উঠা) এর ব্যাপারে আপনারা কী বলেন? আমরা বলবো, আল্লাহ 'আরশের উপরে সমুন্নত। যেমন আল্লাহ বলেন, **আর রাহমানু আলাল আরশিস তাওয়া** "পরম করুণাময় 'আরশের উপর উঠেছেন।" আরও বলেন, **ইলাইহি ইয়াসআদুল কালিমুত তাইয়্যিবু** "তাঁরই পানে উত্থিত হয় ভালো কথা।" আরও বলেন, **বাল রাফাআহুল্লাহি ইলাইহি** "বরং তিনি তাঁর কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন।"

ফির'আউনের ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, ফির'আউন বলল, "হে হামান! আমার জন্য তুমি নির্মাণ করো এক সুউচ্চ প্রসাদ যাতে আমি অবলম্বন পাই, আসমানে আরোহনের অবলম্বন, যেন দেখতে পাই মূসার ইলাহকে। তবে আমি তাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি।" ফির'আউন মিথ্যা মনে করে ছিল মূসার একথা 'আল্লাহ আসমানের উপরে'।

আল্লাহ বলেন, "তোমরা কি নির্ভয় হয়ে গেছ যিনি আসমানের উপর রয়েছেন যে, তিনি তোমাদেরসহ যমীনকে ধ্বসিয়ে দিবেন।" আসমানসমূহের উপরে 'আরশ। যেহেতু 'আরশ আসমানসমূহের উপরে, তাই যা কিছু ঊর্ধ্বে আছে তাই আসমান। অর্থাৎ সমস্ত আসমান। 'আরশ বলতে বুঝিয়েছেন, সে 'আরশ যা আসমানসমূহের সর্ব উপরে। দেখ না! আল্লাহ তা'আলা সমস্ত আসমানের কথা উল্লেখ করে বলেন, "তিনি চন্দ্রকে তাতে স্থাপন করেছেন আলোকরূপে।" তিনি বুঝাতে চাননি, সকল আসমানই এ চাঁদের আলো দিয়ে ভর্তি করে দিয়েছেন।

আমরা দেখি দো'আর সময় সকল মুসলিম আসমানের দিকে হাত তোলে। কেননা আল্লাহ সে 'আরশের উপর সমুন্নত যা সমস্ত আসমানের ঊর্ধ্বে। যদি আল্লাহ 'আরশের উপরে না হতেন তবে তারা 'আরশের দিকে হাত তুলতো না। মু'তাযিলা, জাহমিয়্যাহ ও খারিজিরা বলে, "ইস্তিওয়া অর্থ দখল করা, মালিক হওয়া ও কর্তৃত্ববান হওয়া। আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান।" তারা আল্লাহর 'আরশের উপর থাকাকে অস্বীকার করে, যেমনটি হকপন্থীরা বলে থাকে।

মু'তাযিলা, জাহমিয়্যাহ ও খারিজীরা ইস্তিওয়াকে ক্ষমতার অর্থে ব্যবহার করে। যদি তাদের কথা ঠিক হয় তবে 'আরশ ও সপ্তম যমীনের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। কেননা আল্লাহ সব বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। অতএব, আল্লাহ যমীন ও পায়খানার উপর ক্ষমতাবান। নাউজুবিল্লাহ

অনুরূপ তাদের দাবি অনুযায়ী যদি 'আরশের উপর মুস্তাওয়ি হওয়ার অর্থ মুস্তাওলি বা দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা হয়, তবে বলা যাবে যে, আল্লাহ সকল কিছুর উপর মুস্তাওয়ি বা সবকিছুর দখলদারিত্ব লাভ করেছেন। অথচ কোনো মুসলিম একথা বলার বৈধতা দিবে না, আল্লাহ পায়খানা বা বাথরুমের উপর মুস্তাওয়ি। অতএব, প্রমাণিত হয়, আরশের উপর ইস্তিওয়া হওয়া মানে অধিকার করা (বা দখল করা বা বিজয়ী হওয়া) এ জাতীয় অর্থ সম্পূর্ণরূপে বাতিল।" ৫৩১. আল-ইবানাহ, ৮৫-৮৭।

তদ্রূপ হাফিয ইবন আসাকির বলেন, আবুল হাসান তার গ্রন্থ আল-'উমাদ ফির রু'ইয়াহ তে বলেন, আমরা গুণাবলি সম্পর্কে এক বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ন করেছি। আমরা তাতে মু'তাযিলা ও জাহমিয়্যাদের প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করেছি। তাতে আল্লাহর চেহারা, তাঁর 'আরশের উপর উঠা ইত্যাদি গুণাবলি সংক্রান্ত অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা রয়েছে। তাবয়ীনু কাযিবিল মুফতারী, ১২৯; নাকদ্বু তা'সীসিল জাহমিয়্যাহ (২/৩৩৫)।

অনুরূপ হাফেয আবুল আব্বাস আহমাদ ইবন সাবেত আত-ত্বারকী বলেন, আমি আবুল হাসান আল-আশ'আরীর গ্রন্থ যার নাম 'আল-ইবানাহ' তাতে পড়েছি, আরশের উপর উঠার উপর প্রমাণ, সেখানে যা উল্লেখ করেছেন তন্মধ্যে এটাও বলেছেন, "মুসলিমরা যখন আল্লাহ তা'আলার প্রতি অনুরাগী হয় তখন দো'আ করে বলে, হে 'আরশের উপরে অবস্থানকারী। আর তাদের শপথ হচ্ছে, না, সে সত্তার শপথ, যিনি সাত আসমানের উপরে পর্দার আড়ালে রয়েছেন"।. আল-ইবানাহ, ৯১।

ইমাম যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ইমাম আবুল হাসান আল-আশ'আরী রাহিমাহুল্লাহ ২৬০ হিজরীতে তার জন্ম হয়, ৩১৪ হিজরীতে বাসরায় মারা যান। প্রথমে তিনি মু'তাযিলা ছিলেন। পরবর্তীতে তাওবা করেন এবং মু'তাযিলা-বিরোধী অনেক বিষয়ে আসহাবুল হাদীসের সাথে একমত পোষণ করেন। তারপর (সর্বশেষ পর্যায়ে) অধিকাংশ ক্ষেত্রে আসহাবুল হাদীসের সাথে একমত পোষণ করেন। সেটাই আমরা তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেছি। তাতে তিনি এসব ব্যাপারে আহলে হাদীসের ইজমা'র দাবি করেছেন এবং এসব ব্যাপারে তিনি আহলে হাদীসের সাথে একমত।

তিনি জীবনে ৩টি অবস্থা অতিক্রম করেন:

মু'তাযিলা অবস্থা

কিছু ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাহ, কিছু ক্ষেত্রে নয়, যেমন তার রিসালাতুন ইলা আহলিস সাগার গ্রন্থে স্পষ্ট হয়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাহ, যেমন তার ইবানাহ গ্রন্থে স্পষ্ট হয়।

আমরা তার ব্যাপারে এতটুকু জানি। আল্লাহ তার ওপর রহম করুন এবং তাকে সহ সমস্ত মুসলিমকে ক্ষমা করুন। (যাহাবী, আল-আরশ, (২/৩৭৫) অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমূদ।)

ইমাম আবুল হাসান আদ-দারাকুত্বনী রাহিমাহুল্লাহ (৩৮৫ হিজরী)

ইমাম আবুল হাসান আদ-দারাকুতনী রাহিমাহুল্লাহ 'আরশের উপর আল্লাহর অবস্থান করার বিষয়ে কবিতা পাঠ করে বলেন,

"হাদীস যেভাবে এসেছে সেভাবে চালিয়ে দাও। তোমরা তাকে বাতিল করতে লেগে যেও না।" ইমাম দারাকুতনী এতটাই প্রসিদ্ধ যে, তার পরিচিতির প্রয়োজন নেই। তিনি কিতাবুস সুনান সংকলন করেন। তার মাধ্যমে পক্ষের-বিপক্ষের সবাই ফায়দা অর্জন করে। তার সময়কাল ইমাম বুখারী ও তার স্তরের পরে হলেও তিনি সংরক্ষণের দিক থেকে তাদের মতো। তিনি ৩৮৩ হিজরীতে ৮০ বছর বয়সে মারা যান।

তিনি বাগাওয়ী, ইবন ছা'য়েদ, ইবন আবী দাউদ ছাড়াও অনেকের কাছ থেকে শুনেছেন। অনেক দেশ সফর করেন। তিনি এমন কিছু অর্জন করেন যা অন্যরা অর্জন করতে পারেনি। সুনান ছাড়াও তার আরও গ্রন্থ হচ্ছে- আর-রু'ইয়াহ, আল-আফরাদ, আল-কিরাআত অধ্যায় ভিত্তিক। কিরাআত বিষয়ে তার পূর্বে কেউ অধ্যায় ভিত্তিক গ্রন্থ সংকলন করেননি। গুণাবলি বিষয়ে তার একটি খণ্ড রয়েছে। সেখানে আল্লাহর সত্তাগত গুণ যথা হাত, পা, আঙুল, চেহারা, সূরত, হাতের কোষ হাদীস দিয়ে সাব্যস্ত করেন। আর আল্লাহর কার্যগত গুণ, যথা সন্তুষ্টি, ক্রোধ, দয়া, হাত প্রশস্ত করা, হাসা, কুরসী তার পা রাখার স্থান হওয়া বর্ণনা করার পর বলেছেন, 'সুইয়ান ইবন 'উয়াইনাহ বলেছেন, আল্লাহ তাঁর নিজেকে যেসব গুণে গুণান্বিত করেছেন সেগুলো পড়া হচ্ছে তার ব্যাখ্যা, কোনো ধরন নির্ধারণ করা যাবে না, কোনো উপমা বা উদাহরণ দেয়াও যাবে না।' আরও বলেছেন, এ হাদীসগুলো আমরা যেভাবে এসেছে সেভাবে মেনে নিই, আর বলবো না, এটার ধরন কী? এটা কেন আসল? আরও বলেছেন, সুফইয়ান বলেন, এগুলো যেভাবে আসছে সেগুলোকে আমরা স্বীকৃতি দিই, সেগুলো বর্ণনা করি তবে আমরা ধরন নির্ধারণ করি না। তারপর বর্ণনা নিয়ে এসে বলেছেন, "নিশ্চয় আপনি আরশের উপরে, সাত আসমানের উপরে...মু'তাযিলারা আল্লাহর অবতরণ অস্বীকার করে, কিন্তু আমরা এ দীন নিয়েছি তাবেয়ীদের বংশধরদের থেকে, তারা সাহাবায়ে কেরাম থেকে। অপরপক্ষে তারা কার থেকে নিয়েছে?" সর্বশেষে তিনি বলেছেন, এসব হাদীসকে যেভাবে আসছে সেভাবে অনুমোদন করে দাও, কোনো ধরণ নির্ধারণ ব্যতীতই। তারপর তিনি ইমাম আবদুল্লাহ ইবন ওহাবের সূত্রে, ইমাম মালিকের মাধ্যমে ইমাম যুহরী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, "তোমরা সুন্নাতের

কাছে নিজেকে সমর্পণ করো, তার বিরোধিতা করো না।" (আস-সিফাত ও রহমান আরশের উপর উঠেছেন ২৬০)

আবু সুলাইমান আল-খাত্তাবী রহিমাহুল্লাহ (৩৮৮ হিজরী)

ইমাম আবু সুলাইমান আল খাত্তাবী রাহিমাহুল্লাহ আশ'আরী আকীদাহ'র লোক বলেই প্রসিদ্ধ। বস্তুত তাঁর বিভিন্ন অবস্থান ছিল। সব সময় তিনি 'তাফওয়ীদ্ব' বা সিফাতের আয়াত ও হাদীসের 'অর্থ জানা যায় না' এমন কথা বলতেন না। তিনি তাঁর আ'লামুল হাদীসে তা বলতেন, কিন্তু অন্য কিতাবে আমরা তাকে অর্থ সাব্যস্ত করার ব্যাপারে সোচ্চার দেখতে পাই। তিনি স্বীয় গ্রন্থ আল-গুনিয়াতু আনিল কালামে বলেন,

"তুমি জানতে চেয়েছো যেসব গুণ কুরআনে ও সহীহ সুন্নায় বর্ণিত হয়েছে, তার ব্যাপারে নীতি কী? তিনি জবাবে বলেন, সালাফদের নীতি হচ্ছে- তা সাব্যস্ত করা এবং তা বাহ্যিকতার ওপর প্রয়োগ করা এবং ধরন ও সাদৃশ্য দেয়াকে নাকচ করা।

অনুরূপভাবে খাত্তাবী তার আ'লামুল হাদীসেও কখনও কখনও হক কথাটি বলেছেন, যেমন তিনি বলেন,

"মুসলিমগণের কথা এর অর্থ এটা নয় যে, আল্লাহ তা'আলাকে তা স্পর্শ করে আছে... বরং তিনি সকল সৃষ্টিকুল থেকে আলাদা। এটি তো একটি সংবাদ যা কুরআন ও সুন্নাহ'র মাধ্যমে আমাদের জানানো হয়েছে, সুতরাং আমরা তা বলব, তার ধরন নির্ধারণকে আমরা অস্বীকার করব; কারণ কোনো কিছু তার মত নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (আ'লামুল হাদীস, ২/১৪৭৪, রহমান আরশের উপর উঠেছেন-২৬৫ পৃঃ)

কিন্তু তিনি তার 'শি'আরুদদীন' গ্রন্থে পরিষ্কারভাবে এর অর্থ বুঝা যায়, বললেন এবং ধরন সম্পর্কে খোঁজ নিতে নিষেধ করলেন,

"আল্লাহ তাআলা তাঁর আরশের উপর সমুন্নত হওয়ার বিষয়টির ব্যাপারে কথা হচ্ছে, এ মাসআলাটির একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ'র মাধ্যমে জ্ঞান লাভ, এ দিক ছাড়া সেদিকে পৌঁছার কোনো পথ নেই কুরআন একাধিক আয়াতে তা সাব্যস্ত করেছে, আর বহু সহীহ হাদীস দ্বারা তা এসেছে, তাই জানিয়ে দেয়া পদ্ধতিতে সেটার ওপর ঈমান আনা ওয়াজিব, তার ব্যাপারে খোঁজাখুজি করা ও ধরন জানতে চাওয়া জায়েয নয়।" (তারপর তিনি ইমাম

মালিক এর সেই বিখ্যাত বাণী বর্ণনা করেন এবং ইস্তাওলা বলার প্রতিবাদ করেন) (রহমান আরশের উপর উঠেছেন-২৬৬)

ইমাম আবুল কাসিম হিবাতুল্লাহ লালেকাঈ রহিমাহুল্লাহ (৪১৮ হিজরী)

ইমাম আবুল কাসিম হিবাতুল্লাহ ইবন হাসান লালেকাঈ শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহ আকীদার জগতে এক অনন্য নাম। তিনি তাঁর পূর্ববর্তী লোকদের আকীদার যত ছোট ছোট গ্রন্থ, পুস্তিকা ছিল তার যতটুকু সম্ভব নিজের গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। এর মাধ্যমে পূর্বের অনেক সালাফের সালেহীনের বাণী, বক্তব্য, আছার আমাদের কাছে পৌঁছেছে। তাঁর এ মূল্যবান গ্রন্থটি শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আত নামে বিখ্যাত। উক্ত গ্রন্থে তিনি বলেন,

"আল্লাহর বাণী: "পরম করুণাময় 'আরশের উপর উঠেছেন" -এর ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে তার আলোচনা। আল্লাহ আসমানের ঊর্ধ্বে তাঁর 'আরশের উপরে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তার দিকে পবিত্র বাক্যসমূহ ঊর্ধ্বে ওঠে।" আরও বলেন, "তোমরা কি এ থেকে নির্ভয় হয়েছ যে, যিনি আসমানে আছেন।" অন্যত্র বলেন- "আর তিনিই নিজ বান্দাদের ওপর ক্ষমতাবান" তিনি বলেন, এসব আয়াত প্রমাণ করে যে, তিনি আসমানের উপর আর তার ইলম সর্বস্থানকে বেষ্টন করে আছে। এ বক্তব্য বর্ণিত আছে 'উমার, ইবন মাসউদ, ইবন 'আব্বাস ও উম্মু সালামাহ থেকে। আর তাবে'য়ীদের মধ্যে রবী'আহ, সুলাইমান তাইমী ও মুকাতিল ইবন হাইয়ান থেকে বর্ণিত আছে। ইমাম মালিক, সাওরী ও আহমাদ ইবন হাম্বলেরও একই বক্তব।

আবু নু'আইম আল-আসবাহানী রাহিমাহুল্লাহ (৪৩০ হিজরী)

হাফিয আবু নু'আইম আহমাদ ইবন আবদুল্লাহ আসবাহানী রাহিমাহুল্লাহ যে আকীদাহ সংকলন করেছেনতাতে বলেন, আমাদের তরীকাহ হচ্ছে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমায়ে উম্মাহ'র অনুসরণকারী সালাফদের তরীকা (বা মানহাজ)। তারা যে আকীদাহ পোষণ করতেন, তা হলো- আল্লাহ তাঁর অনাদি গুণাবলির সহকারে সর্বদা পরিপূর্ণভাবে আছেন সেসব কখনো নিঃশেষ হবে না, সেসবের কোনো রূপান্তরও নেই। তিনি অনাদি জ্ঞান সহকারে সর্বদা জ্ঞানী, দর্শন সহকারে সর্বদ্রষ্টা, শ্রবণ সহকারে সর্বশ্রোতা, কথা সহকারে কথক। তারপর তিনি পদার্থ ছাড়াই বস্তুসমূহ সৃষ্টি করেছেন।

কুরআন মহান আল্লাহর কালাম। অনুরূপ সমস্ত আসমানী কিতাব তাঁর কালাম। তাঁর কালাম মাখলুক নয়। কুরআন পড়া হোক, তিলাওয়াত করা, সংরক্ষণ করা হোক, শোনা হোক, লেখা হোক বা উচ্চারণ করা হোক- সকল ক্ষেত্রেই প্রকৃতভাবেই তা আল্লাহর কালাম; বিবরণ কিংবা অনুবাদ নয়। কুরআন আমাদের শব্দের সাথেও আল্লাহর কালাম, মাখলূক নয়।

কুরআনের ব্যাপারে (মাখলুক কিংবা মাখলুক নয় এমন বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত প্রদান না করে) নীরবতা পালনকারী এবং যে বলে আমাদের শব্দের সাথে কুরআন মাখলূক, সে জাহমিয়্যাদের অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি যে-কোনোভাবে যদি মনে করে আল্লাহর কালাম সৃষ্টি, তবে সালাফদের মতে সে জাহমিয়্যাদের অন্তর্ভুক্ত। আর সালাফদের মতে জাহমিয়্যারা কাফির। এরপর তিনি আরও অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করেন।

অবশেষে তিনি বলেন, 'আরশের ব্যাপারে ও তাঁর উপর আল্লাহর উঠার ব্যাপারে যেসব হাদীস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা থেকে প্রমাণিত, তারা তা সাব্যস্ত করেন। তবে ধরন নির্ধারণ করেন না এবং দৃষ্টান্ত দেন না। তিনি তাঁর সৃষ্টি থেকে আলাদা ও পৃথক। সৃষ্টিও তাঁর থেকে আলাদা ও পৃথক। সৃষ্টির মাঝে হুলুল বা ঢুকে যান না ও তাদের সাথে মিশেও যান না। তিনি তাঁর আসমানের ঊর্ধ্বে তাঁর 'আরশের উপরে, যমীনে নয়, তার সৃষ্টির ভিতরেও নয়।" ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ুশ, আল-'উলূ, পৃ. ২৪৩; আল-'আরশ (২/৪৪২) অনুবাদঃ আব্দুল্লাহ মাহমূদ।তারপর তিনি সালাফদের সকল আকীদাহ এবং এ ব্যাপারে তাদের ইজমা' তুলে ধরেন।

তাছাড়া তিনি তার 'মাহাজ্জাতুল ওয়াসেক্বীন ও মাদরাজাতুর রামেক্বীন' গ্রন্থে বলেন, "আর মুসলিমগণ একমত হয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা আসমানের উপর, 'আরশের উপরে তাঁর অবস্থান। আরশের উপরে তিনি সমুন্নত হয়েছেন; সেটার উপর অধিষ্ঠিত অর্থে নয় যেমনটি জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায় বলে থাকে। তারা বলে তিনি সব জায়গায়; তারা এটা বলে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তারা তার বিরোধিতা করে। আল্লাহ বলেন, "তোমরা কি এ থেকে নির্ভয় হয়েছ যে, যিনি আসমানে রয়েছেন।" (সূরাহ আল-মুলক, আয়াত: ১৬) তিনি আরও বলেন, "তাঁরই দিকে পবিত্র বাণীসমুহ হয় সমুত্থিত।" (সূরাহ ফাতির, আয়াত: ১০) তিনি আরও বলেন, "রহমান আরশের উপর উঠেছেন।" (সুরাহ ত্বা-হা, আয়াত: ০৫) (মাহাজ্জাতুল ওয়াসেক্বীন ও মাদরাজাতুর রামেক্বীন, পৃ. ০৩।)

ইমাম যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আবু নু'আইম হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ আল-বান্নার নাতি। তিনি ছিলেন দুনিয়াবিমুখ এবং আসবাহানের অপ্রতীদ্বন্দ্বী শাইখ। আল্লাহ তাকে হাদীস, হিফয ও জ্ঞানবুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। তার দরবারে দূর দূরান্ত থেকে লোকজন উপস্থিত হতেন। ইমাম ও হাফিযগণ তার দরজায় ভিড় জমাতেন। এক মাস কম ৯৪ বছর বয়সে ৪৩০ হিজরীর সফর মাসে তিনি মারা যান। (যাহাবী, আল-আরশ, (২/৪৪২) অনুবাদঃ আব্দুল্লাহ মাহমূদ।)

ইমাম আবু 'আমর 'উসমান ইবন সা'ঈদ ইবন 'উসমান ইবন 'উমার আদ-দানী রাহিমাহুল্লাহ (৪৪৪ হিজরী)

তিনি তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আর-রিসালাতুল ওয়াফিয়াতে বলেন,

"অধ্যায়: মহান আল্লাহ তাঁর 'আরশের উপরে উঠা এবং তাঁর সৃষ্টির উপর থাকা প্রসঙ্গে আর আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের কথা হচ্ছে, নিশ্চয় মহান আল্লাহ্ তাঁর সকল আসমানের উপরে, তাঁর 'আরশের উপরে সমুন্নত। সকল সৃষ্টির উপর কর্তৃত্ববান, তাঁর সত্তাগতভাবে তাদের সকলের থেকে আলাদা, তবে তাঁর জ্ঞানে তাদের থেকে পৃথক নন। বরং তাঁর জ্ঞান সৃষ্টির সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে, তিনি তাদের গোপন ও প্রকাশ্য সবই জানেন, জানেন তারা কী অর্জন করবে, যেমনটি তাঁর পক্ষ থেকে সত্য সংবাদে এসেছে এবং তাঁর বিবৃতি প্রদানকারী কিতাব বলেছে, তিনি বলেছেন, আর রাহমানু আলাল আরশিস তাওয়া "রহমান আরশের উপর উঠেছেন।" (সূরাহ ত্বা-হা, আয়াত: ০৫) আর তাঁর 'আরশের উপর উঠার অর্থ হচ্ছে, উর্ধ্বে উঠা। কোনো প্রকার ধরন নির্ধারণ, সীমা নির্ধারণ, স্পর্শকরণ ও পার্শ্ববর্তী কিছু নির্ধারণ ব্যতীতই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "এরপর তিনি আরশের উপর উঠেছেন। তিনি জানেন যা কিছু যমীনে প্রবেশ করে এবং যা কিছু তা থেকে বের হয়" (সূরাহ আল-হাদীদ, আয়াত: ০৪) অর্থাৎ তাঁর জ্ঞান তাদেরকে পরিবেষ্টন করে আছে তারা যেখানেই থাকুক না কেন। অনুরূপ আল্লাহর বাণী: "যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ্ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান এবং জ্ঞানে আল্লাহ্ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন।" (সূরাহ আত-তালাক, আয়াত: ১২) তিনি আরো বলেন, "তাঁরই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ হয় সমুত্থিত এবং সৎকাজ, তিনি তা করেন উন্নীত।" (সূরাহ ফাতির, আয়াত: ১০) তিনি আরো বলেন, "তোমরা কি এ থেকে নির্ভয় হয়েছ যে, যিনি আসমানে রয়েছেন তিনি

তোমাদেরকে সহ যমীনকে ধ্বসিয়ে দিবেন, অতঃপর তা হঠাৎ করেই থর থর করে কাঁপতে থাকবে?" (সূরাহ আল-মুলক, আয়াত: ১৬), "অথবা তোমরা কি এ থেকে নিরভয় হয়েছ যে, আসমানে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদের উপর কংকরবর্ষী ঝঞ্ঝা পাঠাবেন? তখন তোমরা জানতে পারবে কিরূপ ছিল আমার সতর্কবাণী!" (সূরাহ আল-মুলক, আয়াত: ১৭) তিনি আরো বলেন, "ফিরিশতা এবং রূহ আল্লাহর দিকে ঊর্ধ্বগামী হয়।" (সূরাহ আল-মা'আরিজ, আয়াত: ০৪) তিনি আরো বলেন, "তিনি আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন।" (সূরাহ আস-সাজদাহ, আয়াত: ০৫) তিনি আরও বলেন, "আর তিনিই আপন বান্দাদের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণকারী।" (সূরাহ আল-আন'আম, আয়াত: ১৮) তিনি আরো বলেন, "তারা ভয় করে তাদের উপরস্থ তাদের রবকে" (সূরাহ আন-নাহল, আয়াত: ৫০) তিনি আরও বলেন, "হে ঈসা! "নিশ্চয় আমি আপনাকে পরিগ্রহণ করব, আমার নিকট আপনাকে উঠিয়ে নিব।" (সূরাহ আলে ইমরান, আয়াত: ৫৫) তিনি আরো বলেন, "বরং আল্লাহ্ তাকে তাঁর নিকট তুলে নিয়েছেন।" (সুরাহ আন-নিসা, আয়াত: ১৫৮) ফির'আউন সম্পর্কে সংবাদ দিতে গিয়ে বলেন, "ফির'আউন আরও বলল, 'হে হামান! আমার জন্য তুমি নির্মাণ কর এক সুউচ্চ প্রাসাদ যাতে আমি অবলম্বন পাই।" (সূরাহ গাফির, আয়াত: ৩৬) মালেক রাহিমাহুল্লাহ সে ব্যক্তিকে বলেন, যে 'আরশের উপর উঠার ধরন জানতে চেয়েছিল? 'উপরে উঠা' অজানা জিনিস নয়, ধরণ বিবেকের যুক্তি দিয়ে নির্ধারণের বাইরে, এর ওপর ঈমান আনা ফরজ, আর ধরণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদআত। মহান আল্লাহ বলেন, এরপর তিনি আরশের উপর উঠেছেন। তিনি জানেন যা কিছু যমীনে প্রবেশ করে এবং যা কিছু তা থেকে বের হয়"। এ আয়াতের অর্থ, তাঁর জ্ঞান সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে তারা যেখানেই থাকুক না কেন; কারণ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, "যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান এবং জ্ঞানে আল্লাহ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন।" আর আল্লাহর বাণী, "আর আসমানসমূহ ও যমীনে তিনিই আল্লাহ।" (সূরাহ আল-আন'আম, আয়াত: ০৩) এর অর্থ হচ্ছে, তিনি আল্লাহ আসমানসমূহ ও জমীনে উপাস্য। কারও মতে, এর অর্থ হচ্ছে তিনি একাই আসমান ও যমীনের পরিচালনা করেন। কেউ কেউ বলেন, এখানে আগ-পিছ রয়েছে, তিনি অর্থাৎ আর তিনিই আল্লাহ, তিনি আসমানসমূহ ও যমীনের প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছু জানেন। আল্লাহর বাণী: "আর তিনিই সত্য ইলাহ্ আসমানে এবং তিনিই সত্য

ইলাহ যমীনে।" (সূরাহ আয- যুখরুফ, আয়াত: ৮৪) অর্থাৎ, নিশ্চয় তিনি আসমানবাসীদের ইলাহ, আর তিনি যমীনবাসীদের ইলাহ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বাণী: "নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে আছেন যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে এবং যারা মুহসিন।" (সূরাহ আন-নাহল, আয়াত: ১২৮) "আর নিশ্চয় আল্লাহ্ মুহসিনদের সংগে আছেন। (সূরাহ আল-আনকাবুত-৬৯) আমি তো আপনাদের/তোমাদের সংগে আছি, আমি শুনি ও আমি দেখি।" (সূরাহ ত্বা-হা, আয়াত: ৪৬) অর্থাৎ নিশ্চয় তিনি তাদের হেফাযত করেন, সাহায্য করেন, সহযোগিতা করেন, এর অর্থ নয় যে, তাঁর সত্তা তাদের সাথে মিশে আছেন। আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের কথা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। অনুরূপ আল্লাহর বাণী: "তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন হিসেবে তিনি থাকেন না।" (সূরাহ আল-মুজাদালাহ, আয়াত: ০৭) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে জানেন, আরও জানেন তাদের যাবতীয় গোপন ভেদ ও পরামর্শ। কারণ এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, । "আপনি কি লক্ষ্য করেন না যে, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে আল্লাহ্ তা জানেন?" (সূরাহ আল-মুজাদালা, আয়াত: ০৭) আল্লাহর বাণী: "আর তিনি সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত।" (সূরাহ আল-মুজাদালা, আয়াত: ০৭) সুতরাং আল্লাহ তা'আলা আয়াতের শুরু করেছেন 'জানা' শব্দ দিয়ে আর শেষ করেছেন সে 'জানা' শব্দ দিয়ে, তাহলে পুরো আয়াতে যে সাথে থাকার কথা এসেছে তা দ্বারা কেবল আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানে থাকা উদ্দেশ্য।" আবু 'আমর আদ-দানী, আর - রিসালাতুল ওয়াফিয়াহ, পৃ. ১২৯-১৩২।

আবু উসমান ইসমা'ঈল ইবন আবদুর রহমান আস-সাবুনী রাহিমাহুল্লাহ (৪৪৯ হিজরী)

ইমাম আবু 'উসমান ইসমা'ঈল ইবন 'আব্দুর রহমান আস-সাবুনী আন-নাইসাপুরী রাহিমাহুল্লাহ স্বীয় গ্রন্থ আর- রিসালাহ ফিস সুন্নাহতে বলেন,

"আহলুল হাদীসগণ আকীদাহ পোষণ করেন ও সাক্ষ্য দেন যে, আল্লাহ তাঁর আসমানসমূহের উর্ধ্বে তাঁর 'আরশের উপরে। যেমনটি মহান আল্লাহ তার কিতাবে সূরাহ ইউনুসে বলেন, "তোমাদের রব তো আল্লাহ্, যিনি আসমানসমূহ ও যমীন ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি 'আর্শের উপর উঠলেন। তিনি সব বিষয় পরিচালনা করেন। তাঁর অনুমতি লাভ না করে সুপারিশ করার কেউ নেই।" (সূরাহ ইউনুস, আয়াত: ০৩)। আর সূরাহ আর-রা'দে বলেন,

"আল্লাহ্, যিনি আসমানসমূহ উপরে স্থাপন করেছেন খুঁটি ছাড়া, তোমরা তা দেখছ। তারপর তিনি 'আর্শের উপর উঠেছেন।" (সূরাহ আর-রা'দ, আয়াত: ০২) আর সূরাহ আল-ফুরকানে বলেন, "তিনি আসমানসমূহ, যমীন ও এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেন; তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠলেন। তিনিই 'রহমান', সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে যে অবহিত তাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।" (সূরাহ আল- ফুরকান, আয়াত: ৫৯) আর সূরাহ সাজদায় বলেন, "আল্লাহ, যিনি আসমানসমূহ, যমীন ও এ দু'য়ের অন্তর্বর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন।" (সূরাহ আস-সাজদাহ, আয়াত: ০৪) আস-সাবূনী, আকীদাতুস সালাফ ১৮৮: যাহাবী, আল-আরশ, (২/৪৪৮-৪৪৯) অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমূদ ।

অন্যত্র তিনি বলেন, "আর তিনি সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর 'আরশের উপর উঠেছেন, তিনি "আরশের উপর উঠেছেন যেমনটি তিনি তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন, তাঁর বাণীতে "নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ যিনি আসমানসমূহ ও যমীন ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি আরশের উপর উঠেছেন।" (সূরাহ আল-আ'রাফ, আয়াত: ৫৪) অনুরূপ তাঁর অপর বাণীতে "তিনি "আরশের উপর উঠলেন। তিনিই 'রহমান', সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে যে অবহিত তাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।" (সূরাহ আল-ফুরকান, আয়াত: ৫৯) তাছাড়া আরও বেশ কিছু আয়াতে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সেটা বর্ণনা করেছেন তার থেকে আগত বাণীতে, তবে তাঁর আরশের উপরে উঠার ধরন নির্ধারণ করা ব্যতীতই অথবা আল্লাহর 'আরশের উপর উঠাকে কোনো কাজ কিংবা বুঝ কিংবা ধারণা দিয়ে ধরন ছাড়াই। কারণ, আমাদের রবের গুণসমূহের ধরন নির্ধারণ নিষিদ্ধ। তৎকালীন মুসলিমগণের ইমাম আবু আবদুল্লাহ মালিক ইবন আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু, যে ব্যক্তি তাকে "আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তার আরশের উপরে উঠার ধরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল, তার জবাবে বলেছিলেন, 'ইস্তেওয়া' শব্দটির অর্থ জানা, ধরণ অজানা, এর (শব্দ ও অর্থের ওপর ঈমান আনা ফরয, এটার ধরন সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদ'আত, আর তোমাকে তো মনে হচ্ছে যিন্দীক (কুফর লালনকারী), তাকে তোমরা মাসজিদ থেকে বের করে দাও।"(অসিয়্যাতুল ইমাম আস- সাবূনী, পৃ. ১০; ত্বাবাক্বাতুশ শাফি'য়ীইয়াতুল কুবরা (৪/২৮৭) ।)

হাফিয আবু বকর ইবন হুসাইন আল-বাইহাকী রাহিমাহুল্লাহ (৪৫৮ হিজরী)

আস-সুনানুল কাবীর ও অন্যান্য গ্রন্থকার ইমাম আবু বকর ইবন হুসাইন আল-বাইহাকী রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহর গুণাবলির ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোনো মানহাজের ওপর ছিলেন না।

যেসব স্থানে তিনি সালাফদের মতের উপর ছিলেনঃ

কখনও কখনও তিনি সালফে সালেহীনের মানহাজের উপর চলেছেন। যেমন,

* তিনি আল্লাহর গুণাবলিকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। ১) যাতিয়্যা বা সত্তাগত গুণ ও ২) ফিলিয়্যাহ বা কর্মগত গুণ। তারপর প্রত্যেকটিকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন।

সুতরাং সত্তাগত গুণকে দুই ভাগে ভাগ করেছেনঃ ১) যাতিয়্যাহ আকলিয়্যাহ, বা বিবেকগ্রাহ্য সত্তাগত গুণ যেমন জীবন, ক্ষমতা, জ্ঞান, ইচ্ছা, শোনা, দেখা, কথা বলা ইত্যাদি, ২) যাতিয়্যাহ খবরিয়্যাহ, বা সংবাদ (কুরআন ও সুন্নাহ) এর মাধ্যমে প্রাপ্ত সত্তাগত গুণ, যেমন চেহারা, দু' হাত, চোখ গুণ।

আবার কর্মগত গুণকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন, ১) ফিলিয়্যাহ আকলিয়্যাহ বা বিবেকগ্রাহ্য কর্মগত গুণ যেমন সৃষ্টি করা, রিযিক দেয়া, জীবিত করা, মৃত্যু দেয়া, ক্ষমা করা, শাস্তি প্রদান করা ইত্যাদি, ২) ফি'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ বা সংবাদ (কুরআন ও সুন্নাহ) এর মাধ্যমে প্রাপ্ত কর্মগত গুণ, যেমন ইস্তেওয়া 'আলাল 'আরশ, আগমন করা, আসা, অবতীর্ণ হওয়া ইত্যাদি। (আল-আসমা ওয়াস সিফাত, পৃ. ১১০।) বস্তুত সিফাতের এ ভাগটিতে তিনি সালাফে সালেহীনের পূর্ণ অনুসরণ করেছেন।

* তিনি যাবতীয় যাতিয়্যাহ 'আকলিয়্যাহ গুণ ও ফিলিয়্যাহ 'আকলিয়্যাহ সাব্যস্ত করেছেন। এ সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে তিনি কুরআন ও হাদীস দিয়েই সেগুলোকে সাব্যস্ত করেছেন। শুধু বিবেকের ওপর নির্ভর করেননি। বস্তুত এখানেও তিনি সালাফে সালেহীনের নীতির পূর্ণ অনুসরণ করেছেন।

যেসব স্থানে তিনি সালাফে সালেহীনের মানহাজে থাকতে পারেননিঃ

উপরে বর্ণিত দু'টি স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও তিনি সালাফে সালেহীনের পথে চলতে পারেননি। আল্লাহর সিফাতের বাকী দু'টি স্থান অর্থাৎ

যাতিয়্যাহ খবরিয়্যাহ ও ফি'লিয়্যাহ খবরিয়্যার ক্ষেত্রে তিনি সালাফে সালেহীনের সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন।

* তন্মধ্যে যাতিয়্যাহ খবরিয়্যাহ'র ক্ষেত্রে তিনি কোনো নির্দিষ্ট নিয়মে চলতে পারেননি। সেজন্য দেখবেন তিনি দু'হাত, চেহারা, চক্ষু গুণসমূহ যথার্থভাবে সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু বাকী সত্তাগত কুরআন ও হাদীস থেকে প্রাপ্ত গুণ যেমন, আঙ্গুল, ডান হাত সাব্যস্ত না করে সেগুলোর জন্য দু'টি পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। এ গুণাবলিতে তিনি তা'ওয়াল নামের দূরবর্তী অর্থের আশ্রয় নিয়েছেন।

* আর ফি'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ তথা আল্লাহর 'আরশের উপর উঠা, হাশরের মাঠে আসা, শেষ রাত্রিতে নিকটতম আসমানে নেমে আসা ইত্যাদি গুণগুলোর ক্ষেত্রে তিনি তাফওয়ীদ্ব নীতিকে প্রধান্য দিয়েছেন। সুতরাং তার মতে এগুলোর অর্থ করা যাবে না। তিনি মনে করতেন এটিই বুঝি সালাফদের মত। সালাফদের মত যে অর্থ সাব্যস্ত করা, ধরন নির্ধারণ না করা, এটা তাঁর কাছে স্পষ্ট ছিল না। (রহমান আরশের উপর উঠেছেন - ২৯২- ২৯৩)

ইমাম আবু 'উমার ইবন আবদুল বার রাহিমাহুল্লাহ (৪৬৩ হিজরী)

আল-ইস্তিআব, আল-ইস্তেযকার, আত-তামহীদ, বায়ানু জামে'উল ইলমি ওয়া ফাদ্বলিহী ও অন্যান্য চমৎকার গ্রন্থ প্রণেতা ইমাম, মাগরিবের হাফিয আবু 'উমার ইবন আবদুল বার, মালিকী মাযহাবের ইমাম এবং হাফিযদের অন্যতম। তিনি 'ইস্তেওয়া' এর অভিধানিক অর্থ সম্পর্কে বলেন, "তা হচ্ছে, উপরে উঠা, কোনো কিছুর উপরে উঠা, কোনো কিছুর উপরে থাকা ও সেখানে অবস্থান করা"। (আত-তামহীদ (৭/১৩১)।

তিনি আল্লাহর 'আরশের উপর উঠার আকীদাহ সাব্যস্ত করতেন। তার প্রমাণ হচ্ছে তাঁর নিম্নোক্ত বাণী,"আর যার ওপর আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদাহ প্রতিষ্ঠিত তা হচ্ছে, তিনি তাঁর যাবতীয় গুণাবলি ও যাবতীয় নামসহ বিদ্যমান। তাঁর অনাদি হওয়ার কোনো শুরু নেই, আর তাঁর অনন্ত হওয়ারও কোনো শেষ নেই, আর তিনি তাঁর 'আরশের উপর উঠেছেন।" (রহমান আরশের উপর উঠেছেন)

অন্যত্র তিনি বলেন,

"আর আল্লাহর বাণী "তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন হিসেবে তিনি থাকেন না এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যেও হয়

না যাতে ষষ্ঠজন হিসেবে তিনি থাকেন না। তারা এর চেয়ে কম হোক বা বেশি হোক তিনি তো তাদের সঙ্গেই আছেন তারা যেখানেই থাকুক না কেন।" (সূরাহ আল-মুজাদালাহ, আয়াত: ০৭)" এ আয়াত দ্বারা তাদের দলীল গ্রহণ করার কোনো সুযোগ নেই। কারণ আয়াতের প্রকাশ্য ভাষ্যে তাদের দাবির স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই; কারণ সাহাবী ও তাবেয়ী আলেমগণ, যাদের থেকে কুরআনের তাফসীর বর্ণিত হয়েছে, তারা সবাই এ আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, "তিনি আরশের উপরে, আর তাঁর জ্ঞান সকল স্থানে"। (রহমান আরশের উপর উঠেছেন)

অন্যত্র তিনি বলেন, "এ হাদীসে প্রমাণ রয়েছে যে, মহান আল্লাহ তিনি উপরে 'আরশের উপর, সাত আসমানের উপরে, আর তার জ্ঞান সর্বত্র, যেমনটি আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত, আহলুল ফিকহ ওয়াল আছার বলে থাকেন, আর তাদের দলীল হচ্ছে কুরআনের প্রকাশ্য অর্থ, যা আল্লাহর বাণীতে এসেছে, "রহমান তো 'আরশের উপর উঠেছেন।" (রহমান আরশের উপর উঠেছেন - ২৯২- ২৯৩) তারপর তিনি ইস্তেওয়া এর অর্থ বর্ণনা করেছেন এবং সেটা যে মু'তাযিলাদের কথার বিপরীত সেটার দলীল প্রমাণাদি তুলে ধরেছেন। সেখানে তিনি ইমাম মালিকের সেই বিখ্যাত উক্তি, ইমাম রবী'আহর উক্তি, সুফইয়ান সাওরীর বক্তব্য, ইবনুল মুবারকের বক্তব্য, ইবন মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর বক্তব্য তুলে ধরেছেন। (রহমান আরশের উপর উঠেছেন - ২৯২-২৯৩)

অনুরূপভাবে তিনি মুআত্তা মালিকের হাদীস, আমাদের রব প্রতি রাতে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন, এর ব্যাখ্যায় বলেন, "এই হাদীস সহীহ হওয়ার ব্যাপারে হাদীস বিশারদগণ মতানৈক্য করেননি। এ হাদীস প্রমাণ করে যে, আল্লাহ সাত আসমানের ঊর্ধ্বে 'আরশের উপরে। যেমনটি আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মত। মু'তাযিলাদের বিপক্ষে এ হাদীস বিশারদগণের দলীল।

এটি আম লোকদের কাছে অতি প্রসিদ্ধ এবং এতটাই পরিচিত যে, এর চেয়ে আর বেশি কিছুর প্রয়োজন নেই। কেননা তা আবশ্যক বিষয়। এ আকীদাহ পোষণকারীদেরকে কেউ তিরস্কার করেনি এবং কোনো মুসলিম তাদের বিরোধিতা করেনি। (আত-তামহীদ, ইবন আব্দিল বার (৭/১৩৪) যাহাবী, আল-আরশ, (২/৪৫৪-৪৫৬) অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমূদ।) তাছাড়া

সেখানে তিনি ইমাম রবী'আহ, মালিক, ইবনুল আরাবী প্রমুখদের বক্তব্য নিয়ে এসেছেন।

আবু বকর আল-খাতীব, খত্বীব আল-বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ (৪৬৩ হিজরী)

মুসলিম বিশ্বের পূর্বাঞ্চলীয় এলাকার হাফিয আবু বকর খাতীব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, গুণাবলির ব্যাপারে কথা হচ্ছে- "যেসব গুণ সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সেসব গুণের ক্ষেত্রে সালাফদের নীতি হচ্ছে- তা সাব্যস্ত করা ও বাহ্যিকতার ওপর প্রয়োগ করা এবং ধরণ ও সাদৃশ্য দেয়াকে নাকচ করা। এ ব্যাপারে মূলনীতি হচ্ছে-গুণাবলির ব্যাপারে কথা বলা আল্লাহর সত্তার ব্যাপারে কথা বলার একটি শাখা। তাই সিফাত বা গুণের ক্ষেত্রে জাত তথা সত্তা ও তার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করবো। আর যখন এটা জানা বিষয় যে, জগৎসমূহের রবকে সাব্যস্ত করা মানে তার অস্তিত্বকে সাব্যস্ত করা, তাঁর সীমা ও ধরণ সাব্যস্ত করা নয়। অনুরূপভাবে তাঁর গুণাবলিকে সাব্যস্ত করা মানে তার অস্তিত্বকে সাব্যস্ত করা, সীমা ও ধরন সাব্যস্ত করা নয়।

যখন আমরা বলি, হাত, শ্রবণ ও চোখ, তখন এর দ্বারা শুধুমাত্র গুণাবলি সাব্যস্ত করা হয়, যে গুণাবলি স্বয়ং আল্লাহ নিজের ক্ষেত্রে সাব্যস্ত করেছেন। আমরা বলি না, হাত অর্থ কুদরাত বা ক্ষমতা। বলি না, শ্রবণ ও দর্শন অর্থ জ্ঞান। বলি না, এসব অঙ্গ এবং কাজের উপাদান। আমরা বলি- শুধুমাত্র সাব্যস্ত করা ওয়াজিব। কেননা কুরআন ও সুন্নাহ'য় তা বর্ণিত হয়েছে। তাশবীহ বা সাদৃশ্য দেয়াকে নাকচ করা ওয়াজিব। কারণ, আল্লাহ বলেন: **আর লাইছা কামিসলিহী শাইউন ওয়াহুয়াস সামিউলবাসীর** অর্থাৎ "তাঁর মত কিছু নেই আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।" আরও বলেন-**অলাম ইয়া কুল্লাহু কুফুআন আহাদ** অর্থাৎ **"আর লাইছা কামিসলিহী শাইউন ওয়াহুয়াস সামিউলবাসীর** অর্থাৎ তাঁর কোনো সমকক্ষও নেই।" (আল-'উলূ, ২৫৩ (৫৭৭); আল-'আরশ (২/৪৫৬-৪৫৮) অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমূদ; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৮/২৮৩-২৮৪); তাযকিরাতুল হুফফায (৩/২২৫)।)

তাছাড়া খত্বীব আল-বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ ইমাম শাফে'য়ীর প্রশংসায় বলেছেন তাতেও তার বিশুদ্ধ আকীদাহ প্রকাশ পায়। তিনি ইমাম শাফে'য়ী রাহিমাহুল্লাহ'র প্রশংসা করে বলেন, রহমান আরশের উপর উঠেছেন।

"আল্লাহ তাআলা উঁচু মর্যাদা ও উচ্চাসন তিনি ব্যতীত অন্য আর কারও জন্য হওয়াকে অস্বীকার করছেন। আর 'আরশের অধিপতি যাকে উপরে উঠাবেন তাকে কেউ নীচে নামাতে পারে না।" (রহমান আরশের উপর উঠেছেন-৩০০)

ইমাম আবু মুহাম্মাদ হুসাইন ইবন মাসঊদ আল-বাগাওয়ী রাহিমাহুল্লাহ (৫১০ হিজরী)

ইমাম, মুহিউস সুন্নাহ আবু মুহাম্মাদ হুসাইন ইবন মাসঊদ আল-বাগাওয়ী সহীহ আকীদাহ'র প্রচার ও প্রসারে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছিলেন, তিনি আল্লাহর গুণাবলির ব্যাপারে সালাফে সালেহীনের আকীদাহ'র ধারক-বাহক ছিলেন। তিনি তাঁর গ্রন্থসমূহে আল্লাহ তা'আলার জন্য আঙ্গুল, নফস, চেহারা, চোখ, হাত, পা, আসা, আগমন করা, অবতরণ করা, হাসা, শোনা, দেখা ইত্যাদি গুণসমূহ সাব্যস্ত করেছেন। যেমন ইমাম বাগাওয়ী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর শারহুস সুন্নাহ গ্রন্থে বলেন,"আর হাদীসে বর্ণিত আঙুল আল্লাহর গুণাবলির মধ্যে একটি গুণ। অনুরূপভাবে কুরআন ও সুন্নায় আল্লাহ তা'আলার এ রকম যত গুণ এসেছে যেমন, নফস, চেহারা, চোখ, হাত-পা, আসা, আগমন করা, নিকটতম আসমানে অবতরণ করা, 'আরশের উপরে উঠা, হাঁসা ও খুশি হওয়া।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুসা 'আলাইহিস সালামকে বলেন, "আর আমি আপনাকে আমার নিজের জন্য প্রস্তুত করে নিয়েছি। (সূরাহ ত্বাহা ৪১) তিনি আরোও বলেন। "আর যাতে আপনি আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হন।" (সূরাহ ত্বা-হা, আয়াত: ৩৯) তিনি আরও বলেন, "নেই, আল্লাহর সত্তা ছাড়া সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল।" (সূরাহ আল- কাসাস, আয়াত: ৮৮) তিনি আরও বলেন, "আর অবিনশ্বর শুধু আপনার রবের চেহারা, যিনি মহিমাময়, মহানুভব।" (সূরাহ আর-রহমান, আয়াত: ২৭) তিনি আরও বলেন, "বরং আল্লাহর উভয় হাতই প্রসারিত।" (সূরাহ আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৬৪) তিনি আরও বলেন, "হে ইবলীস! আমি যাকে আমার দু'হাতে সৃষ্টি করেছি, তার প্রতি সাজদাবনত হতে তোকে কিসে বাধা দিল?" (সূরাহ সাদ, আয়াত: ৭৫) তিনি আরও বলেন, "অথচ কিয়ামতের দিন সমস্ত যমীন থাকবে তাঁর হাতের মুঠিতে এবং আসমানসমূহ থাকবে ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁর ডান হাতে।" (সূরাহ আয-যুমার, আয়াত: ৬৭) তিনি আরও বলেন, "তারা কি শুধু এর প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, আল্লাহ ও ফিরিশতাগণ মেঘের ছায়ায় তাদের কাছে উপস্থিত হবেন?" (সূরাহ আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ২১০) তিনি আরও বলেন,

"আর যখন আপনার রব আগমন করবেন ও সারিবদ্ধভাবে ফিরিশতাগণও।" (সূরাহ আল-ফাজর, আয়াত: ২২) তিনি আরও বলেন, "দয়াময় (আল্লাহ) আরশের উপর উঠেছেন।" (সূরাহ ত্বা-হা, আয়াত: ০৫) তিনি আরও বলেন, "তারপর তিনি আরশের উপর উঠলেন।" (সূরাহ আল-ফুরকান, আয়াত: ৫৯) অনুরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেছেন, "আমাদের রব প্রতি রাতে নিকটতম আসমানে অবতরণ করেন, যখন রাতের শেষ এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে।" আর আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা থেকে বর্ণনা করেন, "জাহান্নামে (মুশরিক্ব, কাফির, মুনাফিক্ব ও পাপীদেরকে) ফেলা হতেই থাকবে, আর জাহান্নাম বলতেই থাকবে, আরও বেশি আছে কি? যতক্ষণ না রব্বুল ইয্যত আল্লাহ তা'আলা তাঁর পা সেটার উপর রাখছেন।" আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত হাদীসে, সর্বশেষ যে জাহান্নাম থেকে বের হবে, তাতে এসেছে, "অতঃপর আল্লাহ তার ব্যাপারে হাসবেন, তারপর তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে।" জাবের রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর হাদীসে "তখন আল্লাহ হেঁসে তাদের জন্য প্রকাশিত হবেন।" আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু ও অন্যান্যদের হাদীসে এসেছে, "আল্লাহ তা'আলা কোনো বান্দার তাওবাতে তাঁর চেয়েও বেশি খুশী হন, যখন তোমাদের কেউ তার উট পেয়ে যাবে, অথচ সে মরুভূমিতে সেটাকে হারিয়ে ফেলেছিল"। (মিশকাত)

এগুলো এবং অনুরূপ আরও যা এসেছে, সবই আল্লাহর গুণাবলি। কুরআন ও সুন্নায় তা এসেছে, সেগুলোর অর্থের ওপর ঈমান আনতে হবে, সেগুলোকে তার প্রকাশ্য অর্থে পরিচালিত করতে হবে, তা'ওয়ীল বা অপব্যাখ্যা করে দূরবর্তী অর্থ গ্রহণ করা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে হবে। তাশবীহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর কোনো গুণ সৃষ্টির কোনো গুণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয় যেমন তাঁর সত্তা সৃষ্টির কোনো সত্তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। মহান আল্লাহ সুবহানাহু বলেন, **লাইসা কামিসলিহী শাইউন অহুয়াস সামিউল আলিম** অর্থাৎ "তাঁর মতো কোনো কিছু নেই, আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" (সূরাহ আশ শূরা, আয়াত: ১১) আর এ নীতির ওপরই উম্মতের সালাফে সালেহীন, সুন্নাহর ইমামগণ সবাই গত হয়েছেন। তারা এগুলোর ওপর ঈমান এনেছেন এগুলোকে গ্রহণ করে নিয়েছেন। এগুলো থেকে তামছীল (অনুরূপ) ও তা'ওয়ীল (অপব্যাখ্যা) করা থেকে দূরে থেকেছেন। তারা এগুলোর প্রকৃত জ্ঞান মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে সোপর্দ করেছেন। যেমন মহান আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা ইলমে মজবুত লোকদের সম্পর্কে

বলেছেন, "আর যারা ইলমে সুদৃঢ় তারা বলে, আমরা এগুলোর ওপর ঈমান আনলাম, এসবই আমাদের রবের পক্ষ থেকে এসেছে।" (সূরাহ আলে ইমরান, আয়াত: ০৭)

ইমাম সুফইয়ান ইবন 'উয়াইনাহ বলেন, "মহান আল্লাহ তাঁর কুরআনে যা দিয়ে নিজেকে গুণান্বিত করেছেন সেগুলোর ব্যাখ্যা হচ্ছে, সেগুলো পাঠ করে বুঝে নিয়ে চুপ থাকা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ব্যতীত কারও জন্য সেগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার অধিকার নেই"। এক ব্যক্তি ইমাম মালেক ইবন আনাস রাহিমাহুল্লাহকে মহান আল্লাহর বাণী "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন" (সূরাহ ত্বা-হা, আয়াত: ০৫) এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন, কীভাবে উঠলেন? তিনি জবাবে বললেন, "উপরে উঠার বিষয়টি অজানা নয়, এর ধরন বিবেকের যুক্তি দ্বারা প্রাপ্য বিষয় নয়, আর এর ওপর ঈমান আনা ফরয, এর ধরন সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদ'আত। আর আমি তো তোমাকে একজন পথভ্রষ্ট লোকই দেখতে পাচ্ছি, আর তাকে মজলিস থেকে বের করে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হলো।"

ইমাম ওয়ালীদ ইবন মুসলিম বলেন, আমি ইমাম আওযা'ঈ, সুফইয়ান ইবন 'উয়াইনাহ, মালেক ইবন আনাসকে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি ও আল্লাহ তা'আলাকে দেখার ব্যাপারে আসা হাদীসসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি, তারা সবাই বলেছেন, "এগুলোকে যেভাবে এসেছে সেভাবে বুঝে চালু করে দাও, তবে ধরন নির্ধারণ করো না।"

ইমাম যুহরী বলেন, "আল্লাহর পক্ষ থেকে বর্ণনা এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে সেটা পৌঁছানো হয়েছে আর আমাদের ওপর কর্তব্য হচ্ছে সেটা মেনে নেয়া।"

সালাফদের কেউ কেউ বলেছেন, ইসলামে কারও পা দৃঢ় ততক্ষণ হবে না, যতক্ষণ না মেনে নেয়ার সাঁকোতে আরোহন করবে।" আবুল আলীয়া বলেন, **'ইস্তেওয়া ইলাস সামায়ি'** (সূরাহ আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৯) এর অর্থ হচ্ছে, "উপরে উঠলেন তারপর সেগুলোর সৃষ্টিকে সুন্দর করলেন।" মুজাহিদ বলেন, 'ইস্তেওয়া' (সূরাহ আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ২৯) 'আরশের উপর উঠলেন"। (শারহুস সুন্নাহ (১/১৬৯-১৭১)

তিনি তার মা'আলিমুত তানযীল তাফসীরে বলেন-

আল্লাহর বাণী: **আর রহমানু আলাল আরশিস তাওয়া** "পরম করুণাময় 'আরশের উপর উঠেছেন।"কালবী এবং মুকাতিল বলেছেন- তিনি অবস্থান নিয়েছেন। আবু উবায়দা বলেছেন- তিনি উপরে উঠেছেন। মু'তাযিলারা 'ইস্তিওয়া' শব্দটির তাওয়ীল বা অপব্যাখ্যামূলক অর্থ করেছে 'ইস্তাওলা' বা দখল করা। আহলুস সুন্নাহ বলে -'আরশের উপরে উঠা আল্লাহর গুণ। তবে ধরন অজানা। এর প্রতি বিশ্বাস রাখা ওয়াজিব। (তাফসীর বাগাওয়ী (২/১৬৫)।

অনুরূপভাবে, তিনি আল্লাহর বাণী: **ইসতাওয়া ইলাস সামায়ি অহিয়া দুখানুন**। "তারপর তিনি আসমানের উপর উঠলেন এমতাবস্থায় যে, তা ছিল ধোঁয়া" এর ব্যাখ্যায় বলেন, ইবন 'আব্বাস ও সালাফদের অধিকাংশ মুফাসসির বলেছেন: 'এখানে **'ইস্তাওয়া ইলাস সামা-য়ি'** এর অর্থ, তিনি আকাশের উপরে উঠেছেন। (তাফসীর বাগাওয়ী (১/৫৯)।

অন্যত্র তিনি আল্লাহর বাণী- **ওয়াহুঅল্লাহু ফীসসামাঅতি অফীল আরজী** "আর আসমানসমূহ ও যমীনে তিনিই আল্লাহ" -এর ব্যাখ্যায় বলেন অর্থাৎ তিনি আসমানসমূহে ও যমীনে ইলাহ। যাজ্জাজ বলেন, এখানে পূর্ব ও পর করা হয়েছে। আসল বাক্য হচ্ছে- তিনি আল্লাহ, আসমান ও যমীনে তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য জিনিস জানেন। (তফসীর বাগাওয়ী (২/৮৪-৮৫)।

অনুরূপভাবে তিনি আল্লাহর বাণী- "তিনজনে এমন কোনো পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থ না থাকেন" -এর ব্যাখ্যায় বলেন, জ্ঞানের দ্বারা থাকেন। (তাফসীর বাগাওয়ী (৪/৩০৭)।

আল্লামা ইয়াহইয়া ইবন আবুল খায়ের আল-ইমরানী রাহিমাহুল্লাহ (৫৫৮ হিজরী)

আল্লামা ইয়াহইয়া ইবন আবুল খায়ের আল- 'ইমরানী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর 'আল ইন্তিসার ফির রাদ্দি আলালমু'তাযিলাতিল কাদারিয়্যাতিল আশরার' গ্রন্থে বলেন,

"আমরা এ কিতাবের শুরুতে বলেছি যে, আসহাবুল হাদীস ও আহলুস সুন্নাহ'র নিকট আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং সত্তাগতভাবে, তাঁর সৃষ্টি থেকে আলাদা, 'আরশের উপর উঠেছেন, আসমান সমূহের উপরে, তবে সেটাকে স্পর্শ করে নয়, তাঁর জ্ঞান সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে।

কাররামিয়াহ ফেরকার লোকেরা বলে, তিনি 'আরশের স্পর্শে আছেন। মু'তাযিলারা বলে, নিশ্চয় তাঁর সত্তা সর্বত্র, এমনকি ময়লা ও জীবজন্তুর পেটেও। বিশর আল-মারীসীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি কি তোমার এ গাধার পেটেও? সে বলেছিল, হ্যাঁ। বস্তুত এটি হুলুলী সম্প্রদায়ের মত, এটা স্পষ্ট কুফুরী, যাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর আশ'আরী ফেরকার লোকেরা বলে, তাঁকে 'আরশের উপর কিংবা আসমানের উপর এ গুণে গুণান্বিত করা যাবে না।"

তারপর গ্রন্থকার আল্লাহ তাঁর 'আরশের উপর রয়েছেন সেটা সাব্যস্ত করার জন্য কুরআনের আয়াত ও রাসূলের হাদীস থেকে অনেক দলীল নিয়ে আসেন। অবশেষে বলেন, আরও যে কারণে আল্লাহকে উপরে মানতে হবে তা হচ্ছে, মুসলিমগণ তাদের দো'আর সময় চক্ষু উপরে উঠানো, হাতসমূহ উপরের দিকে প্রসারিত করার ব্যাপারে একমত যা প্রমাণ করে যে, আমরা যা বলেছি তা বিশুদ্ধ।

আর তাদেরকে বলা হবে, যদি আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপর না থাকেন, 'আরশের সাথে বিশেষ অর্থে, যেমনটি আসহাবুল হাদীসগণ বলে থাকেন, আর যদি তিনি সব জায়গায় থাকেন, তাহলে তোমরা বল, তিনি যমীনের নিচে আর আসমান যমীনের উপরে, সে হিসেবে তিনি তো নিচের নিচে হয়ে যান। আবার সব জায়গায় থাকার মর্ম অনুসারে তিনি উপরেরও উপরে থাকতে হয়, আর সবকিছু তাঁর নিচে থাকতে হয়, এভাবে তো পরস্পর বিরোধী বিষয়ে পরিণত হয়।

তারপর যদি তারা বলে, "তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন হিসেবে তিনি থাকেন না এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যেও হয় না যাতে ষষ্ঠজন হিসেবে তিনি থাকেন না। তারা এর চেয়ে কম হোক বা বেশি হোক তিনি তো তাদের সঙ্গেই আছেন তারা যেখানেই থাকুক না কেন।" (সূরাহ আল-মুজাদালাহ, আয়াত: ০৭) অনুরূপ "তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন যেখানেই তোমরা থাক না কেন।" (সূরাহ আল-হাদীদ, আয়াত: ০৪) এ বাণীসমূহের কী অর্থ?

উত্তর হবে, সূরাহ মুজাদালার "তিনজনের শলা-পরামর্শের তিনি অবশ্যই তাদের চতুর্থজন হন" (সূরাহ আল-মুজাদালাহ, আয়াত: ০৭), এর অর্থ আয়ত্ব ও জ্ঞানের মাধ্যমে। অনুরূপভাবে "পাঁচজনের মাঝেও তিনি ষষ্ঠজন হন" (সূরাহ আল-মুজাদালাহ, আয়াত: ০৭) এর অর্থও অনুরূপ। তারপর

আল্লাহ বলেছেন, "তবে তিনি তাদের সাথেই আছেন যেখানেই তারা থাকুক না কেন" অর্থাৎ তিনি আয়ত্ব ও ইলমে তাদের সাথে আছেন, সত্তাগতভাবে বা সৃষ্টির ভিতরে প্রবেশের মাধ্যমে নয়।

এ ব্যাখ্যা বিশুদ্ধ হওয়ার প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহর বাণী, "পাঁচ ব্যক্তির মধ্যেও হয় না যাতে ষষ্ঠজন হিসেবে তিনি থাকেন না।" (সূরাহ আল-মুজাদালাহ, আয়াত: ০৭) এতে আয়াতের শুরু হয়েছে ইলম বা জ্ঞান দিয়ে, আর শেষ হয়েছে, ইলম বা জ্ঞান দিয়ে। সুতরাং বুঝা গেল যে, এ পুরো আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাঁর জ্ঞানের সংবাদ প্রদান করা এবং সকল অবস্থাতেই তিনি সকলকে (জ্ঞান ও কুদরতে) পরিবেষ্টন করে আছেন সেটার সংবাদ প্রদান করা।

আর যদি তারা আল্লাহর বাণী, "আর তিনি এমন সত্তা যিনি আসমানেও মা'বুদ, যমীনেও মা'বুদ" (সূরাহ আয-যুখরুফ, আয়াত: ৮৪) এ আয়াত দিয়ে দলীল গ্রহণ করতে চায় এবং বলে যে, এখানে তো বলা হয়েছে তিনি আসমান ও যমীনের প্রত্যেকটিতে ইলাহ।

তখন জবাবে বল, আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, তিনি আসমানের অধিবাসীদেরও মাবুদ, আবার তিনি যমীনের অধিবাসীদেরও মা'বুদ। যেমন বলা হয়, "অমুক ইরাকে ভদ্র ও আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী, অনুরূপভাবে সে হিজাযেও ভদ্র ও আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী" তখন তার অর্থ হয়, সে উভয় স্থানেই আনুগত্য পায়, তার অর্থ এটা নয় যে, তার সত্তা ইরাকে ও হিজাযে অবস্থিত।

তারপর যদি তারা আল্লাহর বাণী, "নিশ্চয় আল্লাহ যারা তাক্বওয়াবান তাদের সাথে আছেন" (সূরাহ আন-নাহল, আয়াত: ১২৮), অনুরূপ আল্লাহর বাণী "আমি তোমাদের দু'জনের সাথে আছি, শুনছি ও দেখছি" (সূরাহ ত্বা-হা, আয়াত: ৪৬) আয়াতদ্বয় দিয়ে দলীল দেয়, তখন তার উত্তর হবে, এগুলোতে উদ্দেশ্য হচ্ছে, হিফাযত, দেখা-শোনা, সাহায্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে তিনি নেককারদের সাথে, মুহসিনদের সাথে, মূসা ও হারূনের সাথে আছেন। এটাকে কখনও কিয়াস করে বদকার, কাফির লোকদের সাথে, কিংবা কুকুর ও শূকরের সাথে থাকার কথা বলা যায় না, আল্লাহ তাদের এসব কথা থেকে কতই না ঊর্ধ্বে।

আর মু'তাযিলা ও তাদের অনুসারীরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বাণী "রহমান 'আরশের উপর 'ইস্তাওয়া' করেছেন" (সূরাহ ত্বা-হা, আয়াত: ০৫) এর অপব্যাখ্যা করে বলে, এখানে ইস্তেওয়া বলে 'ইস্তাওলা' তথা অধিকার করা, অধীনস্থ করা বুঝানো হয়েছে। তারা দলীল হিসেবে এক কবির কবিতাকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করে থাকে, সে কবিতাটি হচ্ছে, "বিশর ইরাক অধিকার করেছে, কোনো প্রকার তরবারী ও রক্ত প্রবাহিত করা ছাড়াই' তার উত্তর হচ্ছে, অধিকার করা এটি তখনই বলা হবে যখন কেউ কোনো কিছু অধিকার করতে অক্ষম হওয়ার পর প্রচেষ্টা ব্যয় করার পর সেটাকে দাপট খাটিয়ে অধিকার করে নেয়, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তো পূর্ব থেকেই দাপুটে নামের অধিকারী এবং সবকিছুই তাঁর অধিকারে।"

তারপর তিনি ইবনুল আরাবীর সে বক্তব্য নিয়ে এসেছেন, যেখানে ইস্তেওয়াকে ইস্তাওলা দ্বারা ব্যাখ্যা করাকে বাতিল হিসেবে গণ্য করেছেন। তারপর বলেন,

"যদিও তারা যা বলে শুদ্ধ হতো তবে এটা বলাও তো শুদ্ধ হতে হয় যে, তিনি আল্লাহ ময়লার জায়গা ও অনুরূপ অনাকাঙ্ক্ষিত স্থানের উপরও অধিষ্ঠিত হয়েছেন; কারণ তিনি সেটা অধিকারে রেখেছেন। যদি সেটাই অর্থ হয় তো 'আরশের কথা বর্ণনা করার কোনো মানে থাকে না।

আশ'আরীরা বলে, যদি আল্লাহ তা'আলাকে "আরশের উপর বলা হয়, তবে তাকে তো সীমাবদ্ধ করা হয়ে গেল, তার জন্য এমন স্থানের প্রয়োজন দেখা দিল যা তাকে ঘিরে রাখবে, আর আল্লাহ তা থেকে পবিত্র।

এর উত্তর হচ্ছে, আমরা যদিও বলি যে, তিনি আরশের উপরে যেমনটি আল্লাহ তাঁর কিতাবে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা তাঁর হাদীসে আমাদের জানিয়েছেন, কিন্তু আমরা এর দ্বারা কখনও বলি না যে, তিনি সীমাবদ্ধ, অনুরূপ তাঁর স্থানের প্রয়োজন রয়েছে। এটাও আমরা বলি না, আরও বলি না যে, দিক বা স্থান তাঁকে ঘিরে রাখতে পারে, বরং তিনি ছিলেন তখনও যখন কোনো স্থান ছিল না, কাল ছিল না, তারপর তিনি স্থান ও কাল সৃষ্টি করেছেন। আর 'আরশের উপর উঠেছেন কোনো ধরন নির্ধারণ ছাড়াই। তিনি তাঁর প্রয়োজন পূরণের জন্য 'আরশ সৃষ্টি করেননি। বরং যেমনটি যুন-নূন আল-মিসরী থেকে বর্ণিত আছে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, আল্লাহ তা'আলা 'আরশ সৃষ্টি দ্বারা কী ইচ্ছা করেছেন? তিনি উত্তরে বললেন, আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলেন যেন তাকে যারা চিনে জানে তাদের অন্তর

দিগভ্রান্ত বা হতভম্ব হয়ে হারিয়ে না হয়ে যায়, আল্লাহ তা'আলা 'আরশকে নিজের প্রয়োজনে সৃষ্টি করেননি। সুতরাং যখন ঈমানদার দাসকে জিজ্ঞেস করা হবে, আল্লাহ কোথায়? সে জবাবে বলবে, 'আরশের উপর।" (আল-ইন্তিসার ফির রাদ্দি আলাল মু'তাযিলাতিল কাদারিয়্যাতিল আশরার' (২/৬০৭-৬২২)।

ইমাম আবদুল কাদের জীলানী রাহিমাহুল্লাহ (৫৬১ হিজরী)

সূফীকুল শিরোমনি, অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব, ইমাম শাইখুল ইসলাম আবু মুহাম্মাদ আবদুল কাদের ইবন আবু সালেহ জীলানী রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন সহীহ আকীদাহ বিশ্বাসের সিপাহসালার। আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণ বিষয়ক তার রয়েছে অনেক বিশুদ্ধ বক্তব্য। তিনি অন্য ইমামদের কথাও বর্ণনা করেছেন। নিচে আমরা কয়েকটি বক্তব্য তুলে ধরছি:

ইমাম আবু মুহাম্মাদ আবদুল কাদের জীলানী আল-হাম্বলী রাহিমাহুল্লাহ, তার আল-গুনইয়াতু লি ত্বালিবিল হক্ক গ্রন্থে বলেন,

সংক্ষিপ্তভাবে আয়াত ও প্রমাণসমূহের মাধ্যমে স্রষ্টার মা'রেফত: জানা যায় ও নিশ্চিত হওয়া যায় যে, আল্লাহ এক, একক। অবশেষে তিনি বলেন, তিনি উপরের দিকে রয়েছেন, 'আরশের উপরে সমুন্নত। রাজত্বকে ধারণকারী। তাঁর ইলম সকল কিছুকে বেষ্টনকারী। "তাঁরই পানে উত্থিত হয় ভালো কথা আর নেক আমল তা উন্নীত করে।" "তিনি আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত সকল কার্য পরিচালনা করেন। তারপর তা একদিন তাঁর কাছেই উঠবে। যেদিনের পরিমাণ হবে তোমাদের গণনায় হাজার বছর।"

তাঁর ক্ষেত্রে এই গুণের বর্ণনা দেয়া জায়িয নয় যে, তিনি সর্বত্র বিরাজমান। বরং বলতে হবে, তিনি আসমানের ঊর্ধ্বে 'আরশের উপরে। যেমন, তিনি বলেছেন: পরম করুণাময় 'আরশের উপর উঠেছেন। উচিৎ হচ্ছে উপরে উঠার গুণকে তা'ওয়ীল বা অপব্যাখ্যা ছাড়াই ব্যবহার করা। তাঁর সত্তা 'আরশের উপরে উঠা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার 'আরশের উপর থাকার বিষয়টি প্রত্যেক নবী ও রাসূলের কাছে অবতীর্ণ প্রত্যেক কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তবে ধরন অজানা। (গুনিয়াতুত ত্বালেবীন: (১/৫৪-৫৭); আল-'উলূ, ১৯৩; ইজতিমা'উল জুয়ুশ, ২৭৭।)

আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন আবু বকর আল-কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ (৬৭১ হিজরী)

ইমাম কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ তার বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থে প্রথমে কালাম শাস্ত্রবিদদের কথা নিয়ে এসেছেন, যেভাবে অন্য তাফসীরকারগণ নিয়ে এসে থাকেন, সেখানে কালাম শাস্ত্রবিদরা আল্লাহর জন্য দিক সাব্যস্ত না করার কথা বলেছিলেন, তিনি তাদের কথা বর্ণনা করার পরে সেটার প্রতিবাদ করে বলেন,

"তবে প্রথম সালাফগণ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুম কখনো দিক নির্ধারণকে অস্বীকার করতেন না। আর তারা দিক নির্ধারণ অস্বীকার করে কোনো কথাই বলেননি। বরং তারা এবং সবাই মহান আল্লাহর জন্য দিক নির্ধারণ করার কথাই বলেছেন, যেমনটি আল্লাহর কিতাব বলেছে এবং তাঁর রাসূলগণ সংবাদ দিয়েছেন। সালাফে সালেহীনের কেউ এটা অস্বীকার করেননি যে, আল্লাহ যথাযথ প্রকৃত অর্থেই 'আরশের উপর উঠেছেন, 'আরশকে নির্ধারণ করা হয়েছে; কারণ এটি তাঁর সবচেয়ে বড় সৃষ্টি। তবে তারা ধরন সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, কারণ সেটার প্রকৃত রূপ জানা সম্ভব নয়। মালিক রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'ইস্তেওয়া' জানা জিনিস, অর্থাৎ অভিধানিকভাবে, আর ধরন অজানা, আর ধরন সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদ'আত। আর এটি উম্মে সালামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহাও বলেছেন। এতটুকু পরিমাণ জানাই যথেষ্ট।... আর 'ইস্তেওয়া শব্দটি আরবী ভাষায় উপর ও অবস্থান করা বুঝায়।" (তাফসীরে কুরতুবী (৯/২৩৮)

অন্যত্র তিনি বলেন, "আর ইস্তেওয়া শব্দের অর্থ অভিধানে, উপরে উঠা, কোনো কিছুর ঊর্ধ্বে হওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "অতঃপর যখন আপনি ও আপনার সংগীরা নৌযানের উপরে স্থির হবেন।" (সূরাহ আল-মুমিনূন, আয়াত : ২৮) আরও বলেন, "যাতে তোমরা এর পিঠে স্থির হয়ে বসতে পার।" (সূরাহ আয-যুখরুফ, আয়াত: ১৩)" আর কবি বলেন, "অতঃপর আমি তাদেরকে খালি মরু অঞ্চলে পানির ঘাটে নিয়ে গেলাম, আর তখন ইয়ামানী তারকা আকাশে চক্কর দিয়ে মাথার উপর এসে উপস্থিত হয়েছে।" অর্থাৎ উপরে উঠেছে, ঊর্ধ্বে গিয়েছে। আরও বলা হয়, সূর্য ইস্তাওয়া করেছে অর্থাৎ সোজা মাথার উপর উঠেছে। আরও বলে, পাখি আমার ঠিক মাথার উপর ইস্তেওয়া করেছে, যখন তা উপরে উঠে। (তাফসীরে কুরতুবী (১/৩৮০-৩৮১)।

এখানে উদ্দেশ্য এটা বলা যে, ইমাম কুরতুবী হক্ক কথা বর্ণনা করেছেন, যদিও তিনি তারপর সেটার অপব্যাখ্যাকারীদের বর্ণনাও নিয়ে এসেছেন, যেটা

সাধারণত মুফাসসিরগণ করে থাকেন। তারা একই অধ্যায়ে যে যা বলেছে সবই নিয়ে আসেন।

ইমাম/ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ (৭২৮ হিজরী)

শাইখুল ইসলাম আহমাদ ইবন আবদুল হালীম ইবন আবদুস সালাম আল-হাররানী রহিমাহুল্লাহ যিনি ইবন তাইমিয়্যাহ নামে বিখ্যাত। তিনি আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণ বিষয়ে কুরআনুল কারীম, হাদীসুর রাসূল, সাহাবায়ে কেরাম, তাদের সুন্দর অনুসারী তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীগণ, হিদায়াতের ইমামগণ, হাদীসের দিকপাল এবং তাদের প্রদর্শিত পথে বিচরণকারী পূর্ববর্তী সহীহ মানহাজের আলেমগণের মতকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন, জেলে গিয়েছেন, কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করেছেন। তার অবদানের কথা এ স্বল্প পরিসরে লিখে শেষ করা যাবে না। শুধু কয়েকটি ভাষ্য বর্ণনা করবো:

আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা থেকে মুতাওয়াতির তথা ধারাবাহিক অবিচ্ছিন্ন অসংখ্য পদ্ধতিতে যা এসেছে এবং যার ওপর উম্মতের সালাফগণ একমত হয়েছেন যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর আসমানের উপরে, 'আরশের উপরে, তাঁর সকল সৃষ্টির উপরে ।

- আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর সৃষ্টির সাথে, যেখানেই তারা থাকুক না কেন, তবে এ সাথে থাকার অর্থ হচ্ছে, জ্ঞানের মাধ্যমে সাথে থাকা, তিনি জানেন তারা কী করবে।

যেমনটি আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাণী "তিনি ছয়দিনে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি 'আর্শের উপর উঠেছেন। তিনি জানেন যা কিছু যমীনে প্রবেশ করে এবং যা কিছু তা থেকে বের হয়, আর আসমান থেকে যা কিছু অবতীর্ণ হয়এবং তাতে যা কিছু উত্থিত হয়। আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন- তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, আর তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।" (সূরাহ আল-হাদীদ, আয়াত: ৪) এ আয়াতে ('আরশের উপর থাকা ও সাথে থাকাকে) একসাথে বর্ণনা করেছেন।

আর এখানে "তিনি তোমাদের সাথে আছেন" বলে সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার সংমিশ্রণ বুঝানো হয়নি। কারণ: ভাষা তা আবশাক করে না। (অর্থাৎ কোনো ভাষাতেই সাথে থাকা অর্থ শরীরের সাথে লেপটে থাকা আবশ্যক করে না।)

আর এটি উম্মতের সালাফগণের ঐকমত্যে বিপরীত কথা। অনুরূপভাবে তা আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টিকে যে স্বভাবজাত প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তার বিপরীত কথা।

বরং "চাঁদ" আল্লাহর নিদর্শনসমূহের একটি নিদর্শন। আর সৃষ্টিসমূহের মধ্যে অনুপাতে ছোট একটি সৃষ্টি, যা আকাশে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে, সেটি মুসাফিরের সাথে থাকে, আর যারা মুসাফির নয় তাদের সাথেও থাকে, যেখানেই তারা থাকুক না কেন।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 'আরশের উপরে, সকল সৃষ্টির প্রতি তাঁর সুতীক্ষ্ম দৃষ্টি রয়েছে, তাদের ওপর যথাযথ আয়ত্ব প্রতিষ্ঠাকারী-বিচারক, তাদের প্রতি তাঁর রয়েছে পূর্ণ নজরদারী ইত্যাদি রবুবিয়াত বা প্রভুত্বের যাবতীয় কর্মকান্ড তাদের ওপর প্রযোজ্য।

এসব কিছু যা আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন যে, তিনি 'আরশের উপর, তিনি আমাদের সাথে, সবই সত্য ও যথাযথ। যা প্রকৃত অর্থেই, কোনোটা সাব্যস্ত করতেই কোনো প্রকার বিকৃতির আশ্রয় নেয়ার প্রয়োজন পড়েনা। তবে অবশ্যই মিথ্যা ধারণা থেকে অবশ্যই সংরক্ষিত রাখতে হবে।" (আল-আকীদাতুল ওয়াসেত্বিয়্যাহ, পৃ. ৮৩-৮৪।)

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ'র ওপর আরোপিত বিভিন্ন অভিযোগ ও তার জবাব:

দুর্ভাগ্যবশত শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ'রহিমাহুল্লাহর মতো এ মর্দে মুজাহিদের ওপর মিথ্যাচারের পর মিথ্যাচার করা হয়েছে। কেউ তাকে দেহবাদী মুজাসসিমা বলেছে, কেউ তাকে বলেছে মুশাব্বিহা বা সাদৃশ্য স্থাপনকারী। কেউ বলেছে, তিনি আল্লাহকে 'আরশের উপর মানুষের বসার মতো বসার কথা বলেছেন, কেউ বলেছেন, তিনি আল্লাহর নিকটতম আসমানে অবতরণ করাকে মানুষের মতো করে অবতরণ করার কথা তিনি বলেছেন। বস্তুত এসবই তাঁর ওপর মিথ্যাচার। তিনি কখনও এমন কথা বলেননি। শত্রুরা সব সময়েই মিথ্যাচার করে মজা পায়। আমরা শাইখুল ইসলামের কিছু বক্তব্য উল্লেখ করব, যার মাধ্যমে প্রমাণিত হবে যে, তিনি এসব কিছু বলেননি। যেমন তিনি বলেন,

আল্লাহ তা'আলা জগতের উপরে, জগত থেকে পৃথক, সৃষ্টিকুল তাকে সীমাবদ্ধ করতে পারে না, তাকে জায়গা দিতে পারে না, তিনি 'আরশ বা অন্য

কিছুর মুখাপেক্ষী নন, তদুপরি তিনি 'আরশের উপরে, সৃষ্টিকুল থেকে আলাদা, তাদের অনুরূপ নয়, তাদের ওপর যা ঘটা বৈধ তাঁর ওপর তা বৈধ নয়। (মাজমূ'উল ফাতাওয়া (৫/৩০৭)।

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপর, তিনি 'আরশের ভিতরে নয় অথবা 'আরশের প্রতি তার মুখাপেক্ষিতাও নেই। (দার'উ তা'আরুদ্বিল আকলি ওয়ান নাকল (৬/৩১৫)।

আল্লাহ তা'আলা তিনি স্রষ্টা, তিনি সবকিছু থেকে অমুখাপেক্ষী, তিনি তাঁর সত্তা, গুণ ও কর্মের জন্য তাঁর থেকে আলাদা কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী নন। বরং যা কিছুই তাঁর থেকে আলাদা তা-ই তাঁর মুখাপেক্ষী। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এই পৃথক জিনিস থেকে সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী, সেই পৃথক সৃষ্টিই বরং তাঁর মুখাপেক্ষী। সুতরাং তিনি নিত্য-নতুন যেসব কাজ নিজের সত্তা দ্বারা সম্পন্ন করেন সেসব কাজ করতে তাঁর থেকে পৃথক কোনো কিছুর প্রতি মোটেও মুখাপেক্ষী নন। (দার'উ তা'আরুদ্বিল আকলি ওয়ান নাকল (২/২৩২)।

তিনি কোনো বিদ্যমান দিকের মধ্যেও আবদ্ধ নন; বরং অস্তিত্ব তো রয়েছে কেবল স্রষ্টা ও সৃষ্টির। আর সৃষ্টিকর্তার অবস্থান তাঁর সৃষ্টিরাজি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি সকলের উপরের উপরে। সুতরাং তিনি কোনো সৃষ্টির মধ্যেই নন, চাই ঐ সৃষ্টিকে কোনো 'দিক' বলে অবহিত করা হোক, অথবা কোনো 'দিক' বলে অবহিত করা না হোক। (মাজমূ' ফাতওয়া (১১/৪৮৪)।

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করার পূর্বেও বিদ্যমান ছিলেন; তারপর তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি তাদের মধ্যে প্রবেশ করেননি এবং তাঁর নিজের মধ্যেও তিনি তাদেরকে শামিল করে নেননি। সুতরাং তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্যে তাঁর সত্তার কোনো কিছুই নেই, আবার তাঁর সত্তার মধ্যেও তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্য থেকে কোনো কিছুই নেই। মাজমূ' ফাতওয়া (১১/৪৮৪)।

ইমাম শামছুদ্দীন আয-যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ (৭৪৮ হিজরী)

মুহাদ্দিস (হাদীসবিদ), মুওয়াররিখ (ইতিহাসবিদ), মুক্বরি (কিরআতবিদ) ইমাম শামছুদ্দীন আয- যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ'র প্রত্যক্ষ ছাত্র ছিলেন। কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবায়ে কেরামের বাণী, তাবেয়ীদের ভাষ্য, হিদায়াতের ইমামগণের বক্তব্য এবং তার পরবর্তী

আলেমগণের দেয়া তথ্য তুলে ধরে তিনি 'আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁর 'আরশের উপর উঠার বিষয়টি নিয়ে আলাদা তিনটি গ্রন্থ লিখেছেন,

এক. আল-উলূ লিল আলিয়্যিল আযীম দুই. কিতাবুল আরশ। তিন. আরবাঈন ফী সিফাতি রাব্বিল আলামীন।

তাছাড়া তিনি তাঁর সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, তারীখুল ইসলাম, তাযকিরাতুল হুফফায গ্রন্থসমূহেও এ বিষয়ে অনেক প্রামাণ্য বর্ণনা নিয়ে এসেছেন।

আমরা এখানে নমুনাস্বরূপ তার একটি কথা নিয়ে এসেছি। তিনি তাঁর 'আল-'উলূ গ্রন্থে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁর 'আরশের উপর উঠা সংক্রান্ত ইমাম মালিকের বিখ্যাত উক্তির ব্যাখ্যায় বলেন,

"এটি ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ থেকে সাব্যস্ত আছে। আর এটাই সকল আহলুস সুন্নাহ'র মত। তারা বলেন, আমরা 'আরশের উপরে উঠার ধরন বিবেকের যুক্তি দিয়ে বুঝতে অক্ষম। বরং এটা আমরা জানি না। তবে তার **'ইস্তেওয়া'** এর অর্থ আমরা জানি, যেমনটি আল্লাহ তাঁর কিতাবে জানিয়েছেন।

আর তা নির্ধারিত হবে যেভাবে তার জন্য উপযোগী সেভাবে। আমরা এতে আরও বেশি গভীরতায় প্রবেশ করবো না, আরও বেশি পন্ডিতি করবো না। এটা সাব্যস্ত করলে অমুক অমুক জিনিসের বাধ্যবাধকতা এসে যায় বলে সেটা টেনে এনে তা স্বীকার কিংবা অস্বীকারও করবো না। বরং ধরন নির্ধারণের ব্যাপারে সালাফে সালেহীন যেভাবে চুপ ও নীরব ছিলেন আমরাও সেরকম নীরব থাকবো। আমরা এটা দৃঢ়ভাবে জেনে নিব যে, এটার যদি কোনো অপব্যাখ্যা করার সুযোগ থাকতো তাহলে সাহাবায়েকেরাম ও তাবে'য়ীগণ সেটা বর্ণনা করার ব্যাপারে অগ্রণী থাকতেন। তাদের জন্য সেটাকে শুধু অর্থের স্বীকৃতি প্রদান করে ধরনের বিষয়টিতে না গিয়ে কেবল চালিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং চুপ থাকা সম্ভব ছিল না। এর পরও আমরা দৃঢ়ভাবে এটা জানি যে, আল্লাহ তা'আলার গুণাবলিতে কেউ তাঁর মতো নয়। অনুরূপ তাঁর ইস্তেওয়া বা ('আরশের) উপরে উঠার ব্যাপারেও কেউ তাঁর মতো নয়। তদ্রূপ তাঁর নুযূল বা (নিকটতম আসমানে) অবতরণের ব্যাপারে কেউ তাঁর মতো নয়। যালিমরা যা বলে তা থেকে তিনি কতই না পবিত্র, আর তা থেকে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে।" (আল-উলু-৯৫৪)

মহান আল্লাহর নাম ও গুণসমূহের প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করতে হবে, তাফওয়ীদ্ব করা যাবে না। তবে প্রকাশ্য অর্থ কী, তা বুঝাতে গিয়ে ইমাম যাহাবী বলেন, "আমি বলি: তথাকথিত পরবর্তী চিন্তাবিদরা (কালামশাস্ত্রবিদরা) এমন উক্তি আবিষ্কার করেছে, আমি জানি না তাদের আগে কেউ সেটা বলেছে কী না।

তারা বলেছে, এ গুণগুলোকে যেভাবে এসেছে সেভাবে চালিয়ে নিতে হবে, ব্যাখ্যাও করবো না, তবে এটা বিশ্বাস রাখবো যে, এগুলোর প্রকাশ্য অর্থ উদ্দেশ্য নয়। (বস্তুত এটা হচ্ছে তাদের তাফওয়ীদ্ব নীতি, যার মাধ্যমে তারা সালাফে সালেহীনের মানহাজবা নীতির পূর্ণ বিরোধিতা করেছে। কারণ সালাফে সালেহীন এগুলোর অর্থ করতেন। অর্থহীন করতেন না, বা প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করা যাবে না, বলতেন না ।) তাদের উক্ত নীতির মাধ্যমে বুঝা যাচ্ছে যে, যাহের বা প্রকাশ্য অর্থ বলতে দু'টি জিনিস বুঝানো হয়, **এক. এর কোনো ব্যাখ্যা নেই, শুধু সম্বোধনের ভাষ্য থেকে যা বুঝা যায় তা-ই এর অর্থ, যেমনটি সালাফে সালেহীন বলেছেন, 'ইস্তেওয়া' শব্দটির অর্থ জানা আছে। (আর তা হচ্ছে উপরে উঠা) আরও যেমন বলেছেন, ইমাম সুফইয়ান ইবন 'উয়াইনাহ ও অনান্যগণ, যারা বলেছেন, এর পড়াই হচ্ছে এর তাফসীর। তাদের কথার অর্থ হচ্ছে, এগুলো ভাষার অভিধানে সুস্পষ্ট, এগুলোকে নিয়ে অপব্যাখ্যা ও বিকৃতির সংকীর্ণতার দিকে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। বস্তুত এটাই হচ্ছে সালাফে সালেহীনের মাযহাব। সাথে সাথে তারা এটাতেও একমত ছিলেন যে, এ গুণগুলো কোনোভাবেই মানুষের গুণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়; কারণ স্রষ্টার মতো কোনো কিছু নেই, তাঁর সত্তাতেও নয় অনুরূপ তাঁর গুণেও নয়।**

দুই. এর প্রকাশ্য অর্থ বলতে বুঝায়, যা কারো ব্রেনের ধারণায় সেসব গুণের বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে, যেমন কখনো কোনো মানুষের গুণ বর্ণনা করলে ব্রেনে সেটার একটি রূপ পরিগ্রহ করে থাকে। বস্তুত প্রকাশ্য অর্থ বলে এটা উদ্দেশ্য নেয়া যাবে না। কারণ তিনি আল্লাহ, একক সত্তা, অমুখাপেক্ষী, তাঁর কোনো দৃষ্টান্ত নেই, যদিও তাঁর গুণ অনেক, সে গুণাবলি অবশ্যই সত্য ও সঠিক কিন্তু সেগুলোর অনুরূপ কোনো কিছু নেই, আর সেগুলোর দৃষ্টান্তও কোথাও নেই। কারণ এমন কে আছে যে, সে গুণাবলিকে দেখেছে এবং তার পূর্ণ বিবরণ আমাদের কাছে দিয়েছে? এমন কে আছে যে আমাদের নিকট বর্ণনা করবে কীভাবে তার বাণী শোনা যাবে? আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমরা অবশ্যই অপারগ, অক্ষম, হতভম্ব, অস্পষ্ট আমাদের রূহের পরিচয় দিতে, যা আমাদের শরীরের মাঝেই অবস্থান করে। কীভাবে সেটা প্রতি রাতে উপরে চলে

যায়, যখন তার স্রষ্টা তাকে ঘুম নামক মৃত্যু প্রদান করেন? আবার কীভাবে সেটা ছাড় পেয়ে ফিরে আসে? কীভাবে মৃত্যুর পরে অবস্থান করে?শহীদের হত্যার পর তার রবের কাছে তার জীবনের প্রকৃত রূপ কী? বর্তমানে নবীদের জীবনের প্রকৃত স্বরূপ কী? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা তার ভাই মূসাকে কবরে দাঁড়িয়ে সালাত পড়তে কীভাবে দেখলেন? তারপর তার সাথে ষষ্ঠ আসমানে কীভাবে দেখলেন? কীভাবেই তার সাথে বিস্তারিত কথোপকথন করলেন? কীভাবে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ইঙ্গিত করলেন যেন তিনি রাব্বুল আলামীনের কাছে যাওয়া-আসা করেন? কীভাবে তিনি চাইলেন যেন তিনি রাব্বুল আলামীনের কাছে লাঘব করার আবেদন করেন? কীভাবে মূসা 'আলাইহিস সালাম তারপর (আদি) পিতা আদমের সাথে মুনাযারা করলেন? কীভাবে আদম ('আলাইহিস সালাম) তাকে পূর্ব তাকদীরের কথা বলে হারিয়ে দিলেন, এটা বলে যে তাওবা করা ও তা কবুল হওয়ার পরে তিরষ্কার করাতে কোনো উপকার নেই? অনুরূপভাবে আমরা জান্নাতে আমাদের অবস্থার বর্ণনা করতে অক্ষম, ডাগর নয়না হূরদের গুণাবলি বর্ণনা করতে অপারগ। তদ্রূপ যদি আমরা ফিরিশতাদের দিকে আলোচনা নিবদ্ধ করি, কেমন তাদের সত্তা, তাদের ধরন? কীভাবে তাদের কাউকে যদি বলা হয় পৃথিবীকে গিলে ফেলতে তবে সে এক লোকমা দিয়েই তা গিলে ফেলবে? তাছাড়া তাদের সৌন্দর্য, চিত্তাকর্ষকতা, তাদের আলোকিত (জাওহার বা) মৌলিক উপাদানই বা দেখতে কেমন? যদি এসব ব্যাপারেই আমাদের জ্ঞান না থাকে তাহলে আমরা কেন এটা বুঝি না যে, আল্লাহ তা'আলা এগুলোর চেয়ে অনেক উর্ধ্বে ও অনেক বড়, তাঁর জন্য সর্বোচ্চ পূর্ণ গুণাবলি, তার জন্য রয়েছে নিঃশর্ত পরিপূর্ণতা, তার মতো কেউ তো আসলেই নেই (সুতরাং ধরন না জেনে ঈমান আনতে অসুবিধা কোথায়?) "আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান আনলাম এবং সাক্ষ্য থাক যে আমরা মুসলিম।" (সূরাহ আল-মায়িদাহ, আয়াত: ১১১) আল-'উলূ, পৃ. ২৫১। তবে ইমাম যাহাবী উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর অন্য গ্রন্থে দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, "উত্তর: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমার সামনে সেটার নমুনা তুলে ধরা হয়েছে। তিনি মূসা আলাইহিস সালামকে একাধিকবার দেখেছেন। তাঁর চলন পথে মূসা 'আলাইহিস সালামকে দেখেছেন তার কবরে সালাত আদায় করতে, তারপর তাকে দেখেছেন বাইতুল মাকদিসে, তারপর তাকে দেখেছেন ষষ্ঠ আসমানে, অন্যদেরকেও দেখেছেন। এতে বুঝা গেল নবীদেরকেও উপরে তোলা হয়েছে যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমাকে উপরে

উঠানো হয়েছে। আর নবীরা তাদের কবরে জীবিত যেমনটি শহীদগণ তাদের কবরে জীবিত। তাদের জীবন দুনিয়াবাসীদের জীবনের মতো নয়, আর তাদের জীবন আখেরাতের জীবনের মতোও নয়, বরং এটি ভিন্ন ধরনের জীবন (তথা বারজাখী জীবন)। যেমনটি শহীদদের জীবনের বর্ণনায় এসেছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের রূহকে সবুজ পাখির পেটে রাখবেন, যে পাখিগুলো জান্নাতের সর্বত্র বেড়াবে আর 'আরশের নিচে লটকে থাকা ঝাড় বাতিগুলোতে আশ্রয় নিবে। সুতরাং এ হিসেবে তারা তাদের রবের নিকট জীবিত, যেমনটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা খবর দিয়েছেন, আর তাদের দেহ তাদের কবরেই রবে। সুতরাং এই সকল বিষয় মানব বিবেক-বুদ্ধির চেয়ে বড় এবং এসবের প্রতি ইমান আনা ওয়াজিব যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, অথচ তাদের শরীর তাদের কবরেই রয়েছে।

বস্তুত এ জিনিসগুলো মানুষের বিবেকে ধরার চেয়ে বড়। এগুলোর ওপর ঈমান আনতে হবে, যেমন আল্লাহ বলেছেন, "যারা গায়েবের ওপর ঈমান রাখে"। (যাহাবী, তারীখুল ইসলাম, আস-সীরাতুন নাবওয়িয়্যাহ, ২৬৯-২৭০।)

ইমাম/ইবনুল কাইয়্যেম রহিমাহুল্লাহ (৭৫১ হিজরী)

ইবনুল কাইয়্যেম রাহিমাহুল্লাহ "আল্লাহর আরশের উপর উঠা" এ ব্যাপারে 'ইজতিমাউল জুয়ূশিল ইসলামিয়্যাহ' নামে স্বতন্ত্র গ্রন্থও প্রণয়ন করেছেন। তাছাড়া অপর কয়েকটি কিতাবে তিনি এ বিষয়টি বিস্তারিত তুলে ধরেছেন। যেমন, আস-সাওয়া'য়িকুল মুরসালাহ, ই'লামুল মুওয়াক্কি'য়ীন, আল-কাফিয়াতুশ শাফিয়াহ ফিল ইন্তিসার লিল ফিরক্বাতিন নাজিয়াহ (নিয়্যাহ) প্রভৃতি। এখানে সামান্য কয়েকটি ভাষ্য কেবল তুলে ধরছি।

ইবনুল কাইয়্যেম রাহিমাহুল্লাহ কোথাও এটা বলেছেন যে, কুরআনুল কারীম, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস, সাহাবায়কেরামের ভাষ্য, তাবেয়ীগণের বক্তব্য সবই আল্লাহ তা'আলাকে 'আরশের উপর সাব্যস্ত করছে। তিনি বলেন,

"চিন্তা কর, এ আয়াতগুলোকে কীভাবে মু'আত্তিলা বা অর্থহীন যারা বলে সে সম্প্রদায় এবং শির্ক যারা করে সে সম্প্রদায়ের কথাকে খন্ডন করা হয়েছে। আল্লাহর বাণী, "তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন" এ বাণীটিতে যাদের যুক্তি খন্ডন করা হয়েছে, তন্মধ্যে রয়েছে মু'আত্তিলা ও

জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায়ের বক্তব্য; যারা বলে 'আরশের উপর 'না' ছাড়া আর কিছু নেই। তারা আরও বলে, আল্লাহ আরশের উপর উঠেননি। আরও বলে, তাঁর দিকে হাত তোলা যাবে না। আরও বলে, তাঁর দিকে উত্তম কালেমাসমূহ উত্থিত হয়না। আরও বলে, 'ঈসা 'আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে উপরে উঠানো হয়নি। তারা আরও বলে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমাকে মি'রাজের জন্য উপরে নিয়ে যাওয়া হয়নি। আরও বলে, আল্লাহর দিকে ফিরিশতা ও রূহ উঠে যান না। আরও বলে, আল্লাহর নিকট থেকে জিবরীল 'আলাইহিস সালাম ও অন্য কেউ অবতরণ করেননি। আরও বলে, প্রতি রাতে আল্লাহ প্রথম আসমানে নাযিল হননি। আরও বলে, তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে ফিরিশতা ও অন্যান্যগণ তাদের উপরস্থ সত্তাকে ভয় করেন না। আরও বলে, কিয়ামতের দিন মুমিনগণ তাদের চোখ দিয়ে উপরের দিকে তাদের রবকে চাক্ষুষ দেখবে না। আরও বলে, তাঁর দিকে উপরের দিকে আঙ্গুল দিয়ে ইঙ্গিত করে দেখানো জায়েয নেই, যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা সবচেয়ে বড় সম্মিলনস্থলে বিদায় হজের সময় ইঙ্গিত করে দেখিয়েছেন। তিনি তাঁর আঙ্গুলকে আসমানের দিকে উঠিয়েছেন এবং সেটাকে মানুষের আল্লাহুম্মা আশ্হাদ অর্থাৎ দিকে নীচু করে বলেছিলেন, হে আল্লাহ, সাক্ষী থাক" ।

শাইখুল ইসলাম বলেন, এ আল্লাহর কিতাব প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ, সকল সাহাবী, তাবেয়ী এবং সকল ইমামের বক্তব্য, সরাসরি স্পষ্ট করে বা প্রকাশ্যভাবে এটাতে পরিপূর্ণ যে, নিশ্চয় আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা সবকিছুর উপরে, তিনি 'আরশের উপরে, আসমানসমূহের উপরে, তাঁর 'আরশের উপর সমুন্নত। (ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, ৯৫-৯৬।)

অন্যত্র তিনি ইমাম মালিকের সিফাত বিষয়ক ঐতিহাসিক বক্তব্য, "ইস্তেওয়ার অর্থ জানা, ধরন অজানা...." এর ব্যাখ্যায় বলেন

"এভাবে ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ 'ইস্তেওয়া' শব্দ থেকে যে অর্থ বুঝা যায় এবং যে ধরন মানুষের বিবেকে আসতে পারে এতোদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। বস্তুত ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ'র এ উত্তর আল্লাহর সকল গুণের ক্ষেত্রে একটি পূর্ণ উত্তর; আরোগ্যের মহৌষধ।

তাই যে কেউ প্রশ্ন করে বলবে, আল্লাহর বাণী "নিশ্চয় আমি তোমাদের দু'জনের সাথে আছি, শুনছি এবং দেখছি" (সূরাহ ত্বা-হা, আয়াত:

৪৬) এ আয়াতে কীভাবে তিনি শুনেন ও দেখেন? উত্তরে একই কথা বলা হবে, তাকে বলা হবে, শোনা ও দেখার বিষয়টি সবার জানা, তবে আল্লাহ তা'আলার জন্য সেটার ধরন নির্ধারণ করা বিবেক-বুদ্ধির কাজ নয়। কেউ যদি আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান, জীবন, ক্ষমতা, ইচ্ছা, অবতরণ, ক্রোধ, সন্তুষ্টি,রহমত, হাসি ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন করে, তার উত্তরও হবে এই যে, এগুলোর অর্থ তো আমরা বুঝি; কিন্তু আল্লাহর জন্য এগুলোর ধরন নির্ধারণ করা বিবেকের যুক্তি দ্বারা অর্জন করা যায়না; কারণ কারো গুণের ধরন বিবেকের যুক্তি দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া নির্ভর করছে সে সত্তার ধরণ ও তার প্রকৃত অবস্থা জানার ওপর। আর যেহেতু আল্লাহ তা'আলার সত্তার প্রকৃত জ্ঞান কোনো বিবেকের যুক্তি ধারণ করতে পারে না, তাই তাঁর গুণাবলির প্রকৃত অবস্থা ও ধরন কীভাবে বিবেধ ধারণ করবে?

এ অধ্যায়ে বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা নিজেকে যেসব গুণে গুণান্বিত ঘোষণা করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমাও আল্লাহকে যেসব গুণে গুণান্বিত বলেছেন, সেগুলো দিয়ে আল্লাহকে গুণান্বিত সাব্যস্ত করা। আর এ সাব্যস্তকরণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার বিকৃত, অর্থশূন্যতা, কিংবা ধরন নির্ধারণ, কারো অনুরূপ নির্ধারণ করা যাবে না। বরং আল্লাহর জন্য তাঁর নামসমূহ ও গুণসমূহ সাব্যস্ত করা হবে আর তাঁর থেকে সৃষ্টিকুলের সাথে সাদৃশ্যতাকে নিষেধ করতে হবে। এটা করতে পারলে আপনার সাব্যস্তকরণ হবে তামছীল বা সাদৃশ্যমুক্ত আর আপনার নিষেধ করা হবে তা ত্বীল বা অর্থহীন করা থেকে মুক্ত। সুতরাং যে কেউ 'ইস্তেওয়া' বা 'আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁর 'আরশের উপর উঠা' এর প্রকৃত অর্থকে অস্বীকার করবে সে তো তা'ত্বীল (অর্থশূন্য) করলো এবং মু'আত্তিলা হয়ে গেল। আর যে কেউ আল্লাহ তা'আলার 'ইস্তেওয়া' বা 'আরশের উপর উঠা'কে সৃষ্টির কারও জন্য অপর কারও উপর উঠার সাথে সাদৃশ্য প্রদান করলো সে তো 'তাঁর তামছীল (সাদৃশ্য স্থাপন) করলো এবং 'মুমাসসিলা' হয়ে গেল। আর যে কেউ বললো, 'আরশের উপর উঠা' সৃষ্টির কারও মতো নয়, সে হচ্ছে তাওহীদের ঝান্ডাবাহী, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণাকারী।" (ইবনুল কাইয়্যেম, মাদারিজুস সালেকীন (২/৮৫)।

অন্যত্র বলেন, "আর উপরে হওয়া, এটাই তো কুরআন ও সুন্নায় আসা 'ইস্তেওয়া শব্দের অর্থ।"(মুখতাসারুস সাওয়া'য়িকুল মুরসালাহ (২/৩৬৩)।

অন্যত্র ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম রাহিমাহুল্লাহ বেশ কিছু বিষয় বর্ণনা করেছেন, যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর উঠার বিষয়টি সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়, যেমন,

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের সম্পর্কে বলেছেন, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ - অলিল্লাহীল মাছালুল আ'লা "আর আল্লাহর জন্যই সকল সর্বোচ্চ উদাহরণ" (সূরাহ নাহল, আয়াত: ৬০), আরও বলেন, وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ - অলাহু উল মাছালুল আ'লা "আর তাঁর জন্য আসমান ও যমীনে রয়েছে সর্বোচ্চ উদাহরণ" (সূরাহ রূম, আয়াত: ২৭) এখানে সর্বোচ্চ উদাহরণ এর অর্থ কী? সবচেয়ে উত্তম ও মর্যাদাবান যতগুণ মহান আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত হবে। (আল-ওয়াহেদী, আল-ওয়াজীয, পৃ. ৮৪১; ইবনুল কাইয়্যেম, আস-সাওয়া'য়িকুল মুরসালাহ (৩/১০৩৩)। ইবনুল কাইয়্যেম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আল্লাহর 'আরশের উপর উঠার এ গুণটিকে ("আল-মাসালুল আ'লা") বা 'সর্বোচ্চ গুণ' হিসেবে নিতে হবে। তিনি এর ব্যাখ্যা করে বলেন,

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, সাত আসমান কুরসীতে বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে ফেলা রাখা একটি রিং এর মতো, অনুরূপ কুরসী; তা 'আরশের তুলনায় বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে ফেলে রাখা একটি রিং এর মতো আর 'আরশের পরিমাণ তো কেবল আল্লাহই জানেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের উপর, সেখানে থেকেই তিনি তাঁর বান্দারা কী করে সেটা জানতে পারেন। এ জিনিসটিই ঈমানদার, বিশ্বাসী, তাঁকে যারা জানে, তাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম গুণাবলি হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। ফলে তারা তাঁকে চিনতে সক্ষম হয়েছে, তাঁকে সেটার মাধ্যমে ইবাদাত করেছে, তা দিয়েই তারা তাঁর কাছে যাচঞা করেছে আর এভাবেই তারা তাঁকে ভালোবেসেছে, তাঁকে ভয় করেছে, তাঁর কাছে আশা করেছে, তাঁর ওপর ভরসা করেছে, তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে, তার স্মরণে প্রশান্তি লাভ করেছে, তাঁর ভালোবাসার মাধ্যমে সাযুজ্যতা লাভ করেছে, এসবই হচ্ছে এই পরিচয়ের মাধ্যমে। সুতরাং তাদের কাছে তখন কঠিন মনে হয়নি আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর উঠার বিষয়টি, অনুরূপ অন্যান্য যাবতীয় পূর্ণ গুণে গুণান্বিত হওয়ার বিষয়টি; কারণ তাদের অন্তর জুড়ে আছে যে, তাঁর কোনো দৃষ্টান্ত নেই, তাঁর অনুরূপ কোনো কিছু নেই, তাদের অন্তরে কখনও সৃষ্টির কারও মতো হওয়ার বিষয়টি উদিত হয়না; কারণ আল্লাহ

তা'আলা তাঁর নবীর যবানীতে তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, 'আল্লাহ তা'আলা তাঁর এক হাতে আসমানসমূহ ধরবেন, অপর হাতে যমীনকে ধরবেন, তারপর সেগুলোক নাড়াচাড়া করবেন।' আরও জানিয়েছেন যে, 'সাত আসমান ও সাত যমীন তাঁর হাতের কব্জির উপরে যেন তোমাদের কারও হাতে একটি সরিষার দানা।' আরও জানিয়েছেন যে, "আল্লাহ তা'আলা সকল আসমানকে এক আঙ্গুলের উপর রাখবেন, সকল যমীনকে এক আঙ্গুলের উপর রাখবেন, সকল পাহাড়কে এক আঙ্গুলের উপর রাখবেন, সকল গাছ-পালা আরেক আঙ্গুলের উপর, অনুরূপ সকল সৃষ্টিকে আরেক আঙ্গুলের উপর রাখবেন।"(৬৮০ আস-সাওয়া'য়িকুল মুরসালাহ (২/৪৩১-৪৩২)।

আল্লাহ তা'আলা বান্দার সাথে থাকা, কাছে থাকার সাথে যারা "আরশের উপর উঠা ও আরশের উপর থাকাকে গুলিয়ে ফেলেন, তাদের জন্য ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম বলেন, "আল্লাহর নৈকট্য বিদ্যা, বান্দার অন্তরকে আল্লাহর সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত করে দেয়। কারণ সাথে থাকার বিষয়টি দু'ধরনের:

এক. সাধারণভাবে সাথে থাকা; আর তা হচ্ছে জ্ঞান ও পরিবেষ্টনে সাথে থাকা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, - وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ "তিনি তোমাদের সাথে আছেন যেখানেই তোমরা থাক না কেন।" (সূরাহ আল-হাদীদ, আয়াত: ০৪) অনুরূপ আল্লাহ বলেন, أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - "তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন হিসেবে তিনি থাকেন না এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যেও হয় না যাতে ষষ্ঠজন হিসেবে তিনি থাকেন না। তারা এর চেয়ে কম হোক বা বেশি হোক তিনি তো তাদের সঙ্গেই আছেন তারা যেখানেই থাকুক না কেন।" (সূরাহ আল-মুজাদালাহ, আয়াত: ০৭)

দুই. বিশেষভাবে সাথে থাকা; আর তা হচ্ছে নৈকট্যের মাধ্যমে সাথে থাকা। যেমন, আল্লাহ বলেন, - إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ "নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে আছেন যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে এবং যারা মুহসিন।" (সূরাহ আন-নাহল, আয়াত: ১২৮) অনুরূপ আল্লাহর বাণী إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ - "নিশ্চয় আল্লাহ্ সবরকারীদের সাথে আছেন।" (সূরাহ আল-

বাক্বারাহ, আয়াত: ১৫৩) অনুরূপ আল্লাহর বাণী - وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ "আর নিশ্চয় মুহসিনদের সাথে আছেন।" (সূরাহ আল-'আনকাবূত, আয়াত: ৬৯) এ দ্বিতীয়টিই হচ্ছে নৈকট্যের মাধ্যমে সাথে থাকা। যাতে সাহায্য-সহযোগিতা, হিফাযত করা অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত উভয় অর্থই তাঁর পক্ষ থেকে বান্দার সাথী হওয়া সাব্যস্ত করে। তবে প্রথমটি হচ্ছে দেখা ও বেষ্টনের মাধ্যমে সাথে থাকা আর দ্বিতীয়টি সাহায্য-সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের মাধ্যমে সাথে থাকা। সুতরাং বুঝা গেল যে, **মা'আ** শব্দটির যার অর্থ সাথে থাকা, তা আরবী ভাষায় যথাযোগ্য সঙ্গী হওয়া বুঝায়; কখনও মিশে যাওয়া বা লেগে থাকা বুঝায় না, পড়শিত্বও বুঝায় না, পাশাপাশি অবস্থান করাও বুঝায় না। তাই যে কেউ এগুলোর কোনোটি মনে করবে সে তার খারাপ বুঝ থেকে তা বলেছে।

আর নৈকট্য: কুরআনুল কারীমে সেটা কখনও বিশেষ অর্থে ব্যতীত ব্যবহার হয়নি। আর এ বিশেষ অর্থেও তা দু' ভাবে এসেছে,

ক. তাঁকে যারা ডাকবে তাদের ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য তিনি আহ্বানকারীর নিকটে।

খ. তাঁর ইবাদাতকারী, তাদের সাওয়াব প্রদানের জন্য তিনি তাদের নিকটে।

প্রথমটির উদাহরণ যেমন, আল্লাহর বাণী: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ - "আর আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, (তখন বলে দিন যে) নিশ্চয় আমি অতি নিকটে। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তার আহবানে সাড়া দেই।" (সূরাহ আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ১৮৬) আর এজন্যই সাহাবায়ে কেরামের প্রশ্নের উত্তরে নাযিল হয়েছে, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, আমাদের রব কী নিকটে যে, আমরা তার সাথে মিনমিন করে কথা বলবো, নাকি দূরে, ফলে তাকে শব্দ করে ডাকবো? তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন।

দ্বিতীয়টির উদাহরণ হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমার বাণী, "একজন দাস তার মনিবের সবচেয়ে কাছে থাকে যখন সে সাজদায় থাকে, আর রব সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বান্দার সবচেয়ে কাছে

অবস্থান করে রাতের মধ্যভাগে; এটা হচ্ছে আল্লাহর বান্দাদের জন্য বিশেষ নৈকট্য যা তিনি তাঁর আনুগত্যশীলদের জন্য মঞ্জুর করেছেন।"

অনুরূপ সহীহ হাদীসে এসেছে, আবু মূসা আল-আশ'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কোনো এক সফরে ছিলাম । আমাদের শব্দসমূহ তাকবীর ধ্বনীতে মুখরিত হচ্ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বললেন, "হে লোকরা, তোমাদের নিজেদের ওপর কোমলতা অবলম্বন কর; কারণ তোমরা কোনো বধির কিংবা অনুপস্থিতকে ডাকছ না, নিশ্চয় তোমরা যাকে ডাকছ তিনি সর্বশ্রোতা ও নিকটে; তোমাদের কারও বাহনের ঘাড়ের থেকেও তিনি নিকেট।" এটাও বিশেষ ধরনের নৈকট্য; যা তাঁকে আহ্বানকারীর জন্য বিশেষভাবে নির্ধারিত যা দো'আ, প্রশংসা ও স্তুতির ইবাদাতের কারণে অর্জিত হয়। এভাবে কোনো সৃষ্টি কর্তৃক রব্বে করীমের নিকটে থাকা তাঁর পূর্ণরূপে সৃষ্টি থেকে আলাদা থাকা এবং তাঁর 'আরশের উপরে থাকাকে নিষেধ করে না। বরং নিকটে থাকা ও 'আরশের উপর সৃষ্টি থেকে আলাদা থাকা, দুটো জিনিস একই সাথে হতে পারে, একই সাথে হওয়াকে আবশ্যকও করে। কারণ এ নৈকট্য দুনিয়ার দেহ বিশিষ্টদের একে অপরের নিকটে থাকার মতো নয়। মহান আল্লাহ সে রকম হওয়া থেকে বহু উর্ধ্বে। এ তো ভিন্ন রকমের নৈকট্য ও নিকটে থাকা।" (মাদারিজুস সালেকীন (২/২৫৪-২৫৫)।

৩- তিনি এটা তুলে ধরার চেষ্টা করেন যে, 'আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের উপর উঠা' প্রমাণ করে যে, তিনি সৃষ্টি থেকে আলাদা। এ বিষয়টি সাব্যস্ত করতে তিনি বলেন,

"আল্লাহর বাণী, هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ - "তিনি ছয়দিনে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন। তিনি জানেন যা কিছু যমীনে প্রবেশ করে এবং যা কিছু তা থেকে বের হয়, আর আসমান থেকে যা কিছু অবতীর্ণ হয় এবং তাতে যা কিছু উত্থিত হয়। আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, আর তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।" (সূরাহ আল-হাদীদ, আয়াত: ০৪) এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে যে, স্রষ্টা তার সৃষ্টি থেকে আলাদা; কারণ তিনি সৃষ্টিকে নিজের সত্তার ভিতরে সৃষ্টি করেননি, বরং

তাদেরকে তার সত্তার বাইরে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তাদের থেকে আলাদা থেকেছেন তাঁর 'আরশের উপর উঠা'র মাধ্যমে। তিনি জানেন তারা যা যা করছে, তিনি তাদের দেখছেন, তার দৃষ্টি তাদেরকে ভেদ করে, আর জ্ঞান, ক্ষমতা, শ্রবণ, দেখার মাধ্যমে তিনি তাদেরকে ঘিরে রেখেছেন। এটাই হচ্ছে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কর্তৃক তারা যেখানেই থাকুক সেখানে তাদের সাথে থাকা।" (হাদিউল আরওয়াহ ইলা বিলাদিল আফরাহ: ২৯৫।)

তিনি "আরশ যে সবচেয়ে প্রশস্ত বড় ও সম্মানিত সৃষ্টি সেটা প্রমাণ করে তাতে উঠা ও সেখানে অবস্থান করা সবচেয়ে বড় ও মহৎ গুণের অধিকারী রাব্বুল আলামীন শানের সাথে সংগতিপূর্ণ সেটা বর্ণনা করে বলেন,

"আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের উপর উঠা' এ গুণটিকে প্রায়শই 'রহমান' নামটির সাথে যুক্ত করেন। যেমন তিনি বলেন, الرَّحْمَـٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ - "দয়াময় (আল্লাহ) 'আরশের উপর উঠেছেন।" (সূরাহ ত্বা- হা, আয়াত: ০৫), الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَـٰنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا - "তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠলেন। তিনিই 'রহমান', সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে যে অবহিত তাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।" (সূরাহ আল-ফুরক্বান, আয়াত: ৫৯) এভাবে দেখা যাচ্ছে, তিনি রহমান নাম নিয়েই 'আরশের উপর উঠেছেন। কারণ 'আরশ সকল সৃষ্টিকুলকে ঘিরে রেখেছে; যা তাতে জায়গা হয় আর রহমতও সকল সৃষ্টিকুলকে ঘিরে আছে, তাদের জন্য তা প্রশস্ত হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ - "আর আমার রহমত সবকিছুর জন্য প্রশস্ত"। (সূরাহ আল-আ'রাফ, আয়াত: ১৫৬) সুতরাং তিনি সবচেয়ে প্রশস্ত সৃষ্টির উপরে উঠেছেন সবচেয়ে প্রশস্ত গুণাবলি নিয়ে। এজন্যই তাঁর রহমত সবকিছুকে ঘিরে রয়েছে। সহীহ হাদীসে আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা যখন সৃষ্টির ফয়সালা করেন তখন তিনি একটি কিতাব লেখেন যা তাঁর নিকট 'আরশের উপর বিদ্যমান, তাতে লেখা রয়েছে, **ইন্না রহমাতি তাগলিবু গাজাবী** অর্থাৎ আমার রহমত আমার ক্রোধের ওপর প্রাধান্য পাবে"। অপর বর্ণনায় এসেছে, "সেটা তাঁর কাছে 'আরশের উপর"।

তাহলে চিন্তা করুন, এ কিতাবটিতে বিশেষ করে তাঁর রহমতের উল্লেখ রয়েছে আর সেটাকে তিনি তাঁর কাছে 'আরশের উপরই রেখেছেন, এবার তাহলে এটার সাথে আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী দু'টোর মিল খুঁজে দেখুন।

الرَّحْمَـٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ - "দয়াময় (আল্লাহ্) 'আরশের উপর উঠেছেন।" (সূরাহ ত্বা-হা, আয়াত: ০৫), الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَـٰنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا - "তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠলেন। তিনিই 'রহমান', সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে যে অবহিত তাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।" (সূরাহ আল-ফুরক্বান, আয়াত: ৫৯) দেখবেন, আল্লাহর মারেফত বা সত্যিকারের পরিচয় লাভের ক্ষেত্রে আপনার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে, যদি না সেটা আপনার পক্ষ থেকে তা'ত্বীল (অর্থশূন্য) করার নীতি ও জাহমী হওয়ার নীতি দ্বারা বন্ধ হয়ে থাকে।" (মাদারিজুস সালেকীন (১/৫৭)।

অন্যত্র তিনি আল্লাহর নাম 'আল-মালিক' হওয়ার দাবি হিসেবেও তিনি 'আরশের উপর উঠবেন, 'আরশের উপর থাকবেন সেটাকে সাব্যস্ত করার জন্য বলেছেন,

"আর আল্লাহর 'মালিক' বা বাদশাহ নামটি প্রমাণ করছে তাঁর প্রকৃত রাজত্বের দাবি অনুসারে তাঁর থাকবে ক্ষমতা, পরিচালনা, দান করা, নিষেধ করা, সাওয়াব দেয়া, শাস্তি দেয়া, তাঁর রাজত্বের চারদিকে তার দূতদের প্রেরণ করা, তাঁর দাসদেরকে তাঁকে সম্মান প্রদর্শনের নিয়ম- কানুন জানিয়ে দেয়া, তাদের কাছ থেকে আনুগত্যের অঙ্গীকার নেয়া, তাঁর রাজকীয় খাটের উপর উঠা, যার অপর নাম হচ্ছে তাঁর মহান 'আরশ।" (মাদারেজুস সালেকীন (৩/৩৭৪-৩৭৫)।

অন্যত্র তিনি এটা তুলে ধরেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজেকে 'আরশের মালিক বলা দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ 'আরশ একান্তভাবেই তাঁর। অন্য কেউ তাতে উঠবে এমনটি কখনও উপযোগী নয়। তিনি বলেন,

"আর মহান আল্লাহ তাঁর নিজেকে 'যুল 'আরশ' 'আরশ ওয়ালা গুণ দিয়ে গুণান্বিত করা, যার পরিমাণ তিনি ব্যতীত আর কেউ নির্ধারিতভাবে বলতে পারে না, এটা প্রমাণ করে যে, তাঁর সাথে বিশেষায়িত এ 'আরশ তিনি ব্যতীত আরও কারও জন্য তার উপরে উঠা উপযোগী হবে না। অনুরূপ তিনি 'মাজদ' বা 'মহামর্যাদা'র গুণে গুণান্বিত করলেন, প্রশস্ত জ্ঞান, ক্ষমতা, রাজত্ব, অমুখাপেক্ষিতা, দান, বিশেষ দাক্ষিন্ন, সম্মান প্রদান এসব তাঁর গুণ একান্তভাবে তাঁর হওয়ার কারণেই।" (আত-তিবইয়ান ফী আক্বসামিল কুরআন, পৃ. ৯৮।)

৭-তাছাড়া তিনি তাঁর ই'লামুল মুওয়াক্কে'ঈন গ্রন্থে আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের উপর রয়েছেন সেটাকে অনেকগুলো উদাহরণের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, বিদ'আতপন্থীদের মূল কাজ দু'টি: এক. হাদীস দ্বারা কোনো কিছু তাদের মনঃপুত না হলে সেটাকে কুরআনের বিরোধী প্রমাণে উঠে পড়ে লাগা। দুই. কুরআনের কোনো কিছু মনঃপুত না হলে, সেটা যদিও সম্পূর্ণভাবে মুহকাম বা সুদৃঢ় অর্থের বিষয় হয়, তবুও সেটাকে মুতাশাবিহ বানানোর জন্য যাবতীয় প্রচেষ্টা নিবদ্ধ করা। (ই'লামুল মুওয়াক্কে'ঈন (২/২০৯)। এ দু'টি নীতিই আমরা যাবতীয় পথভ্রষ্ট দলগুলোর মাঝে কমন হিসেবে দেখতে পাই।

তারপর ইবনুল কাইয়্যেম রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের উপর সেটা প্রমাণ করার জন্য ১৮ (আঠারো) প্রকার দলীল উপস্থাপন করেছেন। (ই'লামুল মুওয়াক্কে'ঈন (২/২০৯-২১৭)।

অনুরূপভাবে ইবনুল কাইয়্যেম তাঁর নূনিয়া কাব্যগ্রন্থে একটি নমূনা বিচার ব্যবস্থা করেছেন, যাতে 'আল্লাহর 'আরশের উপর উঠা' বলার পক্ষের আর যারা বিপক্ষে রয়েছে তাদের মধ্যে মুনাযারা ব্যবস্থা করে দেখিয়েছেন যে, 'আরশের উপর উঠেছে যারা বলেছে তারা ব্যতীত অন্যদের দেয়ার মতো দলীল নেই। তারপর তিনি বলেন, "কেউ আমাদেরকে মুজাসসিমা(দেহবাদী), মুশাব্বিহা (সাদৃশ্য স্থাপনকারী) বা হাশওয়িয়্যাহ (বেহুদা বক্তৃতাকারী) বললেই তাদের এসব মিথ্যা বদনামীর ভয়ে আমরা আমাদের রবের গুণে তাকে গুণান্বিত করা ছেড়ে দিব? কখনওনা।" (আলে ঈসা, শারহুল কাফিয়্যাতুস শাফিয়্যাহ-১/১৬)

এ হচ্ছে সামান্য কিছু উদাহরণ; যার মাধ্যমে আমরা ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম রাহিমাহুল্লাহ কর্তৃক "আল্লাহর আরশের উপরে উঠা এ গুণটি সাব্যস্ত করার বিভিন্নমুখী প্রচেষ্টা এখানে তুলে ধরলাম । বস্তুত ইবনুল কাইয়োমের মত এ ব্যাপারে এতই প্রসিদ্ধ যে, তার জন্য দলীল পেশ করার খুব বেশি প্রয়োজন হয় না।

ইমাম ইবন কাসীর (৭৭৪ হিজরী) রাহিমাহুল্লাহ

ইমাম ইবন কাসীর রাহিমাহুল্লাহ সালাফে সালেহীনের পথের পথিক ছিলেন। তিনি একাধারে মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ঐতিহাসিকসহ বহু গুণের অধিকারী ছিলেন। তার বিভিন্ন গ্রন্থে তিনি আল্লাহর গুণাবলি সম্পর্কে আহলুস

সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের নীতিমালা বর্ণনা করেছেন এবং 'আরশের উপর উঠার বিষয়টিও তুলে ধরেছেন। নিম্নে আমরা আমাদের কথার সমর্থনে কয়েকটি ভাষ্য বর্ণনা করব।

ইবন কাসীর রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহর গুণাবলির ব্যাপারে কী নীতি অবলম্বন করতে হবে তা বর্ণনা করে বলেন, "আল্লাহর বাণী, 'তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠলেন'। এ জায়গায় এসে লোকদের মাঝে বহু মতামত লক্ষ্য করা যায়। এ ব্যাপারে আমরা শুধুমাত্র সালাফে সালেহীন বা পূর্ববর্তী সহীহ আমলকারী বিজ্ঞজনদের মতামত অবলম্বন করছি। তাঁরা হচ্ছেন মালিক, আওযা'ঈ, সাওরী, লাইস ইবন সা'দ, শাফে'য়ী, আহমাদ, ইসহাক ইবন রাহওয়াইহ এবং ইসলামের নবীন ও প্রবীণ গ্রহণযোগ্য মুসলিম ইমামগণ। আর সে মতামত হচ্ছে এই যে, যা কিছু আল্লাহ তা'আলা বলেছেন সেটাকে কোনো প্রকার ধরন অথবা সাদৃশ্য অথবা অর্থহীন করা ছাড়াই সাব্যস্ত করে নিতে হবে। আর যারা সাদৃশ্য নির্ধারণ করে তাদের মনে যে প্রকাশ্য অর্থের সঞ্চার হয় তা আল্লাহ থেকে নিষেধ করতে হবে। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন: - لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ - وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ "তাঁর মতো কোনো কিছু নেই, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।" (সূরাহ আশ-শূরা, আয়াত: ১১) বরং বিষয়টি তেমনভাবে সাব্যস্ত করতে হবে, যেমনটি ইমামগণ বলেছেন। এদের মধ্যে নু'আঈম ইবন হাম্মাদ আল-খুযা'ঈ অন্যতম, যিনি হচ্ছেন ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ'র উস্তাদ। তিনি বলেন: যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে কোনো মাখলুকের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত করে সে কাফির হয়ে যাবে, আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা যেসব গুণে নিজেকে ভূষিত করেছেন তা অস্বীকার করবে সে কাফির হয়ে যাবে।" বস্তুত আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আল্লাহর জন্য যা সাব্যস্ত করেছেন তাতে কোনো সাদৃশ্য নেই। তাই যেসব গুণ স্পষ্টরূপে আল্লাহর কিতাবের আয়াতসমূহে ও বিশুদ্ধ হাদীসগুলোতে বর্ণিত হয়েছে, যদি কেউ আল্লাহর সম্মান ও মর্যাদার সাথে উপযোগী করে সাব্যস্ত করবে এবং তাঁর থেকে সর্বপ্রকার ত্রুটি অস্বীকার করবে, সে ব্যক্তিই সঠিক পথে চলতে সমর্থ হয়েছে।" (ইবনু কাসীর তাফসীর, ৩/৪২৭)

তাছাড়া তিনি তাঁর তাফসীর গ্রন্থের অন্যত্র আল্লাহ তা'আলার মুষ্ঠির ভিতরে যমীন থাকার বিষয়টি তুলে ধরে বলেন,

"এ বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত অনেকগুলো হাদীস এসেছে, এ ব্যাপারে ও অনুরূপ বিষয়ে নীতি হলো, সালাফদের মতকে গ্রহণ করে নেয়া, আর তা হচ্ছে,

যেভাবে এসেছে সেভাবে চালিয়ে নেয়া, কোনো প্রকার ধরন নির্ধারণ করা যাবে না, বিকৃতি সাধনও করা যাবে না।" (ঐ, ৭/১১৩)

ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী রাহিমাহুল্লাহ (৭৯২ হিজরী)

ইমাম ইবন আবিল ইযয আল-হানাফী রাহিমাহুল্লাহ আকীদাহ বিষয়ক ইমাম ত্বাহাওয়ীর ভাষ্যের ওপর যে ব্যাখ্যা রচনা করেছেন তা কালজয়ী ভাষ্যের মর্যাদা পেয়েছে। তাঁর এ গ্রন্থ থেকে পরবর্তী সকল হানাফী আলেমগণ উপকৃত হয়েছেন। বিশেষ করে মোল্লা আলী ক্বারী আল- হানাফী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর 'শারহুল ফিকহিল আকবার' গ্রন্থে তা ইমাম ইবন আবিল ইযয থেকে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম ইবন আবিল ইযয রাহিমাহুল্লাহ'র এ গ্রন্থটি এতই গ্রহণযোগ্য হয়েছে যে, পরবর্তীকালে বিভিন্ন আলেমগণের নিকট তা সংক্ষিপ্ত আকীদাহ'র গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তা পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সে গ্রন্থ থেকে আমরা যৎ সামান্য কিছু এখানে বর্ণনা করব। ইমাম ইবন আবিল ইযয রাহিমাহুল্লাহ 'আরশ ও কুরসীর বাস্তবতা তুলে ধরে বলেন,

"আর আরশ ও কুরসী সত্য। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন। - ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ "আরশের অধিকারী ও সম্মানিত।" (সূরাহ আল-বুরূজ, আয়াত: ১৫) - ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ "তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন।" (সূরাহ আস-সাজদাহ, আয়াত: ০৪) الرَّحْمَـٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ - "দয়াময় (আল্লাহ) 'আরশের উপর উঠেছেন।" (সূরাহ ত্বা-হা, আয়াত: ০৫) فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ - لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ - "তিনি ছাড়া কোন হক্ক ইলাহ্ নেই; তিনি সম্মানিত 'আরশের রব।" (সূরাহ আল-মুমিনূন, আয়াত: ১১৬)- اللَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ "আল্লাহ্, তিনি ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ্ নেই, তিনি মহা 'আরশের রব।" (সূরাহ আন-নামল, আয়াত: ২৬) الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً - "যারা 'আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা এর চারপাশে আছে, তারা তাদের রবের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সাথে এবং তাঁর ওপর ঈমান রাখে, আর মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।" (সূরাহ গাফির, আয়াত: ০৭) وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ - "আর সেদিন আটজন ফিরিশতা আপনার রবের 'আরশকে ধারণ করবে তাদের উপরে।"

(সূরাহ আল-হাক্কাহ, আয়াত: ১৭) "আর আপনি ফিরিশতাদেরকে দেখতে পাবেন যে, তারা 'আরশের চারপাশে ঘিরে তাদের রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে।" (সূরাহ আয-যুমার, আয়াত: ৭৫) অনুরূপ বিপদগ্রস্তের দো'আয় সহীহ বুখারীতে এসেছে, "আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নেই, তিনি অতি মহান ও সহনশীল। আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য মা'বুদ নেই, তিনি বিশাল 'আরশের মালিক, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই, তিনি আসমানের রব, যমীনের রব ও সম্মানিত 'আরশের রব।" (সহীহ বুখারী, ৬৩৪৬)

তারপর তিনি হাদীসে আও'য়াল নামক 'আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর বিখ্যাত হাদীস নিয়ে আসেন, যাতে 'আরশকে সাত আসমানের উপরে সাব্যস্ত করা হয়েছে, আল্লাহকে তাঁর উপর সাব্যস্ত করা হয়েছে।

তারপর তিনি বেদুঈনের সে হাদীস নিয়ে এসেছেন, যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা তাকে বলেছেন যে, 'আরশ আসমানসমূহের উপর গম্বুজের ন্যায়। তারপর তিনি বুখারীর সে হাদীস নিয়ে আসেন, যাতে জান্নাতের উপর আল্লাহর 'আরশের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর তিনি কিয়ামতের দিন মূসা 'আলাইহিস সালাম কর্তৃক 'আরশের খুঁটি ধরে রাখার হাদীসটি নিয়ে আসেন। তারপর তিনি 'আরশ বলে যে খাট বুঝানো হয় সেটা সাব্যস্ত করেছেন এবং সেটা যে কুরসী নয়, কুরসী যে আল্লাহর পা রাখার স্থান তা সাব্যস্ত করেন। (শারহুত ত্বাহাওয়িয়্যাহ- ২৫৪-২৬২)

ইমাম ইবন আবিল ইযয রাহিমাহুল্লাহ 'আরশ সাব্যস্তের পর 'আরশ সবকিছুর উপর সেটাও দলীল-প্রমাণ দিয়ে সাব্যস্ত করেন, তারপর তিনি আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের উপর উঠেছেন সেটা সাব্যস্ত করার জন্য অনেক ধরনের দলীল পেশ করেন, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ হচ্ছে,

১) কুরআনুল কারীমে ফিরিশতাগণ কর্তৃক আল্লাহকে ভয় করার ব্যাপারটি উল্লেখের সময় বলা হয়েছে,

يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ -

"তারা ভয় করে তাদের উপরস্থ তাদের রবকে এবং তাদেরকে যা আদেশ করা হয় তারা তা করে।" (সূরাহ আন-নাহল, আয়াত: ৫০) এখানে তাদের উপর থেকে তাদের রবকে ভয় করে বলা হয়েছে। আর এখানে (মিন)

অব্যয়টি ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে 'উপরে নয়' বলার যুক্তি কেউ দেখাতে পারবে না।

২) কুরআনুল কারীমে সরাসরি আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর বান্দাদের উপর বলা হয়েছে। যেমন,

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ -

"আর তিনিই আপন বান্দাদের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণকারী।" (সূরাহ আল-আন'আম, আয়াত: ১৮)

৩) কুরআনুল কারীমে তাঁর দিকে বিভিন্ন জিনিস ও প্রাণী উত্থিত হয় বলা হয়েছে। আর উত্থিত হওয়ার অর্থই যার দিকে উত্থিত হয় তিনি উপরে। যেমন- আল্লাহ বলেন,

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ -

"ফিরিশতা এবং রূহ আল্লাহর দিকে ঊর্ধ্বগামী হয়।" (সূরাহ আল-মা'আরিজ, আয়াত: ০৪)

৪) কুরআনে আল্লাহ তাঁর দিকে বিভিন্ন জিনিস আরোহন করার কথা বলেছেন। যেমন, ইলাইহি ইয়াস আদুল কালিমুত তাইয়্যিব "তাঁরই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ হয় সমুত্থিত।" (সূরাহ ফাতির, আয়াত: ১০)

৫) কুরআনে আল্লাহ তা'আলা তাঁর দিকে কোনো কিছু উঠানোর কথা বলেছেন, যেমন,

بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ - "বরং আল্লাহ্ তাকে তাঁর নিকট তুলে নিয়েছেন।" (সূরাহ আন-নিসা, আয়াত: ১৫৮)

৬) কুরআনে আল্লাহ তা'আলার জন্য 'আলী' বা উপরে থাকার গুণ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, - وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

"আর তিনি সুউচ্চ সুমহান।" (সূরাহ আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ২৫৫)

৭) কুরআনুল কারীমে আল্লাহর কাছ থেকে কিছু অবতরণ করার কথা বলা হয়েছে,- تَنزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ

"এ কিতাব সৃষ্টিকুলের রবের পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া, এতে কোনো সন্দেহ নেই।" (আস-সাজদাহ, আয়াত: ০২)

৮) কুরআনুল কারীমে ও হাদীসে বিশেষ বিশেষ সৃষ্টি আল্লাহর কাছে থাকার কথা বলা হয়েছে,

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ -

"নিশ্চয় যারা আপনার রবের সান্নিধ্যে রয়েছে তারা তাঁর ইবাদাতের ব্যাপারে অহংকার করে না। আর তারা তাঁরই তাসবীহ পাঠ করে এবং তাঁরই জন্য সাজদাহ করে।" (সূরাহ আস- সাজদাহ, আয়াত: ১৫)

৯) কুরআনে আল্লাহ তা'আলা নিজেকে আসমানের উপর ঘোষণা করেছেন। যেমন, أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ

"তোমরা কি এ থেকে নির্ভয় হয়েছ যে, যিনি আসমানে রয়েছেন তিনি তোমাদেরকে সহ যমীনকে ধ্বসিয়ে দেবেন, অতঃপর তা হঠাৎ করেই থর থর করে কাঁপতে থাকবে?" (সূরাহ আল-মুলক, আয়াত: ১৬)

১০) কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা নিজেকে 'আরশের উপর উঠেছেন বলে ঘোষণা করেছেন।

ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ -

"এরপর তিনি 'আরশের উপরে উঠেছেন।" (সূরাহ আল-আ'রাফ, আয়াত: ৫৪)

১১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহীহ হাদীসে আল্লাহ তা'আলা প্রথম আসমানে প্রতি রাতে নেমে আসার কথা বর্ণিত হয়েছে। আর নেমে আসা উপর থেকেই হয়।

১২) আল্লাহর দিকে হাত তোলে দো'আ করার কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

১৩) হাদীসে এসেছে, উপরের দিকে ইঙ্গিত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম থেকে সাক্ষ্য নিয়েছেন।

১৪) হাদীসে এসেছে, 'আল্লাহ কোথায়' এমন প্রশ্ন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা এক দাসীকে করেছিলেন।

১৫) হাদীসে এসেছে, 'আল্লাহ কোথায়' প্রশ্নের জবাবে সে দাসী 'আসমানে' বলেছিল।

১৬) ফির'আউন আসমানে চড়ার চেষ্টা করেছিল আল্লাহকে দেখার জন্য। যেমনটি কুরআনে এসেছে।

১৭) মি'রাজের রাত্রে বারবার মূসা ও আল্লাহর কাছে উপরের দিকে গমন করার বিষয়টি বহু সহীহ হাদীসে এসেছে।

১৮) হাদীসে এসেছে, জান্নাতীরা আল্লাহর দিকে জান্নাত থেকে উপরের দিকে তাকাবেন।

১৯) তাছাড়া বিবেকের যুক্তি বলে, উপরে থাকা সবচেয়ে সম্মানের বিষয়, তাই আল্লাহর জন্য তা সাব্যস্ত হবে।

২০) স্বভাবজাত প্রকৃতি বা ফিত্বরী প্রমাণ হচ্ছে, সৃষ্টি মাত্রই তার বিপদাপদে উপরের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। তবে যার প্রকৃতি নষ্ট হয়ে গেছে তার কথা ভিন্ন। (শারহুত ত্বাহাওয়িয়্যাহ: ২৬৩-২৭৩ থেকে সংক্ষেপিত।)

ইমাম ইবন আবিল ইয্য রাহিমাহুল্লাহ সূরাহ আল-আ'রাফের আয়াতের তাফসীরে 'ইস্তাওয়া'র ধরন

সম্পর্কে বলেন,

"আল্লাহর বাণী, 'তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠলেন' কীভাবে তিনি উঠলেন? তখন ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ বললেন, 'ইস্তেওয়া" এর অর্থ জানা, এর ধরন অজানা।' এ একই উত্তর উম্মে সালামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে, মাওকুফ সূত্রে ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা থেকে মারফূ- সূত্রে।" (শারহুল আকীদাতুত ত্বাহাওয়িয়্যাহ, ৩৭২-৩৭৩।)

ইমাম ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহর নাম ও গুণের ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নীতির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

"যখন ইমাম ত্বাহাওয়ী রাহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করলেন যে, কুরআন বাস্তবেই আল্লাহর বাণী, তখন তিনি সাবধান করতে চাইলেন যে, মহান আল্লাহ তাঁর গুণসমূহে মানুষের মতো নয়। সাব্যস্ত করার পরে সাদৃশ্য স্থাপন করাকে অস্বীকার করার জন্য। অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা, যদিও তাকে কথা বলার গুণে গুণান্বিত করছি, কিন্তু তাঁর সে কথাকে মানুষের সাথে অর্থপূর্ণ করে সাব্যস্ত করা যাবে না, যেভাবে মানুষ কথা বলার গুণ অর্জন করে সেভাবে নয়। কারণ

আল্লাহ তা'আলা তাঁর মতো কোনো কিছু নেই, তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা। যারা কোনো প্রকার সাদৃশ্য স্থাপন ও অস্বীকৃতি করণের মাঝে অবস্থান করে আল্লাহর গুণাবলি সাব্যস্ত করে তাদের ব্যাপারে কত সুন্দর উদাহরণ দিয়ে বলা হয় যে, সে যেন অস্বীকৃতির বিষ্টা ও সাদৃশ্যের রক্তে মাঝখান থেকে বের হয়ে আসা এমন খাঁটি দুধ সংগ্রহ করলো যা পানকারীর জন্য উপাদেয় ।" (শোরহুত ত্বাহাওয়িয়্যাহ, পৃ. ১৫২।)

শাইখুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মাদ ইবন আবদুল ওয়াহহাব রাহিমাহুল্লাহ (১২০৬ হিজরী)

শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবন আবদুল ওয়াহহাব রাহিমাহুল্লাহ সালাফে সালেহীনের পথের পথিক ছিলেন। তাকে আমরা ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম, ইমাম যাহাবী, ইমাম ইবন আবদুল হাদী, ইমাম ইবন কাসীর এর জ্ঞানের সঠিক উত্তরসূরী হিসেবে দেখতে পাই।

সুতরাং আল্লাহর নাম ও গুণের ক্ষেত্রে তিনি এক বিন্দুও পূর্বসূরীদের মত ও পথের বাইরে যাননি। তিনি আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণের ক্ষেত্রে কী আকীদাহ-বিশ্বাস পোষণ করেন তা তার গ্রন্থসমূহে তুলে ধরেছেন। তার অধঃস্তন বংশধররাও সেটা তাদের গ্রন্থে ব্যক্ত করেছেন। উদাহরণস্বরূপ আমরা এখানে বেশ কিছু ভাষ্য তুলে ধরার চেষ্টা করব:

আল্লাহর নাম ও গুণের ক্ষেত্রে কী আকীদাহ তিনি পোষণ করেন তা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন,

"আল্লাহর ওপর ঈমানের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে তাঁর নিজেকে যেসব গুণে গুণান্বিত করেছেন, অনুরূপ তাঁর নবীর যবানীতে যেসব গুণ দ্বারা ভূষিত করেছেন তার ওপর ঈমান আনা, কোনো প্রকার বিকৃতি, অর্থশূন্যতা না করে। বরং আমি বিশ্বাস করি যে, "আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর মতো কোনো কিছু নেই, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" সুতরাং আমি তাঁর কোনো গুণকে অস্বীকার করি না, যা দিয়ে তিনি নিজেকে গুণান্বিত করেছেন, আর সেসব বাক্যকে তার স্থানচ্যুত করি না। তাঁর নাম ও আয়াতসমূহে ইলহাদ তথা বক্রপথ অবলম্বন করি না। সেগুলোর ধরন নির্ধারণ করি না, তাঁর গুণসমূহকে সৃষ্টির কোনো গুণের সাথে উপমা প্রদান করি না; কারণ আল্লাহ তা'আলা তাঁর নেই কোনো সমনামের কেউ, নেই কোনো

সমপর্যায়ের কেউ, নেই কোনো তাঁর সদৃশ কেউ, আর তাঁকে তার সৃষ্টির উপরও কিয়াস করা যাবে না। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের ব্যাপারে ও অন্যদের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি জানেন, সবচেয়ে সত্য কথা বলেন, সবচেয়ে উত্তম বক্তব্য প্রদান করেন। এভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বয়ং তাঁর বিরোধী ধরন নির্ধারণকারী এবং সাদৃশ্য স্থাপনকারীরা যেসব গুণে তাকে গুণান্বিত করে তা থেকে নিজেকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন। (কারণ তাঁর সম্পর্কে না জেনে খারাপ গুণে তাঁকে গুণান্বিত করে থাকে) অনুরূপ বিকৃতকারী ও অর্থশূন্যকারীদের দ্বারা তাদের গুণ অস্বীকার করা থেকেও তিনি নিজেকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন। তাই তিনি বলেন, سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ - وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - "তারা যা আরোপ করে, তা থেকে পবিত্র ও মহান আপনার রব, সকল ক্ষমতার অধিকারী। আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলদের প্রতি। আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই প্রাপ্য।" (সূরাহ আস-সাফফাত: ১৮০-১৮২) মাজমূ'মুওয়াল্লাফাতিশ শাইখ (৫/৮)।

শাহ ইসমা'ঈল ইবন আবদুল গনী ইবন ওয়ালীউল্লাহ আদ-দেহলাওয়ী রাহিমাহুল্লাহ (১২৪৬ হিজরী)

শাহ ইসমা'ঈল ইবন আবদুল গনী ইবন ওয়ালিউল্লাহ আদ-দেহলাওয়ী রাহিমাহুল্লাহ সহীহ আকীদাহ'র একজন মুজাহিদ ছিলেন। যিনি একাধারে কলম, মুখ ও হাত সবকিছু দিয়ে জিহাদ করেছেন আর এ পথেই ইনশাআল্লাহ শহীদ হিসেবে দুনিয়া থেকে চলে গেছেন। তার জীবনের অধিকাংশ জিহাদ ইংরেজদের (শিখ, পৌত্তলিক) বিরুদ্ধে, উপমহাদেশের মানুষের শির্ক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে। তবে আল্লাহর নাম ও গুণের ক্ষেত্রেও তিনি অবদান রেখেছেন। নিম্নে আমরা অনুরূপ কয়েকটি ভাষ্য বর্ণনা করব। তিনি তাঁর 'তাযকীরুল ইখওয়ান' গ্রন্থে বলেন, "আল্লাহর ওপর ঈমানের উদ্দেশ্য, দৃঢ়ভাবে এ বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ তা'আলা তিনিই স্রষ্টা, মালিক, যিনি প্রয়োজন পূরণ করেন, বিপদ থেকে উদ্ধার করেন, তাকে রিযিক দেন। আর এ বিশ্বাস করা যে, সে সত্তার জন্যই যাবতীয় হামদ ও যাবতীয় উত্তম সৌন্দর্য, যাবতীয় পূর্ণ গুণাবলি, তাঁকে যাবতীয় দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত ঘোষণা করা, তাঁর কাছেই সর্বাবস্থায় ধর্ণা দেয়া, কষ্ট ও আনন্দ সর্বাবস্থায় তাঁর শুকর করা।"

তিনি রাদ্দুল ইশরাক গ্রন্থে বলেন, "আর 'উলুহিয়াত' বা মা'বুদ বলা অর্থ হচ্ছে, যাকে ইলাহ মানছে তার ব্যাপারে এ বিশ্বাস করা যে, তিনি সর্বব্যাপী জ্ঞান অথবা ইচ্ছা ও দাপটে শক্তিতে গুণান্বিত হওয়ার মাধ্যমে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে সকল সৃষ্টিকুলের মাঝে তার কোনো উপমা কিংবা সমপর্যায়ের হওয়া থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে।"

অন্যত্র তিনি বলেন, "আর আল্লাহর গুণাবলির ব্যাপারে বিবেকের যুক্তি খাটানো জায়েয নেই, যেমনটি জায়েয নেই **"আর-রহমানু 'আলাল 'আরশ ইস্তাওয়া", রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন,** (সূরাহ ত্বা-হা, আয়াত: ০৫); কারণ আমি বিশ্বাস করি এতে বিবেকের যুক্তি খাটানো যাবে না। আর এটি বিখ্যাত ও স্বীকৃত নিয়ম যে, সালাফগণ এ বিশ্বাসই পোষণ করতেন, ইস্তেওয়া এর অর্থ জানা, ধরন অজানা। আর এটাই 'ইস্তেওয়া' এর অধ্যায়ে সাব্যস্ত নীতি। আমার মনে পড়ে পরবর্তীরা 'শারহে আকায়েদে নাসাফী' তে এগুলোতে অপব্যাখ্যা করেছে"। এখানে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, ইস্তেওয়া এর ধরণ নির্ধারণে বিবেকের যুক্তি খাটানো জায়েয নেই। তারপর তিনি সহীহ আকীদাহ-বিশ্বাসের প্রতিনিধিত্বকারী ইমাম মালিকের সে ঐতিহাসিক উক্তিটি নিয়ে আসেন।

অন্যত্র তিনি বলেন, "আর সকল নবী-রাসূল, সকল ওলীগণ, যদি তাদেরকে আল্লাহর বড়ত্ব ও ক্ষমতার দিক থেকে কিয়াস করা হয় তবে তারা সবাই একটি সরিষা দানার চেয়ে ছোট বিবেচিত হবেন, আর তাঁর আরশ, যা আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টন করে আছে সেগুলোর উপরে গম্বুজের মতো হয়ে, তাকে নিয়ে এমন ভার জনিত শব্দ করে যা সাওয়ারী নিয়ে কোনো বাহন করে থাকে। তাহলে একজন সৃষ্টি কীভাবে তাঁর বড়ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারে বা ধারণ করতে পারে? কে এমন আছে যে তাঁর রাজত্বে অনুপ্রবেশ করার দুঃসাহস দেখাতে পারে বা কে এমন আছে যে সে রাজত্বে তার নির্দেশ চালু করতে পারে? তিনিই তো কেবল যা ইচ্ছা করতে পারেন, যা ইরাদা করেন তা নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। তাঁর কোনো মন্ত্রী কিংবা পরামর্শদাতার প্রয়োজন পড়ে না। ক্ষণিকের মাঝে এত বেশি বিষয় তিনি পরিচালনা করেন যার ওপর কোনো পরিসংখ্যান অনুষ্ঠিত হয়নি, যা হিসেব করে শেষ করা যাবে না। তাহলে সে সত্তা কীভাবে অন্যের কাছে সুপারিশ করবে? আর তিনি ব্যতীত এমন কে আছে যে সকল কাজ যেভাবে ইচ্ছা করতে পারে?

আশ্চর্য্যের বিষয়, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আল্লাহ যাকে সকল সৃষ্টির উপর মর্যাদাবান করেছেন, বেদুঈন থেকে একটি বাক্য, যে বাক্যে বুঝা গিয়েছিল যে, সে আল্লাহ সম্পর্কে না জেনে-বুঝেই তা বলেছে, উক্ত বাক্য শোনা মাত্রই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তর আল্লাহর ভয়ে পূর্ণ হয়ে গেল, তখন তিনি আল্লাহর বড়ত্ব প্রকাশক বর্ণনা দিলেন, যিনি জানিয়ে দিলেন, তাঁর বড়ত্ব আরশ থেকে ফরাস পর্যন্ত সবকিছু থেকে বেশি, তাহলে কিছু মানুষের কী হলো যে, তারা তাদের জিহ্বা লম্বা করে আজেবাজে কথা বলে, তারা পাগলামীপূর্ণ বাক্য ও দুঃসাহস দেখিয়ে কথা বলছে, এর মাধ্যমে তারা এমনসব কথা বিনা বাধায় অনর্গল বলে চলেছে যার কারণে আসমান ফেটে পড়ার উপক্রম হয়, যমীন ফেটে চৌছির হয়ে যেতে চায়, পাহাড়সমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাওয়ার মতো হয়ে যায়, তারা মহান আল্লাহর ব্যাপারে এমনসব কথা বলে যাতে মনে হচ্ছে যেন আল্লাহর সাথে তাদের দুলালীপনা চলে অথবা আল্লাহর সাথে তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। তাদের কেউ কেউ বলে, আমি আমার রবকে এক পয়সার বিনিময়ে কিনে নিয়েছি, তাদের অপর কেউ বলে, আমি আমার রবের চেয়ে দু' বছরের বড়, তাদের তৃতীয়জন বলে, যদি আমার রব আমার পীর সাহেবের সূরত ছাড়া অন্য কোনো সূরতে প্রকাশ পায় তাহলে তার দিকে আমি চোখ তুলে তাকাবো না।"... আল্লাহর কাছে তাঁর সাথে আদব ও শিষ্টাচার রক্ষার তাওফীক চাই; কারণ বেআদব আল্লাহর দয়া থেকে বঞ্চিত হয়। অন্যত্র শাহ ইসমাঈল শহীদ রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহ তা'আলার সকল গুণাবলি সাব্যস্ত করে বলেন,

আশ্চর্যের বিষয়, শরী'আত প্রচারক নবী রাসূলগণ কখনও আল্লাহর বাণীকে প্রকাশ্য অর্থ থেকে ভিন্ন অর্থে পরিচালিত করার সামান্যতম প্রমাণও প্রতিষ্ঠা করেননি। তাদের সারা জীবনে কখনো বলেননি যে, মহান রবের দিকে আমরা যা সম্পর্কিত করছি তা থেকে তিনি পবিত্র। তাছাড়া এসব ভাষ্যের তা'ওয়ীলকারী তথা অপব্যাখ্যাকারীরা যেসব অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে এসব গুণাবলীর বিধান আল্লাহ থেকে অস্বীকার করেছে সেসব দাবীর পক্ষে কোনো সহীহ হাদীস কিংবা দুর্বল হাদীস দিয়েও তারা প্রমাণ করতে পারেনি। বস্তুত এভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বাণীর অপব্যাখ্যা করার মাধ্যমে তারা শরী'আত প্রচারক নবী-রাসূলগণের দিকে পথভ্রষ্ট করার দোষ চাপাচ্ছে, 'আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই' বরং এদের এসব কর্মকাণ্ড মহান আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলার ওপর অভিযোগ-আপত্তি তোলারই নামান্তর; কারণ তাদের এসব কর্মকান্ডের অর্থ হচ্ছে তারা যেন বলতে চাচ্ছে আল্লাহ যেসব লোকদেরকে

হিদায়াতের জন্য পছন্দ করে নিয়েছেন হিদায়াতের অধ্যায়সমূহের এ অধ্যায়, অর্থাৎ ইলাহিয়াত বা আল্লাহর সংক্রান্ত আকীদার কী হবে, যা শরীআতের প্রধান স্তম্ভরূপে বিবেচিত, তাতে তারা হক কথা প্রকাশ করেননি, বা তাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন এমন কিছু যা বাস্তবের সাথে কোনো মিল নেই। "আল্লাহ তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, এ তো প্রকাশ্য অপবাদ"। বরং এসব লোকেরা শরী'আতের বাঁধন তাদের ঘাঁড় থেকে খুলে ফেলেছে, তারা কোনো কিছুতেই আহলুস সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত নয়, যদিও তাদের কেউ কেউ নিজেদেরকে এ নামে ভূষিত করে থাকে। বরং সত্যিকারের আহলুস সুন্নাত হচ্ছে, সাহাবায়ে কেরাম ও তাদের সুন্দর অনুসারীগণ। সুতরাং আমরা কখনো আমাদের পিছনের দিকে প্রত্যাবর্তন করবো না, যখন আমরা শুনব, ১-রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন। ২-তিনি প্রতি রাতে নিকটতম আসমানে নেমে আসেন। ৩-তিনি বান্দা ও অন্তরের মাঝে বাধা হয়ে যান। ৪-তিনি মূসাকে ডেকেছেন ডান দিকের পাহাড় থেকে পবিত্র ভূমি থেকে, গাছ থেকে, হে মূসা! ৫-তিনি পাহাড়ের উপর তাজাল্লী বা নিজের আলো ফেলেছেন, তাতে পাহাড়কে তিনি চূর্ণ করে দিয়েছেন। ৬-তিনি এমন সত্তা, যাকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে দেখেছেন, আল্লাহ তাঁর হাত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু' কাধের মাঝখানে রেখেছেন এমনকি তিনি তার দু' স্তনের মাঝখানে আল্লাহর আঙ্গুলসমূহের ঠাণ্ডার পরশ পেয়েছেন এবং বলেছেন, হে মুহাম্মাদ উপরস্থ সভাষদের লোকেরা কী নিয়ে বাক-বিতণ্ডা করছে? ৭-তাঁর 'আরশে ভারজনিত শব্দ করে, যেমন কোনো বাহন তার বাহককে নিয়ে ভারজনিত শব্দ করে। ৮-তিনি হাসেন। ৯- তিনি খুঁশিতে পূর্ণ হয়ে যান। ১০-তিনি ভালোবাসেন। ১১-তিনি শত্রুতা করেন (তাঁর শত্রুদের সাথে)। ১২-তিনি সন্তুষ্ট হোন। ১৩-তিনি ক্রোধান্বিত হন। ১৪- তিনি তাঁর ঈমানদার বান্দার জান কবজ করতে দ্বিধা করেন। ১৫-তিনি বান্দা ও তার কিবলার মাঝে সালাতের সময় থাকেন। ১৬-তিনি এমন এক সত্তা, যার (তাওহীদের) হিফাযত করলে, বান্দা তাঁকে তার কাছে পায়। ১৭-বান্দা নফল আমল দিয়ে তাঁর নৈকট্য অর্জন করতে করতে এমন হয় যে, তিনি তাঁর শোনা, দেখা, হাত, পা হয়ে যান। (সুতরাং বান্দা তখন এসব অঙ্গকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত পরিচালনা করে না।) ১৮-তিনি সে আগামী দিন হাশরের মাঠে নিজেকে প্রকাশ করবেন। ১৯- তিনি বান্দার সাথে কথা বলবেন, তাঁর ও বান্দার মাঝে কোনো অনুবাদক থাকবে না। ২০-তিনি হাশরের মাঠে ঈমানদারদের সামনে এমন সূরতে আসবেন যে সূরতে ঈমানদাররা তাঁকে চিনবে না, তারপর আবার এমন সূরাহতে আসবেন যে

সূরতে তারা তাঁকে চিনবে। ২১-আর জান্নাতীরা রাব্বুল আলামীনকে চাক্ষুষ এমনভাবে দেখবে যেমন চাঁদকে পূর্ণিমার রাতে দেখা যায়। ২২-তিনি তাদের জন্য জান্নাতের উপর থেকে নিজেকে দেখাবেন এবং বলবেন, আসসালামু ‘আলাইকুম।

অনুরূপ আরও বহু বর্ণনা, যা অগণিত, অসংখ্য। হে রব, আপনি যা নাযিল করেছেন তার ওপর ঈমান আনলাম। সুতরাং আমাদেরকে আপনি সাক্ষী হিসেবে লিখে নিন। এর বিপরীতে তারা (ঐসব অপব্যাখ্যাকারীরা) কুরআন ও হাদীসের এসব ভাষ্যের বিধানকে নিষেধ করছে তাদের মতের স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই, যদি কিছু তারা বলেও থাকে তবে তা মাকড়শার জালের চেয়েও বেশি দুর্বল। (‘আবাক্বাত: ৯০-৯১।)

এ ভাষা থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা গেল যে, তিনি আল্লাহর সকল গুণাবলি সাব্যস্ত করেন, যেমন ‘আরশের উপর উঠা, নিকটতম আসমানে অবতরণ করা, কথা বলা, হাত, উপরে থাকা, হাসা, খুশি হওয়া, পছন্দ করা, শত্রুতা করা, সন্তুষ্ট হওয়া, অসন্তুষ্ট হওয়া, নৈকট্য ইত্যাদি যাবতীয় সত্তাগত ও কর্মগত গুণাবলি তিনি সাব্যস্ত করতেন; এর মাধ্যমে তিনি যারা এগুলোর তা’ওয়ীল বা অপব্যাখ্যা করে, তাদের কথাকে খণ্ডন করেছেন।

আল্লামা মুহাম্মাদ ইবন আলী আশ-শাওকানী রাহিমাহুল্লাহ (১২৫০ হিজরী)

ইমাম শাওকানী থেকে আল্লাহর ‘আরশের উপর উঠার গুণটি সুস্পষ্টভাবে সাব্যস্ত করার অনেক ভাষ্য দেখা যায়। এখানে এমন একটি ভাষ্য উল্লেখ করা হলো: তিনি তার তাফসীর গ্রন্থে বলেন,

“সালাফে সালেহীনের মাযহাব হচ্ছে, আল্লাহু সুবাহানাহু ওয়া তা‘আলা ‘আরশের উপর উঠেছেন কোনো প্রকার ধরন নির্ধারণ ব্যতীত, যেভাবে তাঁর জন্য সেটা উপযোগী; তবে যা তার জন্য উপযোগী নয় এমন কোনো কিছু থেকে তিনি পবিত্র। আর ‘ইস্তেওয়া’ শব্দটি আরবী ভাষার অভিধান অনুযায়ী অর্থ হচ্ছে, উপরে উঠা এবং অবস্থান করা।” (ফাতহুল কাদীর (২/২৫৯-২৬০)।

আল্লামা সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী আল-কিন্নাওজী রাহিমাহুল্লাহ (১৩০৭ হিজরী)

উপমহাদেশের সহীহ আকীদাহ'র একজন দিকপাল আল্লামা শাইখ সিদ্দীক হাসান খান ভূপালী রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর উঠার আকীদাহটি স্পষ্টভাবে তার তাফসীরে বর্ণনা করে বলেন,

"তারপর তিনি (আল্লাহ) "আরশের উপর উঠেছেন" আলেমগণ এর ব্যাখ্যায় চৌদ্দটি বক্তব্য দিয়েছেন, তবে যা হক্ক-সত্য ও বিশুদ্ধ হিসেবে স্বীকৃত তা হচ্ছে সালাফে সালেহীনের মাযহাব। তারা বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর আরশের উপর উঠেছেন কোনো প্রকার ধরন নির্ধারণ ছাড়াই, বরং যে পদ্ধতি তাঁর সাথে উপযুক্ত হবে সেভাবে, তবে সাথে সাথে তাঁর জন্য যা অসম্ভব সেটা থেকে তিনি পবিত্র।

আর আরবী ভাষাতে **'ইস্তেওয়া'** এর অর্থ হলো- উপরে উঠা ও উপরে থাকা। জাওহারী বলেন, বলা হয়, 'ইস্তাওয়া **'আলা যাহরি দাব্বাতিহী'** অর্থাৎ বাহনের উপরে অবস্থান নিলেন। আর **'ইস্তাওয়া ইলাস সামায়ি'** এর অর্থ উপরে উঠলেন। আর ইস্তাওয়া অর্থ ইস্তাওলা বা অধিকার করল ও জয়ী হলো এটা মু'তাযিলা একদল কালামশাস্ত্রবিদদের কথা।

আবু উবাইদাহ থেকে বর্ণিত, এখানে 'ইস্তাওয়া' অর্থ 'আলা (উপর উঠলেন) ও 'ইরতাফা'আ' বা ঊর্ধ্বে উঠলেন। ইমাম শাওকানীর এ ব্যাপারে একটি আলাদা পুস্তিকা রয়েছে, সেখানে তিনি আল্লাহর গুণসমূহকে প্রকাশ্য অর্থের উপর নিতে হবে বলেছেন, তন্মধ্যে তিনি 'ইস্তেওয়া' আল্লাহর 'আরশের উপর উঠা' এ গুণটি বর্ণনা করেছেন। শাইখুল ইসলাম আহমাদ ইবন আবদুল হালীম ইবন তাইমিয়্যাহ আল-হাররানী, হাফেয ইমাম মুহাম্মাদ ইবন আবী বকর ইবন কাইয়্যেমিল জাওযিয়্যাহ 'ইস্তেওয়া' বা 'আল্লাহ কর্তৃক তাঁর 'আরশের উপর উঠা'র বিষয়ে, তাঁর জন্য উপর দিক সাব্যস্ত করা, তাঁর জন্য সৃষ্টির উপরে সর্বোচ্চে থাকার গুণটি প্রমাণ করার বিষয়টি পূর্ণ দখলে ছিল, তারা দু'জন এ ব্যাপারে বেশ কিছু গ্রন্থ লিখেছেন, যার কোনোটি ছোট কোনোটি বড়। অনুরূপভাবে হাফেয যাহাবী রাহিমাহুল্লাহর কিতাবুল উলু নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে কুরআনের আয়াত, হাদীস ও অন্যান্য দলীল প্রমাণাদি একত্রিত করেছেন। আর আমিও এ বিষয়টি আমার রচিত গ্রন্থ 'আল-ইন্তিক্বাদুর রাজীহ ফী শারহিল ই'তিক্বাদ আস-সহীহ' গ্রন্থে বিস্তারিত তুলে ধরেছি।

উম্মে সালামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ইস্তেওয়া' এর অর্থ অজানা নয়, ধরণ বিবেকের যুক্তি দিয়ে পাওয়া যাবে না। তা স্বীকার করে নেয়ার নাম ঈমান, আর তা অস্বীকার করার নাম কুফুরী যা

ইমাম ইবন মারদুওইয়াহ বর্ণনা করেছেন। ইমাম মালিক ইবন আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বাড়তি এসেছে, আর এর ধরন সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদ'আত।

অন্যদিকে আমরা দেখতে পাই যে, নাসাফী বলেছেন, 'আরশের তাফসীর খাট আর ইস্তেওয়া এর অর্থ ('আরশের উপর) অবস্থান করা যেমনটি সাদৃশ্য স্থাপনকারীরা বলে তা বাতিল। শেষ। আমি বলবো, ওহে মিসকীন, তুমি কি জান না যে, ভাষায় 'আরশ বলে খাটকেই বুঝায় আর ইস্তেওয়া বলে অবস্থানকেই বুঝায়। এ তাফসীর উম্মতের বড় আলেম, কুরআনের তাফসীরকার "আব্বাস থেকেই এসেছে, যেমনটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন। এভাবে সাব্যস্ত করার মধ্যে সাদৃশ্য স্থাপন করা হয় না, সাদৃশ্য স্থাপন তো কেবল ধরণ নির্ধারণ দ্বারাই হয়ে থাকে। বরং এর অর্থ সাব্যস্ত করাকে অস্বীকার করাই হচ্ছে তা'ত্বীল বা অর্থশূন্যকরণ যা উম্মতের সালাফে সালেহীন ও উম্মাতের ইমামদের মতের বিপরীত। তাদের মত ছিল এসব গুণকে যেভাবে এসেছে সেভাবে পরিচালনা করা, কোনোরূপ ধরন নির্ধারণ না করে এগুলোকে প্রকাশ্য অর্থে ব্যবহার করা, তবে তারা তাতে ধরন নির্ধারণ করতেন না, অপব্যাখ্যা করতেন না, অর্থহীন করতেন না এবং সাদৃশ্যও স্থাপন করতেন না। আর সাদৃশ্য স্থাপন রোধ করার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত বাক্য ব্যবহার করা হবে, আর তা হচ্ছে, **'লাইসা কামিসলিহী শাইয়্যুন'** তাঁর মতো কোনো কিছু নেই।" (ফাতহুল বায়ান ফী মাকাসিদিল কুরআন (৪/৩৭৪-৩৭৫)।

তাছাড়া তিনি আল্লামা শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলাওয়ীর 'আকীদাহ হাসানা' এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর দ্বারা শাহ রাহিমাহুল্লাহ'র উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন কোনো দিক অস্বীকার করা যার প্রতি আল্লাহর প্রয়োজনীয়তা বুঝাবে। কারণ, 'দিক' বলতে সাধারণত কোনো জায়গায় সীমাবদ্ধতার নির্দেশ করে আর আল্লাহ তা'আলা তো কোনো প্রকার সীমাবদ্ধ কিছুর অভ্যন্তরে থাকা থেকে মুক্ত। তারপর তিনি আল্লাহর জন্য 'আরশের উপর উঠার বিষয়টি আবদুল কাদের জীলানী, আবুল হাসান আল-আশ'আরী, ইমাম বাইহাকী কর্তৃক আনয়ন করা আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ'র বর্ণনা, ইবন কুতাইবাহ আদ-দীনাওয়ারী, আল্লামা শাওকানী, ইবন রুশদ আল- কুরতুবী, ইবন তাইমিয়্যাহ, ইবনুল কাইয়্যেম থেকে বর্ণনা এনে আল্লাহ তা'আলার জন্য উপর দিক সাব্যস্ত করেন। (আল- ইন্তিক্বাদুররাজীল ই'তিক্বাদিস সহীহ, ৬০-৬৮।)

তারপর তিনি যারা আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীসগুলোকে মুতাশাবিহ বলে তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম থেকে প্রচুর পরিমাণ ভাষ্য বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, 'ইমাম আহমাদ বলেন, যারা সহীহ হাদীসের ওপর আমল করতে চায় না, তারা সাধারণত দু'টি নীতিতে থাকে, এক. হাদীসকে কুরআনের বিপরীতে দাঁড় করানো। দুই. যদি সেটা সম্ভব না হয় তখন তারা কুরআন ও হাদীসের মুহকাম বা সম্পূর্ণ স্পষ্ট অর্থ বিশিষ্ট ভাষ্যসমূহকে মুতাশাবিহ বলে পার পেতে চায়। যেমন, আল্লাহর 'আরশের ওপর উঠার ভাষ্যটি মুহকাম হওয়ার পরও সেটাকে মুতাশাবিহ দাবী করা।' (আল ইস্তিক্বাদুর রাজীহ ফী শারহির ই'তিক্বাদিস সহীহ, ৭৩-৭৪।)

তারপর তিনি আল্লাহর আরশের উপর থাকার ওপর উপমহাদেশের আলেমগণের মত নিয়ে আসেন। সেখানে তিনি আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের উপর উঠেছেন বলে উপমহাদেশের বিভিন্ন আলেমদের মত নিয়ে এসেছেন। সবশেষে তিনি বলেন, "মোটকথা, এ অধ্যায়ে আলেমগণের কথা অনেক, অসংখ্য; গুণে শেষ করা যাবে না। যে কেউ স্বল্পতে যথেষ্ট হবে না তাকে বেশি দিয়েও তুষ্ট করা যাবে না। যে কেউ সংক্ষিপ্ত কথা বুঝবে না, তার কাছে বিস্তারিত বলা মূল্যহীন। আল্লাহ তা'আলা তিনি সত্য বলেন আর তিনি সঠিক পথের দিশা দেন। তিনি তেমনি যেমনটি নিজে তাঁর সম্মানিত কিতাবের সূরাহ ত্বা-হায় নিজেকে গুণান্বিত করে বলেছেন, **আর রহমানু আলাল আরশিস তাওয়া** অর্থাৎ "রহমান আরশের উপর উঠেছেন" অনুরূপ সূরাহ আল-আ'রাফে বলেছেন, إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ - "নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ যিনি আসমানসমূহ ও যমীন ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন ; إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ - يُدَبِّرُ الْأَمْرَ তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন।" (সূরাহ আল-আ'রাফ, আয়াত: ৫৪) অনুরূপ সূরাহ ইউনুসে বলেন, "তোমাদের রব তো আল্লাহ্, যিনি আসমানসমূহ ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠলেন। তিনি সব বিষয় পরিচালনা করেন।" (সূরাহ ইউনুস, আয়াত: ০৩) আল-ইস্তিক্বাদুর রাজীহ ফী শারহিল ই'তিক্বাদিস সহীহ, ৯৩-৯৪।)

আল্লামা মিয়া নযীর হুসাইন দেহলাওয়ী রাহিমাহুল্লাহ (১৩২০ হিজরী)

আল্লামা মিয়া নাযীর হুসাইন দেহলাওয়ী রাহিমাহুল্লাহ এমন এক ব্যক্তিত্ব, যাকে পরিচয় করিয়ে দিতে হয় না। তাকে বলা হয় শাইখুল কুল ফিল কুল। কুরআন, হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির পাশাপাশি তিনি সকল মা'কুলাত বিষয়ে অনন্য জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলাওয়ীর (মেয়ের ঘরের) নাতি আল্লামা শাহ মুহাম্মাদ ইসহাক্ব ছিলেন মিয়া নাযীর হুসাইন এর প্রিয় উস্তাদ। তাঁরই জায়গায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। তার ছাত্রদের মধ্যে আরব ও আজমের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ববর্গ রয়েছেন, যেমন, শাইখ আব্দুল্লাহ গাযনাওয়ী, মুহাম্মাদ গাযনাওয়ী, আব্দুল জাব্বার গাযনাওয়ী, মুহাম্মাদ বশীর সাহসাওয়ানী, আব্দুল্লাহ গাযীপূরী, শামসুল হক্ক আযীমাবাদী, আব্দুর রহমান মুবারকপূরী, সানাউল্লাহ অমৃতসরী। আরবদের মাঝে, ইসহাক্ব ইবন আব্দুর রহমান আলুশ শাইখ, সা'দ ইবন হামাদ ইবন আতীক, আলী ইবন নাসের আবু ওয়াদী, আবু বকর খুওকীর, আব্দুল্লাহ ইদ্রীস আস-সান্নু আল-মাগরেবী প্রমুখ। এ মহান ব্যক্তিত্বের আল্লাহর 'আরশের উপর উঠা সংক্রান্ত আকীদা বর্ণনা করব। তিনি বলেন,

"প্রশ্ন: উলামায়েদীন এ মাসআলার ব্যাপারে কী বলেন, এক আলেম বলেন, যে কেউ আল্লাহ তা'আলাকে আরশের উপর কোনো ধরন নির্ধারণ ব্যতীতই 'আরশের উপর বলবে বা জানবে সে কাফের হয়ে যাবে? এ আলেমের এ কথাটি ভুল নাকি শুদ্ধ? বিষয়টি বর্ণনা করুন এবং সাওয়াবের অধিকারী হউন।

উত্তর:

যে আলেম এমন কথা বলবে তিনি আলেমই নন, বরং তিনি জাহেল। আর এ কথা সম্পূর্ণ ভুল ও বাতিল; কেননা কুরআনে কারীমে এক নয় বরং বহু আয়াতে আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর উঠা সাব্যস্ত হয়েছে। অনুরূপভাবে বহু হাদীসে এ কথা সাব্যস্ত হয়েছে। তবে এটা বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর উঠার ধরন অজানা ও অজ্ঞাত। সকল সাহাবী, তা'বেয়ী, তাবে' তাবে'য়ীন, মুজতাহিদ ইমামগণ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুম সবারই এ আকীদাহ ও বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপর উঠেছেন, আর আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর উঠার ধরন অজানা ও অজ্ঞাত। আল্লাহ তা'আলা কোনো ধরন নির্ধারণ ব্যতীত আরশের উপর হওয়া সাব্যস্ত করার ব্যাপারে কুরআনের আয়াত, রাসূলের হাদীস, দ্বীনের ইমামগণের বক্তব্য

বিস্তারিত ও বিশদ আকারে দেখতে হলে ইমাম যাহাবীর আল-উলু কিতাবটি অধ্যয়ন করা যেতে পারে।....."

তারপর তিনি কুরআন থেকে আল্লাহ তা'আলার আরশের উপরে দলীলসমূহ তুলে ধরেন প্রথমেই সূরাহ আল-আ'রাফ, সূরাহ রা'দ, সূরাহ ত্বাহা থেকে তিনটি আয়াত নিয়ে আসেন। তারপর দুটি হাদীস নিয়ে আসেন; যাতে 'আরশের উপর তাঁর কাছে রাখা কিতাব, তারপর হাশরের মাঠে আল্লাহ তা'আলা মহান আল্লাহর অবস্থানে নিচে যাবেন, যখন তিনি "আরশের উপর থাকবেন সংক্রান্ত হাদীস উদ্ধৃত করেন। তারপর চার ইমামের বক্তব্য তুলে ধরেন। (ফাতাওয়া নাযীরীয়াহ, প্রথম খন্ড, কিতাবুল ঈমান ওয়াল আকায়িদ, পৃ. ৫৭।)

আব্দুল জাব্বার আল-গাযনাওয়ী রাহিমাহুল্লাহ (১৩৩১ হিজরী)

শাইখ আব্দুল জাব্বার ইবন আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ আ'যম আল-গাযনাওয়ী রাহিমাহুল্লাহ তারপর অমৃতসরী, যাদের মর্যাদা ও সম্মানের ব্যাপারে আলেমগণ একমত পোষণ করেছেন। হিজরী ১২৬৮ সালে তাঁর জন্ম। পিতার কাছে প্রাথমিক পড়া শেষ করেন। তারপর আপন দু' ভাই মুহাম্মাদ ও আহমাদের কাছে আরবী পড়া সম্পন্ন করেন। তারপর দিল্লীতে প্রবেশ করে মিয়া নাযীর হুসাইন দেহলাওয়ী, যাকে শাইখুল কুল ফিল কুল, সকল বিষয়ে সকলের উস্তাদ বলা হয়, তাঁর দারসে মুলাযামাত করেন। বিশ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই ইলমী জগতের সেরা ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। তারপর অমৃতসরে বসবাস করতে থাকেন। সেখানেই দাওয়াত ও ইবাদতে বাকী সময় অতিবাহিত করেন। কোনো সুনির্দিষ্ট মাযহাবের অনুসরণ করতেন না। তাঁর ইজতিহাদের যোগ্যতা ছিল। ইমামদের সম্পর্কে ভালো কথা বলতেন। আকীদাহ'র ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ ধারার প্রবর্তকদের অন্যতম ছিলেন।

শাইখ সানাউল্লাহ অমৃতসরী রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপরে উঠার বিষয়ে ভুল করলে সেটার রদ করে শাইখ আব্দুল হক গাযনাওয়া যে গ্রন্থ লেখেন তিনি সেটার অনুমোদনকারী ৮০জন আলেমের অন্যতম ছিলেন। পরবর্তীতে সৌদি আরবের বাদশাহ আব্দুল আযীয তাদের মধ্যে মধ্যস্থতা করে দেন। শাইখ সানাউল্লাহ অমৃতসরী তার ভুল থেকে ফিরে আসার ঘোষণা প্রদান করেন।

এভাবেই শাইখ আব্দুল জাব্বার গাযানওয়ী রাহিমাহুল্লাহ আকীদার মিশনকে চাঙ্গা করেন। তিনি আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকুল থেকে আলাদা 'আরশের উপরে বিশ্বাস করতেন এবং এর ওপর গ্রন্থ রচনা করেছেন। যার নাম হচ্ছে, সাবিলুন নাজাত ফ মুবায়ানাতির রাব্বি আনিল মাখলূকাত। এর মাধ্যমে ভারতবর্ষের মানুষের মাঝে আল্লাহর ব্যাপারে যেসব বিভ্রান্তি ছিল তা অপনোদন করে সঠিক আকীদাহ প্রচার প্রসার করেন। এখানের আল্লাহ তা'আলাকে 'আরশের উপরে থাকা সংক্রান্ত তার কিছু বক্তব্য তুলে ধরছি:

আকীদাহ বিষয়ক গ্রন্থ

অধ্যায়: আল্লাহ কর্তৃক তাঁর 'আরশের উপর উঠা এবং সৃষ্টিকুল থেকে পৃথক হওয়ার ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আহ এর আকীদাহ।

আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি রহমান ও রহীম, হামদজাতীয় সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সর্বোচ্চ সত্তা, সর্বোপরে অবস্থানকারী, সালাত ও সালাম তাঁর সে সব বান্দাদের জন্য যাদের তিনি পছন্দ করেছেন, তারপর: আমি আমাদের সমসাময়িক কারও কারও কিছু ছোট ছোট প্রবন্ধ দেখেছি, যাতে তিনি সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদাহ-বিশ্বাস, 'আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টি থেকে পৃথক, তাঁর আরশের উপরে সত্তাগতভাবেই আছে, আর সবজায়গা তাঁর জ্ঞানের মাধ্যমে পরিবেষ্টন করে আছেন' এ নীতির বিরোধিতা করতে দেখেছি। তাকে দেখেছি এটা বলতে যে, তিনি সত্তাগতভাবে আমাদের সাথে এ যমীনেই রয়েছেন, যেমনটি তিনি আরশের উপর রয়েছেন। নিঃসন্দেহে তার এ কথাটি বানোয়াট, বিদ'আতী কথা, যা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদাহ-বিশ্বাস বিরোধী।

বস্তুত দু'টি কারণে তারা সহীহ আকীদা বিরোধী এসব কথা বলেছে, এক. সালাফে সালেহীনের অনুসরণ করতে ঘৃণা করা, দুই. তাদের নিজেদের মতকে অতিরিক্ত পছন্দ করার প্রবণতা। মূলত এ দু'টি জিনিস মারাত্মক ধ্বংসাত্মক রোগ। যারাই এ দু'টি রোগে আক্রান্ত হয়েছে তাদের বেশিরভাগই ধ্বংস হয়েছে।

আর তাদের ভুলের সুত্রপাত মূলত কয়েকটি জিনিস থেকে:

১- মহান আল্লাহর বাণী "তিনি তোমাদের সাথে রয়েছেন যেখানেই তোমরা থাক না কেন" সেখানে (মাআ) 'সাথে থাকা' এর অর্থকে মুতাশাবিহ বা কঠিন অস্পষ্টতা মনে করা।

২- অনুরূপ আল্লাহর বাণী "আর আমরা তোমাদের বেশি নিকটে রয়েছি তোমাদের গ্রীবার ধমনি থেকেও" এ আয়াতের (ক্বরীব) 'নিকটে থাকা' এর অর্থকে মুতাশাবিহ মনে করা।

৩- তদ্রূপ আল্লাহর বাণী, "অতঃপর তোমরা যেদিকেই তোমাদের চেহারা ফিরাও না কেন সে দিক তো তাঁরই দিক" এ আয়াতের (অজহু) 'ওয়াজহ' বা চেহারা বা দিক এ শব্দটি মুতাশাবিহ মনে করা।

বস্তুত উপরের আয়াতে যেগুলোকে মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত বলা হচ্ছে তা মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে কোনো কোনো আলেম থেকে এগুলোকে মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত বলে মত প্রদান করা হলেও যারা সেটা তাদের থেকে বর্ণনা করেছে তারা সেসব আলেমের কথার উদ্দেশ্য, তাদের বক্তব্যের মূল কথা বুঝতে অসমর্থ হয়েছেন বা বেখবর থেকেছেন। কারণ যারা এসব শব্দ ও অর্থকে মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, এগুলো এমন সাদৃশ্যপূর্ণ যে, তাতে কয়েকটি অর্থ করার সুযোগ রয়েছে, তাদের উদ্দেশ্য এটা নয় যে এগুলো এমন মুতাশাবিহ বা অস্পষ্ট অর্থ বিশিষ্ট যার অর্থ বা ব্যাখ্যা করা যায়না। তারা যেখানে 'সম্ভাবনাময় অর্থ করার সুযোগ রয়েছে' সেটাকেই মুতাশাবিহ বা অস্পষ্টতার প্রকার ধরে নিয়েছে। যেমনটি ত্বীবী, ক্বাসত্বাল্লানী, বাগাওয়ীসহ অনেকেই স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। মূলত এ প্রকার মুতাশাবিহ এর বিধান হচ্ছে, সেগুলোকে মুহকাম আয়াত, যার কেবল একটি অর্থই হয় এমন ভাষ্যসমূহের দিকে নিয়ে গিয়ে তার অর্থ নির্ধারণ করা। সে হিসেবেই তারা এসব আয়াতে আগত 'সাথে থাকা', 'নিকটে থাকা', 'চেহারা' বা দিককে মুতাশাবিহ আয়াত এর অন্তর্ভুক্ত করেছে। তারপর তারা 'সাথে থাকা'কে জ্ঞান, 'নিকটে থাকা'কে ফিরিশতাদের নিকটে থাকা অথবা জ্ঞানে নিকটে থাকা, আর ওয়াজহ বলে দিক বা সন্তুষ্টি বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

আর যে জিনিস এ বিষয়টিকে স্পষ্ট করে দিবে তা হচ্ছে,

(মাআ) 'সাথে থাকা' এ শব্দটি দ্বারা দু'টি সত্তা নিকটবর্তী থাকা বুঝায় আবার অন্য অর্থও বুঝায়। যেমন, আল্লাহর বাণী, "আর যখন তারা তাদের শয়তানদের সাথে একান্ত হয়, তখন তারা বলে, নিশ্চয় আমরা তোমাদের সাথেই রয়েছি"। (এখানে সর্বসম্মত মত হচ্ছে যে এটা দু'টি সত্তার এক সাথে লেগে থাকা নয়, বরং) উদ্দেশ্য হচ্ছে, ধর্ম ও আকীদায় আমরা একসাথে আছি। অনুরূপ আল্লাহর বাণী, "নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন"। উদ্দেশ্য হচ্ছে, সাহায্য ও সহযোগিতায়। তদ্রূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম আত-তাসলিমা বাণী, "(তাবুকের যুদ্ধের জন্য বের হওয়ার পর) মদীনায় কিছু লোক রয়ে গেছে, তোমরা যে পথই অতিক্রম কর, যে উপত্যকাই পাড়ি দাও না কেন, তারা তোমাদের সাথে রয়েছেন"। অর্থাৎ কল্যাণকামিতায়, নিয়তে, দো'আয়। অনুরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, "কুরআনে পারদর্শী ব্যক্তি সম্মানিত সৎ দূত 'মালায়িকা ও নবী'দের সাথে" অর্থাৎ মর্যাদা ও সাওয়াবের দিক থেকে। তাছাড়া মাআ 'সাথে থাকা' শব্দটি স্থান, কাল ও পাত্রভেদে আরও বিভিন্ন অর্থ প্রদান করে থাকে। একইভাবে 'আমরা' সর্বনামটি কখনও কখনও নিজেকে সম্মানিত করার জন্য বহুবচন ব্যবহার করে থাকে। আবার কখনও কখনও তা এমন কেউ ব্যবহার করে থাকেন যিনি অপর কাউকে কোনো দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন তখন দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি সে কাজটি করলেও প্রেরণকারী তা নিজের দিকে সম্পৃক্ত করার জন্য বহুবচনের সর্বনাম 'আমরা' ব্যবহার করে থাকেন। যেমন, আল্লাহর বাণী "নিশ্চয় আমরা যিকির (কুরআন ও সুন্নাহ) নাযিল করেছি"। অপর বাণী "নিশ্চয় আমরাই জীবিত করি ও মৃত্য প্রদান করি"। অপর বাণী "আমরা আপনার কাছে বর্ণনা করব উত্তম কিসসা"। অপর বাণী "আমরা আপনার কাছে তিলাওয়াত করব মূসা ও ফির'আউনের সংবাদ"। অপর বাণী "অতঃপর যখন আমরা তা পাঠ করব তখন আপনি সে পাঠের অনুসরণ করুন"। অপর বাণী "আর আমরা লিখে রাখি যা তারা অগ্রে পেশ করছে এবং তাদের পদচিহ্নগুলোও"। এসব আয়াতে উল্লিখিত অবতরণ করা, জীবিত করা, মৃত্যু দেয়া, ঘটনা বলা, তিলাওয়াত করা, পড়া, লেখা যদিও বাহ্যিকভাবে ফিরিশতাদের কাজ তারপরও সেগুলোকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন; কারণ তিনিই তো সেগুলোর নির্দেশদাতা, হুকুমদাতা।

অনুরূপভাবে, (ক্বরীব) 'নিকটে থাকা' এ শব্দটিও বাক্যের আগ-পিছ দৃষ্টি দিয়ে অর্থ নির্ধারণ করতে হবে। যেমন, আল্লাহর বাণী, "আমরা তার গ্রীবার ধমনী থেকেও তার বেশি নিকটে" এখানে যদিও 'আমরা' বলে ফিরিশতাদের বুঝানো হয়েছে, কারণ পরের আয়াত সেটার ব্যাখ্যা করে দিচ্ছে, যাতে আল্লাহ বলেছেন, "যখন গ্রহণ করে দু'দল ফিরিশতা, ডান দিক ও বাম দিকে বসে, সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তার কাছে সদা উপস্থিত সংরক্ষণকারী রয়েছে"। অনুরূপ আল্লাহর বাণী "আর আমরা তোমাদের চেয়ে তার বেশি নিকটে, কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না।" এখানে 'নিকটে' বলে ফিরিশতারা মৃত ব্যক্তির নিকটে থাকা বুঝানো হয়েছে, যা আয়াতের পূর্বাপর থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়। (কারণ আয়াতের মধ্যেই বলা হয়েছে, 'কিন্তু তোমরা দেখতে পাও

না'। যা কেবল ফিরিশতাদের জন্যই প্রয়োগ হতে পারে।) তারপরও আল্লাহ তা'আলা উভয় আয়াতেই নিকটে থাকাকে নিজের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন, কারণ তিনিই তো সেটার নির্দেশদাতা ও হুকুমদাতা। আবার কোনো কোনো আলেম বলেছেন এখানেও আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক জ্ঞানের মাধ্যমে নিকটে থাকা বুঝানো হয়েছে। তবে প্রথম মতটিই বেশি বিশুদ্ধ।

আর যারা আল্লাহকে আহ্বান করে, যারা আল্লাহ তা'আলার যিকির করে, আল্লাহ তাদের নিকটে থাকা, যেমন কুরআন ও হাদীসের বাণীতে এসেছে, আল্লাহর বাণী "আর যখন আমার বান্দারা আমার ব্যাপারে আপনাকে প্রশ্ন করে তখন আপনি বলুন, নিশ্চয় আমি নিকটে, আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে"। অনুরূপ আল্লাহর বাণী "সুতরাং তোমরা তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, তারপর তাঁর কাছে তাওবাহ করো, নিশ্চয় আমার রব অতি নিকটে ও অতিশয় দো'আ কবুলকারী"। তদ্রূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে এসেছে, তিনি বলেছেন, "নিশ্চয় যাকে তোমরা ডাকছ, তিনি তোমাদের কারও বাহনের ঘাড়ের চেয়েও নিকটে", অনুরূপ আরও কিছু আয়াত ও হাদীসে যে নৈকট্যের কথা বলা হয়েছে, সেটা কখনও কখনও বিশেষ সত্তাগত নৈকট্য বুঝানো হতে পারে, যেমন নিকটতম আসমানে নেমে আসা, তিনি যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে নেমে আসেন, যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে নিকটে আসতে পারেন। আমরা এ সবের উপরই ঈমান আনি, আমরা বলি সবই আমাদের রবের পক্ষ থেকে এসেছে।

অনুরূপভাবে 'ওয়াজহ' শব্দেরও বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। যেমন, কোনো কিছুর চেহারা বা সম্মুখভাগ, অথবা কোনো কিছু স্বয়ং, অথবা কোনো জাতির নেতা, অথবা দিক; যেমনটি ক্বামূস এবং মুখতারায় এসেছে। এই অর্থে আলেমগণ তাদের তাফসীরে আল্লাহর্ বাণী ফাছম্মা ওয়াজহুল্লাহি এর অর্থে বলেছেন, 'সে দিক, যার নির্দেশ আল্লাহ্ দিয়েছেন।' ...

আর যেহেতু উপরে বর্ণিত এসব আয়াত বিবিধ অর্থ প্রদান করে, তাই কেউ কেউ এ আয়াতগুলোকে মুতাশাবিহ এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তারপর আহলুস সুন্নাহ সেগুলোকে সে অর্থে গ্রহণ করেছেন যে অর্থ করা হলে তা সেসব ভাষ্যের বিরোধী হয় না, যাতে কেবল একটি অর্থই রয়েছে। যদি এগুলো সেসব মুতাশাবিহ এর অন্তর্ভুক্ত হতো যা ব্যাখ্যা করা যায় না, তাহলে তারা এগুলোর অর্থ করতেন না। আর যেসব ভাষ্য কেবল একটি অর্থই প্রদান করে, তা হচ্ছে, আল্লাহর বাণী, "উত্তম বাক্য তাঁর দিকেই উত্থিত হয়"। "ফিরিশতা ও জিবরীল

তাঁর দিকেই উঠে আসেন"। "তিনি আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত যাবতীয় বিষয় পরিচালনা করেন, তারপর সবকিছুই তাঁর সমীপে উত্থিত হবে"। "নিশ্চয় আমি আপনাকে বয়সের পূর্ণতা দিব আর আপনাকে আমার দিকে তুলে আনব"। "বরং আল্লাহ তাঁকে তার দিকে তুলে নিয়েছেন।" "তোমরা কি আসমানের উপরে যিনি আছেন তার ব্যাপারে নিরাপদ হয়ে গেছ যে, তিনি যমীনকে তোমাদের নিয়ে ধ্বসিয়ে দিবেন না?" "অতঃপর যারা আপনার রবের নিকট রয়েছে তারা তাঁর ইবাদাত করার ব্যাপারে কোনো অহংকার করে না।" "তারা তাদের রবকে তাদের উপরে থেকে ভয় করে"। "আর ফির'আউন বলল, হে হামান, আমার জন্য একটি প্রাসাদ বানাও, যাতে করে আমি একটি অবলম্বন পাই,আসমানে আরোহনের অবলম্বন, যাতে আমি মূসার ইলাহকে দেখতে পাই, আর আমি নিশ্চয় তাকে মিথ্যাবাদী মনে করি"। "রহমান আরশের উপর উঠেছেন"। অনুরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, 'অতঃপর আমি তা নিয়ে মূসা 'আলাইহিস সালামের কাছ পর্যন্ত অবতরণ করলাম, তিনি বললেন, আপনার উম্মতের উপরে আপনার রব কী ফরয করেছেন? আমি বললাম, দিনে ও রাতে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত। তিনি বললেন, আপনি আপনার রবের কাছে যান, আপনার উম্মতের ওপর থেকে হাল্কা করার আহ্বান করুন, তারপর আমি আমার রব এবং মুসার মাঝে বারবার আসা যাওয়া করি, অবশেষে আল্লাহ বললেন, হে মুহাম্মাদ, এগুলো হচ্ছে দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত।" হাদীসের শেষ পর্যন্ত। অনুরূপ অন্য হাদীস, "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করলেন, তখন তাঁর কাছে 'আরশের উপর একটি গ্রন্থে লিখলেন, **ইন্না রহমাতি গালাবাত গাজাবী** অর্থাৎ আমার রহমত আমার ক্রোধের ওপর প্রাধান্য পাবে।" ফাতাওয়া উলামায়ে হাদীস, (১০/২৫৭-২৬৩)।

এরপর তিনি আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপরে থাকার ব্যাপারে বহু হাদীস নিয়ে আসেন, সাহাবায়ে কিরামের বাণী নিয়ে আসেন, তাবে'য়ীদের বক্তব্য উপস্থিত করেন, তাবে তাবে'ঈন ও ইমানগণের কথা তুলে ধরেন। যার অধিকাংশই তিনি ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম ও ইমাম যাহাবীর গ্রন্থসমূহ থেকে উদ্ধৃত করেন। (৭৫৫) ফাতাওয়া উলামায়ে হাদীস, (১০/২৬৪-২৮৯)।

আল্লামা শাইখ আবদুর রহমান ইবন নাসের আস-সাদী রাহিমাহুল্লাহ (১৩৭৬ হিজরী)

শাইখ আবদুর রহমান ইবন নাসের আস-সা'দী রাহিমাহুল্লাহ প্রথমেই তিনি আল্লাহ তা'আলার সিফাত সংক্রান্ত কিছু সোনালী নীতিমালা বর্ণনা করেন, তারপর তিনি বলেন, "সালাফে সালেহীনের ঐকমত্যের মূলনীতির একটি, যার ওপর কুরআন ও সুন্নাহ'র ভাষ্যসমূহ প্রমাণবহ, তা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি দু' প্রকার:

- যাতিয়্যাহ বা সত্তাগত গুণসমূহ, যা কখনো সত্তা থেকে আলাদা হয় না। যেমন জীবন, জ্ঞান, ক্ষমতা, শক্তি, সম্মান, রাজত্ব, বড়ত্ব, অহংকার ইত্যাদি, যেমন নিঃশর্ত সর্বোচ্চতা । ফি'লিয়্যাহ বা কর্মগত গুণসমূহ, যার সাথে তাঁর কাজ জড়িত; যেকোনো সময়, যেকোনো মুহূর্তে এবং যেকোনো কালে। আর এর সাথে সৃষ্টি ও নির্দেশের প্রভাব রয়েছে। সুতরাং তারা ঈমান আনে যে, আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন তাই করতে সক্ষম, তিনি সর্বদা আছেন, সর্বদা থাকবেন, কথা বলেন, বক্তব্য প্রদান করেন, সৃষ্টি করেন, সবকিছু পরিচালনা করেন। আরও ঈমান আনে যে, তাঁর কর্মগুলো কিছু কিছু করে পরপর তাঁর হিকমত ও ইচ্ছার চাহিদা অনুযায়ী সংঘটিত হয়। কারণ তাঁর শরী'আত, তাঁর শর'য়ী নির্দেশ ও নিষেধ সর্বদা একটির একটি ঘটেই চলেছে। .....(অবশেষে বলেন) ঈমানদারের কর্তব্য হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা যা কিছু তাঁর সত্তার সাথে জড়িত যেসব কর্মকাণ্ডকে তাঁর দিকে সম্পর্কযুক্ত করেছেন, যেমন 'আরশের উপর উঠা, হাশরের মাঠে আগমন করা, আসা, নিকটতম আসমানে অবতরণ করা, কথা বলা ইত্যাদি যাবতীয় কর্মকাণ্ডের ওপর ঈমান আনয়ন করা। অনুরূপ সেসব কর্মকাণ্ডের উপরও ঈমান আনা যা তার সৃষ্টির সাথে জড়িত। যেমন, সৃষ্টি করা, রিযিক দেয়া এবং বিভিন্ন প্রকার পরিচালনা-নিয়ন্ত্রণ করা।" (আত্-তাম্বীহাতুল লাতীফাহ -পৃ: ২০-২১)

তিনি আল্লাহ তা'আলার কর্মগত গুণাবলিকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন, কিছু কর্মগত গুণ যা একান্তভাবে তাঁর নিজের সাথে সংশ্লিষ্ট, আর কিছু কর্মর্গত গুণ রয়েছে যা তার কথা কাজের মাধ্যমে হয়ে থাকে (আল-হাক্কুল ওয়াদ্বিহ আল-মুবীন, পৃ. ৪২।) আর যারা আল্লাহ তা'আলার কর্মগত আপন পছন্দ করা গুণ নিয়ে ভিন্ন পথ অবলম্বন করে, তাদের প্রতিবাদ করে তিনি বলেন, "আর বাতিল কালামশাস্ত্রবিদদের বক্তব্য: কর্মগত গুণসমূহ আল্লাহর দ্বারা সংঘটিত হয় না, তাদের নিকট কোনো কাজ করা মানেই হচ্ছে সে কৃতকর্মটি। এ বক্তব্য অবশ্যই কুরআন, সুন্নাহ ও সালাফে সালেহীনের ইজমা' অনুযায়ী বাতিল কথা।...." (আল-হাক্কুল ওয়াদ্বিহ আল-মুবীন ৫২; তাওদ্বীহুল কাফিয়াহ আশ-শাফিয়াহ, পৃ. ৩০।)

তিনি আল্লাহ তা'আলার কর্মগত গুণাবলিকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন, এক. তাঁর নিজের সাথে সংশ্লিষ্ট, দুই. যা তার সৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত। এ বিষয়টি বর্ণনা করে বলেন, "আল্লাহর সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মগত গুণ যেমন 'আরশের উপর উঠা, নিকটতম আসমানে নেমে আসা, যা কুরআন ও সুন্নাহ'র ভাষ্য দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে, অনুরূপ আগমন করা, আসা, কথা ইত্যাদি, আর আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সংশ্লিষ্ট তাঁর সকল কর্মগত গুণাবলি যেমন জীবিতকরণ, মৃত্যু প্রদান, অনুরূপ যাবতীয় পরিচালনা এসবই আল্লাহর ক্ষমতা ও ইচ্ছা দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে।" (আল-হাক্কুল ওয়াদ্বিহ আল-মুবীন, পৃ. ২৩)

অন্যত্র তিনি আল্লাহ তা'আলার কর্মগুত গুণ যেমন, আগমন করা, নেমে আসা, উপরে উঠা এগুলো বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়ে তার তাফসীরের কয়েক জায়গায় বলেন,

"আল্লাহ তা'আলা বলেন, هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ - "তারা কি শুধু এর প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, আল্লাহ্ ও ফেরেশতাগণ মেঘের ছায়ায় তাদের কাছে উপস্থিত হবেন?" (সূরাহ আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ২১০) এ আয়াতটি ও অনুরূপ আয়াতসমূহ আহলুস সুন্নাতের প্রমাণ, যারা আল্লাহর ইচ্ছাকৃত ও পছন্দকৃত গুণসমূহ সাব্যস্ত করে থাকেন, যেমন 'আরশের উপর উঠা, নিকটতম আসমানে অবতরণ করা, হাশরের মাঠে আগমন করা ইত্যাদি, যে গুণাবলি দিয়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের ব্যাপারে জানিয়েছেন, আর তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা জানিয়েছেন। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত সেগুলোকে এমনভাবে সাব্যস্ত করে থাকেন যা তাঁর মহত্ব, বড়ত্ব ও সম্মানের সাথে উপযোগী, তবে তারা সেটাতে কোনো প্রকার সাদৃশ্য কিংবা বিকৃতি কোনোটিই করেন না। এর বিপরীত অবস্থানে রয়েছে মু'আত্তিলা গোষ্ঠী, যেমন জাহমিয়্যাহ, মু'তাযিলা ও আশ'আরিয়্যাহ ইত্যাদি গোষ্ঠীগুলো, যারা আল্লাহর এ গুণাবলিকে অস্বীকার করে, যারা এ গুণাবলির কারণে কুরআনের আয়াতের এমন সব তা'ওয়ীল বা দূরবর্তী অর্থ নিয়ে আসে যার পক্ষে আল্লাহ কোনো প্রমাণ নাযিল করেননি। বরং তাদের এ নীতির বাস্তব কথা হচ্ছে আল্লাহর বর্ণনা ও তাঁর রাসূলের বর্ণনার ত্রুটি ধরা আর এটা মনে করা যে, এ অধ্যায়ে কেবল তাদের কথা দ্বারাই হিদায়াত লাভ হবে; বস্তুত এদের পক্ষে কুরআন- হাদীসের দলীলও নেই, বিবেকের যুক্তির দলীলও নেই।" (তফসীর আস-সা'দী, পৃ. ২৮১)

আরও বলেন,

"আল্লাহর বাণী, هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ - "তারা শুধু এরই তো প্রতীক্ষা করে যে, তাদের কাছে ফিরিশতা আসবে, কিংবা আপনার রব আসবেন, কিংবা আপনার রবের কোনো নিদর্শন আসবে? যেদিন আপনার রব-এর কোন নিদর্শন আসবে সেদিন তার ঈমান কোন কাজে আসবে না, যে পূর্বে ঈমান আনেনি অথবা যে ব্যক্তি ঈমানের মাধ্যমে কল্যাণ লাভ করেনি.....।" (সূরাহ আল-আন'আম, আয়াত: ১৫৮) এ আয়াতে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মাযহাবের দলীল রয়েছে, যারা আল্লাহর ইচ্ছা ও পছন্দকৃত কর্মগত গুণাবলি আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলার জন্য সাব্যস্ত করে, যেমন 'আরশের উপর উঠা, নিকটতম আসমানে অবতরণ, হাশরের মাঠে আগমন করা; তারা সেটা সাব্যস্ত করতে গিয়ে কেনোভাবেই তা সৃষ্টির কারো সাথে সদৃশ করে সাব্যস্ত করেন না।" (তফসীর আস-সা'দী, পৃ. ২৮১।)

অন্যত্র ইস্তেওয়া এর অর্থ স্পষ্ট করে বর্ণনা করে তিনি বলেন, "ইস্তাওয়া" শব্দটি আল-কুরআনে তিনভাবে তিন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কখনও তা কোনো অর্থ পরিবর্তনকারী অব্যয় ছাড়াই ব্যবহৃত হয়েছে, তখন সেটার অর্থ হয় পূর্ণতা ও সমান সমান হওয়া। যেমন- মূসা 'আলাইহিস সালামের ব্যাপারে বলেছেন, - وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا "আর যখন মূসা তার শক্তি-সামর্থ্যের অবস্থায় উপনীত হলো এবং পূর্ণ অবস্থায় পৌঁছে গেল" (সূরাহ আল-কাসাস, আয়াত: ১৪) আবার কখনও কখনও তা 'আলা ওয়ারতাফা'আ' উপরে উঠা বা ঊর্ধ্বে উঠার অর্থে ব্যবহৃত হয়, যখন তার সাথে অর্থ পরিবর্তনকারী (আলা) অব্যয়টি আসে। যেমন- আল্লাহ তা'আলার বাণী - ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ "তারপর তিনি তাঁর আরশের উপর উঠেছেন।" (সূরাহ আল-আ'রাফ, আয়াত: ৫৪) وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ - "যাতে তোমরা তার পিঠের উপর উঠতে পার।" (সূরাহ আয-যুখরুফ, আয়াত: ১৩) আবার কখনও কখনও ইচ্ছা করার অর্থে ব্যবহৃত হয়; যখন তার সাথে (ইলা) অব্যয়টি আসে। যেমন, আলোচ্য আয়াতে (অর্থাৎ সূরাহ আল-বাক্বারার ২৯ নং আয়াতে)। অর্থাৎ যখন আল্লাহ তা'আলা যমীন সৃষ্টি করলেন, তখন তিনি আসমান সৃষ্টির ইচ্ছা করলেন। তারপর তিনি সেটাকে সাত আসমানে সৃষ্টি করলেন। এখানে

'ফাসাওয়াহুন্না' এর অর্থ, তাই তিনি সেগুলোকে সৃষ্টি করলেন, মজবুত করলেন এবং সুদৃঢ় করলেন।" (তাফসীর সা'দী, পৃ. ৪৮।)

তাছাড়া 'ইস্তেওয়া' বা 'আরশের উপরে উঠার ধরণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে কী জবাব দিতে হবে তা উল্লেখ করে বলেন, "আল-ইস্তেওয়া' এর অর্থ জানা, এর ধরণ অজানা, তার ওপর ঈমান আনয়ন করা ফরয, আর এর ধরণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদ'আত। সুতরাং যে কেউ আল্লাহর ইলম, আল্লাহর সৃষ্টি, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ নীতি সম্পর্কে প্রশ্ন করবে তাকে বলা হবে, নিশ্চয় মহান আল্লাহর সত্তা যেভাবে কোনো সত্তার সদৃশ নয় তেমনি তার গুণাবলিও কোনো গুণাবলির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। সুতরাং আল্লাহর সৃষ্টি আল্লাহকে কেবল সে পরিচয়েই চিনে যে পরিচয় তিনি তাঁর গুণাবলি ও কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রদান করেছেন, কিন্তু সেগুলোর ধরণ, তার প্রকৃত ব্যাখ্যা তো কেবল আল্লাহই জানেন।" (বাহজাতু কুলূবিল আবরার পৃ. ২১৯; ত্বারীকুল উসূল, পৃ. ৮।)

শাইখ কারী মুহাম্মাদ তৈয়ব ইবন হাফিয মুহাম্মাদ আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ কাসেম নানুতুওয়ী রাহিমাহুল্লাহ (১৪০৩ হিজরী)

শাইখ কারী মুহাম্মাদ তৈয়ব রাহিমাহুল্লাহ, যিনি উপমহাদেশের বিখ্যাত দেওবন্দ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতুওয়ী এর নাতি ছিলেন, দেওবন্দ মাদরাসার মুহতামিম ছিলেন। আকীদাগতভাবে তিনি মাতুরিদী আকীদাহ'র লোক ছিলেন। কিন্তু তিনি শারহুল আকীদাতিত ত্বাহাওয়ী গ্রন্থে বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি সম্পর্কে সালাফে সালেহীনের মতকেই প্রাধান্য দেন। যার মাধ্যমে তাদের বক্তব্যের খণ্ডনও হয়ে যাবে বর্তমান সময়ে যারা সালাফদের বক্তব্যকে নিজেদের বিভ্রান্ত মতের স্বপক্ষে নেয়ার জন্য অপব্যাখ্যা করে থাকে। তারা তাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় এ আলেমে দীনের বক্তব্য গ্রহণ করেও হকের পথে ফিরে আসতে পারে, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, **ইন্নাহা লা তা'মাল আবসার, ওয়ালাকিন তা'মাল কুলুবিল্লাতি ফিস সুদূর**। আমরা নিম্নে তাঁর কিছু বক্তব্য তুলে ধরার প্রয়াস পাব, তিনি বলেন,

"আল্লাহ তা'আলা যে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কথা কুরআনে কারীমে উল্লেখ করেছেন এবং হাদিসের মধ্যে যেগুলোর বিবরণ এসেছে যেমন- হাত, পা, মুখ, আঙ্গুল, আঙ্গুলের অগ্রভাগ, পিণ্ডলী ইত্যাদি যদিও এগুলোর আলোচনা সাধারণভাবে এসেছে এর অর্থ এই নয় যে, এগুলো মানবাঙ্গের মতই। বরং এর অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলার শানে এগুলো যেমন হওয়া দরকার ঠিক তেমনই আছে। সুতরাং তাঁর সত্তা যেমন মানব সত্তার মতো নয় এবং তাঁর কাজ কর্ম

যেমন আমাদের কাজ কর্মের মত নয়, ঠিক তেমনিভাবে তাঁর শানে ব্যবহৃত অঙ্গের নামগুলোও আমাদের অঙ্গের মত নয়। তাই আমাদের জন্য সবচে বেশি নিরাপদ হবে যে, এই শব্দ গুলোর ব্যবহারিক অর্থই আমরা উদ্দেশ্য নিবো। সাথে সাথে ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ যেমনটি বলেছেন আমরাও তাই বলবো যে, এই শব্দগুলোর ব্যবহারিক অর্থ আমাদের জানা থাকলেও এগুলোর আকার আকৃতি-প্রকৃতি, ধরন, প্রকৃতি আমাদের জানা নেই। তবুও এর উপর ঈমান আনা ওয়াজিব। এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা বিদ'আত। কারণ এগুলোর পূর্ণ পরিচিতি জানা এবং বুঝা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। হ্যাঁ, যদি আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে কোনো জ্ঞান দান করেন তাহলে তা ভিন্ন কথা"। (রহমান আরশের উপর উঠেছেন ৪৩৩ পৃ:)

তিনি আরও বলেন, "আল্লাহ তা'আলা বলেন- **লাইছা কামিসলিহী শাহউন ওয়াহুঅস সামিউল বাছির** এই আয়াতে আল্লাহর সাদৃশ্যতাকে অস্বীকার করা হয়েছে। তা তাঁর জাত তথা সত্তা, গুণাবলি, কাজকর্ম, এমনকি সর্ববিষয়ে ব্যাপকভাবে তার সাদৃশ্যতাকে অস্বীকার করা হয়েছে, যা পূর্বের আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট হয়েছে। সুতরাং তিনি সত্তার অধিকারী, কিন্তু তাঁর সত্তা আমাদের সত্তার মতো নয়। তিনি গুণাবলির অধিকারী, কিন্তু তার গুণাবলি আমাদের গুণাবলীর মত নয়। তিনি কর্ম সম্পাদনকারী, কিন্তু তার কর্ম সম্পাদন আমাদের কর্ম সম্পাদনের মতো নয়। এমনকি সাদৃশ্যপূর্ণ যত বিষয় আছে সর্ব ক্ষেত্রে তিনি মাখলুক থেকে ব্যতিক্রম। যেমন কোনো বিষয়ে তার জানা আর মানুষের জানা এক নয়। তিনি শক্তি-সাধ্যের অধিকারী, তবে তা মানুষের মত নয়। তিনি দেখেন, তবে তার দেখা আর মানুষের দেখা সমান নয়। তাঁর শোনা, তার উপরে উঠা, নিচে নামা এবং তাঁর হাসি ও তাঁর "আরশের উপর উঠা এর কোনো কিছুই মানুষের মতো নয়। কারণ তাঁর সত্তাই তো আমাদের সত্তার মতো নয়। মোটকথা, তাঁর কোনো সাদৃশ্যতাও নেই সমকক্ষও নেই। তিনিই তাঁর উত্তম দৃষ্টান্ত। তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।" (রহমান আরশের উপর উঠেছেন ৪৩৩ পৃ:)

তিনি আরও বলেন, "সঠিক মাযহাব হলো, আল্লাহ তা'আলার জন্য ক্রোধ ও সন্তুষ্টি, শত্রুতা ও বন্ধুত্ব, ঘৃণা ও ভালোবাসা ইত্যাদি সাব্যস্ত করা, এ সব গুণাবলি আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে শ্রবণ ও দর্শন, জীবন ও শক্তি, জ্ঞান ও কালাম বা কথা ইত্যাদি সাব্যস্ত করার মতই। আর এ গুণাবলি বাস্তব অর্থেই আল্লাহ তা'আলার জন্য প্রযোজ্য। রূপক অর্থে নয়। কিন্তু এর ধরন ও প্রকৃতি আমাদের জানা নেই। তাই এর এমন কোনো তা'ওয়ীল করা, যা আল্লাহ

তা'আলার শানে ব্যবহৃত বাস্তব অর্থকে পরিবর্তন করে দেয়, তা বৈধ নয়। সুতরাং ক্রোধ ও দয়া এবং এ ছাড়াও অন্যান্য গুণাবলি যেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার জন্য তা উল্লেখ করা হয়, কিন্তু খালেক ও মাখলুকের ক্ষেত্রে এ গুণাবলির প্রয়োগ সমান অর্থে নয়। বরং তা শুধু ইশতিরাকে লফযী শব্দগত সংযুক্তিতা বা মিল, অর্থগতভাবে নয়। তাই আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে ক্রোধ ও সন্তুষ্টি তাঁর শান অনুযায়ীই সাব্যস্ত হবে। (তা'লীক্বাত আলাল আক্বীদাতিত তাহাওয়ী, পৃ.১৩৪। শাইখ জুনাইদ বাবুনগরী হাফিযাহুল্লাহ, তাওহীদ ও শির্ক প্রকার ও প্রকৃতি, পৃ. ৪৯, অনুবাদ আব্দুল আউয়াল, মুহাদ্দিস ও মুফতি, ইদ্রিস আলী ইসলামিয়া মাদরাস আল্লারদরগা, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।)

শাইখ আবুল হাসান আলী আন-নাদওয়ী রাহিমাহুল্লাহ (১৪২০ হিজরী)

প্রখ্যাত আলেমে দীন শাইখ সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী আন-নাদওয়ী রাহিমাহুল্লাহ অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি শাইখ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলাওয়ীর সঠিক উত্তরসূরী ছিলেন। শাহ সাহেবের মত তিনিও ইলমুল কালামের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, যে আকীদাহ'র উৎস নির্ধারণে ভুল হওয়ার কারণেই যত খারাপ ও অশুদ্ধ আকীদাহ মুসলিমদের মাঝে প্রচার-প্রসার লাভ করে। যদি তারা নবীদেরকে আকীদাহ'র উৎস মনে করত তাহলে আর এত সন্দেহ ও ভুলে পতিত হতো না। যদি কুরআন ও সুন্নাহ'র আকীদাহ গ্রহণ করা হয়, তাহলে আল্লাহ তা'আলাকে 'আরশের উপরে বলতেই হয়। যেমন তিনি বলেন,

"আম্বিয়ায়ে কিরামের মারফত মানুষ যেসব বিদ্যা ও মর্মজ্ঞান পেয়েছে তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, শ্রেষ্ঠ ও জরুরী জ্ঞান হলো আল্লাহ তা'আলার জাত, সিফাত ও আফআল তথা তাঁর সত্তা, গুণাবলি ও কর্মসমূহের ব্যাপারে জ্ঞান। এ জ্ঞানের উৎস ও কেন্দ্রস্থল হচ্ছেন আম্বিয়ায়ে কিরামই। এ জ্ঞানের উপায় উপকরণ, এর প্রাথমিক জ্ঞাতব্য বিষয় ও অভিজ্ঞতা সবকিছুই মানবীয় আওতার ঊর্ধ্বে। কিয়াস ও বুদ্ধিবৃত্তির কোনো ভিত্তি নেই এখানে।

আল্লাহর কোনো নজীর নেই, তাঁর মতো বলতেও কিছু নেই। তিনি সব ধরনের উদাহরণ ও সাদৃশ্য হতে মুক্ত ও পবিত্র। সবকিছু থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে। মানুষ যা ধারণা করতে পারে, যা প্রত্যক্ষ করতে সে সক্ষম এবং যা সে অনুভব করতে সামর্থ, যেগুলোকে সে বস্তুগত ও অনুভবময় পৃথিবীতে কাজে লাগায় সেই সব ধরনের ধারণা, দেখা ও অনুভবেরও ঊর্ধ্বে। এখানে বুদ্ধি,

যুক্তি, মেধা ও ধীশক্তি কিছুই সাহায্য করতে পারে না। বুদ্ধির ঘোড়া দাবড়ানোর ময়দান এ নয়। মুক্তি ও অভিজ্ঞতার যুক্তি উড়ানোর আকাশও নয়।

এ জ্ঞানকে সবচেয়ে মহান এবং শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। কারণ মানুষের সর্বকালের কল্যাণ ও সৌভাগ্য এর ওপরই নির্ভরশীল। আমল ও আকীদাহ, আখলাক ও তামাদ্দুন, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মূল বুনিয়াদ এ -ই। এরই মাধ্যমে মানুষ নিজের হাকীকত ও মূল সম্পর্কে অবহিত হতে পারে, বিশ্বজগতে কুহেলিকার জট খুলতে পারে, জীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারে, বিশ্ব প্রকৃতিতে নিজের মর্যাদা ও অবস্থান নির্ণয় করতে পারে। এরই আলোকে স্বজাতিয়দের সাথে নিজের সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হয়, স্বীয় জীবন পথ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে এবং সম্পূর্ণ আস্থা অন্তর্দৃষ্টি ও পরিষ্কার ধারণার সাথে নিজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ণয় করতে সে সক্ষম হয়ে ওঠে।

আর তাই সকল জাতি ও গোষ্ঠির, সর্বযুগে ও সর্বশ্রেণিতে এই জ্ঞানকে সর্বোচ্চ স্থান দেয়া হয়েছে। জীবনকে যারা উদ্দেশ্যহীন বলে মনে করে না, পরিণাম সম্পর্কে যারা সচেতন, যারা মুখলেস ও আন্তরিক, এই ধরনের সমস্ত মানুষই এই জ্ঞানের প্রতি গভীর আগ্রহ ও অনুরাগ পোষণ করেন। ইচ্ছা-অনিচ্ছা, চেতন বা অচেতন যেভাবেই হোক না কেন, এই জ্ঞান থেকে বঞ্চিত থাকা এমন এক বঞ্চনা যার পর বঞ্চনা বলতে আর কিছুই থাকে না। এ এমন এক ধ্বংস ও বরবাদী যার থেকে বড় ধ্বংস ও বড় বরবাদী বলতে আর কিছুই নেই।

এ বিষয়ে মানুষের শ্রেণি দু'টি

এক. একটি শ্রেণি, যারা এ জ্ঞানার্জনের পথে মাধ্যম হিসেবে সেসব পয়গাম বাহক সত্তাদের ওপর নির্ভর করেছে, যাদেরকে মহান আল্লাহ নবুওয়াত, বাণী ও রিসালাতের সুমহান দায়িত্ব ও মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন, যাদের দিয়েছিলেন তাঁর নিজের সত্তার সঠিক মারিফাত ও পরিচয়। স্বীয় সন্তুষ্টির কাজগুলো সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করার জন্য তাঁদেরকে তিনি মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন সুদৃঢ় বিশ্বাস ও ইয়াকীনের বিপুল সম্পদ তিনি তাদের দান করেছিলেন যার বেশির কোনো কল্পনাও করা যায় না। সে নূর ও অন্তর্জ্যোতি তিনি তাদের দিয়েছিলেন, যার চেয়ে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ও আস্থাভাজন জ্যোতি আর হতে পারে না কখনো।

দুই. অপর শ্রেণি হলো, তারা যারা আপন মেধা ও জ্ঞানের ওপরই পুরোপুরি নির্ভরশীল, এ গণ্ডির মধ্যেই তাদের চিন্তাধারা সীমাবদ্ধ। নিজের বিবেক বুদ্ধিকে তারা লাগামহীন করে ছেড়ে দিয়েছে। সব জায়গায় তারা যুক্তি ও অনুমানের ঘোড়া দাবড়িয়ে বেড়ায়। আল্লাহর সত্তা, গুণাবলি, তাঁর সত্তা ও গুণাবলির অধ্যয়ন ও গবেষণার ক্ষেত্রেও তারা সব নিষ্ফল ও অনর্থক বিশ্লেষণ ও ব্যবচ্ছেদ করতে লেগে যায়, যেমনভাবে কোনো রাসায়নিক ল্যাবরেটরিতে প্রকৃতিজ বা উদ্ভিজ্জ কোনো বস্তুর করা হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কেও এরা 'তিনি এমন' বা 'তিনি এমন নন' জাতীয় কথা বেধড়কভাবে বলতে শুরু করে। আবার এদের কাছে 'তিনি এমন' জাতীয় কথার তুলনায় 'তিনি এমন নন' জাতীয় কথার পরিমাণ অনেক বেশি। এটি একটি বাস্তব সত্য, বিশ্বাস ও সত্যের জ্যোতি থেকে যখন কোনো মানুষ বঞ্চিত হয়ে যায় তার কাছে কোনো কিছুরি 'না' করা তা 'হ্যাঁ' ও প্রমাণ করার তুলনায় অধিকতর সহজ হয়ে যায়। আর তাই দেখা যায়, গ্রীক দার্শনিকদের আল্লাহতত্ত্বে অধিকাংশ পর্যালোচনা ও গবেষণার পরিণাম নেতিবাচক। কিন্তু কোনো ধর্ম ও আদর্শ, কোনো তাহযীব ও তামাদ্দুন এবং কোনো জীবনব্যবস্থা অনর্থক বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। আম্বিয়ায়ে কিরামের অভ্যাস তা নয়। এ তাঁদের শান ও মর্যাদা থেকে অনেক দূরের। তাঁরা তো অনুভূতি, বুদ্ধির অগম্য হাকীকত ও সত্যসমূহ সম্পর্কেও রাখেন প্রত্যক্ষশীল দর্শনেন্দ্রিয় ও শোনার মতো শ্রবণেন্দ্রিয়।

গ্রীক দার্শনিকদের ইলাহতাত্ত্বিক দর্শন পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারা, ধারণা ও অনুমানের নিশ্চিদ্র এক কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গল বলেই প্রতীয়মান হয়। মানুষকে এ বনে পথ হারিয়ে কেবলই চক্কর কাটতে হয়। এ যেন এক বিরাট গোলকধাঁধা, যাতে একবার ঢুকলে আর বেরুবার পথ পাওয়া যায় না। মেধা, প্রজ্ঞা, দার্শনিক রহস্যপ্রিয়তা, কাব্যচর্চা, জ্ঞান ও কৌশলে যেসব দার্শনিক ছিলেন অধিক প্রসিদ্ধ, এ শ্রেণির মধ্যে তাদেরকেই বেশি আগুয়ান বলে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ইলাহ তত্ত্বে মেধা, প্রজ্ঞা ইত্যাদি কোনোটিরই বিন্দুমাত্র দখল নেই। তাদের সকল প্রয়াস ও শ্রম নিষ্ফল ও পাহাড় কেটে কুয়া খননের নামান্তর বৈ অন্য কোনো পরিণাম বয়ে আনেনি। অন্তহীন সমুদ্রের বিপুল আঁধারে এরা ডুবে সারা হচ্ছে। কুরআনের এ আয়াতটিতে এদের যে চিত্রটি আঁকা হয়েছে এর চেয়ে যথার্থ ও সুন্দর আর কিছু হতে পারে না। আল্লাহর বাণীটি হচ্ছে, أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا ۗ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ - "গহীন সমুদ্রের আঁধার, ছেয়ে রেখেছে তা ঢেউ,

তার উপর আরেক ঢেউ, ঢেউয়ের উপরে আবার মেঘ বিপুল আঁধার, এক আঁধারের পরতে আরেক আঁধার। যদি বের করে নিজের হাত তবে যেন দেখা যায় না! আল্লাহ যার জন্য নির্ধারণ করেননি কোনো আলো তখন তার আর আলো কোথায়?" (সূরাহ আন-নূর: ৪০)

এদের কাছে হিদায়াতের কোন আলো ছিল না, যথার্থ জ্ঞান ও মা'রিফাতেরও কোনো রৌশনী ছিল না এতদসম্পর্কে তাদের কোনোরূপ পূর্ব অভিজ্ঞতা, অনুভূতি ও উপলব্ধি, এর প্রাথমিক পূর্বশর্তসমূহের পরিচয় বা বুনিয়াদী জ্ঞান যেগুলোর মাধ্যমে লাভ হয় অজানা বিষয়টির জ্ঞান - কোনো কিছুরই আশ্রয় তাদের ঘটেনি।

অধিকন্তু এরা ছিল পুরোনো ঝুরঝুরে শির্ক ও বিদ'আতের শিকার । এদের ধমনীতে ছিল শির্ক ও বিদ'আতের প্রবাহ। ভিত্তিহীন ও বাজে কিসসা-কাহিনী ও কিংবদন্তির ওপর ভিত্তি করে গঠিত বিশ্বাস ছিল তাদের সবকিছুর বুনিয়াদ ।

তাদের দর্শন, তাদের কাব্য ও কবিতা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ধর্ম ও নীতি সর্বক্ষেত্রে শির্ক ও পৌত্তলিকতার ছিল সুস্পষ্ট প্রভাব। তাদের দেহ ও মনে সর্বত্রই ছিল এর জোরালা মিশ্রণ। সৌরচক্র ও তথাকথিক দশটি আকল সম্পর্কে তাদের ছিল এক শির্কী আকীদামূলক দর্শন। এ ছিল গ্রীক প্রতীমা-দর্শন ও মিথলজির এক মিকশ্চার। তারা নিজেদের চিন্তা-ভাবনা ও কাল্পনিক ধ্যান-ধারণা ও কুসংস্কারগুলোকে গালেভরা ও ভারিক্কী নামে অভিহিত করে পেশ করত এবং দার্শনিক ও শাস্ত্রীয় পোশাকের ছদ্মাবরণে তা ঢেকে রাখত।

সাধারণভাবে পৃথিবীর প্রায় সকল সম্প্রদায়ের চিন্তাবিদ, ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিকরা গ্রীক দার্শনিকদেরই অনুসরণ করেছে। তাদের প্রভাবে অন্যান্য সকল জাতির প্রায় সকলেই হীনমন্যতা ও পরাজিত মানসিকতার শিকারে পরিণত হয়ে পড়েছিল এবং চোখ বুজে তাদের সবকিছুর ওপর আস্থাশীল হয়ে ওঠে। এরা তাদের গবেষণাপ্রসূত সকল ধারণাকে একটা স্বীকৃত সত্য বলে বিশ্বাস করে বসে। এগুলো সম্পর্কে আর কোনো রূপ আলোচনা ও প্রশ্নের কোনো অবকাশ নেই বলে ধারণা করতে থাকে। আর কেউ যদি এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করে বা প্রশ্ন তোলে তবে তাকে তারা অকাট মূর্খ ও গোঁড়া ও জেদী বলে মনে করতে থাকে ।

যে সকল সম্প্রদায় ও দল সুদূর অতীত থেকেই সঠিক ধর্মীয় পুঁজি হারিয়ে ফেলেছে, হিদায়াত থেকে ও আল্লাহর নূর তথা জ্যোতি থেকে বঞ্চিত যারা, তাদের বেলায়তো এ ধরনের হীনমন্যতার শিকার হওয়া ততটা বিস্ময়ের নয়। বিস্ময় ও আশ্চর্য্য হলো, সেসব তথাকথিত মুসলিম পন্ডিত ও চিন্তাবিদদের জন্য, যাদের আল্লাহ দান করেছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের মতো বিরাট নি'আমত এবং আল্লাহর কালামের মতো গৌরবজনক সম্পদ। এতদসত্ত্বেও তারা শিকার হলো এ মানসিকতার। এ মহান কিতাব ও এ মহান আদর্শের অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হলো, لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ - تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ - "বাতিল এতে পারে না আসতে, না সামনে থেকে আর না পেছন থেকে; এতো মহাপ্রাজ্ঞ ও প্রশংসিত সত্তার নিকট থেকে অবতীর্ণ।" (সূরাহ হা-মীম- আস-সাজদাহ: ৪২)

পরবর্তীতে মুসলিম জাহানের বেশ কিছু একাডেমী ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র পুরোপুরি মেনে নেয় এবং এর ওপর এমনভাবে আলোচনা ও গবেষেণায় লিপ্ত হয়ে পড়ে, এ যেন কিছু স্বীকৃত সত্য ও পরীক্ষিত কতিপয় বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়। কল্পনাশক্তি ধারণা ও সংস্কারগুলোকে এরা সঠিক বলে ধারণা করে নেয়। এদের অনেকেই এগুলোর সমর্থনে কুরআনের আয়াতও ব্যবহার শুরু করে এবং মনগড়া ও অর্থহীন ব্যাখ্যা দিতে থাকে এবং এমন সব তাফসীর এরা করে যাতে তাদের তথাকথিত 'স্বীকৃত দর্শন' ও 'প্রমাণিত সত্য' গুলোর সাথে কুরআনের সাযুজ্য প্রকাশ পায়।

তাদের চিন্তার মূলনীতি ছিল 'ওয়াজিবুল উজুদ'বা'অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বশীল সত্তা' যিনি হবেন, তাঁকে এ ধারণার জন্য ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। এরূপ চিন্তাধারার কারণেই মূলত এদের অধিকাংশ ভুলত্রুটি সংঘটিত হয়েছে। কারণ অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বশীলতার জন্য ক্ষতিকর ধারণা বলতে তারা যে বিষয়গুলোকে বুঝিয়েছে এর অধিকাংশই ছিল তাদের উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত কতক উদ্ভট ধারণা। আর কেবল এর ওপরই ভিত্তি করে তারা আল্লাহর বহু গুণবাচক নাম, গুণ ও কর্মকে স্বীকৃতি দেয়নি। এদের ধারণায় এগুলো দ্বারা আল্লাহর সাথে 'হুদুছ' বা অনিত্যতা ও অনাদিত্বতার আরোপ ঘটে বা কোনোটি দ্বারা আল্লাহর 'দেহশীল' হওয়া বুঝায় কিংবা অনাদি ও অবশ্যম্ভাবী সত্তা যেসব বিষয় থেকে পবিত্র হতে হবে, সেগুলো আরোপিত হয়। ইত্যাদি। এসব নুকতা আবিষ্কারের বুনিয়াদ হলো, মূলত এরা আল্লাহকেও মানুষের মতো এবং তাঁকে নিজেদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে

ধারণা করে বসে। কেননা এদের একজন কল্পনাও করতে পারে না বা একজনের এ অভিজ্ঞতা লাভও কখনো হয় না যে, সংশ্লিষ্ট অবস্থায় সংযোজন ছাড়াও এ গুণাবলির অস্তিত্ব লাভ সম্ভব। এরা ভুলে গিয়েছিল, এগুলো হচ্ছে আল্লাহর গুণ; এগুলো কোনো অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার মুখাপেক্ষী নয়; কোনো কিছুর পাবন্দী এগুলোর জন্য জরুরী নয়। এদের মধ্যে অনেকে আল্লাহর সিফাত ও গুণাবলির সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বসে। আবার তাদের মধ্যে অনেকেই এ সিফাতগুলোর রূপক অর্থ করে বা এর মধ্যে নানা অপব্যাখ্যার আশ্রয় নেয়, চূড়ান্ত বিশ্লেষণে এর ধরনের দূরবর্তী ব্যাখ্যাও অস্বীকারেরই নামান্তর। এতে আল্লাহর সিফাতসমূহের হিকমত বিনষ্ট হয়ে যায়।

রুচি ও প্রবণতার তারতম্য অনুসারে অনেকেই উক্ত পথে যাত্রা শুরু করে এবং ক্রমে ক্রমে 'ইলমে কালাম' নামে এক শাস্ত্রের উদ্ভব হয় এবং এতদসংক্রান্ত আলোচনা-পর্যালোচনাও বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর হতে থাকে।

তখন মুসলিম সমাজে একজন প্রাজ্ঞ জ্ঞানীর প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হতে থাকে, যিনি কুরআন, সুন্নাহ এবং সালাফ ও মহান পূর্বসূরীদের অনুসৃত আকীদা ও নীতির ওপর বুনিয়াদ রাখবেন স্বীয় আকীদাহ ও চিন্তাধারার, ঐগুলোকেই যিনি গ্রহণ করবেন মূল ভিত্তি হিসেবে; সাধারণ বিজ্ঞান, দর্শন ও এর ওপর ভিত্তি করে উদ্ভাবিত কালামশাস্ত্র ভক্তের দৃষ্টিতে নয়, বরং সমালোচকের নিরাসক্ত দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করবেন, যিনি দেখবেন এ এমন একটি বিষয়, যার কিছু অংশ গ্রহণ করা যায় আর কিছু অংশ প্রত্যাখ্যানও করা যায়। তিনি স্বাধীনভাবে এর একাডেমিক ও শাস্ত্রীয় বিশ্লেষণ করবেন, হীনমন্যতা ও পরাজিত মানসিকতার লেশমাত্র চিহ্ন থাকবে না এতে। কুরআনের ওপর তার ঈমান হবে তদ্রূপ যেরূপ তা নাযিল হয়েছিল। আল্লাহর সিফাত ও কার্যাবলী সম্পর্কে কোনোরূপ তা'ওয়ীল (রূপক ব্যাখ্যা) এবং তাহরীফ বা বিকৃতি সাধন ব্যতিরেকেই তিনি ঠিক তেমনিভাবে তা স্বীকার করে নেবেন যেমন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা সেগুলো সম্পর্কে বলেছেন।

এমন একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন, নেতৃস্থানীয় উলামায়ে কিরামের সাক্ষ্যানুযায়ী অষ্টম হিজরী শতকের সুপ্রসিদ্ধ আলিম শাইখুল ইসলাম হাফিয ইবন তাইমিয়্যাহ আল-হাররানী রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু ৭২৮ হিজরী) অন্যতম। তাঁর রচনাবলি তাঁর এ মর্যাদার জ্বলন্ত সাক্ষী। যে সত্য ও মূল্যবোধসমূহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা নিয়ে এসেছিলেন, আল্লাহর কালামে যেসব মূল্যবোধ ব্যক্ত করা হয়েছে, এসব কিছুর ওপর যেমন

তার পরিপূর্ণ ও দ্বিধাহীন ঈমান ও সুদৃঢ় প্রত্যয় ছিল, ইসলামের প্রথম যুগে প্রচলিত এবং সালাফে সালেহীন ও সুমহান মর্যাদার অধিকারী পূর্বসূরীদের অনুসৃত আকীদাহ সম্পর্কে যেমন তিনি ছিলেন সশ্রদ্ধ আস্থা ও স্বতৃপ্ত উপলব্ধির অধিকারী ; তেমনি ছিলেন তখন পর্যন্ত মুসলিম উম্মার মধ্যে দর্শন ও কালামশাস্ত্রের যতটুকু চর্চা ছিল সে দরিয়ার একজন সুকৌশলী ও সুদক্ষ সাঁতারু।

তিনি গ্রীক দর্শন, তর্কশাস্ত্র ও চিন্তাধারার সুগভীর, বিস্তৃত ও তুলনামূলক অধ্যয়ন করেছিলেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে দর্শন চিন্তা মুসলিমদের পরাজিত মস্তিষ্ককে প্রভাবান্বিত করে রেখেছিল, সেসব কিছু তিনি একজন তীক্ষ্ণধী সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। যেসব দর্শন অনেকের কাছেই স্বীকৃত হয়ে আসছিল তিনি সেসবের স্বাধীন ও শক্তিশালী সমালোচক ছিলেন।" (আবুল হাসান আলী আন-নাদওয়ী, আকীদা, ইবাদত ও সুলুক, পৃ. ৫৬-৬১। অনুবাদঃ মাওলানা ফরীদউদ্দীন মাস'উদ। বাংলা অনুবাদে বই এর নাম, ইসলামী জীবন বিধান।)

তিনি আরও বলেন,

"নিশ্চয় জগতের একজন স্রষ্টা রয়েছেন, যিনি সর্বপ্রথম, সর্বদা আছেন ও সর্বদা থাকবেন... তিনি সবকিছুর চেয়ে বড়, সবকিছুর উপরে, যাবতীয় পূর্ণতার গুণে গুণান্বিত, যাবতীয় ত্রুটিযুক্ত গুণ ও বিনষ্ট হওয়ার গুণ থেকে পবিত্র। তিনি সকল সৃষ্টিকুলের স্রষ্টা... তিনি কখনও কারও অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন না, কারও সাথে একাকার হয়ে যান না। তিনি 'আরশের উপর, কিয়ামতের দিন তিনি ঈমানদার দের জন্য দৃশ্যমান হবেন"। (আন-নাদওয়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩-৬৪।)

শাইখ মুহাম্মাদ নাসেরউদ্দীন আল-আলবানী রাহিমাহুল্লাহ (১৪২০ হিজরী)

শাইখ আল-মুহাদ্দিস আবু আবদুর রহমান মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দীন আল-আলবানী রাহিমাহুল্লাহ হচ্ছেন বর্তমান সময়ের জন্য ঊর্ধ্ব আকাশের ধ্রুব তারার মতো। যিনি হাদীসের খেদমতে প্রসিদ্ধ হলেও দীনী ইলমের কোনো ক্ষেত্রেই তাঁর অবদান কম ছিল না। আকীদাহ বিশুদ্ধকরণ, প্রচার- প্রসারের ক্ষেত্রে তার ব্যাপক অবদান ছিল। তিনি আল্লাহ সম্পর্কে সহীহ আকীদাহ'র বিষয়টি তাঁর

অনেক গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে আল্লাহর নাম ও গুণের বিষয়টিকে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নিয়েছেন।

তন্মধ্যে আল্লাহ সর্বোচ্চ পবিত্র সত্তা হওয়া, 'আরশের উপর হওয়া, 'আরশের উপর উঠা এ বিষয়ে তিনি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং তার অনেক গ্রন্থে এ ব্যাপারে বিস্তারিত লিখেছেন। এ সব লেখা পরবর্তীকালে একত্রিত করার পর তা ৩০০ পৃষ্ঠা ছাড়িয়ে গেছে। তাছাড়া তিনি এ বিষয়ে লিখিত ইমাম যাহাবীর অনবদ্য গ্রন্থ 'আল-'উলূ লিল আলিয়্যিল আযীম'গ্রন্থের শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয় করে সংক্ষিপ্তাকারে বের করেন। আমরা এখানে নমুনাস্বরূপ কিছু ভাষ্য তুলে ধরব।

আল্লাহর 'আরশের উপর উঠা ও কুরআন ও হাদীসে আসা আল্লাহ তা'আলাকে 'আসমানে বলতে কী বুঝানো হয়েছে, তার ব্যাখ্যা করে বলেন, "আর মুসলিমের আকীদাহ'র জন্য শুধু **"রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন"** এটার অর্থ বুঝাই যথেষ্ট নয়।" অনুরূপ "যমীনে যারা আছে তাদের ওপর দয়া কর, আসমানে যিনি আছেন, তিনি তোমাদের ওপর রহম করবেন"। এগুলোর শুধু অর্থ জানলেই হবে না, তার জানা লাগবে যে, **আরহামু মান ফীল আরজি ইয়ার হামকুম মান ফিস সামায়ি** এ হাদীসে 'ফী' বলে সেটাই বুঝানো হয়েছে যা কুরআনের **আআ মিনতুম মান ফীস সামায়ি** উক্ত আয়াতে 'ফী' দ্বারা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এগুলোতে 'ফী' বলে 'আলা' বুঝানো হয়েছে। তখন অর্থ হবে, যিনি আসমানের উপরে আছেন। এটা এজন্য বলেছি, যাতে করে কোনো মু'তাযিলী বা আশ'আরী তার কাছে এসে যদি কুমন্ত্রণা দেয় যে, তোমরা তো আল্লাহকে আসমানের ভিতরে রাখছ, তখন যেন তার কাছে উত্তর প্রস্তুত থাকে যে, না, রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন এবং আসমানের উপর যিনি আছেন এ দু'য়ের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই; কারণ দ্বিতীয় আয়াতে আসা 'ফী' এর অর্থ 'আলা' বা উপরে, 'মধ্যে' অর্থ নয়। এর ওপর প্রমাণ অনেক অনেক যে 'ফী' হরফটি 'আলা' এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। **আরহামু মান ফীল আরজি ইয়ার হামকুম মান ফিস সামায়ি** এ হাদীসটি মানুষের মুখে খুব প্রচলিত, যা তার অনেক বর্ণনার কারণে আলহামদুলিল্লাহ সহীহ। হাদীসে **আরহামু মান ফিল আরজি** কখনো যমীনের মধ্যে বলে যমীনের ভিতরের পোকামাকড় বুঝানো হয়নি। বরং বুঝানো হয়েছে, যারা যমীনের উপরে আছে, মানুষ ও (অন্যান্য) জীবজন্তু। তেমনিভাবে **আরহামু মান ফিস সামায়ি** বলে যিনি আসমানের উপরে আছেন তাঁকে বুঝানো হয়েছে। যারা সহীহ হক আকীদাহ'র দাওয়াতে সাড়া দিবে তাদের জন্য এ ধরনের বিস্তারিত জ্ঞান থাকা আবশ্যক; যাতে তারা

বিষয়টির ব্যাপারে স্পষ্ট প্রমাণের ওপর থাকে।" (মাওসূ'আতুল আলবানী ফিল আকীদাহ (৬/১১)।

অন্যত্র তিনি আল্লাহর নাম ও গুণের বিষয়টি বিস্তারিত কেন জানতে হবে তা ব্যাখ্যা করে বলেন,

"অধ্যায়: দাওয়াতের ক্ষেত্রে তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত তথা আল্লাহর নাম ও গুণের তাওহীদের বিষয়টি দাওয়াত প্রদানকারীর প্রথমের প্রথমে থাকার গুরুত্ব, সাথে সাথে তার কাছে থাকতে হবে সালাফে সালেহীনের (মানহাজ) বুঝ, আর এটা থেকে ভিন্ন পথে থাকার ঝুঁকি বা বিপদ।

প্রত্যেক মুসলিমই ঈমানের মূলনীতিগুলো ভালো করে জানে, যেমন আল্লাহর উপর ঈমান, ফিরিশতাদের উপর ঈমান ..... তাকদীরে ভালো ও মন্দ লেখা থাকার ওপর ঈমান, কিন্তু এ ধরনের ঈমানের দু'টি দিক রয়েছে। **এক. ঈমান মুজমাল বা সংক্ষিপ্ত ঈমান**, যা না জানার ক্ষেত্রে কারও ওযর গ্রহণযোগ্য নয়। সে ঈমানে মুজমাল হচ্ছে আল্লাহর ওপর, ফিরিশতাদের ওপর... সংক্ষিপ্ত ঈমান। কিন্তু এ ঈমানই যথেষ্ট নয়, তার সাথে অবশ্যই যুক্ত হতে হবে, **দুই. ঈমানে মুফাসসাল** বা আল্লাহর কুরআন ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে অথবা তাঁর সুন্নাতে সে ঈমানের যে বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে তা সম্পৃক্ত থাকতে হবে। আর সেটা বুঝতে হবে আমাদের সালাফে সালেহীনের বুঝ (তথা মানহাজ) মোতাবেক। এখন আমি শুরু করতে চাই সে ঈমানে মুজমালের বর্ণনা যা প্রতিটি মুসলিমের থাকতে হবে, তারপর তার সাথে যুক্ত হতে হবে বিস্তারিত বর্ণনা। ঈমান বিল্লাহ বা আল্লাহর ওপর ঈমান হচ্ছে সকল ঈমানের মূল।... দুনিয়াতে যত দীন প্রচলিত আছে তারা সবাই ঈমানে মুজমাল বা সংক্ষিপ্ত ঈমানে তোমার সাথে শরীক হতে পারে... ইয়াহূদীরা আল্লাহর ওপর ঈমান রাখে, খ্রিষ্টানরাও আল্লাহর ওপর ঈমান রাখে, সাবেঈরাও আল্লাহর উপর ঈমান রাখে... তাহলে বুঝা গেল যে, আল্লাহর ওপর এরকম সংক্ষিপ্ত ঈমান যথেষ্ট নয়। বরং ঈমান অবশ্যই বিস্তারিত বর্ণিত থাকতে হবে। তবে যেটা বলেছি ইতোপূর্বে যে, অবশ্যই কুরআন ও সুন্নাহ'র ওপর হতে হবে। এখন আমরা বাস্তব জীবন থেকে একটি উদাহরণ দিতে পারি, আমাদের যুবকরাও বিভিন্ন দলীয় ব্যানারে ভাগ হয়ে পড়েছে, কিন্তু তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত আদর্শের ওপর নেই, তারা সবাই জানে না যে ঈমানে মুজমাল যথেষ্ট নয়, ঈমানে মুফাসসাল লাগবে। কুরআন ও সুন্নাহ'য় যেভাবে এসেছে সেভাবে আল্লাহর ওপর ঈমান আনতে হবে। কুরআন ও সুন্নাহ'য় যেভাবে

আল্লাহ নিজেকে গুণান্বিত করেছেন সেভাবে ঈমান আনতে হবে।... বর্তমানে মুসলিমদের অবস্থা এমন হয়েছে যে, একবার কোনো এক বুদ্ধিমান শাসক এক বড় আলেমকে বলতে শুনলেন যে,.. আল্লাহ তা'আলাকে উপরে আছে বলে গুণান্বিত করা যাবে না, অনুরূপ তাকে নিচে, ডানে, বামে, সামনে, পিছনে এগুলোও বলা যাবে না। তাকে জগতের ভেতরে, জগতের বাইরে কোনোটিই বলা যাবে না, উক্ত বুদ্ধিমান শাসক তখন বলেছিলেন, 'এরা তো দেখি তাদের রবকে হারিয়ে বসে আছে। এটাই হচ্ছে মুসলিমদের বাস্তবতা, মুসলিমদের বিশ্বাস আজ এ রকমই। তাছাড়া আকীদাতে এর থেকেও আকীদাহ রয়েছে, যা আমরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন আলোচনা সভায় শুনতে পাই, তারা যখন তার রবকে স্মরণ করে তখন বলে, কী বলে? বলে, আল্লাহ সব জায়গায়। তাদের যিকিরও তাই বুঝায়। বস্তুত এটাই প্রকৃত কুফুরী। এর কারণ কী? কারণ হচ্ছে মুসলিমরা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে আরও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে সালাফে সালেহীনের মানহাজ থেকে। এ শেষের অংশটুকু জুড়ে দেয়া জরুরী। কারণ; কারণ পূর্ববর্তী পথভ্রষ্ট দার্শনিক কিংবা কালামশাস্ত্রবিদ, যাদেরকে উক্ত বুদ্ধিমান শাসক বলেছিলেন যে, 'এরা তো দেখি তাদের রবকে হারিয়ে ফেলেছে' অথবা তাদের পরবর্তী পথভ্রষ্ট অনুসারী গোষ্ঠী, যারা রাব্বুল আলামীনকে সব জায়গায় জমা করেছে, এমনকি ময়লার ডিপোতে, পানির লাইনে, ময়লার ড্রেনে, অনুরূপ নিকৃষ্টতম জায়গায়, তারাও কিন্তু আল্লাহর বাণী অস্বীকার করে না, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত অস্বীকার করে না, বরং তারা তাদের বিরোধীদের চ্যালেঞ্জ করে বলে, আমরা তো কুরআন ও সুন্নাহ'র ওপরই চলি.....।" (প্রাগুক্ত (৬/১৬-১৭)।

যারা বলে থাকে যে, আল্লাহর নাম ও গুণের বিষয়টি সাধারণ মানুষের সামনে আলোচনা করা ঠিক নয়, অন্যত্র শাইখ তাদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন, "আল্লাহর পথের দা'ঈগণ কি আল্লাহর নাম ও গুণাবলির আলোচনা সাধারণ জনসমক্ষে করা উচিত?

প্রশ্নঃ আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন, আল্লাহর নাম ও গুণের কথা আলোচনা উপলক্ষ্যে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, কিছু লোক বলেন, আল্লাহর পথের দা'ঈদের কর্তব্য হচ্ছে, এ অধ্যায়ের আলোচনা সাধারণ জনসম্মুখে না করা; কারণ এসব বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া তাদের অন্তরে সন্দেহের উদ্রেক ঘটাতে পারে, এ কথাটি কতটুকু বিশুদ্ধ?

উত্তর: হ্যাঁ, প্রথমে আমরা বলবো, তোমরাও সাধারণ মানুষের সামনে তোমাদের উত্তম কথাগুলো বলো। তোমরা তোমাদের উত্তম কথাগুলো সাধারণ মানুষের সামনে বলতে থাক। যদি তোমাদের কাছে আল্লাহর নাম ও গুণাবলি নিয়ে কথা বলা ভালো না লাগে তবে তোমাদের ওপর কর্তব্য হচ্ছে যা তোমাদের কাছে ভালো লাগে সেটা তাদের কাছে বলা। তোমরা যদি সেটা না করো, আর তোমরা কখনো করবে না, তাহলে তোমরা তা শুনবে যা তোমরা অপছন্দ করো। এই যে জিনিসটি তোমাদের কাছে অপছন্দের সেটাই তোমাদের রবকে খুশি করবে, সন্তুষ্ট করবে, আর এটাই তো আমাদের কাছে এসেছে আমাদের সালাফে সালেহীনের জ্ঞানের অংশ হিসেবে, আর আমরা এটাকেই আল্লাহর ইবাদাতের জন্য দীন হিসেবে গ্রহণ করেছি। সাধারণ মানুষ, যেভাবে তোমাদেরকে আমরা বলেছি, তারা সুস্থ স্বাভাবিক প্রকৃতির ওপর আছে, তাদেরকে যদি বলা হয়, আল্লাহ উপরেও নয়, নিচেও নয়, তখন সেটা তাদের অন্তর মেনে নেয়না। কিন্তু যদি তাদেরকে বলা হয়যে, আল্লাহ তাআলা সকল সৃষ্টিকুলের উপরে, তাঁর উপরে কোনো সৃষ্টি নেই, তখন সেটা তাদের সুস্থ স্বাভাবিক প্রকৃতির সাথে খাপ খায়। فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ - "আল্লাহর সেই ফিতরাত বা সুস্থ স্বাভাবিক প্রকৃতি, যার ওপর তিনি মানুষদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহর সৃষ্টির এ ফিত্বরাতের পরিবর্তন নেই।" (সূরাহ আর-রূম: ৩০)"

যারা বলে থাকেন আল্লাহর গুণ সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীস মুতাশাবিহাত এর অন্তর্ভুক্ত; শাইখ তাদের সন্দেহের অপনোদন করে বলেন,

"অধ্যায়, আল্লাহর গুণবাচক আয়াত ও হাদীস কী মুতাশাবিহ (অস্পষ্ট) নাকি সেগুলো মুহকাম (স্পষ্ট) আয়াত ধরা হবে?

প্রশ্ন: কোনো এক প্রশ্নকারী বলেন, আল্লাহর গুণবাচক আয়াত ও হাদীসগুলো কী মুতাশাবি বা অস্পষ্ট, নাকি মুহকাম বা স্পষ্ট অর্থজ্ঞাপক, যেমনটি শাইখুল ইসলাম বলেছেন?

শাইখ উত্তরে বলেন; এগুলোকে একদিক থেকে মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত ধরা যেতে পারে, আর তা হচ্ছে সেগুলার ধরন নির্ধারণ। তবে এগুলোর প্রকাশ্য অর্থ থাকার বিষয়ে এগুলোকে মুতাশাবিহাত আয়াতসমূহের অন্তর্ভুক্ত বলা যাবে না। যেমনটি আমরা আগে বলেছি, সালাফদের কথা 'এগুলোকে যেভাবে এসেছে সেভাবে চালিয়ে নাও' এর ব্যাখ্যায়। সালাফদের

কথা, 'যেভাবে এসেছে সেভাবে চালিয়ে নাও' এর অর্থ আরবী বুঝ অনুযায়ী চালিয়ে নাও, যার উদাহরণ আমরা ইমাম মালিকের বক্তব্য থেকে ইতোপূর্বে তোমাদেরকে জানিয়েছি। তাহলে সে হিসেবে অর্থাৎ এ আয়াতসমূহের জানা অর্থ রয়েছে আরবী ভাষায়, সে হিসেবে এগুলো মুতাশাবিহ বা অস্পষ্ট আয়াত বলা যাবে না।

তবে ধরণ নির্ধারণের দিক থেকে এগুলো মুতাশাবিহ বা অস্পষ্ট; কারণ আমরা আল্লাহর সত্তার ধরন জানতে সক্ষম নই, তাই আমরা আল্লাহর গুণাবলির ধরণও জানতে অক্ষম। আর সেজন্যই হাদীসের ইমামগণের কেউ কেউ বলেছেন, তিনি হচ্ছেন, ইমাম আবু বকর আল-খত্বীব, বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থের লেখক, যা তারীখে বাগদাদ নামে খ্যাত, তিনি বলেন, "আল্লাহর গুণের ব্যাপারে সেটাই বলা হবে, যা তাঁর সত্তার ব্যাপারে বলা হবে, সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে ও সাব্যস্ত না করার ক্ষেত্রে। গুণের ক্ষেত্রে তাই বলা হবে যা সত্তার ব্যাপারে বলা হয়। যেভাবে আমরা তাঁর সত্তাকে সাব্যস্ত করি, সত্তার অস্তিত্বকে না বলি না; কারণ এটাকে না বলা তো মূলত তাঁকে অস্বীকার করাই হয়ে যায়। সে রকম আমরা আল্লাহর গুণাবলির ব্যাপারেও বলি, আমরা সেগুলোকে সাব্যস্ত করি, নাকি করি না। তবে আমরা যেভাবে সত্তার ধরণ নির্ধারণ করি না, তেমনি গুণাবলিরও ধরণ নির্ধারণ করি না। এটিই হচ্ছে এ প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তর।

আর আমরা বলি, কুরআনে কারীমের ভাষ্য - وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ 'এর তা'ওয়াল আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না' (সূরাহ আলে-ইমরান, আয়াত: ০৭) এ আয়াত থেকে সরাসরি যে তা'ওয়ীলকে নিষেধ করা হয়েছে তার অর্থ কখনো ও কস্মিনকালেও এটা নয়যে, আল্লাহ ব্যতীত এর অর্থ কেউ জানে না। এখানেই স্পষ্ট হয়েযাবে কিছু মানুষের ভুল, যারা তথাকথিত 'তাফওয়ীদ্ব' বা আল্লাহর গুণাবলি বুঝাতে আসা আয়াতসমূহ ও হাদীসসমূহের শব্দাবলির অর্থ না করার নীতি অবলম্বন করেছে, তারা বলে থাকে, আমরা এগুলোর অর্থ মহান আল্লাহর দিকে সোপর্দ করছি, আমরা এগুলোর অর্থ খুঁজবো না। বস্তুত তাদের এ বক্তব্য ভুল, তাদের আয়াতাংশের ভুল ব্যাখ্যা ব্যতীত তাদের মতের স্বপক্ষে আর কোনো দলীল-প্রমাণ পেশ করতে পারবে না। আর যদি তাদের এ 'অর্থ না করার নীতির স্বপক্ষে একমাত্র এ আয়াতাংশই দলীল হয়ে থাকে, যেমনটি তোমরা শুনে থাক, তাদের জানা উচিত, আমাদের রব বলেছেন, 'এগুলোর তা'ওয়ীল বা বিস্তৃত ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না', কখনও বলেননি, 'এগুলোর অর্থ আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না'।

আর এটা জানা কথা যে, তা'ওয়ীল হচ্ছে, কোনো কিছুর সর্বশেষ পরিণাম ও কোনো কিছুর প্রকৃত অবস্থা, যার দিকে তা প্রত্যাবর্তন করবে বা যেখানে এসে শেষ হবে। হ্যা, এটাই তা'ওয়ীলের অর্থ। আমরা যখন আল্লাহর গুণ সংক্রান্ত কোনো আয়াত বা হাদীস পড়ি, তখন নিঃসন্দেহে ও কোনো প্রকার সমস্যা ছাড়াই এগুলোর অর্থ বুঝি, যেমন আল্লাহর বাণী الرَّحْمَـٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ - "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন" (সূরাহ ত্বা-হা, আয়াত: ০৫), এর মধ্যে আসা 'ইস্তেওয়া' গুণটি, যা তিনি কুরআনের কারীমের অনেক জায়গায় বলেছেন, অনুরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুতাওয়াতির পর্যায়ের হাদীসে আসা "আল্লাহ অবতরণ করেন প্রতি রাতে নিকটতম আসমানে'। এ আয়াত ও হাদীস দু'টিতে আসা ইস্তেওয়া ও নুযূল এর অর্থ আমরা সহজেই বুঝতে পারি। কিন্তু এ ইস্তেওয়া বা উপরে উঠা ও নুযূল বা অবতরণের প্রকৃত ধরণ আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না। এর প্রকৃত ধরন না জানার বিষয়টিই উক্ত (সূরাহ আলে ইমরানের ৭ নং) আয়াতের উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য সেটা নয় যা তাফওয়ীদ্ব বা অর্থশূন্যকারী গোষ্ঠী বলে থাকে যে, এ (সূরাহ আলে ইমরানের ৭ নং) আয়াতের উদ্দেশ্য আমরা এগুলোর অর্থ জানি না। এ ধরনের কথা-বার্তা বিবেক কীভাবে মেনে নিতে পারে? শরী'আত মেনে নেয়ার তো প্রশ্নই আসে না।" প্রাগুক্ত (৬/২২)।

যারা সালাফে সালেহীনের দিকে আল্লাহর গুণাবলি বর্ণনায় আসা আয়াত ও হাদীসের অর্থ না করার নীতি তথা তাফওয়ীদ্ব অবলম্বন করে তাদের নীতি খন্ডন করে শাইখ বলেন, ইমাম আহমাদের বক্তব্য 'তোমরা এগুলোকে পরিচালিত করো যেভাবে এসেছে সেভাবে। এর অর্থ হচ্ছে, এগুলোকে যেভাবে এসেছে সেভাবে বুঝ, এগুলোর গভীরে গিয়ে ধরন জানার প্রচেষ্টা চালানো ব্যতীতই। আর যারা বলে, সালাফে সালেহীনের মাযহাব ছিল তাফওয়ীদ্ব বা অর্থশূন্য করে শুধু শব্দের ওপর ঈমান আনা, প্রথমেই তাদের ওপর দু'টি বিষয় আপতিত হবে। আর যেমনটি প্রবাদে আছে, দু'টি জিনিসের মধ্যে যেটি সবচেয়ে বেশি মিষ্ট সেটিই তিতা।

সে দু'টি জিনিসের প্রথমটি হচ্ছে, এটা বলা যে, যেসব আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁর নিজের গুণ বর্ণনা করেছেন সেসব আয়াত, যদিও সেসব অগণিত অসংখ্য হাদীসকে আলোচনার বাইরেও রাখি, যাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা তাঁর রবের গুণাবলি বর্ণনা করেছেন, সেসব যাবতীয় ভাষ্যের অর্থ তাফওয়ীদ্ব নীতি অবলম্বনের কারণে বলা হয় যে, আমরা

এগুলোর অর্থ মোটেই বুঝি না, বরং আমরা জানি না কেন আমাদের মহান রব এগুলো তাঁর কিতাবে নাযিল করেছেন, আমরা তাও জানি না, কেন তাঁর নবী সেগুলো দিয়ে তার রবকে গুণান্বিত করেছেন, আমাদের কর্তব্য হচ্ছে আমরা কুরআন ও সুন্নাহ'য় আসা এসব গুণাবলির অর্থ না বুঝা ও না জানা, তাহলে আমাদের জানা উচিত আল্লাহ তা'আলা কিছু গোষ্ঠীর ব্যাপারে মারাত্মক অখুশী প্রকাশ করেছেন, যারা কুরআনে কারীম বুঝার ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়না, যখন রাব্বুল আলামীন বলেন, - أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا 'তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করবে না? নাকি তাদের অন্তরে তালা আছে?' (সূরাহ মুহাম্মাদ, আয়াত: ২৪)

সন্দেহ নেই, ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে সেই রব সম্পর্কে জানা, যিনি এ দীন প্রবর্তন করেছেন, আর তা করেছেন তাঁর নবীর যবানীতে, তাহলে যখন আল্লাহর গুণাবলি সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীসের ক্ষেত্রে বলা হয় যে, আমরা এগুলো থেকে কিছুই বুঝি না, তাহলে তো তারা আল্লাহর আয়াত ও রাসূলের হাদীস থেকে মোটেই কোনো শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেনি। তারা তো তখন সে আয়াতের অধীন হয়ে যাবে, যাদের সম্পর্কে পূর্বোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে, - أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا "তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করবে না? নাকি তাদের অন্তরে তালা আছে?' (সূরাহ মুহাম্মাদ, আয়াত: ২৪) অনুরূপ তারা সে আয়াতেরও অন্তর্ভুক্ত হবে, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا - 'তাদের রয়েছে এমন কিছু হৃদয় যার দ্বারা তারা কিছু বুঝে না' (সূরাহ আল-হাজ্জ, আয়াত: ৪৬) আরও বলেছেন, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ 'আর কুরআনের এসব উদাহরণ কেবল আলেমগণই বুঝতে পারে। (সূরাহ আল-আনকাবূত, আয়াত: ৪৩)

আর আল্লাহর আয়াতসমূহ আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে কেবল তা বুঝার জন্য, তা অনুধাবন করার জন্য, যদি সেটা আকীদাহ সম্পর্কিত হয় তাহলে সেগুলোকে আকীদাহ হিসেবে গ্রহণ করবে, আর যদি সেটি বিধি-বিধান সম্বলিত হয় তবে সেটাকে বিধান হিসেবে গ্রহণ করবে ও তার ওপর আমল করবে। তাহলে তা যখন মহান আল্লাহর গুণাবলি সংক্রান্ত হবে আর তা বুঝা না যায় তখন তো আমরা আমাদের রব সম্পর্কে কিছুই জানতে পারলাম না, কেবল বুঝলাম যে, তাঁর একটা অস্তিত্ব আছে।

(বস্তুত এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কিছু নয় যে, আল্লাহর সৃষ্টি হয়েও তাঁর ব্যাপারে কিছুই জানতে পারিনি, তবে বাস্তব কথা হচ্ছে তারা সকল গুণের ব্যাপারে সেটা বলে না।)

যদি তাদের কথা যে 'এসব গুণাবলির আয়াত থেকে কিছুই বুঝা যায়না' এটা সত্য হয়, তাহলে সেসব আয়াতের ব্যাপারে কী বলবে, যেসব গুণ সাব্যস্তের ব্যাপারে তারা সবাই একমত, এমনকি তাদের পরবর্তী আলেমগণও, যেমন, **লাইছা কামিসলিহী শাইউন ওয়াহুঅস সামিউল বাসীর** 'তাঁর মতো কোনো কিছু নেই, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা'। (সূরাহ আশ-শূরা, আয়াত: ১১) তাদের পূর্বোক্ত নীতি যদি এখানে কার্যকর করা হয় তাহলে সেটার দাবী হচ্ছে তারা এখানে আসা আল্লাহর গুণ 'আস-সামী' শব্দটিকে তাফওয়ীদ্ব করে বলা যে, এর অর্থ জানা যায়না। তাহলে সেটা অনুযায়ী আমরা কি বলবো, আমরা জানি না আস-সামী' থেকে সাম' নামক সিফাতের অর্থ কী? আর আল-বাসীর থেকে 'বাসার' নামক সিফাত এর অর্থ কী? অনুরূপ কথাই কি বলা হবে, ক্বাদীর, হাকীম, আলীম ইত্যাদি সিফাতসমূহের ব্যাপারে? বস্তুত এ তথাকথিত 'তাফওয়ীদ্ব' বা অর্থ না করার নীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা এসব গুণের গুণটির অর্থই জানি না, তখন অর্থ দাঁড়াবে, আমরা একজন রবের অস্তিত্বের ওপর ঈমান আনলাম, কিন্তু তাঁর গুণসমূহের কোনো গুণ সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। এভাবে বললে তো আমরা বান্দাদের রব আল্লাহর সাথেই কুফুরী করলাম, যখন তথাকথিত তা ফওয়ীদ্ব নীতির মাধ্যমে তার গুণাবলিকে অস্বীকার করলাম। এভাবেই যারা তথাকথিত তাফওয়ীদ্ব নীতি অবলম্বন করে তাদের রদ্দ করা হবে।

দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে, তাদেরকে বলা যে, যদি ইমাম আহমাদ ও অন্যান্যরা বলে থাকেন যে, 'এ গুণবাচক আয়াতগুলোকে যেভাবে এসেছে সেভাবে চালিয়ে নিয়ে যাও' (যার অর্থ তোমাদের ধারণা অনুযায়ী, অর্থ না বুঝে পার হয়ে যাওয়া) তাহলে ইমাম আহমাদের পূর্বে দারুল হিজরাত মদীনার ইমাম মালিক ইবন আনাস রাহিমাহুল্লাহ তিনিও কি একই মাযহাব পোষণ করতেন? যখন তার কাছে সেই প্রশ্নকারী এসে জিজ্ঞেস করেছিল, হে মালিক, 'রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন' কীভাবে উঠলেন? তিনি জবাবে বলেছিলেন, ইস্তেওয়া বা 'উপরে উঠা' জানা কথা। তিনি বলেছেন, 'ইস্তেওয়া মা'লুমূন' বা ইস্তেওয়া জানা কথা। এ কথা বলেননি যে, 'ইস্তেওয়া' এর অর্থ তাফওয়ীদ্ব কর। বরং বলেছেন, 'ইস্তেওয়া মা'লুমূন' বা ইস্তেওয়া জানা কথা আর সেটা হচ্ছে উপরে থাকা, ঊর্ধ্বে উঠা। তবে সেটার ধরন অজানা। এটাই হচ্ছে

সালাফে সালেহীনের মত। আর এজন্যই ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ'র কথার বাকী অংশ হচ্ছে, এ লোকটিকে বের করে দাও; কেননা সে বিদ'আতী লোক। এ প্রশ্নকারী লোকটিকে কেবল আল্লাহর বাণী **আর রহমানু আলাল আরশিস তাওয়া**, এ আয়াতে তার কাছে কোনো শব্দের অর্থ গোপন থাকায় সেটা জিজ্ঞেস করার কারণে বের করে দেয়া হয়নি, বিদ'আতী বলা হয়নি, বরং তাকে তো বের করে দেয়া হয়েছে ও বিদ'আতী বলা হয়েছে এ কারণে যে, সে এর ধরন জানতে চেয়েছে। আর সে জন্যই ইমাম মালিকের এ বাণী সালাফে সালেহীন ও তাদের সুন্দর অনুসারীদের প্রতিনিধিত্ব করেছে। যার মূল কথা হলো, আল্লাহর গুণাবলি সংক্রান্ত আসা যাবতীয় আয়াত ও সকল হাদীসের অর্থ আভিধানিকভাবে আমরা বুঝি; কিন্তু তার ধরন আমাদের সম্পূর্ণ অজানা। সুতরাং সে সত্তা ব্যতীত তাঁর সত্তার ধরন অন্য কেউ জানে না, অনুরূপ সে সত্তা ব্যতীত অন্য কেউ তাঁর গুণাবলির ধরন জানে না। কিন্তু 'ইস্তেওয়া', সাম', বাছার এগুলোর অর্থ জ্ঞাত জিনিস।" (প্রাগুক্ত (৬/৫৪-৫৬)।

অন্যত্র তিনি আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি সম্পর্কে বলেন, "আর আল্লাহর গুণাবলি দু'ভাগে বিভক্ত: কর্মগত গুণ ও সত্তাগত গুণ। সুতরাং "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন" (সূরাহ ত্বা-হা, আয়াত: ০৫) এটি কর্মগত গুণ। অনুরূপ তাঁর অবতরণ, "প্রতি রাতে আল্লাহ তা'আলা নিকটতম আসমানে নেমে আসেন" এটাও কর্মগত গুণ। কিন্তু তাঁর অবতরণ মানুষের অবতরণের মতো নয়, আর তাঁর উপরে উঠা আমাদের উপরে উঠার মতো নয়।"প্রাগুক্ত (৬/৭৯)।

অন্যত্র তিনি 'আরশের উপরে বলতে কি কোনো স্থান বুঝাচ্ছে? সেটার জবাব দিয়ে বলেন,

(ইমাম যাহাবী তার আল-'উলু গ্রন্থে বলেন) আর যা প্রমাণ করে যে, মহান আল্লাহ সবকিছুর উপরে, তাঁর সম্মানিত 'আরশের উপরে, তবে সেটা পরিচিত কোনো জায়গায় প্রবেশ করা নয়, তার দলীল আল্লাহর বাণী "তাঁর 'কুরসী' আসমানসমূহ ও যমীনকে পরিব্যাপ্ত করে আছে; আর এ দু'টোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর জন্য বোঝা হয়না। আর তিনি সুউচ্চ সুমহান।" (সূরাহ আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ২৫৫)

শাইখ আবু আব্দির রহমান মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দীন আল-আলবানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এ বাক্যটি নিয়ে চিন্তা কর, এটি এমন এক সত্য ও সঠিক বক্তব্য, যা না জানার কারণে অনেক মানুষকে দেখা যায় কুরআন ও সুন্নাহ'র

এসব বহুবিধ প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তারা আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর 'আরশের উপরে থাকাকে অস্বীকার করে যাচ্ছে। তাছাড়া তারা সালাফে সালেহীনের অনুসারীদের ওপর দোষারোপ করছে যারা এর ওপর ঈমান রাখে। এ মানুষগুলো মনে করছে যে, সালাফে সালেহীনের অনুসারীরা মহান আল্লাহর জন্য 'আরশের উপরে একটি স্থান নির্ধারণ করে নিয়েছে (যে রকম স্থান তারা দুনিয়াতে সৃষ্টিকুলের জন্য নির্ধারণ করে), যালিমরা যা বলে তা থেকে আল্লাহ অনেক ঊর্ধ্বে। এই যে গ্রন্থকার (ইমাম যাহাবী) তিনি সালাফে সালেহীনের অনুসারী একজন বড় ইমাম, তিনি এভাবে স্থান নির্ধারণ থেকে আল্লাহকে পবিত্র ঘোষণা করছেন। আল্লাহ তা'আলা কোনো প্রকার স্থানে প্রবেশ করার থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। এসব মানুষ যারা সালাফে সালেহীনের অনুসারীদেরকে এরকম দোষ দিচ্ছে, তারা যে কারণে এটা করছে তা হচ্ছে, তারা মনে করছে, মহান আল্লাহকে তাঁর সকল সৃষ্টির উপরে বলা এটা বলা বাধ্য করে যে, তিনি কোনো স্থানে প্রবেশ করে আছেন, তারা বলে, এটা তো বাতিল, আর যা বাতিল কিছু আনতে বাধ্য করে তাও বাতিল। এ লোকগুলো জানতে পারেনি কিংবা না জানার ভান করেছে যে, স্থান তো একটি অস্তিত্ব প্রদানকৃত জিনিসের নাম, 'আরশের উপর কোনো অস্তিত্ব প্রদানকৃত জিনিস নেই। সুতরাং সেখানে এমন কোনো স্থান নেই যা মানুষের ধারণার মধ্যে আসে। সুতরাং মহান আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলা 'আরশের উপর, তিনি কোনো স্থানের অভ্যন্তরে নন।

আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, যারা মহান আল্লাহ তা'আলাকে এখনও 'আরশের উপর থাকার উপর ঈমান আনেনি, এ তথাকথিত স্থান নির্ধারণ থেকে বাঁচার জন্য তারাই আবার পুরোপুরিভাবে এ ঈমান পোষণ করে থাকে যে, আল্লাহ তা'আলা বহু জায়গায়। আর তা তাদের সে কথার মাধ্যমে, যখন তারা বলে, আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান।" (প্রাগুক্ত (৬/৩৯৫)।

অনুরূপভাবে, তিনি 'আরশের উপর উঠা এবং 'আরশের উপর থাকার বিষয়ে সালাফে সালেহীনের বক্তব্য বর্ণনা করার পর বলেন, "জেনে রাখ, আল্লাহ তা'আলার জন্য "সৃষ্টিকুল থেকে আলাদা" বাক্যটি সালাফে সালেহীনের আকীদায় প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে, যখন তারা আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে বলেন, "মহান আল্লাহ তাঁর 'আরশের উপরে, সৃষ্টিকুল থেকে আলাদা" আর তা বিখ্যাত আলেমগণ থেকে ইমাম আবু যুর'আহ আর-রাযী ও ইমাম আবু হাতেম আর-রাযী বর্ণনা করেছেন। বস্তুত আলেমগণ এ দু'টি বাক্য, 'সত্তাগতভাবে' ও 'আলাদা' ব্যবহার করেছেন, কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের যুগে এভাবে ব্যবহার করা দেখা যায়নি। তার কারণ হচ্ছে, জাহম ও তার অনুসারী লোকদের এটা

বলা যে, আল্লাহ তা'আলা সব জায়গায় বিরাজমান। তখন অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী এ ইমামগণ কর্তৃক 'আলাদা' শব্দটি ব্যবহার করা জরুরী হয়ে পড়েছিল, তখন কেউ সেটার বিরোধিতা করেনি।" (মুখতাসারুল 'উলূ, পৃ. ১৭।)

ইমাম আবু আব্দির রহমান মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দীন আল-আলবানী রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক সকল সৃষ্টির উপরে থাকার বিষয়ে আলোচনা করে বলেন,

"আমাদেরকে এ বিষয়ে এটা জানা আবশ্যক যে, মহান আল্লাহ তাবারকা ওয়া তাআলার রয়েছে যাবতীয় পূর্ণতা প্রকাশক গুণাবলি, তিনি সকল প্রকার ত্রুটিযুক্ত গুণ থেকে মুক্ত। আর পূর্ণতা প্রকাশক গুণের মধ্যে কিছু আছে যা বিবেকের যুক্তি, সুস্থ স্বাভাবিক প্রকৃতির মাধ্যমে মানুষ জানতে পারে। তবে এর সংখ্যা কম। যেমন, আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টির উপরে থাকবেন। যে কেউ এটা জানবে যে, আল্লাহর জন্য সেসব গুণাবলি উপযুক্ত যা পূর্ণতা প্রকাশক, যেমন তিনি সকল সৃষ্টিকুলের উপরে থাকবেন, বিপরীতটি নয়, তার বিবেকের একেবারে সামান্যতম ব্যবহারেই সে এর সত্যতা বুঝতে পারে। তারপরও কুরআন ও সুন্নাহ'য় এত বেশি ভাষ্যে এ বিষয়টিকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সকল সৃষ্টির উপরে রয়েছেন, এর পরে আর স্পষ্ট করে বর্ণনা করার কিছু নেই। এসব ভাষ্যের মধ্যে কিছু ভাষা এটা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে 'আরশের উপর রয়েছেন যেমন **আর রহমানু আলাল আরশিস তাওয়া** 'রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন' (সূরাহ ত্বা-হা, আযাত: ০৫) এ আয়াতটি, যা বেশ কয়েকটি আয়াতে বারবার বর্ণনা করা হয়েছে। বস্তুত 'আরশ মহান আল্লাহর সৃষ্টিসমূহের মধ্যে একটি সৃষ্টি। বরং তা আল্লাহর সৃষ্টিকুলের মধ্যে (আমাদের জানা মতে) সবচেয়ে বড় সৃষ্টি। তাই রব্বুল আলামীন যেখানে সরাসরি নির্দিষ্টভাবে বলছেন যে, তিনি সে মহা 'আরশের উপর, তাহলে সে আকীদাহ প্রত্যেক মুসলিমের গ্রহণ করা ফরয, কোনো মুসলিমের জন্য এর প্রকাশ্য নির্দেশনা থেকে নতুন করে বানানো অর্থের দিকে নিজেকে নিয়ে যাওয়া কখনো জায়েয হবে না। যে দিকে সেসব কালামশাস্ত্রবিদ আলেমগণ গিয়েছেন যারা সালাফে সালেহীনের মত ও পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছেন। কারণ, সালাফে সালেহীন আল্লাহর গুণাবলি সংক্রান্ত সকল আয়াত ও হাদীসের ওপর কোনো ধরনের বিকৃতি কিংবা অপব্যাখ্যা ব্যতীতই ঈমান আনতেন ।

মুতাওয়াতির পদ্ধতি (সন্দেহাতীতভাবে) অথবা বলবো প্রসিদ্ধ পদ্ধতিতে ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তার কাছে এক লোক এসে বললো, হে মালিক, 'রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন' কীভাবে উঠলেন? তখন মালিক রাহিমাহুল্লাহ'র জবাব ছিল, 'ইস্তেওয়া' শব্দের অর্থ জানা, অর্থাৎ আভিধানিকভাবে, তা হচ্ছে উপরে থাকা, এটাই ইমাম মালিক তার 'ইস্তেওয়া শব্দের অর্থ জানা' এ কথা দ্বারা বুঝিয়েছেন। তারপর তিনি বলেছেন, 'তবে ধরন অজানা, সেটা সম্পর্কে অর্থাৎ ধরণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদ'আত।' এভাবে তিনি তার উত্তরে সালাফে সালেহীনের নীতি দিয়ে উত্তর দিয়েছেন যা মহান আল্লাহর সকল গুণের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। সুতরাং সেসব গুণাবলিকে যেভাবে এসেছে সেভাবে সাব্যস্ত করা হবে, অভিধানে তার যে অর্থটি সুসাব্যস্ত সেটা অনুযায়ী, কিন্তু সাথে সাথে কোনো প্রকার উপমা কিংবা সাদৃশ্য নির্ধারণ করাও জায়েয হবে না। কারণ, আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে বলেছেন, - لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ - وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ লাইছা কামিসলিহী শাইউন ওয়াহু অস সামিউল বাসীর অর্থাৎ "তাঁর মতো কোনো কিছু নেই আর তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।" (সূরাহ আশ-শূরা, আয়াত: ১১) এ আয়াতে যখন বলা হয়েছে 'তার মতো কোনো কিছু নেই' তখন কিছু জিনিস 'না' করা হয়েছে, যা দ্বারা আল্লাহকে পবিত্র ঘোষণা করা উদ্দেশ্য। আর আয়াতে 'হ্যাঁ' করা হয়েছে মহান আল্লাহর গুণসমূহ থেকে দু'টি গুণকে, তা হচ্ছে, সাম ও বাসার অর্থাৎ শোনা ও দেখাকে। তাই বলা হবে, তাঁর শোনা অন্য কারও শোনার মতো নয়, তাঁর দেখাও অন্য কারও দেখার মতো নয়, "তাঁর মতো কোনো কিছু নেই আর তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।" প্রাগুক্ত (৬/৪০৮)।

শাইখ আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ ইবন বায রাহিমাহুল্লাহ (১৪২০ হিজরী)

শাইখ আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ ইবন বায রাহিমাহুল্লাহ, যিনি ছিলেন সালাফে সালেহীনের নমুনা। তিনি তার অধিকাংশ আলোচনায় আল্লাহ সম্পর্কিত সালাফে সালেহীনের সহীহ আকীদাহ তুলে ধরতেন। সেগুলো একত্র করলে আরেকটি গ্রন্থ হয়ে যাবে। এখানে শুধু নমুনাস্বরূপ কিছু ভাষ্য বর্ণনা করা হলো:

শাইখ ইবন বায রাহিমাহুল্লাহকে তিনি কোন আকীদাহ পোষণ করেন সেটা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি যা বলেন তা হচ্ছে, "আমার আকীদাহ-বিশ্বাস

যার মাধ্যমে আমি আল্লাহর আনুগত্য করি আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাকে এর ওপরই মৃত্যু দেন, তা হচ্ছে, এ ঈমান পোষণ করা যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তিনিই হচ্ছেন হক্ব মা'বুদ, ইবাদাত পাওয়ার অধিকারী, আরও ঈমান আনি যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের উপর, তিনি সেটার উপর উঠেছেন, যেভাবে উপরে উঠা তাঁর সম্মান, মর্যাদার সাথে উপযুক্ত কোনো প্রকার ধরণ নির্ধারণ ব্যতীতই। আরও ঈমান আনি যে, তিনি সকল সৃষ্টির উপর রয়েছেন এ গুণে তাঁকে গুণান্বিত করতে হবে, যেমনটি আল্লাহ বলেছেন, الرَّحْمَـٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ -আর রাহমানু আলাল আরশিস তাওয়া অর্থাৎ "রহমান আরশের উপর উঠেছেন।" (সূরাহ ত্বা-হা, আয়াত: ০৫), মহান আল্লাহ আরও বলেছেন, إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ -"নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ্ যিনি আসমানসমূহ ও যমীন ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন।" (সূরাহ আল-আ'রাফ, আয়াত: ৫৪), মহান আল্লাহ আয়াতুল কুরসীর শেষে বলেছেন, وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ - "আর এ দু'টোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর জন্য বোঝা হয়না। আর তিনি সুউচ্চ সুমহান।" (সূরাহ আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ২৫৫), মহান আল্লাহ আরও বলেন, فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ - "সুতরাং যাবতীয় কর্তৃত্ব সমুচ্চ, মহান আল্লাহরই।" (সূরাহ গাফির, আয়াত: ১২) মহান আল্লাহ আরও বলেছেন, مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ۚ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ - "তাঁরই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ হয় সমুত্থিত এবং সৎকাজ, তিনি তা করেন উন্নীত।" (সূরাহ ফাত্বির, আয়াত: ১০) এ অর্থে আরও বহু আয়াত এসেছে।"

অন্যত্র তিনি বলেন, "আর মহান আল্লাহ সকল প্রকার পূর্ণতাজ্ঞাপক গুণে গুণান্বিত, সকল প্রকার দোষ- প্রকাশক গুণ থেকে মুক্ত ও পবিত্র। তিনি তেমনি, যেমনটি তাঁর ব্যাপারে তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন, তাঁর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলি।

সুতরাং মুমিনের ওপর কর্তব্য হচ্ছে, আল্লাহর নাম ও গুণের ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা যা সংবাদ দিয়েছেন তার ওপর যথাযথ ঈমান আনয়ন করা, সেগুলোকে যেভাবে এসেছে সেভাবে চেনা, বিগড়ে ফেলা যাবে না, পরিবর্তন সাধন করা যাবে না, পরিবর্ধন করা যাবে না, সংকুচিত করা যাবে না। বরং যেভাবে এসেছে সেভাবে কোনো প্রকার বিকৃতি সাধন, অর্থহীন করণ,

ধরণ নির্ধারণ ও উপমা প্রদান ব্যতীতই তা জানতে হবে। বরং সেগুলোকে সালাফে সালেহীন যেভাবে সাব্যস্ত করেছেন সেভাবে সাব্যস্ত করতে হবে।

তন্মধ্যে অন্যতম গুণ হচ্ছে, "আরশের উপর উঠা, নিকটতম আসমানে অবতরণ করা, চেহারা, হাত, দয়া, জ্ঞান, ক্রোধ, ইচ্ছা ইত্যাদি গুণসমূহ। সুতরাং এগুলোকে মহান আল্লাহর কিতাব ও সহী সুন্না হয় যেভাবে এসেছে সেভাবে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা হবে। আমরা সেগুলোকে আল্লাহর জন্য সেভাবে সাব্যস্ত করবো যেভাবে আমাদের সালাফে সালেহীন আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত সাব্যস্ত করেছেন। যেভাবে রাসূলগণ 'আলাইহিমুস সালাম সাব্যস্ত করেছেন। তাই আমরা বলবো, আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপর উঠেছেন, যেভাবে উঠা তাঁর সম্মান ও মহত্বের সাথে উপযুক্ত। সেটা নয় যা জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায় বলে থাকে যে, তিনি অধিকার করেছেন বা মালিক হয়েছেন। কারণ মহান আল্লাহ বিপরীত কাউকে পরাজয় কারীর অবস্থানে নন; কারণ কেউ তাঁকে পরাজিত করার ভূমিকায় যেতে পারে না। তিনি সবকিছুর উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রক। বস্তুত 'ইস্তেওয়া' 'আরশের সাথে সম্পৃক্ত আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণ। যার অর্থ উপরে উঠা ও ঊর্ধ্বে উঠা। তিনি সুউচ্চে রয়েছেন, তাঁর সৃষ্টির উপরে, ঊর্ধ্বে, 'আরশের উপরে, তাতে সেভাবে উঠেছেন যেভাবে উঠা তাঁর সাথে উপযোগী, মহান আল্লাহর এসব গুণে তাঁর কোনো সৃষ্টি তাঁর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। সুতরাং তাঁর 'আরশের উপর 'ইস্তেওয়া' করা জানা জিনিস (যার অর্থ, উপরে উঠা।) যেমনটি ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "ইস্তেওয়া" বা উপরে উঠার বিষয়টি জানা জিনিস, তার ধরন অজানা, তার উপর ঈমান আনয়ন করা ওয়াজিব, তার (ধরণ) সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদ'আত। এরকমই বলেছেন ইমাম রবী আহ, যিনি ইমাম মালিকের উস্তাদ ছিলেন। আর এ কথাই বলেছেন, উম্মে সালামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা। আর এটাই বলে থাকেন আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত। সুতরাং এ গুণাবলির অর্থ জানা জিনিস, কিন্তু এগুলোর ধরন অজানা। সেগুলোর ওপর ঈমান আনা ওয়াজিব।

সকল গুণের ক্ষেত্রে এই একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। জ্ঞান, দয়া, ক্রোধ, চেহারা, হাত, পা, আঙ্গুল ইত্যাদি যা আল্লাহর কুরআনের আয়াতে এসেছে, আর যা সহীহ সুন্নাহ'য় এসেছে, এসবের ব্যাপারে একই নীতি কার্যকর হবে। অনুরূপ নিয়মেই আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নিকটতম আসমানে অবতরণ করার গুণটি বুঝতে হবে। আমরা অবতরণ করার অর্থ বুঝি, সেটার অর্থকে যেভাবে তাঁর জন্য উপযুক্ত সেভাবে সাব্যস্ত করি, তিনি ব্যতীত সেটার ধরন আর কেউ জানে না। তাই আমরা বলবো, তিনি যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে

অবতরণ করেন, কোনো ধরন নির্ধারণ করবো না, এমনভাবে তিনি অবতরণ করেন যেভাবে অবতরণ করা তাঁর সম্মান ও বড়ত্বের সাথে উপযোগী। এ অবতরণ তাঁর উপরে, সর্বোচ্চে থাকাকে নিষেধ করে না। তাঁর অবতরণ কোনো সৃষ্টিকুলের অবতরণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়।

ঠিক একইভাবে বলা হবে, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক 'আরশের উপর উঠা বস্তুনিচয় সম্পর্কে তাঁর জানা এবং সেগুলোকে জ্ঞানের মাধ্যমে পরিবেষ্টন করার বিরোধী নয়। আবার তিনি তাঁর বান্দাদের সাথে রয়েছেন, তাঁর আনুগত্যকারী বান্দাদের সঙ্গে রয়েছেন, তাঁর বান্দাদের সাথে তিনি তাঁর জ্ঞান ও দেখার মাধ্যমে সাথে আছেন, যেমনটি তিনি বলেছেন, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ -"তিনি তোমাদের সাথে রয়েছেন যেখানেই তোমরা থাক না কেন।" (সূরাহ আল-হাদীদ, আয়াত: ০৪) এ সাথে থাকা তাঁর উপরে থাকা ও 'আরশের উপর উঠার সাথে সাংঘর্ষিক নয়। তিনি আমাদের সাথে রয়েছেন তাঁর জ্ঞান ও দেখার মাধ্যমে, অথচ তিনি 'আরশের উপরে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে, আর যেমনটি তিনি জানিয়েছেন, কোনো প্রকার বিকৃতি, ধরন নির্ধারণ করা যাবে না। আবার তিনি তাঁর বন্ধুদের সাথে, আনুগত্যকারীদের সাথে রয়েছেন তাঁর জ্ঞানের মাধ্যমে, সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে, তাদের যথাযথ তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে, তাদের যথাযথ হিফাযত করার মাধ্যমে, তাদেরকে সাহায্য করার মাধ্যমে। তাহলে এখানে দু' ধরনের সাথে থাকা রয়েছে। একটি হচ্ছে, সর্বব্যাপী 'সাথে থাকা' যা জ্ঞান ও পরিবেষ্টন করাকে বুঝায়, আর বান্দাদেরকে দেখা এবং তারা কেউ যে তাঁর কাছে গোপন থাকে না। (অপর 'সাথে থাকা' হচ্ছে বিশেষভাবে সাথে থাকা, যা তার বিশেষ বান্দাদের সাথে, তার দ্বারা জানা ও দেখার সাথে সাথে তাদের সাহায্য করাও অন্তর্ভুক্ত যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।)"

অন্যত্র তিনি বলেন,

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ -

"যিনি আসমান ও যমীন ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন তারপর তিনি আরশের উপর উঠেছেন।" (সূরাহ আল- আ'রাফ, আয়াত: ৫৪) এখানে (সুম্মা ইস্তাওয়া 'আলাল 'আরশ) এর অর্থ, তারপর তিনি আরশের উপরে উঠলেন, তার ঊর্ধ্বে উঠলেন। সুতরাং সকল জায়গায় তার জ্ঞান, কিন্তু তিনি আরশের উপর, সকল সৃষ্টিকুলের উপর। আর 'আরশ হচ্ছে সকল সৃষ্টির ছাদ। তা সবচেয়ে উপরের সৃষ্টি আর মহান আল্লাহ তার উপরে'। তিনি সে 'আরশের

উপর উঠেছেন যেভাবে উঠা তাঁর সম্মান ও মর্যাদার সাথে উপযোগী, তাঁর গুণের সাথে তাঁর কোনো সৃষ্টির কোনো সাদৃশ্য নেই।"

অন্যত্র তিনি বলেন, - قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ

"আর এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "নিশ্চয় আমি তা (খাবার ভর্তি প্লেট) তোমাদের ওপর নাযিল করব।" (সূরাহ আল-মায়েদাহ, আয়াত: ১১৫)

এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, আমাদের রব তাঁর কাছে উপরের দিকে চাইতে হবে, আর তিনি উপরে আসমানসমূহের উপরে রয়েছেন। সকল সৃষ্টির উপরে, 'আরশের উপরে, তিনি সে 'আরশের উপর এমনভাবে উঠেছেন যেভাবে উঠা তাঁর মহত্ব, সম্মান-মর্যাদার সাথে উপযোগী। তাঁর কোনো গুণের সাথে তাঁর সৃষ্টির কোনো সাদৃশ্য নেই।

এ অর্থটি অন্যান্য বহু আয়াতেও সাব্যস্ত হয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর সৃষ্টির উপরে থাকা প্রমাণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে রয়েছে 'ইস্তেওয়া' বা 'আরশের উপরে উঠা সাব্যস্তকারী সাতটি বিখ্যাত আয়াত; যার অন্যতম হচ্ছে, মহান আল্লাহর বাণী, إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ - "নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ্ যিনি আসমানসমূহ ও যমীন ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন। তিনিই দিনকে রাত দিয়ে ঢেকে দেন, তাদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে। আর সূর্য, চাঁদ ও নক্ষত্ররাজি, যা তাঁরই হুকুমের অনুগত, তা তিনিই সৃষ্টি করেছেন। জেনে রাখ, সৃজন ও আদেশ তাঁরই। সৃষ্টিকুলের রব মহান আল্লাহ্ কত বরকতময় !" (সূরাহ আল-আ'রাফ, আয়াত: ৫৪)

এ আয়াতে তিনি সাব্যস্ত করছেন, তাঁর উপরে থাকা, তিনিই মহাস্রষ্টা, মহা রিযিকদাতা, তিনিই সৃষ্টি ও বিধান প্রদান করার মালিক। তিনিই রাতকে দিন দিয়ে ঢেকে দেন, তিনিই সূর্য ও চন্দ্রের স্রষ্টা, তিনিই তারকারাজি সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে মানুষ জানতে ও বুঝতে পারে তাঁর মহান অবস্থা, পূর্ণ ক্ষমতা, পরিপূর্ণ জ্ঞান। আরও বুঝতে পারে যে, তিনি সকল সৃষ্টির উপরে রয়েছেন, তিনিই শুধু ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য।" (বায়ানুত তাওহীদ আল্লাযী বা'আসাল্লাহু বিহির রুসুলা জামি'আন, পৃ. ৬৭।)

শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল-উসাইমীন (১৪২১ হিজরী)

আমাদের শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল-উসাইমীন রাহিমাহুল্লাহ সারা জীবন যত আকীদাহ'র বইয়ের ব্যাখ্যা করেছেন সবগুলোতেই আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর উঠার বিষয়টির আলোচনা এনেছেন, তাঁর যেসব গ্রন্থে এসব আলোচনা এসেছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে,

১) শারহুস আকীদাতিস সাফারীনীয়্যাহ।

২) শারহু উসূলিল ঈমান

৩) শারহু লুম'আতিল ই'তিক্বাদ

৪) তালখীসু আকীদাতিল হামাওয়িয়্যাহ

আমরা এখানে একটি গ্রন্থের আলোচনা পেশ করব যেখানে তিনি এ বিষয়টিকে খুব সুন্দর ও সহজ করে তুলে ধরেছেন। তিনি শারহুল আকীদাতিল ওয়াসিতিয়্যাহ গ্রন্থে বলেন,

"আর মহান আল্লাহর বাণী, **"সুম্মা ইস্তাওয়া 'আলাল 'আরশ"** (তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠলেন) এখানে 'সুম্মা' শব্দটি ধারাবাহিকতা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আর 'আরশ' অর্থ সে ছাদ, যা সকল সৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করে আছে, আমরা 'আরশের মূল উপাদান জানি না; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা থেকে এমন কোনো সহীহ হাদীস আসেনি যাতে 'আরশ কিসের তৈরি তা বর্ণনা করেছে, তবে আমরা অবশ্যই জানি যে, যত সৃষ্টি আমরা জানি তন্মধ্যে 'আরশ হচ্ছে সর্ববৃহৎ সৃষ্টি।

আর 'আরশ' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, এমন খাট যা বাদশাহ'র জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট। আর জানা কথা যে, বাদশাহ'র জন্য যে খাটটি নির্ধারিত, সেটি হবে অনেক বৃহৎ বিশাল, নজীরবিহীন।

এ আয়াতে আল্লাহর গুণাবলির মধ্যে অনেকগুলো গুণের বর্ণনা এসেছে, কিন্তু গ্রন্থকার (ইবন তাইমিয়্যাহ) শুধু একটি গুণ সাব্যস্ত করার জন্য তা নিয়ে এসেছেন। আর তা হচ্ছে, 'আরশের উপর উঠার গুণ সাব্যস্ত করা।

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আহ ঈমান আনে যে, আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপরে সমুন্নত, তিনি 'আরশের উপরে এমনভাবে উঠেছেন যেভাবে উঠা তাঁর মর্যাদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, তাঁর সে উঠা সৃষ্টিকুলের উঠার মতো নয়।

যদি প্রশ্ন কর যে, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নিকট 'ইস্তেওয়া' এর অর্থ কী?

উত্তর হবে, তাদের নিকট এর অর্থ, উপরে উঠা এবং উপরে অবস্থান করা।

সালাফে সালেহীন থেকে **'ইস্তেওয়া'** এর অর্থ বুঝাতে চারটি শব্দ এসেছে, এক. **'আলা'** বা উপরে উঠা, দুই. **'ইরতাফা'আ'** বা উপরে উঠা, তিন. **'স্বা'আদা'** বা উপরে আরোহন করা, চার. **'ইস্তাকাররা'বা** উপরে অবস্থান করা।

তন্মধ্যে **'আলা', 'ইরতাফা'আ' ও স্বা'আদা** এর অর্থ একই। শুধু শব্দগত পার্থক্য। কিন্তু **'ইস্তাকাররা'** এ শব্দটি উপরোক্ত শব্দসমূহ থেকে অর্থের দিক থেকে একটু ভিন্নতর।

সালাফে সালেহীন তাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে দলীল দিয়েছেন যে, আরবী ভাষার সকল অভিধানে এ অর্থেই এসেছে, যখন সেটার 'আলা' অব্যয় সাথে যুক্ত করা হয়। যেমন,

মহান আল্লাহর বাণী, وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ - وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ - "অতঃপর যখন আপনি ও আপনার সঙ্গীরা নৌযানের উপরে স্থির হবে।" [সূরাহ আল-মুমিনূন, আয়াত: ২৮]

যেমন অপর বাণী, وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ - لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ - "যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এমন নৌযান ও গৃহপালিত জন্তু যাতে তোমরা আরোহণ কর, যাতে তোমরা এর পিঠে স্থির হয়ে বসতে পার, তারপর তোমাদের রবের অনুগ্রহ স্মরণ করবে যখন তোমরা এর উপর স্থির হয়ে বসবে।" [সূরাহ আয-যুখরুফ, আয়াত : ১২-১৩]

এর বিপরীতে আমরা দেখি, তা'ত্বীল (বা এগুলোকে) আল্লাহর গুণাবলি সাব্যস্ত করতে অস্বীকারকারীরা **'ইস্তেওয়া'** শব্দের অর্থ করেছেন **'ইস্তাওলা'** বা অধিকার করা। অধীনস্থ করা। তারা বলে, এখানে **"সুম্মা ইস্তাওয়া আলাল 'আরশ"** [সূরাহ আল-আ'রাফ, আয়াত: ৫৪] এর অর্থ হচ্ছে, তারপর তিনি 'আরশ অধিকার করলেন।

আর তারা সে বিকৃতি সাধনের জন্য পজেটিভ দলীল ও নেগেটিভ দলীল নিয়ে এসেছে।

তন্মধ্যে পজেটিভ বা ইতিবাচক দলীল হচ্ছে, তারা বলে, আমরা কবির কবিতা দিয়ে দলীল পেশ করছি, কবি বলেন, অর্থাৎ বিশর (ইবন মারওয়ান) ইস্তাওয়া (অধিকার করে নিয়েছে) ইরাককে।

তারা বলে, এটি তো এক আরবী লোকের কবিতা। সেখানে ইরাকের উপর উঠেছেন বলা সম্ভব নয়, কারণ, তখন তো আর কোনো বিমান ও এ জাতীয় জিনিস ছিল না যে, আমরা বলবো তিনি এগুলো দিয়ে ইরাকের আকাশে উঠেছেন।

আর তাদের নেগেটিভ বা নেতিবাচক দলীল হচ্ছে এটা বলা যে, আমরা যদি মহান আল্লাহর জন্য 'আরশের উপর উঠা সাব্যস্ত করি, যেমনটি তোমরা বলে থাক, আর যা উপরে উঠা ও উপরে অবস্থান করা বুঝায়, তাহলে তো এর দ্বারা আবশ্যক হয়ে যায় যে আল্লাহ তা'আলা 'আরশের মুখাপেক্ষী, যা অসম্ভব; আর আবশ্যক হওয়া জিনিস অসম্ভব হওয়ায় যা অসম্ভবকে আবশ্যক করে তোলে তাও অসম্ভব হওয়া প্রমাণিত হচ্ছে।

- তাছাড়া আরেকটি জিনিসও বাধ্যতামূলকভাবে এসে যায়, তা হচ্ছে আল্লাহর জন্য দেহ সাব্যস্ত করা। কারণ কোনো কিছুর উপর কোনো কিছু উঠা অর্থই তার উপরে থাকা, তার অর্থ হচ্ছে সেটা দেহ।

- অনুরূপ আরেকটি বিষয়ও এসে যায়, তা হচ্ছে আল্লাহকে সীমাবদ্ধ করা; কারণ কোনো কিছুর উপরে কোনো কিছু উঠার অর্থই হচ্ছে সেটাকে সীমাবদ্ধ বলা। কেননা, তুমি যখন কোনো উটের উপর উঠবে তার অর্থ দাঁড়ায় তুমি উটের উপরের যে নির্ধারিত জায়গা বা অংশ রয়েছে তাতে সীমাবদ্ধ করা ও নির্ধারিত করা।

আর এ তিনটি বিষয়, তাদের ধারণা মতে, আবশ্যক হয়ে পড়ে, যখন কেউ ইস্তেওয়া এর অর্থ উপরে উঠা বা ঊর্ধ্বে উঠা বলে।

সন্দেহের অপনোদনঃ

তাদের এসব সন্দেহের অপনোদন কয়েকভাবে করা যায়:

প্রথমতঃ তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের এ ব্যাখ্যা সালাফে সালেহীনের ঐকমত্যের ব্যাখ্যার বিপরীত। তাদের এ ব্যাপারে ঐকমত্য ছিল

যে, এর দ্বারা 'উপরে উঠা' অর্থই করা হবে; কারণ তাদের থেকে তোমাদের দাবি করা 'অধিকার করা' অর্থ কখনো বর্ণিত হয়নি। তাদের থেকে প্রকাশ্য অর্থের বিপরীত যাওয়ার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। যদি তারা এর প্রকাশ্য অর্থের বিপরীত মত নিতেন তবে অবশ্যই তার বিপরীতটি আমাদের কাছে বর্ণিত হয়ে আসত। তাদের মধ্য থেকে কেউ কোনোদিন বলেননি যে, **'ইস্তাওয়া'** এর অর্থ **'ইস্তাওলা'** বা অধিকার করা।

দ্বিতীয়তঃ এখানে **'ইস্তাওয়া'** এর **'ইস্তাওলা'** বা অধিকার অর্থ করা শব্দের প্রকাশ্য অর্থের বিপরীত কথা; কারণ **'ইস্তাওয়া'** মূলধাতু যখন **'আলা** অব্যয় যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়, তখন তার অর্থ হয়, উপরে উঠা, উপরে অবস্থান করা। এটাই হচ্ছে এ **'ইস্তাওয়া'** শব্দের প্রকাশ্য অর্থ, কুরআনে কারীম ও আরবদের ভাষায় যেখানেই এভাবে এসেছে সেখানেই তার অর্থ হয়েছে উপরে উঠা ও উপরে অবস্থান করা।

তৃতীয়তঃ 'ইস্তাওয়া' শব্দটিকে **'ইস্তাওলা'** বা অধিকার করা অর্থ করা হলে বেশ কিছু বাতিল জিনিস এসে যায়:

'অধিকার করা' অর্থ করার দ্বারা আবশ্যক হয়ে যায় যে, আল্লাহ তা'আলা যখন তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন তখন তিনি 'আরশের উপরে অধিকার সৃষ্টি করতে পারেননি। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ - "আল্লাহ্ যিনি আসমানসমূহ ও যমীন ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন।" [সূরাহ আল-আ'রাফ: ৫৪] এখানে বা 'তারপর' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যা ধারাবাহিকতা বুঝায়। তখন এটা বুঝা আবশ্যক হয়ে পড়ে যে, আসমান ও যমীন সৃষ্টি পূর্ণ করার আগে 'আরশ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও ছিল।

আরবী ভাষায় সাধারণ নিয়ম হচ্ছে **'ইস্তাওলা'** বা অধিকার করা তখনই বলা হয়, যখন কেউ দ্বন্দ্বের পরে কোনো কিছুর কর্তৃত্ব লাভ করে। আর আল্লাহর বিপরীতে কেউ কোনোদিন দ্বন্দ্ব করতে আসেনি।

'ইস্তাওয়া' এর অর্থ **'ইস্তাওলা'** করলে অপর আরেকটি বাতিল মেনে নেয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে, সেটা হচ্ছে, এভাবে বলা শুদ্ধ হওয়া যে, আল্লাহ যমীন, গাছ, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদির উপর **'ইস্তেওয়া'** করেছেন। কারণ, এগুলোও তাঁরই অধিকারে। আর এগুলো অনেকগুলো বাতিলকে মেনে নিতে

বাধ্য করে, আর যা বাতিল মেনে নেয়া আবশ্যক করে তা প্রমাণ করে যে, সে জিনিসও বাতিল যা এ বাতিলকে মেনে নেয়ার দিকে নিয়ে যায়।

আর আরবী কবিতা দিয়ে প্রদত্ত তাদের দলীলের খন্ডনে আমরা বলবোঃ

১- তোমরা এ কবিতাটির সনদ প্রদান করো, এর বর্ণনাকারীরা কতটুকু নির্ভরযোগ্য তাও দেখাও, তারা কখনও তা প্রমাণ করার কোনো পথ খুঁজে পাবে না।

এ কবিতার কবি কে? এটা কি সম্ভব নয় যে, এটি তখন বলা হয়েছিল যখন আরবদের ভাষায় বিকৃতি প্রবেশ করেছে? কারণ, আরবী ভাষার মৌলিকত্বে পরিবর্তন সাধিত হওয়ার পরে আসা কোনো কথা দিয়ে প্রমাণ দিলে তো তা প্রমাণ বলে বিবেচিত হবে না। কেননা যখন যুদ্ধে বিজয় লাভ করে তখন মুসলিম বিশ্বের সীমানা বর্ধিত হতে থাকে আর অনারবগণ আরবগণের সাথে মেলামেশা বেড়ে যায় তখন আর আরবদের ভাষার বিশুদ্ধতা অবশিষ্ট থাকেনি। তাই সম্ভাবনা প্রচুর যে, এ কবিতা তখন বলা হয়েছিল যখন ভাষা পরিবর্তন সাধিত হয়ে গিয়েছিল।

'ইস্তাওয়া বিশরুন আলাল ইরাক' এখানে যদি কবিতাটি শুদ্ধ ধরেও নেয়া হয়, তখন বুঝতে হবে যে, বাক্যের সাথে লাগানো বিশেষ কারণ 'ইস্তাওয়া' শব্দটিকে 'ইস্তাওলা' বা দখল করার অর্থে নেয়া বৈধ করে, কেননা এটা বলা সম্ভব নয় যে বিশর ইরাকের উপরে উঠে সেখানে অবস্থান নিয়েছে যেভাবে কেউ খাট বা বাহনের পিঠে উঠে অবস্থান নিয়ে থাকে। সুতরাং বাধ্য হয়েই যেহেতু 'ইস্তাওয়া' অর্থ উপরে উঠা করা যাচ্ছে না সেহেতু 'ইস্তাওলা' বা দখল করার অর্থ গ্রহণ করা ছাড়া অন্য কোনো পথ ছিল না। (কিন্তু কুরআনের আয়াতে বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে সে রকম কোনো 'কারীনাহ" বা বাক্য সংশ্লিষ্ট বিশেষ কারণ যার ফলে আল্লাহ তা'আলাকে 'আরশ দখলকারী অর্থ করা হবে।)

বস্তুত এ উত্তর হচ্ছে কবিতাটি বিশুদ্ধ ধরে নেয়ার পর, যদিও তা বিশুদ্ধ নয় এটিই আমাদের মত। তারপরও যদি দাবি করা হয় যে, তা বিশুদ্ধ তাহলে আমরা বলবো, এ কবিতাটিতেও 'ইস্তেওয়া' শব্দের অর্থ 'উপরে উঠা' করা সম্ভব; কারণ উপরে উঠা দুই প্রকারঃ

১- ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপরে থাকা, যেমন আমরা খাটের উপরে উঠি।

২- মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে উপরে থাকা, যেমন কোনো কিছুর ওপর প্রভাব বিস্তার করে দখল করে ফেলা বা জয়লাভ করা। সে হিসেবে **'ইস্তাওয়া বিশরুন আলাল ইরাকি'** অর্থ হবে বিশর ইরাকের ওপর ক্ষমতার ও অধীন করার মাধ্যমে উপরে উঠেছে। (তাহলে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এখানেও উপরে উঠা অর্থ করা সম্ভব। আর এটা তখনই হয়েছে যখন প্রথম অর্থটি নেয়া সম্ভব না হবে। আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে এ বিষয়টি মোটেই প্রযোজ্য হবে না। কারণ যারা "আল্লাহ কর্তৃক তাঁর 'আরশের উপরে উঠা" অর্থ করে তারা প্রথম অর্থটি অসম্ভব মনে করে না।) আর তাদের পরবর্তী সন্দেহ হচ্ছে 'ইস্তেওয়া' এর অর্থ 'উপরে উঠা' বললে আল্লাহকে দেহ বলা আবশ্যক হয়ে যায়। তার উত্তর হচ্ছে,

- আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত যা যা আবশ্যক করে তা অবশ্যই সত্য, তার আবশ্যকতা আমরা মেনে নেয়া জরুরী মনে করি। তবে সত্যি সত্যিই তা আল্লাহ ও রাসূলের কথা দ্বারা আবশ্যক হওয়া লাগবে। তাই যদি কোথাও এটা সাব্যস্ত হয়ে যায় যে, এটা প্রকৃতপক্ষেই আবশ্যক হয়ে পড়েছে তাহলে সেটা বলাতে আমরা কোনো দোষ দেখি না।

- তারপর আমরা বলবো, তোমরা নিষিদ্ধ দেহ সাব্যস্ত করা বলতে কী উদ্দেশ্য নিয়ে থাক? যদি এর দ্বারা তোমরা উদ্দেশ্য এটা নিয়ে থাক যে, আল্লাহর এমন কোনো সত্তা সাব্যস্ত হবে না যার জন্য তাঁর উপযোগী আবশ্যক গুণাবলি সাব্যস্ত করা লাগবে, তাহলে তোমাদের কথা বাতিল। কারণ আল্লাহর এমন এক প্রকৃত সত্তা রয়েছে যা বহু গুণে গুণান্বিত। তাঁর রয়েছে চেহারা, হাত, চোখ, পা। এগুলো সাব্যস্ত করা সত্য ও সঠিক। তার জন্য যদি তোমাদের নিকট বিভিন্ন জিনিসের বাধ্য-বাধকতা এসেও যায় তাতে আমাদের কোনো সমস্যা নেই। সেসব সাব্যস্ত করতে গেলে তোমাদের দৃষ্টিতে সমস্যা হিসেবে তোমরা যা ইচ্ছা তা বলতে পার, আমরা সেটাকে কোনো সমস্যা মনে করি না।

আর যদি 'নিষিদ্ধ দেহ' যা তোমরা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করাকে অস্বীকার করে থাক, তা দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়ে থাক এমন কোনো দেহ যা হাঁড়, গোশত, রক্ত ইত্যাদি জিনিস দিয়ে গঠিত, তাহলে তা অবশ্যই আল্লাহর জন্য হওয়া অসম্ভব। আর এটি 'আল্লাহর 'আরশের উপর উঠা' গুণ সাব্যস্ত করা দ্বারা আবশ্যকও হয় না।

আর তাদের পরবর্তী সন্দেহ হচ্ছে, 'ইস্তেওয়া' অর্থ 'উপরে উঠা' সাব্যস্ত করলে আল্লাহ তা'আলাকে সীমাবদ্ধ করা হয়ে যায়, তার বিস্তারিত উত্তর হচ্ছে,

- তোমরা সীমা বলতে কী বুঝাচ্ছ?

যদি সীমাবদ্ধ বলতে এটা বুঝাতে চাও যে, সৃষ্টি থেকে আলাদা, যেমন পৃথিবীতে এটা যায়েদের যমীন, ওটা 'উমারের যমীন, একের যমীন থেকে অন্যের যমীন আলাদা করা, যদি সীমা বলে আল্লাহ তা'আলাকে 'আরশের উপর থাকার কারণে এমন 'আলাদা সত্তা' বুঝাতে চাও তবে অবশ্যই জেনে রাখ, এ আলাদা করার সীমা নির্ধারণ অবশ্যই সত্য। এতে কোনো ত্রুটি নেই।

আর যদি সীমা দ্বারা উদ্দেশ্য হয়, 'আরশ আল্লাহ তা'আলাকে পরিবেষ্টন করে আছে, তাহলে এটা বাতিল। 'আরশের উপর উঠা' বলা দ্বারা এটা আবশ্যক করে না। কারণ, আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপর উঠেছেন, যদিও আল্লাহ তা'আলা 'আরশ ও 'আরশ ব্যতীত অন্য সবকিছুর চেয়ে অনেক বড়। 'আরশের উপর উঠা, 'আরশের উপর থাকা এ কথার দ্বারা 'আরশ আল্লাহকে ঘিরে আছে এমনটি বুঝা আবশ্যক নয়। বরং 'আরশ কোনোভাবেই আল্লাহ তা'আলাকে পরিবেষ্টন করতে পারে না; কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সবকিছুর চেয়ে বড় এবং কিছুর চেয়ে মহৎ। সকল যমীন কিয়ামতের দিন তাঁর হাতের মুষ্ঠির ভেতরে, সকল আসমান তাঁর ডান হাতে ভাঁজ করা অবস্থায় রয়েছে।

আর তাদের কথা, "আল্লাহ 'আরশের উপর আছেন" বললে আল্লাহকে 'আরশের প্রতি মুখাপেক্ষী সাব্যস্ত করা হয়, এর উত্তরে আমরা বলবো, কখনো নয়, এটা বাধ্য করে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের উপর থাকার অর্থ হচ্ছে, 'আরশের উর্ধ্বে, এ এক বিশেষ উপরে থাকা। এর অর্থ কখনো এটা নয় যে, 'আরশ তাঁকে বহন করে, কখনো নয়। 'আরশ তাঁকে বহন করে না, আসমান তাঁকে বহন করে না, তোমরা যে জিনিসটির বাধ্যবাধকতার দাবি করছ সেটা নিষিদ্ধ; কারণ এর মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি ত্রুটিযুক্ত গুণের সম্পর্ক করা হচ্ছে। আল্লাহর জন্য 'আরশের উপর উঠা' যা ইস্তেওয়া শব্দের প্রকৃত অর্থ তা সাব্যস্ত করলে কখনো এমন ত্রুটিপূর্ণ কিছু সাব্যস্ত করা আবশ্যক করে না। কারণ, আমরা কখনো বলি না, 'আল্লাহ 'আরশের উপর উঠেছেন' এর অর্থ 'আরশ তাঁকে বহন করে; বরং 'আরশ স্বয়ং বহনকৃত বস্তু; তাকে বহন করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ

- يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ "আর আপনার রবের 'আরশ সেদিন তাদের উপরে বহন করবে আটজন" [সূরাহ আল-হাক্কাহ, আয়াত: ১৭], ফিরিশতাগণ এখনও 'আরশ বহন করে চলেছে, কিন্তু তারা মহান আল্লাহকে বহন করছে না। কারণ, আল্লাহ তা'আলা এর মুখাপেক্ষী নন। সুতরাং এভাবেই যাবতীয় নেগেটিভ বা না সূচক যুক্তি বাতিল হয়ে গেল।

মোটকথা, যারা বলে, 'আল্লাহ 'আরশের উপর উঠেছেন' বলা যাবে না, সংক্ষিপ্তভাবে আমরা তাদের কথার উত্তর কয়েকভাবে দিতে পারিঃ

এক- তাদের এ কথা কুরআন ও হাদীসের প্রকাশ্য বক্তব্য বিরোধী।

দুই- তাদের এ কথা সাহাবায়ে কেরাম ও সকল সালাফে সালেহীনের ইজমা' বিরোধী।

তিন- আরবী ভাষায় 'ইস্তাওয়া' এর অর্থ 'ইস্তাওলা' (অধিকার করা) আসেনি। যে কবিতা দিয়ে 'ইস্তাওলা' সাব্যস্ত করার জন্য তারা প্রমাণ পেশ করেছে তা দিয়ে দলীল গ্রহণ সম্পন্ন করা যায় না।

চার- 'ইস্তাওয়া' দ্বারা 'ইস্তাওলা' (অধিকার করা) সাব্যস্ত করলে বেশ কিছু বাতিল জিনিস মেনে নেয়ার বাধ্যবাধকতা এসে যায়,

১- 'আরশ আসমান ও যমীন সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারও মালিকানায় থাকা আবশ্যক করে।

২- 'ইস্তাওলা' বাক্যটি সাধারণভাবে এই অর্থ প্রকাশ করে যে, সেখানে আল্লাহ ও অন্য কারও সাথে জয়-পরাজয়ের ব্যাপারে জড়িত, তারপর আল্লাহ 'আরশ অধিকার করলেন এবং বিপক্ষের উপর জয়লাভ করলেন। [নাউযুবিল্লাহ]

৩- যদি ইস্তেওয়া অর্থ তোমাদের ধারণা অনুযায়ী 'অধিকার করা' বলা হয়, তবে এটা বলাও জায়েয হবে যে, আল্লাহ যমীনের উপর ইস্তাওলা করেছেন, অনুরূপ গাছের উপর, পাহাড়ের উপর, মানুষের উপর, উটের উপরও ইস্তাওলা করেছেন। কারণ, এগুলোও তো আল্লাহ তা'আলার অধিকারে। কারণ, কোথাও যদি আল্লাহ তা'আলার জন্য 'অধিকার করা' বলা জায়েয হয় তাহলে অন্য জায়গাতেও সেটি বলা জায়েয মেনে নিতে হবে। সে হিসেবে 'ইস্তাওয়া' এমন সকল কিছুর উপরই ব্যবহার করা যাবে যেখানে 'ইস্তাওলা' ব্যবহার করা যায়, কারণ তোমাদের নিকট তো দু'টো সমার্থবোধক।

এসব উত্তর প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, 'ইস্তেওয়া' এর ব্যাখ্যা 'ইস্তাওলা' দ্বারা করা সম্পূর্ণরূপে বাতিল।" (শারহুল আক্বীদাতুল ওয়াসেত্বিয়্যাহ:(১/৩৭৪-৩৮২)

আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁর বান্দাদের সাথে থাকার অর্থ

প্রথমত: আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির সঙ্গেই আছেন, এ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মানুষের শ্রেণি বিভাগ

আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির সাথে আছেন তা বুঝার ক্ষেত্রে মানুষ তিন ভাগে বিভক্ত: **প্রথম ভাগ:** এদের বক্তব্য হলো 'আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে আছেন, এখানে 'সঙ্গে থাকা'র দ্বারা যদি সাধারণভাবে সঙ্গে থাকাকে বুঝায় তবে এর অর্থ হবে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর জ্ঞানে ও সর্বব্যাপী ক্ষমতায় সৃষ্টির সঙ্গে রয়েছেন। আর যদি বিশেষভাবে সঙ্গে থাকাকে বুঝায় তবে এর অর্থ হবে, সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে তিনি থাকেন। যদিও আল্লাহ তা'আলা সত্তাগতভাবে সর্বোর্ধ্বে এবং 'আরশের উপরে। এরাই হলেন সালাফ এবং এদের মাযহাবই হলো সত্য; যার বর্ণনা অচিরেই আসছে।

দ্বিতীয়ভাগ : এদের বক্তব্য হলো, 'আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে আছেন' এ কথার দাবি হলো, আল্লাহ তা'আলা যমীনে তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে আছেন। তারা আল্লাহ তা'আলার সর্বোর্ধ্বে থাকা এবং 'আরশের উপরে থাকাকে নাকচ করে দেন। এরা হলেন প্রাচীন জাহমিয়্যাহ ফেরকার অন্তর্গত হুলুলিয়া গোষ্ঠী। এদের মাযহাব বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য। সালাফগণ এদের মাযহাব বাতিল হওয়া এবং প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে একমত। যেমনটি উপরে বর্ণনা করা হয়েছে।

তৃতীয়ভাগ: এদের বক্তব্য হলো, 'আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে আছেন', এর দাবি হলো আল্লাহ তা'আলা তাদের সঙ্গে যমীনে আছেন এবং একই সঙ্গে সর্বোর্ধ্বে 'আরশের উপরেও আছেন। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এদের বক্তব্যকে মাজমুউল ফাতাওয়ায় তুলে ধরেছেন। এটিই বর্তমান সময়ের আশায়েরা ও মাতুরিদী সম্প্রদায় বিশ্বাস করে থাকে। এরা মনে করেছে যে 'সঙ্গে থাকা' এবং 'ঊর্ধ্বতা" এ উভয় বিষয়ে যেসব টেক্সট রয়েছে তার বাহ্যিক অর্থকে তারা ধারণ করতে পেরেছেন। কিন্তু তারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন এবং পথভ্রষ্ট হয়েছেন। কেননা 'সঙ্গে থাকা' বিষয়ে যেসব টেক্সট রয়েছে তা মাখলুকের সঙ্গে সত্তাগতভাবে আল্লাহ

তা'আলার মিশে থাকাকে দাবি করে না। এটা বরং বাতিল। আর আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের কথার বাহ্যিক অর্থ কোনো বাতিল বিষয় হতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ তাআলার 'সাথে থাকা' অর্থ 'সত্তায় সত্তায় মিলেমিশে যাওয়া' করা যাবে নাঃ

সে কারণে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক বান্দার 'সাথে থাকা' এর অর্থ আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে আছেন বা অথবা মাখলুক যে জায়গায় থাকে সে জায়গায় অবস্থান করেন, এ ধরনের ব্যাখ্যা বাতিল তা হচ্ছে,

প্রথম কারণঃ এরূপ ব্যাখ্যা সালাফদের ইজমা'র উল্টো। সালাফদের কেউই এরূপ ব্যাখ্যা করেননি। বরং তারা এরূপ ব্যাখ্যা অস্বীকার করার ব্যাপারে একমত ছিলেন।

দ্বিতীয় কারণঃ কুরআন, সুন্নাহ, যুক্তিবুদ্ধি, স্বচ্ছ মানবপ্রকৃতি ও সালাফদের ইজমা'র দ্বারা একথা প্রমাণিত যে, আল্লাহ তা'আলা সর্বোচ্চে ও সবকিছুর উপরে। আর উক্ত ব্যাখ্যা আল্লাহ তা'আলার সর্বোচ্চতা ও সবকিছুর উপরে থাকার বিপরীত। আর যা দলীল দ্বারা প্রমাণিত বিষয়ের বিপরীত হবে তা বাতিল। অতএব, বান্দাদের সঙ্গে থাকার অর্থ যদি কেউ এভাবে করে যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের সঙ্গে মিশে থাকেন অথবা বান্দাদের জায়গাতেই থাকেন তবে কুরআন, সুন্নাহ, যুক্তিবুদ্ধি, স্বচ্ছ মানবপ্রকৃতি ও সালাফদের ইজমা' অনুযায়ী তা প্রত্যাখ্যাত হবে।

তৃতীয় কারণঃ উক্ত কথার যুক্তিগত এমন অযাচিত ফলাফল বের হয় যা আল্লাহ তা'আলার জন্য উপযোগী নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে জানে, তাঁকে যথার্থরূপে সম্মান করে এবং আরবী ভাষায় **মাআইতা** অর্থাৎ 'সঙ্গে-থাকা' কাকে বলে তা বুঝে সে কখনোই একথা বলতে পারে না যে, আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের সঙ্গে থাকার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের সঙ্গে মিশে থাকেন অথবা তারা যে জায়গায় অবস্থান করে তিনিও সে জায়গায় অবস্থান করেন। আরবী ভাষা সম্পর্কে যে অজ্ঞ সেই কেবল এরূপ কথা বলতে পারে। অতএব, এতে আর কোনো সন্দেহ রইল না যে, এ কথাটি বাতিল। যেহেতু এ কথাটি বাতিল তাই দ্বিতীয় কথাটিই সঠিক। আর তা হলো, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের সঙ্গে এমনভাবে আছেন যে, তিনি তাঁর ইলম, কুদরত, শ্রবণ, দর্শন, নিয়ন্ত্রণ, আধিপত্য ও রুবুবিয়াতের যা যা দাবি আছে

সবকিছুর নিরিখে তিনি তাদের পরিবেষ্টন করে আছেন। এটাই হলো আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক বান্দার 'সাথে থাকা' বাহ্যিক অর্থ; কেননা কুরআন ও হাদীসের ভাষ্য হক এবং হকের বাহ্যিক অর্থও হক। বাতিল কখনো আল কুরআনের বাহ্যিক অর্থ হতে পারে না।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ তার আল-ফাতওয়া আল-হামাওয়িয়্যাহ আল- কুবরায় বলেন, "আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক বান্দার সঙ্গে থাকার অর্থ জায়গা অনুযায়ী ভিন্ন-ভিন্ন হয়ে থাকে। অতএব, আল্লাহ তা'আলা যখন বলেন, - يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا "তিনি জানেন যমীনে যা কিছু প্রবেশ করে এবং তা থেকে যা কিছু বের হয়।" (সূরাহ আল-হাদীদ, আয়াত: ০৪) এরপর বলেন: - وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ "আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সাথেই আছেন।" (সূরাহ আল হাদীদ, আয়াত: ০৪) তখন আল্লাহ তা'আলার এ ভাষণ বাহ্যিকভাবে যা বুঝায় তা হলো, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক বান্দাদের সঙ্গে- থাকার অর্থ হলো- তিনি তাদের সকল বিষয় জানেন, তিনি তাদের ওপর সাক্ষী, তিনি সকল বিষয়ের ওপর আধিপত্যশীল ও সর্বজ্ঞানী। এটাই হলো সালাফদের কথার অর্থ যে, 'তিনি তাঁর জ্ঞানের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে আছেন।' এটাই হলো আল্লাহ তা'আলার বাণীর বাহ্যিক অর্থ ও হাকীকত।

আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক 'বান্দার সাথে থাকা' প্রকৃত অর্থেই সাথে থাকা

ইমাম ইবন আবদুল বার রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'আহলে সুন্নত কুরআন-সুন্নাহ'য় উল্লিখিত সকল সিফাতের ওপর ঈমান আনা এবং সেগুলোকে রূপক অর্থে নয় বরং প্রকৃত অর্থে বহন করার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তবে তারা এ সিফাতসমূহের কোনোটারই ধরণ-ধারণ কি বা বাস্তবতা কি তা উল্লেখ করেন না। (ইমাম ইবনুল বার এর বরাত দিয়েএ কথাটি ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ তার গ্রন্থ আল-ফাতওয়া আল হামওয়িয়াতে উল্লেখ করেন,দ্রঃ মাজমুউল ফাতাওয়া, খন্ড ৫ পৃ. ৮৭।)

উপরোক্ত নীতি অনুযায়ী সালাফে সালেহীনের দৃষ্টিতে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক বান্দার সাথে থাকা দু'ভাগে বিভক্ত:

এক. 'মা'য়িয়্যাতু 'আম্মাহ' অর্থাৎ ব্যাপকভাবে সাথে থাকা: আর তা হচ্ছে, জ্ঞান, ক্ষমতা, শোনা, দেখা, কর্তৃত্ব, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদিতে তিনি বান্দাকে পরিবেষ্টন করে আছেন। আর তা আল্লাহর সকল সৃষ্টিকুলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

ঈমানদার, কাফির, নেককার, বদকার, ব্যাপকভাবে সবার সাথেই তিনি রয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا -

"তারা মানুষ থেকে গোপন করতে চায় কিন্তু আল্লাহর থেকে গোপন করে না, অথচ তিনি তাদের সংগেই আছেন রাতে যখন তারা, তিনি যা পছন্দ করেন না- এমন বিষয়ে পরামর্শ করে এবং তারা যা করে আল্লাহ্ তা পরিবেষ্টন করে আছেন।" (সূরাহ নিসা, আয়াত: ১০৮)

আরও বলেন,

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ -

"তিনি ঐ সত্তা যিনি ছয়দিনে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন। তিনি জানেন যা কিছু যমীনে প্রবেশ করে এবং যা কিছু তা থেকে বের হয়, আর আসমান থেকে যা কিছু অবতীর্ণ হয় এবং তাতে যা কিছু উত্থিত হয়। আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, আর তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।" (সূরাহ আল-হাদীদ, আয়াত: ০৪)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -

"আপনি কি লক্ষ্য করেন না যে, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে আল্লাহ্ তা জানেন? তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয়না যাতে চতুর্থজন হিসেবে তিনি থাকেন না এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যেও হয়না যাতে ষষ্ঠজন হিসেবে তিনি থাকেন না। তারা এর চেয়ে কম হোক বা বেশি হোক তিনি তো তাদের সঙ্গেই আছেন তারা যেখানেই থাকুক না কেন। তারপর তারা যা করে, তিনি তাদেরকে কিয়ামতের দিন তা জানিয়ে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত।" (সূরাহ আল-মুজাদালাহ, আয়াত: ০৭)

দুই. 'মা'য়িয়্যাতু খাসসাহ' বিশেষভাবে সাথে থাকা: আর তা হচ্ছে, সাহায্য-সহযোগিতা করা, হিফাযত করা, বিশেষ যত্ন নেয়া, রক্ষা করা, দেখাশুনা করা, ভালোবাসা, তাওফীক দেয়া, যথেষ্ট করে দেয়া, নৈকট্য প্রদান, সঠিক কাজটির দিক নির্দেশনা, হিদায়াত প্রদান ইত্যাদি। আলেমগণ এটাকে আল্লাহর কর্মগত গুণ হিসেবে গণ্য করেছেন।

এটি আবার দু' প্রকার:

১- ব্যক্তির সাথে বিশেষভাবে থাকা। যেমন, আল্লাহর বাণী:

إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"যদি তোমরা তাঁকে সাহায্য না কর, তবে আল্লাহ তো তাঁকে সাহায্য করেছিলেন যখন কাফিররা তাঁকে বহিষ্কার করেছিল এবং তিনি ছিলেন দুজনের দ্বিতীয়জন, যখন উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল; তিনি তখন তাঁর সংগীকে বলেছিলেন, বিষন্ন হয়ো না, আল্লাহ তো আমাদের সাথে আছেন।' অতঃপর আল্লাহ তার উপর তাঁর প্রশান্তি নাজিল করেন এবং তাঁকে শক্তিশালী করেন এমন এক সৈন্যবাহিনী দ্বারা যা তোমরা দেখনি এবং তিনি কাফিরদের কথা হেয় করেন। আর আল্লাহর কথাই সমুন্নত এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।" (সূরাহ আত-তাওবাহ, আয়াত: ৪০)

অনুরূপ আল্লাহর বাণী,

قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ -

"তিনি বললেন, আপনারা ভয় করবেন না, আমি তো আপনাদের সঙ্গে আছি, আমি শুনি ও আমি দেখি।" (সূরাহ ত্বা-হা, আয়াত: ৪৬)

قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ -

"মূসা বললেন, কখনই নয়! আমার সঙ্গে আছেন আমার রব; সত্বর তিনি আমাকে পথনির্দেশ করবেন।" (সূরাহ আশ-শু'আরা, আয়াত: ৬২)

২- কোনো গুণ ও গুণওয়ালাদের সাথে থাকা। যেমন, আল্লাহর বাণী:

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ -

“নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে আছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা মুহসিন।” (সূরাহ আন-নাহল, আয়াত: ১২৮)

অনুরূপ আল্লাহর বাণী:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ -

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা সাহায্য চাও সবর ও সালাতের মাধ্যমে। নিশ্চয় আল্লাহ সবরকারীদের সাথে আছেন।” (সূরাহ আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ১৫৩)

অনুরূপ আল্লাহর বাণী:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ -

“আর যেখান থেকেই আপনি বের হন না কেন মাসজিদুল হারামের দিকে চেহারা ফিরান। নিশ্চয় এটা আপনার রবের কাছ থেকে পাঠানো সত্য। আর তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ গাফেল নন।” (সূরাহ আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ১৪৯)

অনুরূপ আল্লাহর বাণী,

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ -

“আর যারা আমাদের পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, আমরা তাদেরকে অবশ্যই আমাদের পথসমূহের হিদায়াত দিব। আর নিশ্চয় আল্লাহ মুহসিনদের সঙ্গে আছেন।” (সূরাহ আল-‘আনকাত, আয়াত: ৬৯)

অনুরূপ আল্লাহর বাণী

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ -

“পবিত্র মাস পবিত্র মাসের বিনিময়ে। যার পবিত্রতা অলংঘনীয় তার অবমাননা কিসাসের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই যে কেউ তোমাদেরকে আক্রমণ করবে তোমরাও তাকে অনুরূপ আক্রমণ করবে এবং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করবে। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।” (সূরাহ আল বাক্বারাহ, আয়াত: ১৯৪)

তদ্রূপ আল্লাহর বাণী:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ -

"আর আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, (তখন বলে দিন যে) নিশ্চয় আমি অতি নিকটে। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তার আহবানে সাড়া দেই। কাজেই তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমার প্রতি ঈমান আনুক, যাতে তারা সঠিক পথে চলতে পারে।" (সূরাহ আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ১৮৬)

অনুরূপ আল্লাহর বাণী:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ -

"আর যমীনে শান্তি স্থাপনের পর তোমরা সেখানে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। আর আল্লাহকে ভয় ও আশার সাথে ডাক। নিশ্চয় আল্লাহর অনুগ্রহ মুহসিনদের খুব নিকটে।" (সূরাহ আল- আ'রাফ, আয়াত: ৫৬)

অনুরূপ আল্লাহর বাণী:

إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ -

"যদি তোমরা মীমাংসা চেয়ে থাক, তাহলে তা তো তোমাদের কাছে এসেছে; আর যদি তোমরা বিরত হও তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, কিন্তু যদি তোমরা আবার যুদ্ধ করতে করতে আস তবে আমরাও আবার শাস্তি নিয়ে আসব। আর তোমাদের দল সংখ্যায়ও তোমাদের কোনো কাজে আসবে না। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ মুমিনদের সাথে আছেন।" (সূরাহ আল-আনফাল, আয়াত: ১৯)

অনুরূপ যারা আল্লাহ তা'আলার শরী'আত বাস্তবায়ন করে তাদের সাথেও আল্লাহ রয়েছেন, আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ -

"আর অবশ্যই আল্লাহ বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং আমরা তাদের মধ্য থেকে বারজন দলনেতা পাঠিয়েছিলাম। আর আল্লাহ বলেছিলেন, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের সঙ্গে আছি; তোমরা যদি সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও, আমার রাসূলগণের প্রতি ঈমান আন, তাঁদেরকে সম্মান সহযোগিতা কর এবং আল্লাকে উত্তম ঋণ প্রদান কর, তবে আমি তোমাদের পাপ অবশ্যই মোচন করব এবং অবশ্যই তোমাদেরকে প্রবেশ করাব জান্নাতসমূহে, যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত।' এর পরও কেউ কুফুরী করলে সে অবশ্যই সরল পথ হারাবে।" (সূরাহ আল-মায়েদাহ, আয়াত: ১২)

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে এসেছে, "বুখারী ও মুসলিম তাদের সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেন, আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি আমার ব্যাপারে আমার বান্দার ধারণার নিকটে, আমি তার সাথে থাকি যখন সে আমাকে ডাকে অথবা বলেছেন, যখন সে আমাকে স্মরণ করে"। (বুখারী, হাদীস নং ৭৪০৫; মুসলিম, হাদীস নং ২৬৭৫।)

আরও এসেছে, "আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেছেন, "মহান আল্লাহ বলেন, আমি আমার বান্দার সাথে আছি যখন সে আমাকে স্মরণ করে তার দু'টি ঠোট আমাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করে"। বুখারী ৯/১৫৩; ইবন মাজাহ ৩৭৯২; মুসনাদে আহমাদ ১০৯৬৮; সহীহ লিগাইরিহী।

আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক একই সময়ে বান্দার সাথে থাকা ও 'আরশের উপর থাকা সাংঘর্ষিক নয়

আল্লাহ তা'আলার শানের জন্য যেভাবে উপযোগী সেভাবে তিনি বান্দার সঙ্গে থাকেন, এ কথার সঙ্গে, আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপরে আছেন, এর কোনো সংঘর্ষ নেই। বিষয়টি আমরা কয়েকভাবে বুঝতে পারি:

এক: আল্লাহ তা'আলা এ উভয় বিষয়কে তাঁর কিতাবে একত্র করেছেন। যে কিতাব সকল বৈপরীত্ব থেকে মুক্ত। আর যে দু'টি বিষয়কে আল্লাহ তা'আলা একত্র করেছেন সে দু'টির মাঝে কোনো বৈপরীত্ব থাকতে পারে না।

আল কুরআনের কোনো বিষয়ে বৈপরীত্য আছে বলে যদি ধারণা হয়, তাহলে আপনার উচিত হবে গভীরভাবে অধ্যয়ন করা যাতে প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ পায় (অবৈপরীত্য বুঝা যায়)। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا - "তারা কি কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না? আর যদি তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হত, তবে অবশ্যই তারা এতে অনেক বৈপরীত্য দেখতে পেত।" (সূরাহ আন-নিসা, আয়াত: ৮২)

যদি গভীরভাবে অধ্যয়নের পরও বিষয়টি স্পষ্ট না হয়, তাহলে যারা পাকাপোক্ত জ্ঞানের অধিকারী তাদের পথ অবলম্বন করতে হবে, যারা বলেন, وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا -"আমরা এগুলোর প্রতি ঈমান আনলাম, সবগুলো আমাদের রবের পক্ষ থেকে।" (সূরাহ আলে ইমরান, আয়াত: ০৭)

অতএব, বিষয়টিকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করতে হবে যিনি এ ব্যাপারে সুপরিজ্ঞাত। জেনে রাখবেন, যদি কোনো ত্রুটি থাকে তবে তা আপনার জ্ঞান ও বুঝের মধ্যে রয়েছে। পক্ষান্তরে আল-কুরআন সকল বৈপরীত্য থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, সঙ্গে-থাকার দাবি এটা নয় যে, আল্লাহ তা'আলার সত্তা মাখলুকের সঙ্গে মিশে থাকে। এর দলীল হলো, আল্লাহ তা'আলা সূরাহ মুজাদালার আয়াতের শুরুতে এবং শেষে তাঁর সর্বব্যাপী ইলমের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনিবলেছেন:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -

"তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে নিশ্চয় আল্লাহ তা জানেন? তিন জনের কোন গোপন পরামর্শ হয়না যাতে চতুর্থজন হিসেবে আল্লাহ থাকেন না, আর পাঁচ জনেরও হয়না, যাতে ষষ্ঠজন হিসেবে তিনি থাকেন না। এর চেয়ে কম হোক কিংবা বেশি হোক, তিনি তো তাদের সঙ্গেই আছেন, তারা যেখানেই থাকুক না কেন। তারপর কিয়ামতের দিনে তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জানিয়ে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সব বিষয়ে সম্যক অবগত।" (সূরাহ আল-মুজাদালা, আয়াত: ০৭)

উক্ত আয়াতের বাহ্যিক অর্থানুযায়ী, এখানে বান্দাদের 'সঙ্গে থাকা'র দাবি হলো- আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে পূর্ণ ইলম রাখেন এবং তাদের আমল ও কর্মের কোনো কিছুই তাঁর কাছে গোপন নয়। এখানে অর্থ এটা নয়যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের সঙ্গে মিশে আছেন অথবা তিনি তাদের সঙ্গে যমীনের উপর আছেন।

অনুরূপভাবে সূরাহয়ে হাদীদের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা প্রথমে 'আরশের উপরে উঠার কথা, তাঁর ব্যাপক ইলমের কথা বলেছেন এরপর তিনি বান্দাদের সঙ্গে থাকার কথা উল্লেখ করেছেন এবং পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, বান্দারা যা আমল করে সে সম্পর্কে তিনি সর্বদ্রষ্টা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ -

"তিনিই আসমানসমূহ ও যমীন ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন। তিনি জানেন যমীনে যা কিছু প্রবেশ করে এবং তা থেকে যা কিছু বের হয়; আর আসমান থেকে যা কিছু অবতীর্ণ হয় এবং তাতে যা কিছু উত্থিত হয়। আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সাথেই আছেন। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।" (সূরাহ আল-হাদীদ, আয়াত: ০৪)

এ আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এটা যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের সঙ্গে আছেন। তবে এ সঙ্গে থাকার অর্থ বান্দাদের বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখা, বান্দাদের সকল আমল দেখা, কারণ তিনি সর্বোচ্চ 'আরশের উপরে আছেন। আয়াতের অর্থ এটা নয়যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের সঙ্গে মিশে আছেন অথবা তাদের সঙ্গে যমীনে আছেন; কেননা এরূপ অর্থ হলে আয়াতের শুরুর অংশে আল্লাহ তা'আলার সর্বোচ্চতা ও 'আরশের উপরে থাকার যে কথা রয়েছে তার সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে যাবে। (মাজমুউল ফাতাওয়া, খন্ড ৫, পৃ. ১০৩।)

অতএব, আমরা বুঝতে পারলাম যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের সঙ্গে আছেন এর দাবি হলো আল্লাহ তা'আলা তাদের অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞাত, তিনি তাদের কথাবার্তার সর্বশ্রোতা, তিনি তাদের আমলসমূহের সর্বদ্রষ্টা, তিনি তাদের সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণকারী। তিনি তাদের জীবনদানকারী,

মৃত্যুদাতা, ধনাঢ্য দাতা ও দরিদ্রকারী। তিনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা রাজত্ব থেকে বঞ্চিত করেন, তিনি যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন, ইত্যাদি ইত্যাদি যা আল্লাহ তা'আলার রুবুবিয়াত ও তার পরিপূর্ণ ক্ষমতা দাবী করে। সৃষ্টিজগতে হস্তক্ষেপ থেকে কোনো কিছুই আল্লাহ তা'আলাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে না। যার এই শান তিনি প্রকৃত অর্থেই তাঁর সৃষ্টির সাথে, যদিও তিনি তাদের আরশের উপরে প্রকৃত অর্থে, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ 'আল আকীদাহ আল ওয়াসেতিয়া'য় আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক বান্দার সাথে থাকার ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন- 'আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপরে থাকা এবং একই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে থাকার ব্যাপারে যা কিছু বললেন, তা প্রকৃত অর্থেই। এ ক্ষেত্রে কোনো অর্থ বিকৃতির প্রয়োজন নেই। তবে অবশ্যই মিথ্যা ধারণা থেকে আল্লাহ তা'আলার প্রতি আমাদের বিশ্বাসকে বাঁচাতে হবে।' (মাজমুউল ফাতাওয়া, খন্ড ৩, পৃ. ১৪২।)

তিনি আল-ফাতওয়া আল-হামাওয়িয়্যাহ মাজমুউল ফাতাওয়া, পৃষ্ঠা ১০২, ১০৩-তে বলেন, 'এ ক্ষেত্রে সারকথা হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ গভীরভাবে অধ্যায়ন করবে সে পরিপূর্ণ হিদায়াত ও আলো লাভ করতে সক্ষম হবে, যদি সে সত্যের অনুসরণকে উদ্দেশ্য বানায়, তাহরীফ ও বিকৃতি থেকে বেঁচে থাকে এবং আল্লাহ তা'আলার নাম ও সিফাতের ক্ষেত্রে ইলহাদ ও বিকৃতির আশ্রয় নেয়া থেকে বিরত থাকে।'

আর কোনো ধারণাকারী এ ধারণা করবে না যে, উল্লিখিত বিষয়ের একটি অন্যটির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। যেমন কেউ বলল যে, 'আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপরে আছেন এ ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ'য়যে বক্তব্য এসেছে তার বিপরীত বক্তব্য রয়েছে নিম্নবর্ণিত আয়াত ও হাদীসে। আয়াতটি হলো, 'আর তিনি তোমাদের সাথেই আছেন', আর হাদীসটি হলো, 'যখন তোমাদের কেউ সালাতে দাঁড়ায় তখন আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয় তাঁর সম্মুখেই থাকেন'। সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৪৭। এ জাতীয় ধারণা অর্থাৎ (আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের উপর উঠা সংক্রান্ত) উল্লিখিত বক্তব্যের সঙ্গে উক্ত আয়াত ও হাদীসটি সাংঘর্ষিক, এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আর তা এ জন্যে যে, আল্লাহ তা'আলা প্রকৃত অর্থেই আমাদের সঙ্গে আছেন, যেমন তিনি প্রকৃত অর্থেই 'আরশের উপরে আছেন। এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ উভয় বিষয়কে একত্র করে বলেছেন:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ -

"তিনিই আসমানসমূহ ও যমীন ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন। তিনি জানেন যমীনে যা কিছু প্রবেশ করে এবং তা থেকে যা কিছু বের হয়; আর আসমান থেকে যা কিছু অবতীর্ণ হয় এবং তাতে যা কিছু উত্থিত হয়। আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সাথেই আছেন। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।" (সূরাহ আল হাদীদ, আয়াত: ০৪)

আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে আমাদের এ সংবাদ দিয়েছেন যে তিনি 'আরশের উপরে আছেন। তিনি সকল বিষয়ে সুপরিজ্ঞাত এবং আমরা যেখানেই থাকি না কেন তিনি আমাদের সঙ্গেই আছেন। যেমন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা এক হাদীসে বলেছেন: (আর আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপরে, তোমরা যে অবস্থায় আছ, আল্লাহ তা'আলা তা জানেন।)

ইমাম ইবনুল কাইয়েম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই সংবাদ দিয়েছেন, তিনি তাঁর সৃষ্টির সাথে আছেন যদিও তিনি 'আরশের উপরে আছেন। আর আল্লাহ তা'আলা এ দু'টিকে একত্র করে উল্লেখ করেছেন। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: এখানে তিনি সুরা আল-হাদীদের আয়াতটি উল্লেখ করেছেন, এরপর তিনি বলেছেন: অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে তিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তাঁর 'আরশের উপরে উঠেছেন। তিনি তাঁর বান্দাদের সাথে আছেন এ অর্থে যে তিনি "আরশের উপর থেকেই তাদের আমল দেখছেন, যেমন হাদীসে এসেছে: 'আর আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপরে, তোমরা যে অবস্থায় আছ তিনি তা জানেন। (বুখারী, খালকু আফ'আলিল 'ইবাদ ১/৪৩; দারেমী, আর-রাদ্দু 'আলাল জাহমিয়্যাহ, নং ৮১; ইবন খুযাইমাহ ১/২৪৪; বাইহাকী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত, নং ৮৫১।) অতএব আল্লাহ তা'আলার ঊর্ধ্বতা এবং মাখলুকের সঙ্গে থাকা, এ দু'টির মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। আর মাখলুকের সঙ্গে থাকা আল্লাহ তা'আলার ঊর্ধ্বতাকে বাতিল করে দেয় না। বরং উভয়টিই সত্য।' (ইবনুল মুসিলী, মুখতাসারুস সাওয়া'ইক, পৃ. ৪১০।)

দুই. 'সঙ্গে থাকা'র প্রকৃত অর্থ তাঁর উর্ধ্বে থাকার সাথে সাংঘর্ষিক নয়। বরং এ উভয় বিষয় সৃষ্টিবস্তুর ক্ষেত্রেও একত্র হতে পারে। উদাহরণত যদি কেউ বলে যে 'আমরা এখনও এ অবস্থায় চলছি যে চাঁদ আমাদের সাথে।' তাহলে এ কথার দ্বারা কোনো বৈপরীত্য বুঝা যাবে না। কেউ এরূপ বুঝবে না যে, চাঁদ মাটিতে নেমে এসেছে এবং আমাদের সঙ্গে চলতে শুরু করেছে। যদি সৃষ্টিবস্তুর ক্ষেত্রে এরূপ সম্ভব হয়, তাহলে সৃষ্টিকর্তা, যিনি সকল বিষয়কে পরিবেষ্টিত করে আছে, তিনি উর্ধ্বে থাকা সত্ত্বেও মাখলুকের সঙ্গে অবশ্যই থাকতে পারেন। এটা এ কারণে যে সঙ্গে থাকা'র প্রকৃত অর্থ এক জায়গায় একত্র হওয়াকে আবশ্যক করে না।

এ দিকে ইঙ্গিত করেই ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, আরবীতে **মাআ (সঙ্গে)** শব্দটি যখন ব্যবহৃত হয় তখন এর বাহ্যিক অর্থ হয় সাধারণভাবে তুলনা করা, যা আবশ্যিকভাবে পরস্পর পরস্পরকে স্পর্শ অথবা একে অন্যের ডানে বা বামে থাকাকে দাবী করে না। যদি 'সঙ্গে থাকা'র অর্থকে বিশেষ কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে উল্লেখ হয়, তবে তা সে বিশেষ অর্থ-কেন্দ্রিক তুলনাকে বুঝাবে। বলা হয় যে, আমরা এখনও চলছি আর চাঁদ আমাদের সঙ্গে অথবা তারকা আমাদের সঙ্গে। আরও বলা হয় যে 'এ বস্তুটি আমার সঙ্গে' যদিও তা আপনার মাথার উপরে। কেননা আপনার উদ্দেশ্য হলো এ বস্তুর সঙ্গে আপনার সম্পৃক্ততা বর্ণনা করা। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলাও প্রকৃত অর্থেই তাঁর মাখলুকের সঙ্গে আছেন যদিও তিনি প্রকৃত অর্থেই তাঁর 'আরশের উপরে আছেন।' ইবন তাইমিয়্যাহ, আল ফাতওয়া আল হামাওয়িয়্যাহ আল-কুবরা। (দেখুন: মাজমুউ ফাতওয়া, খণ্ড ৫, পৃ. ১০৩।)

তিন. যদি মেনেও নিই যে, 'সঙ্গে থাকা' এবং ঊর্ধ্বতা এ দু'টি বিষয় কোনো সৃষ্টিবস্তুর ক্ষেত্রে একত্র হতে পারে না, তবুও বলব যে আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে এ দুটি বিষয় একত্র হওয়া নিষিদ্ধ নয়। কেননা তিনি নিজেই এ দুটি বিষয়কে একত্র করেছেন। কারণ, আল্লাহ তা'আলা অতুলনীয়, তাঁর সঙ্গে কোনো মাখলুকের তুলনা হয় না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ - "তাঁর মতো কোনো জিনিস নেই, আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" (সূরাহ আশ-শূরা, আয়াত: ১১)

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ এ দিকে ইঙ্গিত করেই 'আল আকীদাহ আল ওয়াসেতিয়া' -গ্রন্থে বলেছেন, 'কুরআন -সুন্নাহ'য় আল্লাহ তা'আলার নৈকটা অথবা সঙ্গে থাকার যে কথা বলা হয়েছে তা আল্লাহর ঊর্ধ্বতা

ও সর্বোচ্চতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলার গুণসমগ্রের কোনোটির ক্ষেত্রেই তাঁর তুল্য কোনো বিষয় নেই। তিনি শীর্ষে থেকেও কাছে এবং নিকটে থেকেও উর্ধ্বে। (মাজমুউল ফাতাওয়া, খণ্ড ৩, পৃ. ১৪৩।)

এর ব্যাখ্যায় বলা যায় যে, আরবী ভাষায় **মাআ (সঙ্গে)** শব্দটি যখন ব্যবহৃত হয় তখন এর বাহ্যিক অর্থ হয় সাধারণভাবে তুলনা করা, যা আবশ্যিকভাবে পরস্পর পরস্পরকে স্পর্শ অথবা একে অন্যের ডানে বা বামে থাকাকে দাবি করে না। যদি সঙ্গে থাকার অর্থকে বিশেষ কোনো অর্থে সীমিত করে উল্লেখ করা হয়, তবে তা সে বিশেষ অর্থ কেন্দ্রিক তুলনাকে বুঝাবে। বলা হয় যে, আমরা এখনও চলছি আর চাঁদ আমাদের সঙ্গে অথবা তারকা আমাদের সঙ্গে। আরও বলা হয় যে এ বস্তুটি আমার সঙ্গে যদিও তা আপনার মাথার উপরে। কেননা আপনার উদ্দেশ্য হলো এ বস্তুর সঙ্গে আপনার সম্পৃক্ততা বয়ান করা। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলাও প্রকৃত অর্থেই তাঁর মাখলুকের সঙ্গে আছেন যদিও তিনি প্রকৃত অর্থেই তাঁর আরশের উপরে আছেন। (মাজমুউল ফাতাওয়া, খন্ড ৫, পৃ. ১০২।)

সে হিসেবে আল্লাহ কর্তৃক মাখলুকের সঙ্গে থাকার দাবী হলো, তিনি তাঁর ইলম ও ক্ষমতায়, শ্রবণ ও দর্শনে, আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণে এবং রুবুবিয়াতের অন্যান্য অর্থে মাখলুককে পরিবেষ্টন করে আছেন। যদি সঙ্গে থাকা' বিশেষ কোনো ব্যক্তি বা গুণকে কেন্দ্র করে উল্লেখ না হয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: - وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ "আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সাথেই আছেন।" (সূরাহ আল হাদীদ, আয়াত: ০৪) আরও বলেন, مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ - "তিনজনের কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন হিসেবে আল্লাহ থাকেন না, আর পাঁচ জনেরও হয় না, যাতে ষষ্ঠজন হিসেবে তিনি থাকেন না। এর চেয়ে কম হোক কিংবা বেশি হোক, তিনি তো তাদের সঙ্গেই আছেন।" (সূরাহ আল-মুজাদালা, আয়াত: ০৭)

আর যদি সঙ্গে থাকার বিষয়টি বিশেষ কোনো ব্যক্তি বা গুণকে কেন্দ্র করে উল্লেখ হয়, তখন উল্লিখিত অর্থগুলোর সঙ্গে যোগ হবে- সাহায্য সহযোগিতা করা, তাওফীক দেয়া এবং সঠিক পথ দেখানো।

আল্লাহ তাআলা কর্তৃক বিশেষ কোনো ব্যক্তির সঙ্গে থাকার উদাহরণ হলো মূসা ও হারূন আলাইহিমাস্ সালামকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলার কথা: قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ - "নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথেই আছি। আমি সবকিছু শুনি ও দেখি।" (সূরাহ ত্বা-হা আয়াত: ৪৬) আরও বলেন,- إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا "তুমি পেরেশান হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।" (সূরাহ আত-তাওবা, আয়াত: ৪০)

বিশেষ কোনো গুণের সঙ্গে থাকার আরেকটি উদাহরণ হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী: - وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "আর তোমরা ধৈর্য ধর, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।" (সূরাহ আল আনফাল, আয়াত: ৪৬) আল কুরআনে এ জাতীয় আরও বহু উদাহরণ রয়েছে।

শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ 'ফাতওয়া আল হামাওয়িয়ায় বলেন, 'প্রসঙ্গের ভিন্নতা অনুযায়ী 'সঙ্গে থাকা'র ভিন্ন ভিন্ন হুকুম হয়ে থাকে। অতএব, আল্লাহ তা'আলা যখন বলেন:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ -

"তিনি জানেন যমীনে যা কিছু প্রবেশ করে এবং তা থেকে যা কিছু বের হয়; আর আসমান থেকে যা কিছু অবতীর্ণ হয় এবং তাতে যা কিছু উত্থিত হয়। আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সাথেই আছেন। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা। (সূরাহ আল হাদীদ, আয়াত: ০৪)

এই বাণীর বাহ্যিক অর্থ যা নির্দেশ করছে তা হলো, এই 'সঙ্গে থাকা'র হুকুম ও দাবি হলো, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ব্যাপারে সম্যক অবহিত, তিনি তোমাদের ওপর সাক্ষী এবং তিনি তোমাদের ওপর আধিপত্যকারী ও তোমাদের ব্যাপারে জ্ঞানী। এটাই হলো সালাফদের কথার অর্থ যে, তিনি তাঁর জ্ঞানের মাধ্যমে তোমাদের সঙ্গে আছেন। আর এটাই হলো উল্লিখিত বাণীর বাহ্যিক ও প্রকৃত অর্থ।

ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা পাহাড়ের গুহায় তাঁর সাথীকে বললেন:

"লা তাহ্যান, ইন্নাল্লাহা মাআ'না অর্থাৎ- 'তুমি পেরেশান হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন' তখন এটাও তার বাহ্যিক অর্থেই এবং অবস্থার পারিপার্শ্বিকতা থেকে বুঝা যায় যে, এখানে 'সঙ্গে থাকা'র অর্থ সম্যকভাবে অবহিত থাকা, সাহায্য-সহযোগিতা করা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ - "নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সাথে, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মশীল।" (সূরাহ আন-নাহল, আয়াত: ১২৮)

অনুরূপভাবে মূসা ও হারূন 'আলাইহিমাস সালামকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলার বাণী: قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ - "ভয় করো না, আমি তো তোমাদের সাথেই আছি। আমি সবকিছু শুনি ও দেখি।" (সূরাহ ত্বা-হা, আয়াত: ৪৬) এখানে 'সঙ্গে থাকা' বাহ্যিক অর্থেই। আর এসব স্থলে সঙ্গে থাকার অর্থ হলো: সাহায্য-সহযোগিতা।

পরিশেষে ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ বলেছেন, 'সঙ্গে থাকা' এর অর্থ ও তার চাহিদার মধ্যে পার্থক্য আছে। আর হতে পারে যে, যা সঙ্গে থাকার চাহিদা তাই তার অর্থ, যা স্থানভেদে ভিন্ন হয়।' (মাজমুউল ফাতাওয়া, পৃ. ১০৩।)

ইবনুল কাইয়্যেম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, **মাআ (সঙ্গে)** শব্দটি যে অর্থ বুঝায় তা হলো সঙ্গ দেয়া, সম্মতি জ্ঞাপন করা। অতএব, যদি সাধারণভাবে বলা হয় যে, আল্লাহ তাঁর মাখলুকের সঙ্গে আছেন, তবে এর দাবীগত আবশ্যিক অর্থ হবে, তিনি তাঁর মাখলুক বিষয়ে সম্যক অবহিত, তিনি তাদের রক্ষণা-বেক্ষণ করছেন এবং তিনি তাদের ওপর ক্ষমতাবান। আর যদি বিশেষভাবে বলা হয়, যেমন নিম্নোক্ত আয়াতে: إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ -"নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সাথে, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মশীল।" (সূরাহ আন-নাহল, আয়াত: ১২৮) তাহলে তার দাবীগত আবশ্যিক অর্থ হবে, আল্লাহ তা'আলা সাহায্য- সহযোগিতা ও সমর্থনদানের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে আছেন। অতএব আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁর বান্দার সঙ্গে থাকা দুই প্রকার: সাধারণভাবে সঙ্গে থাকা এবং বিশেষভাবে সঙ্গে থাকা। আর আল কুরআনে উভয় প্রকারের কথাই উল্লেখ রয়েছে। (মুখতাসারুস সাওয়া'য়িক, পৃ. ৪১০।)

৩। অনুরূপ মহান আল্লাহর বাণী

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا -

“কিতাবে তোমাদের প্রতি তিনি তো নাযিল করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে, আল্লাহ্‌র আয়াত প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে এবং তা নিয়ে বিদ্‌রূপ করা হচ্ছে, তখন যে পর্যন্ত তারা অন্য প্রসংগে লিপ্ত না হবে তোমরা তাদের সাথে বসো না।” (সূরাহ আন-নিসা, আয়াত: ১৪০)

অনুরূপ মহান আল্লাহর বাণী:

وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ -

"আর আল্লাহর প্রতি ও আমাদের কাছে আসা সত্যের প্রতি ঈমান না আনার কি কারণ থাকতে পারে যখন আমরা প্রত্যাশা করি যে, আমাদের রব আমাদেরকে নেককার সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করবেন?” [সূরাহ আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৮৪]

৫- মহান আল্লাহর বাণী,

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا -

“আর কেউ আল্লাহ্‌ এবং রাসূলের আনুগত্য করলে সে নবী, সিদ্দীক (সত্যনিষ্ঠ), শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ- যাদের প্রতি মাহন আল্লাহ্‌ অনুগ্রহ করেছেন- তাদের সঙ্গী হবে এবং তারা কত উত্তম সঙ্গী!” [সূরাহ আন-নিসা, আয়াত: ৬৯]

৬- মহান আল্লাহর বাণী:

وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ -

“আর আল্লাহর প্রতি ও আমাদের কাছে আসা সত্যের প্রতি ঈমান না আনার কি কারণ থাকতে পারে যখন আমরা প্রত্যাশা করি যে, আমাদের রব আমাদেরকে নেককার সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করবেন?” [সূরাহ আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৮৪]

৭- মহান আল্লাহর বাণী,

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ -

“আর যদি তারা বের হতে চাইত তবে অবশ্যই তারা সে জন্য প্রস্তুতির ব্যবস্থা করত, কিন্তু তাদের অভিযাত্রা আল্লাহ্ অপছন্দ করলেন। কাজেই তিনি তাদেরকে অলসতার মাধ্যমে বিরত রাখেন এবং তাদেরকে বলা হল, 'যারা বসে আছে তাদের সাথে বসে থাক।” [সূরাহ আত-তাওবাহ, আয়াত: ৪৬]

‘সাথে থাকা’ মানে মিশে যাওয়াও নয় আবার একই স্থানে থাকাও নয়, বরং অবস্থা অনুসারে অর্থ নির্ধারিত করা। কুরআনে কারীমে বহু জায়গায় মা'আ (সাথে) ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলোকে কেউ কোনো দিন লেগে থাকার অর্থে ব্যবহার করেনি, আর তা সম্ভবও নয়। যেমন,

১- মহান আল্লাহর বাণী,

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ -

“মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল; আর তার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর, তাদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল।” [সূরাহ আল-ফাতহ, আয়াত: ২৯] এখানে (মা‘আহু) ‘সাথে’ মানে লেগে থাকা নয়।

২- মহান আল্লাহর বাণী:

يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ -

“হে মারইয়াম! আপনার রবের অনুগত হন এবং সাজদাহ করুন আর রুকূ'কারীদের সাথে রুকু করুন।” [সূরাহ আলে ইমরান, আয়াত: ৪৩]

৩- মহান আল্লাহর বাণী:

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ -

“হে আমাদের রব! আপনি যা নাযিল করেছেন তার প্রতি আমরা ঈমান এনেছি এবং আমরা এ রাসূলের অনুসরণ করেছি। কাজেই আমাদেরকে সাক্ষ্যদানকারীদের তালিকাভুক্ত করে নিন।” [সূরাহ আলে ইমরান, আয়াত: ৫৩]

৪- মহান আল্লাহর বাণী:

رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ -

"হে আমাদের রব, আমরা এক আহ্বায়ককে ঈমানের দিকে আহ্বান করতে শুনেছি, 'তোমরা তোমাদের রবের উপর ঈমান আন।' কাজেই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের রব! আপনি আমাদের পাপরাশি ক্ষমা করুন, আমাদের মন্দ কাজগুলো দূরীভূত করুন এবং আমাদেরকে সৎকর্মপরায়ণদের সহগামী করে মৃত্যু দিন।" [সূরাহ আলে ইমরান, আয়াত: ১৯৩]

৫- মহান আল্লাহর বাণী:

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا -

"কিন্তু যারা তাওবাহ্ করে, নিজেদেরকে সংশোধন করে, আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাদের দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে, তারা মুমিনদের সঙ্গে থাকবে এবং মুমিনদেরকে আল্লাহ্ অবশ্যই মহাপুরস্কার দিবেন।" [সূরাহ আন-নিসা, আয়াত: ১৪৬]

৬- মহান আল্লাহর বাণী:

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ -

"আর রাসূলের প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা যখন তারা শুনে, তখন তারা যে সত্য উপলি করে তার জন্য আপনি তাদের চোখ অশ্রু বিগলিত দেখবেন। তারা বলে, 'হে আমার রব। আমরা ঈমান এনেছি; কাজেই আপনি আমাদেরকে সাক্ষ্যবহদের তালিকাভুক্ত করুন [সূরাহ মায়েদাহ, আয়াত: ৮৩]

৭- মহান আল্লাহর বাণী;

أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ -

"তোমরা কি এ সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহও আছে? বলুন, 'আমি সে সাক্ষ্য দেই না'। বলুন, 'তিনি তো একমাত্র প্রকৃত ইলাহ এবং তোমরা যা শরীক কর তা থেকে আমি অবশ্যই বিমুক্ত।" [সূরাহ আল-আন'আম, আয়াত: ১৯] নিঃসন্দেহে কোনো ব্যক্তি এটা মনে করে না যে, আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহ তাঁর স্থানের সঙ্গী হিসেবে থাকে।

৮- মহান আল্লাহর বাণী:

الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَـٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ -

"যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্য সাব্যস্ত করে। অতএব অতিসত্বর তারা জেনে নিবে। [সূরাহ আল-হিজর, আয়াত: ৯৬]

৯- মহান আল্লাহর বাণী:

لَّا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَـٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا -

"আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহ্ সাব্যস্ত করো না, করলে নিন্দিত ও লাঞ্ছিত হয়ে বসে পড়বে।" [সূরাহ আল-ইসরা, আয়াত: ২২]

১০- মহান আল্লাহর বাণী,

وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَـٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا -

"আর আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ স্থির করো না, করলে নিন্দিত ও বিতাড়িত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।" [সূরাহ আল-ইসরা, আয়াত: ৩৯]

১১- মহান আল্লাহর বাণী,

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ -

"অতঃপর আমরা সুলায়মানকে এ বিষয়ের মীমাংসা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং তাদের প্রত্যেককে আমরা দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান। আর আমরা পর্বত ও পাখিদেরকে দাউদের অনুগত করে দিয়েছিলাম, তারা তার সাথে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত, আর আমরাই ছিলাম এ সবের কর্তা।" [সূরাহ আল-আম্বিয়া, আয়াত: ৭৯]

১২- মহান আল্লাহর বাণী:

وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَـٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ -

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে, এ বিষয়ে তার নিকট কোনো প্রমাণ নেই; তার হিসাব তো তার রব-এর নিকটই আছে; নিশ্চয় কাফিররা সফলকাম হবে না।" [সূরাহ আল মুমিনূন, আয়াত: ১১৭]

১৩- মহান আল্লাহর বাণী:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَـٰهًا آخَرَ -

"এবং তারা আল্লাহর সাথে কোনো ইলাহকে ডাকে না।" [সূরাহ আল-ফুরকান, আয়াত: ৬৮]

১৪- মহান আল্লাহর বাণী:

الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَـٰهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ -

"যে আল্লাহর সঙ্গে অন্য ইলাহ গ্রহণ করেছিল, তোমরা তাকে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর।" [সূরাহ ক্বাফ, আয়াত: ২৬]

১৫- মহান আল্লাহর বাণী:

"সুতরাং কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি আছে।" [সূরাহ আল-ইনশিরাহ, আয়াত: ০৫]

এ সকল আল্লাহর বাণীতে 'সাথে' শব্দটি এসেছে, কিন্তু কোথাও এগুলো দ্বারা লেগে থাকা বা মিলে-মিশে যাওয়া বুঝানো হয়নি।

এখানে এটাই বলা উদ্দেশ্য যে, মা'য়িয়্যাহ বা 'সাথে' শব্দটি বিভিন্ন অর্থ প্রদান করে, এটি একটি, মুশতারাক শব্দ। যার মধ্যে দু'টি দিক থাকে, যার দু'টি দিকের মধ্যে কোনো একটি বাঁধন থাকে, কখনও সে বাঁধন স্থান হতে পারে, আবার কখনও গুণ হতে পারে। আবার কখনও কখনও অবস্থাও হতে পারে। আবার কখনও কখনও সাহায্যও হতে পারে। তাহলে 'মা'আ' মা'য়িয়্যাহ বা 'সাথে' এ শব্দটি অভিধান অনুযায়ী কোনো বিষয়ে সামান্যতম এককে শরীক হওয়াই বুঝায়। সত্তাগতভাবে শরীক হওয়া বুঝায় না। আর এজন্যই যারা আমাদের সাথে মনের দিক থেকে মিল থাকে আমরা তাদেরকে বলে থাকি, 'আমরা তোমার সাথে আছি' অথবা বলি, 'তোমার সাথে একমত'। অনুরূপ যদি কাউকে আমরা ব্যবসায় শরীক করতে চাই তাহলে বলি, 'আমরা তোমার সাথে আছি'। এসব বাক্যের উদ্দেশ্য কখনও এটা থাকে না যে, আমরা তোমার স্থানে শরীক রয়েছি। এসবই প্রমাণ করে যে, 'মা'য়িয়্যাহ' বস্তুত কোনো একটি কমন মিলকে বুঝায়, তারপর বাক্যের অবস্থা অনুযায়ী নির্ধারিত হবে কোথায় কী অর্থ উদ্দেশ্য। তাই মহান আল্লাহর বাণী,

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -

"আপনি কি লক্ষ্য করেন না যে, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে আল্লাহ্ তা জানেন? তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন হিসেবে তিনি থাকেন না পাঁচ ব্যক্তির মধ্যেও হয় না যাতে ষষ্টজন হিসেবে তিনি থাকেন না। তারা এর চেয়ে কম হোক বা বেশী হোক তিনি তো তাদের সঙ্গেই আছেন তারা যেখানেই থাকুক না কেন। তারপর তারা যা করে, তিনি তাদেরকে কিয়ামতের দিন তা জানিয়ে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত।" [সূরাহ আল মুজাদালাহ, আয়াত: ০৭] এখানে বাক্যের শুরুতে ইলম বা জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে, অনুরূপ বাক্যের শেষেও ইলম বা জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে, যা প্রমাণ করছে যে, মাঝখানে 'সাথে' থাকার যে কথাটি বর্ণিত হয়েছে তা অবশ্যই 'ইলম' এর মাধ্যমে সাথে থাকাকেই বুঝানো হয়েছে।

পঞ্চমত:

এই 'সঙ্গে থাকা' আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁর মাখলুকের ঊর্ধ্বে থাকা এবং 'আরশের ওপরে থাকার সাথে সাংঘর্ষিক নয়; কেননা আল্লাহ তাআলার জন্যে নিরঙ্কুশ ঊর্ধ্বতা প্রমাণিত, সত্তাগতভাবে ও গুণগতভাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, **ওয়াহু অল আল্যিইউল আজীম** অর্থাৎ "আর তিনি সুউচ্চ, মহান। [সূরাহ আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ২৫৫] তিনি অন্যত্র বলেন: **সাব্বি হিসমা রব্বিকাল আ'লা** অর্থাৎ "তুমি তোমার সুমহান রবের নামের তাসবীহ পাঠ কর।" [সূরাহ আল-আ'লা, আয়াত: ০১] অন্য এক আয়াতে বলেন, **অলিল্লাহিল মাসালুল আ'লা অহুঅল আজিজুল হাকিম** অর্থাৎ "আল্লাহর জন্য রয়েছে মহান উদাহরণ। আর তিনিই পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী।" [সূরাহ আন-নাহল, আয়াত: ৬০] আর কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা', আক্বল এবং ফিতরতের দলীল এ ব্যাপারে একত্র হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা সর্বোর্ধ্বে এ ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহর দলীল তো গুণে শেষ করার মতো নয়। অকাট্য দলীলের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার জন্য প্রমাণিত এই ঊর্ধ্বতার সাথে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক মাখলুকের সঙ্গে থাকার কোনো সংঘর্ষ নেই। আর তা কয়েক কারণে:

এক. আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে- যা বৈপরীত্য থেকে মুক্ত -এ দুটি বিষয়কে নিজের জন্য একত্র করে উল্লেখ করেছেন। অতএব, এ দুটি যদি সাংঘর্ষিক হতো তবে আল-কুরআন এ দুটোকে একত্র করে উল্লেখ করত না। আর আল কুরআনের কোনো বিষয় যদি আপনার কাছে বৈপরীত্যপূর্ণ বলে মনে হয়, তাহলে তা বারবার ঘেঁটে দেখুন, যতক্ষণ না আপনার কাছে বিষয়টি পরিস্কার হয়ে না যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন: আফালা ইয়াতা দাব্বারুনাল কুরআনা

অলাউ কানা মিন ইনদি গইরিল্লাহি লাওয়াজাদু ফীহি উখতিলাফান কাছীরান অর্থাৎ "তারা কি কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না? আর যদি তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হত, তবে অবশ্যই তারা এতে অনেক বৈপরীত্য দেখতে পেত।" [সূরাহ আন-নিসা, আয়াত : ৮২]

দুইঃ 'সঙ্গে থাকা' এবং উচুতে থাকা সৃষ্টিবস্তুর জন্যেও সম্ভব। যেমন চাঁদ। অতএব, কেউ যদি রাতের বেলায় পথ চলার সময় বলে আমরা এ অবস্থায় চলছি যে, এখনো চাঁদ আমাদের সঙ্গেই আছে, তবে এটাকে বিপরীতমুখী কথা হিসেবে আখ্যা দেয়া হবে না। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যারা পথ চলে তারা যমীনে, আর চাঁদ হলো আকাশে। অতএব, যদি একটি মাখলুখের ক্ষেত্রে এরূপ সম্ভব হয় তবে যিনি সৃষ্টিকর্তা তাঁর ক্ষেত্রে এরূপ কেন সম্ভব হবে না।

'বরং চাঁদ আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি নিদর্শন, সে আল্লাহর ছোট্ট মাখলুকের মধ্যে একটি। সে মুসাফির এবং অমুসাফিরের সঙ্গে আছে তারা যেখানেই থাক না কেন।' ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র এ কথার ব্যাখ্যায় শাইখ মুহাম্মদ খালীল আল-হাররাস তিনি বলেন, চাঁদের উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বুঝিয়েছেন যা আকাশে স্থাপিত। চাঁদ মুসাফির ও অমুসাফির সবার সংঙ্গেই আছে, তারা যেখানেই থাক না কেন। যদি এটা চাঁদের বেলায় সম্ভব লাইসা কামিসলিহী শাইউন ওয়াহু অস সামিউল বাসীর অর্থাৎ হয় যা আল্লাহ তা'আলার ছোট্ট মাখলুকের মধ্যে একটি, তাহলে যিনি সূক্ষাতিসূক্ষ বিষয় সম্পর্কে সমাক অবহিত, যিনি তাঁর বান্দাদের সকল বিষয় জানেন এবং তাদের সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান, যার হাতে আকাশ ও পৃথিবী ও সমগ্র মহাবিশ্ব ঠিক আমাদের হাতে থাকা ছোট্ট একটি গুটির মতো, তাঁর ব্যাপারে কি এটা বলা ঠিক হবে না যে, তিনি তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে আছেন যদিও তিনি তাদের উর্ধ্বে, তাদের থেকে আলাদা এবং 'আরশের ওপরে? (রহমান আরশের উপর উঠেছেন - ৪৯৪-৪৯৫)

তিনঃ যদি ধরে নিই যে উর্ধ্বতা এবং সঙ্গে থাকা এ দুটি বিষয় কোনো মাখলুকের ক্ষেত্রে একত্র হওয়া সম্ভব নয়, তবে এর দ্বারা এটা আবশ্যক হয় না যে, তা সৃষ্টিকর্তার ক্ষেত্রেও অসম্ভব; কারণ আল্লাহ তা'আলা হলেন উদাহরণহীন। তাঁর মতো কোনো জিনিস নেই। **লাইসা কামিসলিহী শাইউন ওয়াহু অস সামিউল বাসীর** অর্থাৎ "তাঁর মত কিছু নেই, আর তিনি হলেন সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। [সূরাহ আশ-শূরা, আয়াত: ১১] শাইখুল ইসলাম ইবনে

তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ আল আকীদাহ আল ওয়াসিতিয়া গ্রন্থে বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক মাখলুকের নিকটতা ও সঙ্গে থাকার ব্যাপারে কুরআন-সুন্নায় যা এসেছে তা আল্লাহর সর্বোর্ধ্বতা ও সর্বোপরে থাকার সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়; কারণ সকল গুণের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা হলেন উদাহরণবিহীন। তিনি নিকটে থাকা সত্ত্বেও সর্বোর্ধ্বে, কাছে থাকা সত্ত্বেও সর্বোচ্চতায়। (রহমান আরশের উপর উঠেছেন- ৪৯৪-৪৯৫)

এ বিষয়ে খোলাসা কথা হলোঃ

১. আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁর মাখলুকের সঙ্গে থাকার গুণটি কুরআন, সুন্নাহ এবং সালাফদের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।

২. সঙ্গে থাকার বিষয়টি আল্লাহ তা'আলার জন্য উপযোগীভাবে প্রকৃত অর্থেই এবং তা কোনো মাখলুক কর্তৃক অন্য কোনো মাখলুকের সঙ্গে থাকার সদৃশ নয়।

৩. আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁর বান্দাদের সঙ্গে থাকার দাবি হলো, তিনি তাদের পরিবেষ্টন করে আছেন তাঁর জ্ঞান ও ক্ষমতা দ্বারা, শ্রবণ ও দর্শন দ্বারা, আধিপত্য ও ব্যবস্থাপনা দ্বারা এবং রুবুবিয়াতের অন্যান্য অর্থে, যদি সঙ্গে থাকার বিষয়টি অনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত হয়। আর যদি সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি অথবা গুণের সঙ্গে থাকার কথা উল্লিখিত হয় তখন ওপরে বর্ণিতভাবে সঙ্গে থাকার পাশাপাশি সাহায্য-সমর্থন করা, তাওফীক্ব ও সঠিক পথ দেখানো ইত্যাদিও সঙ্গে থাকার অর্থে সন্নিবিষ্ট হবে।

৪. সঙ্গে থাকা এটা দাবী করে না যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাখলুকের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে থাকেন অথবা তাদের স্থলে অবস্থান করেন। 'সঙ্গে থাকা' কোনোভাবেই এ অর্থ বুঝায় না। বস্তুত আল্লাহ তা'আলাকে যারা জগতের ভিতরে বলে থাকে, তারা কুরআন, হাদীস, সালাফদের ইজমা' ও ফিত্বরাত বা স্বাভাবিক প্রকৃতি বিরুদ্ধে কথা বলে থাকে। সাথে তারা বিবেকের যুক্তিরও বিরোধিতা করে থাকে, যেমন, যারা আল্লাহ তাআলাকে সৃষ্টির ভেতরে বলেন, তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে যে, আমরা ও আপনারা সবাই একমত যে, যখন এ জগত ছিল না, তখনও তিনি ছিলেন, তারপর যখন তিনি জগত সৃষ্টি করলেন, তখন হয় তিনি তা নিজের সত্তায় সৃষ্টি করেছেন, অথবা সত্তার বাইরে সৃষ্টি করে সৃষ্টির ভেতরে প্রবেশ করেছেন, আমরা জানি এ দুটোই সম্ভব নয়। তাহলে একমাত্র এটাই বাকী রইল যে, তিনি তাঁর সত্তার বাইরে সৃষ্টি করেছেন, তারপর

বাইরেই আছেন। আর সেটাই হচ্ছে সৃষ্টি থেকে আল্লাহর আলাদা থাকা, যা সালাফে সালেহীন বলতেন।

৫. ওপরে যা বর্ণিত হলো তা যদি অনুধাবন করে দেখি তবে আমরা জানতে পারি যে, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রকৃত অর্থে তাঁর মাখলুকের সঙ্গে থাকা এবং প্রকৃত অর্থে 'আরশের উপরে থাকা এ দুয়ের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। পবিত্র মহান আল্লাহ তা'আলা যার প্রশংসা করে আমরা শেষ করতে পারব না, তিনি নিজে যেভাবে নিজের প্রশংসা করেছেন তিনি ঠিক সে রকমই। সালাত ও সালাম মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবীর প্রতি। (রহমান আরশের উপর উঠেছেন - ৪৯৪-৪৯৫)

কিছু সন্দেহ ও তার অপনোদনঃ

১- আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত কি আল্লাহ তা'আলার 'সাথে থাকা' এ গুণটির তা'ওয়ীল করে?

উত্তর: ওপরে যা বর্ণিত হলো তা থেকে এটাও প্রমাণিত হলো যে আমরা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আহ 'সাথে থাকা' এর কোনো তা'ওয়ীল বা দূরবর্তী অর্থ গ্রহণ করি না। কারণ তা'ওয়ীল বা দূরবর্তী অর্থ তো তখনই বলা হবে, যখন প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ অসম্ভব হবে। এখানে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত কখনও প্রকাশ্য অর্থের বাইরে কিছু গ্রহণ করেনি প্রকাশ্য অর্থ তো নির্ধারিত হবে বাক্যের আগের ও পরের বাকরীতি থেকে। 'হুলুলী' সম্প্রদায় যেটা মনে করে থাকে যে সর্বদা মা'আ (সাথে থাকা) এর অর্থ, 'একত্রে লেগে থাকা' তা কখনো তার একমাত্র প্রকাশ্য অর্থ নয়। ইতোপূর্বে সেটার বিস্তারিত বর্ণনা চলে গেছে।

২- কুরআনের আয়াত

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ -

"আর আসমানসমূহ ও যমীনে তিনিই আল্লাহ, তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু তিনি জানেন এবং তোমরা যা অর্জন কর তাও তিনি জানেন।" [সূরাহ আল-আন'আম, আয়াত: ০৩] এ আয়াত কি প্রমাণ করে না যে, আল্লাহ সর্বত্র?

উত্তর: কুরআনে কারীমের আয়াত

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ - يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ

"আর আসমানসমূহ ও যমীনে তিনিই আল্লাহ, তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু তিনি জানেন এবং তোমরা যা অর্জন কর তাও তিনি জানেন।" [সূরাহ আল-আন'আম, আয়াত: ০৩] এ আয়াতে আল্লাহর সৃষ্টির অভ্যন্তরে থাকা বুঝানো হয়নি। কারণ আয়াতটি পড়ার দু'টি নিয়ম রয়েছে,

এক. আস-সামাওয়াত' এর পরে থেমে যাওয়া। তারপর 'ওয়াফিল আরজি ইয়া'লামু সিররাকুম' থেকে পুনরায় পাঠ করা। তখন অর্থ হবে, তিনি আল্লাহ আসমানসমূহের উপরে, আর যমীনে তিনি তোমাদের গোপন, প্রকাশ্য এবং যা তোমরা কামাই কর সবই জানেন।

দুই. না থেমে পুরোটা এক সাথে পড়া। তখন অর্থ হবে, আসমানসমূহ ও যমীনে তিনিই মা'বুদ বা উপাস্য (তিনি ব্যতীত আর কোনো প্রকৃত উপাস্য নেই)। তিনি জানেন তোমাদের গোপন, তোমাদের প্রকাশ্য এবং তোমরা যা অর্জন কর সবই। তখন আল্লাহ শব্দটির গুণবাচক অর্থ করা হবে। যা সূরাহ আয-যুখরুফের ৮৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যার মতোই।

৩. কুরআনের আয়াত

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَـٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَـٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ -

"আর তিনিই সত্য ইলাহ আসমানে এবং তিনিই সত্য ইলাহ যমীনে। আর তিনি হিকমতওয়ালা, সর্বজ্ঞ।" [সূরাহ আয-যুখরুফ, আয়াত: ৮৪] এ আয়াত কি প্রমাণ করছে না যে, আল্লাহ সর্বত্র?

উত্তর: কুরআনের আয়াত

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَـٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَـٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ -

"আর তিনিই সত্য ইলাহ্ আসমানে এবং তিনিই সত্য ইলাহ্ যমীনে। আর তিনি হিকমতওয়ালা, সর্বজ্ঞ।" [সূরাহ আয-যুখরুফ, আয়াত: ৮৪] এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির অভ্যন্তরে থাকা বুঝায় না। কারণ, আয়াতটির অর্থ, তিনিই সে সত্ত্বা, যিনি আসমানেও উপাস্য, আর যমীনেও তিনি উপাস্য, আর তিনি সুবিজ্ঞ ও সর্বজ্ঞ। অর্থাৎ আসমানবাসীদেরও তিনি মা'বুদ, তেমনি যমীনবাসীদেরও তিনি মা'বুদ।

৪- হাদীসের ভাষ্য,

ইজা কানা আহাদুকুম ইউসাল্লি ফালা ইয়াব সুক্ব ক্বিবালা অজহিহী, ফাআন্নাল্লাহা ক্বিবালা অজহিহী ইজা সল্লা অর্থাৎ "যখন তোমাদের কেউ সালাত আদায় করে তখন সে যেন তার চেহারার সামনের দিকে থুতু না ফেলে; কারণ আল্লাহ তা'আলা তার চেহারার দিকে থাকেন যখন সে সালাত আদায় করে।" (রহমান আরশের উপর উঠেছেন - ৪৯৪-৪৯৫) এর দ্বারা আল্লাহ মানুষের সাথে থাকা বুঝায় না?

উত্তরঃ এর কয়েকটি উত্তর হতে পারেঃ

এক. আল্লাহর শরীআতে আল্লাহ তা'আলার উপরে থাকা ও মুসল্লির চেহারা বরাবর থাকা উভয়টিই সাব্যস্ত করেছে, সুতরাং তা কখনো পরস্পর বিরোধী নয়। কারণ, শরী'আত কখনো স্ববিরোধী কিছু নিয়ে আসে না।

দুই. এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে সৃষ্টির ভেতর বুঝানো হয়নি। আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপরে থাকা এবং তাঁর চেহারা সালাত আদায়কারীর দিকে থাকার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কারণ, উভয়টিই হক। তিনি অবশ্যই সত্তাগতভাবে 'আরশের উপর। আর সেখানে থেকেও যেভাবে তাঁর জন্য উপযুক্ত সেভাবে তিনি সালাত আদায়কারীর চেহারার দিকে রয়েছেন। আর এটা মানুষের জন্যও হতে পারে, যেমন কোনো মানুষ উপরের কেউ বা কিছুর সাথে কথা বলতে হয় তখন সেটা তার উপরেই থাকে, আর সেটা উপরে থাকলেও কথা বলার সময় তা তার চেহারার দিকেই থাকে।

তিন. এটা যদি সৃষ্টির ক্ষেত্রে অসম্ভবও ধরে নেয়া হয় সেটা স্রষ্টার জন্য অসম্ভব হওয়ার কোনো কারণ নেই। যদি না কেউ সেটাকে সৃষ্টির উপর কিয়াস করে। অথচ এ কিয়াসই নিষিদ্ধ; কারণ "তার মতো কোনো কিছু নেই, তিনি সর্বশ্রোতা" সর্বদ্রষ্টা।

আল্লাহ কর্তৃক বান্দার নিকটে থাকা একটি মহৎ গুণ

আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক বান্দার নিকটে থাকা তার একটি গুণ। এটি আল্লাহর পছন্দ করা কর্মগত একটি গুণ, যার পক্ষে কুরআন ও হাদীসের বাণী থেকে প্রমাণ রয়েছে। যেমন,

১- আল্লাহর নামসমূহের মধ্যে একটি নাম হচ্ছে, **'আল-ক্বারীব'** বা সবচেয়ে নিকটে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ -

"আর আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, (তখন বলে দিন যে) নিশ্চয় আমি অতি নিকটে। আহবানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই। কাজেই তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমার প্রতি ঈমান আনুক, যাতে তারা সঠিক পথে চলতে পারে।" [সূরাহ আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ১৮৬]

আরও বলেন, - إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ "নিশ্চয় আমার রব খুব কাছেই, ডাকে সাড়া প্রদানকারী।" [সূরাহ হূদ, আয়াত: ৬১]

এ বিষয়ে মহান আল্লাহ আরও বলেন,

قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ -

"বলুন, আমি বিভ্রান্ত হলে বিভ্রান্তির পরিণাম আমারই, আর যদি আমি সৎপথে থাকি তবে তা এ জন্যে যে, আমার রব আমার প্রতি অহী পাঠান। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, অতি নিকটবর্তী।" [সূরাহ সাবা, আয়াত: ৫০]

২- অনুরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসেও এসেছে, **অমান তাক্বাররবা ইলাইইয়া সিবরন তাক্বাররবতু ইলাইহি জিরাআন-আক্ববালতু ইলাইহি উহারবিলু** অর্থাৎ "আর যে কেউ আমার দিকে এক বিঘত নৈকট্য লাভের দিকে এগিয়ে যাবে, আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাব, আর যে কেউ আমার নৈকট্য লাভে এক হাত এগিয়ে আসবে, আমি তার দিকে এক বেড় এগিয়ে যাব, আর যখন কেউ হেঁটে এগিয়ে আসবে, আমি তার দিকে একটু দ্রুত এগিয়ে যাব। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৪০৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬৭৫ ও ২৬৮৭।)

৩- অপর হাদীসে এসেছে,

"আবু মূসা আল আশ'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক সফরে ছিলাম, আমাদের আওয়াজসমূহ তাকবীর ধ্বনিতে মুখরিত হচ্ছিল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বললেন, হে মানুষরা, নিজেদের ওপর তোমরা কোমলতা আরোপ কর, তোমরা তো কোনা

বধির কিংবা অনুপস্থিত কাউকে ডাকছো না। তোমরা তো ডাকছ সর্বশ্রোতা, সর্বনিকট ও দো'আ কবুলকারী সত্তাকে, তিনি তোমাদের সাথে তেমন নিকটে যেমন তোমাদের কারো বাহনের ঘাঁড় তার থেকে নিকটে। " (বুখারী ও মুসলিম)

অপর হাদীসে এসেছে,

"আমর ইবন আবাসা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমাকে বলতে শুনেছেন, রাব্বুল আলামীন বান্দার সবচেয়ে নিকটে হন শেষ রাতের মধ্যভাগে। সুতরাং যদি তুমি পার তার মতো হতে যে তাঁকে সে সময় স্মরণ করে, তাহলে হও।" (সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব।)

৫- অপর হাদীসে এসেছে,

"আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেন, জাহান্নাম থেকে কোনো বান্দাকে মুক্ত করার ব্যাপারে 'আরাফার দিনের মতো আর কোনো দিন নেই, আল্লাহ তা'আলা নিকটবর্তী হোন, তারপর তিনি তাদের নিয়ে ফিরিশতাদের সাথে গর্ব করে বলেন, এ লোকগুলো কী চায়?" (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৪৮।)

আল্লাহ তাআলা বান্দার নিকটে থাকার গুণ সাব্যস্ত করার নীতি

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ও আসহাবুল হাদীস এ বিশ্বাস রাখেন যে, আল্লাহ তা'আলা প্রকৃত অর্থে তাঁর সম্মান-মর্যাদা ও মহত্বের সাথে উপযোগীভাবে তাঁর বান্দাদের নিকটবর্তী তবে তিনি তাঁর 'আরশের উপরে, তাঁর সৃষ্টিকুল থেকে পৃথক। আবার তিনি যথাযথভাবেই তাঁর বান্দাদের নিকটবর্তী হন, তাদের কাছাকাছি হওয়াও সত্য। কিন্তু তারা কুরআন ও সুন্নাহয় আসা প্রত্যেক 'নিকটবর্তী' শব্দকেই স্বয়ং তাঁর নিকটবর্তী হওয়া বলেন না। বরং কখনও কখনও সেগুলো ফিরিশতাগণের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে বলে থাকেন, আর তা নির্ধারিত হবে বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত শব্দটির আগ-পিছ দেখে।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আর তাঁর বান্দাদের কারো নিকটবর্তী হওয়া, কাছাকাছি হওয়া, এটা এমন সকল আলেমই সাব্যস্ত করে থাকেন, যারা আল্লাহ তা'আলার জন্য তিনি যা ইচ্ছা ও পছন্দ তা করার গুণ সাব্যস্ত করেন। অনুরূপ তারা আরও সাব্যস্ত করেন কিয়ামতের দিন তাঁর হাশরের মাঠে আগমন, তাঁর নিকটবর্তী আসমানে

অবতরণ, 'আরশের উপরে আরোহন। বস্তুত এটিই হচ্ছে সালাফে সালেহীন ইমাম, ইসলামের বিখ্যাত ইমামগণ, হাদীসবেত্তাগণ। আর এ বিষয়টি তাদের থেকে মুতাওয়াতির বা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। (মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/৪৪৬)।

অন্যত্র তিনি বলেন, "আর তাঁর নিকটবর্তী হওয়ার বিষয়টি জায়েয হওয়া এটা আবশ্যক করে না যে কুরআন ও হাদীসের যেখানে যেখানেই এ 'নিকটবর্তী' শব্দ আসবে সেটাকেই তাঁর স্বয়ং নিকটবর্তী হওয়া অর্থ নিতে হবে। বরং সেটা জায়েয পর্যায়েই থাকবে, তারপর যে ভাষ্যে তা এসেছে সে ভাষ্যের দিকে তাকাতে হবে, যদি সেটা দ্বারা আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়াই বুঝা যায় তবে তাই অর্থ নিতে হবে, আর যদি অন্য অর্থ বুঝায় তখন সেটা নিতে হবে। যেমনটি আল্লাহর আসা ও আগমন এ দু'টি গুণের ক্ষেত্রে নেয়ার আলোচনা ইতোপূর্বে চলে গেছে।" (মাজমূ' ফাতাওয়া (৬/১৪)। অন্যত্রও শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ এ মাসআলাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। (ফাতাওয়া ৫/২৩২-২৩৭; ২৪০-২৪১; ২৪৭-২৪৮, ৪৫৯-৪৬৭, ৪৯৪-৫১৪; ৬/৫, ৮, ১২-১৪, ১৯-২৫) (আরও বিস্তারিত জানার জন্য দেখা যেতে পারে, শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-উসাইমীন প্রণীত আল-কাওয়ায়িদুল মুসলা ৬৭-৭২, উদাহরণ নং ১১ ও ১২।)

কিছু সন্দেহ ও তার অপনোদন

প্রশ্ন:

কুরআনে কারীমের বেশ কিছু আয়াতে 'নিকটবর্তী' শব্দটি এসেছে, যেমন, - وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ওয়া নাহনু আক্বরাবু ইলাইহি মিন হাবলিল ওয়া রিদ অর্থাৎ "আর আমরা তার গলার ধমনী হতেও অধিক নিকটবর্তী।" [সূরাহ কাফ, আয়াত: ১৬]

অনুরূপ অন্য আয়াতে এসেছে, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ- ওয়া নাহ্নু আক্বরাবু ইলাইহি মিনকুম অর্থাৎ "আর তোমাদের চাইতে আমরা তার অধিক নিকটবর্তী।" [সূরাহ আল ওয়াকিয়াহ, আয়াত: ৮৫] কোনো কোনো তাফসীর গ্রন্থসমূহে বলা হয়েছে, উল্লিখিত দু' আয়াতে 'অধিক কাছে' বলতে ফিরিশতাদের বুঝানো হয়েছে। এ তাফসীর কি আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া' গুণ বিরোধী, নাকি তা তা'ওয়ীল ?

জওয়াব:

উল্লিখিত দু' আয়াতে 'অধিক নিকটবর্তী' বলতে ফিরিশতারা অধিক নিকটবর্তী বলে যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তাতে আল্লাহর বাণীকে তার বাহ্যিক অর্থ থেকে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে না। গভীরভাবে চিন্তা করলে এ বিষয়টি আমাদের বুঝে আসে।

প্রথম আয়াত:

এখানে 'নিকটবর্তী থাকা'র বিষয়টি এমন কিছুর সঙ্গে যুক্ত করে উল্লেখ করা হয়েছে, যার দ্বারা বুঝা যায়, এখানে 'অধিক নিকটবর্তী' বলে ফিরিশতাদেরকেই উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ - إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ - مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ -

"আর অবশ্যই আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তাও আমরা জানি। আর আমরা তার গলার ধমনী হতেও অধিক কাছে। যখন ডানে ও বামে বসা দু'জন লিপিবদ্ধকারী লিখতে থাকবে তার প্রত্যেক কর্ম ও কাজ সে যে কথাই উচ্চারণ করে তার কাছে সদা উপস্থিত সংরক্ষণকারী রয়েছে।" [সূরাহ ক্বাফ, আয়াত: ১৬-১৮]

এখানে **ইজ ইয়াতা লাক্কা** (যখন... গ্রহণ করবে) দ্বারা এটা বুঝা যাচ্ছে যে আগের আয়াতে, **ওয়া নাহনু আক্বরাবু** এর 'অধিক নিকটবর্তী' বলা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আমলনামা লিপিবদ্ধকারী দুই ফিরিশতার নিকটবর্তী হওয়া।

দ্বিতীয় আয়াত:

দ্বিতীয় আয়াতে যে 'নিকটবর্তী' থাকার কথা বলা হয়েছে, তা বান্দার মৃত্যুকালীন অবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত। আর মৃত্যুকালে বান্দার কাছে যারা উপস্থিত হন তারা হলেন ফিরিশতা। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন: إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ -

"অবশেষে যখন তোমাদের কারো কাছে মৃত্যু আসে, আমার প্রেরিত দূতগণ তার মৃত্যু ঘটায়। আর তারা কোনো ত্রুটি করে না।" [সূরাহ আল-আন'আম, আয়াত: ৬১]

মানুষের মৃত্যুকালে ফিরিশতাই যে বান্দার নিকটে আসেন, এর আরেকটি প্রমাণ হলো আল্লাহ তা'আলার কথা: [ওয়ালা কিল্লা তুবছিরুন] "কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না।" [আল ওয়াকিয়া, আয়াত: ৮৫]

কেননা এ আয়াত থেকে বুঝা যাচ্ছে যে যিনি নিকটবর্তী হন তিনি ঠিক ঐ জায়গাতেই নিকটবর্তী হন এ বিষয়টি ফিরিশতা কর্তৃক নিকটতাকে নির্ধারণ করে দিচ্ছে; কেননা আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে এ প্রকৃতির নিকটবর্তী হওয়া অসম্ভব।

সার্বিকভাবে, সূরাহ ক্বাফের উক্ত আয়াতটির অর্থ যদি আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষেত্রেও নির্ধারণ করা হয়, তবে তার অর্থ তাঁর মর্যাদা ও শানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এমনভাবে তিনি বান্দার নিকটে থাকেন, সৃষ্টির মধ্যে প্রবিষ্ট হিসেবে নন, বরং এর প্রকৃত ধরন আমাদের অজানা-তবে এ অর্থটাও সঠিক হবে।

একটি প্রশ্ন:

এখানে একটি প্রশ্ন এভাবে উত্থাপিত হতে পারে যে, যদি ফিরিশতাই নিকটবর্তী হবেন তাহলে আল্লাহ তা'আলা কেন বললেন যে, 'আমরা তার নিকটে'? অর্থাৎ 'নিকটবর্তী হওয়া'-কে আল্লাহ তা'আলা নিজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে কেন উল্লেখ করলেন? এ প্রকৃতির অভিব্যক্তির উদাহরণ কি অন্য কোথাও পাওয়া যায়?

উত্তর:

আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাদের নিকটবর্তী হওয়াকে তাঁর নিজের নিকটবর্তী হওয়া বলে উল্লেখ করেছেন; কারণ ফিরিশতার নিকটবর্তী হওয়া আল্লাহ তা'আলার নির্দেশেই ঘটে থাকে। ফিরিশতারা হলেন তাঁর সৈন্য ও দূত।

ফিরিশতার নিকটবর্তী হওয়াকে আল্লাহ তা'আলা নিজের নিকটবর্তী হওয়া বলে ব্যক্ত করার উদাহরণ আল-কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় এসেছে, যেমন:- فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ "অতঃপর যখন আমরা তা পাঠ করি (জিবরীলের মাধ্যমে) তখন আপনি তার পাঠের অনুসরণ করুন।" [সূরাহ আল-কিয়ামাহ, আয়াত: ১৮]

উক্ত আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কুরআন পাঠ মূলত ফিরিশতা জিবরীল 'আলাইহিস সালামের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এ পাঠকে নিজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে বলেছেন, “যখন আমরা তা পাঠ করি”। এটা এ হিসেবে যে, জিবরীল ‘আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আল্লাহর নির্দেশেই কুরআন পাঠ করেছেন। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা‘আলার বাণী-হলো فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ - “অতঃপর যখন ইবরাহীম থেকে ভয় দূর হলো এবং তার কাছে সুসংবাদ এলো, তখন সে লূতের কওম সম্পর্কে আমাদের সাথে বাদানুবাদ করতে লাগলো।” [সূরাহ হূদ, আয়াত: ৭৪] ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম লূত ‘আলাইহিস সালামের কওম সম্পর্কে আল্লাহর সঙ্গে বাদানুবাদ করতে লাগলেন। অথচ আমরা জানি যে, তিনি ফিরিশতাদের সঙ্গে বাদানুবাদ করতে লাগলেন। কিন্তু যেহেতু ফিরিশতারা আল্লাহর দূত হিসেবে এসেছিলেন সে হিসেবে তাদের সঙ্গে বাদানুবাদ করা এক অর্থে আল্লাহর সঙ্গেই বাদানুবাদ করা।

তাছাড়া অন্য আয়াতেও এমনটি এসেছে, যেমন:

أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ -

“নাকি তারা মনে করে যে, আমরা তাদের গোপন বিষয় ও মন্ত্রণা শুনতে পাই না? অবশ্যই হ্যাঁ। আর আমাদের ফিরিশতাগণ তাদের কাছে থেকে সবকিছু লিখছে।” [সূরাহ আয-যুখরুফ, আয়াত-৮০]

আর যদি অন্য তাফসীরটি করা হয়, অর্থাৎ যদি বলা হয় যে, এসব আয়াতেও আমরা ‘অধিক নিকটবর্তী’ হওয়া দ্বারা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার নিকটবর্তী হওয়াকে বুঝানো হয়, তাহলে আয়াতের অর্থ হবে ইলমের মাধ্যমে নিকটবর্তী থাকা। (মাজমূ‘ ফাতাওয়া (৬/১৯ -২০)।

আল্লাহ তা‘আলার ‘আরশের উপর থাকা ও নিকটতম আসমানে অবতরণ করা

আল্লাহ তা‘আলার নিকটতম আসমানে নেমে আসা তাঁর একটি মহৎ গুণ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহীহ হাদীসে তিনটি শব্দ এসেছে যার মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলার নিকটতম আসমানে নেমে আসার বিষয়টি প্রমাণিত। সে শব্দগুলো হচ্ছে,

১- আন-নুযূল ।

২- আল-হুবুত্ব।

৩- আত-তাদাল্লী।

এগুলো আল্লাহ কর্তৃক জানিয়ে দেয়া তাঁর কিছু কর্মগত গুণ। সহীহ হাদীসে আমরা তার প্রমাণ পাই। ইমাম দারাকুতনী রহিমাহুল্লাহ তাঁর আন-নুযূল গ্রন্থে আঠারো জন সাহাবী থেকে তা বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি বর্ণনা হচ্ছে,

১- অবতরণ সংক্রান্ত বিখ্যাত হাদীসে এসেছে,

"আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেছেন, আমাদের মহান ও কল্যাণপূর্ণ রব প্রতি রাতে নিকটতম আসমানে নেমে আসেন, যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে, তিনি বলতে থাকেন, কে আমাকে ডাকবে, ফলে আমি তার ডাকে সাড়া দিব? কে আমার কাছে চাইবে, ফলে আমি তাকে প্রদান করব? কে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে ফলে আমি তাকে ক্ষমা করব?" (বুখারী -১১৪৫, মুসলিম-৭৫৮)

২- অপর হাদীসে এসেছে, আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমাকে বলতে শুনেছি: "যদি আমার উম্মতের ওপর কষ্টকর না হতো তবে আমি তাদেরকে প্রতি সালাতের সময় মিসওয়াক করতে নির্দেশ দিতাম আর ইশার সালাতকে রাতের প্রথম এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত নিয়ে যেতাম; কারণ যখন রাতের প্রথম এক-তৃতীয়াংশ পার হয়ে যায় তখন আল্লাহ তা'আলা নিকটতম আসমানে নেমে আসেন, সুবহে সাদিক উদিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানে থাকেন, তিনি বলতে থাকেন, কোনে যাচঞাকারী কি আছে, যাকে আমি প্রদান করব? কোনো আহ্বানকারী কি আছে, যার ডাকে আমি সাড়া দিব? কোনো রোগী কি রোগ মুক্তি কামনা করার আছে, যাকে আমি রোগমুক্ত করব? কোনো গুনাহগার কি ক্ষমা প্রার্থনা করার আছে, যাকে আমি ক্ষমা করব?" (আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং ৯৬৭, ৯৬৮; হাসান সনদে।)

অনুরূপ ইবন মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেছেন, "যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ আসে, আল্লাহ তা'আলা নেমে আসেন নিকটতম আসমানে, তারপর

আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, তারপর তিনি তাঁর হাত প্রসারিত করেন, বলতে থাকেন, এমন কি কোনো যাচনাকারী আছে, যাকে আমি তার প্রার্থিত জিনিস দিব? এভাবে তিনি বলতে থাকেন, যতক্ষণ না সুবহে সাদিক উদিত হচ্ছে।" (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৩৬৭৩, ৩৮২১।)

৩- আর ইসরা ও মি'রাজের হাদীসে এসেছে, আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "অতঃপর রাসূল সিদরাতুল মুন্তাহায় আসলেন, জাব্বার রব্বুল ইয্যত তখন নেমে আসলেন এমনকি তিনি রাসূলের থেকে দু' দন্ড দূরত্বে অথবা তার থেকেও নিকটে হলেন.....।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৫১৭।)

এ হাদীসগুলো থেকে স্পষ্টভাবে সাব্যস্ত হলো যে, রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তা'আলা রাতের বেলায় নিকটতম আসমানে নেমে আসেন।

তাছাড়া এ বিষয়টির ঈমানের ব্যাপারে সালাফে সালেহীনের ইজমা' বা ঐকমত্য বর্ণনা করেছেন যথাক্রমে ইবন আবদুল বার আত-তামহীদ (৭/১৫৩) আবু আমর আত-ত্বালামাঙ্কী (মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/৫৫৭)।, ইবন তাইমিয়্যাহ' শারহু হাদীসিন নুযূল, ৫। ইবন আবদুল হাদী আস সারেমুল মুনকী, ১৯১ পৃ: ইমাম যাহাবী সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১১/৩৭৬) ও ইবনুল কাইয়্যেমসহ প্রমুখ।

আল্লাহ তা'আলার নিকটতম আসমানে নেমে আসার ব্যাপারে সালাফে সালেহীন আ'কীদাহ-বিশ্বাস

ইমাম শাফে'য়ী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আল্লাহর রয়েছে নাম ও গুণাবলি, যার বর্ণনা কুরআনে কারীমে এসেছে, অনুরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে তার সংবাদ দিয়েছেন। তিনি প্রতি রাতে নিকটতম আসমানে নেমে আসেন, এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু "আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রদত্ত সংবাদ। ইবন আবী ইয়া'লা, তাবাকাতুল হানাবিলাহ (১/২৮২)।

ইমাম আবু সাঈদ উসমান ইবন সাঈদ আদ-দারেমী রহিমাহুল্লাহ বলেন, এসব হাদীস যাতে আল্লাহ তাআলার নিকটতম আসমানে অবতরণ করার কথা এসেছে, আমি ফিকহের জ্ঞানে জ্ঞানী সঠিক জ্ঞানসম্পন্ন আলেমগণকে পেয়েছি তারা এগুলো বিশ্বাস করতেন, এগুলো অস্বীকার করতেন

না। এগুলো বর্ণনা করতে পিছপা হতেন না। (আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ, পৃ. ৭৯।)

মুহাদ্দিসগণ এই হাদীসকে আল্লাহ তাআলার সিফাত (গুণ/বিশেষণ) বিষয়ক হাদীস চিহ্নিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম তিরমিযী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এই হাদীস এবং আরও এই ধরনের যে সমস্ত হাদিসে আল্লাহর সিফাত বা প্রত্যেক রাতে পৃথিবীর নিকটবর্তী আকাশে আল্লাহ তা'আলার অবতরণ সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। সে সকল হাদীস সম্পর্কে একাধিক বিশেষজ্ঞ আলিমের বক্তব্য হলো যে, এই ধরনের রিওয়ায়াতসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত। এগুলোর উপর ঈমান রাখতে হবে। এসব বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা যাবে না এবং তা কী ধরনের সে সম্পর্কেও প্রশ্ন করা যাবে না। ইমাম মালিক ইবন আনাস, সুফিয়ান ইবন উয়াইনা, আবদুল্লাহ ইবন মুবারক রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ ইমামদের থেকে এই ধরনের বক্তব্য বর্ণিত আছে। এই ধরনের হাদীসগুলো সম্পর্কে তারা বলেন, "কী ধরনের?" - সে প্রশ্ন না তুলে যেভাবে উল্লেখ হয়েছে সেভাবেই তা মেনে নাও। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আলেমগণ এ অভিমতই পোষণ করেন। কিন্তু জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায় এই সমস্ত রিওয়ায়াত অস্বীকার করে; তারা বলে, এগুলো তা হলো উপমাবোধক। এটি এমন, যেমন আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে বলেছেন, **লাইসা কামাসলিহী শাইউন ওয়াহুঅস সামিউল বাসীর** অর্থাৎ "কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" [সূরাহ আশ-শূরা, আয়াত: ১১) তিরমিজী, (হাদীস নং ৬৫৯ এর ব্যাখ্যায় স্বয়ং ইমাম তিরমিযী।)

ইমাম ইবন জারীর আত-তাবারী বলেন, "অধ্যায়: স্রষ্টার সেসব গুণের বর্ণনায় যা কুরআন ও হাদীসের সংবাদের মাধ্যমে পাওয়া গেছে, তা যুক্তিতে নয়। "সেটা হচ্ছে, যেমন আল্লাহ তাআলা কর্তৃক আমাদের জানানো যে, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, আর তাঁর রয়েছে, দুটি হাত, তাঁর বাণীতে তিনি বলছেন, "বরং তাঁর দুটি হাত সুপ্রশস্ত" (রহমান আরশের উপর উঠেছেন পৃ. ৫০৬)

ইমাম ইবন খুযাইমাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, "অধ্যায়: সে সকল হাদীস যা সহীহ সনদে সাব্যস্ত হয়েছে, যা হিজায ও ইরাকের আলেমগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আল্লাহ তাআলার প্রতি রাতে প্রথম আসমানে অবতরণের ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন। সেগুলোর ব্যাপারে আমরা মুখের স্বীকৃতি, অন্তরের সত্যায়নের মাধ্যমে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এ হাদীসগুলোতে

যে সংবাদ আমরা পাই তার সত্যায়ন করি, তবে কোনো প্রকার ধরন নির্ধারণ না করেই। কারণ, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা আমাদের স্রষ্টার অবতরণ করার ধরন বর্ণনা করেননি। তিনি আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি অবতরণ করেন। আর মহান আল্লাহ স্বয়ং এবং তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা মুসলিমগণ তাদের দীনের জন্য যা প্রয়োজন হবে তা বর্ণনা করা ছাড়েননি। সুতরাং আমরা এসব হাদীসে আসা অবতরণের কথার স্বীকৃতি দিই, তবে তার ধরন নির্ধারণে কথা না বলি; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা আমাদেরকে সেটার ধরন জানাননি। এ হাদীসগুলোতে এটা স্পষ্ট হলো, প্রমাণিত হলো ও বিশুদ্ধভাবে আসলো যে, মহান আল্লাহ নিকটতম আসমানে অবতরণ করেন, যা আমাদেরকে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা জানিয়েছেন। কারণ, আরবী ভাষার অভিধানে কোথাও আসেনি, নিচ থেকে উপরে এসেছে। বরং সকল ভাষার দাবিই হচ্ছে, উপর থেকে নিচে অবতরণ করা হয়।" (কিতাবুত তাওহীদ (১/২৮৯)। ইমাম আবুল কাসেম আল-লালেকাঈ বলেন, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা থেকে মহান রবের নিকটতম আসমানে অবতরণ করার বিষয়ে যা এসেছে তার আলোচনা, যা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওাসাল্লাম থেকে বিশজন বর্ণনা করেছেন।" (আল-লালেকাঈ, শারহু উসুলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাহ (৩/৪৩৪)।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আল্লাহ তা'আলার গুণাবলির ব্যাপারে তাই বলা হবে যা তাঁর সত্তার ব্যাপারে বলা হবে। কারণ তাঁর মতো কোনো কিছু নেই, সত্তাতেও নয়, গুণেও নয়, অনুরূপ কর্মেও নয়। সুতরাং যদি তাঁর এমন প্রকৃত সত্তা আপনি সাব্যস্ত করেন যা অন্যান্য সত্তার মতো নয় তাহলে সে সত্তারও রয়েছে বাস্তব গুণাবলি যা অন্য কারও গুণাবলির অনুরূপ নয়।... তারপর যদি আপনাকে প্রশ্ন করে, আমাদের রব নিকটতম আসমানে কীভাবে অবতরণ করেন? তাকে বলা হবে, তিনি কেমন? যদি বলে, তাঁর সত্তার ধরন তো জানি না। তখন তাকে বলা হবে, আমরাও তাঁর ধরণ জানি না। কারণ, গুণ জানার বিষয়টি নির্ভর করবে গুণান্বিত সত্তাকে জানার ওপর, যা তারই শাখা ও অনুগামী বিষয়। সুতরাং আপনি আমাকে কীভাবে তাঁর শোনা, দেখা, কথা বলার ধরণ জিজ্ঞেস করেন যেখানে আপনি তাঁর সত্তার ধরন সম্পর্কেই জানেন না। আত-তাদমুরিয়্যাহ, পৃ. ১৫১।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তিনি সেটা ইমাম কারজী থেকে বর্ণনা করে সেটার পক্ষে কথা বলছেন, "ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ'র ছাত্র ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান থেকে বর্ণিত, তিনি সেসব হাদীস যাতে এসেছে যে, আল্লাহ তা'আলা নিকটতম আসমানে নেমে আসেন, এ জাতীয় হাদীসসমূহ যা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিবর্গ বর্ণনা করেছেন, সেগুলো আমরাও বর্ণনা করব, সেগুলোতে যা বলা হয়েছে তার ওপর ঈমান রাখব, সেগুলোর ব্যাখ্যা দাঁড় করাবনা।" (মাজমূ' ফাতাওয়া (৪/১৮৬); আরও দেখুন, ইবনুল কাইয়োম, ইজতিমাউল জুয়ূশিল ইসলামিয়্যাহ (১/১৩৯)।)

ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ অন্যত্র বলেন, "সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যখন তাঁকে তাঁর রাসূল এ গুণে গুণান্বিত করেছেন যে, প্রতি রাতে আল্লাহ তা'আলা নিকটতম আসমানে নেমে আসেন, আর তিনি 'আরাফার দিন বিকাল বেলা হাজীদের নিকটে হন, আর তিনি মূসা আলাইহিস সালামের সাথে পবিত্র ভূমির ডান উপত্যকা এর গাছ থেকে কথা বলেছেন, আর তিনি আসমানের দিকে উঠলেন যখন তা ধোঁয়া ছিল, তারপর তিনি সেটাকে বললেন, আস স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়', এসব কর্মকান্ড সে রকম জরুরী নয় যা আমরা সাধারণত দৃশ্যমান কোনো কিছুকে নামতে দেখি; যাতে কেউ এটা না বলে যে, তিনি যদি অবতরণ করেন তো সেটার জন্য এক স্থান ছেড়ে আরেক স্থান ব্যস্ত রাখতে হয়।" (দাক্কায়িকৃত তাফসীর (৬/৪২৪)।

ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ আরও বলেন, "সুন্নাহ ও হাদীসের দিকে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করা কিছু গোষ্ঠী 'আল্লাহ তা'আলার অবতরণ করার হাদীসের তা'ওয়ীল বা অপব্যাখ্যা করে। অনুরূপ তারা কুরআন ও হাদীসের আরও কিছু ভাষাকে অপব্যাখ্যা করে থাকে, যাতে আল্লাহ তা'আলার কোনো কর্মগত গুণ সাব্যস্ত করা হয়েছে, আর যেগুলো কেবল তাঁর সাথেই সম্পৃক্ত, যেমন আসা, আগমন করা, নিচে নামা ইত্যাদি।" (মাজমু' ফাতাওয়া (৫/৩৯৭)।)

অন্য স্থানে তিনি ইমাম ইবন মানদাহ কর্তৃক আনীত আল্লাহ তা'আলার অবতরণের হাদীসগুলো উল্লেখ করার পর, যারা এগুলোর তা'ওয়ীল বা অপব্যাখ্যা করে, তাদের বক্তব্য খন্ডন করতে গিয়ে বলেন, "এ হচ্ছে আবদুর রহমান ইবন মানদাহ যা উল্লেখ করেছেন তার সংক্ষিপ্তরূপ, যদিও তিনি এ হাদীসের সকল বর্ণনা-রীতিকে একসাথ করতে সমর্থ হয়েছেন, সে হাদীসের শব্দগুলোও জমা করেছেন, যেমন, হাদীস,

"আমাদের রব প্রতি রাতে নিকটতম আসমানে নেমে আসেন, যখন তার প্রথম এক-তৃতীয়াংশ গত হয়, তখন তিনি বলেন, আমিই বাদশাহ, কে এমন আছে যে আমার কাছে চাইবে, ফলে আমি তাকে দিব? কে এমন আছে যে আমাকে ডাকবে, ফলে আমি তার ডাকে সাড়া দিব? কে এমন আছে যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে, ফলে আমি তাকে ক্ষমা করব? এভাবেই তিনি বলতে থাকেন যতক্ষণ না সুবহে সাদিক উদিত হয়"।

অপর শব্দে হাদীসটি হচ্ছে, "যখন রাতের দুই-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে, তখন রব নিকটতম আসমানে নেমে আসেন।" অপর বর্ণনায় এসেছে, "আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দাদের ব্যাপারে আমি নিজে ছাড়া কেউ জিজ্ঞেস করবে না, কে আছো যে আমার কাছে চাইবে, আর আমি তাকে তা দিব?"

আর 'আমর ইবন 'আবাসার বর্ণনায় এসেছে, নিশ্চয় মহান রব নেমে আসেন রাতের মাঝামাঝি সময়ে নিকটতম আসমানে।" (মাজমু' ফাতাওয়া (৫/৩৯৪)।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রথম আসমানে নেমে আসার ব্যাপারে যেসব হাদীস এসেছে তাতে তিন প্রকার শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, **১। আন নুজুল, ২। আল হুবুত, ৩। আত-তাদাল্লী** এসব শব্দের অর্থ হচ্ছে অবতরণ করা। বিভিন্ন শব্দে একই বিষয়ের বর্ণনা সে বিষয়ের বাস্তবতাকে আরও শক্তিশালী করে। এ ব্যাপারে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ'র একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রয়েছে, যার নাম "শারহু হাদীসিন নুযূল"। বিস্তারিত জানার জন্য তা দেখা যেতে পারে।

আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নিকটতম আসমানে নেমে আসা তাঁর আরশের উপরে থাকার সাথে সাংঘর্ষিক নয়

সাহাবায়ে কেরাম, তাবে'য়ীনে 'ইযাম, আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীন, ফুকাহা, মুহাদ্দিসীন যুগ যুগ ধরে বিশ্বাস করে এসেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের উপর উঠেছেন, তিনি 'আরশের উপর সমুন্নত। তিনি 'আরশের উপর যেমন সত্য, তেমনি তিনি নিকটতম আসমানে নেমে আসেন এটাও সত্য। এর মধ্যে কোনো বিরোধ নেই।

কিন্তু দেখা যায় যুগ যুগ ধরে কিছু মানুষ আল্লাহ তা'আলার এ গুণটিকে অস্বীকার করে থাকে, তাদের কেউ বলে, স্থান পরিবর্তন আল্লাহর অতুলনীয়ত্বের

সাথে সাংঘর্ষিক। কেউ কেউ বলেন, তিনি 'আরশ থেকে অবতরণ করলে 'আরশ কি শূন্য থাকে? তারা সাধারণত দু'ভাগে তা অস্বীকার করে থাকে:

এক. তাত্বীল বা অর্থহীন করার মাধ্যমে। এ বিশেষণটিকে প্রাচীনকালে কিছু পথভ্রষ্ট ফির্কা জাহমিয়্যাহ ও মু'তাযিলারা অস্বীকার করতো। এখনো আশায়েরা ও মাতুরিদিয়াদের একটি গোষ্ঠী এটাকে নিজেদের মত হিসেবে ব্যক্ত করে, তবে সরাসরি না বলে এগুলোকে মুতাশাবিহ আয়াত বা হাদীস বলে, অর্থ কেবল আল্লাহ জানে, এটা বলে তথাকথিত তাফওয়ীদ্ধ নীতি অবলম্বন করে থাকে।

দুই. বিভিন্নভাবে তা'ওয়ীল বা অপব্যাখ্যার মাধ্যমে তার মূল স্পষ্ট অর্থকে পরিবর্তন করার মাধ্যমে। এ কাজটি সবচেয়ে বেশি করে পরবর্তী আশায়েরা ও মাতুরিদী সম্প্রদায়ের লোকেরা। যেমন, মাতুরিদী, তা'ওয়ীলাতি আহলিস সুন্নাহ (১/৪৩৬) তাদের এসব অপব্যাখ্যার নীতিকে তারা নিম্নোক্তভাবে ব্যক্ত করে:

১- কেউ কেউ বলেন, অবতরণ অর্থ নৈকট্য লাভ করা। (মাতুরিদী, তা'ওয়ীলাতি আহলিস সুন্নাহ (১/৪৩৬)।

২- কেউ কেউ বলে, অবতরণ করার অর্থ বিশেষ করুণা। (জুরজানী, শারহুল মাওয়াক্বিফ (৮/২৫)।

৩- কারও কারও মতে, এর অর্থ ফিরিশতা অবতরণ করা। (মাকালাতুল কাউসারী পৃ. ৩৪৯।)

৪- কারও কারও মতে, অবতরণ করা অর্থ, তাদের দিকে নজর দেয়া। (আবুল মু'ঈন আন-নাসাফী, বাহরুল কালাম পৃ. ২৩; বিস্তারিত দেখুন, তা'ওয়ীলাতি আহলিস সুন্নাহ (১/৮৪)।

তাদের এসব বক্তব্য সম্পূর্ণরূপে পূর্বে বর্ণিত সহীহ সুন্নাহ'র ভাষ্য বিরোধী। এভাবে হাদীসের অর্থ বিকৃত করার এ নীতি তারা জাহমিয়্যাহ ও মু'তাযিলাদের থেকেই নিয়েছে। মূল কারণ হচ্ছে স্রষ্টার গুণকে সৃষ্টির গুণের সাথে তুলনা করা। তারপর সে গুণগুলোকে অস্বীকার কিংবা অপব্যাখ্যা করা। (এ ব্যাপারে বিস্তারিত জবাব জানতে দেখুন, শাইখ শামস আল-আফগানী, আল-মাতুরিদিয়্যাহ ওয়া মাওকেফুহুম মিন তাওহীদিল আসমা ওয়াস সিফাত (৩/৩০)।

প্রকৃতপক্ষে মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলাকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করে চিন্তা করাটাই একটা ভুল চিন্তা। স্রষ্টা আর সৃষ্টি কখনো এক নয়, স্রষ্টা ও সৃষ্টির ক্ষেত্রে একই স্ট্যান্ডার্ড দিয়ে চিন্তা করাটা একটা ত্রুটিপূর্ণ ও দূষিত চিন্তা। আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি সম্পর্কে ইমাম আবু জাফর ত্বাহাবী বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মানবীয় কোনো গুণ আরোপ করবে, সে কাফির হয়ে যাবে। অতএব, যে ব্যক্তি এতে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করবে সে শিক্ষা নিতে সক্ষম হবে। আর (আল্লাহ সম্পর্কে) কাফিরদের মতো নিরর্থক কথা বলা হতে বিরত থাকবে এবং সে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর গুণাবলিতে মানুষের মতো নন।" কাজেই আল্লাহ তা'আলাকে মানুষ বা সৃষ্টিজগতের মাত্রা বা dimension থেকে চিন্তা করাটা কোনো ইসলামী বিশ্বাস নয়। এখানেই যত বিভ্রান্তি লুকায়িত। আহলুস সুন্নাতের ইমামগণ অন্যান্য গুণের মত আল্লাহ তা'আলার 'অবতরণ' সিফাতটিকেও তুলনামুক্তভাবে মেনে নেন। তিনি যখন এবং যেভাবে ইচ্ছা অবতরণ করেন। তাঁর অবতরণ কোনোভাবেই কোনো সৃষ্টির অবতরণের মতো নয়। তাঁর অবতরণের স্বরূপ ও প্রকৃতি কি তা আমরা জানি না এবং জানার চেষ্টাও করি না। ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহকে মহান আল্লাহর অবতরণ বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। তিনি উত্তরে বলেন: **ইয়ানজিলা বিলা কাইফিন**। "(মহান আল্লাহ) অবতরণ করেন, কোনোরূপ পদ্ধতি বা স্বরূপ ব্যতিরেকে।" (বাইহাকী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত ২৩৮০; মোল্লা আলী কারী আল-হানাফী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ৬৯)

সহীহ বুখারীতে সিফাত-সংক্রান্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ এর বক্তব্য উল্লেখ করেছেন ইবন রজব আল-হাম্বলী রাহিমাহুল্লাহ। তাতে এসেছে, "...আমি আবু আবদুল্লাহকে (আহমাদ ইবন হাম্বল) বললাম, "আল্লাহ কি দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন? তিনি বললেন, "হ্যাঁ"। আমি বললাম, "তাঁর অবতরণ কি ইলম (জ্ঞান) দিয়ে অথবা কী দিয়ে?" তিনি বললেন, "এই বিষয়ে চুপ করো। তোমার কী দরকার এ বিষয়ে? হাদীসে যেভাবে 'কীভাবে' বা সীমা ছাড়া বর্ণিত হয়েছে সেভাবে মেনে নাও। তবে কোনো আছার বা হাদীস যদি বর্ণিত হয়, তাহলে ভিন্ন কথা অথবা যদি কিতাবে বর্ণিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন, "অতএব, আল্লাহর কোনো সদৃশ সাব্যস্ত করো না।" (সূরাহ আন-নাহল, আয়াত: ৭৪) এর পরে ইবন রজব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "(আল্লাহর) 'অবতরণ' বিষয়ে যা বর্ণিত হয়েছে, তার উপর নড়াচড়া, স্থানান্তর, 'আরশ থেকে খালি হওয়া, না থাকা এ সকল

কিছু সাব্যস্ত করা বিদ'আত। এ ব্যাপারে গভীরে অনুসন্ধান করা কোনো প্রশংসনীয় কাজ নয়।" (ইবন রাজাব, ফাতহুল বারা (৯/২৮০-২৮১)।

ইমাম আবু জাফর আত-ত্বাহাওয়ী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আর আরশ এবং কুরসী সত্য। আর আল্লাহ তা'আলা 'আরশ ও অন্যান্য বস্তু থেকে অমুখাপেক্ষী। তিনি সমস্ত বস্তুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি সবকিছুরই ঊর্ধ্বে। সৃষ্টিজগত তাঁকে পূর্ণভাবে আয়ত্ব করতে অক্ষম।" আরও বলেন, "আল্লাহ তা'আলা স্থান ও সময়ের স্রষ্টা।"

আল্লাহ তা'আলা ব্যক্তি, বস্তু, সময় বা স্থান কোনো কিছুরই মুখাপেক্ষী নন এবং তিনি এগুলোর ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। কাজেই আল্লাহ তা'আলার জন্য এটা খুবই সহজ যে আল্লাহ তা'আলা আরশের উপরে থাকবেন এবং শেষ রাতে নিকটতম আসমানে অবতরণ করবেন। পৃথিবীর কোথাও না কোথাও সব সময়ে শেষ রাত থাকলেও আল্লাহ তা'আলার জন্য তা কঠিন কিছু নয় । আল্লাহ তা'আলার 'আরশের ঊর্ধ্বারোহন কিংবা শেষ আসমানে অবতরণ মোটেও মানুষ বা অন্য কোনো সৃষ্টির মতো নয়। পথভ্রষ্ট বিদ'আতী আকীদাহ'র মানুষেরা সৃষ্টির সাথে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলিকে মিলিয়ে ফেলে ত্রুটিপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করে পথভ্রষ্টতায় নিপতিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার সিফাত সংক্রান্ত হাদীসে কোনো প্রকারের অসঙ্গতি বা অযৌক্তিক কিছু নেই। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "এখানে সালাফগণের সে কথাটিই বিশুদ্ধ, যাতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা নিকটতম আসমানে অবতরণ করেন আর 'আরশ তার থেকে খালি হয় না। একজন মানুষের রূহ তার শরীরে থাকে, রাত-দিন আমৃত্যু তার সাথে থাকে, ঘুমের সময় উপরে উঠে যায়, 'আরশের নিচে সাজদাহ করে, অথচ সেটা তার শরীর ছেড়ে একেবারে চলে যায়নি। অনুরূপভাবে মানুষ যখন সাজদায় থাকে তখন সে তার রবের সবচেয়ে নিকটে থাকে অথচ তার রূহ তার শরীরেই রয়েছে। আর রূহের বিধান শরীরের বিধানের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। তাহলে ফিরিশতাদের অবস্থা তো আরও ব্যতিক্রম। আর রাব্বুল আলামীনের অবস্থা যে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম হবে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর রাতেরও রয়েছে বিভিন্ন অবস্থা, প্রাচ্যে যখন রাতের এক- তৃতীয়াংশ হয় তখন সেটা পাশ্চাত্যের এক-তৃতীয়াংশের আগে হবেই, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা আল্লাহর অবতরণ করার জন্য যে সময় প্রাচ্যের লোকদের জন্য তাদের আসমানে ঘোষণা করেছেন তা অবশ্যই পাশ্চাত্যের লোকদের আসমানের সময় থেকে ভিন্ন হবেই। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা এমন এক সত্তা, যাঁর কোনো অবস্থা

অপর কোনো অবস্থার জন্য বাধা হয় না। অনুরূপভাবে কারও কথা শোনা অপর কারও শোনা থেকে বাঁধা হয় না। অনবরত অসংখ্য একই সাথে করা চাওয়া তাঁর কোনো সমস্যা তৈরি করে না। বরং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর বান্দাদের সাথে কিয়ামতের দিন কথা বলবেন, তাদের হিসাব নিবেন, একটি করতে অপরটি তার জন্য বাঁধা হবে না। ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন সবার সাথে একই সময় কীভাবে কথা বলবেন? তখন তিনি বলেন, যেমন তিনি সবাইকে একই সময় রিযিক দিচ্ছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আহ্বানকারীদের আহ্বান, তাঁর কাছে যাচনাকারীদের প্রার্থিত জিনিস প্রদান করেন, যদিও তাদের ভাষা হয় বিবিধ, তাদের প্রয়োজনও বহুবিধ। তাছাড়া মানুষের মাঝেও কারও কারও শ্রবণশক্তি এমন ক্ষুরধার হয় যে, এক সাথে কয়েকজনের কথা শুনতে সক্ষম হন, যেমনটি দেখা যায় কোনো কোনো কারী সাহেব একাধিক ছাত্রের পড়া একসময় শুনেন, তবে সেটা খুব স্বল্প সংখ্যক লোকের মাঝেই তা হতে পারে। অনুরূপ কাউকে কাউকে দেখা যায় তার অন্তরে সে উপস্থিত অনুপস্থিত কারও প্রতি টান, নৈকট্য ও ঝোঁক অনুভব করে, সে সময়েই তিনি অপরের জন্য তা অনুভব করেন না। এ যদি হয় মানুষের অবস্থা, তাহলে মহান রব তো অনেক বেশি প্রশস্ত জ্ঞানী, যাঁর শোনা যাবতীয় আওয়াজকে একই সাথে ধারণ করতে পারে, তাঁর দান তো সকল প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট। মানুষের মাঝে কেউ কেউ এ জায়গায় ভুল করে, সে মনে করে থাকে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য মানুষের নড়াচড়া জাতীয় কিছু বুঝি, যখন সে কোনো দিকে ঝুঁকে তখন সে অন্য দিক থেকে প্রত্যাবর্তন করেই তা করতে হয়, সে তার অন্তরের কর্মকে দেখতে পায় যে তা তার শরীরের কর্মের বিপরীত করে চলেছে। তারপরও সে দেখতে পায় তার অন্তর অনেক মানুষের নৈকট্য লাভ করেছে অথচ তাদের কারও নৈকট্য লাভ করতে তাকে অপর কারও কাছ থেকে সরে আসতে হয়নি।" (মোজমূ' ফাতাওয়া (৫/১৩৩), (৫/২৪৭)।

আল্লাহ তা'আলার নিকটতম আসমানে অবতরণ সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন ও তার উত্তর

প্রশ্নঃ এটা কি বলা যাবে যে, আল্লাহ তা'আলা সত্তাগতভাবে অবতরণ করেন?

উত্তরঃ এ ব্যাপারে তিনটি মত পরিলক্ষিত হয়,

এক. প্রথম গোষ্ঠী বলেন, তিনি সত্তাগতভাবে অবতরণ করেন এটা বলা যাবে। এ মতটি আবুল কাসেম আল-আসবাহানীর দিকে সম্পৃক্ত করা হয়। ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, এটি একদল আহলুল হাদীস ও আহলুস সুন্নাহ'র মত।

দুই. দ্বিতীয় গোষ্ঠী বলেন, তিনি সত্তাগতভাবে অবতরণ করেন না।

তিন. তৃতীয় গোষ্ঠী বলেন, বলা হবে তিনি অবতরণ করেন, কিন্তু সত্তাগত কিংবা সত্তাগতভাবে নয় কোনোটিই বলা যাবে না, সেভাবেই বলতে হবে যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আর যা হতে চুপ ছিলেন তা থেকে চুপ থাকতে হবে। (ইবনুল কাইয়্যেম, মুখতাসারুস সাওয়া'য়িক (২/২৫২-২৫৩)। এখানে বিশুদ্ধ মত হচ্ছে তৃতীয়টি।) এখানে বিশুদ্ধ মত হচ্ছে তৃতীয়টি।

প্রশ্নঃ আল্লাহ তা'আলার অবতরণ কি নড়াচড়া সহ নাকি নড়াচড়া ব্যতীত?

উত্তর: এখানে চারটি মত রয়েছে।

এক. প্রথম গোষ্ঠী বলেন, অবতরণ আবার নড়াচড়া ও স্থানচ্যুত হওয়া ব্যতীত হয় নাকি, তাই নড়াচড়া ও স্থানচ্যুত হওয়া বলা যাবে। এমতটি ইমাম উসমান ইবন সা'ঈদ আদ-দারেমী, আবু আবদুল্লাহ ইবন হামেদ, হারব ইবন ইসমা'ঈল আল-কিরমানীর।

দুই. দ্বিতীয় গোষ্ঠী বলেন, অবতরণ নড়াচড়া ও স্থান পরিবর্তন বলা যাবে না। এটি ইমাম আবু সুলাইমান আল-খাত্তাবী, আবুল হাসান আত-তামীমী, তার দুই ছেলে আবদুল ওয়াহেদ ও আবদুল ওয়াহহাব ও ইবনুয্ যাগূনীর মত।

তিন. তৃতীয় গোষ্ঠী বলেন, এ অর্থটি সাব্যস্ত হবে, তখন শব্দটি বলা যাবে না; কারণ তা কোনো হাদীসে আসেনি। এটি কোনো কোনো আহলুল হাদীসের মত, অনুরূপ তা ইবন আবদুল বার এরও মত। (ইবন আব্দিল বার, আত-তামহীদ (৭/১৩৬-১৩৭)।

চার. চতুর্থ গোষ্ঠী বলেন, এ ব্যাপারটিতে কিছু না বলে চুপ থাকতে হবে। এ মতটি ইমাম ইবন বাত্তাহ, আবু বকর আবদুল আযীয ইবন জাফর, (খাল্লালের ছাত্র) এটি অনেক আহলুল হাদীস ও ফকীহগণের মত। বস্তুত এ

চতুর্থ মতটিই বিশুদ্ধ। এটি বলা যাবে না, অস্বীকারও করা যাবে না। কারণ, তা মুজমাল বা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ্য বাক্য । (ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (১৬/৪২৩-৪২৪)।

প্রশ্নঃ আল্লাহ তা'আলা যখন অবতরণ করেন, তখন কি 'আরশ শূন্য হয়ে যায়?

উত্তরঃ এ ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে তিনটি মত রয়েছেঃ (ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/৩৮০-৩৯৬)।

এক. প্রথম গোষ্ঠী বলেন, খালি হয়ে যায়, এমতটি ইমাম আবদুর রহমান ইবন মুহাম্মাদ ইবন মানদাহ রাহিমাহুল্লাহ পোষণ করতেন।

দুই. এ ব্যাপারে কোনো কথা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে। এটি ইমাম আবদুল গনী আল- মাক্বদেসী ও কোনো কোনো আহলে হাদীসের মত।

তিন. 'আরশ তাঁর থেকে খালি হয় না। এটি অধিকাংশ আহলুস সুন্নাতের মত। এটি ইমাম আহমাদ, ইসহাক্ব ইবন রাহওয়াইহ, হাম্মাদ ইবন যায়েদ, উবাইদুল্লাহ ইবন বাত্ত্বাহ প্রমুখ আলেমগণের।

বস্তুত তৃতীয় মতটিই বিশুদ্ধ । (ইবন তাইমিয়্যাহ, ফাতাওয়া (৫/২৪২); শারহু হাদীসিন নুযুল পৃ. ১৬১, ২৩২-২৩৩।)

প্রশ্নঃ আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর উঠা, 'আরশের উপর অবস্থান, নিকটতম আসমানে নেমে আসার বিষয়ে হাদ্দ বা 'পার্থক্যকারী সীমা আছে' বলা যাবে?

উত্তরঃ এ ব্যাপারে তিনটি মত রয়েছেঃ

এক. প্রথম গোষ্ঠী বলেন, হাদ্দ বা সীমা আছে বলা যাবে, এ মতের স্বপক্ষে ছিলেন, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, ইমাম উসমান ইবন সা'ঈদ আদ-দারেমী, ইসহাক্ব ইবন ইবরাহীম ইবন রাহওয়িয়াহ, হারব ইবন ইসমা'ঈল আল-কিরমানী, ইয়াহইয়া ইবন আম্মার, কাদ্বী আবু ইয়া'লা, আদ-দিশতী। আর তা ইমাম আহমাদ থেকেও একটি বর্ণনা।

দুই. দ্বিতীয় গোষ্ঠী বলেন, হাদ্দ বা সীমা আছে বলা যাবে না। এ মতের প্রবক্তাদের অন্যতম হচ্ছেন ইবন হিব্বান, আবু সালামাহ ইবনুল মাজেশূন, আবু নসর আত-তাম্মার, আবু হাতেম আল-বুসতী, আত্ব-ত্বাহাওয়ী, ইয়াহইয়া ইবন মাঈন। আর এটি ইমাম আহমাদের একটি মত।

তিন. তৃতীয় গোষ্ঠী বলেন, হাদ্দ আছে বা নেই সরাসরি বলা যাবে না, অস্বীকারও করা যাবে না। কারণ, তা মুজমাল বা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ্য বাক্য। জিজ্ঞাসা করা হবে, হদ্দ বা সীমা বলতে কী বুঝ? যদি বলে যে, তা দ্বারা উদ্দেশ্য সৃষ্টিকুল থেকে আলাদা অর্থে, তাহলে তা সত্য ও সঠিক, ইমামগণের মধ্যে যারা হদ্দ সাব্যস্ত করেছেন, তারা এ অর্থেই সাব্যস্ত করেছেন। আর যদি বলে হদ্দ দ্বারা উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ বুঝানো, তাহলে তা অস্বীকার করতে হবে। ইমামগণের মধ্যে যারা অস্বীকার করেছেন, তারা এ অর্থেই অস্বীকার করেছেন। (ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউ তা'আরুদ্বুল আকলি ওয়ান নাকলি (২/৩৪-৩৫); আরও বিস্তারিত জানার জন্য দেখা যেতে পারে, হামাদ আত-তুওয়াইজরী, আল-মাসায়িলুল আকাদিয়্যাহ আল্লাতী তা'আদ্দাদাত ফীহা আরায়ি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আতি পৃ. ২-৫।)

'আল্লাহ তাআলার আরশের উপর উঠা' এ গুণটির ক্ষেত্রেও আশায়েরা ও মাতুরিদী সম্প্রদায়ের লোকেরা একই নীতি অবলম্বন করে বলে, "আমাদের পূর্ববর্তীগণ এগুণটির তাফসীর করতেন না, এ গুণটি নিয়ে কথা বলতেন না; যেমনটি এরূপ অন্যান্য গুণের ব্যাপারে তাদের নীতি ছিল। (আল-আসমা ওয়াস সিফাত -৫১৪) ইবন জামা'আহ 'ইস্তেওয়া' শব্দের বিভিন্ন অর্থ উল্লেখ করার পর বলেন, 'সালাফগণ ও ব্যাখ্যাকারগণ একমত যে, এগুলো থেকে যা মহান আল্লাহর মর্যাদার সাথে উপযোগী নয় তা উদ্দেশ্য হবে না, যেমন বসা, সোজা হওয়া। তারপর তারা এর সম্ভাবনাময় অন্যান্য অর্থ নিয়ে মতভেদ করেছেন; যেমন, ইচ্ছা করা, অধিকার করা ইত্যাদি। কিন্তু সালাফগণ এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন আর তা'ওয়ীলকারীগণ এগুলোকে অধিকার করা, অধিনস্থ করার অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন; কারণ রবকে দেহের বিভিন্ন চিহ্ন যেমন জায়গা ও স্থান থেকে মুক্ত করতে হবে।

অনুরূপ বাইজুরী 'ইস্তেওয়া' এর ব্যাপারে সালাফদের অবস্থান তুলে ধরে বলেন, 'যখন কুরআন ও সুন্নাহয় এমন কোনো কিছু আসবে যাতে দিক, দেহ, সূরত অথবা অঙ্গ বুঝাবে তখনই মুজাসসিমা ও মুশাব্বিহা ব্যতীত আহলে হক ও অন্যান্যরা একমত হয়েছেন যে, সেটাকে তা'ওয়াল করে নিতে হবে।' তারপর তিনি কিছু উদাহরণ পেশ করে বলেন, তন্মধ্যে রয়েছে, আল্লাহর বাণী 'রহমান তার 'আরশের উপর ইস্তেওয়া করেছেন'। সালাফগণ বলতেন, 'ইস্তেওয়া' কী তা আমরা জানি না। খালাফগণ বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, দখল করা বা মালিক হওয়া। প্রাচীন ও আধুনিক আশ'আরী-মাতুরিদী সম্প্রদায়ের লোকেরা আল্লাহ তা'আলার 'ইস্তেওয়া' গুণটির অর্থ না করার জন্য

'তাফওয়ীদ্ব' ও তা'ওয়ীল নীতি গ্রহণ করে সেটাকে সালাফদের দিকে সম্পর্কযুক্ত করার জন্য যাবতীয় প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে চলেছেন। [তারা ইমাম মালেকের বক্তব্যকে অপব্যাখ্যার নীতি অবলম্বন করেছে। ইমাম মালেকের ছাত্রগণ ও বড় বড় ইমামগণ যুগ যুগ ধরে যা বুঝেছেন তারা তার বিপরীত অপব্যাখ্যা নিয়ে হাজির হয়েছে।] এ ব্যাপারে তাদের ভাষ্য অনেক। অনেকে এসব ভাষ্য সত্য মনে করেই মেনে নিচ্ছে, বস্তুত তা ইমামগণের বক্তব্যের অপব্যাখ্যা যা আমরা অচিরেই জানব ইনশাআল্লাহ।

আশআরী-মাতুরিদী আলিমগণের নিকট সালাফগণের বক্তব্যঃ

"আল্লাহর 'আরশের উপর ইস্তেওয়া' ('আরশের উপর উঠা) এ গুণটি নিয়ে আশ'আরী-মাতুরিদী আলেমগণের সমস্যা হলো, তারা বিশ্বাস করে, এ গুণ ও অনুরূপ কর্মবাচক গুণাবলি দ্বারা বাতিল অর্থ সাব্যস্ত করা আবশ্যক হয়ে পড়ে, যা আল্লাহ তা'আলার দিকে সম্পৃক্ত করা বৈধ হবে না; কারণ এর দ্বারা শরীর/দেহ সাব্যস্ত হয়ে যায়, এর দ্বারা সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে যায়, তাই তারা এগুলোর প্রকাশ্য হিসেবে যা বুঝেছে তা নেয়া হারাম ঘোষণা করে, আর সেগুলোর অর্থ আল্লাহর দিকে সোপর্দ করে দেয়, এগুলোর অর্থ খোঁজ করা থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব মনে করে থাকে, এগুলো নিয়ে আলোচনা করা থেকে বিরত থাকা বরং নীরব থাকার নীতি আবশ্যক করে নেয়। আর যারাই এগুলো নিয়ে আলোচনা করে অথবা যারা এগুলোর প্রকাশ্য অর্থ যা পাঠক মাত্রই স্বাভাবিকভাবে বুঝতে পারে সে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে তাদেরকে সঠিক পথবিচ্যুত গণ্য করে, তাদেরকেই মুশাব্বিহা, মুজাসসিমা, দেহবাদী, ইত্যাদি খারাপ গুণে গুণান্বিত করে।

"ইস্তেওয়া 'আলাল 'আরশ" ('আরশের উপর উঠা) এ গুণটি সম্পর্কে সালাফে সালেহীনের প্রকৃত অবস্থানঃ

আশ'আরী-মাতুরিদী আলেমদের বক্তব্য তুলে ধরার আগে "ইস্তেওয়া 'আলাল 'আরশ" সম্পর্কে সালাফগণের প্রকৃত মত তুলে ধরা দরকার। বস্তুত সালাফে সালেহীন বিশেষ করে আমাদের পূর্ববর্তী সালাফগণ আল্লাহ তা'আলার এ গুণটি নিয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন; কারণ তখন জাহমিয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়েছিল, তারা এ গুণটিতে তাহরীফ তথা বক্রপথ ও তা'ত্বীল বা এটাকে অর্থশূন্য করার পিছনে ছুটেছিল। তখন সালাফে সালেহীন এ গুণটি সাব্যস্ত করা নিয়ে প্রচুর আলোচনা ও লেখালেখি করেন, এমনকি অনেকে এর ওপর আলাদা গ্রন্থও লিখেছেন [যেমন, যাহাবী, আল-উলু, আল-আরশ, আল-

আরবাঈন, ইবনুল কাইয়েম, ইজতিমা'উল জুয়ূশিল ইসলামিয়্যাহ, ইবন আব্দুল হাদী, আলকালামু আলা মাসআলাতিল ইস্তেওয়া আলাল 'আরশ]। সেসব বক্তব্য, আলোচনা, লেখালেখি ও আলাদা গ্রন্থগুলোর পর্যালোচনা আমাদেরকে এ গুণ এবং অনুরূপ গুণের ব্যাপারে সালাফে সালেহীনের সঠিক অবস্থান জানতে সাহায্য করবে।

এসব বিষয়ে সালাফে সালেহীনের বক্তব্য এত বেশি যে, সেগুলোকে যদি পর্যালোচনা করি তাহলে আমাদের কাছে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, আশা'য়েরা ও মাতুরিদিয়ারা অনেকে যেভাবে এ গুণ ও এ জাতীয় গুণগুলোকে তাফওয়ীদ্ব এর নাম দিয়ে অর্থশূন্য করেছে, অর্থ নিয়ে আলোচনা নিষিদ্ধ করেছে, অর্থ নিয়ে নীরব থাকা জরুরী মনে করেছে, সালাফদের বক্তব্য সম্পূর্ণরূপে তার বিপরীত। বরং সালাফদের বক্তব্য থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, তাঁরা এসব গুণের প্রকাশ্য অর্থ সাব্যস্ত করতেন, মেনে নিতেন, সে অর্থ সাব্যস্ত করার জন্য সংগ্রাম করতেন। সালাফে সালেহীন এ সিফাতগুলোর অর্থ সাব্যস্ত করতেন তার প্রমাণ:

আলোচনার সুবিধার্থে আমরা সেটাকে চারভাগে বিভক্ত করতে পারি:

এক. সালাফে সালেহীন 'ইস্তেওয়া' শব্দের অর্থ করেছেন এবং তারা সেটাকে আভিধানিক বাস্তব অর্থে ব্যবহার করেছেন:

অনেক সালাফ থেকে আমরা পাই যে, তাঁরা 'ইস্তেওয়া' শব্দটিকে তার ভাষাগত অভিধান অনুযায়ী তাফসীর করেছেন, অভিধানের সূত্র ধরে তা দ্বারা কী কী বুঝায় তা মানার ব্যাপারে তাদের ঘোষণা, তা অপরের কাছে পৌঁছানো আর তার অর্থের দাবি গ্রহণ করে নেয়ার আবশ্যকতা তুলে ধরেছেন।

সালাফে সালেহীন থেকে **'ইস্তেওয়া'** গুণটির যে অর্থ এসেছে, তা কয়েকটি শব্দে তারা ব্যক্ত করেছেন, তারা কখনো বলেছেনে, **('উলু)** বা সর্বোচ্চে উঠা, কখনো বলেছেন, **(ইরতেফা')** বা উপরে উঠা, কখনো বলেছেন, **(সা'আদা)** বা আরোহন করা, আবার কখনো বলেছেন, **(ইস্তাকাররা)** বা উপরে থাকা। নিম্নে আমরা তার কয়েকটি বর্ণনা করব:

ইমাম বাইহাক্বী ও অন্যান্যগণ ভাষাবিদ ফাররা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেছেন, "সুম্মাস্তাওয়া" এর অর্থ উপরে উঠলেন ।

অপর বর্ণনায় ইবন ‘আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে এসেছে, তিনি বলেছেন এর অর্থ সমুন্নত হলেন ।

ইমাম বুখারী তা’লীক পদ্ধতিতে প্রখ্যাত তাবেয়ী আবুল আলীয়া থেকে বর্ণনা করেন যে, **‘ইস্তাওয়া ইলাস সামায়ি’** এর অর্থ, (সা‘আদা) উপরে উঠলেন।

আর তিনি প্রখ্যাত তাবে‘য়ী মুজাহিদ ইবন জাবার থেকে বর্ণনা করলেন, **‘ইস্তেওয়া’** এর অর্থ, (‘আলা) আরশের উপরে উঠলেন।

ইমাম ইবন জারীর আত-তাবারী রাহিমাহুল্লাহ প্রখ্যাত তাবে‘য়ী রবী’ ইবন আনাস থেকে বর্ণনা করেন, **“সুম্মাস্তাওয়া ইলাস সামায়ি”** এর অর্থ সম্পর্কে রবী‘ হচ্ছে, ইরাতাফা‘আ ইলাস সামায়ি’ বা উপরের দিকে উঠলেন।

আর এ জন্য অনেক সালাফ মহান আল্লাহর বাণী ।

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ -

এটাকে আল্লাহ তা‘আলার সত্তাগত উপরে থাকার বিষয়ের দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। (আল-বাক্বারাহ-২৯)

ইমাম লালেকাঈ প্রখ্যাত আল-ইমাম, আস-সাবত, আল-হাফেয, ইমাম ইসহাক্ব ইবন রাহওয়াই এর উস্তাদ, হাদীসের ছয় কিতাবের হাদীস বর্ণনাকারী, বিশর ইবন ‘উমার থেকে বর্ণনা করেন, ‘আমি একাধিক মুফাসসিরকে বলতে শুনেছি, আর রাহমানু আলাল আরশিস তাওয়া এর অর্থ হচ্ছে, (ইরাতাফা‘আ) বা উপরে উঠলেন।

অনুরূপ ইমাম লালেকাঈ ও অন্য অনেকেই বিখ্যাত আরবী ভাষাবিদ ‘নিফতাওয়াইহ’ এর মাধ্যমে ভাষাবিদ ইবনুল আ‘রাবী থেকে বর্ণনা করেন, এক লোক তার কাছে এসে বললো, আল্লাহর বাণী আর রাহমানু আলাল আরশিস তাওয়া করুন। এর অর্থ কী? তিনি তখন বললেন, তিনি তাঁর ‘আরশের উপর যেমনটি মহান আল্লাহ জানিয়েছেন। তখন লোকটি বললো, হে আবু আব্দুল্লাহ, এটা তো এর অর্থ নয়, এর অর্থ তো ‘ইস্তাওলা’ বা অধিকার করা, তখন ইবনুল আরাবী বলেন, চুপ কর, তুমি এটার কী বুঝ? কোনো কিছুর ওপর তখনই অধিকার করার কথা আসবে যখন তার বিপক্ষ থাকে, তারপর যখন কেউ সেটাতে জয়লাভ করে তখন বলে ‘ইস্তাওলা’ বা অধিকার করল। এর মাধ্যমে ইবনুল আ‘রাবী ‘ইস্তেওয়া’ শব্দটির ব্যাপারে প্রশ্ন করা যায় স্বীকার

করলেন, সাথে সাথে তিনি সেটার উত্তরও দিলেন। যদি তার মত হতো 'তাফওয়ীদ্ব' বা অর্থ না করে ছেড়ে যাওয়া, তাহলে প্রশ্নের শুরুতেই অস্বীকার করতেন। তাছাড়া তিনি প্রশ্নকারীর ওপর ভুল অর্থ প্রদানকেই অস্বীকার করেছেন, প্রশ্ন করা ও অর্থ জানাকে অস্বীকার করেননি।

ইমাম ফকীহ, মুফাসসির আবুল ফাতহ সুলাইম ইবন আইয়্যুব ইবন সুলাইম আর-রাযী, আবু হামেদ আল-ইসফারায়ীনীর ছাত্র, খতীব আল-বাগদাদীর উস্তাদ, তিনি বলেন, **আর রাহমানু আলাল আরশিস তাওয়া** এর অর্থ সম্পর্কে আবু উবায়দা বলেন, ('আলা) 'উপরে উঠল'। অন্যরা বলেন, (ইস্তাকাররা) অবস্থান করলেন।

আর ইমাম বাগাওয়ী বলেন, **"সুম্মাস্তাওয়া আলাল আরশ"** এর অর্থ কালবী ও মুকাতিল করেছেন, (ইস্তাকাররা) অবস্থান করলেন। আর আবু উবায়দা মা'মার ইবনুল মুসান্না বললেন, ('আলা) উপরে উঠলেন।

তাফসীরকার ও ভাষাবিদগণ কর্তৃক এসব অর্থ বর্ণনা প্রমাণ করে যে, তারা 'ইস্তেওয়া' এর অর্থ খোঁজতেন, খোঁজ করাকে নিষিদ্ধ মনে করতেন না, চুপ বা নীরবও থাকতেন না।

অনুরূপভাবে ইমাম লালেকাঈ আবুল আব্বাস সা'লাব নামক প্রখ্যাত ভাষাবিদ থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেছেন, "ইস্তাওয়া আলাল আরশ" এর অর্থ 'আরশের উপর উঠলেন, তারপর বলেন, এটাই আরবী ভাষা থেকে বুঝা যায়।

আর আখফাশ বলেন, আর রাহমানু আলাল আরশিস তাওয়া এর অর্থ, ('আলা) বা উপরে উঠলেন, যেমন বলা হয়, বাহনের উপর ইস্তেওয়া করলাম, ঘরের ছাদে ইস্তেওয়া করলাম, অর্থাৎ উপরে উঠলাম।

ইমাম কাসসাব তার তাফসীরে বলেন, আল্লাহর বাণী সুম্মাস্তাওয়া আলাল আরশি এটা জাহমিয়াদের বিরুদ্ধে প্রমাণ; কারণ এখানে 'ইস্তেওয়া' এর অর্থ (ইস্তেকার) বা অবস্থান করা। সুতরাং সুম্মাস্তাওয়া আলাল আরশি এর অর্থ তারপর তিনি 'আরশের উপর অবস্থান করলেন ।

অনুরূপভাবে ইবন তাইমিয়্যাহ ইমাম ইবনুল মুবারকসহ অনেকের থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তারা 'ইস্তাওয়া' শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন 'ইস্তাকাররা' দিয়ে। তাদের সংখ্যা অনেক। তারা সবাই বলেছেন, সুম্মাস্তাওয়া আলাল আরশি । এর অর্থ 'আরশের উপর অবস্থান করলেন।

ইমাম মুযানী রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহর গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, সর্বজ্ঞ, সর্বখবর রাখনে ওয়ালা, সর্বোচ্চ, তাঁর 'আরশের উপর আরোহনকারী, তিনি জ্ঞানে সবার নিকটে।"

ইমাম ইবন কুতাইবাহ রাহিমাহুল্লাহ জাহমিয়াদের বক্তব্যের প্রতিবাদ করতে গিয়ে বলেন,

অর্থাৎ কীভাবে কারও জন্য এটা বলা সম্ভব যে, তিনি সব জায়গায় সর্বস্থানে প্রবেশ করে আছেন, অথচ আল্লাহর বাণী রয়েছে, আর রাহমানু আলাল আরশিস তাওয়া যার অর্থ, (রহমান 'আরশের উপর) অবস্থান করা। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ - (অতঃপর যখন আপনি এবং আপনার সাথে যারা আছেন তারা জাহাজের উপর) অবস্থান করবেন"। (মুমিনুন-২৮)

অনুরূপভাবে ইমাম ইবন জারীর আত-ত্বাবারী রাহিমাহুল্লাহ তার তাফসীরে কুরআনে কারীমের যত জায়গায় 'ইস্তেওয়া আলাল 'আরশ' এসেছে, সব জায়গায় অর্থ হিসেবে বাছাই করে নিয়েছেন, 'উলু ও ইরতিফা' (উপরে উঠা ও উর্ধ্বে উঠা) শব্দদ্বয়কে।

ইমাম ইবন আব্দুল বার 'ইস্তেওয়া' এর তাফসীরে বলেন, ইস্তেওয়ার অর্থ ইস্তেকারার ফিল উলু বা উপরে অবস্থান। এটি দিয়েই আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা সম্বোধন করেছেন এবং বলেছেন,

لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ -

"যাতে তোমরা এর পিঠে স্থির হয়ে বসতে পার, তারপর তোমাদের রবের অনুগ্রহ স্মরণ করবে যখন তোমরা এর উপর স্থির হয়ে বসবে।" [সূরাহ আয-যুখরুপ, আয়াত: ১৩](৯৬১) তারপর তিনি ভাষাবিদ ইমাম ও অন্যান্যদের থেকে বহু ভাষ্য বর্ণনা করেছেন। বস্তুত ইমাম ইবন আব্দুল বার উপরোক্ত কথা দিয়ে আমাদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নীতিমালার দিকনির্দেশ করছেন, যার ওপর সালাফে সালেহীনের মানহাজ প্রতিষ্ঠিত, তা হচ্ছে, "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সম্বোধন করেছেন, এমন শব্দে যা আরবী ভাষায় আমরা বুঝতে সক্ষম"; সুতরাং তাঁর কথা বুঝার জন্য আরবী ভাষার চাহিদা অনুযায়ীই আমাদের চলা জরুরী।

অনুরূপভাবে ইমাম কুরতুবী তার তাফসীরে এ বিষয়ে তাকীদ দিয়েছেন যে, সালাফে সালেহীন ইমামগণ বিশ্বাস করতেন যে, 'ইস্তেওয়া' বাস্তব একটি গুণ। তাই তিনি বলেন, "আর সালাফে সালেহীনের কেউ কোনোদিন আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর 'ইস্তেওয়া' বা উঠার বিষয়টি অস্বীকার করেননি। তবে 'আরশকে একান্তভাবে আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করার কারণ এটি তাঁর সর্ববৃহৎ সৃষ্টি। তবে তারা 'ইস্তেওয়া' বা আরশের উপরে উঠার ধরন জানেনি। কারণ এর প্রকৃত রূপ জানা যায় না। (আহকামুল কুরআন -৭/২১৯)

ইমাম আবু বকর ইবম মাওহাব আল-মালেকী, যিনি ইমাম ইবন আবী যায়েদ আল-ক্বাইরোয়ানী" এর রিসালার ব্যাখ্যা করেছেন, তিনি সালাফে সালেহীন ইমামগণের আকীদাহ'র সংক্ষিপ্ত রূপ বর্ণনায় বলেন, "তাঁরা তাঁর আরশের উপরে উঠার গুণটি স্বীকার করে নিয়েছে আরও স্বীকার করেছে যে, এটা বাস্তব অর্থেই কোনো রূপক অর্থে নয়।

এ হচ্ছে সামান্য কিছু তাফসীর যা সালাফে সালেহীন আলেমগণ থেকে আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর উঠা' এ গুণের ব্যাপারে এসেছে। আরও এমন বহু বর্ণনা আছে যা আমি এখানে উল্লেখ করিনি। এসব থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, 'আল্লাহ তা'আলার আরশের উপর উঠা' যা 'ইস্তেওয়া' গুণ নামে খ্যাত তার অর্থ করার বিষয়টি সালাফে সালেহীনের নিকট কোনো গোপন ব্যাপার ছিল না, বরং তা ছিল তখনকার সময় সর্বজন বিদিত বিষয়।

বস্তুত এ ব্যাপারে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আলেমগণের উপর্যুক্ত যে তাফসীর বর্ণনা করেছেন তাই প্রমাণ করে যে তারাও এটাই বিশ্বাস করেন এবং এ তাফসীরের ওপর সন্তুষ্ট। কারণ যদি 'ইস্তেওয়া' এর এ তাফসীর তাদের কাছে অগ্রহণযোগ্য হতো তবে আমাদের সালাফে সালেহীন ইমামগণ এর বিরুদ্ধে কথা বলতেন, যেমনটি তারা 'ইস্তেওয়া' শব্দের জাহমিয়াদের তাফসীর 'ইস্তাওলা' (অধিকার করা/দখল করা/মালিক হওয়া) এর প্রতিবাদ করেছেন। সুতরাং সালাফে সালেহীন ইমামগণ এটার তাফসীর (উপরে উঠা) অস্বীকার না করে বর্ণনা করা, বরং তা বর্ণনায় অগ্রণী হওয়া, এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করছে যে, সিফাত এর ভাষ্যসমূহের অর্থ বর্ণনা করা তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য বিষয় ছিল বরং এটা তাদের মানহাজের মৌলিক বিষয় ছিল।

তারপরও একটি জিনিসের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার যে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আর ইমামগণ কোনো কোনো ব্যাখ্যার বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু তারা শুদ্ধটি কী তা বলতে দ্বিধা করেননি। তারা তাফওয়ীদ্ব

করতেন না, যেমনটি আশ'আরী-মাতুরিদী আলেমগণ করে থাকে, বরং সালাফগণ এর বিপরীতটিই করতেন।

সালাফে সালেহীনের থেকে আসা 'ইস্তেওয়া 'আলাল 'আরশ" ব্যাখ্যায় 'ইস্তেওয়া' এর অর্থ বর্ণনায় যা যা বর্ণিত হয়েছে, তা যে আশ'আরী-মাতুরিদী সম্প্রদায়ের তাফওয়ীদ্ব নীতির বিরোধী তার আরেকটি প্রমাণ হচ্ছে, তাদের বড় ব্যক্তিত্ব ইমাম রাযী সালাফে সালেহীনের থেকে আসা এসব তাফসীরকে তাশবীহ ও তাজসীম নাম দিয়েছেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার জন্য 'ইস্তেওয়া' এর অর্থ অবস্থান করা, উপরে থাকা ইত্যাদি করাকে অসম্ভব বলেছেন। রাযী বলেন, **"আল্লাহর বাণী সুম্মাস তাওয়া আলাল আরশি এর 'ইস্তেওয়া' এর অর্থ উপরে অবস্থান করা যাবে না।**

অপর জায়গায় তিনি বলেন, আয়াতে 'ইস্তাওয়া' এসেছে, (সুতরাং সালাফ থেকে যারা উপরে অবস্থান করেছেন বলে অর্থ করেছেন তা বলা যাবে না, কারণ আয়াতে 'মুস্তাওয়িন' আসেনি, তাই সেটার শব্দ পরিবর্তন করে বলা যাবে না।

এর দ্বারা বুঝা গেল যে, সালাফ যা যা বলেছেন সেটা আশা'য়েরা-মাতুরিদিয়াদের নেতারা জানতো, কিন্তু মেনে নিতে পারেনি। তারা এটাও জেনেছে যে, সালাফগণ এটার অর্থ বর্ণনা করেছেন। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, অর্থ না করা, অর্থের ব্যাপারে চিন্তা না করা, যা তাফওয়ীদ্ব নামে খ্যাত তা সালাফের মানহাজ ছিল না।

আশ'আরী মতবাদের আরেক নেতা ইবন জামা'আহ বলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী 'ইস্তেওয়া' এর অর্থ দখল করা ও অধীনস্থ করা এটিই করতে হবে, 'উপরে উঠা' ও 'উপরে অবস্থান করা' করা যাবে না; কারণ এটা করলে তো আল্লাহ তা'আলাকে স্থান ও সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়, আর তাতে করে স্থান ও সময়কেও প্রাচীন বলতে হয়।

আশ'আরী মতবাদের অন্যান্য আলেম যেমন আমেদী, ইবন জাহবল, ইবনুত তিলমিসানী, সুবুকী (পিতা), হিসনী, কাওসারী এরা প্রত্যেকেই আল্লাহর সিফাত হিসেবে 'ইস্তেওয়া' উল্লেখ করার পর সেটার অর্থ করাকে অস্বীকার করেছেন। কারণ হিসেবে বলেছেন, এটা করলে তাজসীম হয়, আর তাজসীম বা দেহ সাব্যস্ত করা হারাম। এভাবে তারা সালাফের কাছ থেকে আসা অর্থকে অস্বীকার করে নিজেদের মন মত অর্থ সাব্যস্ত করে নিয়েছে। [বস্তুত সালাফ

এগুলোকে কখনো দেহ বলেননি, তারাই নিজেরা প্রথমে দেহ সাব্যস্ত করে পরে তা অস্বীকার করেছে, সালাফ তো বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের উপর উঠেছেন, এ উঠার বিষয়টি তেমন হবে যেভাবে হওয়া তাঁর জন্য উপযুক্ত]

দুই: সালাফে সালেহীন থেকে এমন সব বর্ণনা এসেছে যা প্রমাণ করে যে, তারা বাস্তব অর্থেই আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁর 'আরশের উপর উঠা সাব্যস্ত করতেন:

সালাফে সালেহীন থেকে এমনসব ভাষ্য এসেছে যা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে এটা প্রমাণিত হয় যে তারা 'ইস্তেওয়া' বা 'উপরে উঠা' এ অর্থটি বাস্তব অর্থেই আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করতেন। তারা কখনো তাফওয়ীদ্ব নামে অর্থহীন করে দিতেন না। এর অর্থ বর্ণনায় প্রবেশ করতে কেউ বিরত থাকতেন না। এ জন্যই আমরা দেখি তাঁরা কখনো সরাসরি সর্বোপরে, সর্বোচ্চে আছে বলতেন। আরশের উপরে উঠার বিষয়টি তাকীদ দেয়ার জন্য **'বি-যাতিহী'**, (সত্তাগতভাবে) কিংবা **'বি-নাফসিহী'** (স্বয়ং) শব্দদ্বয় ব্যবহার করতেন। কখনো কখনো **'বায়িনুন মিন খালকিহী'** (তাঁর সৃষ্টিকুল থেকে পৃথক) এ বাক্য ব্যবহার করতেন। এসব তাকীদপূর্ণ শব্দ ও বাক্যের ব্যবহার এটা প্রমাণ করে যে, সালাফে সালেহীণ বাস্তব অর্থেই আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর 'আরশের উপরে উঠা বিশ্বাস করতেন।

সালাফে সালেহীনের বিশ জনের বেশি আলেম থেকে এ রকম তাকীদপূর্ণ শব্দ ব্যবহার বর্ণিত হয়েছে যেমন,

১- হিশাম ইবন উবাইদুল্লাহ আর-রাযী আল-হানাফী, যিনি ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান এর ছাত্র ছিলেন, তাঁর থেকে বর্ণিত, জাহমিয়্যাহ হওয়ার কারণে এক ব্যক্তিকে বন্দি করা হয়। সে তাওবা করলে তাকে পরীক্ষা করার জন্য হিশামের দরবারে আনা হয়। হিশাম তাকে বললেন, তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছো যে, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর 'আরশের উপরে, তার সৃষ্টির বিপরীতে? সে বলল, তার সৃষ্টির বিপরীতে কী?তা আমি জানি না। তিনি বললেন, আবার তাকে বন্দি করো। সে এখনও তাওবা করেনি। (ইবন তাইমিয়্যাহ, হামাওয়িয়্যাহ, পৃ.৮৮; যাহাবী, আল-'উলূ, ১২৩; ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ১৪০- ১৪১, ।)

২- ইয়াহইয়া ইবন মু'আয আর-রাযী বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপর, সৃষ্টিকুল থেকে আলাদা, আর তিনি সবকিছু জ্ঞানে পরিবেষ্টন করে আছেন"। (রহমান আরশের উপর উঠেছেন- ৫৩৫ পৃঃ)

৩- সালেহ ইবনুদ দুরাইস বলেন, 'আব্দুল্লাহ ইবন আবূ জা'ফর আর-রাযী, জাহমিয়্যাহ হওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত- তার এক আত্মীয়ের মাথায় জুতা দিয়ে মারছিলেন আর বলছিলেন, ততক্ষণ ছাড়ব না যতক্ষণ না বলো: রহমান 'আরশের উপরে উঠেছেন, তিনি তাঁর সৃষ্টি থেকে আলাদা। (যাহাবী, আল-'উলূ, ১১৯; ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ২২১;)

৪- ইমাম বুখারীর শিক্ষক আলী ইবন হাসান ইবন শাকীক থেকে প্রমাণিত, তিনি বলেন, আমি 'আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারককে বললাম- আমাদের মহান রবকে আমরা কীভাবে চিনবো? তিনি বললেন: সপ্তম আসমানের ঊর্ধ্বে তাঁর 'আরশের উপরে, তাঁর সৃষ্টিকুল থেকে পৃথক।"(আদ-দারেমী, আর রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ, পৃ: ৬৭,সহীহ সনদে)

৫- উসমান ইবন আবী শাইবাহ বলেন, আল্লাহ 'আরশ সৃষ্টি করেছেন তারপর সত্তাগতভাবে তিনি তার উপরে উঠেছেন, এ মর্মে প্রচুর হাদীস আছে। সুতরাং তিনি আসমানসমূহের উপরে, তিনি সত্তাগতভাবে তাঁর 'আরশের উপরে, তাঁর সৃষ্টি থেকে আলাদা, তাদের থেকে আলাদা। (ইবন আবী শাইবাহ, কিতাবুল আরশ ২/২৭৮-২৯০; তাহকীক ড. মুহাম্মাদ ইবন খলীফা আত-তামীমী; ইবন আব্দুল হাদী, আল-কালাম আলা মাসআলাতিল ইস্তেওয়া 'আলাল আরশ পৃ.৬৭।)

৬- ইমাম আহমাদ থেকে ইউসুফ ইবন মূসা আল-কাত্তান বর্ণনা করেন, আহমাদ ইবন হাম্বলকে বলা হলো, আল্লাহ সাত আসমানের ঊর্ধ্বে তাঁর 'আরশের উপরে, তাঁর সৃষ্টি থেকে আলাদা, তাঁর জ্ঞান ও ক্ষমতা সর্বত্র? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি তাঁর 'আরশের উপর, কোনো কিছু তার জ্ঞানের অগোচরে নয়। এটি খাল্লাল ইউসুফ থেকে বর্ণনা করেছেন। (যাহাবী, আল-'উলু, ১২৯; ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, ২০০;)

৭- ইমাম উসমান ইবন সা'ঈদ আদ-দারেমী বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস, সাহাবী, তাবে'য়ীগণ এবং তাদের পরের লোকদের এ বিষয়ের ভাষ্য এত বেশি যে তা আমাদের এ কিতাবে জায়গা হবে না। তবে আমরা কেবল সেটা তাতে সংক্ষেপ করেছি যা দিয়ে

বিবেকবানরা দলীল নিতে পারে যে, পুরো উম্মত এমনকি পূর্ববর্তী উম্মতগণও আল্লাহকে চেনার ব্যাপারে কখনও সন্দেহ প্রকাশ করতেন না যে, তিনি আসমানের উপরে, তাঁর সৃষ্টি থেকে আলাদা।"

৮- ইমাম ইবন খুযাইমাহ বলেন, "যে স্বীকার করে না, আল্লাহ তাঁর 'আরশের উপরে, তাঁর সাত আসমানের উপরে উঠেছেন, তাঁর সৃষ্টি থেকে আলাদা" সে কাফির। তাকে তাওবা করতে বলা হবে। তাওবা করলে (ভালো) অন্যথায় তার গর্দান উড়িয়ে দিয়ে নর্দমায় নিক্ষেপ করতে হবে; যেন তার গন্ধে মুসলিমরা ও যিম্মীরা কষ্ট না পায়। (ইবন তাইমিয়্যাহ, ফাতওয়া হামাবিয়াহ, ৩৫; তিনি সহীহ বলেছেন; যাহাবী, আল-'উলু, ১৫২, ।)

৯- ইমাম আবুল কাসেম আত-ত্বাবারানী বলেন, আল্লাহ তাঁর 'আরশের উপরে উঠেছেন এবং তার সৃষ্টি থেকে তিনি আলাদা সংক্রান্ত বিষয়ে যা বর্ণিত হয়েছে- তার আলোচনা। তারপর তিনি এ বিষয়ে বিভিন্ন হাদীস বর্ণনা করেন। (আস-সুন্নাহ: ২৪।)

১০- ইমাম আবী যায়েদ আল-ক্বাইরোয়ানী বলেন, মহান আল্লাহ সত্তাগতভাবে তাঁর মহান 'আরশের উপরে আর তিনি সর্বত্র তাঁর ইলমের মাধ্যমে। (কাইরাওয়ানী, আর-রিসালাহ, ৪; ইবন আব্দুল হাদী, আল-কালাম আলা মাসআলাতিল ইস্তেওয়া আলাল আরশ পৃ.৭৮।)

১১- হাফিয ইমাম আবূ নাসর আস-সিজযী স্বীয় গ্রন্থ আল-ইবানাহতে বলেন, আমাদের ইমাম সাওরী, মালিক, ইবন 'উয়াইনাহ, হাম্মাদ ইবন সালামাহ, হাম্মাদ ইবন যাইদ, ইবনুল মুবারক, ফুদ্বাইল ইবন 'ইয়াদ্ব ও আহমাদ ইবন ইসহাক একমত যে, মহান আল্লাহ সত্তাগতভাবে তাঁর 'আরশের উপরে, আর তাঁর ইলম সর্বত্র। (ইবনু তাইমিয়্যাহ, দারউ তাআরুযিল আকল ওয়ান নাকল, ৬/২৫০।)

১২- অনুরূপভাবে শাইখুল ইসলাম আবু ইসমা'ঈল আল-আনসারী বলেন, বিভিন্ন হাদীসে আছে, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা সপ্তম আসমানের ঊর্ধ্বে 'আরশের উপর রয়েছেন।

১৩- ইমাম আবুল হাসান আল-কারজী আকীদাতু আসহাবিল হাদীস গ্রন্থে বলেন, আসহাবুল হাদীসের আকীদাহ হচ্ছে, আল্লাহ সত্তাগতভাবে তাঁর 'আরশের উপর। সেখান থেকেই যাবতীয় গায়েবী বিষয় তাঁর ইলমের অন্তর্ভুক্ত।

১৪- শাইখুল ইসলাম, যার সুপথপ্রাপ্তির ব্যাপারে সবাই একমত এবং যিনি অসংখ্য কারামতের অধিকারী, শাইখ আব্দুল কাদের জীলানী। তিনি বলেন, তাঁর ক্ষেত্রে এই গুণের বর্ণনা দেয়া জায়িয নয় যে, তিনি সর্বত্র বিরাজমান। বরং বলতে হবে, তিনি আসমানের ঊর্ধ্বে 'আরশের উপরে। যেমন, তিনি বলেছেন- আর-রহমানু আলাল আরশিস তাওয়া অর্থাৎ পরম করুণাময় 'আরশের উপর উঠেছেন। উচিৎ হচ্ছে উপরে উঠার গুণকে তা'ওয়ীল বা অপব্যাখ্যা ছাড়াই ব্যবহার করা। তাঁর সত্তা 'আরশের উপরে উঠা, আল্লাহ সুবহানাল্লাহু ওয়া তা'আলার 'আরশের উপর থাকার বিষয়টি প্রত্যেক নবী ও রাসূলের কাছে অবতীর্ণ প্রত্যেক কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তবে ধরন অজানা। (গুনিয়াতুত ত্বালেবীন: ১/৫৪-৫৭; ত্বাকাতুল হানাবিলাহ: ১/২৯৬; মাজমুউল ফাতাওয়া: ৫/৮৫; আল-'উলূ: ১৯৩; ইজতিমা'উল জুয়ুশ: ২৭৭।)

১৫- ইসমাঈল ইবন ইয়াহইয়া আল-মুযানী তাঁর শারহুস সুন্নাহ গ্রন্থে বলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যা দ্বারা শুরু করা হয়েছে তিনি তার হকদার। শুকরিয়া পাওয়ার অধিকারীদের মধ্যে সর্বাগ্রে। তাঁর গুণ বর্ণনা করছি। তিনি এক অমুখাপেক্ষী। তাঁর কোনো স্ত্রী ও সন্তান নেই। তিনি দৃষ্টান্তের ঊর্ধ্বে। তাঁর সাদৃশ্য ও সমকক্ষ নেই। সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, সর্বজ্ঞানী, সর্ববিষয়ে অবহিত, শক্তিশালী, সুউচ্চ, তাঁর মর্যাদা সহকারে সত্তাগতভাবে 'আরশের উপর সমুন্নত। তিনি জ্ঞানের মাধ্যমে সৃষ্টির নিকটে।... তিনি আরও বলেন, কুরআন আল্লাহর কালাম। আল্লাহর থেকে এসেছে। মাখলূক নয় যে ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহর বাণী, তাঁর ক্ষমতা, প্রশংসা ও গুণাবলি পূর্ণাঙ্গ, মাখলূক নয়, চিরন্তন চিরস্থায়ী। মাখলূক নয় যে ধ্বংস হয়ে যাবে। আমাদের রব অপূর্ণাঙ্গ ছিলেন না যে বৃদ্ধি পেয়েছেন। মাখলুকের সাদৃশ্য থেকে তাঁর গুণাবলি ঊর্ধ্বে। আলাদা। এরপর তিনি বাকী আকীদাহ উল্লেখ করেন। (যাহাবী, আল-উলূ, ১৩৫; ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, ১৬৬-১৭০।)

১৬- আব্দুর রহমান ইবন আবু হাতিম বলেন, আমি আবু হাতিম রাযী ও আবূ যুর'আ রাযী রাহিমাহুমাল্লাহ'র কাছে দীনের মৌলিক বিষয়ে আহলে সুন্নাহ'র মানহাজ সম্পর্কে জানতে চাই এবং এও জানতে চাই যে, তারা উভয়ে সকল এলাকার আলেমদের কী আকীদায় পেয়েছেন এবং উভয়ে কী আকীদাহ পোষণ করেন? উভয়েই বলেন, আমরা হিজায, ইরাক, মিসর, শাম, ইয়ামানসহ সকল এলাকার আলেমদের পেয়েছি এ মতের ওপর যে, আল্লাহ তাঁর 'আরশের উপরে রয়েছেন, তিনি তাঁর সৃষ্টি থেকে আলাদা। যেমনটি স্বয়ং আল্লাহ নিজের ক্ষেত্রে বর্ণনা দিয়েছেন। কোনো ধরন নির্ধারণ ও জানা ছাড়াই। তিনি সকল

কিছুকে জ্ঞানের মাধ্যমে বেষ্টন করে আছেন। (যাহাবী, সিয়ার,১৩/৮৪: আল-'উল, ১২৫, নং ১১০;)

১৭- ইমাম আবু 'উমার আত-ত্বালামাঙ্কী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর 'আল-উসূল ইলা মা'রিফাতিল উসূল' যা দু খণ্ডে সমাপ্ত তাতে বলেন, "মুসলিমগণের মধ্যে আহলুস সুন্নাত এ ব্যাপারে ঐকমত্য করেছেন যে, আল্লাহর বাণী 'তিনি তোমাদের সাথে আছেন যেখানেই তোমরা থাক না কেন' (সূরাহ আল-হাদীদ, আয়াত: ০৪), ও অনুরূপ কুরআনের আয়াতগুলোর অর্থ, আল্লাহর ইলম বা জ্ঞান। তারা আরও একমত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা সত্তাগতভাবে আসমানের উপরে, তাঁর 'আরশের উপর উঠেছেন, যেমনটি তিনি চেয়েছেন। আর আহলুস সুন্নাহ বলেন, মহান আল্লাহর বাণী, 'রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন" (সূরাহ ত্বা-হা, আয়াত: ০৫) আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর আরশের উপর উঠা বাস্তব অর্থেই, কোনো রুপক অর্থে নয়"। (মুখতাসারুল উলু পৃ. ২৬৪।)

১৮- ইমাম আবু বকর মুহাম্মাদ ইবন মাওহাব আল-মালেকী তার শারহু রিসালাতু ইবন আবী যাইদ আল-ক্বাইরোয়ানীতে বলেন, "ইমাম ইবন আবী যায়েদ আল-ক্বাইরোয়ানীর কথা 'নিশ্চয় তিনি (তথা মহান আল্লাহ) তাঁর সম্মানিত 'আরশের উপর সত্তাগতভাবে রয়েছেন' এখানে 'ফাওকা' (উপরে) ও 'আলা' (উপরে) সকল আরবদের নিকট একই। আর কুরআন ও সুন্নায় সেটার সত্যায়ন রয়েছে, আর তা হচ্ছে, আল্লাহর বাণী, (তারপর তিনি আরশের উপর উঠলেন) (সূরাহ আল-আ'রাফ, আয়াত: ৫৪), (রহমান আরশের উপর উঠলেন) (ত্বা-হা, আয়াত: ৫), (তারা তাদের রবকে ভয় পায়, উপর থেকে) (সূরাহ আন-নাহল, আয়াত: ৫০) 'ফী' শব্দটি আরবী ভাষাতে কখনও কখনও 'উপরে' শব্দের অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহর বাণী, (সুতরাং তোমরা যমীনের ঘাড়ের উপর বিচরণ কর) (আল-মুলক, আয়াত: ১৫), (খেজুর গাছের উপরে), (ত্বা-হা, আয়াত: ৭১), (যিনি আসমানের উপর রয়েছেন তার ব্যাপারে কি তোমরা ভয়হীন হয়ে গেছ?), ব্যাখ্যাকারগণ বলেন, অর্থাৎ তার উপরে। আর এটাই ইমাম মালেক যেসব তাবেয়ী পেয়েছেন তাদের কাছ থেকে বুঝে বলেছেন, সেসব তাবে'য়ীও যেসব সাহাবীকে পেয়েছেন তাদের থেকে বুঝে বলেছেন, আর সাহাবীগণও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পেয়েছেন যে, 'আন্নাল্লাহা ফিস-সামায়ি' অর্থ 'আল্লাহ আলাস সামায়ি বা আল্লাহ আসমানের উপরে, আসমানের ঊর্ধ্বে। আর এজন্যই শাইখ আবু মুহাম্মাদ বলেন, 'নিশ্চয় তিনি তাঁর 'আরশের উপরে' তারপর তিনি বর্ণনা করলেন যে,

তাঁর আরশের উপরে থাকা এটা কেবল সত্তাগতভাবে। কারণ তিনি তাঁর সকল সৃষ্টি থেকে আলাদা, কোনো প্রকার ধরন নির্ধারণ ছাড়াই। তিনি সকল স্থানেই তাঁর ইলম বা জ্ঞানের মাধ্যমে, সত্তাগতভাবে নন। কারণ কোনো স্থান তাকে পরিবেষ্টন করতে পারে না, কারণ তিনি তা থেকে অনেক বড়"। (মুখ তাসারুল উলু, ২৮০-২৮১)

১৯- ইমাম আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবন 'আম্মার আস-সিজিস্তানী তার 'রেসালাহ'তে বলেন, আমরা জাহমিয়্যাদের মতো বলবো না যে, আল্লাহ জায়গাসমূহে প্রবেশ করেছেন, বস্তুর সাথে মিশে গেছেন এবং তিনি কোথায় তাও জানি না। বরং তিনি সত্তাগতভাবে 'আরশের উপরে এবং তাঁর ইলম সকল কিছুকে বেষ্টন করে আছে। তাঁর ইলম, তাঁর শ্রবণ, তাঁর দর্শন এবং তাঁর ক্ষমতা সকল কিছুকে আয়ত্তে রেখেছে। সে অর্থে আল্লাহর বাণী: "তিনি তো তোমাদের সঙ্গেই আছেন তোমরা যেখানেই থাকো না কেন।" তিনি তাঁর সত্তাগতভাবে তাঁর 'আরশের উপরে, যেমনটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। (যাহাবী, আল-'উলূ, ১৭৭-১৭৮; ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা উল জুয়ূশ, ২৭৯।)

২০- ইমাম আবু 'আমর আদ-দানী তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আর-রিসালাতুল ওয়াফিয়াতে বলেন,

"অধ্যায়: আল্লাহ তাঁর 'আরশের উপরে উঠা এবং তাঁর সৃষ্টির উপর থাকা প্রসঙ্গে আর আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের কথা হচ্ছে, নিশ্চয় মহান আল্লাহ তাঁর সকল আসমানের উপরে, তাঁর 'আরশের উপরে সমুন্নত। সকল সৃষ্টির উপর কর্তৃত্ববান, তাঁর সত্তাগতভাবে তাদের সকলের থেকে আলাদা, তবে তাঁর জ্ঞানে তাদের থেকে পৃথক নন। বরং তাঁর জ্ঞান সৃষ্টির সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে, তিনি তাদের গোপন ও প্রকাশ্য সবই জানেন, জানেন তারা কী অর্জন করবে, যেমনটি তাঁর পক্ষ থেকে সত্য সংবাদে এসেছে এবং তাঁর বিবৃতি প্রদানকারী কিতাব বলেছে, তিনি বলেছেন, রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন। আর তার 'ইস্তেওয়া' হচ্ছে উপরে থাকা, কোনো প্রকার ধরন নির্ধারণ ছাড়া ও সীমা নির্ধারণ ছাড়া।" আবু আমর আদ-দানী, আর-রিসালাতুল ওয়াফিয়াহ, পৃ. ১২৯-১৩২। বরং কোনো ইমাম 'সত্তাগতভাবে' বা 'স্বয়ং' এ কথা বলার ব্যাপারে সালাফে সালেহীন ইমামগণের ইজমা' বর্ণনা করেছেন। আশ্চর্য হতে হয় এ বিষয়ে যে, সালাফে সালেহীন থেকে তা ব্যাপকভাবে সাব্যস্ত

হওয়ার পরও ইবনুল জাওযীর মত লোক বলতে পারে, 'সালাফরা সত্তাগতভাবে 'আরশের উপর উঠেছে তা বলেননি'। সাইদুল খাত্বির, ২৩।

সাতটি বিখ্যাত আয়াত; যার অন্যতম হচ্ছে, আল্লাহর বাণী, "নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ্ যিনি আসমানসমূহ ও যমীন ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন। তিনিই দিনকে রাত দিয়ে ঢেকে দেন, তাদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে। আর সূর্য, চাঁদ ও নক্ষত্ররাজি, যা তাঁরই হুকুমের অনুগত, তা তিনিই সৃষ্টি করেছেন। জেনে রাখ, সৃজন ও আদেশ তাঁরই। সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ্ কত বরকতময় !" (সূরাহ আল-আ'রাফ, আয়াত: ৫৪)

এ আয়াতে তিনি সাব্যস্ত করছেন, তাঁর উপরে থাকা, তিনিই মহাস্রষ্টা, মহা রিযিকদাতা, তিনিই সৃষ্টি ও বিধান প্রদান করার মালিক। তিনিই রাতকে দিন দিয়ে ঢেকে দেন, তিনিই সূর্য ও চন্দ্রের সৃষ্টা, তিনিই তারকারাজি সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে মানুষ জানতে ও বুঝতে পারে তাঁর মহান অবস্থা, পূর্ণ ক্ষমতা, পরিপূর্ণ জ্ঞান। আরও বুঝতে পারে যে, তিনি সকল সৃষ্টির উপরে রয়েছেন, তিনিই শুধু ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য।" (বায়ানুত তাওহীদ আল্লাযী বা'আসাল্লাহু বিহির রুসুলা জামি'আন, পৃ. ৬৭, রহমান আরশের উপর উঠেছেন কিতাব থেকে সংকলিত)

মর্যাদার দিক দিয়ে আয়াতুল কুরসী কুরআনের সবচেয়ে বড় আয়াত হওয়ার কারণ হলো উহাতে এমন বিষয় বর্ণিত হয়েছে, যা মহান আল্লাহ তাআলার সুন্দরতম নাম ও সুমহান গুণাবলীকে সাব্যস্ত করেছে এবং মহান আল্লাহর সত্তাকে এমনসব মন্দ বৈশিষ্ট্য থেকে পবিত্র করেছে, যা তাঁর বড়ত্ব ও মর্যাদার শানে শোভনীয় নয়।

তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্য মাবুদ নেইঃ الله لا اله لا هو। অর্থাৎ তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্য ইলাহ নেই। সুতরাং তিনি ব্যতীত যেসব মাবুদের এবাদত করা হয়, তা একদম বাতিল। আল্লাহ তা'আলার অন্যতম অতি সুন্দর নাম **الحى (চিরজীবন্ত)**। এর অর্থ আল্লাহ তাআলা এমন চিরবিদ্যমান সত্তা, যার জন্য রয়েছে পূর্ণতম জীবন। আল্লাহ তা'আলার হায়াত যেহেতু পূর্ণাঙ্গ, তাই তাঁর হায়াত কখনো শেষ হবেনা। আল্লাহর আরেকটি নাম **القيوم (সবকিছুর ধারক)**। যিনি নিজে নিজেই প্রতিষ্ঠিত, স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং অন্যকে প্রতিষ্ঠাকারী তিনিই হচ্ছেন আল কাইয়্যুম। সুতরাং কোন মাখলুকের

প্রতিই আল্লাহ তাআলার কোনো প্রয়োজন নেই। অথচ সমস্ত মাখলুকই তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী।

বর্ণিত হয়েছে যে, **الحى القيوم হচ্ছে ইসমে আযম**, যা দিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করলে আল্লাহ তা'আলা সেই দু'আ কবুল করেন এবং এর উসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে তিনি তা দান করেন। ইসমে আযম হওয়ার কারণ হলো **الحى ''আলহাই''** নামটি আল্লাহর সিফাতে যাতীয়ার উপর প্রমাণ বহন করে। তথা এটি আল্লাহর ঐ সব সিফাতের অন্তর্ভূক্ত যা কখনোই মহান আল্লাহর পবিত্র সত্তা হতে আলাদা হয়না। আর **القيوم ''আলকাইয়্যুম''** নামটি আল্লাহর সিফাতে ফেলিয়া অর্থাৎ তাঁর কর্ম সম্পর্কীয় সিফাত থাকার প্রমাণ করে। সুতরাং আল্লাহর সকল সিফাতের মূলভিত্তি হচ্ছে এই দুইটি সম্মানিত ও মহান নাম। মহান আল্লাহ তা'আলার এই পবিত্র নাম দু'টিতে মহান আল্লাহর দু'টি সুমহান সিফাত রয়েছে। একটি হচ্ছে হায়াত তথা আল্লাহর জীবন। মহান আল্লাহর হায়াত হচ্ছে এমন পরিপূর্ণ ও চূড়ান্ত হায়াত, যাতে কোনো প্রকার ত্রুটি নেই। মহান আল্লাহর হায়াতের সাথে সৃষ্টির হায়াতের কোন তুলনাই হতে পারেনা। সৃষ্টির হায়াতের শুরু রয়েছে এবং তার পরিসমাপ্তিও রয়েছে। রোগ-ব্যাধি, তন্দ্রা-নিদ্রা ইত্যাদির কারণে মাখলুকের জীবিত থাকার মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি চলে আসে। মৃত্যুর মাধ্যমে সৃষ্টির দুনিয়ার হায়াত শেষ হয়ে যায়। কিন্তু মহান আল্লাহর হায়াতের কোন শুরু নেই, শেষও নেই। তাঁর হায়াত ও জীবন এত চূড়ান্ত ও পরিপূর্ণ যে, তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শই করতে পারেনা।

মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর বিষয়ে এ কথাটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখা ও বুঝা আবশ্যক যে, হায়াত হচ্ছে মহান আল্লাহর এমন একটি সিফাত, যার উপর বাকী সিফাতগুলো ভিত্তিশীল। এটি হচ্ছে মহান আল্লাহর সত্তাগত সিফাত। তা কখনো আল্লাহর যাত থেকে আলাদা হয়না। মহান আল্লাহর এই হায়াত বিশেষণ ছাড়া তাঁর বাকী সিফাতগুলো অকল্পনীয়।

আর মহান আল্লাহর কাইয়্যুমিয়াত তথা সবকিছুকে ধারণ ও সংরক্ষণ করা তাঁর এমন একটি বিশেষণ, যার উপর মহান আল্লাহর বাকীসব কর্মগত সিফাতের ভিত্তি। মহান আল্লাহর এই সিফাতের ফলেই আসমান-যমীন এবং এতদোভয়ের মধ্যকার সকল সৃষ্টি টিকে আছে।

لا تأخذه سنة ولا نوم **তন্দ্রা ও নিদ্রা তাকে স্পর্শ করতে পারেনাঃ** তিনিই যেহেতু সকল সৃষ্টির সার্বক্ষণিক ধারক ও বাহক, তাই তন্দ্রা ও নিদ্রা তার ধারে কাছেও পৌঁছতে পারেনা। হালকা ঘুমকে 'সিনাহ' বলা হয়। এটি শুধু চোখের মধ্যেই হয়। আর ঘুম তন্দ্রা থেকে অধিক গভীর ও শক্তিশালী হয়। ঘুম মৃত্যুর ছোট ভাই। এই প্রকার ঘুম অন্তরে হয়।

له ما فى السموات وما فى الارض **আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সব তাঁরইঃ** অর্থাৎ আসমান ও যমীনে যত মাখলুক রয়েছে, তাদের সকলের স্রষ্টা একমাত্র তিনি, এগুলোর মালিকানাও একমাত্র তাঁর এবং সকলেই তার অনুগত। সুতরাং তিনি উর্ধ্ব জগৎ এবং নিম্ন জগতের সবকিছুরই মালিক।

من ذا الذى يشفع عنده الا باذنه **এমন কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করবে ?** অর্থাৎ বিনা অনুমতিতে তাঁর নিকট সুপারিশ করার মত কেউ নেই। الشفاعة শব্দটি الشفع (যুক্ত করা) থেকে নেওয়া হয়েছে। এটি الوتر (বিজোড়) এর বিপরীত। শাফাআতকারী যেহেতু স্বীয় প্রার্থনার সাথে অন্যের জন্য প্রার্থনা করাকেও যুক্ত করে নেয়, তাই সুপারিশকারীকে **الشافع (সুপারিশকারী)** বলা হয়। তাই যার জন্য সুপারিশ করা হয়, সেই লোক প্রথমে বেজোড় (একা) থাকার পর সুপারিশকারী তাকে নিজের সাথে মিলিয়ে নিয়ে জোড়ে পরিণত করে দেয়। আর পারিভাষিক অর্থে শাফাআত অর্থ হচ্ছে **سؤال الخير للغير**অন্যের জন্য কল্যাণ প্রার্থনা করা। অর্থাৎ মুমিন ব্যক্তি তাঁর রবের কাছে অন্যান্য মুমিনের জন্য এই দু'আ করবে যে, তিনি যেন তাদের গুনাহ ও অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দেন। তবে শাফাআতের বিষয়টি সম্পূর্ণ মহান আল্লাহর মালিকানাধীন। মহান আল্লাহর অনুমতি ও আদেশ ব্যতীত শাফাআত হবেনা। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বড়ত্ব ও মর্যাদার কারণেই অনুমতি ছাড়া কেউ তাঁর নিকট ক্বিয়ামতের দিন অন্য কারো জন্য সুপারিশ নিয়ে অগ্রসর হতে পারবেনা।

يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم **তাদের সম্মুখের ও পশ্চাতের সবই তিনি অবগত আছেনঃ** অর্থাৎ মহান আল্লাহ তা'আলার ইলম অতীত ও ভবিষ্যতের সকল বিষয়কে পরিবেষ্টন করে আছে। অতীত ও ভবিষ্যতের কোন জিনিসই মহান আল্লাহর জ্ঞানের বাইরে নয়।

ولا يحيطون بشئ من علمه الا بما شاء **তার জ্ঞান থেকে কোন কিছুই তারা পরিবেষ্টন করতে পারেনা। কিন্তু তিনি নিজে যে জিনিষের জ্ঞান মানুষকে দিতে চান, সেটুকুর কথা ভিন্নঃ** অর্থাৎ মহান আল্লাহর বান্দাগণ তাঁর ইলম থেকে কিছুই জানতে পারেনা। তবে তারা শুধু সেটুকুই জানতে পারে, যা তিনি রাসূলদের মাধ্যমে তাদেরকে জানিয়েছেন।

وسع كرسيه السموات والارض **তার কুরসী সমস্ত আসমান ও যমীন পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেঃ আল্লাহর কুরসী সম্পর্কে বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে। কেউ বলেছেঃ** উহা হচ্ছে আল্লাহর আরশ। অর্থাৎ আরশ ও কুরসী একই জিনিস। কেউ বলেছেনঃ কুরসী আর আরশ এক নয়। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং অন্যান্য সাহাবী রাজিয়াল্লাহু আনহুম হতে বর্ণিত হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, কুরসী হচ্ছে আল্লাহর দুই পা রাখার স্থান। সেটি এমন কুরসী, যার বিশালতা ও প্রশস্ততা সমস্ত আসমান-যমীন পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। সুতরাং কেউ যেন এমন না ভাবে যে, কুরসী দ্বারা এখানে ঐরকম চেয়ার উদ্দেশ্য, যার উপর আমরা বসি। আল্লাহর কুরসীর ব্যাপারে এই রকম ধারণা করা ঠিক নয়। মহান আল্লাহর কুরসী রয়েছে, এই কথা থেকে এমন ধারণা করা যাবেনা যে, তিনি চেয়ারে বসে আছেন। নাউযুবিল্লাহ। কুরসীর যেই বিবরণ কুরআন ও সুন্নায় এসেছে, উহাই বিশ্বাস করতে হবে। আরশের সাধারণ অর্থ রাজা-বাদশাহর সিংহাসন। কিন্তু মহান আল্লাহর আরশ আল্লাহর সর্ববৃহৎ সৃষ্টি এবং তা সকল সৃষ্টির ছাদ। আরশের ব্যাপারেও এমন ধারণা ঠিক নয় যে, রাজা-বাদশাহগণ যেভাবে সিংহাসনে বসেন, আল্লাহ তা'আলাও সেভাবে সিংহাসনে বসে আছেন। পবিত্র কুরআনের কিছু কিছু বাংলা অনুবাদে মহান আল্লাহ আরশে সমাসীন বলে যেই অনুবাদ করা হয়েছে, তা ভুল। الرحمن على العرش استوى এই আয়াতের অনুবাদে কোন কোন অনুবাদ গ্রন্থে এভাবে করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ তা'আলা আরশে সমাসীন। এই অনুবাদ সঠিক নয়। সঠিক অনুবাদ হচ্ছে মহান আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর সমুন্নত বা বিরাজমান। এখন আমরা সূরাহ ইখলাছের ভাবানুবাদটি নিম্নে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

আমাদের বাংলাদেশে ও পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষায় রচিত মহান আল্লাহর সত্তা, জাত, সিফাত ও অবস্থান সম্পর্কে যতগুলো ইসলামী বই-পুস্তক বাজারে বের হয়েছে তার অধিকাংশ বই-পুস্তকে মহান আল্লাহর সত্তা, জাত,

সিফাত ও অবস্থান সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ বিরোধী বক্তব্য-বিবৃতি প্রদান করা হয়েছে যেমন: উভয় বাংলার অপ্রতিদ্বন্দী মুনাজির, ডিবেটর ও তার্কিক মৃত মুহতারাম আব্দুর রউফ রহিমাহুল্লাহ খুলনাবী কর্তৃক প্রণীত **''আল্লাহ কি নিরাকার ও সর্বত্র বিরাজমান ?"**, উভয় বাংলার ইবনে তাইমিয়া বলে খ্যাত, বহু ইসলামিক মৌলিক গ্রন্থ প্রণেতা মৃত মুহতারাম হাফেজ অধ্যাপক শাইখ আইনুল বারী আলীয়াবী রহিমাহুল্লাহ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত কর্তৃক প্রণীত ও আল্লামা আলীমুদ্দীন একাডেমী, কলেজ রোড, মেহেরপুর, বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত **''ঈমান ও আক্বীদা"**। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলেমে দ্বীন ও বিশ্ববরেণ্য অপ্রতিদ্বন্দ্বী মুফাসসিরে কুরআন মুহতারাম আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী রহিমাহুল্লাহ কর্তৃক প্রণীত **''আল্লাহ কোথায় ?"**, মুহতারাম ড. প্রফেসর মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব হাফিজাহুল্লাহ, ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান, এ্যারাবিক এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রণীত ও হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পোস্ট কাজলা, রাজশাহী, বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত **"আহলে হাদীস আন্দোলন উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ"**। মুহতারাম ড. প্রফেসর মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব হাফিজাহুল্লাহ কর্তৃক লিখিত **"সালাতুর রাসূল"** পুস্তকেও মহান আল্লাহর অবস্থান সম্পর্কে শিরকযুক্ত শব্দ **সমাসীন** ব্যবহার করেছেন। সম্পর্কে বহু ইসলামী মৌলিক গ্রন্থ প্রণেতা মৃত মুহতারাম ড. প্রফেসর খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহিমাহুল্লাহ সাহেব প্রণীত **"আল-ফিকহুল আকবার বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা"**, অধ্যাপক, আল-হাদীস বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, আস-সুন্নাহ পাবিলিকেশন্স, ঝিনাইদহ, বাংলাদেশ, কর্তৃক প্রকাশিত। মুহতারাম হাফেজ মুহাম্মাদ আইয়ুব হাফিজাহুল্লাহ কর্তৃক প্রণীত **''ঈমান ও সহীহ আক্বীদাহ/আল্লাহ কি নিরাকার, সর্বত্র বিরাজমান ?"**, মুহতারাম ড. ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হাফিজাহুল্লাহ কর্তৃক প্রণীত **"দ্বীন-ইসলামের জানা-অজানা"**। অধ্যক্ষ ও প্রফেসর এ,এইচ,এম শামসুর রহমান রহিমাহুল্লাহ কর্তৃক প্রণীত ও আল্লামা আলীমুদ্দীন একাডেমী, কলেজ রোড, মেহেরপুর, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত **"মহান স্রষ্টার অপরূপ সৃষ্টি"**, বংশাল, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। হাদীস একাডেমী (শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান) কর্তৃক অনূদিত **''তাহক্বীক্ব মিশকাতুল মাসাবীহ"**, ২১৪, বংশাল রোড, ঢাকা-১১০০। বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক ইসলামী গবেষক, লেখক, মুহাক্কিক আলিম ও দাঈ আব্দুল হামিদ ফাইযী আল-

মাদানী হাফিজাহুল্লাহ কর্তৃক সংকলিত **''দ্বীনী প্রশ্নোত্তর ?''** বিশিষ্ট মুহাক্কিক আলিম ও দাঈ, মুফাসসিরে কুরআন মুহতারাম আল্লামা শাইখ কাজী মুহাম্মাদ ইবরাহীম হাফিজাহুল্লাহ, প্রধান মুহাদ্দিস, জামেয়া কাসেমিয়া, নরসিংদী কর্তৃক প্রণীত **''তাওহীদ জিজ্ঞাসা জবাব-১''** তৃতীয় সংস্করণ, মানারাহ পাবলিকেশন, ফকিরাপুল, ঢাকা। এছাড়া বাংলা ভাষায় প্রকাশিত যতগুলো পবিত্র কুরআনুল কারীমের অনুবাদ অদ্যাবধি বের হয়েছে তার অধিকাংশ অনুবাদে উল্লিখিত ভ্রান্ত ও শিরক বিজড়িত শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে, বহুল প্রচারিত সহীহ আক্বীদার কণ্ঠস্বর বলে খ্যাত, পবিত্র কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকবর্তিকা **''মাসিক আত্-তাহরীক''** পত্রিকা এবং অন্যান্য যে সমস্ত পত্রিকা ও পুস্তকসমূহ অদ্যাবধি আমাদের হস্তগত হয়েছে তার অধিকাংশ তাফসির ও পুস্তকে মহান আল্লাহ আরশে সমাসীন, আসীন, উপবিষ্ট, অধিষ্ঠিত ইত্যাদি শিরকযুক্ত শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। যা একেবারে ভ্রান্ত আক্বীদাহ এবং সহীহ আক্বীদাহ পরিপন্থী। কেবলমাত্র মৃত আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কুরাইশী রহিমাহুল্লাহ কর্তৃক প্রণীত **''কালেমা তাইয়েবা''** এবং আল্লামা শাইখ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম হাফিজাহুল্লাহ, লিসান্স, মদিনা ভার্সিটি, সৌদি আরব, কর্তৃক প্রণীত **''কালেমার মর্মকথা''** এবং ইসলামিক রিসার্চ এ্যান্ড রিফরমেশন সেন্টার (আই আর আর সি), ২৬০/৬, মালিবাগ রোড, ঢাকা-১২১৭, ঢাকা বিজ্ঞান কলেজ ভবন, ৬ষ্ঠ তলা, কর্তৃক প্রকাশিত **''ছিরাতে মুস্তাক্বীম, চলমান গবেষণা সংকলন : পর্ব-৪''**। ব্যাখ্যাকার : ড. সালেহ আল ফাওযান কর্তৃক প্রণীত এবং আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী হাফিজাহুল্লাহ কর্তৃক অনূদিত **''শারহুল আক্বীদাহ্ আল-ওয়াসিত্বীয়া''** ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী, রাজশাহী, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত। কেবলমাত্র এই চারটি পুস্তকে শিরক বিমুক্ত, নির্ভেজাল সহীহ আক্বীদাহপুষ্ট শব্দ মহান আল্লাহ আরশের উপর বিরাজমান, বা আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন ইত্যাদি কথাটি আমরা লিখিত দেখতে পেয়েছি।

তাই আমরা মনে করি মহান আল্লাহ সুবহানা ওয়া তা'আলা তার মহান সৃষ্টি মহান আরশের উপর বিরাজমান বা সমুন্নত হয়েছেন ইত্যাদি শব্দগুলো দ্বীন-দরদী ইসলাম প্রিয় আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত তথা আহলুল হাদীস ভাইদের কিতাবে লেখা উচিৎ। এ শিরকমুক্ত নির্ভেজাল আক্বীদাপুষ্ট শব্দগুলো (যেমন মহান আরশের উপর বিরাজমান, মহান আরশের

উপর সমুন্নত হয়েছেন, সপ্ত আসমানের উপর ইত্যাদি) ছাড়া উপরে উল্লেখিত শিরকযুক্ত ও আক্বীদা পরিপন্থী শব্দগুলো আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আক্বীদাহপুষ্ট শব্দ নয়। আমি নিজেও এ বিষয়ে তাহক্বীক্ব করার আগে আমার ইতিপূর্বে প্রকাশিত কিতাবে এবং বিভিন্ন মাসজিদে জুমুআর খুৎবায় ও ওয়াজ মাহফিলে, সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে ও আপামর জনসাধারণের সাথে সাধারণ কথা ও আলাপ-আলোচনায় উপরে উল্লিখিত শিরক মদদপুষ্ট শব্দ সমাসীন, আসীন, উপবিষ্ট, অধিষ্ঠিত ইত্যাদি ভ্রান্ত শব্দগুলো উল্লেখ করেছি। আমার এ অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমি মহান আল্লাহর নিকট অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কায়মনোবাক্যে একনিষ্ঠ চিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করছি। **আসতাগফিরুল্লাহ ওয়াতুবু ইলাইহি** (তিনবার) মহান আল্লাহ সুবহানা ওয়া তা'আলা আমাকে যেন তাঁর নিজ দয়াগুণে এ অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দেন, আমীন! ছুম্মা আমীন!! **ইয়া হাইয়্যু ইয়া ক্বাইয়্যুম বি রহ্মাতিকা আসতাগিছ** (তিনবার), **ইয়া আরহামার রাহিমীন** (তিনবার), **ইয়া জাল জালালী ওয়াল ইকরাম** (তিনবার), **ইয়া রব্বি** (দুইবার)। অতএব আহলুস সুন্নাত অল জামাআতের মুহাক্কিক ও বিদগ্ধ আলেম-উলামাদের একান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য হবে, ক্ষণকাল বিলম্ব না করে, উপরে উল্লেখিত ভ্রান্ত ও শিরক বিজড়িত শব্দগুলোর পরিবর্তে মহান আল্লাহ সুবহানা ওয়া তা'আলা, তার সৃষ্ট মহান আরশের উপর বিরাজমান, সমুন্নত ইত্যাদি বিশুদ্ধ ও শিরকমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদি শব্দগুলো ব্যবহার করা। তাহলে সহীহ আক্বীদার বিষয়ে আর কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকে না। যে সমস্ত বিজ্ঞ ও মুহাক্কিক আলিম-উলামা মুসলিম ভাইদের প্রণীত পুস্তকে উপরে উল্লেখিত ভুল শব্দগুলো অনিচ্ছাকৃতভাবে লিখিত রয়েছে, আমরা আশা করব ইনশাআল্লাহ তারা তাদের বইয়ের অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটিগুলো পরবর্তী সংস্করণে শুধরে দিবেন। মহান আল্লাহ তাওফীক্ব দাতা। ওয়ামা তাওফীক্বি ইল্লা বিল্লাহি আলাইহি তাওওয়াকক্বালতু ওয়া ইলাইহি উনিব। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে ঈমান-আক্বীদা, সহীহ মানহাজ, দ্বীনের ব্যাপারে নির্ভেজাল, বিশুদ্ধ ও সঠিক ঈমান-আক্বীদাহ পোষণ করার তাওফীক্ব নসীব করুন। আমীন! ওয়াল্লাহু 'আলামু বিস সওয়াব।

তৃতীয় প্রশ্ন : "মহান আল্লাহ কেমন ?"

ভারতবর্ষের মুসলিমদের নিকট এ প্রশ্নের দুইরকম উত্তর শোনা যায় :

(ক) মহান আল্লাহ নিরাকার :

এ আক্বীদা দুই দিক থেকে বাতিল ও ভ্রান্ত। যথা :

(১) হিন্দু ও শিখ ধর্মের সাথে মিলে যায়। এই দুই ধর্মের লোকেরা (ঈশ্বর) আল্লাহকে নিরাকার বিশ্বাস করে।

(২) কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। মহান আল্লাহর যাত ও ছিফাতের যে বর্ণনা কুরআন মাজীদে এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর বিশাল হাদীছের ভান্ডারে পাওয়া যায়, তা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি অবশ্যই নিরাকার নন। মহান আল্লাহকে নিরাকার বলা মানে মহান আল্লাহর সত্তাগত অস্তিত্বকে অস্বীকার করা। অথচ আল্লাহর সত্তাগত অস্তিত্ব ছাড়া তাঁর প্রভাবগত (স্রষ্টাগত) অস্তিত্বের কল্পনাই করা যায় না। যাঁর সত্তাই নেই, তিনি কীভাবে সৃষ্টি করেন বা করবেন ? কুরআনে স্পষ্টভাবে মহান আল্লাহ বলেছেন যে, তিনি কথার মাধ্যমে সৃষ্টি করেন আবার দুই হাত দ্বারাও সৃষ্টি করেন। আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ -

"শুধু এভাবেই তাঁর কাজ সম্পাদিত হয়, যখন তিনি কোনো কিছু করতে ইচ্ছা পোষণ করেন তখন বলেন, হয়ে যাও, আর সাথে সাথে তা হয়ে যায়" (ইয়াসীন, ৩৬/৮২; অনুরূপ তথ্য রয়েছে : আল-বাক্বারা, ২/১১৭; আলে ইমরান, ৩/৪৭, ৫৯; আল-আনআম, ৬/৭৩; আন-নাহল, ১৬/৪০; মারইয়াম, ১৯/৩৫; গাফির/মুমিন, ৪০/৬৮)।

দুই হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন আমাদের আদি পিতা আদম আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা-কে। মহান আল্লাহ বলেন,

يَاإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ -

"হে ইবলীস! তোকে কীসে বাধা দিল ওই ব্যক্তিকে সিজদা করতে যাকে আমি আমার দুই হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছি" (ছোয়াদ, ৩৮/৭৫)। সুতরাং দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মহান আল্লাহ নিরাকার নন। যে নিরাকার বলবে, সে এক প্রকার নাস্তিক এবং হিন্দু ও শিখ ধর্মের অনুসারী। অতএব বুঝাই যাচ্ছে যে, যেহেতু আল্লাহ নিরাকার নন, তাহলে তার বিপরীতটাই সঠিক হওয়ার কথা। আর তা হচ্ছে তিনি আকারবিশিষ্ট বা সাকার।

(খ) মহান আল্লাহ আকারবিশিষ্ট বা সাকার :

মহান আল্লাহর আকারের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি নিরসন : এটা অবশ্যই সঠিক কথা যে মহান আল্লাহ কেমন এ প্রশ্নের জবাবে "নিরাকার" বলা কুফরী হলেও আকারবিশিষ্ট বা সাকার বলা ভুল নয়। মহান আল্লাহর আকারের ক্ষেত্রে তিন প্রকার দৃষ্টিভঙ্গি/আক্বীদা লক্ষ্য করা যায়: **(১) দেহবাদী (২) সংশয়বাদী (৩) ছহীহ আক্বীদা**।

(১) সাকার/দেহবাদী : তারা হিন্দু-বৌদ্ধদের মতোই মূর্তিপূজক। তারা মুর্দা মানুষ বা মাখলূকের মূর্তিপূজা করে। আর দেহবাদীরা চিরঞ্জীব আল্লাহর মূর্তি নির্ধারণ করে পূজা করে। কারণ, তাদের আল্লাহ না কি দাড়ি-গোঁফ গজানোর উপক্রম নওজোয়ান এর মতো। অনেক সূফীবাদীদের আক্বীদা বিশ্বাস এরূপ দেখা যায়। বাংলাদেশের দেওয়ানবাগী পীর ও আযহারউদ্দীন ছিদ্দীক্বী তথা মানিকগঞ্জের পীর ও তাদের মুরীদদের আক্বীদা এরূপ। দেওয়ানবাগী বলেছে, আরশে মুআল্লায় গেলে দেখা যাবে দেওয়ানবাগীই সেখানে বসে আছে- নাঊযুবিল্লাহ। এসব কথা লিখতে, বলতে ও পড়তে অন্তর কাঁপছে। কিন্তু তাদের কোনো ভয়-ভীতি নেই। কত বাতিল ও নির্লজ্জ হলে এমন কথা বলতে ও বিশ্বাস করতে পারে। আক্বীদার ক্ষেত্রে অজ্ঞ ও অস্পষ্ট ধারণাসম্পন্ন কিছু আলেম দেহবাদী হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় মহান আল্লাহকে আকারবিশিষ্ট বা সাকার বলতে ভয় পায়। তাই তারা নিরাকারের পক্ষ অবলম্বন করে নিজেদের বিপদমুক্ত মনে করেন। আবার অনেকে মহান আল্লাহর আকার কেমন ? এই প্রশ্নের উত্তর না জানার কারণেও নিরাকার বলে দায়মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেন। অথচ এক্ষেত্রে প্রশ্ন করা ও উত্তর দেওয়া উভয়টাই সমান অপরাধ। মারাত্মক ভুল হলো এমন প্রশ্ন করা যে, মহান আল্লাহর আকার কেমন ? এই প্রশ্ন করাও হারাম এবং উত্তর দেওয়া হারাম। এরূপ প্রশ্ন করার যেমন অনুমোদন ও দলীল কুরআন-সুন্নাহতে নেই, উত্তর দেওয়ারও অনুমতি কুরআন ও ছহীহ হাদীছে নেই।

(২) মহান আল্লাহর সাকার প্রশ্নে সংশয়বাদী : এক্ষেত্রে অনেক ছহীহ আক্বীদার বাঘা বাঘা আলেমও জড়িয়ে গেছেন। তারা বলে থাকেন, মহান আল্লাহ নিরাকার নন, সাকারও নন। কিন্তু এ ব্যাপারে সন্তোষজনক দলীল দেওয়া হয় না। এর কারণ মহান আল্লাহর আকার নিরাকার এই শিরোনামে সালাফদের থেকে আক্বীদা বিষয়ক কোনো অধ্যায় তেমন চোখে পড়ে না বললেই চলে। যার জন্য অধিক সতর্কতার কারণে হয়তো মধ্যমপন্থা অবলম্বন

হিসেবে تَوَقُّف ক্ষান্ত থাকার নীতি অবলম্বন করা হয়ে থাকতে পারে। আল্লাহ এইসব উদ্দেশ্যের কারণে তাদেরকে নেকীও দিতে পারেন।

আমার জানা মতে, এই মাসআলাটি ভারতউদ্ভূত ও ভারতসংশ্লিষ্ট আক্বীদাগত বিষয়। জাহমিয়া ও মু'তাজিলারা আল্লাহর তানযীহের কারণে মহান আল্লাহর ছিফাত অস্বীকার ও অপব্যাখ্যা করে। কিন্তু ভারতবর্ষের অনেক আলেম এটা করে আল্লাহ নিরাকার এইজন্য, আল্লাহকে সাকার বলা যাবে না। এর দ্বারা যদি এই উদ্দেশ্য পোষণ করা হয় যে, তিনি দেহবিশিষ্ট নন, তাহলে তো কিছুটা ঠিক আছে। কিন্তু সাকার বা আকারবিশিষ্টই বলা যাবে না এমন বিশ্বাস করা হলে তখন সেটা অবশ্যই আপত্তিকর হবে। ভারতবর্ষের আহলেহাদীছ তথা ছহীহ আক্বীদার আলেমগণ আল্লাহকে সাকার বলেই জানেন ও বিশ্বাস করেন, তারা কয়েকটা দলীলের সূত্র ধরে আল্লাহকে সাকার বলেন। যথা :

(ক) رُؤْيَةُ اللهِ মহান আল্লাহর দর্শন বা দীদার : কুরআন ও ছহীহ হাদীছে ভূরিভূরি দলীল পাওয়া যায় যে, মুমিনরা ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহকে দেখতে পাবে।

মহান আল্লাহ সাকার বা আকারবিশিষ্ট হওয়ার বা বলার অর্থ মহান আল্লাহ দর্শন ও দীদারযোগ্য সত্তা। কারণ নিরাকার জিনিস কখনো দর্শন ও দীদারযোগ্য হয় না। উল্লেখ্য যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর যুগের মুমিন ছাহাবীরাই শুধু নয়; বরং সকল মুমিন-মুসলিমের একটা অদম্য আশা-আকাঙ্ক্ষা যে, মহান আল্লাহকে দেখবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন, মহান আল্লাহ দর্শন ও দেখা দিয়ে তাদের সে আশা পূর্ণ করবেন। এমনকি মূসা আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা মহান আল্লাহকে দেখার জন্য অস্থির হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি শর্তযুক্তভাবে দেখা দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু শর্তে টিকেননি (আল-আ'রাফ, ৭/১৪৩)।

(খ) لِقَاءُ اللهِ মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ : বহু আয়াতে মহান আল্লাহ মুমিনদের সাক্ষাতের লোভ দেখিয়েছেন। "সৎ আমল করো, আমার সাক্ষাৎ পাবে" (আল-কাহফ, ১৮/১১০)। যারা কাফের, তারা মহান আল্লাহর সাক্ষাৎ চায় না। এরকম আয়াত কুরআন মাজীদে প্রায় ১৫/১৬টি রয়েছে। মহান আল্লাহর সাক্ষাৎ ও দীদার এ দুটি বিষয় প্রায় ওতপ্রোতভাবে জড়িত, এ দুটি ছিফাতই মহান আল্লাহর সাকার হওয়া অনিবার্য করে দেয়। মহান আল্লাহর

সাক্ষাৎ ও তাঁর দীদার দর্শন হচ্ছে জান্নাতের নেয়ামতসমূহের মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান (শ্রেষ্ঠ) নেয়ামত।

(গ) ذَاتُ اللهِ মহান আল্লাহর যাত বা সত্তা : মহান আল্লাহর যাত বা সত্তার সাথে তার বহু ছিফাত জড়িত। যেমন- চেহারা, হাত, দুই হাত, পা, চক্ষু, গোছা ইত্যাদি ছিফাত। এগুলো ছহীহ হাদীছে উল্লেখিত হয়েছে। এ সবগুলো ছিফাতের নির্দেশনা হলো মহান আল্লাহ সাকার, দীদার ও দর্শনযোগ্য সত্তা। ক্বিয়াস বা অনুমানভিত্তিক ছিফাত সাব্যস্ত করা যাবে না। যেমন- নাক, কান, চুল, গলা, কপাল, পেট, পিঠ, ইত্যাদি।

(ঘ) صُورَةُ اللهِ মহান আল্লাহর ছুরত : মহান আল্লাহর যাতের আকার-আকৃতিতে ক্বিয়ামতের দিন মুমিন বান্দারা আল্লাহকে দেখতে পাবে। এ ব্যাপারে আল্লাহর صُورَةُ (আকার) উল্লেখসহ ছহীহ বুখারী বর্ণিত হাদীছ,

يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ فَيَقُولُ : مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ، فَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ القَمَرَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبْقَى هَذِهِ الأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ فِي غَيْرِ الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا، فَإِذَا أَتَانَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ فِي الصُّورَةِ (وفي رواية : في صورته) الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا - "ক্বিয়ামতের দিন যখন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করা হবে, বলা হবে- যে যার ইবাদত করতে, তার অনুসরণ করো। ফলে, যারা সূর্যের পূজা করত, তারা সূর্যের অনুসরণ করবে। আর যারা চন্দ্রের পূজা করত, তারা চন্দ্রের অনুসরণ করবে। যারা ত্বাগূতসমূহের ইবাদত করত, তারা তাদের অনুসরণ করবে। অতঃপর আল্লাহর ইবাদতকারীরা অবশিষ্ট থাকবে। তাদের মধ্যে মুনাফেক্বরাও থাকবে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় আকৃতি ব্যতীত অন্য আকৃতিতে তাদের নিকট আসবেন, যা তারা চিনে না। অতঃপর বলবেন, "আমি তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক"। মুমিনগণ বলবেন, আপনার থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। আমরা এখানেই অবস্থান করব, আমাদের প্রভু-প্রতিপালক না আসা পর্যন্ত। যখন আমাদের রব আসবেন, তখন আমরা তাঁকে চিনে নিব। অতঃপর মহান আল্লাহ তাঁর স্বীয় আকৃতিতে আসবেন, যেটা তাদের নিকট পরিচিত। অতঃপর বলবেন, "আমি তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক"। তারা বলবে, হ্যাঁ, আপনি আমাদের প্রভু-প্রতিপালক"।

মহান আল্লাহর আকার ও নিরাকার বিষয়ে ব্যাকরণ : এ ব্যাপারে ব্যাকরণ হচ্ছে সূরাহ আশ-শূরার ১১ নং আয়াতের শেষাংশ।

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ-

"তাঁর (আল্লাহর) সাদৃশ্য কিছুই নেই অথচ তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা"। এই আয়াতাংশের দুটি ভাগ রয়েছে। দ্বিতীয় অংশ গোপন করে শুধু প্রথমাংশ "মহান আল্লাহর সদৃশ কিছুই নেই" গ্রহণ করলে নিরাকারের দলীল হয়। আর উভয় অংশ গ্রহণ করলে মহান আল্লাহ সাকার সাব্যস্ত হয়। তবে মহান আল্লাহর আকারের মতো কারো আকার নেই, যেমনভাবে তাঁর শ্রবণের মতো কারো শ্রবণ নেই, তাঁর দর্শনের মতো কারো দর্শন নেই অর্থাৎ তাঁর আকার তাঁরই মতো।

চতুর্থ প্রশ্ন : "বান্দার সাথে আল্লাহর সম্পর্ক কী ?"

বান্দার সাথে মহান আল্লাহর সম্পর্কের বিষয় তাওহীদ ও ইবাদত এবং দ্বীন বলতে যা বুঝায়। মহান আল্লাহ বলেছেন, وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ - "আর আমি জিন ও মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছি শুধু আমার ইবাদতের জন্য" (আয-যারিয়াত, ৫১/৬৬)।

কবরের দ্বিতীয় প্রশ্ন ما دِينُكَ؟ "তোমার দ্বীন কী ?" দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলো হাদীছে জিবরীলে উল্লিখিত হয়েছে। গোটা দ্বীন পালনের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক সাব্যস্ত হয়। কমপক্ষে মৌলিক বিষয়গুলো অবশ্যই পালন করতে হবে।

কবরের তৃতীয় প্রশ্ন, مَنْ نَبِيُّكَ؟ "তোমার নবী কে ?" এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে অবশ্যই তাঁর সঠিক পরিচয় ও হক্বসমূহ জানতে হবে ও আদায় করতে হবে এবং কেবল তাঁর দিয়ে যাওয়া পদ্ধতি অনুযায়ী মহান আল্লাহর ইবাদত করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, একজন মুমিন-মুসলিম হিসাবে প্রত্যেককে মহান আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক ও স্বচ্ছ জ্ঞান অর্জন করা অপরিহার্য। কেননা ঈমান-আক্বীদা সঠিক না হলে আমল কাজে আসবে না। সঠিক ঈমান-আক্বীদার উপরই নির্ভর করে আমলের ক্ববূলিয়াত। যে রবের ইবাদত করব তাকে চিনতে ভুল করলে পরকালে আফসোস করা ছাড়া কিছুই করার থাকবে না। (আল-ইতিছাম অক্টোবর ও নভেম্বর ২০২১ সংখ্যা)

বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্মগুলোর শ্রেণীবিন্যাস

বিশ্বের ধর্মসমূহকে প্রথমত দুটো শ্রেণীতে বিন্যাস করা যায়-যথাঃ **(১) সেমিটিক ও (২) নন- সেমিটিক।**

নন-সেমিটিক ধর্মগুলোকে আবার দু' শ্রেণীতে ভাগ করা যায়- যথা ঃ **(ক) আর্য এবং (খ) অনার্য ।**

সেমিটিক ধর্মসমূহ

সেমিটিক ধর্মগুলো এমন ধর্ম যেগুলোর উদ্ভব ঘটেছে মূলত সেমিটীয় তথা হিব্রু, আরব, আসিরীয় ও ফিনিশীয় জনগোষ্ঠির মধ্যে। বাইবেলের বর্ণনানুসারে নূহ আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা-এর এক পুত্রের নাম ছিল **'শাম'**। শাম-এর বংশধরগণ **'সেমিটীয়'** নামে পরিচিত। সুতরাং সেমিটিক ধর্মগুলোর উৎপত্তি হয়েছে ইয়াহুদি, আরব, আসিরীয় ও ফিনিশীয়দের মধ্যে। প্রধান প্রধান সেমিটিক ধর্মগুলো হলো-ইয়াহুদি মতবাদ, খ্রিস্টীয় মতবাদ এবং ইসলাম। এ ধর্মগুলো পয়গাম্বরীয় ধর্ম যা মহান আল্লাহর নবীগণ কর্তৃক আনীত স্বর্গীয় নির্দেশনায় বিশ্বাসী।

নন-সেমিটিক ধর্মসমূহ

এটাকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ

(১) এরিয়াল বা আর্য এবং

(২) নন-এরিয়াল বা অনার্য।

আর্য ধর্মসমূহ

আর্য ধর্মসমূহের উৎপত্তি আর্য জাতির মধ্যেই, যারা ইন্দো-ইউরোপিয়ান ভাষাভাষী একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী। এরা খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ থেকে ১৫০০ পর্যন্ত ইরান এবং উত্তর ভারতে বসতি স্থাপন করেছিল।

আর্য ধর্মগুলো আবার বৈদিক ও অবৈদিক এ দু ভাগে বিভক্ত। বৈদিক ধর্মকে **'হিন্দুবাদ'** বা **'ব্রাহ্মণ্যবাদ'** নামে অভিহিত করা হয়। আর অবৈদিক ধর্মগুলো হলো-**শিখবাদ, বুদ্ধবাদ, জৈনবাদ** ইত্যাদি। সবকটি আর্য ধর্মই অপয়গাম্বরীয় ধর্ম অর্থাৎ কোনো নবী-রাসূল কর্তৃক এসব ধর্ম প্রবর্তিত হয় নি।

জরথুস্ত্রীয় ধর্মও একটি আর্য ও অবৈদিক ধর্ম যা হিন্দুবাদের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। এ ধর্মের দাবী হলো যে, এটা পয়গাম্বরীয় ধর্ম।

অনার্য ধর্মসমূহ

অনার্য ধর্মসমূহের উৎপত্তি বিভিন্ন প্রকারে হয়েছে। **'কনফুসীয়'** ও **'তাও'বাদের** উৎপত্তি হয়েছে চিনে। কিন্তু **শিন্টো** ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে জাপানে। এসব অনার্য ধর্মসমূহে **'মহান আল্লাহ'** সম্পর্কে কোনো ধারণার অস্তিত্ব নেই। এসব ধর্মকে মূলত কিছু কিছু নৈতিক নিয়মাবলির সমাহার বলাই ভালো।

কোন ধর্মে আল্লাহ'র যথার্থ সংজ্ঞা

কোনো ধর্মের অনুসারীদের **'মহান আল্লাহ'** সম্পর্কিত ধারণা কি, তা তাদের ব্যবহারিক জীবনকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ ছাড়া বিচার করা যায় না। এটা অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার যে, অনেক ধর্মের অনুসারীরা তাদের ধর্মগ্রন্থে **'মহান আল্লাহ'** সম্পর্কে কী বর্ণনা আছে তা জানে না। অতএব কোন ধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থে **''মহান আল্লাহ''** সম্পর্কে কী ধারণা দেয়া আছে সেটাই বিশ্লেষণ করা উত্তম।

তা হলে পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্মগ্রন্থগুলোতে **'মহান আল্লাহ'** সম্পর্কিত যে ধারণা দেওয়া হয়েছে সেটাই এখন বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।

হিন্দুধর্মে 'মহান আল্লাহ' সম্পর্কে ধারণা

আর্য ধর্মগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ধর্ম হলো **হিন্দুধর্ম**। **'হিন্দু'** শব্দটি মূলত একটি ফারসী শব্দ। সিন্ধু উপত্যকার আশে-পাশে বসবাসকারী অধিবাসীদেরকে **'হিন্দু'** নামে অভিহিত করা হয়। সে যাই হোক হিন্দুধর্ম বহুত্ববাদে বিশ্বাস সম্বলিত একটি সাধারণ ধর্ম। যার অধিকাংশ **'বেদ', 'উপনিষদ'** এবং **'শ্রীমৎ ভগবতগীতা'** প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের ওপর নির্ভরশীল।

হিন্দুধর্মে 'মহান আল্লাহ' সম্পর্কে সাধারণ ধারণা

হিন্দুধর্ম বহু ঈশ্বরবাদে বিশ্বাসী একটি ধর্ম। বস্তুত অধিকাংশ হিন্দুই এ বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত এবং তারা বহু ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। কতেক হিন্দু তিন ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, আবার কিছু হিন্দু তেত্রিশ কোটি দেবতায়ও বিশ্বাসী অর্থাৎ ৩ শত ৩০ মিলিয়ন দেবতা। তবে শিক্ষিত হিন্দুরা যারা ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে ভালো

ধারণা রাখে তারা বলে যে, একজন হিন্দুর উচিত এক ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা এবং এক ঈশ্বরের পূজা করা।

হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো ঈশ্বর সম্পর্কে উপলব্ধিতে। সাধারণভাবে হিন্দুদের বিশ্বাস সর্বেশ্বরবাদ তথা সর্বভূতে ঈশ্বর অর্থাৎ সবকিছুতে ঈশ্বর আছেন- এ দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত । যাকে ওয়াহদাতুল অজুদ বা ইলহাদ বলে।

সর্বেশ্বরবাদের মূলকথা হলো জৈব অজৈব সব কিছুই ঐশ্বরিক এবং পবিত্র। তাই হিন্দুরা গাছ, সূর্য, চন্দ্র, জীব-জন্তু এমনকি মানব প্রজাতির মধ্যেও ঈশ্বরের প্রকাশ উপলব্ধি করে এবং সাধারণ হিন্দুদের বিশ্বাস যে, প্রত্যেক বস্তুই ঈশ্বর। যেমন তারা বলে থাকে- "হরির উপর হরি, হরি শোভা পায়, হরিকে দেখিয়া হরি হরিতে লুকায়"।

অপরদিকে ইসলাম মানুষকে ধারণা প্রদান করে যে, মানুষ নিজে এবং তার পারিপার্শ্বিক সবকিছুই মহান আল্লাহর সৃষ্টির নমুনা মাত্র- এসব কিছু মহান আল্লাহ নয়। অন্য কথায় আমরা বিশ্বাস করি সবকিছুর মালিক মহান আল্লাহ। গাছ-পালা, সূর্য-চন্দ্র এবং এ বিশ্বে যা কিছু আছে সবই মহান আল্লাহর সৃষ্টি।

অতএব হিন্দু এবং মুসলিমের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো **Apostrophe 'S'** অর্থাৎ হিন্দুরা বলে, **'সবকিছুই ঈশ্বর'** আর মুসলিমরা বলে, **'সবকিছুই আল্লাহ'র**। পবিত্র কুরআন বলে-

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ -

অর্থ : এসো তোমাদের ও আমাদের মধ্যেকার একটি সাধারণ বিষয়ে। প্রথম সাধারণ বিষয় হলো আমরা মহান আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করবো না। (সূরাহ আলে ইমরান : ৬৪)

অতএব আসুন আমরা হিন্দু ও মুসলিমদের ধর্মগ্রন্থ বিশ্লেষণ করে তা থেকে উভয়ের মধ্যকার সামঞ্জস্যগুলো বের করার চেষ্টা করি।

শ্রীমৎ ভগবতগীতা

হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হলো **'শ্রীমৎ ভগবতগীতা'**। গীতার নিম্নোক্ত শ্লোক দেখুন-

"ঐ সব লোক যাদের বুদ্ধি মেধা বস্তুতান্ত্রিক ইচ্ছে কর্তৃক আচ্ছন্ন, তারা সাকার ঈশ্বরের অনুগত এবং তারা তাদের প্রকৃতি অনুসারে পূজার একটি নির্দিষ্ট নিয়ম পদ্ধতি অনুসরণ করে।" (ভগবতগীতা অধ্যায় ৭, শ্লোক ২০)

গীতা সিদ্ধান্ত দেয় যে, যারা বস্তুবাদী তারা সাকার ঈশ্বরের পূজা করে অর্থাৎ সত্যিকার নিরাকার ঈশ্বরের পাশাপাশি সাকার ঈশ্বরের পূজা করে।

উপনিষদ

হিন্দুরা উপনিষদকেও পবিত্র গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করে। উপনিষদের নিম্নোক্ত শ্লোকগুলো দেখুন :

১. **"একম ইভাদ্বিতীয়ম"** অর্থাৎ 'তিনি একক, দ্বিতীয় ছাড়া'। (Chandgya উপনিষদ ৬ : ২: ১)

২. "তার কোনো মাতা-পিতা নেই, কোনো প্রভুও নেই।"

(Svetasa vatara উপনিষদ) দ্বিতীয় খন্ড পৃ. ২৬৩)

৩. উপনিষদের নিম্নোক্ত শ্লোকগুলোও লক্ষ্য করুন ঃ

"তাঁর মতো কিছুই নেই।" (Svetasa vatara উপনিষদ অধ্যায় ৪ : ১৯)

"তাঁর মতো কিছু নেই যার নাম মহিমাময় উজ্জ্বল।"

(The Principal উপনিষদ কৃত এস. রাধাকৃষ্ণ পৃ. ৭৩৬ ও ৭৩৭)

(প্রাচ্যের পবিত্র গ্রন্থাবলি ভলিউম ১৫, উপনিষদ ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ২৫৩)

উপর্যুক্ত শ্লোকগুলোর সাথে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো তুলনা করুন-

وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ –

অর্থ : তাঁর সদৃশ কিছু নেই [কেউ নেই]। (সূরাহ ইখলাস : ৪)

يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ -

অর্থ : কোনো কিছুই এমন নেই যা তাঁর মত হতে পারে তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (সূরাহ শূরা : ১১)

৪. উপনিষদের নিম্নোক্ত শ্লোকগুলো আল্লাহর প্রকৃত রূপ ধারণ করতে মানুষের অক্ষমতা প্রকাশ করেছে-

"তাঁর রূপ দেখা যায় না, কেউ তাঁকে চোখে দেখে নি, যারা হৃদয় ও আত্মা দ্বারা তাঁকে উপলব্ধি করে, তাঁর উপস্থিতি অন্তরে অনুভব করে, তারাই অমরত্ব লাভ করে।" (Svetasa vatara উপনিষদ, ৪ : ২০)

পবিত্র কুরআন উপর্যুক্ত ধারণাকে নিম্নোক্ত আয়াতে প্রকাশ করে-

لَّا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ - وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ -

অর্থ : দৃষ্টিসমূহ তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারে না। অবশ্য তিনি দৃষ্টিসমূহকে পরিবেষ্টন করে আছেন। তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী সুবিজ্ঞ। (আন্'আম ঃ ১০৩)

বেদ

হিন্দুদের সকল ধর্মগ্রন্থের মধ্যে **'বেদ'** সবচেয়ে পবিত্র গ্রন্থ। তাদের প্রধান **'বেদ'** ৪টি- **(১) আয়ুর্বেদ (২) অথর্ববেদ (৩) ঋগবেদ (৪) শ্যামবেদ** ।

১. আয়ুর্বেদ

ক. আয়ুর্বেদের নিম্নোক্ত শ্লোকগুলো লক্ষ্য করুন : 'তার কোনো প্রতিরূপ বা প্রতিমা নেই।' (আয়ুর্বেদ ৩২ : ৩) এতে আরো উল্লিখিত হয়েছে-

"যেহেতু তিনি কিছু থেকে, কারো থেকে জন্ম নেন নি, তাই তিনি আমাদের উপাসনার উপযুক্ত।"

"তাঁর কোনো প্রতিরূপ বা প্রতিমা নেই, তাঁর মহিমা অত্যন্তমহান। তিনি তাঁর মধ্যে সকল উজ্জ্বল বস্তু ধারণ করেন। যেমন সূর্য। তিনি যেন আমার অকল্যাণ না ঘটান-এটাই আমার প্রার্থনা। যেহেতু তিনি কিছু থেকে বা কারো থেকে জন্ম নেন নি। তাই তিনি আমাদের উপাসনার উপযুক্ত।" (আয়ুর্বেদ : দেবীচাঁদ এম. এ. পৃ. ৩৭৭)

খ. "তিনি নিরাকার এবং পবিত্র।" (আয়ুর্বেদ ৪০ :৮)

"তিনি আলোময়, নিরাকার, নিস্পৃশ্য, পবিত্র, যাকে শয়তান বিদ্ধ করতে পারে না, তিনি অদৃশ্য, প্রাজ্ঞ, পরিবেষ্টনকারী, তিনি স্বয়ম্ভু।

তিনি যখন যা ইচ্ছে তা-ই করেন, তিনি চিরঞ্জীব।' (আয়ুর্বেদ ৪০:৮) (আয়ুর্বেদ সংহিতা : আই. এইচ গ্রীফিথ পৃ. ৫৩৮)

গ. আয়ুর্বেদে আরো উল্লিখিত আছে- "তারাই অন্ধকারে প্রবেশ করে যারা প্রাকৃতিক বস্তুর উপাসনা করে, যেমন বায়ু, পানি, আগুন ইত্যাদি। তারা গভীর অন্ধকারে ডুবে যায়- যারা **'শম্ভূতি'**র উপাসনা করে। **'শম্ভূতি'** হলো সৃষ্ট বস্তু যেমন টেবিল, চেয়ার, প্রতিমা ইত্যাদি। (আয়ুর্বেদ ৪০ : ৯)

ঘ. আয়ুর্বেদে এ প্রার্থনা এভাবে উল্লিখিত হয়েছে :

"আমাদের ভালো পথে পরিচালিত করুন এবং আমাদের পাপরাশি মুছে ফেলুন যা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত করে।" (আয়ুর্বেদ ৪০ :১৬)

২. অথর্ববেদ

অথর্ববেদের এ শ্লোকগুলো লক্ষ্য করুন : "দেব মহা অসি" অর্থাৎ ঈশ্বর অত্যন্ত মহান। (অথর্ববেদ ৩০ : ৫৮ : ৩)

"যথার্থই তুমি আলোময়, তোমার প্রকাশ মহান, তুমিই সত্য, অদ্বিতীয়, তোমার প্রকাশ মহান, যেহেতু তোমার প্রকাশ মহান, তাই তোমার মহানত্ব সর্ব স্বীকৃত, সত্যই মহান তোমার প্রকাশ, হে ঈশ্বর !" (অথর্ববেদ সংহিতা ভলিউম ২ উইলিয়াম সাইট হুইটনি, পৃ. ৯১০)পবিত্র কুরআন মাজীদের সূরাহ রা'দ-এ একই ভাব প্রকাশিত হয়েছে। - عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ

আলিমুল গাইবি অশশাহাদাতিল কাবিরু ল মুতাআলি।

অর্থ : তিনিই একমাত্র মহান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। (রা'দ :৯)

৩. ঋগবেদ

ক. সকল বেদের মধ্যে প্রাচীনতম হলো **ঋগবেদ**। হিন্দুরা এটাকে অত্যন্ত পবিত্র মনে করে। ঋগবেদে বর্ণিত আছে যে, 'জ্ঞানী ঋষিগণ এক ঈশ্বরকে বহু নামে ডাকে।' (ঋগবেদ ১: ১৬৪: ৪৬)

খ. ঋগবেদে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কমপক্ষে ৩৩ টি বিভিন্ন গুণবাচক নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এর বেশিরভাগ উল্লিখিত হয়েছে ঋগবেদ ২য় পুস্তকে ১ম শ্লোকে।

ঋগবেদে উল্লিখিত সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের গুণবাচক নামগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর নাম হলো **'ব্রহ্মা'** অর্থাৎ **'স্রষ্টা'**। এ শব্দের আরবি প্রতিশব্দ হলো **'আল-খালিক'**।

'ব্রহ্মা' দ্বারা Creator বা **'স্রষ্টা'** নেয়া হলে এবং এর দ্বারা সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহকে বুঝালে মুসলমানদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু মুসলমানরা কখনো এমত সমর্থন করে না যে, 'ব্রহ্মা,-ই স্রষ্টা বা খালিক যার মাথা ৪ টি। (আমরা এ বিভ্রান্তি থেকে মহান আল্লাহর আশ্রয় চাই।) মুসলমানরা এর চরম ব্যতিক্রমী মত পোষণ করে। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে 'নরবিজ্ঞান' শাস্ত্রের পরিভাষায় প্রকাশ করা স্বয়ং আয়ুর্বেদের নিম্নোক্ত বক্তব্যেরও পরিপন্থী- **'ন তস্যৎ প্রতিমা অস্তি'** অর্থাৎ **'তার কোনো সদৃশ বা প্রতিমা নেই।'** (আয়ুর্বেদ ৩২ ঃ ৩)

ঋগবেদ দ্বিতীয় পুস্তক প্রথম চরণ শ্লোক ৩ (আর বি ২: ১: ৩)-এ উল্লিখিত হয়েছে **'বিষ্ণু'** অর্থাৎ **'প্রতিপালক'** যার আরবি প্রতিশব্দ **'রব'** এতেও মুসলমানদের কোনো আপত্তি নেই যে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে **'রব' 'সাসটেইনার'** বা **'বিষ্ণু'** নামে ডাকা হবে। কিন্তু হিন্দুদের সার্বজনীন ধারণা বিষ্ণুর হাত চারটি। তিনি ডান দিকের এক হাতে **'চক্র'** (ভারী চাকা), আর বাম দিকের এক হাতে **'কঞ্চ'** (শামুক) ধারণ করে আছেন। তিনি একটি পাখির উপর অথবা সর্পাসনে উপবেশন করে আছেন। মুসলমানরা কখনো ঈশ্বরের এমন ধারণাকে গ্রহণ করতে পারে না। উপরোল্লিখিত বিশ্বাসও আয়ুর্বেদের অধ্যায় ৪০ শ্লোক ১৯-এর সাথে সাংঘর্ষিক।

গ. ঋগবেদের নিম্নোক্ত শ্লোক লক্ষ্যণীয়-

"বন্ধুগণ, তাঁকে ছাড়া আর কাউকে উপাসনা করো না, যিনি একমাত্র ঈশ্বর।" [ঋগবেদ ৮ : ১ : ১] [ঋগবেদ সংহিতি (Vol-9) পৃ. ১ ও ২ স্বামী সত্য প্রকাশ স্বরস্বতী সত্যকাম বিদ্যালঙ্কার]

হিন্দু বেদান্তবাদের ব্রহ্মাস্তত্র

হিন্দু বেদান্তবাদের ব্রহ্মাস্তত্র হলো- **'একম ব্রহ্মা, দ্বিতীয়া ন্যস্ত নেহন ন্যস্ত কিঞ্চন।'** অর্থাৎ 'ঈশ্বর একক-দ্বিতীয় নেই। মোটেই নেই মোটেই নেই, একেবারেই নেই।' যা হোক হিন্দুধর্মের পবিত্র গ্রন্থসমূহ থেকে উদ্ধৃত বিষয়ের মাধ্যমে আমরা হিন্দুধর্মে ঈশ্বরের ধারণা সম্পর্কে অবগত হতে পারলাম।

৪. শিখ ধর্মে মহান আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা

শিখ ধর্ম একটি অসেমিটিক, আর্য ও অবৈদিক ধর্ম। এটা যদিও প্রধান ধর্মসমূহের তালিকাভুক্ত নয়, কিন্তু এটা হিন্দু ধর্মেরই একটি শাখা যা গুরু নানক কর্তৃক পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রবর্তিত। এটা সংগঠিত হয়েছে পাকিস্তানের এলাকায় এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের পাঞ্জাব অঞ্চলে, যা পঞ্চনদের অববাহিকা। গুরু নানক একটি ক্ষত্রিয় (যোদ্ধা গোত্রে) হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি গভীরভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের দ্বারা প্রভাবিত হন।

'শিখ' এবং 'শিখবাদ'-এর সংজ্ঞা

'শিখ' শব্দটি **'শিষ্য'** শব্দটি থেকে উদ্ভূত। শিষ্য অর্থ ভক্ত বা অনুসারী (Diciple, Follower)। **'শিখ'** ধর্ম দশজন গুরুর ধর্ম। প্রথম **গুরু নানক** এবং ১০ ম ও শেষ গুরু হলেন গুরু **গোবিন্দ শিং**। শিখদের পবিত্র গ্রন্থ শ্রী গুরু গ্রন্থ যাকে **'আদি গ্রন্থসাহেব'** ও বলা হয়ে থাকে।

পাঁচ 'ক'

প্রত্যেক **'শিখ'-কে পাঁচ 'ক'** ধারণ করতে হয়, যা তাদের ধর্মীয় পরিচিতি বহন করে।

(এক) 'কেশ' – অকর্তিত কেশ বা চুল, যা সকল গুরুই রাখে।

(দুই) 'কঙ্গ' – চিরুনী যা চুলকে পরিচ্ছন্ন রাখতে ব্যবহার করা হয়।

(তিন) 'কাদা' – লোহা বা অন্য ধাতুর তৈরি বালা বা কঙ্কন, যা শক্তি-ক্ষমতা বা আত্মসংযমের প্রতীক।

(চার) 'কৃপাণ' – ত্রিফলা খঞ্জর যা আত্মরক্ষার্থে ব্যবহৃত হয়।

(পাঁচ) 'কাচ্চা' – জানু পর্যন্ত লম্বা অন্তর্বাস বিশেষ যা কর্মতৎপরতার পক্ষে সুবিধাজনক।

মূলমন্ত্র : শিখ ধর্মের মৌলিক বিশ্বাস

ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণা দিতে শিখরা তাদের পবিত্র গ্রন্থের শুরুতে **'মূলমন্ত্র'** উদ্ধৃত করে থাকে-এটা তাদের মৌলিক বিশ্বাস, যা **গুরু গ্রন্থ সাহেব**-এর শুরুতে উল্লিখিত আছে। গুরু গ্রন্থ সাহেব-ভলিউম-১, জাপূজী-এর প্রথম শ্লোকে উল্লিখিত হয়েছে- **"ঈশ্বর মাত্র একজন যাকে বলা হয় সত্যিকার সৃষ্টিকর্তা, তিনি ভয় ও ঘৃণা থেকে উর্ধ্বে। তিনি অমর, তিনি জাতকহীন, তিনি স্বয়ম্ভু, তিনি মহান এবং করুণাময়।"**

শিখধর্ম তার অনুসারীদেরকে কঠোরভাবে একত্ববাদের দীক্ষায় দীক্ষিত করে। এ ধর্ম এই সার্বভৌম বিমূর্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, যাকে **'এক ওমকারা'** বলে। **'ওমকারা'** পরিচয় প্রকাশে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লিখিত হয়েছে-

'করতার'	– স্রষ্টা বা সৃষ্টিকর্তা।
'সাহিব'	– প্রভু।
'অকাল'	– আদি-অন্তহীন।
'সত্যনামা'	– পবিত্র নাম।
'পরওয়ারদিগার'	– প্রতিপালক।
'রহীম'	– দয়াময়।
'করিম'	– সদাশয়।

তাঁকে **'ওয়াহি গুরু'** অর্থাৎ একক সত্য ঈশ্বরও বলা হয়। শিখ ধর্ম কঠোরভাবে একত্ববাদ হলেও তা **'অবতারবাদ'**- এ বিশ্বাস করে না। **'অবতারবাদ'** হলো ঈশ্বরের মানবাকৃতিতে পৃথিবীতে আগমন সংক্রান্ত মতবাদ। তাদের মতে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর কখনো **'অবতার'** রূপে মানব আকৃতিতে পৃথিবীতে আগমন করেন না। তারা মূর্তি পূজারও ঘোর বিরোধী।

গুরু নানক, "কবীর" কর্তৃক প্রভাবিত

গুরু নানক **'কবীর'** নামক এক মুসলিম সাধক-এর শিক্ষায় প্রভাবিত হন। **'শ্রী গুরু নানক সাহেব'**-এর বিভিন্ন অধ্যায়ে **"সাধক কবীর"** রচিত চরণগুলো উল্লিখিত আছে। কয়েকটি চরণ নিচে উল্লিখিত হলো-

"দুঃখ মেঁ সুমিরানা সব করেঁ সুখ মেঁ করেঁ

না কয়া জু সুখ মেঁ সুমিরানা করেঁ তু দুখ কায়ে হুয়ে"।

অর্থাৎ বিপদে পড়লে সবাই স্রষ্টাকে স্মরণ করে, কিন্তু শান্তি ও সুখের সময় কেউ তাঁর স্মরণ করে না। যে শান্তি ও সুখের সময় তাঁকে স্মরণ করবে তার কেন বিপদ হবে ?"

ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ পবিত্র কুরআন মাজীদে নিম্নোক্ত আয়াত উপরোক্ত চরণের সাথে তুলনা করুন-

وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا - إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ -

অর্থ : আর যখন মানুষের ওপর কোন দুঃখ-দৈন্য এসে পড়ে তখন সে তার প্রতিপালককে ডাকতে থাকে একনিষ্ঠভাবে তার অভিমুখী হয়ে, অতঃপর তিনি যখন তাকে নিজের পক্ষ থেকে নিয়ামত দান করেন, তখন সে ভুলে যায় সে কথা, যার জন্য পূর্বে তাকে ডাকছিল এবং মহান আল্লাহর শরিক সাব্যস্ত করে, যাতে অপরকে মহান আল্লাহর পথ থেকে ভ্রষ্ট করতে পারে। (আল কুরআন-৩৯ ঃ ৮)

৫. জরথুস্ত্রীয় ধর্মে ঈশ্বরের ধারণা

জরথুস্ত্রীয় ধর্মে প্রাচীন আর্য ধর্মের অন্তর্গত একটি ধর্ম। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে পারস্যে এ ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। এ ধর্মমতের অনুসারীর সংখ্যা কম হলেও সারা বিশ্বে এর অনুসারির সংখ্যা এক লক্ষ ত্রিশ হাজারের কম নয়। এটা প্রাচীন ধর্মগুলোর একটি। ইরানি নবী **জরস্টারকে** এ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ধরা হয়। এ ধর্ম **'পারসি ধর্ম'** হিসেবেও পরিচিত। এ ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ হলো **'দসতির' ও 'আবেস্তা'**। জরথুস্ত্রীর ধর্মে 'ঈশ্বর' **'আহুরা মাজদা'** নামে পরিচিত। **'আহুরা' অর্থ প্রভু, আর 'মাজদা' অর্থ প্রাজ্ঞ**। আর তাই **'আহুরা মাজদা' অর্থ 'প্রাজ্ঞ প্রভু'**। **'আহুরা মাজদা'** দ্বারা একক অদ্বিতীয় প্রভুকে বুঝানো হয়ে থাকে।

দসতীর অনুসারে ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য

দসতীর অনুসারে **'আহুরা মাজদার'** নিম্নের গুণাবলী রয়েছে-

১.তিনি একক।

২. কিছুই তাঁর সদৃশ নয়।

৩. তিনি আদি অন্তহীন।

৪. তাঁর পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র কিছুই নেই।

৫. তাঁর কোনো আকার-আকৃতি নেই।

৬. দৃষ্টি তাকে প্রত্যক্ষ করতে পারে না এবং কল্পনা শক্তিও তাঁকে আয়ত্ব করতে অক্ষম।

৭. তিনি মানবীয় ধারণা-কল্পনার বহু ঊর্ধ্বে।

৮. তিনি মানুষের নিজের চেয়েও নিকটতর।

'আবেস্তা' অনুসারে ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য

'আবেস্তা'-তে **'গাথা'** ও **'ইয়াসনা' 'আহুরা মাজদা'**র যে বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছে তা হলো-

১. সৃষ্টিকর্তা (ইয়াসনা ৩১ : ৭ ও ১১) (ইয়াসনা ৪৪ : ৭) (ইয়াসনা ৫০ : ১১) (ইয়াসনা ৫১ : ৭)

২. সর্বশক্তিমান– শ্রেষ্ঠ (ইয়াসনা ৩৩ : ১১), (ইয়াসনা ৪৫ : ৬)

৩. করুণাময়- 'হুদাই' (ইয়াসনা ৩৩ : ১১) (ইয়ানা ৪৮ : ৩)

৪. দানশীল- 'স্পেন্তা' (ইয়াসনা ৪৩ : ৪, ৫, ৭, ৯, ১১, ১৩, ১৫) (ইয়াসনা ৪৪ : ২)(ইয়াসনা ৪৫ : ৫) (ইয়াসনা ৪৬ : ৯) (ইয়াসনা ৪৮ : ৩)

৬. ইয়াহুদি ধর্মে মহান আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা

ইয়াহূদি ধর্ম প্রধান সেমিটিক ধর্মসমূহের অন্যতম। এর অনুসারীদেরকে **'ইয়াহূদি'** নামে অভিহিত করা হয়। তারা নিজেদেরকে মূসা কলিমুল্লাহ আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা প্রচারিত ধর্মে বিশ্বাসী বলে দাবি করে।

১. নিম্নোক্ত শ্লোকটি বাইবেল **'পুরাতন নিয়ম'**- এর **'ডিওটারেনমি'** অধ্যায়ে উদ্ধৃত মূসা আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা-এর উপদেশনামা থেকে গৃহীত। **"শামা ইজরাঈলিউ আদোনাই ইলা হাইনো আদনা ইশাদ।"**

এটা একটা হিব্রু ভাষার বাইবেল পুরাতন নিয়ম থেকে উদ্ধৃত শ্লোক। এর অর্থ- **"ইসরাঈলীরা শোনো, আমাদের প্রভু ঈশ্বর একক।"** (বাইবেল, ডিওটারেনমি ৬ : ৪)

২. বাইবেলের **'ঈসাইয়্যাহ'** অধ্যায়ে উল্লিখিত নিম্নোক্ত শ্লোকগুলো লক্ষ্য করুন- "আমি, আমিই একমাত্র প্রভু এবং আমি ছাড়া অন্য কোনো ত্রাণকর্তা নেই।" (বাইবেল, ঈসাইয়্যাহ ৪৩ : ১১)

৩. "আমি-ই প্রভু, এবং এ ছাড়া আর কেউ নেই, আমি ছাড়া আর কোনো ঈশ্বর নেই।" (বাইবেল, ঈসাইয়াহ ৪৫ : ৫)

৪. "আমি-ই ঈশ্বর এবং এ ছাড়া আর কেউ নেই, আমি-ই ঈশ্বর এবং আমার সদৃশ কেউ নেই।" (বাইবেল, ঈসাইয়াহ ৪৬ : ৯)

৫. ইয়াহূদি ধর্মে প্রতিমা পূজাকে নিম্নোক্ত শ্লোকসমূহে নিন্দা করা হয়েছে-"আমার পাশাপাশি তুমি অন্য কাউকে ঈশ্বর হিসেবে গ্রহণ করবে না, তুমি নিজের জন্য কোনো প্রতিমা তৈরি করবে না, অথবা ঊর্ধ্বকাশে অথবা পৃথিবীতে আছে অথবা ভূগর্ভে জলে আছে এমন কোন কিছুর সদৃশ স্থির করবে না, তুমি তাদের সামনে বিনীত হবে না, আর না তাদের দর্শন করবে, কেননা আমি-ই একমাত্র প্রভু, তোমার ঈশ্বর, ঈর্ষাপরায়ণ ঈশ্বর....।" (বাইবেল, এক্সোডাস ২০ : ৩-৫)

৬. বাইবেলের ডিওটারোনমিতে একই কথা পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে-

"আমার পাশাপাশি অন্য কাউকে ঈশ্বর হিসেবে গ্রহণ করবে না, তুমি কোনো কিছুর প্রতিমা তৈরি করবে না, অথবা ঊর্ধ্বাকাশে, পৃথিবীতে অথবা ভূগর্ভে জলে যা কিছু আছে তার কোনো কিছুর সদৃশ তৈরি করবে না, এসবের সামনে তুমি কখনো বিনীত হবে না, আর তাদের উপাসনাও করবে না, কেননা, আমি একমাত্র প্রভু, তোমার ঈশ্বর ঈর্ষাপরায়ণ ঈশ্বর....।" (বাইবেল, ডিওটারোনমি ৫ ঃ ৭-৯)

৭. খ্রিস্টধর্মে ঈশ্বরের ধারণা

খ্রিস্টধর্মও একটি সেমিটিক ধর্ম। খ্রিস্টানদের দাবি অনুসারে সারা বিশ্বে দুই শত কোটি অনুসারী রয়েছে। যীশু খ্রিস্ট তথা ঈসা আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা-এর নামানুসারে খ্রিস্টধর্মের নামকরণ করা হয়েছে। ঈসা রুহুল্লাহ আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা ইসলাম ধর্মেও অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। খ্রিস্ট ধর্ম ছাড়া অন্য সকল ধর্মমতের মধ্যে একমাত্র ইসলামই ঈসা আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা-এর নবুওয়াতে বিশ্বাস স্থাপন ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। খ্রিস্টধর্মে ঈশ্বরের ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করার আগে

ইসলামে ঈসা আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা-এর মর্যাদা পরীক্ষা করে দেখা যাক।

১. অ-খ্রিস্টান ধর্মগুলোর মধ্যে ইসলাম-ই একমাত্র ধর্ম যাতে ঈসা আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা-এর উপর বিশ্বাস পোষণ ঈমান তথা বিশ্বাসের মৌলিক নীতি হিসেবে মনে করা হয়। ঈসা আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা-কে নবী হিসেবে বিশ্বাস না করে কোনো মুসলিম-ই পুরোপুরি মুসলমান হতে পারে না।

২. আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি মহান আল্লাহ তা'আলার একজন মর্যাদাশালী নবী ছিলেন।

৩. আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি কোনো পুরুষের সংস্রব ছাড়া অলৌকিকভাবে পিতৃবিহীন জন্মগ্রহণ করেছেন, যা আধুনিকালের অনেক খ্রিস্টান মানতে চান না।

৪. আমরা বিশ্বাস করি যে, মহান আল্লাহর হুকুমে তিনি মৃতকে জীবন দান করতে পারতেন।

৫. আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি মহান আল্লাহর হুকুমে জন্মান্ধকে দৃষ্টিদান করতে এবং কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য দান করতে সক্ষম ছিলেন।

কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, মুসলিম ও খ্রিস্টান উভয়ই যদি ঈসা আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা-কে ভালোবাসে ও সম্মান করে, তাহলে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কোথায় ? ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হচ্ছে, খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীরা ঈসা আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা-কে ঐশ্বরিক গুণসম্পন্ন সত্তা ও উপাস্যের যোগ্য মনে করে, যা ইসলাম স্বীকার করে না। খ্রিস্টধর্মের পবিত্র গ্রন্থ অধ্যয়নে জানা যায় যে, ঈসা আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা কখনো নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করেন নি। মূলত বাইবেলের নতুন নিয়মে এ জাতীয় দাবি সম্বলিত একটি বাক্যও খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে তিনি বলেছেন **'আমি ঈশ্বর'** অথবা **'আমাকে উপাসনা করো।'** বরং বাইবেলে এমন একাধিক বাক্য রয়েছে যা এর বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে। দেখা যাক বাইবেলে উদ্ধৃত তার বাক্যগুলোতে কী আছে–

"My Father is Greater than me or I."

"আমার পিতা আমার চেয়ে মহান।" (যোহন ১৪ : ২৮)

"My Father is Greater than all."

"আমার পিতা সবার চেয়ে মহান।" (যোহন ১০ : ২৯)

"...I cast our devils by the spirit of the God..."

"... আমি সকল মন্দ আত্মাকে তাড়াই ঈশ্বরের শক্তিতে...।" (মথি ১২ ঃ ২৮)

"...With the finger of the God cast our devils..."

"...ঈশ্বরের সাহায্যেই আমি মন্দ দূর করি।" (লূক ১১ : ২০)

'আমি নিজ থেকে কিছুই করতে পারি না, আমি যেমন শুনি তেমন–ই বিচার করি এবং আমার বিচার সঠিক। কেননা আমি নিজের ইচ্ছেয় কিছু করতে চাই না, বরং যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, সেই পিতার ইচ্ছে অনুসারেই আমি কাজ করতে চাই।'

যীশু খ্রিস্টের মিশন– তিনি এসেছিলেন আইনকে পূর্ণ করতে

যীশু কখনো নিজের ঐশ্বরিকতার দাবি করেন নি। অর্থাৎ তিনি নিজেকে **'ঈশ্বর'** বা **'ঈশ্বরের পুত্র'** বলে দাবি করেন নি। তিনি তাঁর মিশনের প্রকৃতি সম্পর্কে পরিষ্কার করে বলেছেন। ইতিপূর্বেকার কিতাব তাওরাতকে পূর্ণতা দানের জন্য ঈশ্বর তাকে পাঠিয়েছেন, যা ইয়াহূদীদের হাতে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। মথি লিখিত সুসমাচারের (Gospel) নিম্নোক্ত বর্ণনায় ঈসা আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা–এর নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে–

"তোমরা মনে করো না যে, আমি আইন তথা মূসা আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা-এর তাওরাতের বিধান অথবা নবীদের বিধান ধ্বংস করতে এসেছি। আমি ধ্বংস করতে আসি নি, বরং সেসব পূর্ণ করতে এসেছি। আমি তোমাদেরকে সত্যই বলছি– আকাশ ও পৃথিবী যতদিন চলতে থাকবে ততদিন সেই বিধানের কোনো একটি মাত্রা বা একটি বিন্দুও মুছে যাবে না, যতক্ষণ না পরিপূর্ণ হয়।"

"অতঃপর যে কেউ এ সব বিধানের ছোট একটি বিধানও অমান্য করবে এবং মানুষকে তা অমান্য করতে শিক্ষা দেবে, তাকে স্বর্গরাজ্যে সবচেয়ে

ছোট মনে করা হবে। অপরদিকে যে কেউ বিধানসমূহ পালন করবে এবং মানুষকে তা পালন করতে শিক্ষা দেবে, তাকে স্বর্গরাজ্যে অত্যন্ত মর্যাদাবান মনে করা হবে।" (বাইবেল মথি, ৫ : ১৭-২০)

যিশু ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ

বাইবেল নিচের শ্লোকগুলোতে যিশুর মিশনের ঐশ্বরিক প্রকৃতি সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছে–

"and the word which ye (i.e.you) hear is not mine, but the Father's which has sent me."

অর্থ : "এবং তোমরা যা আমার থেকে শোনো, তা-তো আমার কথা নয় এবং সেসব কথা পিতার যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।" (বাইবেল যোহন ১৪ : ২৪)

"And this is life eternal, that they might know thee, the only true God and Jesus Christ, whom thou has sent."

অর্থ : "এবং এটাই শাশ্বত জীবন যে, তারা তোমাকে তথা সত্য ঈশ্বরকে আর তুমি যাকে পাঠিয়েছ সেই যীশু খ্রিস্টকে জানবে।" (বাইবেল যোহন ১৭ : ৩)

যিশু তার উপর দেবত্ব আরোপের বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছেন। বাইবেলে উল্লিখিত নিচের ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করুন–

"And behold, one came and said unto him, Good master, what good thing shall I do, that I may have eternal life ?" And he said unto him- "Why callest thou me good? There is none good but one, that is the God, but if thou will enters into life, keeps the commandments."

অর্থ : 'এবং দেখো, একজন লোক আসলো এবং যিশুকে বললো– ওহে ভালো প্রভু! আমাকে এমন ভালো কাজ সম্পর্কে বলুন, যা করলে আমি অনন্ত জীবন লাভ করতে পারবো।' **যিশু তাকে বললেন,** 'আমাকে ভালো বলছো কেন, এক ছাড়া কেউ ভালো নেই, আর তিনি

হলেন **'ঈশ্বর'** তুমি যদি অনন্ত জীবন লাভ করতে চাও, তবে তাঁর সব আদেশ পালন করো।' এ বিবরণ দ্বারা যিশুর **'ঈশ্বর'** হওয়া সংক্রান্ত খ্রিস্টানদের মতবাদ এবং যিশুর আত্মত্যাগের মাধ্যমে তাদের পরিত্রাণ লাভের মতবাদ বাইবেল প্রত্যাখ্যান করেছে। যিশু মানবজাতীর চূড়ান্ত মুক্তি লাভের জন্য স্রষ্টার আদেশ-নিষেধ মেনে চলার উপর জোর দিয়েছেন। (বাইবেল মথি ৫ : ১৭-২০)

নাজারাথবাসী যিশু– ঈশ্বরের মনোনীত এক মানুষ

বাইবেলের নিম্নোক্ত বিবরণ ইসলামী এ বিশ্বাসকে সমর্থন করে যে, যিশু আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা মহান আল্লাহর নবী ছিলেন–

"Ye men of lsrael, hear these words : Jesus of Nazareth, man approved of God among you by miracles and wonders and sings, which God did by him in the midst of you, as ye yourselves also know."

অর্থ : 'হে ইসরাঈলীরা এ কথাগুলো শোনো : নাজারাথবাসী, যিশু ঈশ্বরের মনোনীত একজন মানুষ যিনি ঈশ্বরের অলৌকিক, আশ্চর্যজনক নিদর্শন। ঈশ্বর তার দ্বারা যা করেছেন তা তোমাদের মধ্য থেকেই করেছেন যা তোমরা নিজেরাই জানো।'

সর্বপ্রথম নির্দেশ- ঈশ্বর একক-অদ্বিতীয়

বাইবেল খ্রিস্টানদের ত্রিত্ববাদ কখনো সমর্থন করে না। একদা বাইবেলের একজন লিপিকার যিশুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, ঈশ্বরের সর্বপ্রথম নির্দেশ কোন্‌টি? এর উত্তরে তিনি তা-ই পুনরুক্তি করলেন যা মূসা আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা বলেছিলেন- **'শামা ইসরাঈলু আদোনাই ইলা হাইনো আদনা ইখাত'** এটা একটা হিব্রু উদ্ধৃতি যার অর্থ হলো– 'হে ইসরাঈলীরা শোনো! আমাদের প্রভু ঈশ্বর একক প্রভু।' (মার্ক ১২ : ২৯)

৮. ইসলামে মহান আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা

ইসলাম একটি সেমিটিক ধর্ম। সারা বিশ্বে ইসলামের একশত বিশ কোটি (মতান্তরে একশত পঞ্চাশ কোটি) অনুসারী রয়েছে। **'ইসলাম'** অর্থ মহান আল্লাহর ইচ্ছেতে আত্মসমর্পণ। মুসলমান পবিত্র কুরআনকে মহান আল্লাহর বাণী হিসেবে গ্রহণ করে, যা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-

তাসলিমা এর উপর নাযিল করা হয়েছিল। ইসলাম বলে যে, মহান আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে একত্ববাদের দাওয়াত এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জবাবদিহিতার বার্তা নিয়ে তাঁর দূত এবং নবীদেরকে প্রেরণ করেছেন। সুতরাং ইসলাম অতীতকালের সকল নবী-রাসূল তথা আদম আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা থেকে নিয়ে যত নবী-রাসূল দুনিয়াতে এসেছেন তাদের সকলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করাকে তার বিশ্বাসের মূলনীতি হিসেবে নির্ধারণ করেছে। এদের মধ্যে রয়েছেন নূহ আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা, লুত আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা, ইসমাঈল আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা, ইসহাক আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা, ইয়াকুব আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা, মূসা আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা, দাউদ আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা, সোলায়মান আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা, ইউনুস আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা, জাকারিয়া আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা, হারুন আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা, ইয়াসা আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা, ইয়াহ্ইয়া আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা ও ঈসা আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা এবং অন্য সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুস সালাম আত্-তাসলিমা।

ঈশ্বরের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঈশ্বর তথা মহান আল্লাহর সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া হয়েছে পবিত্র কুরআন মাজীদের ১১২ নং সূরাহ ইখলাসের চারটি আয়াতের মাধ্যমে–

১. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- বলুন, তিনি মহান আল্লাহ একক (অদ্বিতীয়)।

২. اللَّهُ الصَّمَدُ- মহান আল্লাহ মুখাপেক্ষিহীন।

৩. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ- তিনি কাউকে জন্মদান করেন নি, কারো থেকে তিনি জন্মগ্রহণ করেন নি।

৪. وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ- আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। (সূরাহ ইখলাস : ১-৪)

এ সূরাহয় উল্লিখিত **'আস-সামাদ'** আরবি শব্দটির যথার্থ অনুবাদ একটু কঠিন। তবে এর মূল অর্থের কাছাকাছি অর্থ হলো Absolute existence অর্থাৎ **পরম অস্তিত্ব**।

এটা একমাত্র মহান আল্লাহর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, কেননা অন্য সকল কিছুর অস্তিত্ব অস্থায়ী ও শর্তসাপেক্ষ। এ শব্দ দ্বারা এ অর্থও প্রকাশিত হয় যে, মহান আল্লাহ কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর ওপর নির্ভরশীল নন বরং সকল ব্যক্তি বা বস্তু তাঁর উপরই নির্ভরশীল এবং তাঁরই মুখাপেক্ষী। (**'আস-সামাদ'** শব্দের বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানতে হলে মৎ প্রণীত আলোড়ন সৃষ্টিকারী পুস্তক **"সত্যিকারের মুমিন-মুসলিমের পরিচয়"** নামক পুস্তকটি দয়া করে পাঠ করুন।)

সূরাহ ইখলাস-ধর্মতত্ত্বের কষ্টিপাথর

সূরাহ ইখলাসকে (সূরাহ : ১১২) পবিত্র কুরআন মাজীদের কষ্টিপাথর বলা যায়। গ্রিক ভাষার **'থিও'** অর্থ ঈশ্বর আর **'লজি'** অর্থ জ্ঞানার্জন। **'থিওলজি'** অর্থ ঈশ্বর তথা মহান আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন সংক্রান্তবিদ্যা। সূরাহ ইখলাসের এ চারটি লাইন প্রত্যেক মুসলমানের জন্য মহান আল্লাহ সংক্রান্ত জ্ঞানের কষ্টিপাথর হিসেবে বিবেচিত। প্রত্যেক উপাস্যের দাবিদারকে অবশ্যই এ সূরাহর কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত হতে হবে। মহান আল্লাহর যে পরিচয় এ সূরাহয় দেয়া হয়েছে, তার আলোকে মিথ্যা দেব-দেবী এবং ঐশ্বরিকতার দাবিদারদের মিথ্যা দাবি অত্যন্ত সহজেই নাকচ হয়ে যায়।

মানুষের ঈশ্বর হওয়ার দাবি সম্পর্কে ইসলামের বক্তব্য

ভারতীয় উপমহাদেশ হলো মানব-ঈশ্বরের দেশ। এটা এজন্য যে, এখানে তথাকথিত আধ্যাত্মিক গুরুর সংখ্যা অগণিত। এ সমস্ত **'বাবা'** এবং **'গুরু'**র অনুসারীরা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে রয়েছে। মানুষের প্রতি দেবত্ব আরোপ করাকে ইসলাম নিন্দা করে।

মানুষের প্রতি দেবত্ব আরোপ সংক্রান্ত ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান বুঝার জন্য এরূপ এক মানব-ঈশ্বর **'ভগবান রজনীশ'** সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। রজনীশ হলেন ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম আধ্যাত্মিক গুরু। ১৯৮১ সালের মে মাসে তিনি আমেরিকা গমন করেন এবং সেখানে **'রজনীশপূরম'** নামে একটি শহর প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে তিনি পাশ্চাত্যের রোষাণলে পড়েন ও গ্রেফতার হন। অবশেষে তিনি সে দেশ থেকে বহিস্কৃত হন। তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং তার জন্মভূমি পুনা'-তে **'ওশো'** নামে আরেকটি শহর প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৯০ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ওশোতে রজনীশের অনুসারীরা বিশ্বাস করেন যে, তিনি ছিলেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের মানবরূপ তথা অবতার। একজন পর্যটক **'ওশো'** জনপদে ভ্রমণ করলে দেখতে

পাবে যে, তাঁর অনুসারীরা তাঁর সমাধি-ফলকে পাথরে খোদাই করে লিখে রেখেছে যে, **'ওশো রজনীশ কখনো জন্মগ্রহণ করেন নি। কখনো মৃত্যুবরণ করেন নি। তিনি কেবল পৃথিবী গ্রহটি পরিদর্শন করে গেছেন-১১ ডিসেম্বর ১৯৩১ সাল থেকে ১৯ জানুয়ারি ১৯৯০ সাল পর্যন্ত।'**

তারা সম্ভবত এটা উল্লেখ করতে ভুলে গেছে যে, তাঁকে পৃথিবীর ২১ টি বিভিন্ন দেশের ভিসা দেয়া হয় নি। রজনীশের অনুসারীরা এটাকে কোনো সমস্যা হিসেবে মনে করে নি যে, **'পৃথিবী ভ্রমণকারী অবতার'** বলে বিশ্বাস করে তাকে কোন দেশে প্রবেশ করার জন্য সে দেশের অনুমতি তথা ভিসার প্রয়োজন হয়।

চলুন, ভগবান রজনীশের **'অবতার'** হওয়ার দাবিকে সূরাহ ইখলাসের কষ্টিপাথরে ফেলে পরীক্ষা করা যাক।

১. প্রথম মানদন্ড হলো- "বলুন, তিনিই মহান আল্লাহ, একক ও অদ্বিতীয়।" রজনীশ কি একক ও অদ্বিতীয়? এর উত্তরে বলা যায় যে, 'না'। রজনীশের মতো অনেকেই ঈশ্বরের অবতার হওয়ার দাবি করেছে। রজনীশের কয়েকজন শিষ্য এখনো এ দাবির উপর অটল রয়েছে যে, রজনীশ একক ও অদ্বিতীয়।

২. দ্বিতীয় মানদন্ড হলো- 'মহান আল্লাহ পরম অস্তিত্বশীল ও মুখাপেক্ষীহীন।' নিশ্চয়ই রজনীশ পরম অস্তিত্বশীল ছিলেন না, কেননা তিনি ১৯৯০ সালে মৃত্যুবরণ করেছেন। রজনীশের জীবনীগ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, তিনি দীর্ঘস্থায়ী ডায়াবেটিস, হাঁপানি ও পুরাতন শিরদাঁড়ার ব্যথায় ভুগছিলেন। তিনি অভিযোগ করেছেন যে, আমেরিকান সরকার তাঁকে কারাগারে ধীরে ধীরে বিষ প্রয়োগ করেছেন এবং তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। ভেবে দেখুন সর্বশক্তিমান ভগবানকে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে! সুতরাং রজনীশ যেমন চিরঞ্জীব ছিলেন না, তেমনি তিনি মুখাপেক্ষীহীনও ছিলেন না।

৩. তৃতীয় মানদন্ড হলো- 'মহান আল্লাহ কাউকে জন্ম দেন নি এবং কারো থেকে জন্মগ্রহণও করেন নি।' আমরা জানি যে, রজনীশ ভারতের জবলপুরে এক পিতার ঔরসে ও মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে। পরবর্তীতে তাঁরা উভয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

১৯৮১ সালের মে মাসে তিনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন এবং সেখানে তিনি **'রজনীশপূরম'** নামে একটি শহর প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে

তিনি পাশ্চাত্যের রোষাণলে পড়েন এবং অবশেষে গ্রেফতার হয়ে সে দেশত্যাগে বাধ্য হন। তিনি পুনরায় ভারতে ফিরে আসেন এবং (পুনা)-তে তাঁর অনুসারীদের জন্য **'ওশো'** নামে একটি জনপদ গড়ে তোলেন। ১৯৯০ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর অনুসারীরা তাকে **'সর্বশক্তিমান ভগবান'** বলে বিশ্বাস করে। কোনো ভ্রমণকারী **'ওশো'** জনপদে গেলে সেখানে রজনীশের সমাধিতে পাথরে খোদাই করে এ কথাগুলো লেখা দেখতে পাবে-**"ওশো-তিনি কখনো জন্মগ্রহণ করেন নি এবং কখনো মৃত্যুবরণ করেন নি। তিনি 'পৃথিবী' নামক গ্রহটি শুধু পরিদর্শনে এসেছিলেন ১১ ডিসেম্বর ১৯৩১ সাল থেকে ১৯ জানুয়ারি ১৯৯০ পর্যন্ত।"**

তারা এটা উল্লেখ করতে সম্ভবত ভুলে গেছে যে, রজনীশকে বিশ্বের ২১ টি দেশে প্রবেশের জন্য ভিসা দেয়া হয় নি । কেউ কি এটা ভেবে দেখেছে যে, 'ভগবান'- কে পৃথিবী পরিদর্শনে এসে কোনো দেশে প্রবেশের জন্য ভিসা চাইতে হবে! গ্রিসের আর্চ বিশপ বলেছেন যে, রজনীশ যদি সে দেশ থেকে বের হয়ে না যায় তাহলে তারা তার শিষ্য-সাগরেদসহ তার বাসস্থান জ্বালিয়ে দেবে।

৪. চতুর্থ মানদন্ড যা অত্যন্ত কঠোর তা হলো- মহান আল্লাহর সদৃশ সমকক্ষ কেউ নেই, কিছু নেই।' ঈশ্বরত্বে দাবিদার কাউকে যদি কোনো সৃষ্টির সাথে তুলনা করা সম্ভব হয়, তাহলে তার ঈশ্বরত্ব তাৎক্ষণিক বাতিল বলে প্রমাণিত হবে। সত্যিকার একক মহান আল্লাহর কোনো কাল্পনিক আকার-আকৃতি কল্পনা করা কোনোমতেই সম্ভব নয়। আমরা জানি যে, রজনীশ রক্তে-মাংসে গড়া একজন মানুষ ছাড়া কিছু নয়। যার ছিল শুভ্র লম্বা দাড়ি। তার ছিল দুটো চোখ, দুটো কান, একটা নাক, একটি মুখ। রজনীশের ছবি সম্বলিত পোস্টার প্রচুর পাওয়া যায়। এতে করে এটা সহজেই ধারণা করা যায় যে, সে **'ঈশ্বর'** বা **'ভগবান'** হতে পারে না।

একইভাবে যে ব্যক্তিটি শারীরিক শক্তিমত্তা হেতু **'মিস্টার ইউনিভার্স'** উপাধিপ্রাপ্ত তাকেও কেউ **'ঈশ্বর'** হিসেবে কল্পনা করতে পারে বটে, কিন্তু সূরাহ ইখলাসে বর্ণিত ৪ টি মানদন্ডের আলোকে একমাত্র একক অদ্বিতীয় **'মহান আল্লাহ'** ছাড়া কেউ উত্তীর্ণ হতে পারে না।

আমরা যে নামে ঈশ্বরকে ডাকি

মুসলমানরা ইংরেজি শব্দ **'গড'**-এর পরিবর্তে একক সৃষ্টিকর্তাকে **'আল্লাহ'** নামেই ডাকে। **'গড'**-এর চেয়ে আরবি শব্দ **'আল্লাহ'**-ই সৃষ্টিকর্তার

ক্ষেত্রে সর্বোত্তম ও যথার্থ। **'গড'** ইংরেজি শব্দ, খাঁটি আরবি শব্দ **'আল্লাহ'**। ইংরেজি **'গড'** শব্দের নিম্নরুপ রুপান্তর ঘটতে পারে। যেমনঃ

'গড' শব্দের সাথে **'এস'** ইংরেজি বর্ণ যুক্ত করে তাকে বহুবচন হিসেবে ব্যবহার করা যায়, কিন্তু 'মহান আল্লাহ' একক সত্তা। এ শব্দের কোনো বহুবচন হয় না। **'আল্লাহ'** বহুবচন বলতে কিছু নেই। **'আল্লাহ'** 'যেমন আলকুরআনের সূরাহ ইখলাসের ১নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, **"কুলহু ওয়াল্লাহু আহাদ** অর্থাৎ বলুন তিনি **'আল্লাহ'** একক ও অদ্বিতীয়। আবার **'গড'**-এর সাথে **'dess'** যোগ করলে তা স্ত্রীলিঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু মহান আল্লাহর ক্ষেত্রে কোনো পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গ নেই। **'মহান আল্লাহ'** শব্দের লিঙ্গান্তর হয় না। আপনি যদি **`God'** বড় হাতের **G** দিয়ে লেখেন তাহলে এটা হবে সত্যিকার **God**. যতি ছোট হাতের g দিয়ে **'god'** লিখেন তাহলে এর অর্থ হবে নকল খোদা। ইসলামে আমাদের একজনই সত্য আল্লাহ। আমাদের কোন মিথ্যা আল্লাহ নেই। **'গড'** শব্দের আগে **Tin** শব্দাংশ যোগ করলে তার অর্থ দাঁড়ায় **Tin god** বা **'মিথ্যা উপাস্য'** বা **বাতিল গড**। ইসলামে **'টিন আল্লাহ'** বলতে কিছুই নেই। আল্লাহ খাঁটি এবং একক। যদি আপনি God-এর সাথে father যোগ করেন তাহলে হবে godfather. সে আমার গডফাদার। আপনি আল্লাহর সঙ্গে **'আব্বা'** কিংবা **'ফাদার'** যোগ করতে পারবেন না। **'আল্লাহ আব্বা'** কিংবা **'আল্লাহ ফাদার'** বলে ইসলামে কিছু নেই। যদি আপনি god এর সাথে mother যোগ করেন তাহলে হবে godmother। আপনি আল্লহর সাথে **'মাদার'** বা **'আম্মি আল্লাহ'** বলতে পারেন না। ইসলামে **'আম্মি আল্লাহ'** বলতে কিছু নেই। **'মহান আল্লাহ'** শব্দটি এমন এক অসাধারণ ও অদ্বিতীয় শব্দ যা সম্পর্কে কল্পনা করে কোনো আকৃতি বা আকার ধারণা করা বা তা নিয়ে কোনো প্রকার যথেচ্ছাচার করা যায় না। এসব কারণে মুসলমান একক ও অদ্বিতীয় উপাস্যকে **'মহান আল্লাহ'** নামেই ডাকে।

'গড' কখনো মানুষ হতে পারে না

কিছু লোক যুক্তি পেশ করে যে, ঈশ্বর যদি সবকিছু করতে সক্ষম, তবে তিনি মানব আকৃতি ধারণ করতে পারবেন না কেন? তিনি যদি ইচ্ছে করেন তবে তিনি মানব-আকৃতি ধারণ করতে পারেন, কিন্তু এই যুক্তি মেনে নিলে **'ঈশ্বর'** আর ঈশ্বর থাকতে পারেন না। কেননা **'ঈশ্বর'** আর মানুষের গুণ-বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন ক্ষেত্রেই বিপরীতধর্মী। একই সত্তার মধ্যে ঈশ্বরত্ব ও মানবত্বের

বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় হতে পারে না। **'অবতারবাদ'** বা ঈশ্বরের মানবাকৃতি ধারণ সংক্রান্ত মতবাদ কোনো কোনো ধর্মে থাকলেও তা যে অবাস্তব এ বিষয়ে পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে আলোচনা করা হয়েছে।

'ঈশ্বর' অবিনশ্বর অথচ মানুষ নশ্বর। মানব-ঈশ্বর তথা এমন কোন সত্তার অস্তিত্ব নেই যার মধ্যে অবিনশ্বর ঐশ্বরিক সত্তা নশ্বর মানবদেহ ধারণ করবে। এ জাতীয় ধারণা অর্থহীন ও অযৌক্তিক।

ঈশ্বর-এর বৈশিষ্ট্য হলো তিনি অনাদি ও চিরন্তন। অপরদিকে মানুষের শুরু যেমন আছে তেমনি শেষও আছে। এমন কোন সত্তা মানুষের মধ্যে নেই যার মধ্যে শুরু না থাকা এবং শুরু থাকা উভয়ই বিদ্যমান আছে। মানুষের শেষ আছে কারণ মানুষ মরণশীল। এমন কোনো মানুষ নেই যার মধ্যে অবিনশ্বরতা ও নশ্বরতা উভয় গুণের সমাবেশ পাওয়া যাবে। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের পানাহারের প্রয়োজন নেই, কিন্তু মানুষকে তার জীবনকে কর্মচঞ্চল রাখার জন্য পানাহার করতে হয়। অতএব স্রষ্টা বা ঈশ্বর বা মহান আল্লাহর মানবরূপ ধারণ সংক্রান্ত মতবাদ একটি ভ্রান্ত মতবাদ।

- وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ "And He it is that Feeds but is not fed."

অর্থ : তিনি খাদ্য দান করেন, কিন্তু তিনি খাদ্যগ্রহণ করেন না। (সূরাহ আনআম : ১৪)

মহান আল্লাহর কখনো বিশ্রাম বা নিদ্রার প্রয়োজন হয় না, অথচ মানুষ বিশ্রাম ও নিদ্রা ছাড়া চলতে পারে না।

اللَّهُ لَا إِلَـهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ - لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ - لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ -

"Right Allah, there is no Haq `Ilah' but He- The living, The self-subsisting, Eternal. No slumber can seize Him nor sleep. His are all things in the heavens and on the earth."

অর্থ : মহান আল্লাহ- তিনি ছাড়া কোনো হক্ব উপাস্য (ইলাহ) নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সব কিছুর ধারক। তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না তন্দ্রা ও নিদ্রা। আসমানে ও জমিনে যা কিছু আছে তা সবই তাঁর। (সূরাহ বাকারা : ২৫৫)

মানুষ কর্তৃক অন্য মানুষের উপাসনা নিষ্ফল

যেহেতু **'ঈশ্বরে'**র মানবরূপ ধারণ তথা অবতারবাদ গ্রহণীয় নয়, তাই আমরা অবশ্যই এ ব্যাপারে একমত হবো যে, কোনো মানুষের উপাসনা করা নিষ্ফল ছাড়া আর কিছু নয়। ঈশ্বর যদি মানব-আকৃতি ধারণ করে, তা তিনি অবশ্যই ঐশ্বরিক গুণাবলি ত্যাগ করেই মানবরূপ ধারণ করবেন এবং তিনি মানুষের মধ্যকার সমস্ত গুণের অধিকারী হবেন। উদাহরণস্বরূপ ধরুন, একজন মেধাবী অধ্যাপক যদি দুর্ঘটনায় পড়ে তাঁর মেধা ও স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেন, তাহলে এ অবস্থায় তার ছাত্রদের পক্ষে তাঁর নিকট তাদের নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর শিক্ষা গ্রহণের কাজ চালিয়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না অবশ্যই।

অতঃপর বলা যায় যে, ঈশ্বর যদি মানবরূপ ধারণ করেন, এ মানুষটি আর কখনো তার পূর্বরূপ ঈশ্বরত্বে ফিরে যেতে পারবে না। কেননা মানুষ তার প্রকৃতি অনুযায়ী ঈশ্বরে রূপান্তরিত হওয়ার ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং মানব-ঈশ্বর এর উপাসনা করা অযৌক্তিক এবং এ অবতারবাদের সর্বপ্রকার-এর বিরুদ্ধে আমাদের সোচ্চার হওয়া উচিত।

আর এজন্যই পবিত্র কুরআন মাজীদে সর্বপ্রকার মানব-ঈশ্বর বা অবতারবাদের অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতিরূপ নির্ধারণের বিরুদ্ধে বলা হয়েছে-

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ –

অর্থ : কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। (সূরাহ শুরা ঃ **১১**)

"There is nothing whatever like create him."

'ঈশ্বর' কখনো অন্যায় ও তাঁর পক্ষে অশোভন কাজ করতে পারেন না

সর্বশক্তিমান **'ঈশ্বর'** যিনি ন্যায়বিচার, করুণা, সত্য ও অনন্ত-অনিন্দ্যনীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তিনি কখনো এমন সৃষ্টিসুলভ কাজ করতে পারেন না, যা তাঁর সত্তা ও বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী। তদ্রূপ তাঁর পক্ষ থেকে কোনো প্রকার মিথ্যা কথা বলার ধারণাও করা যায় না। একইভাবে অন্যায়, ভুল, কোনো বিষয় স্মৃতিভ্রম ইত্যাদি যাবতীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ তাঁর পক্ষ থেকে প্রকাশ পাওয়ার কথাও কল্পনা করা যায় না। তবে 'ঈশ্বর' যদি ইচ্ছে করেন তাহলে অন্যায় করতে পারেন, কিন্তু তিনি কখনো তা করেন না, করবেনও না, যেহেতু এটা অন্যায়, আর এমন অন্যায় কাজ তাঁর জন্য অশোভন। পবিত্র কুরআন মাজীদ বলে– إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ -

"Allah is never unjust in the least segree."

অর্থ ঃ মহান আল্লাহ কখনো এক বিন্দু পরিমাণও যুলুম করেন না। (সূরাহ নিসা : ৪০)

ঈশ্বর যদি চান অত্যাচারী হতে পারেন, কিন্তু ঈশ্বর যখনই অন্যায়কারী হবেন সেই মূহূর্তেই তিনি তাঁর ঐশ্বরিকতা হারাবেন।

ঈশ্বর ভুলে যেতে পারেন না, আর না তিনি ভুল করতে পারেন

ঈশ্বর কখনো ভুলে যেতে পারেন না, কেননা ভুলে যাওয়া ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। এটা মানবীয় সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতার উদাহরণ। একইরূপে ঈশ্বর ভুল করতে পারেন না, কেননা ভুল করা ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। পবিত্র কুরআন বলে– - لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى

"My lord never errs, nor forgets."

অর্থ : আমার প্রভু বিভ্রান্তও হননা, ভুলেও যান না। (সূর তা-হা : ৫২)

ঈশ্বর ঈশ্বরসুলভ কাজই করেন

তাঁর সবকিছু করার ক্ষমতা আছে। ঈশ্বর সম্পর্কে ইসলামের ধারণা হলো- 'ঈশ্বরের ক্ষমতা সবকিছুর ওপর বিরাজমান।' পবিত্র কুরআন বলে–

أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ –

"For verily Allah has power over all things."

অর্থ : মহান আল্লাহ অবশ্যই সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

(আল-কুরআন– ২ : ১০৬, ২ :১০৯, ২ :২৮৪, ৩ : ২৯, ১৬ : ৭৭, ৩৫ : ১)

পবিত্র কুরআন মাজীদ আরো বলে– فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ-

"Allah is the deer of all he intends."

অর্থ : তিনি যা চান তা-ই করেন। (সূরাহ বুরূজ : ১৬)

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহ তাঁর সত্তা ও গুণাবলীর সাথে সামঞ্জস্যশীল কাজেরই ইচ্ছে করেন এবং তা সম্পাদন করেন। অন্যায় এবং তাঁর সত্তা ও গুণাবলীর বিপরীত কাজ তিনি করেন না।

অনেক ধর্মই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো না কোনো পর্যায়ে অবতারবাদে বিশ্বাস করে, অর্থাৎ ঈশ্বর মানব আকৃতি ধারণ করে । তাদের যুক্তি হলো-সর্বশক্তিমান 'ঈশ্বর ' অত্যন্ত পবিত্র, সত্য, পরিপূর্ণ ও নিষ্কলুষ । তাই তিনি মানুষের দুঃখ- কষ্ট, সীমাবদ্ধতা ও অনুভূতি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ । অতএব , মানুষের জন্য নীতি-নিয়ম প্রণয়নের লক্ষ্যে পৃথিবীতে মানবরূপে আবির্ভূত হন । যুগে যুগে এ প্রতারণাপূর্ণ যুক্তি লক্ষ লক্ষ মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। চলুন এ যুক্তিটিকে বিশ্লেষণ করে দেখা যাক এটা কতটুকু যুক্তিপূর্ণ। সৃষ্টিকর্তা **দিক-নির্দেশনা সংক্রান্তবিধিমালা প্রণয়ন করেন**।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মানবীয় গুণ-বৈশিষ্ট্য ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন । আমরা এ বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে বিভিন্ন কাজের সুবিধার্থে বিভিন্ন ধরনের সহায়ক হাতিয়ার বা যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করে নিয়েছি। টেপরেকর্ডার এমনই একটি যন্ত্র যা শিল্প-কারখানায় বহুল পরিমাণে তৈরি হয়ে থাকে। কিন্তু এটা কি কখনো পরামর্শ দেয়া হয়েছে যে, টেপরেকর্ডারের কী ভালো, আর কী মন্দ, তা জানার জন্য প্রস্তুকারক তার এ যন্ত্রের উৎপাদন ও চালানোর নিয়ম-পদ্ধতি সংক্রান্তবিধিমালা সম্বলিত একটি পুস্তক বা ক্যাটালগ (Manual) তৈরি করবেন। যার মাধ্যমে এ যন্ত্রের ব্যবহারকারীরা তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য ও নিয়মাবলি পেতে পারে। এ পুস্তকের মাধ্যমে নির্দেশনা দেয়া থাকবে যে, এ যন্ত্র কীভাবে ব্যবহার করা যাবে আর কীভাবে ব্যবহার করা যাবে না। আপনি যদি মানুষকে তেমনি একটি যন্ত্র ধরে নেন, তবে এটা নিশ্চিত যে, মানুষ আল্লাহ তা'আলার এক জটিল ও সুনিপুণ সৃষ্টি। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই দুনিয়াতে এসে মানুষের জন্য কী ভাল আর কী মন্দ তা জানার। তিনি মানবজাতির জন্য নির্দেশিকা সম্বলিত গ্রন্থ (Instruction manual) দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিয়েছেন । পবিত্র কুরআন-ই মানব জাতির জন্য সেই গ্রন্থ। আল্লাহ তা'আলা শেষ বিচারের দিন তাঁর এ সুনিপুণ সৃষ্টির কাজ-কর্মের হিসাব নেবেন। সুতরাং এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, তিনি যে বিষয়ে হিসাব নেবেন, সে বিষয়ে পূর্ণ নির্দেশিকা আগেই পাঠিয়ে দেবেন। তাই পবিত্র কুরআন নাযিল করে দুনিয়ার জীবনে মানুষের কী করণীয় আর কী বর্জনীয় তা জানিয়ে দিয়েছেন। বাছাই করা মানুষদের মাধ্যমে তাঁর ঐশী বিধি-বিধান দুনিয়াতে মানুষের নিকট পৌছে দিয়েছেন। এসব বাছাই করা মানুষদেরকে **'বার্তাবাহক' বা নবী-রাসূল** বলা হয়।

কিছু লোক 'অন্ধ' ও 'বধির'

অবতারবাদী দর্শনের অসম্ভাব্যতা ও অযৌক্তিতা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও অনেক ধর্মের অনুসারীরা নিজেরাও এ অবতারবাদে বিশ্বাস করে অন্যদেরকেও এটা শিক্ষা দেয়। এটা কি মানুষের বুদ্ধিমত্তা (Intelligence) এবং যিনি মানুষকে এ বুদ্ধিমত্তা দান করেছেন তাঁর প্রতি অবমাননা প্রদর্শন নয় ? এ সমস্ত লোকই প্রকৃতপক্ষে **'অন্ধ'** ও **'বধির'** , যদিও আল্লাহ তাদেরকে শ্রবণেন্দ্রীয় ও দর্শনেন্দ্রীয় দিয়েছেন । পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে। صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ

Deaf, dumb and blind, they will not return (to the right path).

অর্থ : তারা বধির, বোবা ও অন্ধ, তারা (সঠিক পথে) ফিরে আসবে না । (সূরাহ বাকারা : ১৮) বাইবেল মথির লিখিত সুসমাচারে একই কথা বলেছে-

Seeing they see not and hearing they hear not, neither do they understand.

অর্থ: তারা দেখেও দেখে না এবং শুনেও শোনে না, তারা বুঝতেও সক্ষম নয়। (মথি ১৩:১৩) হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থ 'ঋগবেদে' ও একই ধরনের বক্তব্য রয়েছে-

There may be someone who sees the words and yet indeed do not see them, may be another one who hears those words but indeed does not hear them.

অর্থ: এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা বাণীসমূহ দেখে, প্রকৃতপক্ষে তারা দেখে না; এমন কিছু লোকও রয়েছে যারা এ বাণীসমূহ শোনে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা শোনেনা । (ঋগবেদ ১০:৭১:৪) এসব পবিত্র গ্রন্থের বাণী তাদের পাঠকদেরকে বলে যে, যদিও ঈশ্বরের বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তবুও এরা সত্য থেকে বিচ্যুতই হয়ে যাবে।

ঈশ্বরের গুণাবলী

মহান আল্লাহর জন্যই রয়েছে অত্যন্ত সুন্দর গুণবাচক নামসমূহ

Say, call upon Allah or call upon Rahman : By whatever name you call upon him, (it is well) : For to him belong the most beautiful name"

অর্থঃ বলুন, তোমরা **'আল্লাহ'** বলে ডাক কিংবা **'রহমান'** বলে ডাক, যে নামেই ডাক না কেন , তাঁর তো রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম । (বনী ইসরাঈল :১১০)একই ধরনের কথা কুরআন মাজীদের অন্যান্য সূরাহতে উল্লিখিত হয়েছে। [সুরা আ'রাফ (৭:১৮): সূরাহ ত্বা-হা (২০:৮) এবং আল-হাশর (৫৯:২৩-২৪)]

আল-কুরআন সর্বশক্তিমান আল্লাহর কমপক্ষে ৯৯ টি বিভিন্ন গুণবাচক নাম উল্লেখ করেছে। এর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো **আল্লাহ**। কুরআন 'আল্লাহর পরিচয় প্রকাশে অনেক নামের মধ্যে **'আর-রহমান'** (সবচেয়ে দয়ালু), 'আর-রহীম' (সবিশেষ দয়াবান) এবং **'আল-হাকীম'** প্রভৃতি নাম উল্লেখ করেছে। আপনি যে কোনো নামেই আল্লাহকে ডাকতে পারেন : কিন্তু সেই নামগুলো হতে হবে সুন্দর। তবে সেই নামগুলো উচ্চারণের সাথে মানসপটে কোনো সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কোনো চিত্র যেন ফুটে না ওঠে ।

মহান আল্লাহর সব গুণবাচক নামই সুন্দর এবং এসব গুণের মালিক একমাত্র মহান আল্লাহ নিজেই

আল্লাহ তাআলা এসব সুন্দর নামসমূহের অধিকারী শুধু নন, প্রত্যেকটি নামের মাধ্যমেই সর্বশক্তিমান আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ ও নিখুঁত পরিচয় পাওয়া যায়। আমি এ বিষয়টি বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করব। ডাঃ জাকির নায়েক বলেন, একজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের উদাহরণ পেশ করা যাক। ধরুন নভোচারী নেইল আর্মস্ট্রং। কেউ যদি বলে যে, **'নীল আর্মস্ট্রং একজন আমেরিকান'**। উক্তিটি যথার্থ: কিন্তু তার পরিচয়ের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট নয়। **'নীল আর্মস্ট্রং একজন নভোচারী'** - এ পরিচয়ও তার জন্য অনন্য পরিচয় নয়, কেননা এ পরিচয় অন্যদেরও আছে। যদি বলা হয় যে, **'নীল আর্মস্ট্রং প্রথম ব্যক্তি যিনি চাঁদে পা রেখেছেন'**। এখন কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, চাঁদে প্রথম পদার্পণ করেছেন কে ? উত্তরে কেবল বলা হবে **'নীল আর্মস্ট্রং'**। এ কৃতিত্বে তাঁর কোনো শরিক নেই। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের গুণাবলীও হতে হবে অনন্য ও অতুলনীয়। তিনি বিশ্বজগতের স্রষ্টা। আমি যদি বলি- **'তিনি ইমারতের নির্মাণকারী'** তাহলে তাঁর পরিচয় হিসেবে অনন্য নয়, কেননা অনেক মানুষ ইমারতের নির্মাতা হতে পারে। অতএব 'নির্মাতা গুণ দ্বারা ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে পার্থক্য করা যেতে পারে না। আল্লাহর গুণসমূহ এমন হবে যা দ্বারা তাঁকেই নির্দেশ করবে অন্য কাউকে নয়।

উদাহরণস্বরূপ

Ar-Raheem (সবিশেষ দয়াবান)

Ar-Rahman (সবচেয়ে দয়ালু)

Al-Hakeem (প্রজ্ঞাময়)

সুতরাং কেউ যদি প্রশ্ন করে Ar-Raheem বা সবিশেষ দয়াবান কে ?

এর উত্তরে একটি মাত্র কথাই বলা যেতে পারে -'সর্বশক্তিমান আল্লাহ'।

ঈশ্বর এর একটি গুণ অন্য গুণের সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে না

আগের উদাহরণটিকে ধরা যাক, কেউ যদি বলে, "নীল আর্মস্ট্রং একজন আমেরিকান নভোচারী যিনি মাত্র চার ফুট লম্বা' তবে এ পরিচয় (আমেরিকান নভোচারী) যথার্থ, কিন্তু সহায়ক গুণটি (চার ফুট লম্বা) মিথ্যা । একইভাবে কেউ যদি বলে যে, ঈশ্বর সমগ্র বিশ্বজগতের সৃষ্টির্কতা। তাঁর একটি মাথা, দুটো হাত, দুটো পা ইত্যাদি ইত্যাদি রয়েছে। এর মধ্যে প্রথম বৈশিষ্ট্য তথা সমগ্র 'বিশ্বজগতের সৃষ্টির্কতা' বৈশিষ্ট্যটি যথার্থ: কিন্তু সহায়ক বৈশিষ্ট্য (মানুষের আকৃতি বিশিষ্ট হওয়া) ভুল এবং মিথ্যা।

ঈশ্বরের যাবতীয় গুণ-বৈশিষ্ট্য একক-অদ্বিতীয় ঈশ্বরকেই নির্দেশ করে

যেহেতু ঈশ্বর একক ও অদ্বিতীয়, তাই তাঁর সব গুণ-বৈশিষ্ট্য দ্বারা একমাত্র তাকেই নির্দেশ করাটাই স্বাভাবিক। যদি বলা হয়, 'নীল আর্মস্ট্রং ছিলেন একজন নভোচারী যিনি চাঁদের বুকে প্রথম পদার্পণ করেন, কিন্তু পরে দ্বিতীয় জন এডউইন অলড্রিন-একথাটা সঠিক নয়। কেননা প্রথম পদার্পণকারী একজনই হতে পারে। প্রথম পদার্পণকারী দ্বিতীয় হতে পারে না। সুতরাং স্রষ্টা একক ঈশ্বর এবং প্রতিপালক। অন্য ঈশ্বর-এ বক্তব্য অবাস্তব, কেননা বিশ্বজগতে ঈশ্বর একক ও অদ্বিতীয় যাবতীয় মহৎ গুণ স্রষ্টার একক সত্তায় পূর্ণতা লাভ করেছে।

ঈশ্বরের এককত্ব

বহু ঈশ্বরবাদীরা একথা বলে যুক্তি পেশ করে যে, বহু ঈশ্বরের অস্তিত্ব অযৌক্তিক নয়। তাদের এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তি পেশ করা যায় যে, বিশ্ব-জগতের যদি একাধিক ঈশ্বর থাকতো, তাহলে তাদের মধ্যে অবশ্যই মতপার্থক্য সৃষ্টি হতো। প্রত্যেক ঈশ্বরই অন্য ঈশ্বরের ইচ্ছের বিরুদ্ধে নিজের ইচ্ছেকে কার্যকর করতে চাইতো। এরই প্রতিক্রিয়া দেখা যায় বহু ঈশ্বরবাদী ও সর্বেশ্বরবাদী ধর্মীয় উপাখ্যানগুলোতে। যদি এক ঈশ্বর অন্য ঈশ্বরের নিকট পরাজিত হন এবং তাদেরকে নিয়ন্ত্রণে আনতে অক্ষম হন, তাহলে তিনি 'ঈশ্বর' হওয়ার যোগ্য হতে পারেন না। ফলে তিনি প্রকৃত ঈশ্বরও হতে পারেন না। বহু ঈশ্বরবাদী ধর্মগুলোতে বহু ঈশ্বরের ধারণা অত্যন্ত জনপ্রিয়, কেননা সেখানে বিভিন্ন ঈশ্বরের বিভিন্ন দায়িত্ব। যেমন- সূর্যদেবতা, বৃষ্টির দেবতা ইত্যাদি। তাদের প্রত্যেকে মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বিভিন্ন ঈশ্বর বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। এ বর্ণনা একথার ইঙ্গিত দেয় যে, এসব ঈশ্বরের কেউ-ই সুনির্দিষ্ট কোনো কাজের এককভাবে যোগ্য নয়। অধিকন্তু এক ঈশ্বরের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে কিছুই জানেন না। একটি অজ্ঞ ও অক্ষম সত্তা 'ঈশ্বর' হতে পারেন না। যদি ঈশ্বর একাধিক হতো, তাহলে মহাবিশ্বে অবশ্যই সংশয়, বিশৃঙ্খলা, গোলমাল ও ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হতো, অধিকন্তু মহাবিশ্বের সর্বত্র পূর্ণাঙ্গ শান্তি এবং শৃঙ্খলা বিরাজমান। পবিত্র কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে–

``لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ - If there were, in the heavens and the earth other ilahs Besides Allah, there would have been confusion in both! But glory to Allah the lord of the Throne : (High is He) above what they attribute to Him!''

অর্থ : যদি আসমান ও জমিনে মহান আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য 'ইলাহ' থাকতো তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেতো। অতএব আরশের অধিপতি মহান আল্লাহ সেসব বিষয় থেকে পবিত্র যা তারা বলে থাকে। (সূরাহ আম্বিয়া ঃ ২২)

একাধিক ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকলে তারা তাদের সৃষ্ট ও আয়ত্তাধীন রাজত্ব নিয়ে আলাদা আলাদা হয়ে যেতো। পবিত্র কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে-

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَـٰهٍ - إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَـٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ - سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ - ``No son did Allah beget, nor is there any ilahs along with Him (if there

were Many ilahs), behold, each ilah would have taken away what he had created, and some would have lorded it over others! Glory to Allah! (He is free) From the (sort of) they attribute to Him.''

অর্থ : মহান আল্লাহ কাউকে সন্তান হিসেব গ্রহণ করেন নি এবং তাঁর সাথে অন্য কোনো **'ইলাহ'**- ও নেই, (যদি অন্য ইলাহ থাকতো) তাহলে প্রত্যেক ইলাহ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে অবশ্যই পৃথক হয়ে যেতো এবং একে অন্যের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতো। আল্লাহ পবিত্র মহান (তিনি মুক্ত) তা থেকে যা তারা বলে। (সূরাহ মুমিনুন ঃ ৯১) অতএব, একক ও অদ্বিতীয় সার্বভৌম, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর-এর অস্তিত্ব থাকাটাই যুক্তি ও বুদ্ধির দাবি।

কিছু ধর্ম রয়েছে অজ্ঞেয়বাদে বিশ্বাসী, যেমন বৌদ্ধধর্ম ও কনফুসীয় ধর্ম। অজ্ঞেয়বাদ (agnostic)-এর মূলকথা হলো- 'ঈশ্বর' সম্বন্ধে কোনো কিছু আমাদের জানা নেই। সুতরাং সে সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করা যাবে না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর অন্তরালে কোনো কিছুর অস্তিত্ব সম্পর্কে মানুষ কিছুই জানে না- এটা হলো অজ্ঞেয়বাদের ধারণা। তারা 'ঈশ্বর'- এর অস্তিত্ব স্বীকারও করে না আবার অস্বীকারও করে না। অপর কিছু ধর্ম আছে যেমন জৈন ধর্ম- এগুলো নাস্তিক্যবাদী ধর্ম। এরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না। *(ডাঃ জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র মনি-মুক্তা ১/১১৮-১৪৪ পৃঃ)*

প্রশ্ন ঃ আক্বীদা কাকে বলে? মুসলিম জীবনে আক্বীদার গুরুত্ব কতটুকু?

উত্তর ঃ 'আল-আক্বীদাহ' শব্দটি **'উক্বদাতুন'** শব্দ থেকে উদ্‌গত। অর্থ - গিরা বা বাঁধন। যেমন পবিত্র কুরআন **'উক্বদাতুন নিকাহ'** বা বিবাহের বাঁধন বলা হয়েছে (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ২৩৫ ও ২৩৭)। বাঁধনের মাঝে কী আছে তা না দেখেই শুধু চূড়ান্ত বিশ্বাস করার নামই **'আক্বীদা'**। মূলত কর্ম ছাড়া কোন বিষয়ে সন্দেহাতীত চূড়ান্ত বিশ্বাসই আক্বীদা। তাই মহান আল্লাহকে না দেখে, ফেরেশতা, জান্নাত, জাহান্নাম, হাশর, ক্বিয়ামত, কবরের আযাব ইত্যাদি অদৃশ্য বিষয় না দেখেই শুধু পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীসের বর্ণনায় সুদৃঢ় বিশ্বাস করার নাম আক্বীদা। (আক্বীদাতুত তাওহীদ, পৃঃ ১)। এ জন্য পবিত্র কুরআনের শুরুতেই মুত্তাক্বীদের প্রথম গুণ হিসাবে **'অদৃশ্যে বিশ্বাস করার'** বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ৩)।

আক্বীদা মুসলিম জীবনের মূল সম্বল। তাই আক্বীদা বিশুদ্ধ না হলে জীবনের সকল প্রকার কর্ম নিস্ফল ও বাতিল বলে গণ্য হবে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ - **'আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে কুফুরী করবে তার আমল নষ্ট হয়ে যাবে। সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে'** (সূরাহ আল-মায়েদাহ : ৫)। অথচ অধিকাংশ মানুষের আক্বীদা শিরকমিশ্রিত এবং আমল বিদ'আত ও কুসংস্কারে পরিপূর্ণ। ফলে মহান আল্লাহর বিধান অনুযায়ী আমল করে কোনো লাভ হচ্ছে না (সূরাহ আন-আন'আম : ৮২ ও ৮৮)। আক্বীদাগত সকল বিষয়ের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো ঈমানের রুকন সমূহ, যা প্রত্যেকের উপর ফরয। ঈমানের এই ছয়টি রুকন আক্বীদার মৌলিক, ভিত্তি, যদিও আক্বীদা সংক্রান্ত আরও অনেক বিষয় রয়েছে। তাই এই মৌলিক ছয়টি বিষয়ের প্রতি সর্বাগ্রে ঈমানকে দৃঢ় করতে হবে। কারণ তাওহীদী আক্বীদা ভিতরে না থাকলে যেমন কোনো ব্যক্তি মুসলিম হতে পারে না, তেমনি অন্যান্য হাজারো আমল করলেও মহান আল্লাহর নিকট গৃহীত হবে না; বরং বাতিল বলে গণ্য হবে। কারণ এটা তো মুসলিম হওয়ার প্রধান শর্ত। জিবরীল আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমাকে প্রশ্ন করেন, ঈমান কী? তিনি উত্তরে বলেন, 'আপনি মহান আল্লাহর প্রতি, ফেরেশতামণ্ডলী, কিতাব সমূহ, রাসূলগণ, শেষ দিবস এবং তাক্বদীরের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস করবেন। (মিশকাত, হা/২)।

প্রশ্ন ঃ আক্বীদা ও আমলের মাঝে সমন্বয় কিভাবে করা যায়?

উত্তর ঃ মুসলিম জীবন আক্বীদার উপর প্রতিষ্ঠিত। আক্বীদা বা বিশ্বাস যার বিশুদ্ধ নয় তার জীবন সম্পূর্ণই বৃথা। কারণ বিশুদ্ধ আক্বীদা মুসলিম জীবনের মূল চাবিকাঠি। বিশ্বাসের আলোকেই মানুষ তার সকল কর্ম সম্পাদন করে। এখানে আমলের কোনো ভূমিকা নেই। আর যাবতীয় আমল এই আক্বীদার উপর নির্ভরশীল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেন, **'সমস্ত আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।'** (মিশকাত, হা/১)

উক্ত হাদীসে বর্ণিত **'নিয়ত'** শব্দটি **'নাওয়া'** শব্দ থেকে তৈরি হয়েছে। আর এর অর্থ হলো- **বিচি বা আঁঠি**। অর্থাৎ মনের গহীনে যে আঁঠি লাগানো হবে ঠিক তারই গাছ হবে এবং ফলও সেই গাছেরই হবে। আক্বীদা বা নিয়ত যার যেমন হবে, আমল তেমনই হবে। তার বিপরীত হবে না। কারণ কাঁঠালের বিচি লাগালে আম হয় না আর কেউ আমের আশাও করে না। অনুরূপ আমের

আঁঠি লাগালে কাঁঠাল হয় না। সুতরাং ক্বলবের কল্পনার ভিত্তি আক্বীদাকে নিয়ন্ত্রণ করা প্রত্যেকেরই দায়িত্ব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেন, 'সাবধান! নিশ্চয় শরীরের মাঝে একটি টুকরা আছে। যদি সেই টুকরাটি সুস্থ থাকে, তাহলে পুরো শরীরটাই সুস্থ থাকে। আর যদি ঐ টুকরাটি অসুস্থ থাকে, তাহলে পুরো শরীরটাই অসুস্থ থাকে। সাবধান! সেটাই হলো ক্বলব। (মিশকাত, হা/২৭৬২)। সুতরাং এই আসল জিনিসটি সঠিকভাবে পরিচালিত হলে শরীরের হাত পা, চোখ-কান, কথা-বার্তা, চিন্তা-চেতনা, চলা-ফেরা সবই সঠিক পথে পরিচালিত হবে। আর মূল জিনিসটি ভালো না হলে সেগুলো সঠিকভাবে পরিচালিত হবে না। মহান আল্লাহ তা'তালা বলেন, وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ - 'আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে কুফুরী করবে তার আমল নষ্ট হয়ে যাবে। সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' (সূরাহ আল-মায়েদাহ : ৫) **(প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম পুস্তকের ৪৯-৫০ পৃঃ)**

প্রশ্ন ঃ 'আল্লাহ আকাশ-পৃথিবীর জ্যোতি' কথার অর্থ কী?

উত্তর ঃ - اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 'আল্লাহ আকাশ-পৃথিবীর জ্যোতি।' (নূর ঃ ৩৫) এর অর্থ হলো, মহান আল্লাহ আকাশ-পৃথিবীকে জ্যোতির্ময় ও আলোকিত করেন। সুতরাং আকাশে যত আলো আছে, পৃথিবীতে যত রকমের আলো আছে এবং ক্বিয়ামতে যে আলো হবে, সব কিছুই তাঁরই আলো, তাঁরই জ্যোতি।

অবশ্য তাঁর জ্যোতি দুই প্রকার। সৃষ্ট জ্যোতি। আর তা হলে আকাশ-পৃথিবীর যে আলো আমরা দেখতে পাচ্ছি, যা সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহ-নক্ষত্রের মাধ্যমে লাভ করে থাকি এবং যা বিদ্যুৎ ও অগ্নির মাধ্যমে দেখতে পাই, সবই তাঁর সৃষ্ট আলো।

আর দ্বিতীয় প্রকার জ্যোতি হলো তাঁর গুণ। সে জ্যোতি সৃষ্ট নয়। তা তাঁর সাত্তিক গুণ। একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'আপনি কি আপনার প্রতিপালককে দেখেছেন?' উত্তরে তিনি বললেন, "তাঁকে কিরূপে দেখা সম্ভব? যাঁর পর্দা (অন্তরাল) হলো নূর (জ্যোতি)। যে পর্দা উন্মোচিত হলে তাঁর আনন-দীপ্তি সমগ্র সৃষ্টিকুলকে দগ্ধীভূত করে ফেলবে।" (মুসলিম ৪৬৩ নং)। অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেন, "আমি নূর দেখেছি।"

প্রশ্ন ঃ সৃষ্টিতত্ত্বের কোনো সংবাদ প্রচারে কেউ কেউ বলে থাকেন, 'এত কোটি বছরে এই হয়েছিলো। এত কোটি বছর আগে ঐ হয়েছিলো। এত কোটি বছর পূর্বে পৃথিবীতে মানুষের বসবাস শুরু হয়।' ইত্যাদি। এ সবে বিশ্বাস করা কি বৈধ?

উত্তর ঃ কোনো তত্ত্ববিদ বা বিজ্ঞানী যখন অনুরূপ তথ্য পরিবেশন করেন, তখন কিছুর উপর ভিত্তি করে অনুমান প্রসূত কথা বলেন। তাতে বিশ্বাস-অবিশ্বাস কিছুই করা জরুরী নয়। মানুষের ইতিহাস যে কত বছরের, তাও কেউ বলতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۛ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ ۛ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ -

অর্থাৎ, তোমাদের কাছে কি সংবাদ আসেনি তোমাদের পূর্ববর্তীদের; নূহের সম্প্রদায়ের, আ'দের ও সামূদের এবং তাদের পরবর্তীদের? তাদের বিষয় মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। (ইব্রাহীম ঃ ৯)

প্রশ্ন ঃ আল্লাহর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ, আল্লাহর কাজের সমালোচনা অথবা আল্লাহর কাজে দোষ বের করা বৈধ কি?

উত্তর ঃ আল্লাহর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ, আল্লাহর কাজের সমালোচনা অথবা আল্লাহর কাজে দোষ বের করার অধিকার কোন বান্দার নেই। যেহেতু সকল বিধানে তিনি নিখুঁত বিধায়ক। **'কেন'** বলে অভিযোগ বা আপত্তি করার অবকাশ ও অধিকার নেই কারো। মহান আল্লাহ বলেন,

وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ -

অর্থাৎ, আল্লাহ আদেশ করেন। তাঁর আদেশের সমালোচনা (পুনর্বিবেচনা) করার কেউ নেই এবং তিনি হিসাব গ্রহণে তৎপর। (রা'দ ঃ ৪১)

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ -

অর্থাৎ, তিনি যা করেন, সে বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হবে না; বরং ওদেরকেই প্রশ্ন করা হবে। (আম্বিয়া ঃ ২৩)। *(দ্বীনি প্রশ্নোত্তর কিতাবের ৬৬-৬৮ পৃঃ)*

প্রশ্ন ঃ আল্লাহ বা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমাকে গালি দিলে কেউ মুসলিম থাকবে কি?

উত্তর ঃ আল্লাহ বা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা এর বিরুদ্ধে কোনো কুমন্তব্য করা, গালি প্রয়োগ করা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বা কটাক্ষ করা বড় কুফরী। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا -

অর্থাৎ, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তো তাদেরকে ইহলোকে ও পরলোকে অভিশপ্ত করেন এবং তিনি তাদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। (আহ্যাব ঃ ৫৭) তিনি আরও বলেন,

وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ -

অর্থাৎ, তাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক আছে, যারা নবীকে কষ্ট দেয় এবং বলে, **'সে প্রত্যেক কথায় কর্ণপাত করে থাকে।'** তুমি বলে দাও, 'সে কর্ণপাত তো তোমাদের জন্য কল্যাণকর। সে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করে এবং মুমিনদের (কথাকে) বিশ্বাস করে। আর সে তোমাদের মধ্যে বিশ্বাসী লোকদের জন্য করুণাস্বরূপ। যারা মহান আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়, তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।' *(তাওবাহ ঃ ৬১)*। **(দ্বীনি প্রশ্নোত্তর কিতাবের ৬১ পৃঃ)**

প্রশ্ন ঃ ইবাদত কবুলের শর্তাবলী কী কী?

উত্তর ঃ ইবাদত কবুল হওয়ার বাহ্যিক শর্ত হলো, হালাল, রূযী ও শরীর, স্থান, পোশাক পবিত্র হওয়া। *(মিশকাত, হা/২৭৬০)*। আর অভ্যন্তরীণ প্রধান দুটি শর্ত রয়েছে। **প্রথমত ঃ** ইবাদত একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই হতে হবে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ - **'তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে'** *(সূরাহ আল-বাইয়েনাহ : ৫)। (সূরাহ তওবা : ৩১; সূরাহ যুমার : ১১, ১৪; সূরাহ কাহ্ফ ১১০, নাসাঈ, হা/৩১৪০; সনদ সহীহ)*। **দ্বিতীয়ত ঃ** একমাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-এর পদ্ধতি মোতাবেক হতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا -

'আর রাসূল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন, তা হতে বিরত থাক' *(সূরাহ আল-হাশর : ৭)। (সূরাহ আহযাব : ২১; সহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮, 'মীমাংসা' অধ্যায়)*। উক্ত শর্ত দুটির কোনো একটি ছাড়া পড়লে তা ইবাদত বলে গণ্য হবে না। প্রথম শর্তে চুল পরিমাণ ব্যতিক্রম হলে ঐ ইবাদত শিরকে পরিণত হবে। অনুরূপ দ্বিতীয় শর্ত কোনো রকম ব্যতিক্রম হলে বিদ'আতে পরিণত হবে।

প্রশ্ন ঃ বিশুদ্ধ আক্বীদার প্রতিদান কী?

উত্তর ঃ মুসলিম জীবনে আমলের চেয়ে আক্বীদার গুরুত্ব বেশি। ক্বিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তা'আলা বান্দার অন্তর ও আমলের উপর ভিত্তি করে বিচার-ফায়সালা করবেন। *(মিশকাত, হা/৫৩১৪)* মহান আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-এর নির্দেশিত পদ্ধতিতে ইবাদত করলে তাকে জান্নাতী বলে আখ্যায়িত করেছেন। *(মিশকাত, হা/১৪)* জীবনে কোনদিন সৎ আমল না করেও শুধু আল্লাহর ভয় করার কারণে মহান আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন। *(সহীহ মুসলিম, হা/২৭৫৬, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫৬, (ইফাবা হা/৬৭২৮)* ১০০ জনকে হত্যা করার পরেও শুধু আক্বীদা পরিবর্তন করার চেষ্টা করার কারণে মহান আল্লাহ তাকেও ক্ষমা করে দেন। *(মিশকাত, হা/২৩২৭)*। এমনকি শুধু কালেমায়ে শাহাদাত পাঠকে ক্বিয়ামতের দিন তারা পাল্লা ভারী করবে বলে বলা হয়েছে। *(মিশকাত, হা/৫৫৫৯)*।

প্রশ্ন ঃ কারও আক্বীদা অশুদ্ধ হলে তার পরিণাম কী হবে?

উত্তর ঃ ভ্রান্ত আক্বীদার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। কেননা আমল যত সুন্দরই হোক, আক্বীদা সহীহ না হলে তা আল্লাহ্‌র নিকট কখনোই কবুল হবে না। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ - যে ব্যক্তি তার বিশ্বাসের সাথে কুফরী করবে, তার আমল নষ্ট হয়ে যাবে এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে *(সূরাহ আল-মায়েদাহ : ৫)*। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেছেন, 'নিশ্চয় মহান আল্লাহ তা'আলা কোনো আমল কবুল করবেন না, যদি তাঁর জন্য তা খালেছ হৃদয়ে ও তাঁর সন্তুষ্টির জন্য না করা হয়'। *(নাসাঈ, হা/৩১৪০, সনদ সহীহ)*। আক্বীদাভ্রষ্ট আমলকারীদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বহিষ্কৃত হবে যে, তাদের সাথে ইসলামের কোনো অংশ পর্যন্ত থাকবে না। *(মিশকাত, হা/৫৮৯৪)*। শায়খ বিন বায

রহিমাহুল্লাহ বলেন, কোন কথা ও কাজ যদি বিশুদ্ধ আক্বীদার মানদণ্ডে প্রকাশিত হয়, তাহলে গ্রহণযোগ্য হবে। অন্যথায় বাতিল বলে গণ্য হবে। *(আল-আক্বীদাতুছ সহীহাহ ওয়ামা ইউযাদ্দুহা, পৃঃ ৩ ভূমিকা দ্রঃ)*

কালেমায়ে শাহাদাত প্রসঙ্গ

প্রশ্ন ঃ আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু। তথা 'আমি সাক্ষী দিচ্ছি এই মর্মে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বুদ নেই' এবং ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা আল্লাহর বান্দা ও রাসূল'-এর প্রকৃত অর্থ কী?

উত্তর ঃ 'আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বুদ নেই' এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা আল্লাহর রাসূল' এ কথার ঘোষণা দেওয়া ইসলামে প্রবেশের চাবিকাঠি। কেননা এই সাক্ষ্য দেওয়া ব্যতীত ইসলামে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। এজন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা মু'আয রাজিআল্লাহু আনহুকে ইয়ামানে পাঠানোর সময় আদেশ দিয়েছিলেন যে, তুমি প্রথম এই কথার সাক্ষ্য দেওয়ার আহ্বান জানাবে যে, মহান আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা আল্লাহর রাসূল। *(মিশকাত, হা/১৭৭২)*। মূলত **আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু** এর অর্থ হলো - আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো মা'বূদ নেই এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করা। *(তাত্বহীরুল জানান ওয়াল ফুরকান 'আন দারানিশ শিরকি ওয়াল কুফরান, পৃঃ ৩০)*। উক্ত বাক্যের দুটি অংশ। একটি 'না' বাচক। অপরটি 'হ্যাঁ' বাচক। 'লা-**'ইলাহা'** অংশটুকু **'না'** বাচক আর **'ইল্লাল্লাহ'** অংশটুক **'হ্যাঁ'** বাচক। কেননা প্রথমে সমস্ত বাতিল মা'বূদের জন্য কৃত সকল প্রকার ইবাদতকে অস্বীকার করে দ্বিতীয় বাক্যে তা একমাত্র তা সত্য মা'বূদ মহান আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। *(প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১; ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন-১৭, পৃঃ-৪৭)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ - 'এজন্যেও যে, মহান আল্লাহ, তিনিই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে ওটা তো অসত্য এবং মহান আল্লাহ, তিনিই তো সমুচ্চ, মহান' *(সূরাহ আল-হাজ্জ : ৬২)*।

আর **ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।** এর অর্থ হলো, অন্তরে বিশ্বাস এবং মুখে এই কথার স্বীকৃতি প্রদান করা যে, মুহাম্মাদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা সমস্ত জিন ও ইনসানের জন্য রাসূল হিসাবে প্রেরিত হয়েছেন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমাকে রাসূল হিসাবে সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থ হলো - নির্দেশিত বিষয়ের প্রতি আনুগত্য করা, তিনি যে বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন তাকে বিশ্বাস করা, তিনি যে বিষয়ে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা এবং অন্যকে বিরত রাখা, মহান আল্লাহর ইবাদত না করা তার শরী'আত ব্যতীত এবং তার বিপরীতে প্রবৃত্তি ও বিদ'আত থেকে সর্বদা বিরত থাকা, যে বিষয়ে তিনি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিয়েছেন। *(সূরাহ আল-হাশর : ৭; সূরাহ আন-নিসা : ৬৫; সূরাহ আন-নূর : ৬৩; সহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮; ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন-১৭, পৃঃ-৪৯)*

প্রশ্ন ঃ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু' কিভাবে তাওহীদের সকল প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করে?

উত্তর ঃ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু' এই পবিত্র বাক্যটি তাওহীদের সকল প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করে। কখনও প্রকাশ্যভাবে আবার কখনও অপ্রকাশ্যভাবে। **'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু'** বলার সাথে সাথে বাহ্যিকভাবে তাওহীদে উলুহিয়াতকেই বুঝায়। তবে তা তাওহীদে রুবূবিয়াকেও শামিল করে। কেননা যারা মহান আল্লাহর ইবাদত করে তারা আল্লাহর রুবূবিয়াতকে স্বীকার করে বলেই তা করে থাকে। এমনিভাবে তাওহীদে আসমা ওয়াছ ছিফাতকেও অন্তর্ভুক্ত করে। কারণ যার কোনো সুন্দর নাম ও গুণাবলী নেই মানুষ কখনই তার ইবাদত করতে রাজি হবে না। এজন্যই ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা তাঁর পিতাকে বলেছেন, إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا - 'হে আমার পিতা! যে শুনে না, দেখে না এবং তোমার কোনো উপকারে আসে না, তার ইবাদাত কেন কর?' *(সূরাহ মারিয়াম : ৪২)*। সুতরাং তাওহীদে উলূহিয়াতের স্বীকৃতি তাওহীদে রুবূবিয়াত ও তাওহীদে আসমা ওয়াছ ছিফাতকেও অন্তর্ভুক্ত করে। *(ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন-১৮, পৃঃ-৫০)*

প্রশ্ন ঃ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু'-এর ফযীলাত কী?

উত্তর ঃ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু'-এর ফযীলাতের বর্ণনা পেশ করে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ - تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا - وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ -

'আপনি কি লক্ষ্য করেননি, আল্লাহ কিভাবে উপমা দিয়ে থাকেন? সৎ বাক্যের তুলনা উৎকৃষ্ট বৃক্ষ -যার মূল সুদৃঢ় ও শাখা-প্রশাখা ঊর্ধ্বে বিস্তৃত, যা প্রতি মুহূর্তে ফল দান করে থাকে তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। আর আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা এজন্য দেন যে, তারা যেন শিক্ষা অর্জন করে' *(সূরাহ ইবরাহীম : ২৪-২৫)*। উক্ত আয়াতে **'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু'**-এর ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জেনে বুঝে এই বিশ্বাস নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে যে, 'আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো মা'বূদ নেই, সে ব্যক্তি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।' *(মিশকাত, হা/৩৭)*। একনিষ্ঠচিত্তে **'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু'** পাঠকারী ক্বিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-এর শাফা'আত লাভে ধন্য হবে। *(সহীহ বুখারী, হা/৯৯, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০, ইফাবা হা/৯৯, ১/৭৪ পৃঃ), 'ইলম' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩৩)*।

প্রশ্ন ঃ মুসলিম হয়ে মৃত্যুবরণ করার জন্য মৃত্যুকালে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু' বলা শর্ত কি?

উত্তর ঃ মুসলিম হয়ে মৃত্যুবরণ করার জন্য মৃত্যুকালে এই কালেমা বলা শর্ত নয়। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা মৃত্যুর সময় এ কালেমা স্মরণ করানোর কথা বলেছেন। (সহীহ মুসলিম, হা/৯১৭; মিশকাত, হা/১৬১৬)। তিনি আরও বলেছেন যে, **'যার জীবন এই কালেমার মাধ্যমে শেষ হবে সে জান্নাতে যাবে'**। *(আবূ দাঊদ, হা/৩১১৬; মিশকাত, হা/১৬২১)*।

তাওহীদ প্রসঙ্গ

প্রশ্ন ঃ তাওহীদ কাকে বলে? এটা কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর ঃ ইবাদতের জন্য একমাত্র মহান আল্লাহকে একক গণ্য করাই হলো **'তাওহীদ'**। *(শায়খ উছায়মীন, শরাহু ছালাছাতিল উছূল, পৃঃ ৩৯)*। মহান আল্লাহ মানব জাতিকে পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন শুধু তাঁর তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য। *(সূরাহ আল-যারিয়াত : ৫৬; সূরাহ আন-নাহল; ৩৬)*। মহান আল্লাহর একত্ব বা তাওহীদকে মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরাম তিন শ্রেণীতে বিভক্ত

করেছেন। যথা ঃ **(এক)** তাওহীদে রুবূবিয়াহ **(দুই)** তাওহীদে উলূহিয়াহ এবং **(তিন)** তাওহীদে আসমা ওয়া ছিফাত। *(শায়খ উছায়মীন, মাজমূঊ ফাতাওয়া ওয়া রাসাইল, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৩)*। আর এ তিন প্রকার তাওহীদ একত্রে বর্ণিত হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে। মহান আল্লাহ তা'তালা বলেন, رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا - 'তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এতোদুভয়ের অন্তর্বর্তী যা কিছু আছে, সবারই প্রতিপালনক, সুতরাং তুমি তাঁরই ইবাদত করো এবং তাঁরই ইবাদতে প্রতিষ্ঠিত থাকো; তুমি কি তাঁর সমমান সম্পন্ন কাউকেও জান?' *(সূরাহ মারইয়াম : ৬৫)*।

প্রশ্ন ঃ তাওহীদে রুবূবিয়াহ কাকে বলে?

উত্তর ঃ একমাত্র মহান আল্লাহকে সবকিছুর পালনকর্তা, সৃষ্টিকর্তা, রূযীদাতা, জীবনদাতা, মরণদাতা, আইনদাতা ও সবকিছুর মালিক হিসাবে বিশ্বাস করা হলো **'তাওহীদে রুবূবিয়াহ'**। *(শারহু ছালাছাতিল উছূল, পৃঃ ৩৯)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ -

'নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক হচ্ছেন সেই আল্লাহ, যিনি আসমান ও যমীনকে ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি স্বীয় আরশের উপর সমুন্নত হন, তিনি দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এমনভাবে যে, রাত্রি ও দিবস একে অন্যকে অণুসরণ করে চলে তড়িৎ গতিতে; সূর্য চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি সবই তাঁর হুকুমের অনুগত। জেনে রেখো, সৃষ্টির একমাত্র কর্তা তিনিই, আর হুকুমের একমাত্র মালিক তিনিই, সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ হলেন বরকতময়' *(সূরাহ আল-আ'রাফ : ৫৪)*। পবিত্র কুরআনে বহু আয়াতে উক্ত প্রকারের বিবরণ এসেছে। *(প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম পুস্তকের ৫৪ পৃষ্ঠার ১১ নং প্রশ্ন)*।

প্রশ্ন ঃ ইসলামে প্রবেশের জন্য 'তাওহীদে রুবূবিয়াহ'-এর স্বীকৃতিই যথেষ্ট?

উত্তর ঃ না, কেননা কাফিররা এটাকে স্বীকার করা সত্ত্বেও ইসলামে প্রবেশ করতে পারেনি। *(সূরাহ লুক্বমান : ২৫; আয-যুমার : ৩৮; সহীহ বুখারী, হা/৪৮১১)*

প্রশ্ন ঃ শরী'আত বিরোধী গঠনতন্ত্র ও সংবিধান সম্পর্কে ইসলামের বিধান কী?

উত্তর ঃ পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস হলো মহান আল্লাহ প্রদত্ত সর্বশেষ চূড়ান্ত সংবিধান। তাই একে বাদ দিয়ে কেউ যদি কোনো নবী ও কিতাবের অনুসরণ করে, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না; বরং সে পথভ্রষ্ট হবে। (মিশকাত, হা/১৯৪)। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেছেন, 'আমি তোমাদের কাছে উজ্জ্বল ও পরিচ্ছন্ন দ্বীন নিয়ে এসেছি। শুনে রাখ, আজ যদি মূসা আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা বেঁচে থাকতেন, তাহলে আমার আনুগত্য করা ছাড়া তাঁরও কোনো গত্যন্তর থাকত না'। *(মিশকাত, হা/১৭৭)*। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিম-এর রিসালাতের উপর ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করলে সে জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। *(মিশকাত, হা/১০)*

পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের উপস্থিতিতে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া তাওরাত, ইঞ্জীল, যাবূরসহ অন্যান্য কিতাব যদি বাতিল হয়ে যায়, তাহলে মানুষের রচনা করা ইসলাম বিরোধী আইন কিভাবে বৈধ হতে পারে? কিভাবে সেই আইনকে সমর্থন করা যেতে পারে? সেই বিধান ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলে কি তাওহীদ থাকবে? সুতরাং মহান আল্লাহর সংবিধানে বিরোধী যেকোনো নীতিমাল, গঠনতন্ত্র ও সংবিধান বাতিল বলে গণ্য হবে।

প্রশ্ন ঃ 'ওয়াহদাতুল ওজূদ' বা সবকিছুতে মহান আল্লাহর উপস্থিতি বলতে কী বঝায়? এর উপর কোনো মুসলিম বিশ্বাস করতে পারে কি?

উত্তর সবকিছুর মধ্যে মহান আল্লাহ্র বিলীন হওয়াকে **'ওয়াহদাতুল ওজূদ'** বলে। একশ্রেণীর লোক পৃথিবীর সবকিছুকেই এক মহান আল্লাহর অংশ মনে করে থাকে। (নাঊযুবিল্লাহ)। ফলে সককিছুতেই মহান আল্লাহ্র উপস্থিতি রয়েছে। তাই সবই আল্লাহ। আল্লাহ আরশের উপরে নন, বরং সর্বত্র ও সবকিছুতেই বিরাজমান। ছূফীরা স্রষ্টা ও সৃষ্টিতে কোনো পার্থক্য করে না। বরং কোনো ব্যক্তি যখন উক্ত মর্যাদা অর্জন করে, তখন তাকে আর শরী'আতের

বিধি-বিধান পালন করতে হয় না। কারণ সে আল্লাহ্‌র মাঝে বিলীন হয়ে গেছে। এগুলো সবই **'ওয়াহদাতুল ওজূদ'** বা সবকিছুতে মহান আল্লাহ্‌র উপস্থিতি বুঝায়।

এদের আক্বীদা হলো : (ক) 'ছূফীরা বলে থাকেন, নিশ্চয় যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ তা'আলাকে চিনতে পারবে, তার উপর থেকে শরী'আতের হুকুম রহিত হয়ে যাবে। কেউ একটু বাড়িয়ে বলেছেন, যে মহান আল্লাহ তা'আলার সাথে মিলিত হবে'। (আল-ফাছর ফিল মিলাল, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৪৩)। (খ) দেওবন্দী মতবাদের আধ্যাত্মিক নেতা ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কী বলেন, 'মা'রেফতের অধিকারী ব্যক্তি সমগ্র পৃথিবীর উপর কর্তৃত্বশীল হয়। মহান আল্লাহ তা'আলার যে কোনো রশ্মিকে নিজের জন্য ধরে নিতে পারে। মহান আল্লাহর যে কোনো গুণে ও ইচ্ছায় নিজেকে বিভূষিত করে তার প্রকাশ ঘটাতে পারে। যেহেতু তার মধ্যে আল্লাহর গুণাবলী বিদ্যমান এবং সে মহান আল্লাহর চরিত্রে বিলীন'। *(যিয়াউল কুলূব (উর্দূ), পৃঃ ২৭-২৮; (বাংলা), পৃঃ ৫১)*। অন্য এক জায়গায় বলেন, 'কোনোরূপ আড়াল ছাড়াই সে মহান আল্লাহকে দেখতে পাবে। মহান আল্লাহকে সরাসরি প্রত্যক্ষ করার সে সুযোগ পাবে'। *(যিয়াউল কুলূব (উর্দূ), পৃঃ ৭-২৫; (বাংলা), পৃঃ ২০ ও ৪৪)*। তিনি আরেক জায়গায় বলেন, 'তাওহীদে জাতি হলো এই যে, বিশ্বজগতের সবকিছুকে মহান আল্লাহ বলে ধারণা করা'। *(যিয়াউল কুলূব (উর্দূ), পৃঃ ৩৫; (বাংলা), পৃঃ ৬২)*। এটি ভ্রান্ত মতবাদ। কোনো মুসলিম এ মতে বিশ্বাসী হতে পারে না। কেননা এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করা হয়েছে। এটা মূলত হিন্দুদের আক্বীদা। তারা সর্বেশ্বরবাদ বা সবকিছুকেই ঈশ্বর মনে করে। তাই তারা ঈশ্বর, মানুষ ও ব্যাঙের মাঝে কোনো তফাৎ খুঁজে পায় না। যেমন তারা বলে থাকে – **'হরির উপর হরি, হরি শোভা পায়, হরিকে দেখিয়ে হরি হরিতে লুকায়'**। মূলত এটি **'ফানাফিল্লাহ'** ভিত্তিক কুফরী আক্বীদা।

প্রশ্ন ঃ 'তাওহীদে উলূহিয়াত' কাকে বলে?

উত্তর ঃ ইবাদতের যোগ্য হিসাবে একমাত্র আল্লাহকে একক গণ্য করাই হলো – **'তাওহীদে উলূহিয়াত'**। বান্দা হিসাবে সকল কর্মে আল্লাহর এককত্ব প্রমাণ করা। যাবতীয় ইবাদত, প্রার্থনা, দু'আ, প্রত্যাশা, ভয়-ভীতি, আগ্রহ, আগ্রহ, মানত, কুরবানী, সবই পেশ করার জন্য মহান আল্লাহকে একক গণ্য করা। *(আক্বীদাতুত তাওহীদ, পৃঃ ৪২)*। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - '(হে নবী!) আপনি

বলুন, নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু বিশ্ব জাহানের প্রতিপালকের জন্য' *(সূরাহ আল-আন' আম : ১৬২)*। আর এই আদেশ দেওয়ার জন্যই মহা আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে সমস্ত নবী-রাসূলকে প্রেরণ করেছিলেন *(সূরাহ আন-নাহল : ৩৬; আল-আম্বিয়া : ২৫)*।

প্রশ্ন ঃ যারা মহান আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে মানব রচিত আইন দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করে তাদের হুকুম কী?

উত্তর ঃ মহান আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত বিধান দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করা বা বিচার-ফায়সালা করা তাওহীদে রুবূবিয়াতের অন্তর্ভুক্ত। তাই মহান আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে মানব রচিত বিধান দ্বারা বিচার-ফায়সালা করা তাওহীদে রুবূবিয়াত অস্বীকার করার শামিল। এছাড়া ইয়াহুদী-নাছারা তারা তাদের ধর্ম-যাজকদেরকে রব হিসাবে গ্রহণ করেছিল। তারা মহান আল্লাহর বিধানের বিরোধিতা করে ঐ সব পাদ্রী ও আলেমদের কাছে নতি স্বীকার করত এবং তাদের অনুসরণ করত। এজন্য মহান আল্লাহ তা'আলা তাদের ধর্মযাজকদেরকে 'রব' হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন *(সূরাহ আত-তাওবা : ৩১)*। আদী বিন হাতেম রাজিআল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমাকে বললেন, তারা তো তাদের ইবাদত করে না। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বললেন, তারা হালালকে হারাম করে এবং হারামকে হালাল করে। আর সাধারণ লোকেরা তাদের অনুসরণ করে থাকে। এটিই তাদের ইবাদত। *(তিরমিযী, হা/৩০৯৫, সনদ হাসা)*। তাই যারা মহান আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে মানব রচিত বিধানের আলোকে বিচার ফায়সালা করে থাকে তারা অনুরূপ ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের ন্যায়। এছাড়া মহান আল্লাহ তা'আলা তাদরেকে মুনাফিক্ব *(সূরাহ আন-নিসা : ৬০–৬৫)* ও কাফের, ফাসিক ও জালেম (সূরাহ আল-মায়েদাহ : ৪৪-৪৫, ৪৭। হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।

প্রশ্ন ঃ মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য মা'বুদের ইবাদত করার পরিণাম কী?

উত্তর ঃ মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য মা'বূদের ইবাদত করা শিরক। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ - 'উহা এজন্য যে আল্লাহই প্রকৃত সত্য এবং তাকে ব্যতীত তাঁরা যাকে আহ্বান করে তা বাতিল (সূরাহ লুক্বমান : ৩০)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেছেন, 'যে ব্যক্তি **'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু'** বলল

এবং আল্লাহ ব্যতীত যার ইবাদত করা হয় তাকে অস্বীকার করল, তার রক্ত ও সম্পদ হারাম এবং তার হিসাব মহান আল্লহ্‌র নিকট'। (সহীহ মুসলিম, হা/২৩)। এছাড়া শিরককারীর উপর মহান আল্লাহ জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন (সূরাহ আল-মায়েদাহ : ৭২)।

প্রশ্ন ঃ ত্বাগূতের কাছে ফায়সালা নেওয়ার পরিমাণ কী?

উত্তর ঃ 'ত্বাগূত' অর্থ – সীমালংঘণকারী, বিপদগামী, আল্লাদ্রোহী, অবাধ্য, পথভ্রষ্ট, শয়তান, মূর্তি, দেবতা। *(তাফসীরে কুরতুবী, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ১০৩)*। মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আসা ফায়সালাই হলো চূড়ান্ত ফায়সালা। মহান আল্লাহ মানুষের স্রষ্টা। তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন কোথায় মানুষের জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তাই কোনো মানুষ আল্লাহর আইন ব্যতীত আল্লাহদ্রোহী ত্বাগূতের রচনা করা কোনো আইনকে বিশ্বাস করতে পারে না, মানতেও পারে না। মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা প্রদত্ত বিধানের অনুসরণ না করে মানব রচিত বা শয়তান প্রদত্ত আইনের অণুসরণ করাই হলো **'ত্বাগূত'**। *(ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫০)*। আর এই ত্বাগূতকে বর্জন করার জন্যই মহান আল্লাহ প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক জনপদে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন *(সূরাহ আন-নাহল : ৩৬)*। ত্বাগূতদের নিকট ফায়সালা নেওয়ার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। যেমন মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَـٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا - أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ - وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا -

'আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যাদেরকে কিতাবের এক অংশ দেওয়া হয়েছে, তারা জিব্‌ত (অর্থাৎ মূর্তি, প্রতিমা, যাদুকর, ভেলকিবাজ ইত্যাদি) ও ত্বাগূতের প্রতি ঈমান আনে এবং কাফিরদেরকে বলে, এরা মুমিনদের তুলনায় অধিক সঠিক পথপ্রান্ত। তারা ঐ সমস্ত লোক যাদেরকে মহান আল্লাহ তা'আলা লা'নত করেছেন। আর মহান আল্লাহ যাকে লা'নত করেন, আপনি কখনো তার কোনো সাহায্যকারী পাবেন না'। *(সূরাহ আন-নিসা : ৫১-৫২)*। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَـٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ -

‘(হে নবী!) আপনি বলুন! আমি কি তোমাদেরকে মহান আল্লাহর নিকট পরিণতির বিচারে এর চেয়ে মন্দ কিছুর সংবাদ দিব ? যাকে মহান আল্লাহ লা‘নত দিয়েছেন এবং যার উপর তিনি ক্রোধান্বিত হয়েছেন ? আর যাদের মধ্যে থেকে বাঁদর ও শূকর বানিয়েছেন এবং তারা ত্বাগূতের উপাসনা করেছেন। তারাই অবস্থানের দিক দিয়ে মন্দ এবং সোজা পথ থেকে সর্বাধিক বিচ্যুত’ *(সূরাহ আল-মায়েদাহ : ৬০)*। আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ - وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ - أُولَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ - هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ -

‘যারা ঈমান এনেছে মহান আল্লাহ তাদের বন্ধু, তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর যারা কুফরী করে, তাদের অভিভাবক হলো ত্বাগূত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারে নিয়ে যায়। তারা আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে’ *(সূরাহ আল–বাক্বারাহ : ২৫৭)*

প্রশ্ন ঃ মহান আল্লাহর অধিকার কী?

উত্তর ঃ মহান আল্লাহর অধিকার হলো – তাঁর ইবাদত করা ও তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করা এজন্য মহান আল্লাহর অধিকার সঠিকভাবে আদায় করতে হলে তাঁর প্রতি দৃঢ় ঈমান পোষণ করে তাওহীদের তিনটি পর্যায়কে চূড়ান্তভাবে ধারণ করতে হবে। উক্ত তিনটি বিষয় পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করলে মহান আল্লাহর অধিকার পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। মু‘আয় রাজিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-এর গাধার পিছনে ছিলাম। তাকে বলা হতো **‘উফাইর’**। তখন তিনি আমাকে বললেন, ‘হে মু‘আয! তুমি কি জান বান্দার প্রতি মহান আল্লাহর অধিকার কী? আর মহান আল্লাহর প্রতি বান্দার অধিকার কী? আমি বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই বেশি অবগত। তখন তিনি বললেন, বান্দার প্রতি মহান আল্লাহর অধিকার হলো, তারা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না। আর মহান আল্লাহর প্রতি বান্দার অধিকার হলো – যে বান্দা আল্লাহর সাথে শরীক করবে না, তাকে শাস্তি না দেওয়া’। *(মিশকাত; হা/২৮)*

প্রশ্ন ঃ গায়রুল্লাহর নৈকট্য হাসিলের জন্য পশু কুরবানী করার হুকুম কী? গায়রুল্লাহর নামে যবেহ করা পশুর গোশত ভক্ষণ করা জায়েয আছে কি?

উত্তর ঃ গায়রুল্লাহর নামে পশু যবাই করা বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত। কেননা যবেহ করা একটি ইবাদত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ - 'আপনার প্রভুর জন্য সালাত আদায় করুন এবং কুরবানী করুন *(সূরাহ আল-কাওছার : ২)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ - 'আপনি বলুন! আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন আমার মরণ সব কিছু বিশ্বজাহানের প্রতিপালক মহান আল্লাহর জন্য। তাঁর কোনো শরীক নেই, আর আমি এর জন্যই আদিষ্ট হয়েছি। আমিই মুসলিম' *(সূরাহ আল–আন'আম ১৬২-১৬৩)*। সুতরাং যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য পশু যবেহ করবে, চাই সে কোনো ফেরেশতার উদ্দেশ্যে করুক বা নবী-রাসূলের উদ্দেশ্যে বা কোনো অলী বা আলেমের উদ্দেশ্যে করুক সেটা শিরক হবে। আর শিরককারীর উপর মহান আল্লাহ জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন *(সূরাহ আল-মায়েদাহ : ৭২)*। গায়রুল্লাহর নামে যবেহকৃত পশুর গোশত খাওয়া হারাম। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ -

'তোমাদের জন্য মৃত, রক্ত, শুকরের মাংস, আল্লাহ ছাড়া অপরের নামে উৎসর্গকৃত পশু, গলাটিপে মারা পশু, প্রহারে মৃত পশু, উপর থেকে পতিত হয়ে মারা যাওয়া পশু, অন্য পশুর শিংয়ের আঘাতে মৃত পশু এবং হিংস্র জন্তুর ভক্ষণ করা পশুর গোশত খাওয়া হারাম করা হয়েছে। তবে যা তোমরা যবেহ করে পবিত্র করেছ, তা হালাল। আর যে সমস্ত পশুকে পূজার বেদীর উপর বলি দেওয়া হয়েছে, তাও তোমাদের জন্য হারাম' *(সূরাহ আল-মায়েদাহ : ৩)*

প্রশ্ন ঃ 'তাওহীদে আসমা ওয়াছ ছিফাত' কাকে বলে?

উত্তর ঃ মহান আল্লাহর নামসমূহ ও তাঁর গুণাবলী এককভাবে তাঁর সাথেই সম্পৃক্ত, অন্য কারো সাথে তুলনীয় নয়। পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, ঐভাবেই বিশ্বাস করতে হবে। (তাত্বহীরুল জানান ওয়াল ফুরকান, পৃঃ ৫৬)। কোনো রূপক বা বিকৃত অর্থ করা যাবে না,

কোনো কল্পিত ব্যাখ্যাও চলবে না। যেমন আল্লাহ চিরঞ্জীব (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ২৫৫; আলে ইমরান : ২), তিনি সর্বজ্ঞানী *(সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ২৫৫; আল-মুলক : ১৪)*, তাঁর ইচ্ছার গুণ (সূরাহ ইয়াসিন : ৮২), তাঁর ক্ষমতা (সূরাহ আল-ফাতাহ : ২১), তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা (সূরাহ আশ-শূরা : ১১), তাঁর কথা বলা ও সাক্ষাৎ *(সূরাহ আন-নিসা : ১৬৪; আল-আ'রাফ : ১৪৩)*, তাঁর দয়া (সূরাহ আন-নামল : ৩০), তাঁর ভালোবাসা (সূরাহ আল-মায়েদাহ : ৫৪), তাঁর চেহারা (সুলাহ আর-রহমান : ২৭), তাঁর চোখ (সূরাহ ত্ব-হা : ৩৯), তাঁর দুই হাত (*সূরাহ আছ-ছোয়াদ " ৭৫; আল মায়েদাহ : ৬৪; আল-মুলক : ১; আল-ফাতহ : ১০)*, তিনি আরশের উপর সমুন্নত (সূরাহ ত্ব-হা : ৫; আল – আ'রাফ : ৫৪ ; ইউনুস : ৩; আর-রা'দ : ২; আল-ফুরক্বান : ৫৯; আস-সাজদাহ : ৪; আল-হাদীদ : ৪), তাঁর অবতরণ করা প্রভৃতি সবই মহান আল্লাহর গুণাবলী। *(মিশকাত, হা/১২২৩)*। তাই প্রতিটি মুসলিম এগুলো বিষয়ের উপর কোনো ধরনের রূপক বা বিকৃত অর্থ ছাড়াই পুরিপূর্ণভাবে ঈমান রাখবে এটাই তাওহীদের দাবী।

প্রশ্ন ঃ মহান আল্লাহর নাম কি নির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমিত?

উত্তর ঃ না, আল্লাহর নামগুলো নির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমিত নয়। (সিলসিলা সহীহ হা/১৯৯)। মহান আল্লাহর নামের ভাণ্ডারে যে সমস্ত নাম সংরক্ষিত রেখেছেন, তা একমাত্র মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। অতএব আল্লাহর নাম সীমিত নয়। তবে বুখারীতে একটি হাদীসে ৯৯টি নামের কথা এসেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেছেন, **'আল্লাহর এমন নিরানব্বইটি নাম রয়েছে, যে ব্যক্তি এগুলো মুখস্থ করবে, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে'**। (মিশকাত, হা/২২৮৭)। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা থেকে মহান আল্লাহর নামসমূহের নির্দিষ্ট সংখ্যার বর্ণনা সহীহ সূত্রে সাব্যস্ত হয়নি। (ফাতাওয়া আরাকানুল ইসলাম, পৃঃ ৩১, পৃঃ ৭৪-৭৬)।

প্রশ্ন ঃ 'আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান' আক্বীদা কি সঠিক?

উত্তর ঃ পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে উক্ত বিশ্বাস সঠিক নয়। বরং আল্লাহ মহান আরশের উপর সমুন্নত। মহান আল্লাহ তাঁর পরিচয় দিয়ে বলেন, - الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ **'দয়াময় (আল্লাহ) আরশের উপর সমুন্নত'** (সূরাহ ত্ব-হা : ৫)। এছাড়া সূরাহ আল-আ'রাফ : ৫৪, সূরাহ ইউনুস : ৩, সূরাহ আর-রা'দ : ২, সূরাহ আল-ফুরক্বান : ৫৯, সূরাহ আস-

সাজদাহ : ৪, সূরাহ আল-হাদীদ : ৪ আয়াতসহ মোট ৭টি আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয যে, মহান আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর সমুন্নত। হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, মহান আল্লাহ আরশের উপর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেছেন, 'যখন আল্লাহ মাখলূক সৃষ্টির ইচ্ছা করলেন, তখন আরশের উপর তাঁর কাছে রক্ষিত এক কিতাবে লিপিবদ্ধ করলেন যে, অবশ্যই আমার করুণা আমার ক্রোধের উপর জয়লাভ করেছে'। (মিশকাত, হা/২৩৬৪)।

অনুরূপভাবে মহান আল্লাহ তা'আলা আসমানে আছেন এটাও স্পষ্টভাবে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত (সূরাহ আল-মূলক : ১৬-১৭)। এছাড়া সূরাহ আলে ইমরান : ৫৫ এবং সূরাহ আন-নিসা : ১৫৮ আয়াত দ্বারাও আসমানে অবস্থানের কথা প্রমাণিত হয়। অনুরূপ হাদীছেও স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। (মিশকাত, হা/৪৯৬৯, সনদ সহীহ)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমাকে মহান আল্লাহ মি'রাজে নিয়ে গিয়েছিলেন সপ্তম আসমানের উপরে এবং বারবার মূসা আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা-এর নিকট থেকে মহান আল্লাহর কাছে যাওয়ার বিষয়টি সবারই জানা। (সহীহ বুখারী, হা/৩৮৮৭, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৪৮-৪৯, (ইফাবা হা/৩৬০৮, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪১১)। আরও অনেক দলীল আছে যার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, মহান আল্লাহ আরশের উপর সমুন্নত। (মিশকাত, হা/৫৮৬২)। তাছাড়া মানুষের স্বভাবজাতও প্রমাণ করে মহান আল্লাহ উপরে আছেন। কারণ কোন বিষয়ে মহান আল্লাহকে সাক্ষী রাখতে চাইলে মানুষ আগে উপরের দিকে হাত উঠায়। দুই হাত তুলে দু'আ করার সময়ও মানুষের লক্ষ্য থাকে উপরের দিকে।

প্রশ্ন ঃ সমাজে প্রচলিত আছে যে, মহান আল্লাহ নিরাকার। এ ব্যাপারে সঠিক আক্বীদা কী?

উত্তর ঃ মহান আল্লাহ তা'আলা নিরাকার নন, তাঁর আকার আছে। তিনি শুনেন, দেখেন এবং কথা বলেন। তাঁর হাত রয়েছে। (সূরাহ আল-মায়েদাহ : ৬৪; সূরাহ আছ-ছোয়াদ : ৭৫; সূরাহ আল-মুলক : ১ ; সূরাহ আয-যুমার : ৬৭; মিশকাত, হা/২৩২৯)। তাঁর পা রয়েছে, (সূরাহ আল-কলম : ৪২; মিশকাত হা/৫৫৪২), তাঁর চোখ রয়েছে (সূরাহ ত্বো-হা : ৩৯; সহীহ বুখারী, হা/৩৪৩৯, ১/৪৮৮৯ পৃঃ (ইফাবা হা/৩১৯৭, ৬/১২৯ পৃঃ) এবং তাঁর চেহারাও রয়েছে (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ১১৫ সূরাহ আর-রহমান : ২৬-২৭)। তবে তাঁর সাথে সৃষ্টির কোন কিছুই তুলনীয় নয়। মহান আল্লাহ তা'আলা

বলেন, - لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ - وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ 'কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা' (সূরাহ আশ-শূরা : ১১)। সুতরাং তাঁর আকারের সাথে কোনো কিছুর তুলনা করা যাবে না। যেমন মহান আল্লাহ নিজেই বলেছেন, - فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ 'সুতরাং তোমরা আল্লাহর কোন সাদৃশ্য বর্ণনা করো না' (সূরাহ আন-নাহল : ৭৪)। অতএব আল্লাহর আকার আছে। তাই পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসে তাঁর আকৃতি সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তার কোনো রূপক বা বিকৃত অর্থ করা যাবে না। বরং বলতে হবে তিনি তাঁর মত। ***(প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম পুস্তকের ৫০-৬২ পৃঃ)***

তাঁকে বেহেশ্‌তে দেখা যাবে। তাঁর দীদারই হবে বেহেশ্‌তের সবচেয়ে বড় সুখ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা স্বপ্নে আল্লাহকে দেখেছেন। তিনি বলেছেন, আমি আমার প্রতিপালককে সবচেয়ে সুন্দর আকৃতিতে দর্শন করেছি (আহমাদ, তিরমিযী, সহীহুল জামে' ৫৯নং)। আর যা দেখা যায়, তা নিরাকার নয়। **(দ্বীনি প্রশ্নোত্তর কিতাবের ৪৯ পৃঃ)**

প্রশ্ন ঃ মহান আল্লাহর চেহারা ও হাত অথবা এ জাতীয় যে সমস্ত বিষয় মহান আল্লাহ নিজের দিকে সম্বোধন করেছেন, তা কত প্রকার?

উত্তর ঃ মহান আল্লাহ তা'আলা নিজের দিকে যে সমস্ত বিষয় সম্বোধন করেছেন তা তিন প্রকার। যথা ঃ **(এক)** স্বয়ং সম্পূর্ণ কোন বস্তুকে মহান আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করা। এটি হলো সৃষ্টিকে তার সত্তার দিকে সম্পৃক্ত করার শ্রেণীভুক্ত। এটি কখনো সাধারণ ভঙ্গিতে হয়। যেমন মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমার যমীন অতি প্রশস্ত (সূরাহ আল-'আনকাবূত : ৫৬)। আবার কখনো কোনো জিনিসের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য মহান আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ হয়। যেমন বলা হয়, বাইতুল্লাহ আল্লাহর ঘর নাক্বাতাল্লাহি আল্লাহর উটনী ইত্যাদি। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ - 'আমার ঘরকে পবিত্র রেখো তাদের জন্য, যারা ত্বাওয়াফ করে এবং যারা দাঁড়ায়, রুকু করে ও সিজদা করে' (সূরাহ আল-হজ্জ : ২৬)। অন্যত্র তিনি বলেন, **'আল্লাহর উষ্ট্রী ও তাকে পানি পান করাবার বিষয়ে সাবধান হও'** (সূরাহ আশ-শামস : ১৩)।

(২) অন্যের উপর নির্ভরশীল কোন বস্তুকে মহান আল্লাহর প্রতি সম্বন্ধ করা। সাধারণত সম্মানের জন্যই তাকে মহান আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করা হয়। যেমন মহান তা'আলা ঈসা আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা-এর ব্যাপারে বলেন, **'তিনি মহান আল্লাহর রূহ'** (সূরাহ আন-নিসা : ১৭১)। এখানে ঈসা

আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা-এর সম্মান বৃদ্ধির জন্য তাঁকে মহান আল্লাহর দিকে সম্বন্ধিত করা হয়েছে। **'আল্লাহর রূহ'**-এর অর্থ হলো, মহান আল্লাহ যে সমস্ত রূহ সৃষ্টি করেছেন, তাঁর রূহও সে সমস্ত রূহের অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু এ রূহ অন্যান্য রূহের তুলনায় অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। এটা নয় যে, মহান আল্লাহর রূহ ঈসা আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা-এর রূহের ভিতরে প্রবেশ করে আছে। এরূপ বিশ্বাস করা বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

(৩) মহান আল্লাহর সিফাতকে আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করা। পবিত্র কুরআনে ব্যাপকভাবে এ ভঙ্গিতে মহান আল্লাহর সিফাতের বিবরণ এসেছে। মহান আল্লাহর কোন সিফাতই তাঁর সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন অজহুল্লাহি মহান আল্লাহর চেহারা, ইয়াদাইহি মহান আল্লাহর হাত, কুদরাতুল্লাহ মহান আল্লাহর শক্তি বা ক্ষমতা, ইজজাতুল্লাহি আল্লাহর ইয্যত বা সম্মান। (ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন-৩৮)।

প্রশ্ন ঃ সমাজে প্রচলিত আছে যে, মহান আল্লাহকে দেখা যাবে না। এ কথা কি সত্য?

উত্তর ঃ উক্ত বিশ্বাস সঠিক নয়। কেননা ক্বিয়ামতের দিন মুমিনগণ জান্নাতে প্রবেশ করে মহান আল্লাহ তা'আলাকে সরাসরি দেখতে পাবে। মহান আল্লাহ বলেন, وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ - إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ - সেদিন অনেক চেহারা এমন হবে যে, তারা তাদের প্রভুর দিকে তাকিয়ে থাকবে' (সূরাহ আল-ক্বিয়ামহা : ২২-২৩)। আবূ হুরায়রা রাজিআল্লাহু আনহু বলেন, একদা কতিপয় লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমাকে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা! ক্বিয়ামতের দিন আমাদের প্রভুকে আমরা কি দেখতে পাব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বললেন, পূর্ণিমার রাত্রির চাঁদ দেখতে কি তোমাদের কোনো অসুবিধা হয়? তারা বলল, না, হে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা! তিনি আবার বললেন, পরিষ্কার আকাশে সূর্য দেখতে তোমাদের কি কোন অসুবিধা হয়? তার বলল, না হে মহান আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা! তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বললেন, তোমরা এভাবেই (ক্বিয়ামতের দিন) মহান আল্লাহকে দেখতে পাবে। *(মিশকাত, হা/৫৫৭৮)*। উল্লেখ্য যে, মু'তাযিলা, খারেজী, জাহমিয়া ও মুরজিয়া আক্বীদার অনুসারীরা আখেরাতে মহান আল্লাহর দর্শনকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে

থাকে। (আল-গানিমান, শারহু আক্বীদাতিল ওয়াসিত্বিইয়াহ, ১২ তম খণ্ড, পৃঃ ৩)।

শিরক প্রসঙ্গ

প্রশ্ন ঃ শিরক কাকে বলে? এটি কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর ঃ 'শিরক' শব্দের অর্থ অংশীদার স্থাপন করা। (লিসানুল আরব, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৪৪৮-৪৫০) মহান আল্লাহর ইবাদতে বা অধিকারে অন্য কোনকিছুকে সংশ্লিষ্ট করাকে 'শিরক' বলে। তথা গায়রুল্লাহকে মহান আল্লাহর বৈশিষ্ট্যের সমকক্ষ করাকে শিরক বলে। (প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম পুস্তকের ৬৩ পৃষ্ঠার ২৭ নং প্রশ্ন)। ইবনুল ক্বাইয়িম (মৃত ৭৫১ হিঃ) বলেছেন,

'শিরক হলো সৃষ্টিকর্তার অনুরূপ বা তুলনীয় হওয়া অথবা সৃষ্টকে মহান আল্লাহর সাথে তুলনা করা। আর এ দু'টি বিষয়ই শিরকের অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি সৃষ্টিকর্তার সাথে তুলনীয় হবে, অতঃপর মানুষের নিকট হতে ইবাদত তালাশ করবে, তাহলে সে শিরক করবে। আর যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সাথে কোনো সৃষ্টিকে তাঁর রুবূবিয়াত, উলূহিয়াত এবং আসমা ওয়াছ ছিফাতের ব্যাপারে তুলনা করবে, সে শিরকে পতিত হবে'। (ড. খালিদ ইবনু আব্দুল্লাহ, শারহু কাশফিশ শুব্হাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩)। শিরক দু'প্রকার। (ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-জাওয়াবুল কাফী, পৃঃ ১৩২)। **(ক)** শিরকে আকবার বা বড় শিরক, যা মুসলিম ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। তওবা ছাড়া মারা গেলে ঐ ব্যক্তি চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ - 'যে মহান আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে, মহান আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন এবং তার আবসাস্থল হবে জাহান্নাম'। (সূরাহ আল-মায়েদাহ : ৭২)। **(খ)** শিরকে আছগার বা ছোট শিরক, যা ব্যভিচার ও মদ পানের চেয়েও জঘন্য পাপ। (শারহু কিতাবুত তাওহীদ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০)। এ জন্য বান্দার প্রতি মহান আল্লাহর সবচেয়ে বড় অধিকার হলো, সে কোনোকিছুকে তাঁর সাথে শরীক করবে না। (মিশকাত হা/২৮)। কারণ মহান আল্লাহর অধিকারে একটু ত্রুটি হয়ে গেলে ফলাফল হবে অত্যন্ত ভয়াবহ।

প্রশ্ন ঃ শিরকের ধরন কয়টি ও কী কী?

উত্তর ঃ সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিরক চালু। এগুলোর কোনটি বড় শিরক, আবার কোনটি ছোট শিরক। এগুলো মোট পাঁচটি। যেমন **(১)** জ্ঞানগত

শিরক (২) ব্যবহারগত শিরক (৩) ইবাদতে শিরক (৪) অভ্যাসগত শিরক এবং (৫) ভালোবাসায় শিরক। *(শাহ মুহাম্মাদ ইসমাঈল শহীদ দেহলভী, রিসালাতুত তাওহীদ, পৃঃ ৬৪)*। এছাড়াও ভয়ভীতিতে শিরক, তাওয়াক্কুলে শিরক, আনুগত্যে শিরক, দু'আয় শিরক ইত্যাদি ধরন নিয়েও মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরাম আলোচনা করেছেন। *(প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম পুস্তকের ৬৪ পৃষ্ঠার ২৮ নং প্রশ্ন)।*

প্রশ্ন ঃ শিরকের পরিণাম কী?

উত্তর ঃ শিরকের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। **প্রথমতঃ** শিরক সবচেয়ে বড় অপরাধ। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, - إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ 'নিশ্চয় শিরক সবচেয়ে বড় জুলুম' (সূরাহ লুক্বমান : ১৩)। (সহীহ বুখারী, হা/৫৯৭৯, ২/৮৮৪ পৃঃ; সহীহ মুসলিম , হা/২৬৯, ১/৬৪ পৃঃ)। **দ্বিতীয়তঃ** শিরক ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا - 'নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তার সাথে অংশী স্থাপন করাকে ক্ষমা করেন না এবং এতদ্ব্যতীত তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে থাকেন' (সূরাহ আন-নিসা : ১১৬)। (সূরাহ আন-নিসা : ৪৮; মিশকাত, হা/২৩৩৬, সনদ সহীহ)। **তৃতীয়তঃ** যাবতীয় সৎ আমল বাতিল হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ - 'তারা যদি শিরক করে, তাহলে তারা যা আমল করেছে সবই বাতিল হয়ে যাবে' (সূরাহ আল-আন'আম : ৮৮; সূরাহ আয-যুমার : ৬৫)। **চতুর্থতঃ** শিরককারীর উপর জান্নাত হারাম। মহান মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ -

'যে মহান আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে, মহান আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন এবং তার আবসাস্থল হবে জাহান্নাম'। (সূরাহ আল-মায়েদাহ : ৭২)। (সহীহ মুসলিম, হা/২৭৯, ১/৬৬ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৭১)। **পঞ্চমতঃ** শিরককারীর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা শাফা'আত করবেন না। *(তিরমিযী, হা/২৪৪১, ২/৭০ পৃঃ, সনদ সহীহ)*

অতএব কোন ব্যক্তি যদি **'শিরক আকবার'** বা বড় শিরক করে এবং তওবা না করে মারা যায়, তবে সে আর কোনো দিন জান্নাতে যেতে পারবে

না। চিরস্থায়ীভাবে কাফের-মুশরিকদের মত জাহান্নামে থাকবে। **'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু'** কালেমা পড়েও কোন লাভ হবে না। তবে শিরক না করে অন্য যেকোনো পাপ করে তওবার পূর্বে মারা গেলে তার জন্য তিনটি বাঁচার পথ খোলা আছে। **(এক)** শিরক না করার কারণে মহান আল্লাহ চাইলে তাকে ক্বিয়ামতের মাঠে ক্ষমা করে দিবেন। (সূরাহ আন-নিসা; ৪৮ ও ১১৬; তিরমিযী, হা/৩৫৪০, ২/১৯৪ পৃঃ, সনদ সহীহ)। **(দুই)** উক্ত পাপের কারণে জাহান্নামে গেলেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-এর সুপারিশে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করে জান্নাতে যেতে পারবে। (আবূ দাউদ, হা/৪৭৩৯; ইবনু মাজাহ, হা/৪৩১০; তিরমিযী, হা/২৪৪১, সনদ সহীহ)। **(তিন)** উক্ত দু'টি সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করার পর কালেমার বদৌলতে এক সময় জান্নাতে যাবে। (ইবনু মাজাহ, হা/৬০, 'ঈমান' অনুচ্ছেদ)। কাফের-মুশরিকদের মত চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা অত্যন্ত কঠোর ভাষায় বলে দিয়েছেন, 'তুমি কোনোকিছুকে মহান আল্লাহর সাথে শরীক করায় না, যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় এবং আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়'। (মুসনাদে আহমাদ, হা/২২১২৮, সনদ সহীহ)।

প্রশ্ন ঃ সবচেয়ে বড় পাপ কোনটি?

উত্তর ঃ পাপের জগতে সবচেয়ে বড় পাপ হলো শিরক। মহান তা'আলা বলেন - إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ 'নিশ্চয় শিরক সবচেয়ে বড় জুলুম' (সূরাহ লুক্বমান : ১৩)। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাজিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেন, হে মহান আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা ! আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় পাপ কোনটি? উত্তরে তিনি বলেন, আল্লাহর সমকক্ষ দাবী করা অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। *(মিশকাত, হা/;৪৯)।*

প্রশ্ন ঃ শিরকে আকবার তথা বড় শিরক কাকে বলে? এর পরিণাম কী?

উত্তর ঃ শিরকে আকবার হচ্ছে, মহান আল্লাহর সাথে কাউকে সমকক্ষ করা। যেমন মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে আহ্বান করা, অন্যের নিকট কিছু কামনা করা, অন্যকে ভয় করা, অন্যকে মহান আল্লাহর ন্যায় ভালোবাসা, অন্যের জন্য পশু উৎসর্গ বা মানত করা এবং মহান আল্লাহর ইবাদত সমূহের কোনো ইবাদত গায়রুল্লাহ-এর উদ্দেশ্যে করাকে **'শিরকে আকবার'** বলা হয়। *(প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম পুস্তকের ৬৬ পৃষ্ঠার ৩২ নং প্রশ্ন)*। এছাড়া মহান

আল্লাহ তা'তালার নামসমূহ ও গুণাবলীর যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যে বৈশিষ্ট্যগুণে তিনি আমাদের একক রব ও উপাস্য, আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বা কোনো অলি-দরবেশ, জিন বা গ্রহ-তারা, গাছ-পালা বলে মনে করা এবং নবী, অলি, গাছ-পালা ও পাথর ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও অন্তর দ্বারা ইবাদতমূলক কোনো কর্ম করাকে শিরকে আকবার বলে। এরূপ শিরককারীর পরিণতি হলো- মুসলিম ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় এবং তওবা ছাড়া মারা গেলে ঐ ব্যক্তি চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। (সূরাহ আল-মায়েদা : ৭২; শারহু কিতাবিত তাওহীদ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০; মিশকাত, হা/৫৩৩৪) **(প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম ৬২-৬৬ পৃঃ)**

প্রশ্ন ঃ হেতুর উপর ভরসা করলে শিরক কখন হয়?

উত্তর ঃ হেতুর উপর ভরসা তিন প্রকার হতে পারে ঃ

(এক) মানুষ এমন হেতুর উপর পরিপূর্ণ ভরসা করে, যা আসলেই কোন হেতু নয়। যেমন সন্তান লাভের হেতু স্বরূপ কুমীর-পীরের উপর ভরসা রাখে। এমন ভরসা শিরকে আকবার, যা করলে মানুষ ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়।

(দুই) এমন হেতুর উপর ভরসা করে, যা আসলেই শরয়ী ও শুদ্ধ হেতু। কিন্তু হেতুর সংঘটক ও সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহকে ভুলে বসে। এ কাজও এক প্রকার শিরক, তবে তাতে মানুষ দ্বীন থেকে খারিজ হয়ে যায় না। যেমন নিজ রুযী-রুটির ব্যাপারে চাকরির ও ব্যবসার উপর ভরসা রাখে, আরোগ্যের ব্যাপারে ওষুধের উপর ভরসা রাখে আর রুযীদাতা ও আরোগ্যদাতা যে একমাত্র মহান আল্লাহ এবং চাকরি ও ওষুধ শুধু হেতুমাত্র তা ভুলে বসে। এটি শিরকে আসগার।

(তিন) এমন হেতুর উপর ভরসা করে, যা আসলেই শরয়ী ও শুদ্ধ হেতু। কিন্তু হেতুর সংঘটক ও সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর উপরেই পরিপূর্ণ ভরসা রাখে। সে জানে, মহান আল্লাহর ইচ্ছা হলে চাকরি বা ব্যবসার মাধ্যমে রুযী দেবেন, নচেৎ দেবেন না, ওষুধ খেলে মহান আল্লাহর ইচ্ছায় আরোগ্য হবে, নচেৎ হবে না। এমন কাজ তাওহীদ ও তাওয়াক্কুল-বিরোধী নয়। বরং এমন কাজ তাওহীদবাদী মুসলিমের। পূর্ণ ভরসা রাখতে হবে মহান আল্লাহর উপর, কিন্তু সেই সাথে শরয়ী ও শুদ্ধ হেতু বা অসীলাও ব্যবহার করতে হবে। মহানবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা মহান আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ ভরসা রাখতেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি আঘাত থেকে বাঁচার জন্য শিরস্ত্রাণ ও লৌহবর্ম ব্যবহার করতেন। (ইবনে উষাইমীন) (দ্বীনি প্রশ্নোত্তর কিতাবের ৫৬ পৃঃ)

প্রশ্ন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহু', 'ইয়া আলী', বা 'ইয়া জীলানী' বলা বৈধ কি?

উত্তর ঃ উদ্দেশ্য যদি আপদে-বিপদে আহ্বান বা সাহায্য প্রার্থনা করা হয়, তাহলে তা শিরকে আকবার। এমন শিরক মুসলিমকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়। মহান আল্লাহ বলেন,

أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ - أَإِلَـٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ -

অর্থাৎ, অথবা তিনি, যিনি আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন, যখন তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীর প্রতিনিধি করেন। মহান আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন উপাস্য আছে কি ? তোমরা অতি সামান্যই উপদেশ গ্রহণ করে থাক। (নাম্‌ল ঃ ৬২)

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ -

অর্থাৎ, সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে, যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে, যা ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দেবে না ? আর তারা তাদের ডাক সম্বন্ধে অবহিতও নয়। (আহ্ক্বাফ ঃ ৫)

প্রসঙ্গত ঃ উল্লেখ্য যে, কোনো সৃষ্টির কাছে সাহায্য প্রার্থনার আহ্বান তিন শর্তে বৈধ : -

(এক) যার নিকট সাহায্য চাওয়া হবে, তাকে পার্থিব জীবনে জীবিত থাকতে হবে।

(দুই) তাকে উপস্থিত বা আহ্বান শুনতে পাচ্ছে এমন অবস্থায় থাকতে হবে।

(তিন) যে সাহায্য চাওয়া হচ্ছে, সে সাহায্য করার মতো তার ক্ষমতা থাকতে হবে।

প্রশ্ন ঃ মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ কি 'বিপত্তারণ' না 'গওস পাক' আছে?

উত্তর ঃ আল্লাহ ছাড়া কেউ **'বিপত্তারণ'** না **'গওস পাক'** নেই। সুতরাং বিপদে এমমাত্র মহান আল্লাহকেই ডাকতে হবে, একমাত্র তাঁরই কাছে সাহায্য চাইতে হবে। বিপদে **'ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইয়া আলী, ইয়া জীলানী'** বলে সাহায্য বলে সাহায্য চাওয়া শিরকে আকবার। মহান আল্লাহ বলেন,

أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ - أَإِلَـٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ -

অর্থাৎ, অথবা তিনি, যিনি আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন, যখন যে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীর প্রতিনিধি করেন। মহান আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো উপাস্য আছে কি? তোমরা অতি সামান্যই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে। (নামল ঃ ৬২)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেন, "যখন তুমি চাইবে, তখন মহান আল্লাহর কাছেই চেয়ো। আর যখন তুমি প্রার্থনা করবে, তখন একমাত্র মহান আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করো।" (তিরমিযী) **(দ্বীনি প্রশ্নোত্তর ৫২ -৫৩ পৃঃ)।**

প্রশ্ন ঃ ছোট শিরক কাকে বলে? এর পরিণাম কী?

উত্তর ঃ শিরকে আকবার নয় এমন যে সব কর্মকে শরী'আতে সুস্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা শিরক বলে নামকরণ করা হয়েছে, সেগুলোই হচ্ছে শিরকে আছগার। যেমন কেউ বলল, **'আল্লাহ আর আপনি যা চান'**। **'আল্লাহ আর আপনি যদি উপস্থিত না থাকতেন, তাহলে আমার মহা বিপদ হয়ে যেত'**। অনুরূপভাবে **মহান আল্লাহ ব্যতীত অপর কারও নামে শপথ করা** ইত্যাদি। *(ইবনু তাইমিয়াহ, আক্বীদাতিল ওয়াসিত্বিইয়া, পৃঃ ১৭০)*। ড. ইবরাহীম বরীকান শিরকের সংজ্ঞায় বলেন, 'আমলের ক্ষেত্রে গায়রুল্লাহকে আল্লাহ তা'আলার সমান মনে করাকে শিরকে আছগার বলা হয়'। **যেমন কোনো কাজে ও কথায় লোক দেখানোর ভাব করা।** *(প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম পুস্তকের ৬৬ পৃষ্ঠার ৩২ নং প্রশ্ন)।*

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম রহিমাহুল্লাহ শিরকে আছগারের উদাহরণ দিয়ে বলেন, **'মাসজিদে লোক দেখানোর ভাব করা, মানুষের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোন কাজ করা, আমি আল্লাহ ও আপনার উপর ভরসা করেছি এমনটি বলা, আল্লাহ ও আপনি না হলে এমনটি হতো।** এ সব উদাহরণ প্রদানের পর তিনি বলেন, শিরকে আছগার কখনো কর্তা ব্যক্তির মানসিক অবস্থা ও উদ্দেশ্যের

পরিপ্রেক্ষিতে শিরকে আকবারেও রূপান্তরিত হতে পারে'। (প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম পুস্তকের ৬৬ পৃষ্ঠার ৩২ নং প্রশ্ন)। শিরকে আছগার বা ছোট শিরক, যা ব্যভিচার ও মদ পানের চেয়েও জঘন্য পাপ। (শারহু কিতাবিত তাওহীদ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০; মিশকাত, হা/৫৩৩৪)।

প্রশ্ন ঃ ছোট শিরকের দৃষ্টান্ত ও তা থেকে বাঁচার উপায় কী?

উত্তর ঃ চন্দ্র বিহীন রাতে কালো পাথর বেয়ে উঠা কালো-পিঁপড়ার চেয়েও গোপন হলো ছোট শিরক। (সহীহ আবু হাতেম, মাজমুঊ ফাতাওয়া, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৫২৪)। এ থেকে বাঁচার জন্য নিম্নোক্ত দু'আটি পড়তে হবে–

'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযুবিকা আন উশরিকা বিকা ওয়া আনা আ'লামু, ওয়া আস্তাগফিরুকা লিমা লা আ'লামু'। অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার সাথে জেনে যে শিরক করি, তা থেকে আমি আপনার কাছে পরিত্রাণ চাচ্ছি। আর যা জানি না তা থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তিনবার করে পাঠ করবে। (সহীহ আদাবুল মুফরাদ, হা/৭১৬, সনদ সহীহ)

প্রশ্ন ঃ 'আল্লাহ ও আপনি যা ইচ্ছা করেন'–এরূপ কথা বলা যাবে কি?

উত্তর ঃ বলা যাবে না। কেননা এটা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-এর নিকট জনৈক ইয়াহুদী আসলে তিনি তাকে বলেন, তোমরা **'আল্লাহ এবং আপনি যা ইচ্ছা করেন'**, এমন কথা বলে ও **'ক্বা' বার কসম'** করে শিরক করছ। অতঃপর তিনি বলেন, তোমরা কসম করতে চাইলে বল, **'ক্বা'বার মালিকের কসম'**; আর একথা বল, **'আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তারপর আপনি যা ইচ্ছা করেন**। (নাসাঈ, হা/৩৭৭৩, সনদ সহীহ; রওযাতুল মুহাদ্দিসীন, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৭২, হা/২৭৪৭)।

প্রশ্ন ঃ বিপদে পড়ে সময় বা যুগকে গালি দেওয়া যাবে কি?

উত্তর ঃ যাবে না। কেননা এটা দ্বারা আল্লাহকেই গালি দেওয়া হয়। আবু হুরায়রা রাজিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, আদম সন্তান যুগকে গালি দিয়ে আমাকে কষ্ট দেয়। কেননা আমিই যুগ। আমিই দিন-রাত্রি পরিবর্তন করে থাকি।' (মিশকাত, হা/২২)

প্রশ্ন ঃ 'হে আল্লাহ! তুমি ইচ্ছা করলে আমাকে ক্ষমা কর'-এভাবে দু'আ করা যাবে কি?

উত্তর ঃ না। কারণ দু'আয় শর্তারোপ করা নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যেন (দু'আ করার সময়) একথা না বলে যে, 'হে মহান আল্লাহ! তুমি ইচ্ছা করলে আমাকে ক্ষমা কর। তুমি ইচ্ছা করলে আমার প্রতি রহম কর। তুমি ইচ্ছা করলে আমাকে রিযিক দাও। বরং মহান আল্লাহর নিকট দৃঢ়তার সাথে চাইতে হবে। কেননা তিনি যা চান তাই করেন। মহান আল্লাহকে কেউ যবরদস্তি করতে পারে না। (মিশকাত, হা/২২২৫)

প্রশ্ন ঃ মূর্তি পূজার হুকুম কী?

উত্তর ঃ মূর্তি পূজা শিরক, যার পরিণাম জাহান্নাম *(সূরাহ আল-আন'আম ৭৪)*। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাজিআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেছেন, আমর ইবনু আমের সর্বপ্রথম মূর্তির নামে উটনি মুক্ত হস্তে ছেড়ে দেয় এবং মূর্তি সমূহের ইবাদত করে। আমি তাকে দেখেছি সে তার নাড়িভূঁড়ি জাহান্নামের মধ্যে টেঁনে নিয়ে যাচ্ছে। *(সিলসিলা সহীহাহ, হা/১৬৭৭)*।

প্রশ্ন ঃ ঝাড়-ফুঁকের হুকুম কী? কুরআনের আয়াত লিখে গলায় ঝুলিয়ে রাখা যাবে কি?

উত্তর ঃ শরী'আতসম্মত উপায়ে ঝাড়-ফুঁক করা বৈধ। পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসে অসংখ্য দু'আ বর্ণিত হয়েছে, যার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা নিজে ও তাঁর সাহাবীদেরকে ঝাড়-ফুঁক করতেন। একবার জিবরীল আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-এর নিকট এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা! আপনি কি অসুস্থতা বোধ করছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বললেন, হ্যাঁ। তখন জিবরীল আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমকে ঝাড়-ফুঁক করেছিলেন। *(মিশকাত, হা/১৫৩৪)*। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা হাসান ও হুসাইন রাজিআল্লাহু আনহুম–এর জন্য ঝাড়-ফুঁক করেছিলেন। *(মিশকাত, হা/১৫৩৫)*। আয়েশা রাজিআল্লাহু আনহা বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা যখন অসুস্থ হতেন, তখন সূরাহ ফালাক্ব ও নাস দ্বারা নিজের শরীরের উপর ফুঁ দিতেন এবং নিজের হাত দ্বারা শরীরে মুছে ফেলতেন। (মিশকাত, হা/১৫৩২)।

তবে পবিত্র কুরাআনের কোন আয়াত ও হাদীসের কোন দু'আ গলায় ঝুলিয়ে রাখা যাবে না। কেননা শরী'আত সম্মত ঝাড়-ফুঁকের মধ্যে গলায় ঝুলিয়ে রাখার কোন সহীহ হাদীস পাওয়া যায় না। তাছাড়া এটা শিরক। এর বিরুদ্ধে প্রমাণ পাওয়া যায়। *(সিলসিলা সহীহাহ, হা/৪৯২, সনদ সহীহ)*। উল্লেখ্য যে, ঝাড়-ফুঁক মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার পরিপন্থী নয়। *(ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন -২৬)*।

প্রশ্ন ঃ কোন রোগ থেকে মুক্তির জন্য তাবীয ব্যবহার করা যাবে কি?

উত্তর ঃ তাবীয ব্যবহার করা শিরক। যে কোনো কারণে তাবীয ব্যবহার করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেছেন, **'যে ব্যক্তি তাবীয লটকালো, সে শিরক করল'**। *(মুসনাদে আহমাদে, হা/১৭৪৫৮, সনদ সহীহ)*। এমনকি পবিত্র কুরআনের কোন আয়াত ও হাদীসে বর্ণিত কোন দুআও তাবীয আকারে ঝুলিয়ে ব্যবহার করা যাবে না। তা পরিষ্কার শিরক। *(ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন-২৫)*।

প্রশ্ন ঃ মাযারে গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগী ও টাকা-পয়সা দান করলে শিরক হবে কি?

উত্তর ঃ এগুলো শিরকে আকবার বা বড় শিরক। শরী'আতের পরিভাষায় শিরক হচ্ছে– মানুষ কোন ব্যক্তি বা অন্য কিছুকে মহান আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা, তার নিকট প্রার্থনা করা, কোনো কিছুর আশা করা, তাকে ভয় করা, তার উপর ভরসা করা, তার নিকট সুপারিশ চাওয়া, বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা, সাহায্য চাওয়া বা তার নিকট মীমাংসা চাওয়া। এছাড়া মহান আল্লাহর অবাধ্যতা করে অন্যের আনুগত্য করা, তার নিকট হতে শরী'আতের বিধান গ্রহণ করা, তার নামে পশু যবেহ করা **'শিরক'**। গাছ, পাথর, কোন স্থান, দিবস, পুরাতন নিদর্শন কিংবা মৃত মানুষের মাধ্যমে বরকত হাছিল করা এবং বছর, কালকে শুভ মনে করাও শিরক। *(প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম পুস্তকের ৬৯ পৃষ্ঠার ৪০ নং প্রশ্ন)*। মাযারে গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগী ও টাকা-পয়সা দান করলে শিরক হবে।

প্রশ্ন ঃ 'আল্লাহ আপনাকে চিরস্থায়ী করুন' কথাটি বলা কি ঠিক?

উত্তর ঃ 'আল্লাহ আপনাকে চিরস্থায়ী করুন' কথাটি বলা ঠিক নয়। এটি দু'আর মধ্যে সীমালংঘন করার শামিল। কারণ মহান আল্লাহ ব্যতীত কোন বস্তুই চিরস্থায়ী নয়। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ - وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ -

‘ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই ধ্বংসশীল। একমাত্র আপনার মহিমার ও মহানুভব পালনকর্তার চেহারা ব্যতীত’ (সূরাহ আর-রহমান : ২৬-২৭)। তিনি আরও বলেন, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ - أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ - ‘আপনার পূর্বেও কোনো মানুষকে অনন্ত জীবন দান করিনি। সুতরাং আপনার মৃত্যু হলে তারা কি চিরঞ্জীব হবে?’ (সূরাহ আল-আম্বিয়া : ৩৪)।

প্রশ্ন ঃ অনেক সময় দেখা যায় যে, গাড়ী বা মাসজিদের দেয়ালে এক দিকে ‘আল্লাহ’ আর অন্যদিকে ‘মুহাম্মাদ’ লেখা থাকে। অনুরূপভাবে কাপড়ের টুকরায়, বইয়ের উপর এবং কুরআন মাজীদের গেলাফের উপরও লেখা থাকে। এরূপ লেখা কি শরী‘আত সম্মত?

উত্তর ঃ এরূপ লেখা বৈধ নয়। এটা স্পষ্ট শিরক। কেননা এধরনের লেখাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমাকে মহান আল্লাহর সমান গণ্য করা হয়ে থাকে এবং অজ্ঞ লোকেরা এভাবে লেখা দেখা উভয় নামকে মর্যাদার দিক থেকে সমান মনে করতে পারে। তাই প্রথমে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-এর নাম মুছে ফেলতে হবে। একশ্রেণীর ভণ্ড সুফীদের বিশ্বাস মতে ‘যিনিই আল্লাহ তিনিই মুহাম্মাদ মর্মে ভ্রান্ত আক্বীদা থেকে এই শিরকের প্রচলন হয়েছে। শায়খ ওছায়মীন রহিমাহুল্লাহ বলেন, ছূফী আক্বীদার দাবীদাররা শুধু আল্লাহু, আল্লাহু যিকির করে থাকে। এজন্য এ সমস্ত জায়গায় লিখিত **‘আল্লাহ’** শব্দটিকে মুছে ফেলতে হবে। *(ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন -১০৪)*। সুতরাং গাড়ীতে, মাসজিদের দেয়ালে, কাপড়ে বা অন্য কোথাও **‘আল্লাহ’** বা **‘মুহাম্মাদ’** কোনটিই লেখা যাবে না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা সম্পর্কে আক্বীদা

প্রশ্ন ঃ মুসলিম সমাজে প্রচলিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা নূরের তৈরি। এটা কি সঠিক?

উত্তর ঃ নূরের তৈরি ফেরেশতামণ্ডলী। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা আদমের অন্যতম সন্তান। সুতরাং তাঁরও আদিসৃষ্টি মাটি থেকেই।

তিনি আল্লাহর তরফ থেকে অন্ধকারে নিমজ্জিত পথভ্রষ্ট মানুষের জন্য প্রেরিত নূর (জ্যোতি বা আলো) ছিলেন। সেই নূর বা আলোতে জাহেলিয়াতের তমসাচ্ছন্ন যুগ ও সমাজ আলোকিত হলো। অন্ধকারে দিশাহারা মানুষ সেই আলোকবর্তিকায় সরল পথের দিশা পেল। তাঁর দেহ নূরানী ছিল, কিন্তু তিনি নূর বা নূর থেকে সৃষ্টি নয় আর নবী মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা ফিরিশতাও ছিলেননা। (কুরআন ৬/৫০) সর্বপ্রথম আল্লাহপাক আরশ ও কলম সৃষ্টি করেন। (আহমাদ ৫/৩১৭) নূরে মুহাম্মাদী মহান আল্লাহর প্রথম সৃষ্টি নয়। পক্ষান্তরে যে হাদীসে নূরে মুহাম্মাদীর কথা বলা হয়েছে, তা জাল বা বাতিল হাদীস। উক্ত বিশ্বাস সঠিক নয়। উক্ত ভ্রান্ত আক্বীদাটি সমাজে বহুল প্রচলিত। এর পক্ষে কতিপয় জাল দলীল পেশ করা হয়। (প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম ৭০ পৃষ্ঠার ৪৩ নং প্রশ্ন)। এছাড়া একশ্রেণীর ভ্রষ্ট আক্বীদার অনুসারীরা পবিত্র কুরআনের সূরাহ মায়েদাহ ১৫ নং আয়াতে বর্ণিত **'নূর'** শব্দের অপব্যাখ্যা করে বলে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা নূরের তৈরি। অথচ উক্ত আয়াতে বর্ণিত **'নূর'** দ্বারা হেদায়াতের নূর তথা কিতাব উদ্দেশ্য। (সূরাহ আল-আ'রাফ : ১৫৭; সূরাহ আত-তাগাবুন : ৮)। তবে এ ব্যাপারে সঠিক আক্বীদা হলো – অন্যান্য আদম সন্তানের ন্যায় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমাও একজন মাটির তৈরি মানুষ। এটাই সঠিক এবং সালাফে ছালেহীন ছাহাবায়ে কেরামের আক্বীদা। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ -

'বলুন, আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি অহি করা হয় যে, তোমাদের মা'বূদ একজন' (সূরাহ আল-কাহফ : ১১০)। উক্ত আয়াত ছাড়াও আরও আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা একজন মানুষ। (সূরাহ বানী ইসরাঈল : ৯৩; হা-মীম সিজদা : ৬)। আর মানুষ হলো মাটির তৈরি। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, - وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ 'আর তাঁর নিদর্শন সমূহের মধ্যে হচ্ছে–তিনি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমরা মানুষ হিসাবে ছড়িয়ে গেছ' (সূরাহ আর-রূম " ২০)। অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, - إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ - **'নিশ্চয় ঈসা আদমের মত। মহান আল্লাহ তাকে মাটি হতে**

সৃষ্টি করেছেন' (সূরাহ আলে ইমরান : ৫৯)। হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা মাটির তৈরি। যেমন

আয়েশা রাজিআল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেছেন, ফেরেশতাদেরকে নূর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং জিন জাতিকে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেই সমস্ত সিফাত দ্বারা, যে সিফাতে তোমাদের ভূষিত করা হয়েছে'। অর্থাৎ মানব জাতিকে মাটিও পানি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। *(মিশকাত হা/৫৭০১)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'মানুষ আদমের সন্তান। আর মহান আল্লাহ আদম আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন।' অতএব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা মাটির তৈরি এই আক্বীদাই পোষণ করতে হবে। তিনি নূরের তৈরি এই আক্বীদা বর্জন করতে হবে। *(প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম ৬৬-৭১ পৃঃ)*

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা আমাদের মত রক্ত, মাংস ও অস্থির গড়া মানুষ ছিলেন। আমাদের মত পিতার ঔরসে ও মাতার গর্ভে তাঁর জন্ম হয়েছিল। আমাদের মত তিনি খেতেন, পান করতেন। সুস্থ-অসুস্থ থাকতেন। বিস্মৃত হতেন, স্মরণ করতেন। বিবাহ–শাদী করেছেন, তাঁর একাধিক স্ত্রী ছিল। তিনি সন্তানের জনক ছিলেন। ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। দুঃখ–শোক, ব্যথা ও যন্ত্রণা অনুভব করতেন। তাঁর প্রস্রাব-পায়খানা হতো এবং তা অপবিত্র ছিল। তাঁর নাপাকীয় উযূ-গোসলের প্রয়োজন হতো। (তিরমিযী ২৪৯ নং) জীবিত ছিলেন, ইন্তিকাল করেছেন। মানুষের সকল প্রকৃতি ও প্রয়োজন তাঁর মাঝে ছিল।

মহান আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমাকে বলেছেন,

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ - فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا -

অর্থাৎ, তুমি বল, 'আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ; আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের উপাস্যই একমাত্র হক্ব উপাস্য; সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকেও শরীক না করে।' *(কাহফ ঃ ১১০, হা-মীম সাজদাহ ঃ ৬)*

পক্ষান্তরে কোন মানুষই তাঁর মতো (সমান) নয়। আমরা তাঁর মতো মানুষ নই। অতিপ্রাকৃত বিষয়ে কেউই তাঁর মতো নয়। তিনি একটানা সিয়াম রাখতেন। সাহাবীগণ তাঁর মতো রাখতে চাইলেন। তিনি বললেন, 'এ বিষয়ে তোমরা আমার মতো নও। আমি তো রাত্রি অতিবাহিত করি, আর আমার প্রতিপালক আমাকে পানাহার করান। *(মুসলিম ১১০৩, মিশকাত ১৯৮৬ নং)*।

তাঁর দেহের ঘাম ছিল শ্রেষ্ঠ সুগন্ধি। একদা তিনি উম্মে সুলাইম রাজিআল্লাহু আনহার ঘরে এসে শুয়ে ঘুমিয়ে গেলেন। তিনি ঘর্মাক্ত হলে উম্মে সুলাইম সেই ঘাম জমা করতে লাগলেন। তিনি উঠে তা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ব্যাপার উম্মে সুলাইম?' বললেন, 'আপনার ঘাম। আমাদের সুগন্ধিতে মিশিয়ে দেব। তার তা হবে শ্রেষ্ঠ সুগন্ধি।' (মুসলিম ৬২০১ নং)

তিনি বিশেষ করে সালাতে সামনে যেমন দেখতেন, পিছনেও দেখতেন। একদা এক সালাতের সালাম ফিরে তিনি বললেন, "তোমরা তোমাদের রুকূ ও সিজদাকে পরিপূর্ণরূপে আদায় কর। সেই সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে, আমার নিকট তোমাদের রুকু, সিজদাহ ও বিনয়-নম্রতা অস্পষ্ট নয়। আমি আমার পিঠের পিছন থেকে দেখতে পাই, যেমন সামনে দেখতে পাই। (মিশকাত ৮৬৮ নং)

তাঁর চক্ষু নিদ্রাভিভূত হতো, কিন্তু হৃদয় নিদ্রাভিভূত হতো না। *(বুখারী ৮৫৯, ১১৪৭, মুসলিম ১৭৫৭, ১৮২৬)*। তাঁর দেহ ও দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন চুল, থুথু, তাঁর ব্যবহৃত জিনিস ইত্যাদি বরকতময় ছিল। *(বুখারী, মুসলিম ৩২১৩ নং) (দ্বীনী প্রশ্নোত্তর ৫৩-৫৪ পৃঃ)*।

প্রশ্ন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমাকে সৃষ্টি না করলে পৃথিবী, জান্নাত-জাহান্নাম কিছুই সৃষ্টি করতেন না' মর্মে যে আক্বীদা সমাজে চালু আছে, তা কি ঠিক?

উত্তর ঃ উক্ত আক্বীদা সঠিক নয়। আল্লাহ তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। এটি কারও সাথে শর্তযুক্ত নয়। উক্ত ভ্রান্ত দাবীর পক্ষে কতিপয় জাল বর্ণনা সমাজে প্রচলিত আছে। যেমন '(আল্লাহ বলেন) আপনাকে সৃষ্টি না করলে বিশাল জগৎ সৃষ্টি করতান না'। (ছাগানী,মাওযূ'আত,পৃঃ ৭) বর্ণনাটি প্রসিদ্ধ হলেও জাল ও ভিত্তিহীন। হাদীসের গ্রন্থসমূহে এর কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। (শাওকানী, আল-ফাওয়াইদুল মাজমূ'আহ ফিল আহাদীছিল মাওযূ'আহ, পৃঃ ৩২৬)। অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, ইবনু আব্বাস রাজিআল্লাহু

আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেছেন, একদা জিবরীল আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা আমার কাছে আসলেন এবং বললেন, আল্লাহ বলেছেন, হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা! আপনাকে সৃষ্টি না করলে জান্নাত সৃষ্টি করতাম না এবং আপনাকে সৃষ্টি না করলে জাহান্নামও সৃষ্টি করতাম না। *(প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম পুস্তকের ৭১ পৃষ্ঠার ৪৪ নং প্রশ্ন)*। অথচ এটি বাতিল বর্ণনা ও একেবারেই উদ্ভট। *(সিলসিলা যঈফাহ, হা/২৮২)*। আরও বর্ণিত হয়েছে যে, 'আপনাকে সৃষ্টি না করলে আমি দুনিয়া সৃষ্টি করতাম না'। *(ইবনু আসাকির; দায়লামী,আল-ফেরদাউস, হা/৮০৩১)*। এটিও মিথ্যা বা জাল বর্ণনা। *(ইমাম সুয়ূত্বী, আল-লাইলিল মাছনূ'আহ ফিল আহাদীছিল মাওযূ'আহ, পৃঃ ২৪৯)*। এভাবে আরও অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। *(প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম পুস্তকের ৭১ পৃষ্ঠার ৪৩ নং প্রশ্ন)*। অথচ সবগুলো মিথ্যা বাতিল বর্ণনা। *(সিলসিলা যঈফাহ, হা/২৫, ৩০৩ ও ৬৬১)*। অতএব মুসলিমদেরকে এই ভ্রান্ত আক্বীদা বর্জন করতে হবে এবং সাথে সাথে এর বিরুদ্ধে জন সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা মারা যাননি; বরং স্থানান্তরিত হয়েছেন মাত্র। তিনি কবরে জীবিত আছেন। অর্থাৎ হায়াতুন্নবীতে বিশ্বাস করা। এমনকি ওলী-আওলিয়াও কবরে জীবিত আছেন' মর্মে বিশ্বাস করা যাবে কি?

উত্তর ঃ উক্ত বিশ্বাস সঠিক নয়। খানকা ব্যবসায়ি উক্ত ভ্রান্ত আক্বীদা সমাজে চালু রেখেছেন। তারা কতিপয় হাদীসের অপব্যাখ্যা করে থাকে। যেমন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেন, **'নবীগণ তাদের কবরে জীবিত থেকে সালাত আদায় করছেন'**। *(সিলসিলা সহীহাহ, হা/৬২১; ফাযায়েলে দুরুদ শরীফ, পৃঃ ৩৪; (উর্দূ), পৃঃ ১৯)*। 'মি'রাজের রাত্রে আমি যখন লাল টিলার নিকট দিয়ে মুসা আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমাকে অতিক্রম করছিলাম, তখন তিনি তাঁর কবরে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। *(প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম পুস্তকের ৭২ পৃষ্ঠার ৪৫ নং প্রশ্ন)*। 'নিশ্চয় মহান আল্লাহ যমীনের উপর নবীগণের শরীরকে হারাম করে দিয়েছেন'। *(মিশকাত, হা/১৩৬১ ও ১৩৬৬)*। এবং 'কোন ব্যক্তি আমার প্রতি সালাম প্রেরণ করলে আমার রূহ ফেরত দেওয়া হয় এবং আমি তার প্রতি সালামের উত্তর দেই'। *(মিশকাত, হা/৯২৫, সনদ হাসান)*।

মূলত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা মারা গেছেন এটিই সঠিক আক্বীদা। মহান আল্লাহ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমাকে লক্ষ করে বলেন,

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ - ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ -

'আপনিও মারা যাবেন এবং তারাও মারা যাবে। অতঃপর ক্বিয়ামত দিবসে তোমরা পরস্পর তোমাদের প্রতিপালকের সামনে বাক-বিতণ্ডা করবে' (সূরাহ আয-যুমার : ৩০–৩১)। এছাড়া এ ব্যাপারে অনেক আয়াত ও হাদীস বিদ্যমান রয়েছে।

তবে উপরে বর্ণিত হাদীসগুলোও সহীহ। কিন্তু তা বারযাখী জীবনের বিষয় অর্থাৎ দুনিয়াবী জীবন ও পরকালীন জীবনের মাঝের জীবন। দুনিয়াবী জীবনের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। যেভাবে বর্ণিত হয়েছে ঠিক সেভাবেই বিশ্বাস করতে হবে। কারণ এগুলো গায়েবের বিষয়। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা মূসা আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমাকে কবরে সালাত আদায় করতে দেখলেন কিন্তু একটু পরে ৬ষ্ঠ আসমানে দেখা হলো। *(মিশকাত, হা/৫৮৬২)*। এরপর যখন ফিরে আসলেন, তখন বায়তুল মাক্বদেছে সকল নবী-রাসূল তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাঁর ইমামতিতে সালাত আদায় করলেন। *(প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম পুস্তকের ৭২ পৃষ্ঠার ৪৫ নং প্রশ্ন)।*

দ্বিতীয়ত ঃ কবরে সালাত আদায়ের বিষয়টি কেবল নবীদের সাথেই খাছ। অন্যদের ব্যাপারে নয়। কারণ মৃত্যুর পর কোন ইবাদত নেই। তাছাড়া কবরস্থানে সালাত আদায় করা নিষেধ *(মিশকাত, হা/৭১২)* তাহলে তারা কিভাবে সেখানে সালাত আদায় করছেন? তাই এগুলো দুনিয়াবী বিষয়ের সাথে মিলানো যাবে না।

তৃতীয়ত ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা–এর প্রতি কেউ দরূদ ও সালাম পাঠালে ফেরেশতাদের মাধ্যমে তাঁর কাছে পাঠানো হয়। অতঃপর আল্লাহ তাঁর মাঝে রূহ ফেরত দিলে সালামের উত্তর দেন। কবর থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা নিজে সরাসরি শুনতে পেলে কেন উক্ত মাধ্যমের প্রয়োজন হয়? তাই দুনিয়ার মানুষের কোন কথা সরাসরি কেউ কবর থেকে শুনতে পায় না এটাই চূড়ান্ত। মহান আল্লাহ চাইলে কাউকে শুনাতে পারেন। এটা তাঁর ইচ্ছাধীন।

(সূরাহ আল-ফাত্বির : ২২; সূরাহ আয-যুমার : ৫২; ইবনু মাজাহ, হা/১৯৮)। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, তাবলীগ জামায়াতের ফাযায়েলে আমল বইয়ের **'হজ্জ'** ও **'দরূদ'** অংশে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-এর কবর নিয়ে এত যে মিথ্যা ঘটনা লেখা আছে, তা গুণে শেষ করা যাবে না। অতএব উক্ত বই থেকে সাবধান!

চতুর্থতঃ সাধারণ মানুষকে কবরে রাখার পর লোকেরা যখন চলে আসে, তখনও মৃত ব্যক্তি তাদের পায়ের জুতার শব্দ শুনতে পায়। উক্ত মর্মেও সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। *(মিশকাত, হা/১২৬)*। এছাড়া মুমিন ব্যক্তিকে কবরে বসানোর সাথে সাথে আছরের সালাত আদায় করতে চায়। *(মিশকাত হা/১৩৮)*। কিন্তু পবিত্র কুরআন-হাদীস থেকে এর বেশি কিছু জানা যায় না। তাই যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, সেভাবেই বিশ্বাস করতে হবে।

মূলত উক্ত বিষয়গুলো কোনটিই দুনিয়াবী জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। কারণ ছাহাবায়ে কেরাম উক্ত হাদীসগুলো জানা সত্ত্বেও কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-এর কবরের কাছে গিয়ে চাননি কিংবা তাঁর কাছে কোনো অভিযোগ করেননি এবং তাঁকে অসীলা মেনে দু'আও করেননি। বরং দুর্ভিক্ষের কারণে তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-এর কবরের কাছে না গিয়ে তাঁর জীবিত চাচা আব্বাস রাজিআল্লাহু আনহু-এর কাছে গিয়ে দু'আ চেয়েছেন। *(সহীহ বুখারী, হা/১০১০, ১/১৩৭ পৃঃ; 'ইস্তিকা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩)*। কারণ কবরে যাওয়ার পর দুনিয়ার সাথে যেমন কোন সম্পর্ক থাকে না, তেমনি কারও কোন উপকার বা ক্ষতি করারও ক্ষমতা থাকে না। এছাড়া বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ **'হায়াতুন্নবীতে'** বিশ্বাসী। এমনকি তথাকথিত পীর-ফকীর ও ওলীরা কবরে জীবিত আছেন বলে ভ্রান্ত আক্বীদা পোষণ করে থাকে। অতএব উক্ত শিরকী আক্বীদা থেকে আমাদেরকে বিরত থাকতে হবে। ***(প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম পুস্তকের ৭১-৭৩ পৃঃ)***

প্রশ্ন ঃ ঈদে মীলাদুন নাবী বিদআত কেন?

উত্তর ঃ যেহেতু শরীয়তে তার কোন দলীল নেই। খোদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বা তাঁর কোনো সাহাবী, কোন তাবেঈ বা ইমাম তা পালন করে যাননি, করার নির্দেশও দেননি।

সর্বপ্রথম ঈদে মীলাদ (নবীদিবস) আবিষ্কার করেন ইরাকের ইরবিল শহরের আমীর (গভর্নর) মুযাফ্ফারুদ্দীন কূকুবুরী ঠিক হিজরী সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে ৬০৪ (মতান্তরে ৬২৫) হিজরীতে। মিসরে সর্বপ্রথম চালু করে ফাতেমীরা; যাদের প্রসঙ্গে ইবনে কাসীর বলেন, "(ফাতেমী শাসকগোষ্ঠী) কাফের, ফাসেক, পাপাচার, ধর্মধ্বজী, ধর্মদ্রোহী, মহান আল্লাহর সিফাত (গুণাবলী) অস্বীকারকারী ও ইসলাম অস্বীকারকারী মাজূসী ধর্ম-বিশ্বাসী ছিল।" *(আল-বিদায়াহ অন-নিহায়াহ' ১১/৩৪৬)*।

অনেকে বলেছেন, মীলাদে মোস্তফা একটি নব্য আবিষ্কার; যা আজ থেকে প্রায় বারো শত বছর পূর্বে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাবে শায়খ উমার বিন মুহাম্মাদ সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন। মাওসেলের অধিবাসী উক্ত উমার বিন মুহাম্মাদ নাকি খুবই আশেকে রাসূল ও মহান আল্লাহর ওলী ছিলেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-এর ভালোবাসায় একান্ত অনুরাগের বশে এ মীলাদ তথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-এর জন্ম-বৃত্তান্ত আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনায় ব্রতী হন। বিখ্যাত সীরাতে শামী গ্রন্থে এ কথা স্বীকার করা হয়েছে। *(দেখুন ঃ সহীহ মাকছুদে মা'মেনীন ৩৬৯ পৃঃ)*। তাছাড়া এতে রয়েছে বিজাতির অনুকরণ এবং শরীয়ত-বিরোধী বহু কর্মকাণ্ড। *('বারো মাসে তেরো পারব' দ্রঃ)*।

প্রশ্ন ঃ 'ঈদে মীলাদুন নাবী' (নবী-দিবস) পালন করা বৈধ নয় কেন?

উত্তর ঃ মহান আল্লাহ আমাদের দ্বীন ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ করে দিয়েছেন তাঁর নবীর জীবদ্দশাতেই। মহান আল্লাহ বলেন,

أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا -

অর্থাৎ, আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ (নেয়ামত) সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্মরূপে মনোনীত করলাম। *(সূরাহ মায়েদাহ ৩ আয়াত)*

আর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেন, **"যে ব্যক্তি আমাদের এ (দ্বীন) ব্যাপারে নতুন কিছু আবিষ্কার করে, সে ব্যক্তির প্রত্যাখ্যাত।" (বুখারী ও মুসলিম) "যে ব্যক্তি এমন কোনো কাজ করে, যার উপর আমাদের কোনো নির্দেশ নেই, সে ব্যক্তির সে কাজ প্রত্যাখ্যাত।"** (মুসলিম)

ইসলামে পালনীয় ঈদ হলো মাত্র দুটি। যথা ঃ **(এক) ঈদুল ফিত্‌র এবং (দুই) ঈদুল আয্‌হা**। তৃতীয় কোন ঈদ ইসলামে নেই। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা নবুয়তের ২৩ বছর কাল নিজের জীবনে কোন বছর নিজের জন্মদিন পালন করে যাননি। কোন সাহাবীকে তা পালন করার নির্দেশও দেননি। তাঁর পূর্ববর্তী নবীদের জন্ম-মৃত্যু উপলক্ষ্যে কোনো আনন্দ অথবা শোকপালন করে যাননি।

তাঁর পরবর্তীকালে তাঁর চারজন খলীফা তাঁদের খেলাফতকালে রাষ্ট্রীয়ভাবে অথবা এককভাবে নবীদিবস পালন করে যাননি। অন্য কোনো সাহাবী বা আত্মীয়ও তাঁর প্রতি এতো ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে আনন্দ অথবা মৃত্যুদিন উপলক্ষ্যে শোক পালন করেননি। তাঁদের পরেও কোন তাবেঈ অথবা তাঁদের কোন একনিষ্ঠ অনুসারী অথবা কোন ইমাম তাঁর জন্ম কিংবা মৃত্যুদিন পালন করার ইঙ্গিত দিয়ে যাননি। **সুতরাং তা যেন নব আবিষ্কৃত বিদ'আত, তা বলাই বাহুল্য।**

খ্রিষ্টানরা আন্দাজে ২৫ শে ডিসেম্বর যীশু খ্রিস্টের জন্মোৎসব (মীলাদ, বড়দিন বা ক্রিস্টমাস ডে) এবং তাদের পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্মদিন (বার্থডে) বড় আনন্দের সাথে পালন করে থাকে। মুসলিমরা তাদের মত আনন্দে মাতোয়ারা হওয়ার উদ্দেশ্যে এই বিদ'আত ওদের নিকট হতেই গ্রহণ করে নিয়েছে। তাই এরাও ওদের মত নবীবিদস (ঈদে-মীলাদুন-নবী) এবং পরিবারের সভ্যদের (বিশেষ করে শিশুদের) **'হ্যাপি বার্থ ডে'**র অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করে থাকে। অথচ তাদের রাসূল তাদেরকে সাবধান করে বলেন, **"যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করে সে তাদেরই একজন।"** (আবুদাউদ)

প্রশ্ন ঃ কেক কেটে, মোমবাতি নিভিয়ে বার্থ-ডে বা জন্মদিন পালন করা কি?

উত্তরঃ বার্থ-ডে বা জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী পালন করা সুন্নত। তবে সেই সুন্নত, যার জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেছেন, "অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির সুন্নত (তরীকা) অনুসরণ করবে বিঘত বিঘত এবং হাত হাত পরিমাণ (সম্পূর্ণরূপে)। এমনকি তারা যদি সাণ্ডার (গোসাপ জাতীয় এক প্রকার হালাল জন্তুর) গর্তে প্রবেশ করে, তবে তোমরাও তাদের অনুসরণ করবে (এবং তাদের কেউ যদি রাস্তার উপর প্রকাশ্যে স্ত্রী-সঙ্গম করে তবে তোমরাও তা করবে)!" সাহাবাগণ বললেন,

‘আল্লাহর রাসূল ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানরা?‘ তিনি বললেন, “তবে আবার কারা?” (বুখারী, মুসলিম ও হাকেম)।

বলা বাহুল্য, বিজাতীর অনুকরণে এমন উৎসব বা অনুষ্ঠান পালন করা বৈধ নয়। যেহেতু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেন, “যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের অনুরূপ্য অবলম্বন করে, সে তাদেরই দলভুক্ত।” *(আবূ দাঊদ, ইবা) (দ্বীনী প্রশ্নোত্তর ৮৭-৮৯ পৃঃ)*

উক্ত আক্বীদা ভ্রান্ত। তাছাড়া এটি মারাত্মক অন্যায়ও। কারণ গায়েবের বিষয়টি সরাসরি মহান আল্লাহর সাথে জড়িত। এটা শিরকে আকবার। মানুষ হিসাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-এর সাথে জড়িত নয়। মহান আল্লাহ ব্যতীত অদৃশ্যের জ্ঞান কারও নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ -

‘হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা! আপনি বলুন, মহান আল্লাহ ছাড়া আসমান ও যমীনের কেউই গায়েবের জ্ঞান রাখে না এবং তারা এটাও বুঝে না যে, তারা কখন পুনরুত্থিত হবে’ *(সূরাহ আন-নামল : ৬৫)*। মহান আল্লাহ তা‘আলা স্বয়ং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-এর মাধ্যমে জানিয়ে দিচ্ছেন,

قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ - إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ -

‘আপনি বলুন, আমি তোমাদের একথা বলি না যে, আমার কাছে মহান আল্লাহর ধন-ভাণ্ডার রয়েছে। আর আমি গায়েব সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখি না এবং আমি তোমাদেরকে এ কথাও বলি না যে, আমি একজন ফেরেশতা। আমার কাছে যা কিছু অহিরূপে পাঠানো হয়, আমি শুধু তারই অনুসরণ করে থাকি’ *(সূরাহ আল-আন‘আম : ৫০)*। তবে তাঁকে অহির মাধ্যমে যা জানানো হতো কেবল তাই বলতেন। *(সূরাহ আল-হূদ : ৩১, ১২৩; সূরাহ আল-আ‘রাফ : ১৮৮; সূরাহ আল-আন‘আম : ৫৯)*। আয়েশা রাজিআল্লাহু আনহা বলেন, ‘যে ব্যক্তি তোমাকে বলবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা গায়েব জানেন, তাহলে সে মিথ্যা বলবে’ *(সহীহ বুখারী, হা/৭৩৮০, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৯৮ পৃঃ, ‘তাওহীদ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪)*। অতএব

প্রমাণিত হলো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা গায়েব জানতেন না। আর যৌক্তিক কারণও সেটাই বলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা এর জীবনে অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে, যেগুলো সম্পর্কে পূর্বে জানা থাকলে তাঁকে কষ্ট স্বীকার করতে হতো না। সুতরাং বিনা পুঁজির মাযার ব্যবসায়ীদের প্রতারণা থেকে সকল মুসলিকে সতর্ক থাকতে হবে।

প্রশ্ন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা যেকোন স্থানে হাজির হতে পারেন এবং অনেক স্থানে মিলাদের মঞ্চে চেয়ারকে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়, যাতে এই খালি চেয়ারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা এসে বসতে পারেন। উক্ত আক্বীদা কি ঠিক?

উত্তর ঃ এটা কুফরী আক্বীদা। মূলত মীলাদের অনুষ্ঠানকে জমজমাট রাখার জন্য উক্ত মিথ্যা আক্বীদা সৃষ্টি করেছে। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা মারা গেছেন। মহান আল্লাহ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমাকে লক্ষ্য করে বলেন, إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ - ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ - 'আপনিও মারা যাবেন এবং তারাও মারা যাবে। অতঃপর ক্বিয়ামত দিবসে তোমরা পরস্পর তোমাদের প্রতিপালকের সামনে বাক-বিতণ্ডা করবে' *(সূরাহ আয-যুমার : ৩০-৩১; আলে ইমরান : ১৪৪)*। তিনি আর কখনো দুনিয়াতে আসতে পারবেন না। কেউ ইচ্ছা করলেও আসতে পারবে না *(সূরাহ আল-মুমিনূন : ৯৯-১০০)*। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ - ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ - 'অতঃপর তোমরা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে। তারপর তোমরা ক্বিয়ামত দিবসে অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে' *(সূরাহ আল-মুমিনূন : ১৫-১৬)*। **দ্বিতীয়ত ঃ** পৃথিবীতে একই সময়ে অসংখ্য স্থানে এই বিদ'আতী মীলাদ হয়। কোনো স্থানে কখন মীলাদ হচ্ছে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-এর পক্ষে জানার কথা নয়। কারণ এটা গায়েবের বিষয়। আর তিনি গায়েব জানেন না। *(সূরাহ আন-নামল : ৬৫; সহীহ বুখারী, হা/৭৩৮০, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৯৮, 'তাওহীদ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪)*। **তৃতীয়তঃ** 'ক্বিয়াম' বা হঠাৎ উঠে দাঁড়ানো যে সীমাহীন মূর্খতা, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এটা হিন্দুদের পূজাকে ভোগ দেওয়ার মত। সাধারণ মুসলিমদেরকে একটু চিন্তা করে এই জঘন্য কুফরী থেকে বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্ন ঃ সমাজের একশ্রেণীর ভাই বিশ্বাস করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা কবর থেকে সালামের উত্তর দেন। এমনকি কখনো হাত বের করে দেন। উক্ত বিশ্বাস কতটুকু শরী'আত সম্মত?

উত্তর ঃ উক্ত আক্বীদা অনেক মুসলিমদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে ছূফী তরীকায় বিশ্বাসী ও তাবলীগ জামায়াতের মধ্যে উক্ত আক্বীদার প্রভাব রয়েছে। অথচ এটা কুফরী আক্বীদা। কারণ মৃত ব্যক্তি দুনিয়ার মানুষের কোন কথা শুনতে পায় না। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ - 'নিশ্চয় আপনি মৃতকে শুনাতে পারবেন না; বধিরকেও আহ্বান শুনাতে পারবেন না, যখন তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়' *(সূরাহ আন-নামল : ৮০ সূরাহ আর-রূম : ৫২)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ - وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ -

'জীবিত আর মৃত একসমান নয়। মহান আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শ্রবণ করান। যারা কবরে রয়েছে তাদেরকে আপনি শুনাতে পারবেন না' *(সূরাহ আল-ফাত্বির : ২২)*। তারা অন্যের উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না। সে জন্য সাহাবায়ে কেরাম কখনো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-এর কবরের কাছে গিয়ে কোন কিছু আবদার করেননি। অতএব এই ভ্রান্তিপূর্ণ আক্বীদা থেকে দূরে থাকতে হবে।

প্রশ্ন ঃ 'নবী-রাসূলগণের চেয়ে ছূফীরাই শ্রেষ্ঠ' এমন আক্বীদা পোষণ করা যাবে কি?

উত্তর ঃ যারা ছূফীবাদে বিশ্বাসী তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-এর চেয়ে কথিত ওলীদেরকেই বড় মনে করে। স্বয়ং বায়েজীদ বুস্তামী বলেন, 'আমার পতাকা (মর্যাদা) মুহাম্মাদের পতাকার চেয়ে অধিকতর উঁচু। (মাওস'আতুর রাদ্দি আলাছ ছূফিয়াহ, *৬৮ তম খণ্ড, পৃঃ ৭১)*। অথচ এটি একটি কুফরী আক্বীদা। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমাকে বাদ দিয়ে তাদের ছূফীদেরকেই সর্বাধিক মূল্যায়ন করে থাকে। অথচ তারা জানে না যে, এ ধরনের বিশ্বাস পোষণ করলে ঈমান থাকবে না। কারণ মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ - 'নিশ্চয় রাসূলের মধ্যেই তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ

নিহিত রয়েছে' *(সূরাহ আল-আহযাব : ২১)*। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেছেন, 'যার হাতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-এর প্রাণ রয়েছে, তাঁর কসম করে বলছি, যদি আজ মূসা আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা তোমাদের নিকটে আবির্ভূত হন আর তোমরা তার অনুসরণ কর এবং আমাকে পরিত্যাগ কর, তবুও তোমরা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে। আজ মূসা আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা যদি বেঁচে থাকতেন, আর আমার নবুওত পেতেন, তবে তিনিও আমার অনুসরণ করতেন'। (মিশকাত, হা/১৯৪) তাছাড়া যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমাকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো ব্যক্তিকে আদর্শের ধারক হিসাবে গ্রহণ করবে, তার জন্য মহান আল্লাহ জাহান্নামকে প্রস্তুত করে রেখেছেন (সূরাহ আন-নিসা : ১১৫)। অতএব ঈমান বিধ্বংসী ছূফী আক্বীদা থেকে সাবধান !

প্রশ্ন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমাকে স্বপ্নে দেখার জন্য কোনো নির্দিষ্ট আমল আছে কি? তাঁকে দেখলে কি জাহান্নাম হারাম হয়ে যাবে?

উত্তর ঃ মুমিন ব্যক্তি স্বপ্নে নবী-রাসূলগণকে দেখতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেন, **'যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখল সে সত্যি আমাকেই দেখল। কারণ শয়তান আমার রূপ ধারণ করতে পারে না'**। *(মিশকাত, হা/৪৬০৯-১০ 'স্বপ্ন' অধ্যায়)*। নবীগণকে স্বপ্নে দেখার জন্য শরী'আতে কোন আমল নেই। আর স্বপ্নে দেখার কারণে জাহান্নাম হারাম হয়ে যাবে এ কথাও ঠিক নয়।

প্রশ্ন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা জান্নাতে প্রবেশের জন্য সর্বপ্রথম দরজা খুলবেন। এ বক্তব্য কি সঠিক?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, উক্ত বক্তব্য সঠিক। আনাস রাজিআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন নবীদের মধ্যে আমার অনুসারীদের সংখ্যা হবে সর্বাপেক্ষা বেশি এবং আমিই প্রথম জান্নাতের দরজা খুলব'। *(মিশকাত, হা/৫৭৪২)*। অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন আমি জান্নাতের দরজায় পৌঁছে দরজা খোলার জন্য বলব। তখন তার পাহারাদার বলবে, আপনি কে? আমি বলব, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা। তখন পাহারাদার বলবে,

আপনার সম্পর্কে আমাকে বলা হয়েছে যে, আপনার পূর্বে আমি যেন অন্য কারো জন্য এ দরজা না খুলি'। *(মিশকাত, হা/৫৭৪৩)।*

প্রশ্ন ঃ যারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-এর মৃত্যুকে অস্বীকার করে এবং তাঁকে মহান আল্লাহর আসনে বসায় তাদেরকে মুসলিম বলা যাবে কি?

উত্তর ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-এর মৃত্যু হয়েছে একথা পবিত্র কুরআন ও সহীহ হদীস দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ - 'আপনিও মারা যাবেন এবং তারাও মারা যাবে' *(সূরাহ আয-যুমার : ৩০)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ - 'মুহাম্মাদ রাসূল ছাড়া অন্য কিছুই নন। অনেক রাসূল তার আগে মৃত্যুবরণ করেছেন। সুতরাং তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তাহলে কি তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? *(সূরাহ আলে ইমরান : ১৪৪)*। সুতরাং যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-এর মৃত্যুকে অস্বীকার করবে এবং তাঁকে মহান আল্লাহ্‌র আসনে বসাবে সে কাফের এবং মুশরিক্বদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। কারণ তিনি একজন আমাদের মতই মানুষ ছিলেন *(সূরাহ আল-কাহ্‌ফ : ১১০)*। **(প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ৭১-৭৭ পৃঃ)**

প্রশ্ন ঃ মহান আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমাকে 'হাবীবুল্লাহ' বলা উচিত, নাকি 'খালীলুল্লাহ'?

উত্তর ঃ মহান আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমাকে **'হাবীবুল্লাহ'** বলা উচিত নয়। যেহেতু **'হাবীবুল্লাহ'** থেকে **'খালীলুল্লাহ'**র মর্যাদা উচ্চতর। আর তিনি বলেছেন, আমি পৃথিবীর কাউকে **'খালীল'** রূপে গ্রহণ করলে ইবনে আবী কুহাফাহ (আবু বাক্‌র) কে **'খালীল'** রূপে গ্রহণ করতাম। কিন্তু তোমাদের সাথী **'খালীলুল্লাহ'**। *(মুসলিম ৬৩২৬ নং)*। পক্ষান্তরে তাঁর **'হাবীবুল্লাহ'** হওয়ার কথা কোনো সহীহ হাদীসে আসেনি। (আলবানী)।

প্রশ্ন ঃ মহান আল্লাহর সর্বপ্রথম সৃষ্টি কী?

উত্তর ঃ মহান আল্লাহর প্রথম সৃষ্টি কলম। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ প্রথম যে জিনিস সৃষ্টি

করেন, তা হলো কলম। তিনি তাকে বললেন, **'লিখো'**।' সে বলল, 'প্রভু! কী লিখব?' তিনি বললেন, 'ক্বিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক জিনিসের ভাগ্য লিখো।' *(আবূ দাঊদ ৪৭০২, তিরমিযী ২১৫৫নং)* তবে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ প্রথমে মহান আরশে সৃষ্টির কথা বলেছেন।

প্রশ্ন ঃ মহান আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা কি কিছু ভুলতেন? যা ভুলে যেতেন, তা কি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিধান জারি করার জন্য নয়?

উত্তর ঃ মহান আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা ভুলতেন, তাঁর নামায ভুল হতো, পবিত্র কুরআন পড়তে গিয়ে আয়াত ছুতে যেতো। আর এটা বিধান জারি করার জন্য নয়। বরং মানব-মনের সাধারণ প্রকৃতির কারণেই তিনি ভুলতেন। তিনি বলেছেন, "আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ। আমিও ভুলে যাই, যেমন তোমরা ভুলে যাও। সুতরাং আমি ভুলে গেলে তোমরা আমাকে মনে করিয়ে দিও।" *(বুখারী ৪০১, মুসলিম ৫৭২ নং)*। অবশ্য সে ভুলের কারণেও বিধান জারি হতো এবং উম্মতের শিক্ষা হতো। (আলবানী) **(দ্বীনি প্রশ্নোত্তর ৬৫ পৃঃ)**

প্রশ্ন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা ও কথিত মৃত ওলীদেরকে অসীলা ধরে দু'আ করা যাবে কি?

উত্তর ঃ এটা পরিষ্কার শিরকী আক্বীদা। যদিও অসংখ্য মুসলিম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমাকে অসীলা করে দু'আ করে থাকে। এমনকি অনেকে সরাসরি রাসূল-এর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করে এবং বিভিন্ন বিষয় আবদার করে থাকে। এটা শিরকে আকবার। এদের হজ্জ-ওমরাহ কোনই কাজে আসবে না। বরং জীবনে যত নেকীর কাজ করেছে সবই নষ্ট হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন, ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ - 'তারা যদি শিরক করে, তবে তাদের যাবতীয় আমল বরবাদ হয়ে যাবে' (আন'আম ৮৮)।

প্রশ্ন ঃ শরী'আতে কী কী অসীলা বৈধ?

উত্তর ঃ শরী'আতে কেবল তিন ধরনের অসীলা বৈধ। যেমন **(এক)** নিজের কৃত সৎ আমলকে অসীলা করে মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা *(সূরাহ আল-মায়েদাহ : ৩৫)*। যেমন পাহাড়ের গর্তে তিন ব্যক্তি আটকা পড়লে তারা নিজ নিজ আমলের কথা স্মরণ করেছিলেন এবং সেই আমলগুলোর

অসীলায় মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করে তারা বিপদ থেকে মুক্তি লাভ। করেছিলেন। *(মিশকাত, হা/৪৯৩৮)*। **(দুই)** মহান আল্লাহর গুণবাচক নাম সমূহ দ্বারা দু'আ করা। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا - 'আল্লাহর অনেক সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে। তাই তোমরা সেগুলো দ্বারাই তাঁকে ডাকো' (সূরাহ আল-আ'রাফ : ১৮০)। **(তিন)** জীবিত তাক্বওয়াশীল ব্যক্তির মাধ্যমে দু'আ চাওয়া। যেমন – মহান আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-এর মৃত্যুর পর দুর্ভিক্ষের সময় সাহাবীগণ তাঁর চাচা আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্তালিব রাজিআল্লাহু আনহু – এর মাধ্যমে পানি প্রার্থনা করতেন। *(সহীহ বুখারী, হা/১০১০, ১/১৩৭পৃঃ, 'ইস্তিকা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ -৩)*। অতএব উক্ত তিন প্রকার অসীলা ছাড়া অন্য যেকোন অসীলা ধরা হারাম। বিশেষ করে মৃত ব্যক্তিকে অসীলা করে দু'আ কর। এটা জাহেলী যুগের মক্কার মুশরিকদের আদর্শ এই অসীলা ধরা থেকে সকল মুসলিমকে বিরত থাকতে হবে।

উল্লেখ্য যে, অসীলা তালাশ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলার আয়াতের অপব্যাখ্যা করা হয়। যেমন মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - 'হে মুমিনগণ! তোমারা মহান আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর সান্নিধ্য তালাশ কর ও মহান আল্লাহর পথে জিহাদ করতে থাক। আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে' *(সূরাহ আল-মায়েদাহ : ৩৫)*। উক্ত আয়াতে বর্ণিত **'অসীলা'** দ্বারা পীর-ফকীরেরা অর্থ নিয়েছে যে, পীর ধরা বা পীরের মুরীদ হওয়া। এটা পবিত্র কুরআনের অর্থকে বিকৃত করার শামিল। কারণ এর অর্থ হলো, সৎ আমলের মাধ্যমে মহান আল্লাহর সান্নিধ্য বা নৈকট্য লাভ করা। যেমন ইবনু আব্বাস রাজিআল্লাহু আনহু সহ অন্যান্য মুফাসসির বলেছেন। *(প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম পুস্তকের ৭৮ পৃঃ ৫৪ নং প্রশ্ন)*। আর উপরে বর্ণিত তিনটি শারঈ আসীলার মাধ্যমে মহান আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করতে হবে। এটাই শরী'আতের নির্দেশ। প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম পুস্তকের ৭৭-৭৮ পৃঃ)

প্রশ্ন ঃ আদম আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা যখন তওবা করেছিলেন, তখন তিনি মুহাম্মাদের অসীলায় ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। এ কথা সঠিক কি?

উত্তর ঃ এ ব্যাপারে একটি হাদীস বর্ণনা করা হয়, যাতে বলা হয়েছে, আদম যখন পাপ করেন, তখন তিনি বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক!

মুহাম্মাদের অসীলায় আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।' মহান আল্লাহ বললেন, 'হে আদম ! তুমি মুহাম্মাদকে চিনলে কীভাবে, অথচ আমি এখনো তাকে সৃষ্টিই করিনি? আদম বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক ! তুমি যখন আমাকে তোমার হাত দিয়ে সৃষ্টি কর এবং আমার মাঝে তোমার রূহ ফুঁকো, তখন আমি মাথা তুলে দেখি, আরশের পায়ায় লেখা আছে, **"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"**। তখন আমি জানি যে, তুমি তোমার নামের পাশে সেই ব্যক্তির নামই যোগ করেছ, যে তোমার সবচেয়ে প্রিয়তম সৃষ্টি।' মহান আল্লাহ বললেন, 'আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। আর মুহাম্মাদ না হলে আমি তোমাকে সৃষ্টিই করতাম না।' *(হাকেম প্রমুখ, সিঃ যয়ীফাহ ২৫ নং)*। উক্ত হাদীসটি জাল ও গড়া হাদীস। অন্য একটি জঈফ হাদীস উক্ত হাদীসের জাল হওয়ার কথা সাক্ষ্য দেয়। আর সেটা এই যে, "আদমকে ভারতে অবতরণ করা হয়। তিনি সেখানে আতঙ্কিত হন। সুতরাং জিবরীল অবতরণ করেন এবং আযান দিতে শুরু করেন, **'আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'** ২বার এবং **'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ'** ২বার। আদম বললেন, 'মুহাম্মাদ কে? তিনি বললেন, 'তোমার সন্তানের মধ্যে শেষ নবী।'

পূর্বের হাদীস সত্য হলে আদম আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা সম্বন্ধে প্রশ্ন করতেন না। (আলবানী) পক্ষান্তরে আদম-হাওয়ার পাপ থেকে ক্ষমা প্রার্থনার দুআ আমরা পবিত্র কুরআন থেকে জানতে পারি, তাঁরা বলেছিলেন,

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ -

অর্থাৎ, তারা বলল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি। যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর, তাহলে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।' (আ'রাফ ঃ ২৩) **(দ্বীনি প্রশ্নোত্তর ৬৯-৭০ পৃঃ)**

প্রশ্ন ঃ মহান আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-এর পিতা-মাতা কি মুশরিক্ব অবস্থায় মারা গেছেন?

উত্তর ঃ তাঁরা উভয়েই মুশরিক্ব অবস্থায় মারা গেছেন। মহান আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা একবার কবর যিয়ারতে গেলেন। সঙ্গে কিছু সাহাবাও ছিলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি কেঁদে উঠলেন। সাহাবাগণ কাঁদার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আমি মহান আল্লাহর

নিকট আম্মার (আব্বার) কবর যিয়ারতের এবং ইস্তিগফারের (ক্ষমা প্রার্থনা করার) অনুমতি চাইলাম, কিন্তু মহান আল্লাহ আযযা অজাল্ল তাঁদের জন্য ইস্তিগফারের অনুমতি দিলেন না। মহান আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-এর মনে প্রশ্ন জাগল যে, ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা তো তাঁর পিতার জন্য (মুশরিক্ব হওয়া সত্ত্বেও) ইস্তিগফার করেছিলেন। মহান আল্লাহর তরফ থেকে উত্তর এলো,

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ -

"ইব্রাহীম তাঁর পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল এবং তা (ইস্তিগফার) তাকে দেওয়া মহান আল্লাহর একটি প্রতিশ্রুতির জন্য সম্ভব হয়েছিল। অতঃপর যখন এটি তার নিকট সুস্পষ্ট হলো যে, সে মহান আল্লাহর শত্রু, তখন ইব্রাহীম তার সম্পর্কে নির্লিপ্ত হয়ে গেল। নিশ্চয় ইব্রাহীম ছিল কোমল হৃদয় ও সহনশীল। " *(তাওবাহ ঃ* **১১৪***, তফসীর ইবনে কাসীর* ২/৩৯৩*)*

একদা এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, 'হে মহান আল্লাহর রাসূল! আমার (মৃত) পিতা কোথায় (জান্নাতে না জাহান্নামে)?' তিনি বললেন, "জাহান্নামে।" অতঃপর সে যখন (মন খারাপ করে) ফিরে যেতে লাগল, তখন তিনি তাকে ডেকে বললেন, "আমার পিতা এবং তোমার পিতা জাহান্নামে।" *(মুসলিম ৫২১নং, দ্রঃ সিঃ সহীহাহ ২৫৯২)*। **(দ্বীনী প্রশ্নোত্তর ৬৮-৬৯ পৃঃ)**

প্রশ্ন ঃ ঈমান কাকে বলে?

উত্তর ঃ ঈমানের শাব্দিক অর্থ বিশ্বাস। আর শারঈ অর্থে– অন্তরে বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি এবং কাজে বাস্তবায়নের নাম ঈমান, যা আনুগত্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং সীমালঙ্ঘনে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। অন্তরে বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতি হলো মূল আর কাজে বাস্তবায়ন হলো শাখা। *(প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম পুস্তকের ৭৮ পৃঃ ৫৬ নং প্রশ্ন)।*

প্রশ্ন ঃ ঈমানের মূলভিত্তি কয়টি ও কী কী?

উত্তর ঃ ৬টি। **(এক)** মহান আল্লাহর প্রতি **(দুই)** ফেরেশতাগণের প্রতি **(তিন)** মহান আল্লাহর কিতাব সমূহের প্রতি। **(চার)** রাসূলগণের প্রতি **(পাঁচ)** আখেরাতের প্রতি এবং **(ছয়)** তাক্বদীরের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করা। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ-

'তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল পূর্ব বা পশ্চিম দিকে প্রত্যাবর্তিত কর, তাতে পুণ্য নেই; বরং পুণ্য তার, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ, পরকাল, ফেশেতাগণ, কিতাব ও নবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে' *(সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ১৭৭)*। মহান আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, - إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ 'নিশ্চয় আমি সবকিছুকে সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে' *(সূরাহ আল-ক্বামার : ৪৯)। (সহীহ মুসলিম, হা/৮; মিশকাত, হা/২)।*

প্রশ্ন ঃ ঈমান বৃদ্ধি হওয়ার উপায় ও হ্রাস হওয়ার কারণ সমূহ কী কী?

উত্তর ঃ ঈমান বৃদ্ধি হওয়ার কতগুলো উপায় রয়েছে। যেমন – **(ক)** মহান আল্লাহর সুন্দর নাম সমূহ ও গুণাবলীসহ মহান আল্লাহ তা'আলার পরিচয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। **(খ)** মহান আল্লাহ প্রদত্ত নিদর্শন সমূহ সম্পর্কে গবেষণা করা এবং মানবজাতির জন্য তিনি যে জীবন বিধান দিয়েছেন, তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা। কেননা মানুষ যতই মহান আল্লাহর সৃষ্টিরাজি নিয়ে চিন্তা করবে, ততই তার ঈমান বৃদ্ধি পাবে। **(গ)** বেশি বেশি সৎ কাজ সম্পাদন করা। অনুরূপভাবে ঈমান কমে যাওয়ার কতিপয় কারণ রয়েছে। যেমন **(ক)** মহান আল্লাহর সুন্দর নাম সমূহ ও গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞান না থাকা। **(খ)** মহান আল্লাহর সৃষ্টি ও তাঁর প্রদত্ত শরী'আত সম্পর্কে গবেষণা না করা। **(গ)** গুনাহের কাজে লিপ্ত হওয়া এবং **(ঘ)** সৎ আমল না করা। *(বিস্তারিত দ্র. ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন নং-৮, পৃঃ ২৮-৩১)।*

প্রশ্ন ঃ শয়তানের ওয়াসওয়াসা কি বান্দার ঈমানকে নষ্ট করে দেয়? শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার উপায় কী?

উত্তর ঃ মহান আল্লাহর ব্যাপারে মনের এই কুমন্ত্রণা বান্দার ঈমানকে নষ্ট করে দেয় না। কেননা এটা স্রেফ শয়তানী কুমন্ত্রণা মাত্র। *(আবূ দাঊদ, হা/৫১১২; মিশকাত, হা/৭৩)*। শয়তান মুমিনদের মাঝে প্রবেশ করে, যাতে সে বান্দার ঈমানকে দুর্বল করে দিতে পারে এবং তাদেরকে মানসিক অস্থিরতায় ফেলে দিয়ে ঈমানী শক্তিকে দুর্বল করে দিতে পারে এবং তাদেরকে মানসিক অস্থিরতায় ফেলে দিয়ে ঈমানী শক্তিকে দুর্বল করে দিতে পারে। শুধু তাই নয় অনেক সময় মুমিনের সাধারণ জীবনকে বিপন্ন করে তুলে। আবূ হুরায়রা রাজিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, ছাহাবীদের একদল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা–এর নিকট আগমন করে জিজ্ঞেস করল, আমরা আমাদের অন্তরে কখনো কখনো এমন বিষয় অনুভব করি, যা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করা আমাদের কাছে খুব কঠিন মনে হয়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বললেন, সত্যিই কি তোমরা এ রকম পেয়ে থাক? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ আমরা এরকম অনুভব করে থাকি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বললেন, এটি তোমাদের ঈমানের স্পষ্ট প্রমাণ। *(সহীহ মুসলিম, হা/১৩২)।*

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেন, তোমাদের কারও শয়তান আগমন করে বলে, কে এটি সৃষ্টি করেছে? কে ঐটি সৃষ্টি করেছে? এক পর্যায়ে বলে, কে তোমার প্রতিপালককে সৃষ্টি করেছে? তোমাদের কারও অবস্থা যদি এরকম হয়, তাহলে সে যেন শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায় এবং এরূপ চিন্তা–ভাবনা করা হতে বিরত থাকে। *(সহীহ বুখারী, হা/৩২৭৬; মিশকাত, হা/৬৫)*। অতএব যখন বুঝা যাবে যে, এটা শয়তানের কুমন্ত্রণা, তখন তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হতে হবে। কেননা যদি কেউ তার পিছনে না ছুটে, তাহলে সে কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। যেমন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেছেন, 'কাজে পরিণত করা অথবা মুখে উচ্চারণ না করা পর্যন্ত মহান আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের মনের কুমন্ত্রণাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। *(সহীহ বুখারী, হা/২৫২৮; মিশকাত, হা/৬৩)।*

প্রশ্ন ঃ ঈমানের ব্যাপারে খারেজীদের আক্বীদা কী?

উত্তর ঃ ঈমানের ব্যাপারে খারেজীদের আক্বীদা হলো চরমপন্থী। তাদের মতে – হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়ন তিনটিই ঈমানের মূল ও অবিচ্ছিন্ন অংশ। এজন্য তারা কবীরা গুনাহগার ব্যক্তিকে ঈমানহীন কাফের মনে করে। *(প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম পুস্তকের ৭৯ পৃঃ ৫৯ নং প্রশ্ন)* এবং সে হত্যাযোগ্য অপরাধী এবং তওবা না করে মারা গেলে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। *(ফিরকুন মু'আছিরাহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭৩; আল–মিলাল ওয়ান নিহাল, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৪)।* অথচ এটা ভ্রষ্ট আক্বীদা।

প্রশ্ন ঃ ঈমানের ব্যাপারে মুরজিয়াদের আক্বীদা কী?

উত্তর ঃ মুরজিয়াদের মতে ঈমান হলো – তারা বিশ্বাস ও স্বীকৃতি উভয়কে ঈমানের মূল হিসাবে গণ্য করেন। আমল ঈমানের অংশ নয়। তাই

কবীরা গুনাহ তার ঈমানের কোন ক্ষতি করবে না। ফলে তাদের নিকট কবীরা গুনাহগার ব্যক্তি পূর্ণ মুমিন। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তের জন্য তারা ক্বিয়ামত পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকেন। তাদের মতে, ঈমানের কোন হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। *(ক্বাৎফুছ ছামার, পৃঃ ৬২, টীকা-১০০)*।

প্রশ্ন ঃ ঈমানের ব্যাপারে মু'তাযিলাদের আক্বীদা কী?

উত্তর ঃ ঈমানের ব্যাপারে মু'তাযিলাদের আক্বীদা হলো – কবীরা গুনাহগার ব্যক্তি ফাসিক ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী। তাদের মতে, কাফিরদের তুলনায় তাদের আযাব কিছুটা হালকা হবে। *(শহরস্থানী, আল-মিলাল ওয়ান নিহাল, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৪)*।

প্রশ্ন ঃ ঈমানের ব্যাপারে আহলেহাদীসের আক্বীদা কী?

উত্তর ঃ ঈমানের ব্যাপারে আহলেহাদীসের আক্বীদা হলো বিশুদ্ধ ও মধ্যমপন্থী। তাদের নিকটে, হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি মূল আর আমল তার শাখা। তাই কেই কবীরা গুনাহ করলে তার ঈমান হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু কাফের হয়ে যায় না। *(কিতাবুল ঈমান, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩১ ও ৩৩৯-টীকা)*। তাদের মতে, সৎ আমলের মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং পাপকার্যে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। (প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম পুস্তকের ৮০ পৃঃ ৬২ নং প্রশ্ন)। এছাড়া কবীরা গুনাহগার ব্যক্তি তার গুনাহের ধারা অব্যাহত থাকায় ঈমান কম হলেও সে ইসলাম থেকে খারিজ নয়। তাই সে কাফেরও নয়, হত্যাযোগ্য অপরাধীও নয়। তওবা না করে মারা গেলেও চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়। পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগের পর কালেমা ত্বাইয়েবার বদৌলতে এক সময় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাকে যেমন পূর্ণ মুমিন বলা যাবে না, তেমনি কাফেরও বলা যাবে না। তবে, ফাসিক্ব, গুনাহগার বলা যাবে। *(প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম পুস্তকের ৮১ পৃঃ ৬২ নং প্রশ্ন)*।

প্রশ্ন ঃ মহান আল্লাহর রহমত ব্যতীত কেউ ঈমান আনতে পারে কি?

উত্তর ঃ মহান আল্লাহর রহমত ব্যতীত কারও পক্ষে ঈমান আনা সম্ভব নয় (সূরাহ ইউনুছ : ১০০)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা স্বীয় চাচা (আবু তালেব)-কে তার মৃত্যুর সময় বলেন, আপনি **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু'** বলুন, আমি ক্বিয়ামতের দিন আপনার পক্ষে সাক্ষী দিব। কিন্তু তিনি তা অস্বীকার করলে মহান আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করে

বলেন, আপনি যাকে পছন্দ করেন তাকে হেদায়াত করতে পারবেন না। *(সহীহ মুসলিম, হা/২৫)*

প্রশ্ন ঃ আমল বিহীন ঈমানে কোন কল্যাণ আছে কি?

উত্তর ঃ না; আমল বিহীন ঈমানে কোন কল্যাণ নেই *(সূরাহ আল – 'আনকাবুত : ২)*।

প্রশ্ন ঃ কারও অন্তরে সামান্যতম ঈমান থাকলেও সে কি জাহান্নামে যাবে?

উত্তর ঃ অন্যান্য পাপের কারণে সে প্রথমে জাহান্নামে যাবে। অতঃপর পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগের পর কালেমায়ে ত্বাইয়েবার বদৌলতে এক সময় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। *(সহীহ বুখারী, ২/২২; প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম পুস্তকের ৮১ পৃঃ ৬৫ নং প্রশ্ন)*। *(প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম পুস্তকের ৭৮-৮১ পৃঃ)*

প্রশ্ন ঃ বিতর্কিত সমস্যায় কার সমাধান গ্রহণ করব?

উত্তর ঃ কোন বিষয়ে মতভেদ থাকলে অথবা একই সময়ে দুই আলেমের ভিন্নমুখী ফতোয়া হলে তাঁর ফতোয়া গ্রহণ করতে হবে, যাঁর ফতোয়া পবিত্র কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর বেশি নিকটবর্তী মনে করেন। যাঁকে ইলম ও তাক্বওয়ায় বেশি বড় মনে হয়। যেমন একই রোগের দুই ডাক্তারের দুই রকম চিকিৎসা–পদ্ধতি ও রায় শোনেন, তাহলে যাঁকে আপনি বড় ও অভিজ্ঞ ডাক্তার মনে করেন, তাঁর চিকিৎসা ও পথ্য গ্রহণ করবেন।

যদি তুলনা করার উপায় না থাকে, তাহলে যাঁর ফতোয়াটা মানার দিক থেকে সহজ, তাঁর ফতোয়া অনুযায়ী আমল করবেন। যেহেতু দ্বীন সহজ মহান আল্লাহ বলেছেন,

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ -

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদের (জন্য যা) সহজ (তা) করতে চান, তিনি তোমাদের কষ্ট চান না। (বাক্বারাহ ঃ ১৮৫)

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ -

অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদেরকে কোন প্রকার কষ্ট দিতে চান না। (মায়িদাহ ঃ ৬)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ -

অর্থাৎ, তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠিনতা আরোপ করেননি। (হাজ্জ ঃ ৭৮)

আর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেছেন, সহজ কর, কঠিন করো না।

আবারও বলি যে, এ হলো সাধারণ মানুষের জন্য, যারা নিজে দলীল যাচাই-বাছাই করতে পারে না এবং দুই আলেমের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে না। পক্ষান্তরে যাদের সে ক্ষমতা আছে, তাদের জন্য অনুসন্ধান চালিয়ে সঠিক সমাধান জেনে নেওয়া জরুরী। (ইবনে উষাইমীন)

প্রশ্ন ঃ অনেক শিক্ষিত মুসলিম পরিবার আছে, যারা পবিত্র কুরআন শেখে না, শিখে থাকলেও নিয়মিত তিলায়াত করে না, তিলায়াত করলেও মানে বুঝে (পড়ে) না, বুঝলেও যথাযথভাবে আমল করে না। এদের আলমারী অথবা দেওয়ালের তাকে বড় যত্নের সাথে পবিত্র কুরআন থাকে। এদের ব্যাপারে উপদেশ কী?

উত্তর ঃ এই শ্রেণীর মুসলিমরা সেই লোকেদের মতো, যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পবিত্র কুরআন বর্জন করার অভিযোগ রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا-

অর্থাৎ, রাসূল বলে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো এ পবিত্র কুরআনকে পরিত্যাজ্য মনে করেছে।' (ফুরক্বান ঃ ৩০)

তাদের মধ্যে এমন লোকও থাকতে পারে, যাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ -

অর্থাৎ, যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ হবে, অবশ্যই তার হবে সংকীর্ণতাময় জীবন এবং আমি তাকে ক্বিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।' (ত্বা-হা ঃ ১২৪)

وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا - الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا -

অর্থাৎ সেদিন আমি জাহান্নামে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করব সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের নিকট। যাদের চক্ষু ছিল আমার স্মরণ (কুরআন) এর ব্যাপারে অন্ধ এবং যারা শুনতেও ছিল অপারগ। (কাহফ ঃ ১০০-১০১)

এদের মধ্যে অনেকে দুনিয়াদার, এরা পত্র-পত্রিকা পড়ে, গল্প-উপন্যাস পড়ে, কিন্তু পবিত্র কুরআন পড়ার সময় পায় না। এই শ্রেণীর লোকদের থেকে বিমুখ হতে নির্দেশ রয়েছে,

فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا - ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ -

অর্থাৎ, অতএব তাকে উপেক্ষা করে চল, যে আমার স্মরণ বিমুখ এবং যে শুধু পার্থিব জীবনই কামনা করে। তাদের জ্ঞানের দৌড় এই পর্যন্ত। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকই ভালো জানেন, কে তাঁর পথ হতে বিচ্যুত এবং তিনিই ভালো জানেন, কে সৎ পথপ্রাপ্ত। (নাজ্‌ম ঃ ২৯-৩০)

অনেকে পবিত্র কুরআনকে কেবল তাবীয ও মৃতের আত্মার কল্যাণে ব্যবহার করে। অথচ পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে জীবিত মানুষের আমলের জন্য। মহান আল্লাহ বলেছেন,

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ -

অর্থাৎ, আমি এ কল্যাণময় গ্রন্থ তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ গ্রহণ করে উপদেশ। (সাদ ঃ ২৯)

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ - لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ-

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা মহান আল্লাহর গ্রন্থ পাঠ করে, যথাযথভাবে নামায পড়ে, আমি তাদরেকে যে রুযী দিয়েছি, তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে; তারাই আশা করতে পারে এমন ব্যবসার যাতে কখনোই লোকসান হবে না। এ জন্য যে, মহান আল্লাহ তাদেরকে (তাদের কর্মের) পূর্ণ প্রতিদান দেবেন এবং তিনি নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরও বেশি দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। (ফাত্বির ঃ ২৯-৩০)

আর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেছেন, "তোমরা পবিত্র কুরআন পাঠ কর। কেননা, তা ক্বিয়ামতের দিন তার পাঠকারীদের জন্য সুপারিশকারীরূপে উপস্থিত হবে।" (মুসলিম ৮০৪ নং)

"যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর কিতাব (কুরআন মাজীদ) এর একটি বর্ণ পাঠ করবে, তার একটি নেকী হবে। আর একটি নেকী, দশটি নেকীর সমান হয়। আমি বলছি না যে, **'আলিফ-লাম-মীম'** একটি বর্ণ; বরং আলিফ একটি বর্ণ, লাম একটি বর্ণ এবং মীম একটি বর্ণ।" (অর্থাৎ তিনটি বর্ণ দ্বারা গঠিত **'আলিফ-লাম-মীম'**, যার নেকীর সংখ্যা হবে ত্রিশ।) (তিরমিযী)

প্রশ্ন ঃ উম্মতের ইখতিলাফ কি রহমত?

উত্তর ঃ উম্মতের ইখতিলাফ রহমত নয়। বরং ইবনে মাসঊদ রাজিআল্লাহু আনহু বলেছেন, **'ইখতিলাফ খারাপ জিনিস'**। (আবূ দাঊদ ১৯৬০ ইং) ইখতিলাফ হলে কিতাব ও সুন্নাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা ওয়াজেব। আর সাহাবাদের ইখতিলাফ ইজতিহাদী। আর ইজতিহাদে ভুল করলেও একটি সওয়াব। কিন্তু ভুল তো ভুলই। সঠিকতা জানার পর আর ইজতিহাদী ভুল বা ইফতিলাফে পড়ে থাকা বৈধ নয়? পরন্তু **'ইখতিলাফু উম্মাতী রাহমাহ'** হাদীস সহীহ নয়। (আলবানী)

প্রশ্ন ঃ দ্বীনি মধ্যমপন্থা কী?

উত্তর ঃ দ্বীন মানতে কিছু লোক চরমপন্থী আছে, কিছু আছে নরম ও ঢিলেপন্থী এবং কিছু আছে মধ্যপন্থী। কেউ দ্বীন ও ইবাদতের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন করে, সহজটাকে কঠিন করে এবং কেউ একেবারে টিলেমি করে, অবজ্ঞা ও অবহেলা করে এবং কঠিনটাকে সহজ মনে করে। অথচ প্রত্যেক জিনিসের মাঝামাঝিটাই ঠিক।

আমাদের দ্বীনই হলো মধ্যমপন্থী। তাতে অতিরঞ্জন নেই। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা ও তাঁর সাহাবাবর্গের পথই হলো মধ্যমপন্থা। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-এর তারীকাই হলো মাঝামাঝি আচরণ। আনাস রাজিআল্লাহু আনহু বলেন, তিন ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-এর স্ত্রীদের বাসায় এলেন। তাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। অতঃপর যখন তাঁদেরকে এর সংবাদ দেওয়া হলো তখন তাঁরা যেন তা অল্প মনে করলেন এবং বললেন, 'আমাদের সঙ্গে নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা-এর তুলনা কোথায়? তাঁর তো আগের ও পরের সমস্ত গোনাহ মোচন করে দেওয়া হয়েছে। (সেহেতু আমাদের তাঁর চেয়ে বেশি ইবাদত করা প্রয়োজন)।' সুতরাং তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, 'আমি সারা জীবন রাতভর নামায পড়ব।' দ্বিতীয়জন বললেন, 'আমি সারা জীবন রোযা রাখব, কখনো রোযা ছাড়ব না।' তৃতীয়জন বললেন, 'আমি নারী থেকে দূরে থাকব, জীবনভর বিয়েই করব না।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা তাঁদের নিকট এলেন এবং বললেন, "তোমরা এই এই কথা বলেছ? শোনো! আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের চেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয় করি, তার ভয় অন্তরে তোমাদের চেয়ে বেশি রাখি। কিন্তু আমি (নফল) রোযা রাখি এবং রোযা ছেড়েও দিই, নামায পড়ি এবং নিদ্রাও যাই। আর নারীদের বিয়েও করি। সুতরাং যে আমার সুন্নত হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে, সে আমার দলভুক্ত নয়।" (বুখারী – মুসলিম)

সুতরাং তাঁর তরীকাতেই রয়েছে মধ্যমপন্থী আচরণ। তিনি বলেছেন, "নিশ্চয় দ্বীন সহজ। যে ব্যক্তি অহেতুক দ্বীনকে কঠিন বানাবে,তার উপর দ্বীন জয়ী হয়ে যাবে। (অর্থাৎ মানুষ পরাজিত হয়ে আমল ছেড়ে দেবে।) সুতরাং তোমরা সোজা পথে থাক এবং (ইবাদতে) মধ্যমপন্থা কর। তোমরা সুসংবাদ নাও। আর সকাল-সন্ধ্যা ও রাতের কিছু অংশে ইবাদত করার মাধ্যমে সাহায্য নাও।" (বুখারী)

বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় আছে, "তোমরা সরল পথে থাকো, মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, সকাল-সন্ধ্যায় চল (ইবাদত কর) এবং রাতের কিছু অংশে। আর তোমরা মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর তাহলেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাবে।"

যারা ঢিলেপন্থী, তারা সুন্নতের উপর আমল করে না, নফল আদায় করতে সচেষ্ট হয় না, বরং অনেক সময় ফরয আদায়েও শৈথিল্য করে।

উদাহরণ স্বরূপ ঃ

(ক) একটি লোক ফাসেক (পাপাচার), সে কবীরা গোনাহ করে, কিন্তু নামায পড়ে এবং শিরক করে না। চরমপন্থী বলে, 'আমি তাকে সালাম করব না, তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব, তার সাথে কথা বলব না।'

নরমপন্থী বলে, 'পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়। আমি তাকে সালাম করব, তার সাথে সুসম্পর্ক রাখব, তার সাথে হেসে-খেলে উঠাবসা করব।'

আর মধ্যমপন্থী বলে, 'আমি তার পাপের জন্য তাকে ঘৃণা করব এবং ঈমানের জন্য ভালোবাসব। তাকে বর্জন করায় যদি কোন উপকার থাকে, তাহলে তাকে বর্জন করব।'

(খ) চরমপন্থী লোক স্ত্রীকে চরণের দাসী মনে করে। নরমপন্থী তাকে নিজের প্রভু মনে করে, বানরের মতো আর কথায় ওঠ-বস করে। আর মধ্যমপন্থী তাকে বন্ধু মনে করে। সে জানে,

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ - وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ -

অর্থাৎ, নারীদের তেমনি ন্যায়-সঙ্গত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের। কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের কিছুটা মর্যাদা আছে। মহান আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (বাক্বারাহ ঃ ২২৮)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেছেন, "কোন ঈমানদার পুরুষ যেন কোন ঈমানদার নারী (স্ত্রীকে) ঘৃণা না করে। যদি সে তার একটি আচরণে অসন্তুষ্ট হয়, তবে অন্য আচরণে সন্তুষ্ট হবে।" (মুসলিম)

প্রশ্ন ঃ মহান আল্লাহ যে জিনিসকে হালাল করেছেন, তা হারাম এবং যে জিনিসকে হারাম করেছেন, তা হালাল করার ব্যাপারে কোন ইমাম, আলেম বা সরকারের আনুগত্য করা কী?

উত্তর ঃ এই শ্রেণীর অনুগত্য তিনভাবে হতে পারে ঃ

(ক) মহান আল্লাহর বিধানে অসন্তোষ প্রকার করে অথবা তা অপছন্দ করে গায়রুল্লাহর বিধানকে পছন্দ করে তার আনুগত্য করা। এর ফলে মুসলিম **'কাফের'** হয়ে যায়। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ -

অর্থাৎ, এটা এ জন্যে যে, মহান আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তারা তা অপছন্দ করে। সুতরাং মহান আল্লাহ তাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল করে দেবেন। (মুহাম্মাদ ঃ ৯)। আর এ কথা বিদিত যে, একমাত্র কাফেরদেরই যাবতীয় আমল নিষ্ফল করা হয়।

(খ) গায়রুল্লাহর বিধানের আনুগত্য করে। তবে এ কথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস রাখে যে, মহান আল্লাহর বিধানই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং মানুষের জন্য অধিক

কল্যাণকর। কিন্তু কোন কুপ্রবৃত্তিবশে, কোন লোভ বা লাভের খাতিরে গায়রুল্লাহর বিধানের আনুগত্য মুসলিম **'কাফের'** হবে না। যেহেতু সে মহান আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করে না। বরং স্বার্থবশে তা পালন করে না। সুতরাং তাকে ফাসেক বলা যাবে।

(গ) না জেনে গায়রুল্লাহর বিধানের আনুগত্য করে। অথবা সে মনে করে যে, সেটাই মহান আল্লাহর বিধান। এ ক্ষেত্রে দুই অবস্থা হতে পারে –

(এক) তার পক্ষে মহান আল্লাহর বিধান জানা সম্ভব। কিন্তু সে জানার চেষ্টা করে না। অথচ মহান আল্লাহ অজানা বিধান উলামার নিকট জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতে আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ -

অর্থাৎ, তোমরা যদি না জান, তাহলে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর; *(নাহ্‌ল ঃ ৪৩, আম্বিয়ান ঃ ৭)* এ অবস্থায় সে গোনাহগার হবে।

(দুই) তার পক্ষে মহান আল্লাহর বিধান জানা সম্ভব নয়। সুতরাং সে কোন আলেম, নেতা বা সরকারের অন্ধানুকরণ করে। এমতাবস্থায় তার কোন অপরাধ হবে না। যেহেতু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেছেন, যে ব্যক্তিকে বিনা ইল্‌মে (ভুল) ফতোয়া দেওয়া হলো, তার পাপ বর্তে মুফতীর উপর। *(আবূ দাঊদ ৩৬৫৭, ইবনে মাজাহ ৫৭, দারেমী ১৫৯ নং)*

এ অবস্থায় যদি অন্ধানুকরণকারীর অপরাধ গণ্য করা হয়, তাহলে তাতে বড় সমস্যা দেখা দেবে এবং ভুলের আশঙ্কায় কেউ কোন আলেমের কথায় ভরসাই রাখবে না। (ইবনে উষাইমীন)

প্রশ্ন ঃ যে ব্যক্তি শরীয়তের কোন বিধানকে 'অচল' বা 'বস্তাপচা' মনে করে, সে ব্যক্তির বিধান কী?

উত্তর ঃ সে ব্যক্তি কাফের। যেহেতু শরীয়তের কোন বিধান অচল ও বস্তাপচা নয়। শরীয়তের বিধান বুঝার জন্য অথবা তা বহাল করার জন্য মানুষের বিবেক-বুদ্ধি অচল হতে পারে। কিন্তু সে বিধান শাশ্বত, চিরন্তন ও কালজয়ী। (ইবনে বায)

প্রশ্ন ঃ যে ব্যক্তি মনে করে, নারী-পুরুষের সমান অধিকার না দিয়ে ইসলাম নারীর প্রতি জুলুম করেছে, সে ব্যক্তির বিধান কী?

উত্তর ঃ ইসলাম নারীকে পুরুষের সমান অধিকার না দিলেও, তাকে তার যথাযথ অধিকার দান করেছে। ইসলাম তার প্রতি কোন অন্যায় করেনি। ইসলামের এ অধিকার বণ্টনকে যদি কেউ অস্বীকার করে এবং অন্যায় ও অবিচার করে, তাহলে সে কাফের। (ইবনে বায) *(দ্বীনি প্রশ্নোত্তর ৭৬-৮৩ পৃঃ)*

ঈমান বিল মালায়িকাহ

ফেরেশতা মন্ডলীর উপর ঈমান।

মালাক অর্থ ও পরিচয়

আরবী ভাষার **'মালাক'** শব্দকে ফার্সী ভাষায় ফিরিশতা বলা হয়। বাংলায় এই ফার্সী শব্দই বেশী প্রচলিত। পারস্যের মুসলিমগণ অনেক ইসলামী পরিভাষাকেও নিজেদের পূর্ববর্তী ধর্মীয় পরিভাষার ভিত্তিতে ফার্সী ভাষায় রূপান্তরিত করেন। যেমন ঃ খোদা, নামাজ, রোজা, দরুদ ইত্যাদি। এগুলো কোনটিই আরবী শব্দের অর্থ বহন করে না। কিন্তু পারস্যবাসীরা তাদের পূর্ববর্তী ধর্মে ব্যবহৃত ধর্মীয় পরিভাষাগুলির ইসলামীকরন করেন। ভারতীয় উপমহাদেশে ফারসী ভাষার প্রভাবে আমাদের বাংলা ভাষায়ও এ সকল পরিভাষার প্রতিষ্ঠা লাভ। গত কয়েক দশক ধরে লেখকগণ ফারসী পরিভাষা বাদ দিয়ে কুরআন-হাদীসে ব্যবহৃত মূল আরবী পরিভাষার প্রচলনের চেষ্টা করছেন। ইতোমধ্যেই খোদার পরিবর্তে আল্লাহ, নামাজের পরিবর্তে সালাত, রোজার পরিবর্তে সিয়াম ব্যবহার বেশ প্রচলন লাভ করেছে। কিন্তু মালাক শব্দটির অবস্থা ভিন্ন। এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে **'ফিরিশতা'** শব্দটিই সর্বত্র ব্যবহৃত। **'মালাক'** শব্দটির প্রচলন নেই, যদিও তা কুরআন-হাদীসের মূল পরিভাষা। আর ধর্মীয় পরিভাষার অনুবাদ না করে বা অন্য ধর্মের কাছাকাছি অর্থের পরিভাষা ব্যবহার না করে মূল পরিভাষা ব্যবহার করাই উত্তম।

আরবী **'মালাক'** শব্দটির অর্থ পত্র, চিঠি বা দূত। বহুল প্রচলনের ফলে শব্দটির মধ্যে কিছু ধ্বণিগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। শব্দটি মূলত ঃ **'আলাক'** ধাতুমূল থেকে গৃহীত, মীম অক্ষরটি **'হারফ জাইদ'** বা অতিরিক্ত অক্ষর। মূল শব্দটি ছিল **'মাঅলাক'** পরবর্তীকালে হামজা অক্ষরটিকে স্থানান্তরিত করে লামের পরে নিয়ে একে মালআক বলা হয়। বহুল ব্যবহারে **'হামজা'** অক্ষরটি লোপ পেয়ে সাধারনভাবে **'মালাক'** বলা হয়। বহুবচনে **'হামজা'** অক্ষরটি বিদ্যমান থাকে এবং বলা হয় **'মালাইকা'**। সর্বাবস্থায় এ সকল ধ্বনিগত পরিবর্তণের ফলে মূল অর্থের পরিবর্তন হয়নি। মালাক, মালআক, মঅলাক

সবগুলি শব্দেরই মূলে আভিধানিক অর্থ পত্র, বাণী, দূত ইত্যাদি। আর ব্যবহারিক অর্থ মহান আল্লাহর দূত (Angel)। (কুরআন সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা)

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَـٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ -

"ওয়ালা কিন্নাল বিররা মান আমানা বিল্লাহি ওয়াল ইয়াওমিল আখিরী ওয়াল মালাই কাতি অর্থাৎ এবং সৎকাজ হল এই যে, ঈমান আনবে মহান আল্লাহর উপর, ক্বিয়ামত দিবসের উপর এবং ফেরেশতা সমূহের উপর।" (বাকারা– ১৭৭)

ইসলামের বুনিয়াদী ঈমানের মধ্যে মালায়িকা বা ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান একটি। পবিত্র কুরআন মজীদে তাদের অতি প্রাকৃত জীব হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশাল সৃষ্টি জগত পরিচালনার কাজে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করার জন্যে তাদের সৃষ্টি করেছেন। তারা নারী বা পুরুষ নয়। তাদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ঘুম-নিদ্রা ও কামনা-বাসনা নেই। তারা নূরের তৈরী। তাহারা ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্নরূপ ধারণ করিতে পারেন। তাদের আকৃতি ও সংখ্যা মানুষকে জানানো হয়নি। তাঁরা শুধু মহান আল্লাহর নির্দেশ পালন এবং তাঁর গুণগান বর্ণনায় নিরত রয়েছে। তাদের আহার গ্রহণের প্রয়োজন নেই, তাদের স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা নেই। তাদের কোন সমাজ নেই। তাদের খাদ্য মহান আল্লাহর তাসবীহ এবং তাদের দায়িত্ব শুধু মহান আল্লাহরই আদেশ পালন করা। মহান আল্লাহর হিকমত বুঝিতে পারে কাহার সাধ্য। তিনি তাঁহার বিশ্বরূপী মেশিন চালাইবার জন্য ফেরেশতা মন্ডলীকে শ্রমিকের ন্যায় সৃষ্টি করিয়াছেন। ফেরেশতাদের সংখ্যা কত তাহা একমাত্র মহান রব্বুল আলামীন জানেন। অসংখ্য ফেরেশতাগণের মধ্যে জিবরাইল আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা, মিকাইল আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা, ইসরাফীল আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা ও মালাকুল মউত আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা এই চারিজন প্রধান। আবার উক্ত চারিজনের মধ্যে জিবরাইল আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি সমগ্র নবী ও রাসূলের নিকট ওয়াহী বা মহান আল্লাহর কিতাব আনয়ন করিতেন।

ফেরেশতাদের আমরা দেখি না বলিয়াই তাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারি না, কেননা আমাদের কোন জিনিসকে না দেখা বা না জানা তাহা

না হওয়ার কারন হইতে পারে না। এই পানি ও বাতাসের মধ্যে অনেক জীব ও জীবাণু রহিয়াছে, আমরা সেগুলো দেখিতে পাই না। কিন্তু অণুবীক্ষণ বা অন্যান্য অত্যাধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে আমরা সেগুলো দেখতে পাই। যখন যন্ত্রের আবিষ্কার হয় নাই, তখন কি সেগুলো ছিল না ! দুই বা তিনশত বছর পূর্বে আমরা কোন গ্যাসের সন্ধান পাই নাই। তাই বলিয়া কি গ্যাস ছিল না ? এতদভিন্ন পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসে যখন তাদের উল্লেখ রহিয়াছে, পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস মানার পর তাদের প্রতি অবিশ্বাসের কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

কিন্তু বিভিন্ন যুগে মানুষ ফেরেশতাদের সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদের জন্ম দিয়েছে। কেউ তাদের মহান আল্লাহর সন্তান-সন্ততি, কেউ তাদের মহান আল্লাহর রাজ্যের অংশীদার, কেউ সুপারিশকারী, কেউ বিভিন্ন প্রকার দেবতা, কেউ নিয়্যাত পূরণকারী ইত্যাদি বানিয়ে নিয়েছে। কিন্তু পবিত্র কুরআন এসব কিছুরই প্রতিবাদ করেছে এবং তাদের সঠিক মর্যাদা নিরুপন করেছে। মহান আল্লাহ তা'আলা প্রকৃতপক্ষে ফেরেশতাদের যতটুকু মর্যাদা দান করেছেন, সে অনুযায়ী তাদের প্রতি ঈমান আনতে হবে। তার চাইতে বেশীও নয় কমও নয়। আর তাদের প্রতি সঠিক ধারণা পোষণের জন্যেই পবিত্র কুরআনে তাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ তাদের প্রতি সঠিক ধারণা পোষণে ব্যর্থ হলে খালিস তাওহীদের সাথে শির্কের মিশ্রণ হয়ে পড়ে। তাই ফেরেশতাদের সম্পর্কে সঠিক ভাবে জানা ঈমানের বুনিয়াদী অংগ।

ফেরেশতাদের সঠিক মর্যাদা

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَـٰنُ وَلَدًا - سُبْحَانَهُ - بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ - لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ - يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ - وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَـٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ - كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ -

তারা বলে ঃ রহমানের সন্তান আছে (অর্থাৎ ফেরেশতারা) সুবহানাল্লাহ। তারা তো দাস মাত্র। তাদের সম্মানিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহর সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তারা কথা বলে না। শুধু তাঁরই হুকুম মতো কাজ করে যায়। যা কিছু তাদের সামনে আছে তাও তিনি জানেন আর যা কিছু তাদের অজ্ঞাত তাও তিনি জানেন। তারা কারো পক্ষে সুপারিশ করবে না, তবে শুধুমাত্র মহান আল্লাহ যদি কারো পক্ষে সুপারিশ শুনতে চান এবং তারা সদা-সর্বদা মহান আল্লাহর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকে। তাদের মধ্য হতে যদি কেউ বলে

বসে ঃ "মহান আল্লাহ ছাড়া আমি একজন ইলাহ।" তাকে আমি জাহান্নামের শাস্তি দেব। জালিমদের এরূপ শাস্তিই আমি দিয়ে থাকি। (আম্বিয়া– ২৬-২৯) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

- لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ অর্থাৎ মহান আল্লাহ তাদের যা আদেশ করেন তারা তা কখনও অমান্য করে না। তাদের যা নির্দেশ দেয়া হয় তারা শুধু তাই পালন করে। (তাহরীম– ৬) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

- وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ

"ওয়া ইউসাব্বিহুর রা'আদু বিহামদিহী অল মালায়িকাতু মিন খিফাতিহী অর্থাৎ মেঘের গর্জন প্রশংসা সহকারে তাঁরই পবিত্রতা বর্ণনা করে আর ফেরেশতারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁর তাসবীহ পাঠ করে। (রায়াদ– ১৩) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

- يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا - لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا অর্থাৎ যেদিন রুহ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে দয়াময় মহান আল্লাহ যাকে অনুমতি দিবেন, সে ব্যতীত কেউ কথা বলতে পারবে না এবং সে সত্য কথা বলবে। (নাবা– ৩৮)

অতএব পবিত্র কুরআনের ভাষণ থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, ফেরেশতারা শুধু মাত্র দাস বা গোলাম। তারা মহান আল্লাহর সম্মানিত বান্দাহ। মহান আল্লাহর হুকুম ছাড়া তারা কারো জন্যে কোন সুপারিশ করবে না। মহান আল্লাহর আদেশ উচ্চারিত হওয়ার পূর্বে তারা টুঁ শব্দটিও করবে না।

তারা যথাযথভাবে শুধু মহান আল্লাহর নির্দেশ পালন করে যায়। কখনো মহান আল্লাহর আদেশ অমান্য করে না। তারা প্রশংসা, তাসবীহ ও গুণকীর্তনে লিপ্ত থাকে এবং সর্বদা মহান আল্লাহর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকে।

মানুষের চাইতে ফেরেশতার মর্যাদা বেশী নয়

আদম আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা কে সৃষ্টি করার পর ফেরেশতাদের নির্দেশ দেয়া হয় তাঁকে সিজদা করতে ঃ যেমন এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন ঃ- وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا অর্থাৎ যখন আমি ফেরেশতাদের নির্দেশ দিলাম আদমকে সিজদা করো। তখন তারা সিজদা করলো। (বাকারাহ– ৩৪)

এতে প্রমাণিত হল যে, মহান আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে মানুষের চাইতে আর কেউ শ্রেষ্ঠ নয়। ফেরেশতারা যদিও **'ইবাদুম মুকরামুন'** বা সম্মানিত বান্দাহ। কিন্তু তারাও মানুষের সামনে সিজদায় নত হয়েছে। সুতরাং মানুষের মধ্যে আত্মসম্ভ্রম থাকা উচিত এবং বিনীত ভাবে এক লা-শারীক আল্লাহর সম্মুখে সিজদায় অবনত হওয়া উচিত। অন্য আয়াতে এ বিষয়ে মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ **"অলাকাদ কাররামনা বানী আদম** অর্থাৎ আমি বণী আদমকে সম্মানিত করে সৃষ্টি করেছি। (কুরআন)

ফেরেশতাদের বিভিন্ন দায়িত্ব

পবিত্র কুরআন মাজীদে ফেরেশতাদের কিছু কিছু দায়িত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ঃ

(১) নবী রাসূলগণের নিকট মহান আল্লাহর বাণী ও বিধি-ব্যবস্থা পৌঁছে দেওয়া ঃ

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

- قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ অর্থাৎ তাদের বলো ঃ জিবরীলের প্রতি যে শত্রুতা পোষণ করবে, তার জেনে রাখা উচিত, জিবরাইল মহান আল্লাহরই অনুমতি ক্রমে তোমার অন্তরে এ পবিত্র কুরআন নাযিল করেছে। (বাকারা– ৯৭)

- ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ - مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ অর্থাৎ নিঃসন্দেহে একথা সম্মানিত পয়গাম বাহকের উক্তি, যে অতি শক্তিমান, আরশ অধিপতির নিকট মর্যাদা সম্পন্ন, তাঁর অনুগত ও বিশ্বাস ভাজন। (তাকভীর– ২০-২১)

- وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ - نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ অর্থাৎ নিঃসন্দেহে এ রব্বুল আলামীনের কিতাব। রুহুল আমীন এ নিয়ে অবতরণ করেছে। (শোয়ারা– ১৯২-১৯৩)

(২) বিশ্ব ব্যবস্থা পরিচালনায় কর্মচারীর দায়িত্ব পালন

সাধারণভাবে মহান আল্লাহর ইবাদাত, তাসবীহ, তাহ্লীল ও মাহাত্ম বর্ণনা করা ছাড়াও ফেরেশতারা মহান আল্লাহ তা'আলার বিশ্ব ব্যবস্থা পরিচালনায় কর্মচারীর দায়িত্বও পালন করে। যেমন এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا - وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا - وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا - فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا - فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا - অর্থাৎ শপথ (সেই ফেরেশতার) যারা ডুবে টানে এবং খুব সহজভাবে বের করে নিয়ে যায়, যারা বিশ্বলোকে তীব্র গতিতে সাঁতার কেটে চলে, মহান আল্লাহর হুকুম পালনে ক্ষিপ্রতা গ্রহণ করে এবং মহান আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী যাবতীয় কাজের ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করে। (নাযিয়াত– ১-৫)

মুফাসসিররগণ উল্লেখ করেছেন যে, এ আয়াতে মালাকগণকেই বুঝানো হয়েছে। তাঁদের কেউ কাফিরদের প্রাণ নির্মমভাবে উৎপাটন করেন, কেউ মুমিনের প্রাণ মৃদুভাবে বন্ধনমুক্ত করেন, কেউ মহান আল্লাহর নির্দেশাবলী নিয়ে মহাবিশ্বে সন্তরণ, চলাচল বা যাতায়াত করেন এবং কেউ মহান আল্লাহর নির্দেশিত কর্মসমূহ নির্বাহ করেন। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا - "শপথ কর্মবন্টনকারীগণের (তথা কর্মবন্টনকারী মালাকগণের)।" (জারিয়াত-৪)

(৩) মানুষের জান কবজ করা ঃ

একদল ফেরেশতা আছে, যাদের দায়িত্ব হলো মানুষের জান কবজ করা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ - অর্থাৎ তাদের বলো ঃ মৃত্যুর যে ফেরেশতাকে তোমাদের উপর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, সে তোমাদের জান কবজ করবে। তারপর তোমাদেরকে তোমাদের রবের নিকট ফিরিয়ে আনা হবে। (আস-সিজদা– ১১)

الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ - يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ - অর্থাৎ ফেরেশতারা যখন পবিত্র আত্মার লোকদের জান কবজ করে, বলে ঃ তোমাদের প্রতি সালাম, তোমাদের আমলের বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করো। (আন-নহল– ৩২) মহান আল্লাহ সূরাহ আনআমের ৬১ নং আয়াতে এ বিষয়ে আরো বলেন ঃ

إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ -

"অবশেষে যখন তোমাদের কারো মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় তখন আমার প্রেরিত দূতগণ তার মৃত্যু ঘটায় এবং (এ কাজ সম্পাদনে) তারা কোন ত্রুটি করে না।"

পবিত্র কুরআনে বা সহীহ হাদীসে **'মালাকুল মাউতের'** নাম উল্লেখ করা হয়নি। তবে কোন কোন মুফাসসিরিন তাঁর নাম আজরাঈলে বলে উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী জামানার মুসলিমদের মধ্যে এই নামই প্রসিদ্ধ। *(তাফসীরে তাবারী ঃ ২১-৯৭-৯৮)*

(৪) মানুষের আমলের রেকর্ড সংরক্ষণ করা ঃ

একদল ফেরেশতা মানুষের আমলের রেকর্ড সংরক্ষণের কাজে নিয়োজিত। ক্বিয়ামত পর্যন্ত তারা এ দায়িত্ব পালন করবেন। সকল মানুষের কাজেরই তারা হিসাব রাখেন ঃ মহান আল্লাহ বলেন ঃ

- يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ - كِرَامًا كَاتِبِينَ অর্থাৎ সম্মানিত লেখকগণ তোমরা যা কর সবই জানে। (ইনফিতার– ১১-১২)

এ বিষয়ে সূরাহ কাফের ১৭-১৮ নং আয়াত দ্বয়ে মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ - مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ -

"দুই গ্রহণকারী (মালাইকা) তার ডানে ও বামে বসে তার (সৎ-অসৎ সকল) কর্ম লিপিবদ্ধ করে। মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্য ' (সদা) তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে।"

(৫) মহান আল্লাহর পক্ষে মুজাহিদদের সাহায্য সহায়তা করা ঃ

যেসব মর্দে মুমিন মহান আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করে- তাদের সাহায্যার্থে মহান আল্লাহ ফেরেশতা প্রেরণ করেন ঃ মহান আল্লাহ বলেন,

يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ -
(বদরের যুদ্ধে) যখন তোমরা তোমাদের পরওয়ারদেগারের নিকট সাহায্যের ফরিয়াদ করলে, উত্তরে তিনি বললেন ঃ আমি তোমাদের সাহায্যে পর পর এক হাজার ফেরেশতা পাঠাচ্ছি। (আনফাল– ৯)

(৬) অপরাধী জাতির উপর মহান আল্লাহর আযাব কার্যকর করা ঃ

যে সব জাতিকে মহান আল্লাহ তা'আলা তাদের অপরাধ ও দুস্কৃতির জন্যে শাস্তি দিতে চান, সেখানে তিনি ফেরেশতা পাঠিয়ে দেন। অতঃপর তারা

সে জাতির উপর মহান আল্লাহর আযাব কার্যকর করেন ঃ যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ - قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ - لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ - مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ - অর্থাৎ (ইবরাহীম) বললো ঃ হে আল্লাহর দূতগণ ! আপনারা কোন অভিযানে আগমন করেছেন ! তাঁরা বললো ঃ আমরা এক অপরাধী জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছি। (আমাদের প্রতি নির্দেশ রয়েছে) যেনো তাদের উপর পাকা মাটির পাথর বর্ষণ করি, যা আপনার আল্লাহর নিকট সীমালংঘণকারী লোকদের জন্যে চিহ্নিত হয়ে আছে। (আয যারিয়াত– ৩১-৩৪)

(৭) ঈমানের পথে অটল নরশার্দুলদের উৎসাহিত করা ঃ

যে সমস্ত মুমীন ঈমানের পথে অটল অবিচল থেকে বাতিলের মোকাবেলা করে যায়। মহান আল্লাহ তা'আলা তাদের উৎসাহিত করা ও দৃঢ়তা দান করার জন্যে ফেরেশতা পাঠিয়ে দেন ঃ যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ - نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ - وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ - نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ - অর্থাৎ 'যেসব লোক বলে ঃ মহান আল্লাহ আমাদের রব।' অতঃপর একথার উপর অটল অবিচল থাকে। নিঃসন্দেহে তাদের প্রতি ফেরেশতার আগমন ঘটে এবং তারা বলতে থাকে ঃ ভীত হয়োনা, চিন্তিত হয়ো না। সেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়ে সন্তুষ্ট হও, তোমাদের নিকট যার ওয়াদা করা হয়েছিল। আমরা দুনিয়ার জীবনেও এবং আখেরাতেও তোমাদের সংগী। সেখানে তোমরা যা চাও, তাই পাবে। সেখানে যে জিনিসের ইচ্ছা করবে তাই তোমাদের দেয়া হবে। তোমাদের সব দাবী পূরণ করা হবে। এ হচ্ছে মেহমানদারীর সামগ্রী, সেই মহীয়ান আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি অতিশয় ক্ষমাশীল দয়াময়। (হামীম সিজদা: ৩০-৩২) মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا - سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ - অর্থাৎ সেই সময়ের কথা স্মরণ কর। যখন তোমার রব ফেরেশতাদের প্রতি অহী করে বললেন ঃ আমি তোমাদের সাথেই আছি। তোমরা ঈমানদারদের অটল, অবিচল ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাখো। (আনফাল– ১২)

(৮) আরশ বহন কারী ও ঈমানদারদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার কাজেঃ

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ - رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ - إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ - وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ - وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

অর্থাৎ যারা আরশকে বহন করছে, আর যারা তাঁর চর্তুদিকে রয়েছে, তারা তাদের রবের পবিত্রতা ও প্রশংসায় লিপ্ত আছে এবং তারা মহান আল্লাহর উপর ঈমান রাখে ও ঈমানদারদের জন্য মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। তারা বলতে থাকেন ঃ হে আমাদের প্রভু ! সবকিছু ঘিরে আছে তোমার জ্ঞান ও করুনা, তাই যে বান্দারা তোমার দিকে মুখ ফিরিয়েছে ও তোমার দেখানো সরল পথ অনুসরণ করেছে, তাদের তুমি ক্ষমা কর। তাদের জাহান্নামের আগুন থেকে রেহাই দাও। হে প্রভু ! তাদের ও তাদের বাপ-মা, স্ত্রী, পুত্রদের যারা ঈমানদার তাদের সবাইকে চিরন্তন জান্নাতের বাসিন্দা কর। তাদের জান্নাত দানের তো তুমি ওয়াদা করেছ। তুমিই সর্বশক্তিমান ও শ্রেষ্ঠতম কুশলী। হে মাবুদ ! তাদের অকল্যাণ থেকে বাঁচাও। তুমি সেদিন যাদের অকল্যাণ থেকে বাঁচাবে, তার উপর দয়া দেখানো হবে। এটাই চরম সাফল্য পরম অভিষ্ট লক্ষ্য। (মুমিন– ৭-৯) এ বিষয়ে সূরাহ হাক্কার ১৭ নং আয়াতে মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ - **“ওয়া ইয়াহ মিুল আরশা রব্বিকা ফাউক্বাহুম ইয়াত্ত মায়িজিন সামানিয়াতান** অর্থাৎ **“এবং সেইদিন আটজন (মালাক) তাদের প্রতিপালকের আরশকে ধারণ করবে তাদের উর্ধ্বে।”**

(৯) মহান আল্লাহর ইবাদাত করার কাজে

মালাইক বা ফিরিশতাগণ মানবীয় দুর্বলতা, ক্লান্তি, কামনা-বাসনা বা পাপেচ্ছা থেকে মুক্ত। তাঁরা সদা-সর্বদা ক্লান্তিহীনভাবে মহান আল্লাহর গুণগান করেন এবং তাঁর নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করেন। যেমন এ বিষয়ে মহান আল্লাহ সূরাহ তাহরীমের ৬ নং আয়াতে বলেন ঃ

لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ -

"মহান আল্লাহ তাঁদেরকে যে নির্দেশ দেন তা তাঁরা লঙ্ঘন করে না এবং তাদেরকে যে নির্দেশ দেয়া হয় তা তাঁরা যথাযথভাবে পালন করে।" এ বিষয়ে মহান আল্লাহ সূরাহ আরাফের ২০৬ নং আয়াতে বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ -

"যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রয়েছে তাঁরা অহংকারে তাঁর ইবাদাতে বিমুখ হয় না। তারা সর্বক্ষণ তাঁরই মহিমা ঘোষণা করে এবং তাঁরই নিকট সাজদাবনত হয়।" যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ - وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ - يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ - অর্থাৎ আসমান ও যমীনের মধ্যে যা কিছু রয়েছে, সবই তার আজ্ঞাবহ ও অধীন। আর যারা তার নিকট রয়েছে, তারা ইবাদাত করতে অহংকারের সাথে মুখ ঘুরায়ে নেয় না এবং হতাশা প্রকাশ করে না। তারা দিবারাত্রি (সদা-সর্বদা) মহান আল্লাহর গুণগান করে। কিন্তু তারা ইবাদাতে বিরক্ত ও ক্লান্তিবোধ করে না। (আম্বিয়া– ১৯-২০)

(১০) মালাইকাদের দূত হিসাবে কাজ করা ঃ

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ - অর্থাৎ তিনি মালাইকাদেরকে দূত হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তাদের কেউ কেউ দুই, তিন, চার বা ততোধিক ডানাবিশিষ্ট। (ফাতির– ১)

(১১) মহান আল্লাহর অনুগত বান্দা হিসাবে ঃ

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَّن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِّلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ - অর্থাৎ ঈসা আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা কখনও মহান আল্লাহর বান্দা হতে অস্বীকার করেনি এবং মহান আল্লাহর ঘনিষ্ঠ মালাইকাগণও মহান আল্লাহর বান্দা বা দাসত্বে অস্বীকার করেনি। (নিসা– ১৭২)

(১২) মানুষের রক্ষণাবেক্ষণ ঃ

মালাকগণের অন্য একটি দায়িত্ব মহান আল্লাহর হুকুমে তাঁরই মর্জিমত মানুষের রক্ষণাবেক্ষণ করা। যেমন এ বিষয়ে মহান আল্লাহ সূরাহ রাদের ১১ নং আয়াতে বলেন ঃ

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ -

অর্থাৎ "মানুষের জন্য তার সামনে ও তার পিছনে একের পর এক প্রহরী থাকে। তাঁরা মহান আল্লাহর আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে।"

(১৩) মানুষকে কল্যাণকর্মে উৎসাহ প্রদান ঃ

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন : প্রিয় নবীজী বলেছেন ঃ "শাইত্বন মানুষের মনে প্রেরণা জাগায় আবার মালাকও মানুষের মনে প্রেরণা জাগায়। শাইত্বানের প্রেরণা অশুভ ও অকল্যাণের ওয়াদা করা এবং সত্যকে অস্বীকার করার প্রেরণা। মালাকের প্রেরণা হলো কল্যাণের ওয়াদা করা এবং সত্যকে মেনে নেয়া। এরপর নবীজী সূরাহ বাকারার ২৬৮ নং আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ - وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا - وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ -

"শাইত্বান তোমাদেরকে দারিদ্রের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতা-কার্পণ্যের নির্দেশ দেয়। আর মহান আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। মহান আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। (তিরমিজী, ইবনু হিব্বান-তিরমিজী বলেন : হাদীসটি হাসান গরীব)

মুমিনদের জন্য দু'আ করা

মালাকগণের একটি বিশেষ কর্ম বিশ্বাসীদের কল্যাণের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ ও দু'আ করা। মহান আল্লাহ বলেন:

الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا- ربنا وسعت كل شئ رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم – ربنا وادخلهم جنات عدنن التى وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم – انك انت العزيز الحكيم- وقهم السيئات – ومن تق السئيات يومئذ فقد رحمته- وذلك هو الفوز العظيم -

"যারা আর্‌শ ধারণ করে আছে এবং যারা তার চতুপার্শ্ব ঘিরে আছে তারা তাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সাথে এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী, অতএব যারা

তওবা করে এবং তোমার পথ অবলম্বন করে তুমি তাদের ক্ষমা কর এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা কর। হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের দাখিল কর স্থায়ী জান্নাতে, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদেরকে দিয়েছ এবং তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নি, সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরকেও। তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (৪০ গাফির/মুমিন: ৭-৯) বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, দান, অনুপস্থিত মানুষদের জন্য দু'আ ও অন্যান্য সৎকর্মে লিপ্ত মুমিনদের জন্য ফেরেশতাগণ দু'আ করেন।

অনুপস্থিত মুসলিম এবং যে তাদের জন্য দু'আ করে তাদের উভয়ের জন্য ফেরেশতাদের দু'আ:

আবু দারদা রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এরশাদ করেছেন, ''কোন মুসলিম তার অনুপস্থিত ভাইয়ের জন্য দু'আ করলে তা কবুল করা হয় এবং তার মাথার কাছে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত থাকে, যখনই সে ব্যক্তি তার ভাইয়ের জন্য মঙ্গলের দু'আ করে তখন সে নিযুক্ত ফেরেশতা বলে, আমীন অর্থাৎ হে আল্লাহ কবুল করুন এবং তোমার জন্য অনুরূপ। (অর্থাৎ তোমার ভাইয়ের জন্য যা চাইলে, মহান আল্লাহ তোমাকেও তাই দান করুন।)" (মুসলিম হা/৮৮(২৭৩৩, ৪/২০৯৪))

আবু হুরাইরা রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এরশাদ করেছেন, ''প্রতিদিন সকালে দুইজন ফেরেশতা অবতরণ করে, তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! দানকারীর সম্পদ বাড়িয়ে দাও, অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! যে দান করে না তার সম্পদকে বিনাশ করে দাও।" (বুখারী হা/১৪৪২, ৩/৩০৪, মুসলিম হা/৫৭(১০১০), ২/৭০০)

আবু দারদা রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এরশাদ করেছেন, ''প্রতিদিন সূর্য উদয়ের সময় তার দুই পার্শ্বে দুই ফেরেশতা প্রেরণ করা হয়, তারা বলতে থাকে, হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের প্রভুর দিকে অগ্রসর হও। পরিতৃপ্তিকারী অল্পসম্পদ, উদাসীনকারী অধিক সম্পদ থেকে উত্তম, তাদের কথা মানুষ ও জ্বীন ব্যতীত সবাই শুনতে পায়। অনুরূপ সূর্য ডোবার সময় তার দুই পার্শ্বে দুই ফেরেশতা প্রেরণ করা হয়, তারা বলতে থাকে, হে আল্লাহ! দানকারীর সম্পদ বৃদ্ধি করে দাও। তাদের কথা মানুষ ও জ্বীন ব্যতীত সবাই শুনতে পায়। (সহীহ হাদীস সিরিজ হাদীস নং- ৪৪৪, সহীহ তারগীব ওয়াত তারহীব; ১/৪৫৬)

আবু হুরাইরা রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এরশাদ করেছেন, ''জান্নাতের দরজার পার্শ্বে এক ফেরেশতা দাড়িয়ে বলে, যে ব্যক্তি আজ ঋন (মহান আল্লাহর রাস্তায় দান করবে) দিবে, তার প্রতিদান পাবে আগামী কাল। (কিয়ামত দিবসে)

আর অন্য দরজায় এক ফেরেশতা দাড়িয়ে বলেন, ''হে আল্লাহ! দানকারীর সম্পদ বৃদ্ধি করে দাও এবং যারা দান করে না তাদের সম্পদকে ধ্বংস করে দাও।'' (আল মুসনাদ, ২/৩০৫-৩০৬ ও অন্যান্য)

অজু অবস্থায় ঘুমানো ব্যক্তির জন্য ফেরেশতা কর্তৃক ক্ষমা প্রার্থনা

যে সকল সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের জন্য ফেরেশতারা ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে, অজু অবস্থায় ঘুমানো ব্যক্তি তাদের অন্তর্ভূক্ত। যারা রাতে ঘুমানোর জন্য বিছানায় যাওয়ার সময় অজু অবস্থায় থাকে, আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়োজিত ফেরেশতা তার সাথে রাত্রি যাপন করে এবং রাতে যখনই পার্শ্ব পরিবর্তন করে তখনই আল্লাহর সমীপে সে ফেরেশতা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।

ইমাম তাবারানী রহিমাহুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এরশাদ করেন:

طهروا هذه الأجساد طهركم الله- فانه ليس من عبد بيت طاهرا إلا بات معه فى شعاره ملك لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال : اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا- অর্থাৎ ''তোমাদের শরীরকে পবিত্র রাখ, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে পবিত্র করবেন। যে ব্যক্তি পবিত্র অবস্থায় (অজু অবস্থায়) রাত্রি যাপন করবে, অবশ্যই একজন ফেরেশতা তার সাথে রাত্রি যাপন করবে, রাতে যখনই সে পার্শ্ব পরিবর্তন করে তখনই আল্লাহর সমীপে সে ফেরেশতা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করত: বলে: হে আল্লাহ! আপনার এ বান্দাকে ক্ষমা করুন, কেননা সে পবিত্র অবস্থায় (অজু অবস্থায়) ঘুমিয়েছে"। (আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুন নাওয়াফেল ১/৪০৮-৪০৯ সনদ জায়েদ)

এছাড়াও এমন ব্যক্তি যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হয় তখনও সে ফেরেশতা তার জন্য আল্লাহর সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করে। এ সম্পর্কে ইমাম ইবনে হিব্বান আব্দুল্লাহ বিন উমর রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এরশাদ করেন:

من بات طاهرا فى شعاره ملك- فلم يستيقظ إلا قال الملك- اللهم اغفر لعبدك فلانا بات طاهرا- অর্থাৎ, ‘‘যে ব্যক্তি পবিত্র অবস্থায় (অজু অবস্থায়) ঘুমায় তার সাথে একজন ফেরেশতা নিয়োজিত থাকে, সে ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথেই আল্লাহর সমীপে ফেরেশতাটি প্রার্থনায় বলে থাকে, হে আল্লাহ তোমার অমুক বান্দাকে ক্ষমা করে দাও, কেননা সে পবিত্রাবস্থায় ঘুমিয়েছিল”। (আল ইহসান ফি তাকরিব সহীহ ইবনে হিব্বান ৩/৩২৮-৩২৯)

ইমাম ইবনে হিব্বান তার হাদীস গ্রন্থে এ হাদীসটি উল্লেখ করে ‘‘পবিত্রাবস্থায় ঘুমানো ব্যক্তি জাগ্রত হলে ফেরেশতা কতৃক ক্ষমা প্রার্থনা” নামক অধ্যায় বেঁধেছেন। (আল ইহসান ফি তাকরিব সহীহ ইবনে হিব্বান ৩/৩২৮)

উল্লিখিত হাদীছদ্বয় থেকে পবিত্র অবস্থায় ঘুমানো ব্যক্তি সম্পর্কে দু’টি বিষয় জানা যায়:

১। ফেরেশতা তার সাথে রাত্রি যাপন করে থাকে। আর ফেরেশতাদের সাথী হওয়াটা কত বড় সম্মান এবং আল্লাহ কর্তৃক কত মহা অনুগ্রহ পাওয়ার ব্যাপার। পবিত্রাবস্থায় ঘুমানো ব্যক্তির জন্য এ ব্যতীত যদি আর কোন ফযিলত না থাকে তবুও এ আমলের মহত্বের উপর এই এক ফযিলতই যথেষ্ট।

২। রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় পার্শ্ব পরিবর্তন করার সময় ও ঘুম থেকে জাগ্রত হলে আল্লাহ কর্তৃক নিয়োজিত ফেরেশতা আল্লাহর সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে।

পবিত্রাবস্থায় ঘুমানোর শুধু এই ফযিলতই নয়, বরং অন্য হাদীসে আরও ফযিলত বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমাদ এবং ইমাম আবু দাউদ মুয়াজ বিন জাবাল রাজিয়াল্লাহু আনহুম হতে বর্ণিত করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এরশাদ করেন: ما من مسلم بيت على ذكر طاهرا فيتعار من الليل- فيسأل الله خيرا من الدنيا والاخرة إلا أعطاء إياه অর্থাৎ, ‘‘পবিত্রাবস্থায় জিকর করতে করতে ঘুমানো ব্যক্তি রাতে জাগ্রত হয়ে দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গলের জন্য আল্লাহর কাছে যা চাইবে আল্লাহ তাকে তা দান করবেন।” (আল-মুসনাদ ৫/২৩৫, সুনানে আবু দাউদ হা/৫০৩২, ১৩/২৬২)

এ হাদীছ থেকে আরও একটি বিষয় জানা গেল যে, দোয়া কবুলের শর্তের মধ্যে এটিও একটি শর্ত যে, পবিত্রাবস্থায় বান্দা জিকির করতে করতে ঘুমাবে এবং রাতে জাগ্রত হয়ে সে আল্লাহর সমীপে প্রার্থনা করবে। কেননা এ

সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা তাঁর উম্মতকে অবহিত করেছেন। আর জানা কথা যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত হয়েই দ্বীনের ব্যাপারে উম্মতকে অবহিত করতেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন:

وما ينطق عن الهوى- ان هو إلا وحى يوحى অর্থাৎ: ''এবং সে মনগড়া কথাও বলে না, ও তো ওহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়।" (আন-নাজম: ৩-৪)

হে আল্লাহ! আমাদেরকে সেই লোকদের অন্তর্ভূক্ত করুন, যারা পবিত্রাবস্থায় রাতে ঘুমায় এবং আমাদেরকে তাদের মতোই সওয়াবের অংশীদার করুন। আমীন, হে বিশ্বপ্রতিপালক কবুল করুন। ইয়া আরহামার রাহিমীন।

সালাতে অপেক্ষাকারীর জন্য ফেরেশতা কর্তৃক ক্ষমা প্রার্থনা

ইমাম মুসলিম রহিমাহুল্লাহ আবু হুরাইরা রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এরশাদ করেন: أحدكم ما قعد ينتظر الصلاة – ما لم يحدث- تدعو له الملائكة اللهم اغفر له وارحمه- অর্থাৎ: ''তোমাদের মাঝে কোন ব্যক্তি যখন অজু অবস্থায় সালাতের অপেক্ষায় বসে থাকে, সে(যেন) সালাতেই রত, তার জন্য ফেরেশতা দো'আ করতে থাকে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর, হে আল্লাহ তুমি তার উপর দয়া কর।" (মুসলিম হা/৬১৯, ১/৪৬০)

ইমাম ইবনে খুযায়মা তার সংকলিত সহীহ ইবনে খুযায়মাতে উপরের হাদীছের কাছাকাছি শব্দে এক অধ্যায় বর্ণনা করেছেন এবং অধ্যায়ের নামকরণ করেন: فضل الجلوس فى المسجد انتظرا الصلاة – وذكر صلاة الملائكة عليه- ودعائهم له- ما لم يؤذ فيه- أو يحدث فيه- অর্থাৎ: ''সালাতের অপেক্ষায় বসে থাকার ফযিলত এবং সেখানে বসে থাকা ব্যক্তির জন্য ফেরেশতা কর্তৃক ক্ষমা প্রার্থনার বর্ণনা যতক্ষণ পর্যন্ত অপরকে কষ্ট না দেয় বা অজু ভঙ্গ না হয়।" (ইমাম খুযায়মা ২/৩৭৯)

আল্লাহ আকবার! এমন আমল করা কত সহজ। আর তার প্রতিদান কত অধিক। বান্দা অজু অবস্থায় সালাতের অপেক্ষায় বসে আছে, আর তার আমলনামায় সালাতের সওয়াব লেখা হচ্ছে এবং ফেরেশতা সে বান্দার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও তার জন্য আল্লাহ তা'আলার সমীপে রহমতের দোয়া করে।

সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরা এরূপ মহৎ কাজের প্রতি গুরুত্ব দিতেন এবং দয়াময় আল্লাহর দয়ায় এখনও করে যাচ্ছেন।

এ সম্পর্কে এমন একটি ঘটনা যা ইমাম ইবনে মুবারাক রহিমাহুল্লাহ আত্বা বিন সায়েব রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা আমরা আব্দুর রহমান সুলামী (যার নাম ছিল আব্দুল্লাহ বিন হাবীব) এর নিকট গেলাম। আর তিনি তখন মৃত্যু আসন্ন অবস্থায় মাসজিদে অবস্থান করছিলেন, আমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি যদি বাড়ীতে চলে যান, তবে আপনার জন্য তা আরামদায়ক হবে। তিনি উত্তরে বললেন: আমাকে জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর হাদীছ শুনিয়েছেন, তিনি এরশাদ করেন: لا يزال أحدكم فى صلاة ما دام مصلاه ينتظر الصلاة- অর্থাৎ, ''তোমাদের মাঝে কোন ব্যক্তি যখন মুসাল্লায় সালাতের অপেক্ষায় থাকে তখন সে (যেন) সালাতেই থাকে।

আর ইমাম ইবনে সা'আদের বর্ণনায় আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এরশাদ করেন: والملائكة تقول اللهم اغفر له وارحمه- ''আর ফেরেশতারা তার জন্য দো'আ করতে থাকে, ''হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর এবং তার উপর দয়া কর।" (কিতাবুয যুহদ, হাদীছ নং ৪২০ পৃঃ ১৪১-১৪২)

তারপর আবু আব্দুর রহমান সুলামী বলেন, فأريد أن أموت وأنا فى مسجدى- ''অতঃপর আমি চাই যে, আমি মাসজিদে (সালাতের অপেক্ষায় থেকেই) মৃত্যুবরণ করি।" (আত তাবাকাতুল কুবরা ৬/১৭৪-১৭৫)

হে দয়ালু দয়াময়! আপনি বান্দাদের উপর অগণিত রহমত বর্ষণ করুন এবং এই অধমদেরও সেই মহৎ কাজের আগ্রহ দান করুন। হে বিশ্ব প্রতিপালক আপনি কবুল করুন। আমীন

এছাড়াও আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা তাঁর উম্মতের জন্য একটি উপকারী কথা বলেছেন, যার ফলে মাসজিদে সালাতের জন্য অপেক্ষাকারীগণ আল্লাহর তাওফীক্বে অতি সহজে উপকৃত হতে পারেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ইবনে খুযায়মা এবং যিয়াউদ্দীন মাকদাসী, সাহাবী আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এরশাদ করেন: إن الدعاء لا يرد بين الأذان والاقامة فادعوا অর্থাৎ: ''নিশ্চয়ই আজান ও

ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে দোয়া ফিরিয়ে দেয়া হয়না। অতএব তোমরা (এ সময়ে) দোয়া কর।" (আল মুসনাদ, হাদীছ নং ১৩৬৬৮, ২১/২৪৭, সহীহ ইবনে খুযায়মা হাদীছ নং ৪২৭, ১/২২২)

ইমাম ইবনে খুযায়মা রহিমাহুল্লাহ নিম্নের অধ্যায়ের আওতায় এ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন: استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة رجاء أن تكون الدعوة غير مردودة بينهما- অর্থাৎ, ''আজান ও ইকামতের মাঝে দোয়া প্রত্যাখ্যান করা হয়না এই প্রত্যাশায় দোয়া করা মুস্তাহাব।" (সহীহ ইবনে খুযায়মা ১/২২২)

হে দয়ালু দয়াবান! আমাদেরকে আজান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে বেশী বেশী দোয়া করার তাওফীক্ব দান করুন, এবং আমাদের প্রার্থনা কবুল করুন। আমীন, ইয়া যাল জালালে ওয়াল ইকরাম।

প্রথম কাতারের মুসল্লীদের জন্য ফেরেশতাদের ক্ষমা প্রার্থনা

প্রথম কাতারের মুসল্লীর জন্য ফেরেশতা কর্তৃক ক্ষমা প্রার্থনা সম্পর্কে ইমাম ইবনে হিব্বান রহিমাহুল্লাহ সাহাবী বারা রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন: كان رسول الله (صلعم) يقول : ان الله وملائكته يصلون على الصف الأول- অর্থাৎ, ''রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলতেন, প্রথম কাতারের মুসল্লীদেরকে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করেন ও ফেরেশতারা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।" (আল ইহসান ফি তাকরিব সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীছ নং ২১৫৭, ৫/৫৩০-৫৩১)

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ আবু উমামা রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ''রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এরশাদ করেন:

ان الله وملائكته يصلون على الصف الأول قالوا : يا رسول الله ! وعلى الثانى ان الله وملائكته يصلون على الصف الأول قالوا: يا رسول الله ! وعلى الثانى قال : وعلى الثانى- অর্থাৎ, ''নিশ্চয়ই প্রথম কাতারের মুসল্লীকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করেন এবং তাঁর ফেরেশতারা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! দ্বিতীয় কাতারের মুসল্লীদের উপর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেন, নিশ্চয়ই প্রথম কাতারের মুসল্লীকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করেন এবং ফেরেশতারা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর

রাসূল! দ্বিতীয় কাতারের মুসল্লীদের জন্য, তিনি বলেন, দ্বিতীয় কাতারের মুসল্লীদের জন্যও।" (আল-মুসনাদ ৫/২৬২, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১/৩১৮)

ইমাম আবু দাউদ রহিমাহুল্লাহ এবং ইমাম ইবনে খুযায়মা রহিমাহুল্লাহ বারা বিন আজেব রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এরশাদ করেন: إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الصفوف الأول- অর্থাৎ, ''নিশ্চয়ই প্রথম কাতারগুলোর মুসল্লীদের উপর আল্লাহ তা'আলা দয়া করেন এবং ফেরেশতারা ক্ষমা প্রার্থনা করে।" (সুনানে আবু দাউদ হাদীছ নং ৬৬০, ২/২৫৭, সহীহ ইবনে খুযায়মা ১৫৫৭, ৩/২৬)

ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ আবু হুরাইরা রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এরশাদ করেন: لو يعلم الناس ما فى النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه- অর্থাৎ, ''যদি লোকেরা আজান দেয়া ও প্রথম কাতারে সালাত আদায় করার সওয়াব সম্পর্কে অবগত হতো, তবে তাতে লটারি দেয়া ছাড়া কেউ সুযোগ পেত না।" (বুখারী হা/৬১৫, ২/৯৬)

কাতারের ডান পার্শ্বের মুসল্লীদের জন্য ফেরেশতাদের ক্ষমা প্রার্থনা

আবু দাউদ ইবনে খুযায়মা ও ইবনে হিব্বান রহিমাহুকুমুল্লাহ এর আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহা বর্ণিত হাদীছ, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এরশাদ করেন: إن الله وملائكته يصلون على ميا من الصفوف- অর্থাৎ, ''নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা দয়া করেন এবং ফেরেশতারা ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে সালাতে ডান পার্শ্বে দাঁড়ানো ব্যক্তিদের উপর।" (আবু দাউদ হা/৬৭২, ২/২৬৩, ইবনে মাজাহ হা/৯৯১, ১/১৮০-১৮১)

কাতারে পরস্পরে মিলিতভাবে দাড়ানো ব্যক্তিদের জন্য ফেরেশতা কর্তৃক ক্ষমা প্রার্থনা

ঐ সকল ব্যক্তি যারা জামাতের সাথে সালাত আদায় করার সময় কাতারে অপরের সাথে মিলিত হয়ে দাঁড়ায়, এবং তার ও অপরের মাঝে কোন

ফাকা রাখে না। এ বিষয়ে বহু হাদীছের মধ্যে দু'টি হাদীছ নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

ক) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম ইবনে মাজাহ, ইমাম ইবনে হিব্বান ও ইমাম হাকেম রহিমাহুকুমুল্লাহ আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এরশাদ করেন: ان الله عز وجل وملائكته عليهم السلام يصلون على الذين يصلون الصفوف- অর্থাৎ, ''নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা দয়া করেন এবং ফেরেশতাগণ ক্ষমা প্রার্থনা করেন, যারা কাতার মিলিত করে (সালাতে একে অপরের সাথে মিলিয়ে দাঁড়ায়।) (আল মুসনাদ ৬/৬৭, ইবনে মাজাহ ৯৮১, ১/১৭৯, ইবনে খুযায়মা ৩/২৩)

ইমাম ইবনে খুযায়মা এ হাদীছটির ভিত্তিতে নিম্নের অধ্যায় রচনা করেছেন: ذكر صلاة الرب وملائكته على واصل الصفوف- অর্থাৎ, ''সালাতের কাতারে মিলিতভাবে দাঁড়ানো ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তা'আলার দয়া এবং ফেরেশতা কর্তৃক ক্ষমা প্রার্থনা অধ্যায়।" (ইবনে খুযায়মা ৩/২৩)

খ) ইমাম ইবনে খুযায়মা রহিমাহুল্লাহ বারা ইবনে আজেব রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা সালাতের কাতারের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সবার সীনায় ও কাঁধে হাত লাগিয়ে কাতার সোজা করতেন এবং বলতেন: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم- অর্থাৎ, ''তোমরা পৃথক পৃথক হয়ে দাঁড়াইও না, কেননা তোমাদের অন্তর পৃথক হয়ে যাবে।" (আল ইহসান ফি তাকরিব ইবনে হিব্বান হাদীছ নং ৫/৫৩৬)

তিনি বারা ইবনে আজেব রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন: وكان يقول : ان الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الاول- অর্থাৎ: ''এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলতেন, যারা সামনের কাতারে মিলে মিলে দাঁড়ায় তাদের উপরে আল্লাহ তা'আলা দয়া করেন এবং ফেরেশতারা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।" (ইবনে খুযায়মা ৩/২৬)

ইমামের সূরাহ ফাতিহা শেষ করার সময় ফেরেশতাদের আমীন

ক) ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ আবু হুরাইরা রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা

এরশাদ করেন: اذ قال الامام (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقولوا أمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه- অর্থাৎ: ''যখন ইমাম غير المغضوب عليهم ولا الضالين বলবে, তখন তোমরা (আমীন) বল, কেননা যার আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীনের সাথে মিলে যাবে তার অতীত জীবনের গোনাহগুলিকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (বুখারী হা/ ৭৮২, ২/২৬৬)

খ) ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম রহিমাহুকুমুল্লাহ আবু হুরাইরা রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এরশাদ করেন: اذا قال أحدكم أمين وقالت الملائكة فى السماء أمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه- অর্থাৎ: ''যখন তোমাদের কেউ আমীন বলে, আর ফেরেশতারাও আকাশে আমীন বলে, অতঃপর উভয়ের আমীন বলা যদি মিলে যায়, তবে আমীন বলা ব্যক্তির অতীত জীবনের সকল পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (বুখারী হা/৭৮১, ২/২৬৬, মুসলিম হা/ ৭২(৪১০) ১/৩০৭ শব্দগুলি বুখারীর)

সালাত শেষে সালাতের স্থানে বসে থাকা ব্যক্তির জন্য ফেরেশতাদের দোয়া

ক) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ আবু হুরাইরা রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এরশাদ করেন: الملائكة تصلى على أحدكم مادام فى مصلاه الذى صلى فيه ما لم يحدث اللهم اغفر له واللهم ارحمه- অর্থাৎ: ''তোমাদের মাঝে যারা সালাতের পর স্বস্থানে বসে থাকে, তাদের জন্য ফেরেশতারা দোয়া করতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত তার অজু ভঙ্গ না হবে, হে আল্লাহ! আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং হে আল্লাহ আপনি তাদের উপর দয়া করুন।" (আল মুসনাদ হা/৮১০৬, ১৬/৩২)

খ) ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ আবু আব্দুর রহমান রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আলী রাজিয়াল্লাহু আনহুকে বর্ণনা করতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এরশাদ করেন: ان العبد إذا جلس فى مصلاه بعد الصلاة صلت عليه الملائكة وصلاتهم عليه اللهم اغفرله اللهم ارحمهم- অর্থাৎ: ''যখন কোন বান্দা সালাতের পর স্বস্থানে বসে থাকে তখন ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করতে

থাকে। আর ফেরেশতাদের দোয়া হলো: হে আল্লাহ আপনি তাকে ক্ষমা করুন, আপনি তাকে দয়া করুন।"

وإن جلس ينتظر الصلاة صلت عليه الملائكة وصلاتهم عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه-

অর্থাৎ, ''যদি সে সালাতের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে তখন ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করতে থাকে। আর তার জন্য ফেরেশতাদের দোয়া হলো: হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ! আপনি তাকে দয়া করুন।" (আল মুসনাদ হা/১২১৮, ২/২৯২)

গ) ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ আত্বা বিন সায়েব রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আবু আব্দুর রহমান সুলামী এর নিকটে গেলাম। তিনি ফজর সালাতান্তে সালাতের জায়গায় অপেক্ষা করছিলেন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি যদি বাড়ীতে চলে যেতেন তবে তা আপনার জন্য আরামদায়ক হবে। তিনি উত্তরে বললেন, আমি আলী রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমাকে বলতে শুনেছি, এরশাদ করেন: من صلى الفجر ثم جلس فى مصلاه صلت عليه الملائكة وصلاتهم عليه اللهم اغفرله اللهم ارحمه- অর্থাৎ: ''যে ব্যক্তি ফজর সালাতান্তে সালাতের স্থানেই বসে থাকবে, ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করতে থাকে। আর ফেরেশতাদের দোয়া হলো: হে আল্লাহ আপনি তাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ আপনি তাকে দয়া করুন।"

ومن ينتظر الصلاة صلت عليه الملائكة وصلاتهم عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه- অর্থাৎ: ''যে ব্যক্তি সালাতের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করতে থাকে। আর ফেরেশতার দোয়া হলো: হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ! আপনি তাকে দয়া করুন।" (আল মুসনাদ হা/১২৫০, ২/৩০৫-৩০৬)

ইমাম তিরমিজী কর্তৃক ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীছে, তিনি বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমাকে বলতে শুনেছি, এরশাদ করেন: أتانى الليلة ربى تبارك وتعالى فى أحسن صورة قال : أحسبه قال فى أنام- فقال : يا محمد ! هل تدرى فيم يختصم الملأ الأعلى ؟ قلت : نعم – فى الكفارات والكفارات: المكت فى المسجد بعد الصلاة- والمشى على الاقدام الى الجماعات- واسباغ الوضوء

فى المكاره- ومن فعل ذلك عاش بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه- অর্থাৎ: ‘‘রাতে আমার প্রতিপালক উত্তম আকৃতিতে আমার সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন: আমার ধারণা যে, এ ঘটনা ছিল স্বপ্নে। (এ ঘটনা ছিল স্বপ্নে, অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল স্বপ্নে) আল্লাহ তা‘আলা বলেন: হে মুহাম্মাদ! আপনি কি জানেন, শ্রেষ্ঠ ফেরেশতারা কি বিষয় নিয়ে ঝগড়া করে থাকে ? আমি বললাম, হ্যাঁ, তারা কাফফারা সম্পর্কে ঝগড়া করে থাকে, আর কাফফারা হলো: সালাতের পর মাসজিদে অবস্থান করা, সালাতের জামায়াতের জন্য পায়ে হেঁটে যাওয়া, কষ্টের (শীতের) সময়ও পূর্ণভাবে অজু করা। যে ব্যক্তি এ আমলগুলো করবে সে সুখে-শান্তিতে জীবন-যাপন করবে এবং মৃত্যু শান্তিতেই হবে এবং স্বীয় পাপ হতে এমন পবিত্র হবে যেমন নবজাতক শিশু গোনাহ থেকে পবিত্র থাকে।” (আত-তাগরীব ওয়াত তারহিব ১/১৯৪)

আল্লাহু আকবার, এ তিন প্রকার আমলের সওয়াব ও বিনিময় কত মহান। হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে এ আমলগুলিকে হেফাজতকারী ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্ত করুন। আমীন।

জামাতের সাথে ফজর ও আসরের সালাত আদায়কারীর জন্য ফেরেশতাদের দোয়া

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ইবনে খুযায়মা এবং ইবনে হিব্বান রহিমাহুকুমুল্লাহ আবু হুরাইরা রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এরশাদ করেন: يجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار فى صلاة الفجر وصلاة العصر- فيجتمعون فى صلاة الفجر- فتصعد ملائكة الليل وتثبت ملائكة النهار- ويجتمعون فى صلاة العصر- فتصعد ملائكة النهار- وتثبت ملائكة الليل- فيسألهم ربهم : كيف تركتم عبادى؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون – وتركناهم وهم يصلون- فاغفرلهم يوم الدين- অর্থাৎ: “রাতের ও দিনের ফেরেশতারা ফজর ও আসর সালাতে একত্রিত হয়। ফজর সালাতে রাতের ফেরেশতারা উপরে উঠে যায় এবং দিনের ফেরেশতা মানুষের নিকট থেকে যায় এবং আসর সালাতে একত্রিত হয়ে দিনের ফেরেশতারা চলে যায় এবং রাতের ফেরেশতারা থেকে যায়। তাদেরকে আল্লাহ তা‘আলা জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা আমার বান্দাদেরকে কোন অবস্থায় ছেড়ে এসেছ ? ফেরেশতারা উত্তর দেয়, আমরা যখন তাদের নিকট উপস্থিত হয়েছিলাম, তখন তাদেরকে সালাত রত অবস্থায় পেয়েছিলাম এবং

যখন আমরা তাদের ছেড়ে এসেছি তখনও তাদেরকে সালাতের অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। অতএব, আপনি তাদেরকে কিয়ামত দিবসে ক্ষমা করুন।" (আল মুসনাদ হা/৯৪১০, ১৭/১৫৪, ইবনে খুযায়মা হা/৩২২, ১/১৬৫)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমার উপর সালাত পাঠকারীর জন্য ফেরেশতাদের ক্ষমা প্রার্থনা

ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ এর আব্দুল্লাহ বিন উমর রাজিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীছ, তিনি বলেন: من صلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه وسلم وملائكته سبعين صلاة فيقل عبد من ذالك أو ليكثر- অর্থাৎ: ''যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর উপর একবার দরূদ পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তার উপর সত্তর বার দয়া করেন ও তার ফেরেশতারা সত্তর বার ক্ষমা প্রার্থনা করবে। অতএব, বান্দারা দরূদ পাঠ করুক বা অধিক দরূদ পাঠ করুক (এটা তার ব্যাপার)।" (আল মুসনাদ হা/৬৬০৫, ১০/১০৬-১০৭) আল্লাহ আকবার! কতই না সহজ আমল আর তার প্রতিদান কতই না মহান।

বান্দা মাটির মানুষ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর উপর একবার দরূদ পাঠ করবে, যার ফলে সমস্ত সৃষ্টিজগতের সৃষ্টিকারী, রিজিকদাতা তার জন্য সত্তর বার রহমত করবে এবং ফেরেশতারাও তার উপর সত্তর বার ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

কাবার রবের শপথ, যদি কোন আমলের ফলে বিশ্ব প্রতিপালকের রহমত একবার হয়, তবেই সে আমলের মর্যাদা প্রমাণ হওয়ার জন্য যথেষ্ঠ, অথচ এ আমলের প্রতিদান স্বরুপ আল্লাহ তা'আলা সত্তর বার দয়া এবং ফেরেশতাদের সত্তর বার দোয়া পাওয়া যায়, তাহলে এর মর্যাদা কত বেশী হতে পারে সহজেই তা অনুমেয়।

উল্লিখিত হাদীছ যদিও আব্দুল্লাহ বিন আমর রাজিয়াল্লাহু আনহুর বাণী, কিন্তু হাদীছ বিশারদদের মতানুসারে সাহাবীদের কথাও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর বাণীর মতই। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর সাহবীগণ নিজের পক্ষ থেকে কোন কথা বলতেন না বরং তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর নিকট থেকে শোনার পরই অপরকে বলতেন।

আল্লামা সাখাবী রহিমাহুল্লাহ আব্দুল্লাহ বিন আমর রাজিয়াল্লাহু আনহু এর বাণী সম্পর্কে বলেন, তার কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমার বানীর পর্যায়ে। কেননা এর মাঝে ব্যক্তিগত মতামতের কোন প্রশ্নই আসতে পারে না। (আল কাউলুল বাদী ফিস সালাতে আলাল হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা পৃঃ ১৫৩)

শায়খ আহমাদ বিন আব্দুর রহমান আল-বান্না রহিমাহুল্লাহ বলেন, এটা হলো, আব্দুল্লাহ বিন আমর রাজিয়াল্লাহু আনহুর বানী, তবে এটা মারফু হাদীছ পর্যায়ের। কেননা এমন সংবাদের মাঝে ব্যক্তিগত মতামতের কোন স্থানই নেই। (বুলুগুল আমানী ১৪/৩১০)

হে আল্লাহ! আপনি আপনার দয়ায় আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এর উপর বেশী বেশী দরূদ পাঠ করার তাওফীক দান করুন এবং আমাদেরকে আপনার দয়া ও ফেরেশতাদের দোয়া পাওয়ার সৌভাগ্য প্রদান করুন। আমীন

এছাড়াও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা তাঁর উপর বেশী বেশী দরূদ পাঠের উৎসাহ প্রদান করেছেন। ইমাম তিরমিজী রহিমাহুল্লাহ উবাই বিন কাব রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, قلت : يا رسول الله! انى اكثر الصلاة عليك- فكم أجعل لك من صلاتى؟ قال : ما شئت- قلت : الربع- قال : ما شئت فإن زدت فهو خير- قال : فالثلثين- قال : ما شئت فإن زدت فهو خير- قلت : أجعل لك صلاتى كلها- قال : اذا تكفى همك ويغفر ذنبك- অর্থাৎ: ''আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার উপর বেশী বেশী দরূদ পাঠ করতে চাই, তবে আমি আমার দোয়ার কত অংশ আপনার দরূদের জন্য নির্দিষ্ট করব ? তিনি বলেন তোমার ইচ্ছানুযায়ী। আমি বললাম, এক চতুর্থাংশ ? তিনি বললেন, তুমি যা চাও, তবে যদি এর চেয়ে বেশী অংশ দরূদ পড় তা তোমার জন্যই ভাল। আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি অর্ধাংশ দরূদ পড়ব ? তিনি বললেন, তুমি যা চাও, তবে যদি এর চেয়ে বেশী পড় তা তোমার জন্যই ভাল। আমি আরজ করলাম, আমি কি দুই তৃতীয়াংশ দরূদের জন্য নির্ধারণ করব ? তিনি বললেন, তুমি যা চাও, তবে যদি বেশী পড় তা তোমার জন্যই ভাল।

আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি দোয়ার সম্পূর্ণই শুধু আপনার উপর দরূদ পাঠ করব ?

তিনি এরশাদ করলেন, যদি তাই কর, তা হবে তোমার চিন্তা মুক্তি ও পাপসমূহের ক্ষমার জন্য যথেষ্ট।" (জামে তিরমিজী হা/২৫৭৪, ৭/১২৯-১৩০)

এ হাদীছ হতে বুঝা গেল, যে ব্যক্তি নিজের জন্য দোয়া না করে শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর উপর দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তাকে দু'টি বস্তু দান করবেন।

ক) দুনিয়া ও আখেরাতে চিন্তামুক্ত করবেন।

খ) তার গোনাহকে ক্ষমা করে দিবেন।

আরও একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, যা ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ উবাই বিন কাব রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, قال رجل : يا رسول الله ! ارأيت إن جعلت صلاتى كلها عليك قال : اذا يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك واخرتك- অর্থাৎ: ''এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর সমীপে আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা আমি নিজের জন্য দোয়া করার পরিবর্তে শুধু আপনার উপর দরূদ পাঠ করতে চাই এ সম্পর্কে আপনার কি অভিমত ? তিনি উত্তরে বলেন: এর জন্য তো দুনিয়া ও আখেরাতে তোমার চিন্তাসমূহের ক্ষেত্রে আল্লাহই যথেষ্ট হবে।" (আল মুসনাদ ৫/১৩৬, হাফেজ মুনযিরি এ হাদীছের সনদকে 'যায়্যেদ' বলেছেন)

রোজার সাহরী ভক্ষণকারীদের জন্য ফেরেশতাদের দোয়া

১) ইমাম ইবনে হিব্বান এবং ইমাম তাবারানী রহিমাহুকুমুল্লাহ আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এরশাদ করেছেন, ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين- অর্থাৎ: ''নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সাহরী ভক্ষণকারীদের জন্য দয়া করেন এবং ফেরেশতারা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে।" (সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ১/৫১৯)

ইমাম ইবনে হিব্বান রহিমাহুল্লাহ হাদীছটির ভিত্তিতে নিম্নের অধ্যায় রচনা করেন:- ذكر مغفرة الله جل وعلا واستغفار الملائكة للمتسحرين অর্থাৎ: ''সাহরী ভক্ষণকারীদের জন্য আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা ও ফেরেশতাদের ক্ষমা প্রার্থনার বর্ণনা অধ্যায়।" (আল ইহসান ফি তাকরিব সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীছ নং ৮/২৪৫)

২) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ আবু সাইদ খুদরী রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এরশাদ করেন, السحور أكله بركة- فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء- فان الله وملائكته يصلون على المتسحرين- অর্থাৎ: ''সাহরী খাওয়াতে বরকত রয়েছে, সাহরী কখনো ছাড়বে না যদিও এক ঢোক পানি পান করেও হয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা সাহরী গ্রহণকারীদের উপর দয়া করেন এবং তাদের জন্য ফেরেশতারা ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে।" (আল মুসনাদ ৩/১২)

এ হাদীছ থেকে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা কত উৎসাহী ছিলেন যে, তাঁর উম্মত সাহরী খেয়ে আল্লাহর রহমত ও ফেরেশতাদের দোয়ায় ধন্য হোক। এ জন্য মুসলিমদেরকে উৎসাহ দান করেছেন, তারা যদি কোন খাদ্য নাও খেতে পায় কমপক্ষে এক ঢোক পানি পান করে হলেও সাহরী গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। (বুলুগুল আমানী ১০/১৬) শায়খ আহমাদ বিন আব্দুর রহমান আল-বান্না এ হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক দরূদের অর্থ হলো: তিনি সাহরী গ্রহণকারীদের উপর তার রহমত অবতীর্ণ করেন এবং ফেরেশতাদের দরূদ হলো: তারা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর যারা সাহরী খায়না তারা আল্লাহর রহমত ও ফেরেশতাদের ক্ষমা প্রার্থনা থেকে বঞ্চিত হয়।

হে আমাদের দয়াময় প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে আপনার রহমত ও ফেরেশতাদের ক্ষমা প্রার্থনা হতে বঞ্চিত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করবেন না। আপনি কবুল করুন, হে প্রার্থনা শ্রবণকারী। ইয়া আরহামার রাহিমীন।

রোজাদারের সম্মুখে পানাহার করা হলে তাদের জন্য ফেরেশতাগণের ক্ষমা প্রার্থনা

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ও ইমাম ইবনে মাজাহ রহিমাহুকুমুল্লাহ উম্মে আম্মারাহ রাজিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণনা করেন, একদা তার নিকট নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা আগমন করলেন, বর্ণনাকারী বলেন, তাদের গোষ্ঠির কয়েকজন লোক তার ঘরে একত্রিত হলো, তিনি তাদের সবার জন্য খেজুর নিয়ে আসলেন, সবাই খেজুর খাওয়া আরম্ভ করল, কিন্তু এক ব্যক্তি খাওয়া হতে বিরত থাকল, তা দেখি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা তাকে বললেন :

ما شأنه ؟ فقال انى صائم- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه ما من صائم يأكل عنده فواطر إلا صلت عليه الملائكة حتى يقوموا-

অর্থাৎ: ''ব্যাপার কি সে খাচ্ছে না কেন ? সে বলল, আমি রোজা রেখেছি।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এরশাদ করেন, রোজাদারের সামনে যতক্ষণ পর্যন্ত খানা খাওয়া হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে।" (আল মুসনাদ ৭/৩৭০, ইবনে মাজাহ হা/১৭৫২, ১/৩২০-৩২১)

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে: যা ইমাম আহমাদ, ইমাম তিরমিজী, ইমাম ইবনে খুযায়মা এবং ইমাম ইবনে হিব্বান রহিমাহুকুমুল্লাহ উম্মে আম্মারাহ রাজিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এরশাদ করেন: ان الملائكة تصلى على الصائم اذا أكل عنده حتى يفرغوا- অর্থাৎ: ''যখন রোজাদারের সামনে খাওয়া হয়, নিশ্চয়ই তখন ফেরেশতারা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে তাদের শেষ হওয়া পর্যন্ত।" (আল মুসনাদ ৭/৪৩৯)

রোগী পরিদর্শনকারীর জন্য ফেরেশতাদের ক্ষমা প্রার্থনা

ইমাম আহমাদ ও ইমাম ইবনে হিব্বান রহিমাহুকুমুল্লাহ আলী রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা কে বলতে শুনেছি: ما من مسلم عاد أخاه إلا ابتعث الله له سبعين ألف ملك يصلون عليه من أى ساعات النهار كان حتى يمسى ومن أى ساعات الليل كان حتى يصبح- অর্থাৎ: ''যে কোন মুসলিম তার অপর মুসলমান রুগী ভাইকে দেখতে যায়, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রেরণ করেন,তারা দিনের যে সময় সে দেখতে যায় সে সময় থেকে দিনের শেষ পর্যন্ত তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে এবং সে রাতের যে সময় দেখতে যায় সে সময় থেকে রাতের শেষ পর্যন্ত তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে।" (আল মুসনাদ ৭৫৪, ২/১১০) ইমাম ইবনে হিব্বান রহিমাহুল্লাহ এ হাদীছটির ভিত্তিতে নিম্নের অধ্যায় স্থাপন করেন:

রোগী প্রদর্শনকারীর জন্য সকাল থেকে সন্ধ্যা ও সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতাদের ক্ষমা প্রার্থনার বর্ণনা। (আল ইহসান ফি তাকরিব সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীছ নং ৭/২২৪) শায়খ আহমাদ বিন আব্দুর রহমান আল-

বান্না এ হাদীছের ব্যাখ্যায় লিখেছেন: ফেরেশতা কর্তৃক মানুষের জন্য দরূদ পাঠ করার অর্থ হলো: তাদের জন্য রহমত এবং ক্ষমার জন্য দোয়া করা।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমার বাণী من أى ساعات النهار এর অর্থ হলো: যদি রোগীর পরিদর্শন দিনে হয়, তবে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে। এজন্য যারা রোগীকে দেখতে যাবে, তাদের উচিৎ তারা যেন দিনের প্রথম দিকে বা রাতের প্রথম দিকে দেখতে যায়, যাতে করে ফেরেশতাদের দোয়া বেশিক্ষণ ধরে চলতে থাকে। (বুলুগুল আমানী ৮/১৬) অন্য একটি বর্ণনাতে রোগীদের পরিদর্শনকারীর জন্য ফেরেশতাদের দরূদ এর অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে এবং এও বলা হয়েছে যে, তাদের জন্য জান্নাতে একটি বাগান তৈরী করা হয়।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ আলী রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা কে বলতে শুনেছি: من عاد مريضا بكرا شيعه سبعون ألف ملك كلهم يستغفرله حتى يمسى وكان له خريف فى الجنة وان عاده مساء شيعه سبعون ألف ملك كلهم يستغفر له حتى يصبح وكان له خريف فى الجنة- অর্থাৎ: ''যে ব্যক্তি সকাল বেলা কোন রোগীকে দেখতে গেল তার সাথে সত্তর হাজার ফেরেশতা যায় এবং তারা সবাই সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে এবং তার জন্য জান্নাতে একটি বাগান নির্ধারণ করা হয়। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় কোন রোগীকে দেখতে গেল, তার সাথে সত্তর হাজার ফেরেশতা যায় এবং তারা সবাই সকাল পর্যন্ত তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে এবং তার জন্য জান্নাতে একটি বাগান নির্ধারণ করা হয়।" (আল মুসনাদ ৯৭৫, ২/২০৬)

আল্লাহু আকবার! এ আমলটি কতই না সহজ এবং এর সওয়াব ও প্রতিদান কতই না মহান। হে আমার দয়ালু দয়াময় পালনকর্তা! আপনি এ অধমকে (এ পুস্তকের লেখককে) এ কাজগুলি করার তাওফীক দান করুন। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

রোগী ও মৃত ব্যক্তির নিকট উক্তির উপর ফেরেশতাদের আমীন বলা

ইমাম আহমাদ, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিজী ও ইমাম বায়হাকী রহিমাহুকুমুল্লাহ উম্মে সালামাহ রাজিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এরশাদ

করেন: اذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا- فان الملائكة يؤمنون على ما تقولون- অর্থাৎ: ''তোমরা যখন কোন রোগী বা মৃত ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হবে, তখন ভালো দোয়া করবে, কেননা ফেরেশতারা তা কবুল হওয়ার জন্য আমীন বলে থাকে।" (আল মুসনাদ ৬/৩২২)

সৎকাজের শিক্ষা প্রদানকারীর জন্য ফেরেশতাদের ক্ষমা প্রার্থনা

ইমাম তিরমিজী রহিমাহুল্লাহ আবু উমামা বাহেলী রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমার সামনে দুই ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া হলো, যাদের একজন আলেম, একজন আবেদ (এবাদতকারী)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এরশাদ করেন: فضل العالم على العابد كفضلى على أدناكم অর্থাৎ: ''আলেমের তুলনায় আবেদের মর্যাদা হলো: যেমন- তোমাদের সর্বনিম্ন লোকের তুলনায় আমার মর্যাদা।"

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বললেন: إن الله وملائكته واهل السموات والارضين حتى النملة فى حجرها- وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير- অর্থাৎ: ''নিশ্চয়ই মানুষকে ভাল কথা শিক্ষা প্রদানকারীর প্রতি আল্লাহ তা'আলা দয়া করে থাকেন এবং ফেরেশতারা, আসমান ও জমিনের অধিবাসীরা এমন কি গর্তের পিপীলিকা ও পানির মৎস্যও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে।" (জামে তিরমিজী হা/২৮২৫, ৭/৩৭৯-৩৮০)

হাদীছে মানুষকে উত্তম কথা শিক্ষা দেওয়ার অর্থ হলো: মোল্লা আলী কারী রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন: দ্বীনি শিক্ষা এবং এমন শিক্ষা যার সাথে মানুষের মুক্তি জড়িত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা প্রত্যেক শিক্ষকের জন্য ক্ষমার উল্লেখ করেননি; বরং معلم الناس الخير অর্থাৎ মানুষের উত্তম শিক্ষা দাতার কথা বলেছেন। যেন তার দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, উক্ত ক্ষমার উপযুক্ত ঐ শিক্ষক মানুষকে কল্যাণের পথে পৌঁছার জন্য ইলম শিক্ষা প্রদান করে থাকেন। (মেরকাতুল মাফাতিহ ১/৪৭৩)

আল্লাহ আকবার! দ্বীন শিক্ষা দাতার সওয়াব কতই না মহান। হে আল্লাহ! এই অধমদেরকে ঐ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করবেন না। আমীন। সুশিক্ষাদাতাদের এই মহা সওয়াবের রহস্য বর্ণনা করে ইমাম ইবনে কাইয়্যিম বলেন: যেহেতু তার দ্বীনি শিক্ষা-সুশিক্ষা প্রদান মানুষের জন্য মুক্তি ও

সৌভাগ্যের কারণ, আর এজন্য তাদের আত্মিক পবিত্রতাও অর্জন হয়। অতএব, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য অনুরূপ প্রতিদান ঘোষণা করেন, যা তাকে ফেরেশতা ও বিশ্ববাসীর দোয়ার অধিকারী বানিয়েছেন এবং তার মুক্তি, সৌভাগ্য ও সফলতার কারণ সাব্যস্ত হয়েছে।

এছাড়াও যখন সৎ শিক্ষা প্রদানকারীর আল্লাহ তা'আলার দ্বীন ও বিধি-বিধানকে মানুষের সামনে ফুটিয়ে তোলে এবং তার নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে লোকদেরকে সচেতন করে তখন আল্লাহ তা'আলাও তার প্রতিদান হিসেবে স্বীয় ক্ষমা প্রদান ও বিশ্ববাসীর দোয়ার মাধ্যমে তার মর্যাদার চর্চা ও তার প্রশংসা আকাশ ও পৃথিবীবাসীর সম্মুখে করেন। মেফতাহ দারুস সায়াদাহ ১/৬৩ উক্ত বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: ''ফযলুদ দাওয়াহ ইলাল্লাহ তা'আলা'' নামক গ্রন্থের ৫৬/৬০ পৃঃ)

মুমিনদের জন্য দু'আ করা

মালাকগণের একটি বিশেষ কর্ম বিশ্বাসীদের কল্যাণের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ ও দু'আ করা। মহান আল্লাহ বলেন:

الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا- ربنا وسعت كل شئ رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم – ربنا وادخلهم جنات عدنن التى وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم – انك انت العزيز الحكيم- وقهم السيئات – ومن تق السئيات يومئذ فقد رحمته- وذلك هو الفوز العظيم -

"যারা আর্‌শ ধারণ করে আছে এবং যারা তার চতুপার্শ্ব ঘিরে আছে তারা তাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সাথে এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী, অতএব যারা তওবা করে এবং তোমার পথ অবলম্বন করে তুমি তাদের ক্ষমা কর এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা কর। হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের দাখিল কর স্থায়ী জান্নাতে, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদেরকে দিয়েছ এবং তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নি, সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরকেও। তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (৪০ গাফির/মুমিন: ৭-৯) বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত

হয়েছে যে, দান, অনুপস্থিত মানুষদের জন্য দু'আ ও অন্যান্য সৎকর্মে লিপ্ত মুমিনদের জন্য ফেরেশতাগণ দু'আ করেন।

অনুপস্থিত মুসলিম এবং যে তাদের জন্য দু'আ করে তাদের উভয়ের জন্য ফেরেশতাদের দু'আঃ

আবু দারদা রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এরশাদ করেছেন, ''কোন মুসলিম তার অনুপস্থিত ভাইয়ের জন্য দু'আ করলে তা কবুল করা হয় এবং তার মাথার কাছে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত থাকে, যখনই সে ব্যক্তি তার ভাইয়ের জন্য মঙ্গলের দু'আ করে তখন সে নিযুক্ত ফেরেশতা বলে, আমীন অর্থাৎ হে আল্লাহ কবুল করুন এবং তোমার জন্য অনুরূপ। (অর্থাৎ তোমার ভাইয়ের জন্য যা চাইলে, মহান আল্লাহ তোমাকেও তাই দান করুন।)'' (মুসলিম হা/৮৮(২৭৩৩, ৪/২০৯৪))

আবু হুরাইরা রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এরশাদ করেছেন, ''প্রতিদিন সকালে দুইজন ফেরেশতা অবতরণ করে, তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! দানকারীর সম্পদ বাড়িয়ে দাও, অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! যে দান করে না তার সম্পদকে বিনাশ করে দাও।'' (বুখারী হা/১৪৪২, ৩/৩০৪, মুসলিম হা/৫৭(১০১০), ২/৭০০)

আবু দারদা রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এরশাদ করেছেন, ''প্রতিদিন সূর্য উদয়ের সময় তার দুই পার্শ্বে দুই ফেরেশতা প্রেরণ করা হয়, তারা বলতে থাকে, হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের প্রভুর দিকে অগ্রসর হও। পরিতৃপ্তিকারী অল্পসম্পদ, উদাসীনকারী অধিক সম্পদ থেকে উত্তম, তাদের কথা মানুষ ও জ্বীন ব্যতীত সবাই শুনতে পায়। অনুরূপ সূর্য ডোবার সময় তার দুই পার্শ্বে দুই ফেরেশতা প্রেরণ করা হয়, তারা বলতে থাকে, হে আল্লাহ! দানকারীর সম্পদ বৃদ্ধি করে দাও। তাদের কথা মানুষ ও জ্বীন ব্যতীত সবাই শুনতে পায়। (সহীহ হাদীস সিরিজ হাদীস নং- ৪৪৪, সহীহ তারগীব ওয়াত তারহীব; ১/৪৫৬)

আবু হুরাইরা রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এরশাদ করেছেন, ''জান্নাতের দরজার পার্শ্বে এক ফেরেশতা দাড়িয়ে বলে, যে ব্যক্তি আজ ঋন (মহান আল্লাহর রাস্তায় দান করবে) দিবে, তার প্রতিদান পাবে আগামী কাল। (কিয়ামত দিবসে)

আর অন্য দরজায় এক ফেরেশতা দাড়িয়ে বলেন, ''হে আল্লাহ! দানকারীর সম্পদ বৃদ্ধি করে দাও এবং যারা দান করে না তাদের সম্পদকে ধ্বংস করে দাও।'' (আল মুসনাদ, ২/৩০৫-৩০৬ ও অন্যান্য)

অজু অবস্থায় ঘুমানো ব্যক্তির জন্য ফেরেশতা কর্তৃক ক্ষমা প্রার্থনা

যে সকল সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের জন্য ফেরেশতারা ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে, অজু অবস্থায় ঘুমানো ব্যক্তি তাদের অন্তর্ভূক্ত। যারা রাতে ঘুমানোর জন্য বিছানায় যাওয়ার সময় অজু অবস্থায় থাকে, আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়োজিত ফেরেশতা তার সাথে রাত্রি যাপন করে এবং রাতে যখনই পার্শ্ব পরিবর্তন করে তখনই আল্লাহর সমীপে সে ফেরেশতা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।

ইমাম তাবারানী রহিমাহুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এরশাদ করেন:

طهروا هذه الأجساد طهركم الله- فانه ليس من عبد بيت طاهرا إلا بات معه فى شعاره ملك لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال : اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا- অর্থাৎ ''তোমাদের শরীরকে পবিত্র রাখ, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে পবিত্র করবেন। যে ব্যক্তি পবিত্র অবস্থায় (অজু অবস্থায়) রাত্রি যাপন করবে, অবশ্যই একজন ফেরেশতা তার সাথে রাত্রি যাপন করবে, রাতে যখনই সে পার্শ্ব পরিবর্তন করে তখনই আল্লাহর সমীপে সে ফেরেশতা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করত: বলে: হে আল্লাহ! আপনার এ বান্দাকে ক্ষমা করুন, কেননা সে পবিত্র অবস্থায় (অজু অবস্থায়) ঘুমিয়েছে"। (আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুন নাওয়াফেল ১/৪০৮-৪০৯ সনদ জায়েদ)

এছাড়াও এমন ব্যক্তি যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হয় তখনও সে ফেরেশতা তার জন্য আল্লাহর সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করে। এ সম্পর্কে ইমাম ইবনে হিব্বান আব্দুল্লাহ বিন উমর রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এরশাদ করেন:

من بات طاهرا فى شعاره ملك- فلم يستيقظ إلا قال الملك- اللهم اغفر لعبدك فلانا بات طاهرا- অর্থাৎ, ''যে ব্যক্তি পবিত্র অবস্থায় (অজু অবস্থায়) ঘুমায় তার সাথে একজন ফেরেশতা নিয়োজিত থাকে, সে ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথেই আল্লাহর সমীপে ফেরেশতাটি প্রার্থনায় বলে থাকে, হে

আল্লাহ তোমার অমুক বান্দাকে ক্ষমা করে দাও, কেননা সে পবিত্রাবস্থায় ঘুমিয়েছিল”। (আল ইহসান ফি তাকরিব সহীহ ইবনে হিব্বান ৩/৩২৮-৩২৯)

ইমাম ইবনে হিব্বান তার হাদীস গ্রন্থে এ হাদীসটি উল্লেখ করে ‘‘পবিত্রাবস্থায় ঘুমানো ব্যক্তি জাগ্রত হলে ফেরেশতা কতৃক ক্ষমা প্রার্থনা” নামক অধ্যায় বেঁধেছেন। (আল ইহসান ফি তাকরিব সহীহ ইবনে হিব্বান ৩/৩২৮)

উল্লিখিত হাদীছদ্বয় থেকে পবিত্র অবস্থায় ঘুমানো ব্যক্তি সম্পর্কে দু’টি বিষয় জানা যায়:

১। ফেরেশতা তার সাথে রাত্রি যাপন করে থাকে। আর ফেরেশতাদের সাথী হওয়াটা কত বড় সম্মান এবং আল্লাহ কর্তৃক কত মহা অনুগ্রহ পাওয়ার ব্যাপার। পবিত্রাবস্থায় ঘুমানো ব্যক্তির জন্য এ ব্যতীত যদি আর কোন ফযিলত না থাকে তবুও এ আমলের মহত্বের উপর এই এক ফযিলতই যথেষ্ট।

২। রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় পার্শ্ব পরিবর্তন করার সময় ও ঘুম থেকে জাগ্রত হলে আল্লাহ কর্তৃক নিয়োজিত ফেরেশতা আল্লাহর সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে।

পবিত্রাবস্থায় ঘুমানোর শুধু এই ফযিলতই নয়, বরং অন্য হাদীসে আরও ফযিলত বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমাদ এবং ইমাম আবু দাউদ মুয়াজ বিন জাবাল রাজিয়াল্লাহু আনহুম হতে বর্ণিত করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এরশাদ করেন: ما من مسلم بيت على ذكر طاهرا فيتعار من الليل- فيسأل الله خيرا من الدنيا والاخرة إلا أعطاء إياه অর্থাৎ, ‘‘পবিত্রাবস্থায় জিকর করতে করতে ঘুমানো ব্যক্তি রাতে জাগ্রত হয়ে দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গলের জন্য আল্লাহর কাছে যা চাইবে আল্লাহ তাকে তা দান করবেন।” (আল-মুসনাদ ৫/২৩৫, সুনানে আবু দাউদ হা/৫০৩২, ১৩/২৬২)

এ হাদীছ থেকে আরও একটি বিষয় জানা গেল যে, দোয়া কবুলের শর্তের মধ্যে এটিও একটি শর্ত যে, পবিত্রাবস্থায় বান্দা জিকির করতে করতে ঘুমাবে এবং রাতে জাগ্রত হয়ে সে আল্লাহর সমীপে প্রার্থনা করবে। কেননা এ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা তাঁর উম্মতকে অবহিত করেছেন। আর জানা কথা যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত হয়েই দ্বীনের ব্যাপারে উম্মতকে অবহিত করতেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা এরশাদ করেন:

وما ينطق عن الهوى- ان هو إلا وحى يوحى অর্থাৎ: ‘‘এবং সে মনগড়া কথাও বলে না, ও তো ওহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়।’’ (আন-নাজম: ৩-৪)

হে আল্লাহ! আমাদেরকে সেই লোকদের অন্তর্ভূক্ত করুন, যারা পবিত্রাবস্থায় রাতে ঘুমায় এবং আমাদেরকে তাদের মতোই সওয়াবের অংশীদার করুন। আমীন, হে বিশ্বপ্রতিপালক কবুল করুন। ইয়া আরহামার রাহিমীন।

সালাতে অপেক্ষাকারীর জন্য ফেরেশতা কর্তৃক ক্ষমা প্রার্থনা

ইমাম মুসলিম রহিমাহুল্লাহ আবু হুরাইরা রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এরশাদ করেন: أحدكم ما قعد ينتظر الصلاة – ما لم يحدث- تدعو له الملائكة اللهم اغفر له وارحمه- অর্থাৎ: ‘‘তোমাদের মাঝে কোন ব্যক্তি যখন অজু অবস্থায় সালাতের অপেক্ষায় বসে থাকে, সে(যেন) সালাতেই রত, তার জন্য ফেরেশতা দো’আ করতে থাকে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর, হে আল্লাহ তুমি তার উপর দয়া কর।’’ (মুসলিম হা/৬১৯, ১/৪৬০)

ইমাম ইবনে খুযায়মা তার সংকলিত সহীহ ইবনে খুযায়মাতে উপরের হাদীছের কাছাকাছি শব্দে এক অধ্যায় বর্ণনা করেছেন এবং অধ্যায়ের নামকরণ করেন: فضل الجلوس فى المسجد انتظرا الصلاة – وذكر صلاة الملائكة عليه- ودعائهم له- ما لم يؤذ فيه- أو يحدث فيه- অর্থাৎ: ‘‘সালাতের অপেক্ষায় বসে থাকার ফযিলত এবং সেখানে বসে থাকা ব্যক্তির জন্য ফেরেশতা কর্তৃক ক্ষমা প্রার্থনার বর্ণনা যতক্ষণ পর্যন্ত অপরকে কষ্ট না দেয় বা অজু ভঙ্গ না হয়।’’ (ইমাম খুযায়মা ২/৩৭৯)

আল্লাহ আকবার! এমন আমল করা কত সহজ। আর তার প্রতিদান কত অধিক। বান্দা অজু অবস্থায় সালাতের অপেক্ষায় বসে আছে, আর তার আমলনামায় সালাতের সওয়াব লেখা হচ্ছে এবং ফেরেশতা সে বান্দার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও তার জন্য আল্লাহ তা‘আলার সমীপে রহমতের দোয়া করে। সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরা এরূপ মহৎ কাজের প্রতি গুরুত্ব দিতেন এবং দয়াময় আল্লাহর দয়ায় এখনও করে যাচ্ছেন।

এ সম্পর্কে এমন একটি ঘটনা যা ইমাম ইবনে মুবারাক রহিমাহুল্লাহ আত্বা বিন সায়েব রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা আমরা আব্দুর রহমান সুলামী (যার নাম ছিল আব্দুল্লাহ বিন হাবীব) এর নিকট গেলাম।

আর তিনি তখন মৃত্যু আসন্ন অবস্থায় মাসজিদে অবস্থান করছিলেন, আমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি যদি বাড়ীতে চলে যান, তবে আপনার জন্য তা আরামদায়ক হবে। তিনি উত্তরে বললেন: আমাকে জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর হাদীছ শুনিয়েছেন, তিনি এরশাদ করেন: لا يزال أحدكم فى صلاة ما دام مصلاه ينتظر الصلاة- অর্থাৎ, ''তোমাদের মাঝে কোন ব্যক্তি যখন মুসাল্লায় সালাতের অপেক্ষায় থাকে তখন সে (যেন) সালাতেই থাকে।

আর ইমাম ইবনে সা'আদের বর্ণনায় আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এরশাদ করেন: والملائكة تقول اللهم اغفر له وارحمه- ''আর ফেরেশতারা তার জন্য দো'আ করতে থাকে, ''হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর এবং তার উপর দয়া কর।" (কিতাবুয যুহদ, হাদীছ নং ৪২০ পৃঃ ১৪১-১৪২)

তারপর আবু আব্দুর রহমান সুলামী বলেন, فأريد أن أموت وأنا فى مسجدى- ''অতঃপর আমি চাই যে, আমি মাসজিদে (সালাতের অপেক্ষায় থেকেই) মৃত্যুবরণ করি।" (আত তাবাকাতুল কুবরা ৬/১৭৪-১৭৫)

হে দয়ালু দয়াময়! আপনি বান্দাদের উপর অগণিত রহমত বর্ষণ করুন এবং এই অধমদেরও সেই মহৎ কাজের আগ্রহ দান করুন। হে বিশ্ব প্রতিপালক আপনি কবুল করুন। আমীন

এছাড়াও আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা তাঁর উম্মতের জন্য একটি উপকারী কথা বলেছেন, যার ফলে মাসজিদে সালাতের জন্য অপেক্ষাকারীগণ আল্লাহর তাওফীক্বে অতি সহজে উপকৃত হতে পারেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ইবনে খুযায়মা এবং যিয়াউদ্দীন মাকদাসী, সাহাবী আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এরশাদ করেন: إن الدعاء لا يرد بين الأذان والاقامة فادعوا অর্থাৎ: ''নিশ্চয়ই আজান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে দোয়া ফিরিয়ে দেয়া হয়না। অতএব তোমরা (এ সময়ে) দোয়া কর।" (আল মুসনাদ, হাদীছ নং ১৩৬৬৮, ২১/২৪৭, সহীহ ইবনে খুযায়মা হাদীছ নং ৪২৭, ১/২২২)

ইমাম ইবনে খুযায়মা রহিমাহুল্লাহ নিম্নের অধ্যায়ের আওতায় এ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন: استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة رجاء أن تكون

الدعوة غير مردودة بينهما- অর্থাৎ, ‘‘আজান ও ইকামতের মাঝে দোয়া প্রত্যাখ্যান করা হয়না এই প্রত্যাশায় দোয়া করা মুস্তাহাব।’’ (সহীহ ইবনে খুযায়মা ১/২২২)

হে দয়ালু দয়াবান! আমাদেরকে আজান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে বেশী বেশী দোয়া করার তাওফীক্ব দান করুন, এবং আমাদের প্রার্থনা কবুল করুন। আমীন, ইয়া যাল জালালে ওয়াল ইকরাম।

প্রথম কাতারের মুসল্লীদের জন্য ফেরেশতাদের ক্ষমা প্রার্থনা

প্রথম কাতারের মুসল্লীর জন্য ফেরেশতা কর্তৃক ক্ষমা প্রার্থনা সম্পর্কে ইমাম ইবনে হিব্বান রহিমাহুল্লাহ সাহাবী বারা রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন: كان رسول الله (صلعم) يقول : ان الله وملائكته يصلون على الصف الأول- অর্থাৎ, ‘‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলতেন, প্রথম কাতারের মুসল্লীদেরকে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা ক্ষমা করেন ও ফেরেশতারা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।’’ (আল ইহসান ফি তাকরিব সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীছ নং ২১৫৭, ৫/৫৩০-৫৩১)

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ আবু উমামা রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ‘‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এরশাদ করেন:

ان الله وملائكته يصلون على الصف الأول قالوا : يا رسول الله ! وعلى الثانى ان الله وملائكته يصلون على الصف الأول قالوا: يا رسول الله ! وعلى الثانى قال : وعلى الثانى- অর্থাৎ, ‘‘নিশ্চয়ই প্রথম কাতারের মুসল্লীকে আল্লাহ তা‘আলা ক্ষমা করেন এবং তাঁর ফেরেশতারা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! দ্বিতীয় কাতারের মুসল্লীদের উপর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেন, নিশ্চয়ই প্রথম কাতারের মুসল্লীকে আল্লাহ তা‘আলা ক্ষমা করেন এবং ফেরেশতারা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! দ্বিতীয় কাতারের মুসল্লীদের জন্য, তিনি বলেন, দ্বিতীয় কাতারের মুসল্লীদের জন্যও।’’ (আল-মুসনাদ ৫/২৬২, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১/৩১৮)

ইমাম আবু দাউদ রহিমাহুল্লাহ এবং ইমাম ইবনে খুযায়মা রহিমাহুল্লাহ বারা বিন আজেব রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এরশাদ করেন: إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الصفوف الأول- অর্থাৎ, ''নিশ্চয়ই প্রথম কাতারগুলোর মুসল্লীদের উপর আল্লাহ তা'আলা দয়া করেন এবং ফেরেশতারা ক্ষমা প্রার্থনা করে।" (সুনানে আবু দাউদ হাদীছ নং ৬৬০, ২/২৫৭, সহীহ ইবনে খুযায়মা ১৫৫৭, ৩/২৬)

ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ আবু হুরাইরা রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এরশাদ করেন: لو يعلم الناس ما فى النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه- অর্থাৎ, ''যদি লোকেরা আজান দেয়া ও প্রথম কাতারে সালাত আদায় করার সওয়াব সম্পর্কে অবগত হতো, তবে তাতে লটারি দেয়া ছাড়া কেউ সুযোগ পেত না।" (বুখারী হা/৬১৫, ২/৯৬)

কাতারের ডান পার্শ্বের মুসল্লীদের জন্য ফেরেশতাদের ক্ষমা প্রার্থনা

আবু দাউদ ইবনে খুযায়মা ও ইবনে হিব্বান রহিমাহুকুমুল্লাহ এর আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহা বর্ণিত হাদীছ, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এরশাদ করেন: إن الله وملائكته يصلون على ميا من الصفوف- অর্থাৎ, ''নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা দয়া করেন এবং ফেরেশতারা ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে সালাতে ডান পার্শ্বে দাঁড়ানো ব্যক্তিদের উপর।" (আবু দাউদ হা/৬৭২, ২/২৬৩, ইবনে মাজাহ হা/৯৯১, ১/১৮০-১৮১)

কাতারে পরস্পরে মিলিতভাবে দাড়ানো ব্যক্তিদের জন্য ফেরেশতা কর্তৃক ক্ষমা প্রার্থনা

ঐ সকল ব্যক্তি যারা জামাতের সাথে সালাত আদায় করার সময় কাতারে অপরের সাথে মিলিত হয়ে দাঁড়ায়, এবং তার ও অপরের মাঝে কোন ফাকা রাখে না। এ বিষয়ে বহু হাদীছের মধ্যে দু'টি হাদীছ নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

ক) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম ইবনে মাজাহ, ইমাম ইবনে হিব্বান ও ইমাম হাকেম রহিমাহুকুমুল্লাহ আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এরশাদ করেন: ان الله عز وجل وملائكته عليهم السلام يصلون

على الذين يصلون الصفوف- অর্থাৎ, ‘‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা দয়া করেন এবং ফেরেশতাগণ ক্ষমা প্রার্থনা করেন, যারা কাতার মিলিত করে (সালাতে একে অপরের সাথে মিলিয়ে দাঁড়ায়।) (আল মুসনাদ ৬/৬৭, ইবনে মাজাহ ৯৮১, ১/১৭৯, ইবনে খুযায়মা ৩/২৩)

ইমাম ইবনে খুযায়মা এ হাদীছটির ভিত্তিতে নিম্নের অধ্যায় রচনা করেছেন: ذكر صلاة الرب وملائكته على واصل الصفوف- অর্থাৎ, ‘‘সালাতের কাতারে মিলিতভাবে দাঁড়ানো ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তা‘আলার দয়া এবং ফেরেশতা কর্তৃক ক্ষমা প্রার্থনা অধ্যায়।” (ইবনে খুযায়মা ৩/২৩)

খ) ইমাম ইবনে খুযায়মা রহিমাহুল্লাহ বারা ইবনে আজেব রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা সালাতের কাতারের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সবার সীনায় ও কাঁধে হাত লাগিয়ে কাতার সোজা করতেন এবং বলতেন: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم- অর্থাৎ, ‘‘তোমরা পৃথক পৃথক হয়ে দাঁড়াইও না, কেননা তোমাদের অন্তর পৃথক হয়ে যাবে।” (আল ইহসান ফি তাকরিব ইবনে হিব্বান হাদীছ নং ৫/৫৩৬)

তিনি বারা ইবনে আজেব রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন: وكان يقول : ان الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الاول- অর্থাৎ: ‘‘এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলতেন, যারা সামনের কাতারে মিলে মিলে দাঁড়ায় তাদের উপরে আল্লাহ তা‘আলা দয়া করেন এবং ফেরেশতারা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।” (ইবনে খুযায়মা ৩/২৬)

ইমামের সূরা ফাতিহা শেষ করার সময় ফেরেশতাদের আমীন

ক) ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ আবু হুরাইরা রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এরশাদ করেন: اذ قال الامام (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقولوا أمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه- অর্থাৎ: ‘‘যখন ইমাম غير المغضوب عليهم ولا الضالين বলবে, তখন তোমরা (আমীন) বল, কেননা যার আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীনের সাথে মিলে যাবে তার অতীত জীবনের গোনাহগুলিকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।” (বুখারী হা/ ৭৮২, ২/২৬৬)

খ) ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম রহিমাহুকুমুল্লাহ আবু হুরাইরা রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এরশাদ করেন: اذا قال أحدكم أمين وقالت الملائكة فى السماء أمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه- অর্থাৎ: ''যখন তোমাদের কেউ আমীন বলে, আর ফেরেশতারাও আকাশে আমীন বলে, অতঃপর উভয়ের আমীন বলা যদি মিলে যায়, তবে আমীন বলা ব্যক্তির অতীত জীবনের সকল পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (বুখারী হা/৭৮১, ২/২৬৬, মুসলিম হা/ ৭২(৪১০) ১/৩০৭ শব্দগুলি বুখারীর)

সালাত শেষে সালাতের স্থানে বসে থাকা ব্যক্তির জন্য ফেরেশতাদের দোয়া

ক) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ আবু হুরাইরা রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এরশাদ করেন: الملائكة تصلى على أحدكم مادام فى مصلاه الذى صلى فيه ما لم يحدث اللهم اغفر له واللهم ارحمه- অর্থাৎ: ''তোমাদের মাঝে যারা সালাতের পর স্বস্থানে বসে থাকে, তাদের জন্য ফেরেশতারা দোয়া করতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত তার অজু ভঙ্গ না হবে, হে আল্লাহ! আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং হে আল্লাহ আপনি তাদের উপর দয়া করুন।" (আল মুসনাদ হা/৮১০৬, ১৬/৩২)

খ) ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ আবু আব্দুর রহমান রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আলী রাজিয়াল্লাহু আনহুকে বর্ণনা করতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এরশাদ করেন: ان العبد إذا جلس فى مصلاه بعد الصلاة صلت عليه الملائكة وصلاتهم عليه اللهم اغفرله اللهم ارحمهم- অর্থাৎ: ''যখন কোন বান্দা সালাতের পর স্বস্থানে বসে থাকে তখন ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করতে থাকে। আর ফেরেশতাদের দোয়া হলো: হে আল্লাহ আপনি তাকে ক্ষমা করুন, আপনি তাকে দয়া করুন।"

وإن جلس ينتظر الصلاة صلت عليه الملائكة وصلاتهم عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه-

অর্থাৎ, ''যদি সে সালাতের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে তখন ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করতে থাকে। আর তার জন্য ফেরেশতাদের

দোয়া হলো: হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ! আপনি তাকে দয়া করুন।" (আল মুসনাদ হা/১২১৮, ২/২৯২)

গ) ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ আত্বা বিন সায়েব রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আবু আব্দুর রহমান সুলামী এর নিকটে গেলাম। তিনি ফজর সালাতান্তে সালাতের জায়গায় অপেক্ষা করছিলেন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি যদি বাড়ীতে চলে যেতেন তবে তা আপনার জন্য আরামদায়ক হবে। তিনি উত্তরে বললেন, আমি আলী রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমাকে বলতে শুনেছি, এরশাদ করেন: من صلى الفجر ثم جلس فى مصلاه صلت عليه الملائكة وصلاتهم عليه اللهم اغفرله اللهم ارحمه- অর্থাৎ: ''যে ব্যক্তি ফজর সালাতান্তে সালাতের স্থানেই বসে থাকবে, ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করতে থাকে। আর ফেরেশতাদের দোয়া হলো: হে আল্লাহ আপনি তাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ আপনি তাকে দয়া করুন।"

ومن ينتظر الصلاة صلت عليه الملائكة وصلاتهم عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه- অর্থাৎ: ''যে ব্যক্তি সালাতের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করতে থাকে। আর ফেরেশতার দোয়া হলো: হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ! আপনি তাকে দয়া করুন।" (আল মুসনাদ হা/১২৫০, ২/৩০৫-৩০৬)

ইমাম তিরমিজী কর্তৃক ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীছে, তিনি বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমাকে বলতে শুনেছি, এরশাদ করেন: أتانى الليلة ربى تبارك وتعالى فى أحسن صورة قال : أحسبه قال فى أنام- فقال : يا محمد ! هل تدرى فيم يختصم الملأ الأعلى ؟ قلت : نعم – فى الكفارات والكفارات: المكث فى المسجد بعد الصلاة- والمشى على الاقدام الى الجماعات- واسباغ الوضوء فى المكاره- ومن فعل ذلك عاش بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه- অর্থাৎ: ''রাতে আমার প্রতিপালক উত্তম আকৃতিতে আমার সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন: আমার ধারণা যে, এ ঘটনা ছিল স্বপ্নে। (এ ঘটনা ছিল স্বপ্নে, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল স্বপ্নে) আল্লাহ তা'আলা বলেন: হে মুহাম্মাদ! আপনি কি জানেন, শ্রেষ্ঠ ফেরেশতারা কি বিষয় নিয়ে ঝগড়া করে থাকে ? আমি বললাম, হ্যাঁ, তারা কাফফারা সম্পর্কে ঝগড়া করে থাকে, আর কাফফারা হলো: সালাতের পর মাসজিদে অবস্থান করা,

সালাতের জামায়াতের জন্য পায়ে হেঁটে যাওয়া, কষ্টের (শীতের) সময়ও পূর্ণভাবে অজু করা। যে ব্যক্তি এ আমলগুলো করবে সে সুখে-শান্তিতে জীবন-যাপন করবে এবং মৃত্যু শান্তিতেই হবে এবং স্বীয় পাপ হতে এমন পবিত্র হবে যেমন নবজাতক শিশু গোনাহ থেকে পবিত্র থাকে।" (আত-তাগরীব ওয়াত তারহিব ১/১৯৪)

আল্লাহু আকবার, এ তিন প্রকার আমলের সওয়াব ও বিনিময় কত মহান। হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে এ আমলগুলিকে হেফাজতকারী ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্ত করুন। আমীন।

জামাতের সাথে ফজর ও আসরের সালাত আদায়কারীর জন্য ফেরেশতাদের দোয়া

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ইবনে খুযায়মা এবং ইবনে হিব্বান রহিমাহুকুমুল্লাহ আবু হুরাইরা রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এরশাদ করেন: يجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار فى صلاة الفجر وصلاة العصر- فيجتمعون فى صلاة الفجر- فتصعد ملائكة الليل وتثبت ملائكة النهار- ويجتمعون فى صلاة العصر- فتصعد ملائكة النهار- وتثبت ملائكة الليل- فيسألهم ربهم : كيف تركتم عبادى؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون – وتركناهم وهم يصلون- فاغفرلهم يوم الدين- অর্থাৎ: "রাতের ও দিনের ফেরেশতারা ফজর ও আসর সালাতে একত্রিত হয়। ফজর সালাতে রাতের ফেরেশতারা উপরে উঠে যায় এবং দিনের ফেরেশতা মানুষের নিকট থেকে যায় এবং আসর সালাতে একত্রিত হয়ে দিনের ফেরেশতারা চলে যায় এবং রাতের ফেরেশতারা থেকে যায়। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা আমার বান্দাদেরকে কোন অবস্থায় ছেড়ে এসেছ ? ফেরেশতারা উত্তর দেয়, আমরা যখন তাদের নিকট উপস্থিত হয়েছিলাম, তখন তাদেরকে সালাত রত অবস্থায় পেয়েছিলাম এবং যখন আমরা তাদের ছেড়ে এসেছি তখনও তাদেরকে সালাতের অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। অতএব, আপনি তাদেরকে কিয়ামত দিবসে ক্ষমা করুন।" (আল মুসনাদ হা/৯৪১০, ১৭/১৫৪, ইবনে খুযায়মা হা/৩২২, ১/১৬৫)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমার উপর সালাত পাঠকারীর জন্য ফেরেশতাদের ক্ষমা প্রার্থনা

ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ এর আব্দুল্লাহ বিন উমর রাজিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীছ, তিনি বলেন: من صلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه وسلم وملائكته سبعين صلاة فيقل عبد من ذالك أو ليكثر- অর্থাৎ: ''যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর উপর একবার দরূদ পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তার উপর সত্তর বার দয়া করেন ও তার ফেরেশতারা সত্তর বার ক্ষমা প্রার্থনা করবে। অতএব, বান্দারা দরূদ পাঠ করুক বা অধিক দরূদ পাঠ করুক (এটা তার ব্যাপার)।" (আল মুসনাদ হা/৬৬০৫, ১০/১০৬-১০৭) আল্লাহ আকবার! কতই না সহজ আমল আর তার প্রতিদান কতই না মহান।

বান্দা মাটির মানুষ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর উপর একবার দরূদ পাঠ করবে, যার ফলে সমস্ত সৃষ্টিজগতের সৃষ্টিকারী, রিজিকদাতা তার জন্য সত্তর বার রহমত করবে এবং ফেরেশতারাও তার উপর সত্তর বার ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

কাবার রবের শপথ, যদি কোন আমলের ফলে বিশ্ব প্রতিপালকের রহমত একবার হয়, তবেই সে আমলের মর্যাদা প্রমাণ হওয়ার জন্য যথেষ্ঠ, অথচ এ আমলের প্রতিদান স্বরুপ আল্লাহ তা'আলা সত্তর বার দয়া এবং ফেরেশতাদের সত্তর বার দোয়া পাওয়া যায়, তাহলে এর মর্যাদা কত বেশী হতে পারে সহজেই তা অনুমেয়।

উল্লিখিত হাদীছ যদিও আব্দুল্লাহ বিন আমর রাজিয়াল্লাহু আনহুর বাণী, কিন্তু হাদীছ বিশারদদের মতানুসারে সাহাবীদের কথাও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর বাণীর মতই। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর সাহবীগণ নিজের পক্ষ থেকে কোন কথা বলতেন না বরং তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর নিকট থেকে শোনার পরই অপরকে বলতেন।

আল্লামা সাখাবী রহিমাহুল্লাহ আব্দুল্লাহ বিন আমর রাজিয়াল্লাহু আনহু এর বাণী সম্পর্কে বলেন, তার কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমার বানীর পর্যায়ে। কেননা এর মাঝে ব্যক্তিগত মতামতের কোন প্রশ্নই আসতে পারে না। (আল কাউলুল বাদী ফিস সালাতে আলাল হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা পৃঃ ১৫৩)

শায়খ আহমাদ বিন আব্দুর রহমান আল-বান্না রহিমাহুল্লাহ বলেন, এটা হলো, আব্দুল্লাহ বিন আমর রাজিয়াল্লাহু আনহুর বানী, তবে এটা মারফু হাদীছ পর্যায়ের। কেননা এমন সংবাদের মাঝে ব্যক্তিগত মতামতের কোন স্থানই নেই। (বুলুগুল আমানী ১৪/৩১০)

হে আল্লাহ! আপনি আপনার দয়ায় আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এর উপর বেশী বেশী দরূদ পাঠ করার তাওফীক দান করুন এবং আমাদেরকে আপনার দয়া ও ফেরেশতাদের দোয়া পাওয়ার সৌভাগ্য প্রদান করুন। আমীন

এছাড়াও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা তাঁর উপর বেশী বেশী দরূদ পাঠের উৎসাহ প্রদান করেছেন। ইমাম তিরমিজী রহিমাহুল্লাহ উবাই বিন কাব রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, قلت : يا رسول الله! انى اكثر الصلاة عليك- فكم أجعل لك من صلاتى؟ قال : ما شئت- قلت : الربع- قال : ما شئت فإن زدت فهو خير- قال : فالثلثين- قال : ما شئت فإن زدت فهو خير- قلت : أجعل لك صلاتى كلها- قال : اذا تكفى همك ويغفر ذنبك- অর্থাৎ: ‘‘আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার উপর বেশী বেশী দরূদ পাঠ করতে চাই, তবে আমি আমার দোয়ার কত অংশ আপনার দরূদের জন্য নির্দিষ্ট করব ? তিনি বলেন তোমার ইচ্ছানুযায়ী। আমি বললাম, এক চতুর্থাংশ ? তিনি বললেন, তুমি যা চাও, তবে যদি এর চেয়ে বেশী অংশ দরূদ পড় তা তোমার জন্যই ভাল। আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি অর্ধাংশ দরূদ পড়ব ? তিনি বললেন, তুমি যা চাও, তবে যদি এর চেয়ে বেশী পড় তা তোমার জন্যই ভাল। আমি আরজ করলাম, আমি কি দুই তৃতীয়াংশ দরূদের জন্য নির্ধারণ করব ? তিনি বললেন, তুমি যা চাও, তবে যদি বেশী পড় তা তোমার জন্যই ভাল।

আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি দোয়ার সম্পূর্ণই শুধু আপনার উপর দরূদ পাঠ করব ?

তিনি এরশাদ করলেন, যদি তাই কর, তা হবে তোমার চিন্তা মুক্তি ও পাপসমূহের ক্ষমার জন্য যথেষ্ট।” (জামে তিরমিজী হা/২৫৭৪, ৭/১২৯-১৩০)

এ হাদীছ হতে বুঝা গেল, যে ব্যক্তি নিজের জন্য দোয়া না করে শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর উপর দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তাকে দু’টি বস্তু দান করবেন।

ক) দুনিয়া ও আখেরাতে চিন্তামুক্ত করবেন।

খ) তার গোনাহকে ক্ষমা করে দিবেন।

আরও একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, যা ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ উবাই বিন কাব রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, قال رجل : يا رسول الله ! ارأيت إن جعلت صلاتى كلها عليك قال : اذا يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك واخرتك- অর্থাৎ: ''এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা-এর সমীপে আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা আমি নিজের জন্য দোয়া করার পরিবর্তে শুধু আপনার উপর দরূদ পাঠ করতে চাই এ সম্পর্কে আপনার কি অভিমত ? তিনি উত্তরে বলেন: এর জন্য তো দুনিয়া ও আখেরাতে তোমার চিন্তাসমূহের ক্ষেত্রে আল্লাহই যথেষ্ট হবে।" (আল মুসনাদ ৫/১৩৬, হাফেজ মুনযিরি এ হাদীছের সনদকে 'যায়্যেদ' বলেছেন)

রোজার সাহরী ভক্ষণকারীদের জন্য ফেরেশতাদের দোয়া

১) ইমাম ইবনে হিব্বান এবং ইমাম তাবারানী রহিমাহুকুমুল্লাহ আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এরশাদ করেছেন, ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين- অর্থাৎ: ''নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সাহরী ভক্ষণকারীদের জন্য দয়া করেন এবং ফেরেশতারা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে।" (সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ১/৫১৯)

ইমাম ইবনে হিব্বান রহিমাহুল্লাহ হাদীছটির ভিত্তিতে নিম্নের অধ্যায় রচনা করেন:- ذكر مغفرة الله جل وعلا واستغفار الملائكة للمتسحرين অর্থাৎ: ''সাহরী ভক্ষণকারীদের জন্য আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা ও ফেরেশতাদের ক্ষমা প্রার্থনার বর্ণনা অধ্যায়।" (আল ইহসান ফি তাকরিব সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীছ নং ৮/২৪৫)

২) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ আবু সাইদ খুদরী রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এরশাদ করেন, السحور أكله بركة- فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء- فان الله وملائكته يصلون على المتسحرين- অর্থাৎ: ''সাহরী খাওয়াতে বরকত রয়েছে, সাহরী কখনো ছাড়বে না যদিও এক ঢোক পানি পান করেও হয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা সাহরী

গ্রহণকারীদের উপর দয়া করেন এবং তাদের জন্য ফেরেশতারা ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে।" (আল মুসনাদ ৩/১২)

এ হাদীছ থেকে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা কত উৎসাহী ছিলেন যে, তাঁর উম্মত সাহরী খেয়ে আল্লাহর রহমত ও ফেরেশতাদের দোয়ায় ধন্য হোক। এ জন্য মুসলিমদেরকে উৎসাহ দান করেছেন, তারা যদি কোন খাদ্য নাও খেতে পায় কমপক্ষে এক ঢোক পানি পান করে হলেও সাহরী গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। (বুলুগুল আমানী ১০/১৬) শায়খ আহমাদ বিন আব্দুর রহমান আল-বান্না এ হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক দরূদের অর্থ হলো: তিনি সাহরী গ্রহণকারীদের উপর তার রহমত অবতীর্ণ করেন এবং ফেরেশতাদের দরূদ হলো: তারা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর যারা সাহরী খায়না তারা আল্লাহর রহমত ও ফেরেশতাদের ক্ষমা প্রার্থনা থেকে বঞ্চিত হয়।

হে আমাদের দয়াময় প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে আপনার রহমত ও ফেরেশতাদের ক্ষমা প্রার্থনা হতে বঞ্চিত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করবেন না। আপনি কবুল করুন, হে প্রার্থনা শ্রবণকারী। ইয়া আরহামার রাহিমীন।

রোজাদারের সম্মুখে পানাহার করা হলে তাদের জন্য ফেরেশতাগণের ক্ষমা প্রার্থনা

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ও ইমাম ইবনে মাজাহ রহিমাহুকুমুল্লাহ উম্মে আম্মারাহ রাজিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণনা করেন, একদা তার নিকট নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা আগমন করলেন, বর্ণনাকারী বলেন, তাদের গোষ্ঠির কয়েকজন লোক তার ঘরে একত্রিত হলো, তিনি তাদের সবার জন্য খেজুর নিয়ে আসলেন, সবাই খেজুর খাওয়া আরম্ভ করল, কিন্তু এক ব্যক্তি খাওয়া হতে বিরত থাকল, তা দেখি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা তাকে বললেন :

ما شأنه ؟ فقال انى صائم- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه ما من صائم يأكل عنده فواطر إلا صلت عليه الملائكة حتى يقوموا-

অর্থাৎ: ''ব্যাপার কি সে খাচ্ছে না কেন ? সে বলল, আমি রোজা রেখেছি।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এরশাদ করেন, রোজাদারের সামনে যতক্ষণ পর্যন্ত খানা খাওয়া হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে।" (আল মুসনাদ ৭/৩৭০, ইবনে মাজাহ হা/১৭৫২, ১/৩২০-৩২১)

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে: যা ইমাম আহমাদ, ইমাম তিরমিজী, ইমাম ইবনে খুযায়মা এবং ইমাম ইবনে হিব্বান রহিমাহুকুমুল্লাহ উম্মে আম্মারাহ রাজিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এরশাদ করেন: ان الملائكة تصلى على الصائم اذا أكل عنده حتى يفرغوا- অর্থাৎ: ''যখন রোজাদারের সামনে খাওয়া হয়, নিশ্চয়ই তখন ফেরেশতারা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে তাদের শেষ হওয়া পর্যন্ত।" (আল মুসনাদ ৭/৪৩৯)

রোগী পরিদর্শনকারীর জন্য ফেরেশতাদের ক্ষমা প্রার্থনা

ইমাম আহমাদ ও ইমাম ইবনে হিব্বান রহিমাহুকুমুল্লাহ আলী রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা কে বলতে শুনেছি: ما من مسلم عاد أخاه إلا ابتعث الله له سبعين ألف ملك يصلون عليه من أى ساعات النهار كان حتى يمسى ومن أى ساعات الليل كان حتى يصبح- অর্থাৎ: ''যে কোন মুসলিম তার অপর মুসলমান রুগী ভাইকে দেখতে যায়, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রেরণ করেন,তারা দিনের যে সময় সে দেখতে যায় সে সময় থেকে দিনের শেষ পর্যন্ত তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে এবং সে রাতের যে সময় দেখতে যায় সে সময় থেকে রাতের শেষ পর্যন্ত তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে।" (আল মুসনাদ ৭৫৪, ২/১১০) ইমাম ইবনে হিব্বান রহিমাহুল্লাহ এ হাদীছটির ভিত্তিতে নিম্নের অধ্যায় স্থাপন করেন:

রোগী প্রদর্শনকারীর জন্য সকাল থেকে সন্ধ্যা ও সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতাদের ক্ষমা প্রার্থনার বর্ণনা। (আল ইহসান ফি তাকরিব সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীছ নং ৭/২২৪) শায়খ আহমাদ বিন আব্দুর রহমান আল-বান্না এ হাদীছের ব্যাখ্যায় লিখেছেন: ফেরেশতা কর্তৃক মানুষের জন্য দরূদ পাঠ করার অর্থ হলো: তাদের জন্য রহমত এবং ক্ষমার জন্য দোয়া করা।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমার বাণী من أى ساعات النهار এর অর্থ হলো: যদি রোগীর পরিদর্শন দিনে হয়, তবে সূর্যাস্ত

পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে। এজন্য যারা রোগীকে দেখতে যাবে, তাদের উচিৎ তারা যেন দিনের প্রথম দিকে বা রাতের প্রথম দিকে দেখতে যায়, যাতে করে ফেরেশতাদের দোয়া বেশিক্ষণ ধরে চলতে থাকে। (বুলুগুল আমানী ৮/১৬) অন্য একটি বর্ণনাতে রোগীদের পরিদর্শনকারীর জন্য ফেরেশতাদের দরূদ এর অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে এবং এও বলা হয়েছে যে, তাদের জন্য জান্নাতে একটি বাগান তৈরী করা হয়।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ আলী রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা কে বলতে শুনেছি: من عاد مريضا بكرا شيعه سبعون ألف ملك كلهم يستغفرله حتى يمسى وكان له خريف فى الجنة وان عاده مساء شيعه سبعون ألف ملك كلهم يستغفر له حتى يصبح وكان له خريف فى الجنة- অর্থাৎ: ''যে ব্যক্তি সকাল বেলা কোন রোগীকে দেখতে গেল তার সাথে সত্তর হাজার ফেরেশতা যায় এবং তারা সবাই সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে এবং তার জন্য জান্নাতে একটি বাগান নির্ধারণ করা হয়। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় কোন রোগীকে দেখতে গেল, তার সাথে সত্তর হাজার ফেরেশতা যায় এবং তারা সবাই সকাল পর্যন্ত তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে এবং তার জন্য জান্নাতে একটি বাগান নির্ধারণ করা হয়।" (আল মুসনাদ ৯৭৫, ২/২০৬)

আল্লাহু আকবার! এ আমলটি কতই না সহজ এবং এর সওয়াব ও প্রতিদান কতই না মহান। হে আমার দয়ালু দয়াময় পালনকর্তা! আপনি এ অধমকে (এ পুস্তকের লেখককে) এ কাজগুলি করার তাওফীক দান করুন। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

রোগী ও মৃত ব্যক্তির নিকট উক্তির উপর ফেরেশতাদের আমীন বলা

ইমাম আহমাদ, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিজী ও ইমাম বায়হাকী রহিমাহুকুমুল্লাহ উম্মে সালামাহ রাজিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এরশাদ করেন: اذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا- فان الملائكة يؤمنون على ما تقولون- অর্থাৎ: ''তোমরা যখন কোন রোগী বা মৃত ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হবে, তখন ভালো দোয়া করবে, কেননা ফেরেশতারা তা কবুল হওয়ার জন্য আমীন বলে থাকে।" (আল মুসনাদ ৬/৩২২)

সৎকাজের শিক্ষা প্রদানকারীর জন্য ফেরেশতাদের ক্ষমা প্রার্থনা

ইমাম তিরমিজী রহিমাহুল্লাহ আবু উমামা বাহেলী রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমার সামনে দুই ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া হলো, যাদের একজন আলেম, একজন আবেদ (এবাদতকারী)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এরশাদ করেন: فضل العالم على العابد كفضلى على أدناكم অর্থাৎ: ''আলেমের তুলনায় আবেদের মর্যাদা হলো: যেমন- তোমাদের সর্বনিম্ন লোকের তুলনায় আমার মর্যাদা।"

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বললেন: إن الله وملائكته واهل السموات والارضين حتى النملة فى حجرها- وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير- অর্থাৎ: ''নিশ্চয়ই মানুষকে ভাল কথা শিক্ষা প্রদানকারীর প্রতি আল্লাহ তা'আলা দয়া করে থাকেন এবং ফেরেশতারা, আসমান ও জমিনের অধিবাসীরা এমন কি গর্তের পিপীলিকা ও পানির মৎস্যও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে।" (জামে তিরমিজী হা/২৮২৫, ৭/৩৭৯-৩৮০)

হাদীছে মানুষকে উত্তম কথা শিক্ষা দেওয়ার অর্থ হলো: মোল্লা আলী কারী রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন: দ্বীনি শিক্ষা এবং এমন শিক্ষা যার সাথে মানুষের মুক্তি জড়িত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা প্রত্যেক শিক্ষকের জন্য ক্ষমার উল্লেখ করেননি; বরং معلم الناس الخير অর্থাৎ মানুষের উত্তম শিক্ষা দাতার কথা বলেছেন। যেন তার দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, উক্ত ক্ষমার উপযুক্ত ঐ শিক্ষক মানুষকে কল্যাণের পথে পৌঁছার জন্য ইলম শিক্ষা প্রদান করে থাকেন। (মেরকাতুল মাফাতিহ ১/৪৭৩)

আল্লাহ আকবার! দ্বীন শিক্ষা দাতার সওয়াব কতই না মহান। হে আল্লাহ! এই অধমদেরকে ঐ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করবেন না। আমীন। সুশিক্ষাদাতাদের এই মহা সওয়াবের রহস্য বর্ণনা করে ইমাম ইবনে কাইয়্যিম বলেন: যেহেতু তার দ্বীনি শিক্ষা-সুশিক্ষা প্রদান মানুষের জন্য মুক্তি ও সৌভাগ্যের কারণ, আর এজন্য তাদের আত্মিক পবিত্রতাও অর্জন হয়। অতএব, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য অনুরূপ প্রতিদান ঘোষণা করেন, যা তাকে ফেরেশতা ও বিশ্ববাসীর দোয়ার অধিকারী বানিয়েছেন এবং তার মুক্তি, সৌভাগ্য ও সফলতার কারণ সাব্যস্ত হয়েছে।

এছাড়াও যখন সৎ শিক্ষা প্রদানকারীর আল্লাহ তা'আলার দ্বীন ও বিধি-বিধানকে মানুষের সামনে ফুটিয়ে তোলে এবং তার নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে লোকদেরকে সচেতন করে তখন আল্লাহ তা'আলাও তার প্রতিদান হিসেবে স্বীয় ক্ষমা প্রদান ও বিশ্ববাসীর দোয়ার মাধ্যমে তার মর্যাদার চর্চা ও তার প্রশংসা আকাশ ও পৃথিবীবাসীর সম্মুখে করেন। মেফতাহ দারুস সায়াদাহ ১/৬৩ উক্ত বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: ''ফযলুদ দাওয়াহ ইলাল্লাহ তা'আলা'' নামক গ্রন্থেও ৫৬/৬০ পৃঃ)

(১৪) অন্যান্য কর্ম ঃ

এছাড়া পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে আমরা জানি যে, মহান আল্লাহ বিভিন্ন সৃষ্টির পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য' বিভিন্ন শ্রেণীর মালাককে ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব দিয়েছেন। চাঁদ-সূর্যের জন্য, পাহাড়-পর্বতের জন্য, আকাশের বিভিন্ন স্থানের জন্য, মেঘের জন্য, বৃষ্টির জন্য, মাতৃগর্ভের ভ্রুণের জন্য, জাহান্নামের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, পাপীদের, জান্নাতবাসী মুমিনদের খেদমত ও শান্তিদানের জন্য বিভিন্ন মালাককে' দায়িত প্রদান করেছেন মহান আল্লাহ।

মুসলিমদের জিকিরের মাজলিস, আলোচনার মাজলিস, ইলমের মাজলিস, সালাতের জামাআত ইত্যাদি সৎকর্মে মালাকগণ উপস্থিত থাকেন, কিছু মালাক বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমার জন্য প্রেরিত সালাত ও সালাম তাঁর পবিত্র রাওজা মুবারকে পৌঁছে দেন, কিছু মালাক, মৃত্যুর পরে বা কবরে মৃত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন-মুনকার নাকির নামক মালাক। **'মালিক'** নামক মালাককে দিয়েছেন জাহান্নামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে। ইস্রাফিল আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমাকে দিয়েছেন ক্বিয়ামতের শিংগায় ফুৎকার দানের দায়িত্ব। মিকাঈল আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা ফিরিশতা বৃষ্টিপাত ও ফল ফসলের দায়িত্বে নিয়োজিত। এভাবে বিভিন্ন হাদীস থেকে বিশ্বজগতের বিভিন্ন সৃষ্টির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভিন্ন ফিরিশতাদের কথা আমরা জানতে পারি, যারা বিশ্ব জগত পরিচালনায় মহান আল্লাহর ইচ্ছা ও নির্দেশের কথা রাস্তবায়ন করেন। তাই মুসলিমরা বিশ্বাস করেন যে, চাঁদ, সূর্য, মেঘ, বৃষ্টি ইত্যাদি মহান আল্লাহর সকল সৃষ্টি যেমন তাঁরই সৃষ্ট প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন, তেমনি এ সকল সৃষ্টির মধ্যে মহান আল্লাহর নিয়ম ও নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য রয়েছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত মালাকগণ। সকল সৃষ্টি তারই নিয়ন্ত্রণে, সকল প্রাকৃতিক নিয়ম

তাঁরই সৃষ্টি, মালাকগণ তাঁরই দাস। সবকিছু তাঁর ইচ্ছা ও নির্দেশের অধীনে। একমাত্র তাঁর ইচ্ছাই চূড়ান্ত। তিনিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। (ইবনু হাজার আসকালানী-ফাতহুলবারী ৬/৩১১-৩১৭, কুরআন সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা)

মালাকগণ বিষয়ক বিভ্রান্তি

আগেই উল্লেখ করেছি যে, ফিরিশতাগণ অদৃশ্য জগতের অংশ। তাঁদের উপর বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আমরা পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আক্ষরিক অনুসরণ ও বিশ্বাসেই মুমিনের নাজাতের একমাত্র পথ। গাইবী বিষয়ে ওহীর সাথে কল্পনা, ধারণা, যুক্তি ইত্যাদি মিশ্রিত করে ওহীর অতিরিক্ত কিছু বলা বিভ্রান্তির পথ উন্মুক্ত করে। মালাকগণের বিষয়ে এ ধরনের কিছু বিভ্রান্তিতে নিপতিত হয়েছে পূর্ববর্তী কোনো কোনো জাতি।

দায়িত্ব বনাম ক্ষমতা

উপরের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, মহান আল্লাহ ফিরিশতাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন, ক্ষমতা দেন নি। এই দায়িত্বকে অতীত কালের বিভ্রান্ত সম্প্রদায় **'ক্ষমতা'** বলে বিশ্বাস করেছে। এরপর তারা এ সকল **'মালাক'** বা ফিরিশতাকে ভক্তির নামে ইবাদত করেছে এবং এদের কাছে প্রার্থনা করেছে। এখানে আরো লক্ষ্যণীয় যে, মহান আল্লাহ মালাকদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন। কোনো জীবিত বা মৃত মানুষকে কোনোরূপ দায়িত্ব দিয়েছেন বলে জানান নি। কিন্তু অনেক বিভ্রান্ত জাতি তাদের মধ্যকার অনেক নবী, ওলী, **'বীর'-'সাধু'** বা সৎ মানুষকে মৃত্যুর পরে **'মালাকগণের'** মত **'দায়িত্বপ্রাপ্ত'** বলে বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে দাবি করেছে। এরপর তারা দায়িত্বকে ক্ষমতা বলে কল্পনা করেছে। এরপর তারা তাদের ইবাদত করেছে বা তাদের কাছে গাইবী বা অলৌকিক সাহায্য চেয়েছে।

সত্যিকারের মুমিন-মুসলিম বিশ্বাস করেন যে, মহান আল্লাহ বৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রে তার ইচ্ছা ও নির্দেশকে বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব দিয়েছেন কোনো কোনো ফিরিশতাকে, কিন্তু তাই বলে বিভিন্ন অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের মত সেই ফিরিশতাকে বৃষ্টির দেবতা মনে করে তার কাছে বৃষ্টি চেয়ে প্রার্থনা করেন না। অনুরূপভাবে সত্যিকারের মুমিন-মুসলিমরা বিশ্বাস করেন যে, মহান আল্লাহ প্রাণ সংহারের জন্য দায়িত্ব দিয়েছেন কোনো কোনো ফিরিশতাকে, কিন্তু তাই

বলে তারা সেই ফিরিশতাকে প্রাণ সংহারের ক্ষমতাশালী মনে করে দীর্ঘায়ূ চেয়ে তার কাছে প্রার্থনা করেন না।

এভাবে আমরা মালাকগণ সম্পর্কে মুসলিম ও অমুসলিম বিশ্বাসের পার্থক্য বুঝতে পারছি। একজন সত্যিকারের মুমিন-মুসলিম বিশ্বাস করেন যে, সকল ক্ষমতা ও শক্তি একমাত্র মহান আল্লাহর। তাঁর ইচ্ছাই চূড়ান্ত। তিনি যেমন আলো ও তাপ দানের জন্য সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন, জীবনের উৎস হিসেবে পানিকে সৃষ্টি করেছেন, বাতাস প্রবাহ, বৃষ্টিপাত, আলোছায়ার জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম সৃষ্টি করেছেন, তেমনি তিনি মালাকগণকে বিভিন্ন দায়িত্ব দিয়েছেন। তিনি ইচ্ছা করলেই সূর্য ছাড়াই আলো ও তাপ দিতে পারেন বা পানি ছাড়াই ফসল দিতে পারেন। তবে তিনি এই মহাবিশ্বকে একটি সুন্দর ও সুনিয়ন্ত্রিত নিয়মের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। বিশ্বের আর সব সৃষ্টির মত ফিরিশতারাও মহান আল্লাহর আনুগত্য করেন এবং তাঁরই ইচ্ছা বাস্তবায়ন করেন। তাই আমরা ফিরিশতাকে সম্মান করি, তাঁদেরকে ভালবাসি, মহান আল্লাহর কাছে তাঁদের কল্যাণ ও শান্তি চেয়ে দু'আ করি এবং বলি (আলাইহিমুস সালাম: তাঁদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক), কিন্তু কখনই তাঁদের কাছে প্রার্থনা করি না, তাঁদেরকে উপাসনা করি না, তাঁদেরকে ডাকি না।

সম্পর্ক ও সুপারিশ

পবিত্র কুরআনুল করীমের বিভিন্ন আয়াত থেকে আমরা জানতে পারি যে, প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন দেশের মানুষেরা মালাক বা ফিরিশতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করত। তাদের এই বিশ্বাস ছিল বিভিন্ন অমূলক ধারণা এবং কুসংস্কার মিশ্রিত। তারা বিশ্বাস করত যে, মালাকগণ মহান আল্লাহর বিশেষ সৃষ্টি। তারা মানুষের থেকে উন্নত ও সম্মানিত। মহান আল্লাহর সাথে তাদের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে এবং তাদের রয়েছে বিভিন্ন ক্ষমতা বা ঐশ্বরিক শক্তি।

পবিত্র কুরআনের বর্ণনায় আমরা দেখতে পাই যে, মুশরিকগণ মালাকগণকে মহান আল্লাহর কন্যা বলে বিশ্বাস করত। (সূরাহ যুখরুফ ১৯, সূরাহ সাফফাত: ১৪৯-১৫২ আয়াত।) এতেই তারা ক্ষান্ত হতো না, বরং তাঁদের শাফায়াত ও সুপারিশ লাভের আশায় তারা তাদের ইবাদত উপাসনা করত বা তাদেরকে ডাকত। এছাড়া অন্য অনেক মানব গোষ্ঠী বিভিন্ন সৎ মানুষ বা নবী-রাসূলকে মহান আল্লাহর সন্তান বলে বিশ্বাস করে তাদের শাফায়াত-সুপারিশ লাভের জন্য তাদের কাছে প্রার্থনা করত। কারণ, যেহেতু এরা বিশেষ সৃষ্টি ও বিশেষ সম্পর্কের অধিকারী সেহেতু মহান আল্লাহ এদের সুপারিশ

ফেলবেন না। পবিত্র কুরআন কারীমের বিভিন্ন স্থানে অবিশ্বাসীদের বিভ্রান্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এ বিষয়ক কয়েকটি আয়াত আমরা উপরে দেখেছি। এক স্থানে মহান আল্লাহ বলেছেন :

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَـٰنُ وَلَدًا ۗ سُبْحَانَهُ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ - لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ - يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ - وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَـٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ -

"তারা বলে, **'দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন।'** তিনি পবিত্র, মহান! তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা। তারা আগে বেড়ে কথা বলে না, তারা তো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে। তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত। তিনি যাদের প্রতি সন্তুষ্ট তাদের ছাড়া আর কারো জন্য তারা সুপারিশ করে না এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত। তাদের মধ্যে যে বলবে **'আমি ইলাহ মহান আল্লাহ ব্যতীত'** তাকে আমি প্রতিফল দিব জাহান্নাম, এভাবেই আমি জালিমদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।" (*আম্বিয়া :* ২৬-২৯)

মহান আল্লাহ মালাকগণের বা আল্লাহর অন্যান্য সম্মানিত সৃষ্টির **'শাফা'আতের'** সুযোগ অস্বীকার করেন নি। তবে এক্ষেত্রে কাফিরদের 'বিকৃতি'র প্রতিবাদ করেছেন। কাফিরগণ মহান আল্লাহর সাথে মালাকগণ বা মহান আল্লাহর প্রিয় সম্মানিত বান্দাগণের সম্পর্ককে পৃথিবীর রাজাবাদশার সাথে আমলা-চামচাদের সম্পর্কের মত মনে করেছে। পৃথিবীর শাসক বা রাজার অজ্ঞাতে অন্যায়কারী তার কোনো প্রিয়পাত্রকে তোয়াজ করে সুপারিশ আদায় করে নিতে পারে। আর এরূপ সুপারিশে শাসক বা রাজা প্রভাবিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেন। আর এক্ষেত্রে সুপারিশ প্রার্থী উক্ত 'আমলা'-কে যেকোনো প্রকারে ভক্তি তোয়াজ করে সুপারিশ আদায়ের চেষ্টা করেন। উক্ত রাজাকে যেমন ভক্তি তোয়াজ করেন, আমলাকেও তদ্রূপ বা তার চেয়ে বেশি করলেও অসুবিধা নেই।

মহান আল্লাহ তাদের এ সকল বিভ্রান্তির স্বরূপ তুলে ধরেছেন। প্রথমতঃ ফিরিশতাগণ বা মহান আল্লাহর অন্যান্য প্রিয় বান্দাগণ 'আল্লাহর বান্দা' মহান আল্লাহর সন্তান নন, বা মহান আল্লাহর সাথে তাদের সৃষ্টিগত কোনো সম্পর্ক নেই, কোনো বিশেষ সম্পর্ক নেই বা তাঁদের কোনো ঐশ্বরিক ক্ষমতা নেই। তাঁদের কেউ তাঁর অবাধ্য হলে বা কোনো প্রকারের ইশ্বরত্ব বা

উপাস্য হবার দাবী করলে তাদেরকে ও অন্য সকল অত্যাচারী পাপীর মত শাস্তি পেতে হবে।

মালাকগণ বা মহান আল্লাহর অন্যান্য প্রিয় বান্দাগণের সুপারিশ কখনোই জাগতিক রাজা-বাদশাহগণের কাছে আমলাদের সুপারিশের মত নয়। মহান আল্লাহ সর্বজ্ঞ আলিমুল গাইব। ফিরিশতাগণ বা নেক বান্দাগণ সদা-সর্বদা তাঁরই ভয়ে ভীত। তাঁরা শুধু মহান আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের জন্যই মহান আল্লাহর কাছে শাফাআত করেন না। কাজেই পাপ, শিরক ও অবিশ্বাসে লিপ্ত থেকে ফিরিশতাদের শাফাআতের আশা করা কাফিরদের অবাস্তব কল্পনা। আর কোনো কাফির যদি ভক্তির নামে বা শাফা'আতের আশায় তাদের কাউকে 'ইবাদত' করে আর তিনি তাতে সন্তুষ্ট হয় তবে মহান আল্লাহ তার জন্যও ভয়ঙ্কর শাস্তির সংবাদ দিয়েছেন। এ বিষয়ে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

كَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ -

"আকাশে কত ফিরিশতা রয়েছে তাদের কোনো সুপারিশ ফলপ্রসু হবে না যতক্ষণ না মহান আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অনুমতি না দেন।" (নাজম: ২৬) মহান আল্লাহ আরো বলেন :

أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ ۚ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ - قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا - لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ - ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ -

"তবে কি তারা মহান আল্লাহ ব্যতীত অপরকে সুপারিশকারী ধরেছে? বলুন: তাদের কোনো ক্ষমতা না থাকলেও এবং তারা না বুঝলেও ? বলুন: 'সকল সুপারিশ মহান আল্লাহরই, ইখতিয়ারে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব মহান আল্লাহরই, অতঃপর তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যানীত হবে।" (যুমার: ৪৩-৪৪)

এভাবে পবিত্র কুরআন মালাকগণের শাফা'আত অস্বীকার করছে না। তবে তাদের শাফা'আতের মালিকানা বা ক্ষমতার ধারণার ভিত্তিহীনতা বর্ণনা করছে। শাফা'আতের মালিকানা ও ক্ষমতা একমাত্র মহান আল্লাহর। তিনি যাকে ইচ্ছা যখন অনুমতি প্রদান করবেন সে তখন কেবলমাত্র যাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট রয়েছেন তাদেরই সুপারিশ করবেন।

ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনার গুরুত্ব ঃ

বস্তুতঃ ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান মহান আল্লাহর প্রতি ঈমানের পরিপূর্ণতা এবং তার আবশ্যিক পরিশিষ্ট মাত্র। এর উদ্দেশ্য শুধু ফেরেশতাদের অস্তিত্বের প্রতি স্বীকৃতি দানই নয়, বরং প্রকৃত গুরুত্ব হচ্ছে, বিশ্ব ব্যবস্থায় তাদের সঠিক মর্যাদা উপলব্ধি করা, যাতে করে মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান খালেস তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শির্ক ও গায়রুল্লাহর ইবাদাতের তামাম মিশ্রণ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনার অর্থ হলো, মানুষকে জগত সম্রাটের সংগে সংগে তার কর্মচারীদের প্রতি স্বীকৃতি দান করা। এছাড়া মানুষ আল্লাহর বিশাল সাম্রাজ্যে নিজের মর্যাদাকে উপলব্ধিও করতে পারবে না এবং সে সম্পর্কে সচেতনও হতে পারবে না। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ -

অর্থাৎ যারা মহান আল্লাহ, তার ফেরেশতা বৃন্দ, তার রাসূলগণ এবং জিবরাইল ও মীকাঈলের শত্রু, মহান আল্লাহ স্বয়ং সেই কাফিরদের শত্রু। (বাক্বারা– ৯৮)

হাদীসের আলোকে ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান

১। আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত আছে ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন ঃ মালাইকাগণকে নূরের দ্বারা তৈরী করা হয়েছে। আর জ্বীন জাতিকে ধুম্রবিহীন অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে আর আদম জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে এমন বস্তু দ্বারা যা তোমাদেরকে বলা হয়েছে। (মুসলিম)

মিরাজ সম্পর্কিত কোন কোন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিশ্ব নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা সম্মুখে 'বায়তুল মামুর' উপস্থিত করা হয়, যা সপ্তম আসমানে মতান্তরে ষষ্ট আসমানে অবস্থিত। আর যা জমীনে স্মৃতিবহ কাবাগৃহের সম পর্যায়ের মত এবং তার বরাবর আকাশে তার সম্মান। প্রত্যহ এতে সত্তর হাজার মালাইকা প্রবেশ করে। তারপর তারা দ্বিতীয়বার প্রবেশের সুযোগ পায় না। (মুসলিম)

২। আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত আছে ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন ঃ আকাশে মালাইকা ছাড়া পা

ফেলার মত জায়গা নেই। কেননা, সর্বত্রই মালাইকাগণ সিজদা বা দন্ডায়মান অবস্থায় আছেন। এ সম্পর্কে মালাইকাগণের বক্তব্য ঃ নিশ্চয়ই আমরা সারিবদ্ধ ভাবে আছি এবং নিশ্চয়ই আমরা প্রশংসা কারী। (ইবনে আবি হাতেম, ইবনে জরীর, মুহাম্মাদ ইবনে নাসের)

জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন ঃ আকাশে মালাইকা ছাড়া পা ফেলার মত অথবা এক বিঘত বা হাতের তালু পরিমাণ স্থানও খালি নাই। তারা কেউ দন্ডায়মান, কেউ সিজদায়, কেউ রুকুতে আছেন। অতঃপর তারা ক্বিয়ামতের দিন একবাক্যে বলে উঠবেন ঃ তোমারই প্রশংসা হে আল্লাহ, আমরা তোমার উপযুক্ত ইবাদাত করতে পারিনি, তবে তোমার সাথে কাউকেও শরীক করিনি। (তাবারানী)

৩। জাবির রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন ঃ আমাকে মহান আল্লাহর আরশ বহনকারী মালাইকাদের একজন সম্পর্কে কিছু বলতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তার কানের লতি হইতে গর্দান পর্যন্ত সাতশত বৎসরের রাস্তা। (আবুদাউদ ও বাইহাকী)

আর জিবরাইল আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা তাদের প্রধান ! মহান আল্লাহ তার আমানত, সৎ চরিত্র এবং শক্তি সম্পর্কে প্রশংসা করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ - ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ - অর্থাৎ তাঁকে (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা কে) শক্তিশালী ব্যক্তি জিবরাইল আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা শিক্ষা দিয়াছেন যিনি সৎ চরিত্র এবং সুন্দর (চেহারার অধিকারী)। (আন নজম– ৫-৬)

অতঃপর তিনি (জিবরাইল) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এর সম্মুখে দন্ডায়মান হলেন। তার শক্তির অন্য নিদর্শন এই যে, তিনি কওমে লুতের শহরকে, যা সাতটি গ্রামের সমষ্টি ছিল, উর্দ্ধে উত্তোলন করেছিলেন। তারা প্রায় চার লক্ষ লোক ছিল। আর তাদের সাথে ছিল তাদের বাহন, চতুষ্পদ জন্তু, আর মাদায়েনের মাটির শত শত দালান কোটা। সকলকে তার এক পাখায় উঠিয়ে আসমান পর্যন্ত পৌঁছিয়েছিলেন। যার ফলে মালাইকাগণ তাদের কুকুরের ঘেউ ঘেউ, মোরগের কক্ কক্ শব্দ শুনেছিলেন।

অতঃপর তা এমনভাবে উল্টিয়ে দিয়েছিলেন, যে উপরের অংশ নীচে ও নীচের অংশ উপরে গেল। এটাই জীবরাইল আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা এর মহাশক্তির নিদর্শন।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ - مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ - অর্থাৎ নিশ্চয়ই উহা (পবিত্র কোরআন) মর্যাদাশীল দূতের বাণী, যিনি শক্তির অধিকারী, যিনি আরশের মালিক এর নিকট থাকেন, তিনি অনুসরণের পাত্র। (তাকভীর– ২০-২১)

অর্থাৎ মালাইকা জগতে তার কথা অনুসরণ (যোগ্য), অতঃপর তিনি বিশ্বস্ত। অর্থাৎ তার শক্তি আছে এবং তিনি মহাশক্তিশালী এবং তার উচ্চ সম্মান রয়েছে মহান আল্লাহর নিকট, যিনি আরশের মালিক অর্থাৎ মহাকাশের মালাইকাদের মজলিশে তিনি অনুসরণ (যোগ্য) যিনি মহা আমানতের অধিকারী। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এর নিকট বিভিন্নরূপ ধরে আসতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা দুইবার তার স্বীয় আকৃতিতে দেখেছেন। তার ছয়শত পাখা রয়েছে। (বুখারী)

৪। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা জিবরাইল আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমাকে তার নিজ আকৃতিতে দেখেছেন। তার ছয়শত পাখা রয়েছে। প্রত্যেকটি আকাশের কিনারা পর্যন্ত পৌঁছেছে। তার পাখা হতে বিভিন্ন রংয়ের মুক্তা ইয়াকুত ঝরে, যে সম্বন্ধে মহান আল্লাহ ভাল জানেন। (মসনদে আহমাদ)

৫। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা জিবরাইল আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমাকে তার নিজ আকৃতিতে একটি সবুজ কাপড়ে আবৃত, আসমান ও জমীনে পরিপূর্ণ অবস্থায় দেখেছেন। (মুসলিম)

৬। আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত আছে ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন ঃ আমি জিবরাইল আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমাকে আকাশ হতে অবতরণ অবস্থায় দেখেছি। তার আকৃতিতে পূর্ব ও পশ্চিম দিক পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। তাকে মনি মুক্তা খচিত রেশমী কাপড় পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। (আবু শেখ)

৭। ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে উত্তম মালাইকা সম্পর্কে অবহিত করব না ? তিনি হলেন জিবরাইল আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা। (তাবারানী)

ইবনে জরীর ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেণ ঃ জিবরাইল আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা মহান আল্লাহর বান্দা, মিকাইল আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা মহান আল্লাহর ছোট বান্দা (ক্ষুদ্র দাস)। যে কোন নামের সাথে ইল থাকিলে তার অর্থ হবে মহান আল্লাহর বান্দা ও দাস।

৮। আবু ইমরান আল জাওনী হতে বর্ণিত আছে ঃ তার নিকট খবর পৌঁছেছে যে, একদা জিবরাইল আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা এর নিকট ক্রন্দনরত অবস্থায় আসলেন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা তাঁকে বললেন ঃ আপনার কান্নার কারণ কি ? তিনি বললেন ঃ আমি কেন ক্রন্দন করব না ? মহান আল্লাহর শপথ ! যখন মহান আল্লাহ জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন, তখন হতেই আমার চক্ষু শুকায়নি এই ভয়ে যে, যদি আমি মহান আল্লাহর হুকুমের অবাধ্যতা করি, তাহলে মহান আল্লাহ আমাকে ঐ জাহান্নামের অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করবেন। (আহমাদ জোহদ কিতাবে এটা বর্ণনা করেছেন)

ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে ঃ একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা জিবরাইল আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা কে বললেন ঃ হে জীবরাইল আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা। আপনি কি আমাদের নিকট আরো অধিকবার আসতে পারেন না ? অতঃপর নীচের আয়াত অবতীর্ণ হয়।

وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ - لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ - وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا - অর্থাৎ তিনি মহান আল্লাহর আদেশ ছাড়া অবতরণ করেন না, আমাদের সম্মুখের এবং পশ্চাতের সবই তার (মহান আল্লাহর) জন্য। (মারইয়াম– ৬৪)

তাদের সর্দারদের মধ্যে একজন হলেন মিকাইল আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা তার উপর বৃষ্টি এবং বৃক্ষরাজী সম্পর্কিত কার্যাবলী ন্যস্ত করা হয়েছে। (বুখারী)

৯। আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা জিবরাইল আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা কে বললেন ঃ আমার কি হল যে, মিকাইল আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা কে কখনও হাসতে দেখিনি। জিবরাইল আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা বললেন ঃ তিনি জাহান্নাম সৃষ্টি হওয়ার পর হতেই আর হাসেন না। (মসনাদে আহমাদ)

১০। আবু সাইদ খুদরী রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন ঃ কিভাবে নিশ্চিন্ত থাকব, অথচ শিংগাধারী মালাইকা সর্বদা শিংগা মুখে নিয়ে প্রস্তুত আছেন, তার মস্তক সব সময়ই অবনত অবস্থায় আছে এবং তার কান সজাগ আছে এবং তিনি অপেক্ষায় আছেন, যখনই মহান আল্লাহর পক্ষ হতে হুকুম দেয়া হবে তখনই ফুৎকার দিবেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল ! আমরা কি বলব ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ তোমরা বলবে– **হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'অমাল অকিল আলাল্লাহি তাওয়াককালনা** অর্থাৎ মহান আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতইনা উত্তম ভরসাস্থল। আমরা মহান আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করলাম। (তিরমিযী, হাকেম) (আল-ইমরান– ১৭৩)

১১। ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন ঃ আরশ বহনকারী মালাইকাদের মধ্যে এক জনের নাম ইসরাফীল। আরশের একটি স্তম্ভ তার স্কন্ধের উপর। তার দুই পা সপ্ত জমীন পর্যন্ত প্রশস্ত এবং তার মাথা সপ্তাকাশ পর্যন্ত উঠেছে। (আবু শায়েখ, আবু নঈম হুলিয়াতে বর্ণনা করেছেন)

আবু শাইখ আওজায়ী হতে বর্ণনা করেণ। তিনি বলেছেন মহান আল্লাহর সৃষ্ট জীবের মধ্যে ইসরাফীল থেকে অধিক সুন্দর কণ্ঠস্বর আর কাহারও নাই। তিনি যখন তসবীহ পাঠ আরম্ভ করেণ, আকাশবাসীরা তাদের তাসবীহ পাঠ ও সলাত আদায় করা থেকে বিরত থাকেন। তাদের সর্দারদের মধ্যে একজন হচ্ছেন মালাকুল মউত। তার প্রকৃত নাম স্পষ্টভাবে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসে উল্লেখ নাই। কোন কোন হাদীসে তার নাম আজরাইল উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহই সে বিষয়ে ভাল জানেন। একথা হাফেজ ইবনে কাসীর রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন। তিনি আরও বলেছেন ঃ মালাইকাদের কর্তব্য অনুযায়ী তাদেরকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। কেউ আরশ বহন করেন, কেউ আরশের চতুর্দিকে আরশ বহনকারীদের সাথে আছেন। তারাই

সবচেয়ে সম্মানিত মালাইকা এবং তারাই মহান আল্লাহর প্রিয় মালাইকা। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَّن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِّلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ - অর্থাৎ মসীহ (ঈশা আঃ) কখনও মহান আল্লাহর বান্দা হতে অস্বীকার করেনি। আর নিকটতম মালাইকারাও মহান আল্লাহর বান্দা হতে অস্বীকার করেনি। (নিসা– ১৭২) আবার মালাইকাদের কাউকেও আসমানের অধিবাসী বলা হয়। তারা রাত দিন, সকাল সন্ধ্যা মহান আল্লাহর ইবাদাতে লিপ্ত। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ - অর্থাৎ তারা রাতদিন মহান আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করে, কিন্তু তারা কখনও ক্লান্ত হয় না। (আম্বিয়া– ২০) আবার কেউ কেউ বায়তুল মামুর একের পর এক তওয়াফ করে। যারা পরস্পর একের পর এক বায়তুল মামুরের নিকট আসেন, তারা আসমানের অধিবাসী।

তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার জান্নাতের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এবং জান্নাতবাসীদের সম্মান করার জন্য নিযুক্ত এবং তারা সর্বদা জান্নাতের অধিবাসীদের আতিথেয়তার জন্য ব্যস্ত। তারা তাদের পোষাক পরিচ্ছদ, খাদ্য, পানীয় ও থাকার স্থান ইত্যাদির ব্যবস্থা করেন, এমন সমুদয় বস্তু যা কোন কালেও কেউ শোনেনি এবং কখনও কোন চক্ষু দেখেনি এবং কোন মানুষ তা কখনও কল্পনাও করেনি।

আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ জাহান্নামের জন্য নিয়োজিত আছেন। মহান আল্লাহ আমাদিগকে ঐ জাহান্নাম হতে মুক্তি দান করুন। তাদের নাম জাবানিয়া। তাদের সর্দার হলেন উনিশজন। আর জাহান্নামের রক্ষকের নাম হল **'মালেক'**। তিনি ঐ উনিশজনের সর্দার। তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ - অর্থাৎ জাহান্নামবাসীরা প্রহরীকে বলবে, তুমি তোমার রবকে বল, তিনি যেন একদিনের জন্য আমাদের শাস্তি লাঘব করেণ। (গাফের– ৪৯) মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ

وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ - قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ - অর্থাৎ জাহান্নামবাসীরা চিৎকার করে বলবে, হে মালেক, তুমি তোমার রবকে বল, (তিনি) যেন আমাদেরকে মৃত্যুদান করেন। উত্তরে তিনি বলবেন, তোমরা চিরকাল জীবিত থাকবে। (যুখরুফ–৭৭) মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ - অর্থাৎ জাহান্নামে ভয়ংকর আকৃতি ও কঠিন হৃদয়ের মালাইকারা আছে, যারা কখনও মহান আল্লাহর অবাধ্যতা করে না, বরং তারা মহান আল্লাহর আদেশ প্রতিপালন করে। (তাহরীম– ৬) অন্যত্র মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ - وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ - অর্থাৎ জাহান্নামে উনিশজন বিরাটাকায় মালাইকা আছে আর জাহান্নামের মালাইকাদের আমি আশ্চর্য এবং অদ্ভুত আকারে সৃষ্টি করেছি। মহান আল্লাহর সৈন্য সামন্ত সম্পর্কে মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ ভাল জানে না। (মুদদ্াছছির– ৩০-৩১) আবার কেউ কেউ মানবজাতির রক্ষণা বেক্ষণের দায়িত্ব পালনে লিপ্ত আছেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ - অর্থাৎ মানুষের সম্মুখে পিছনে পালাক্রমে মালাইকারা বেষ্টন করে আছে। মহান আল্লাহর হুকুমে তারা মানুষকে হিফাজত করছে। (রাদ– ১১)

ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ কতিপয় মালাইকা মানুষের অগ্র পশ্চাতে তাকে পাহারা দিচ্ছেন। যখন মহান আল্লাহর আদেশ আসবে, তখন তারা সরে পড়বে। মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন ঃ কোন বান্দা মালাইকার হিফাজত হতে বঞ্চিত নয়। তাকে জাগ্রত ও নিদ্রিত অবস্থায়, জ্বীন ও মানবজাতি এবং কীট পতঙ্গের অনিষ্টতা হতেও হিফাজত করে। অতএব তার কাছে কিছু এলে তার পিছনে মহান আল্লাহর আদেশ রয়েছে, অতঃপর তা বান্দার উপর আপতিত হয়। মালাইকাদের মধ্যে কেউ কেউ বান্দার আমল কার্যাবলী লক্ষ্য রাখার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ - مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ - অর্থাৎ যখন ডান ও বামের দুইজন মালাইকা পরস্পর সাক্ষাত করে, ঐ ব্যক্তি যাই বলবে ও করবে, তাই তারা সংরক্ষিত করে রাখে। (ক্বাফ– ১৭-১৮) অন্যত্র মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ - كِرَامًا كَاتِبِينَ - يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ - অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য পাহারাদার রয়েছে। তারা সম্মানিত লেখক, তোমরা যা কর, তা তারা জানে। (ইনফিতার– ১০-১২)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেন ঃ মোমেনের সাথে একশ ষাটটি ফেরেস্তা নির্দিষ্ট করা আছে। যারা তার থেকে ঐ সব জিনিস দূরে সরিয়ে দেয়, যার সামর্থ সে রাখে না। (তাবারনী, নাসবুর রায়াহ)

১২। ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ তোমাদেরকে নগ্ন হতে নিষেধ করেন। সুতরাং তোমরা মহান আল্লাহর মালাইকাদের লজ্জা কর। যারা তোমাদের সাথী, অতি সম্মানিত এবং তোমাদের আমল নামার লিখক এবং তারা তিন অবস্থা ছাড়া তোমাদের হতে পৃথক হন না। পায়খানা ও প্রসাবের সময়, স্ত্রী সহবাসের সময় এবং গোসলের সময়। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন খোলা ময়দানে গোসল কর তখন সে যেন কাপড় অথবা দেয়াল অথবা অন্য কিছু দিয়ে আড়াল করে নেয়। (বাজ্জার)

হাফিজ ইবনে কাসীর রহিমাহুল্লাহ বলেছেন ঃ তাদের সম্মান করার অর্থ তাদের লজ্জা করা। সুতরাং তাদের সামনে কোন খারাপ কাজ করবে না, যা তারা লিপিবদ্ধ করেন। কেননা, মহান আল্লাহ তাদেরকে চরিত্রে এবং চাল চলনে সম্মানিত করে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি বলেছেন ঃ তাদের সম্মানের অর্থ এই যে, তারা যে ঘরে কুকুর আছে, ছবি আছে এবং অপবিত্রতা ও মূর্তি আছে সে ঘরে প্রবেশ করে না। আর যাদের সাথে ঘন্টা অথবা কুকুর আছে, তাদের সাথেও থাকে না।

১৩। আবু হুরাইরা রাজিয়াল্লাহু আনহু, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলিমা হতে বর্ণনা করেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে রাত্রদিন মালাইকারা পালাক্রমে আসা যাওয়া করেন এবং তারা ফজর ও আসরের সময় একত্রিত হন। অতঃপর যারা তোমাদের সাথে রাত্রি যাপন করেছেন, তারা আকাশে আরোহণ করেন। তখন মহান আল্লাহ তাদের জিজ্ঞেস করেন তোমরা আমার বান্দাদের কি অবস্থায় ছেড়ে এসেছো ? অথচ তিনি বান্দাদের বিষয় অধিক জ্ঞাত। উত্তরে তারা বলেন, তাদেরকে সলাত আদায় করতে দেখে এসেছি এবং তাদের কাছে সলাত (নামাজ) আদায় অবস্থায় গিয়েছিলাম। (বুখারী, মুসলিম) অন্য বর্ণনায় আবু হুরাইরা রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ তোমরা ইচ্ছা করলে পড়তে পার ঃ

إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا - অর্থাৎ ফজরের সলাতে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত নিশ্চয়ই এ তিলাওয়াত সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য হবে। (ইসরা– ৭৮)

ইমাম মুসলিম ও আহমাদ হাদীস বর্ণনা করেছেন যখনই কোন সম্প্রদায় মহান আল্লাহর পবিত্র কুরআন পাঠ করার জন্য এবং পরস্পরে শিক্ষা দিবার জন্য একত্রিত হয়, তখনই তাদের উপর শান্তিবর্ষিত হয়, রহমত তাদেরকে বেষ্টন করে রাখে এবং মালাইকারা তাদেরকে ঘিরে রাখেন। মহান আল্লাহ তার নিকটবর্তীদের নিকট তাদের কথা আলোচনা করেন। আর যার আমল ধীর গতিতে চলে, বংশ মর্যাদা তাকে অগ্রগামী করতে পারে না। (অর্থাৎ নেক আমল দ্বারাই মানুষ নৈকট্য লাভ করতে পারে।)

মাসনাদে এবং সুনান গ্রন্থ-গুলোতে বর্ণিত হাদীস মালাইকা গণ তালেবে ইলমদের কাজের সন্তুষ্টির নিমিত্ত তাদের জন্য পাখা বিছিয়ে দেন।

মালাকগণে বিশ্বাসের কল্যাণ ঃ

আমরা দেখেছি যে, অদৃশ্য জগতের বিষয়ে মহান আল্লাহ আমাদেরকে কেবলমাত্র সে সকল বিষয়ই জানিয়েছেন এবং বিশ্বাস করতে নির্দেশ দিয়েছেন যার বিশ্বাস আমাদের জীবনে কল্যাণ ও পূর্ণতা বয়ে আনে। আমরা একটু চিন্তা করলেই মালাকগণে বিশ্বাসের কল্যাণ অনুভব করতে পারব।

এই বিশ্বাসের সবচেয়ে বড় কল্যাণ, আমরা মহান আল্লাহর এই সম্মানিত বান্দাদের সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন সমাজে প্রচলিত নানা ধরনের কুসংস্কার, অলীক বিশ্বাস, অতিভক্তি, শিরক ইত্যাদি থেকে আমরা রক্ষা পাই, যে সকল কুসংস্কার মানুষের ইহলোকিক জীবনকে অস্থিরচিত্ত, ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলে। কল্যাণের কামনায় তারা এখানে সেখানে ছুটে বেড়ায়। তাদের ব্যক্তিত্ব হয়ে যায় বহুবিভক্ত। উপরন্ত এসকল কুসংস্কার তাদের জন্য বয়ে আনে পারলৌকিক ধ্বংস ও সর্বনাশ, কারন আমরা জানি যে, শিরকের একমাত্র পরিণতি জাহান্নামের অনন্তশাস্তি।

এছাড়া ফিরিশতাদের উপর বিশ্বাস আনার ফলে আমরা মহান আল্লাহর সৃষ্টির মাহাত্ম জানতে পারি। এ বিশ্বাস আমাদের হৃদয় মনে শান্তি বয়ে আনে। একজন বিশ্বাসী কখনই নিজেকে অসহায় মনে করে না। একাকিত্বের অনুভূতি কখনই তাকে গ্রাস করবে না। তিনি সদাসর্বদা অনুভব করেন যে, মহান আল্লাহর অগণিত ফিরিশতা তাকে ঘিরে রেখেছেন, তাঁদের দু'আ তাকে কল্যাণের পথে নিয়ে যাবে। সকল কষ্ট, সকল বেদনা উত্তরণে তিনি সাহস ও প্রেরণা পাবেন। ধৈর্য ও দৃঢ়তা নিয়ে তিনি সকল হতাশাকে জয় করতে পারবেন।

মালাকগণে বিশ্বাস মানুষকে কল্যাণ ও সততার পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করে। তিনি জানেন যে, কল্যাণকর্মে রত মানুষের জন্য প্রার্থনা করেন মালাকগণ। একজন মুসলিম অন্যান্য মুসলিমের কল্যাণের জন্য তাদের অনুপস্থিতে অন্তরের আকুতি দিয়ে দুআ করেন, কারণ তিনি জানেন যে, এ দু'আর ফলে তিনিও লাভবান হবেন। মহান আল্লাহর মালাকগণ তার জন্য দু'আ করেন। এমনিভাবে সকল ন্যায় ও কল্যাণের কাজে তিনি প্রেরণা ও উৎসাহবোধ করেন।

ফেরেশতা

প্রশ্ন ঃ ফেরেশতাগণ কিসের তৈরি?

উত্তর ঃ নূর বা জ্যোতির তৈরি। (মিশকাত, হা/৫৭০১)

প্রশ্ন ঃ ফেরেশতাদের কাজ কী? তারা স্বেচ্ছায় কিছু করেন কি?

উত্তর ঃ ফেরেশতাদের কাজ একমাত্র মহান আল্লাহর হুকুম পালন করা। তারা স্বেচ্ছায় কিছুই করেন না। *(সূরাহ আত–তাহরীম : ৬; সহীহ বুখারী, হা/৩২২৩)।*

প্রশ্ন ঃ ফেরেশতাদের সর্দার কে? তিনি কোন দায়িত্বে নিয়োজিত?

উত্তর ঃ জিবরীল আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা। তিনি নবী-রাসূলদের নিকট অহী বহনের দায়িত্বে নিয়োজিত। *(সূরাহ আন-নাহল : ১০২; সহীহ বুখারী, হা/৪৯৯৭)।*

প্রশ্ন ঃ ফেরেশতাগণের মধ্যে কি নারী ও পুরুষ রয়েছে?

উত্তর ঃ ফেরেশতাগণের মধ্যে পুরুষ কিংবা নারী জাতীয় পৃথক কোন জাতি নেই। তাঁরা সকলেই একই জাতীয়। তাঁরা পুরুষও নন নারীও নন। মহান আল্লাহ তাদেরকে পৃথক কোনো অবয়বে সৃষ্টি করেছেন। যার খবর একমাত্র তিনিই রাখেন। এটাই ফেরেশতাগণের ব্যাপারে বিশুদ্ধ ঈমানের দাবী। কিন্তু জাহেলী যুগে আরবের মুশরিকরা ফেরেশতাদেরকে 'আল্লাহর কন্যা' বলে আখ্যায়িত করত। মহান আল্লাহ তাদের এই ধারণা খণ্ডন করে আয়াত নাযিল করেন। *(প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম কিতাবের ৮৪ পৃষ্ঠার ৭৬ নং প্রশ্ন)*

প্রশ্ন ঃ ফেরেশতাগণ কি কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি রিপু থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত?

উত্তর ঃ তারা এ সমস্ত মানবীয় গুণাবলী থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। *(সূরাহ হূদ : ৬৯ : ৭০; সূরাহ আল-আম্বিয়া : ১৯-২০)*। উল্লেখ্য যে, **'হারূত-মারূত'** এবং **'যোহরা'** নামক মহিলার ব্যাপারে সমাজে প্রচলিত কাহিনী মিথ্যা ও বানোয়াট। *(তাফসীর ইবনু কাছীর, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৮, সূরাহ আল-বাক্বারাহ ১০২ নং আয়াতের তাফসীর দ্রঃ)*। উক্ত মর্মে বর্ণনাটি যঈফ ও বাতিল। তার সনদে মূসা বিন যুবাইর আনছারী নামক একজন অনির্ভরযোগ্য রাবী রয়েছে (ঐ)। শু'আয়ব আরনাঊত্ব রহিমাহুল্লাহ বলেন, বর্ণনাটি যঈফ। *(মুসনাদে আহমাদ, হা/৬১৭৮; সহীহ ইবনু হিব্বান, হা/৬১৮৬)। শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী বলেন, বর্ণনাটি বাতিল। (সিলসিলা যঈফাহ, হা/১৭০)*

প্রশ্ন ঃ ইসলামী শরী'আতে ফেরেশতাগণের গালি দেওয়ার হুকুম কী?

উত্তর ঃ ফেরেশতাগণের গালি দেওয়া বা তাঁদের সম্মানহানী এ রকম কোন ধরনের কথা বলা হারাম, বরং হত্যাযোগ্য অপরাধ। আল্লামা সুয়ূত্বী রহিমাহুল্লাহ কাযী আয়ায এর সূত্রে বলেন, **'যে ব্যক্তি ফেরেশতাগণের মধ্যে কোন ফেরেশতাকে গালি দিবে, তার শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড'**। *(প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম কিতাবের ৮৫ পৃষ্ঠার ৭৮ নং প্রশ্ন)*। আবুল হাসান ক্বাবেসী বলেন, 'যে ব্যক্তি অপরের জন্য বলবে, ওর চেহারা যেন ক্রোধান্বিত মালেকের চেহারা। অতঃপর যদি জানা যায় যে, সে ফেরেশতার নিন্দা করেছে তাহলে তাকে হত্যা করতে হবে'। ('আলিমুল মালাইকা ওয়াল আবরার, পৃঃ ৫৮)।

ইমাম সুয়ূত্বী রহিমাহুল্লাহ ক্বারাফী আল-মালেকীর বরাত দিয়ে বলেন, 'যে ব্যক্তি তাঁদেরকে কোন প্রকাশ্য সম্ভ্রমহানী করবে, সে কাফের হয়ে যাবে, তাতে কি ইঙ্গিতে হোক অথবা স্পষ্টভাবে হোক। সুতরাং যদি কেউ কঠোরচিত্তের মানুষের দিকে ইঙ্গিত করে বলে, অমুক জাহান্নামের রক্ষী মালেকের চাইতেও কঠোর-হৃদয়! অথবা কোন বিকৃত চেহারার কুৎসিত মানুষ দেখে তাচ্ছিল্য করা উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে'। *(প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম কিতাবের ৮৫ পৃষ্ঠার ৭৮ নং প্রশ্ন)*। বরং তাদের প্রতি সমানভাবে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা রাখতে হবে। এক্ষেত্রে তাদের মাঝে কোন পার্থক্য করা যাবে না। কেননা তাঁরা কেউ মুসলিমের শত্রু নন; বরং সকল মুমিন তাদের বন্ধু। আর বন্ধুকে কখনো কষ্ট দেওয়া ঠিক নয়। অন্যদিকে যারা ফেরেশতাদের বন্ধু তারা মহান আল্লাহর শত্রু। *(সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ৯৭-৯৮; সহীহ বুখারী, হা/৩২০৯; সহীহ মুসলিম, হা/২৬৩৭; মিশকাত, হা/৫০০৫)*।

প্রশ্ন ঃ বিশুদ্ধ বর্ণনামতে ফেরেশতাগণের সংখ্যা কত?

উত্তর ঃ ফেরেশতাগণ সংখ্যায় অগণিত। তাদের সংখ্যা এত বেশি যে, আসমানে চার আঙ্গুল পরিমাণ স্থানও ফাঁকা নেই, যেখানে তাঁরা মহান আল্লাহর জন্য সিজদাবনত হননি। সমগ্র আসমানজগৎ, আরশ বহন করা, জান্নাত ও জাহান্নামের পাহারা দেওয়া, মানুষের ভালো-মন্দ কাজ লিপিবদ্ধ করা, মানুষের নিরাপত্তাদান করা, পাহাড়ে নিযুক্ত, মৃত্যুদান করা, বৃষ্টিবর্ষণ করা প্রভৃতি বিভাগে মহান আল্লাহ প্রদত্ত অসংখ্য ফেরেশতাগণ নিয়োজিত রয়েছেন। কিন্তু তাদের প্রকৃত সংখ্যা মহান আল্লাহ ব্যতীত কারও জানা নেই। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ - 'তোমার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন' *(সূরাহ আল-মুদ্দাছছির : ৩১)*।

মে'রাজ রজনীতে মহান আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বায়তুল মা'মূর দেখেছিলেন। যেখানে প্রত্যহ সত্তর হাজার ফেরেশতা সালাত আদায় করেন। কিন্তু যারা একবার সুযোগ পান তারা বের হওয়ার পর দ্বিতীয়বার সুযোগ পান না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা বলেন,

'আমাকে বায়তুল মা'মূরে উঠানো হলো। জিবরীল আলাইহিস সালাম আত্-তাসলিমা–কে (এ সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলাম, তিনি উত্তরে বললেন, এই ঘরটি হলো বায়তুল মা'মূর, যেখানে প্রত্যেকদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা সালাত আদায় করেন। অতঃপর তাঁরা সালাত আদায় করে বের হলে পুনরায় সেখানে আর ফিরে আসার সুযোগ পান না'। *(সহীহ বুখারী, হা/৩২০৭; সহীহ মুসলিম, হা/১৬৪)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তাঁরা ক্বিয়ামত পর্যন্ত আর উক্ত বায়তুল মা'মূরে প্রবেশ করতে পারবেন না। *(সিলসিলা সহীহাহ, হা/৪৭৭)*।

প্রশ্ন ঃ ফেরেশতাগণের আকৃতি-প্রকৃতি কেমন?

উত্তর ঃ মহান আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাগণকে বিশাল আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী বিস্তৃত স্থানের সমপরিমাণ, দিগন্ত জুড়া বিরাট আকৃতি এবং তাদের দৈহিক কাঠামোর আকৃতি প্রভৃতি তার প্রমাণ বহন করে (সূরাহ আত-তাহরীম : ৬)। ফেরেশতা জিবরীলের আকৃতি ও বিশালতার ব্যাপারে বিস্তারিত জানা যায়। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমা স্বয়ং তাঁকে দু'বার প্রত্যক্ষ করেছেন (সূরাহ আল নাজম : ১৩-১৫)। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আয়েশা রাজিআল্লাহু আনহা বলেন,

‘এই উম্মাতের আমিই প্রথম উক্ত আয়াতের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত-তাসলিমাকে জিজ্ঞেস করি। তখন তিনি বলেন, তিনি হলেন জিবরীল। তাঁকে ঐ দু‘বার ছাড়া তাঁর সৃষ্টিগত আসল রূপে দর্শন করিনি। যখন তিনি আসমানে অবতরণরত ছিলেন, তাঁর বিরাট সৃষ্টি–আকৃতি আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানকে ঘিরে রেখেছিল’। *(সহীহ মুসলিম, হা/১৭৭)* ‘আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণের কানের লতি থেকে কাঁধ পর্যন্ত মধ্যবর্তী স্থানের দূরত্ব সাতশ’ বছরের পথ। *(মিশকাত, হা/৫৭২৮)*। অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, তাদের দু‘পা যমীনের উপরে এবং আরশ তার শিংয়ের উপর। আর তার কানের লতি থেকে কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানের দূরত্ব হলো একটি দ্রুতগামী পাখির সাতশ’ বছরের রাস্তার সমান’। *(সহীহুল জামে‘, হা/৮৫৩, সনদ সহীহ)*

প্রশ্ন ঃ ফেরেশতাগণের অবস্থানস্থল কোথায়?

উত্তর ঃ ফেরেশতাগণের অবস্থান মূলত আসমানে। *(সূরাহ আশ-শূরা : ৫; সূরাহ সূরাহ ফুছছিলাত : ৩৮)*। তবে তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রয়োজনে মহান আল্লাহর নির্দেশক্রমে আসমান থেকে পৃথিবীর দিকে অবতরণ করেন। *(প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম কিতাবের ৮৫ পৃষ্ঠার ১৮ নং প্রশ্ন)*।

প্রশ্ন ঃ ফেরেশতাগণ নবীগণের ন্যায় মা‘ছূম বা নিষ্পাপ?

উত্তর ঃ ফেরেশতাগণ নবীগণের ন্যায় মা‘ছূম বা নিষ্পাপ। তাঁরা সকল ভুলের ঊর্ধ্বে। কারণ তাঁরা সর্বদা মহান আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক কার্য সম্পাদন করে থাকেন, তার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম করেন না। তাঁরা মহান আল্লাহর নাফরমানী করেন না, বরং প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন *(সূরাহ আল-আম্বিয়া : ১৯ ও ২৭)*। ইমাম সুয়ূত্বী রহিমাহুল্লাহ কাযী আয়াযের বরাত দিয়ে বলেন, ‘তারা নিষ্পাপ হওয়ার ব্যাপারে যেমন নবীগণের বিধান, তাদের ক্ষেত্রে ও অনুরূপ বিধান। তাঁরা নবীগণের উপর তাদের হক্ব পৌঁছিয়ে দেন অনুরূপভাবে যেমনভাবে নবীগণ তাঁদের উম্মতের মাঝে পৌঁছেছিলেন। *(‘আলিমুল মালাইকা ওয়াল আবরার, পৃঃ ১৯)*। তাছাড়া ফেরেশতাগণের নিষ্পাপ হওয়ার ব্যাপারে ইসলামী শরী‘আতে স্পষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে। *(প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম কিতাবের ৮৫ পৃষ্ঠার ৭৮ নং প্রশ্ন)*।

এছাড়া মালাকগণের ঈমান আমাদেরকে মহান আল্লাহর সৃষ্টির মহত্ব, বিশালত্ব ও বৈচিত্র সম্পর্কে জ্ঞানদান করে। মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অনুপ্রেরণা দেয়। মহান আল্লাহ আমাদেরকে বিশুদ্ধ ঈমান দান করুন।

মালাকগণ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে হলে অনুগ্রহপূর্বক পাঠ করুন মৎ প্রণীত আলোড়ন সৃষ্টিকারী সুবৃহৎ কলেবরের **"সত্যিকারের মুমিন মুসলিমের পরিচয়"** নামক পুস্তকটি।

===ooo===

بسم الله الرحمن الرحيم

সি. এস. সি. এস প্রকাশনী থেকে
গ্রন্থকার রচিত প্রকাশিত কিছু বইয়ের তালিকা

ক)

- ☞ সলাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - সিরিজ-১
- ☞ সলাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - সিরিজ-২
- ☞ সলাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - সিরিজ-৩
- ☞ সলাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - সিরিজ-৪
- ☞ সলাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - সিরিজ-৫

খ)

- ☞ সত্যিকারের মুমিন-মুসলিমের পরিচয় - সিরিজ-১
- ☞ সত্যিকারের মুমিন-মুসলিমের পরিচয় - সিরিজ-২
- ☞ সত্যিকারের মুমিন-মুসলিমের পরিচয় - সিরিজ-৩
- ☞ সত্যিকারের মুমিন-মুসলিমের পরিচয় - সিরিজ-৪
- ☞ সত্যিকারের মুমিন-মুসলিমের পরিচয় - সিরিজ-৫

গ)

- ☞ দ্বীন-ইসলামে ঈমানের স্বরূপ - সিরিজ-১
- ☞ দ্বীন-ইসলামে ঈমানের স্বরূপ - সিরিজ-২
- ☞ দ্বীন-ইসলামে ঈমানের স্বরূপ - সিরিজ-৩
- ☞ দ্বীন-ইসলামে ঈমানের স্বরূপ - সিরিজ-৪
- ☞ দ্বীন-ইসলামে ঈমানের স্বরূপ - সিরিজ-৫

ঘ)

- ☞ পরকালের পাথেয় - সিরিজ-১
- ☞ পরকালের পাথেয় - সিরিজ-২
- ☞ পরকালের পাথেয় - সিরিজ-৩
- ☞ পরকালের পাথেয় - সিরিজ-৪
- ☞ পরকালের পাথেয় - সিরিজ-৫
- ☞ পরকালের পাথেয় - সিরিজ-৬
- ☞ পরকালের পাথেয় - সিরিজ-৭

ঙ)

☞ খুৎবাতাল্ মুসলিমীন - সিরিজ-১

☞ খুৎবাতাল মুসলিমীন - সিরিজ-২

☞ খুৎবাতাল্ মুসলিমীন - সিরিজ-৩

☞ খুৎবাতাল মুসলিমীন - সিরিজ-৪

☞ খুৎবাতাল্ মুসলিমীন - সিরিজ-৫

চ)

☞ যে গুনাহ তওবা ছাড়া ক্ষমা হয় না - সিরিজ-১

ছ)

☞ উম্মাতে মুহাম্মাদীর মুক্তির সঠিক পথ - সিরিজ-১ (যন্ত্রস্থ)

জ)

☞ দ্বীন প্রতিষ্ঠায় রাসূলের পদ্ধতি বনাম তাগুতি পদ্ধতি - সিরিজ-১ (যন্ত্রস্থ)

সি. এস. সি. এস প্রকাশনী থেকে
গ্রন্থকার রচিত প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কিছু কিতাবের তালিকা

(ক)

- সলাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - সিরিজ-১
- সলাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - সিরিজ-২
- সলাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - সিরিজ-৩
- সলাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - সিরিজ-৪
- সলাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - সিরিজ-৫

(খ)

- সত্যিকারের মুমিন-মুসলিমের পরিচয় - সিরিজ-১
- সত্যিকারের মুমিন-মুসলিমের পরিচয় - সিরিজ-২
- সত্যিকারের মুমিন-মুসলিমের পরিচয় - সিরিজ-৩
- সত্যিকারের মুমিন-মুসলিমের পরিচয় - সিরিজ-৪
- সত্যিকারের মুমিন-মুসলিমের পরিচয় - সিরিজ-৫

(গ)

- দ্বীন - ইসলামে ঈমানের স্বরূপ - সিরিজ-১
- দ্বীন - ইসলামে ঈমানের স্বরূপ - সিরিজ-২
- দ্বীন - ইসলামে ঈমানের স্বরূপ - সিরিজ-৩
- দ্বীন - ইসলামে ঈমানের স্বরূপ - সিরিজ-৪
- দ্বীন - ইসলামে ঈমানের স্বরূপ - সিরিজ-৫

(ঘ)

- পরকালের পাথেয় - সিরিজ-১
- পরকালের পাথেয় - সিরিজ-২
- পরকালের পাথেয় - সিরিজ-৩
- পরকালের পাথেয় - সিরিজ-৪
- পরকালের পাথেয় - সিরিজ-৫
- পরকালের পাথেয় - সিরিজ-৬
- পরকালের পাথেয় - সিরিজ-৭

(ঙ)

- খুৎবাবুল মুসলিমীন - সিরিজ-১
- খুৎবাবুল মুসলিমীন - সিরিজ-২
- খুৎবাবুল মুসলিমীন - সিরিজ-৩
- খুৎবাবুল মুসলিমীন - সিরিজ-৪
- খুৎবাবুল মুসলিমীন - সিরিজ-৫

(চ)

- যে গুনাহ তওবা ছাড়া ক্ষমা হয় না - সিরিজ-১

(ছ)

- উম্মাতে মুহাম্মাদীর মুক্তির সঠিক পথ - সিরিজ-১ (যন্ত্রস্থ)

(জ)

- দ্বীন প্রতিষ্ঠায় রাসূলের পদ্ধতি বনাম তাগুতি পদ্ধতি - সিরিজ-১ (যন্ত্রস্থ)

(ঞ)

- বিভিন্ন ধর্মে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্-তাসলীমা